এ্যাবস্ট্রাক্ট

শিরোনামঃ

ইসলামের হুদুদ আইন : ইয়াহুদী, খ্রিস্টান, হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের আইনের সাথে তুলনামূলক পর্যালোচনা

(Hudud Law in Islam : A Comparative study with the Laws of Judaism, Christianity, Hinduism and Buddhism)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ.ডি. ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

তত্ত্বাবধায়ক
ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ
অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০

গবেষক
মো: সেলিম-উল ইসলাম সিদ্দিকী
পিএইচ.ডি. গবেষক
রেজি. নং- ১৪৪/২০১৬-২০১৭
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ
ডিসেম্বর, ২০২১

শিরোনামঃ

ইসলামের হুদুদ আইন : ইয়াহুদী, খ্রিস্টান, হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের আইনের সাথে তুলনামূলক পর্যালোচনা

(Hudud Law in Islam : A Comparative study with the Laws of Judaism, Christianity, Hinduism and Buddhism)

সারসংক্ষেপ (Abstract)

আলহামদুলিল্লাহি ওয়াহদাহ। ওয়াস্সালাতু ওয়াস্সালামু ‘আলা মান লা নাবিয়্যাহ বা’আদাহ। মানুষ সমগ্র সৃষ্টির মাঝে একটি ব্যতিক্রম সৃষ্টি। মানুষকে বিবেক-বুদ্ধি ও কর্মের স্বাধীনতা দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে, যা অন্য কোনো সৃষ্টিকে দেওয়া হয়নি। মানুষ তার বিবেক-বুদ্ধিকে ব্যবহার করে স্বধীনভাবে নিজেকে পরিচালনা করতে পারে। কর্মের স্বধীনতা মানুষকে ভালো কাজ করার সুযোগ করে দিয়েছে স্বাধীনভাবে। ভালো কাজের পাশাপাশি নানা ধরনের মন্দ কাজেও জড়িয়ে পড়েছে মানব জাতি।

মানুষের মন্দ কাজের সীমা অনেক সময় বর্বরতাকেও ছাড়িয়ে যায়। এক মানুষ অন্য মানুষের সম্পদ হরণ করে, চরিত্রে কালিমা লেপন করে, এমনকি খুন পর্যন্ত করে। নৈতিকতার সকল বাঁধা উপেক্ষা করে অবৈধ যৌনাচারে লিপ্ত, ক্ষেত্র বিশেষ জোরপূর্বক ধর্ষণ করে। মানুষের এই অন্যায়, অনৈতিক কর্মকাণ্ড মানব জাতির জন্য, মানব সভ্যতার জন্য চরম হুমকি স্বরূপ।

মানব জাতির আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষ্যে পৃথিবীতে অসংখ্য আইন, বিধিবিধান প্রণীত হয়েছে। প্রচীন সকল সভ্যতায় আমরা লিখিত বা অলিখিত অসংখ্য আইন দেখতে পাই। প্রচলিত ধর্মসমূহও নিজস্ব আইন দ্বারা পরিচালিত হয়। পবিত্র কুরআন, বাইবেল, মনুস্মৃতিসহ অন্যান্য ধর্মগ্রন্থে মানব জীবন পরিচালনার নানা দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলাম পৃথিবীর সর্বপ্রাচীন ধর্ম। ইসলামী আইনও পৃথিবীর প্রাচীনতম আইন। যার সূত্রপাত আদি পুরুষ আদম (আ.) এর সময় থেকে। ইসলামী আইন পূর্ণতা লাভ করে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর মাধ্যমে। অদ্যাবধি পৃথিবীতে এ আইন প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত রয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে।

ইসলামী আইনের প্রকারসমূহের মধ্যে অন্যতম একটি হুদুদ আইন। কুরআন কর্তৃক সুনির্ধারিত শাস্তি আইনকেই ইসলামের দৃষ্টিতে হুদুদ আইন বলা হয়। মদ্যপান, ব্যভিচার, ব্যভিচারের অপবাদ, চুরি, ডাকাতি ইত্যাদি হুদুদভুক্ত অপরাধ।

ইসলামী আইনে হুদুদ হিসেবে স্বীকৃত অপরাধসমূহ সমাজ ও রাষ্ট্রের স্থিতি ও শান্তি নষ্টের প্রধানতম কারণসমূহের একটি। এর প্রত্যেকটিই ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। মাদকাসক্তি মানুষের মস্তিস্ক নষ্ট করে দেয়, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমিয়ে দেয়। ব্যভিচার চরম অশ্লীলতার প্রকাশ। ব্যভিচারের অপবাদ আরোপের মাধ্যমে আরোপিত ব্যক্তিকে সামাজিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন করা হয়, অনেক সময় ঐ ব্যক্তিকে বিনা অপরাধে শাস্তি ভোগ করতে হয়। চুরি-ডাকাতির মাধ্যমে অপরের অধিকার হরণ করা হয়।

হুদুদভুক্ত অপরাধসমূহ নৈতিক সকল ধর্ম, সমাজ ও রাষ্ট্রের নিকটই অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত। যেকারণে পৃথিবীর প্রায় সকল ধর্ম ও নৈতিক রাষ্ট্রে এগুলোকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। মানুষকে এ অন্যায় অপকর্ম থেকে রক্ষা করতে শাস্তির ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে অধিকাংশ ধর্ম ও রাষ্ট্রব্যবস্থায়।

বর্তমান পৃথবীতে অসংখ্য ধর্ম বিদ্যমান রয়েছে। কমবেশি সব ধর্মেরই অনুসারী রয়েছেন। অনুসারীর সংখ্যা বিবেচনায় বর্তমান পৃথিবীর সর্ববৃহৎ ধর্ম খ্রিস্টধর্ম। এরপরই ইসলামের অবস্থান। গৌতম বুদ্ধ প্রতিষ্ঠিত বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারীর সংখ্যা ইসলামের পরেই। ভারতবর্ষে বেড়ে ওঠা হিন্দু ধর্মের অবস্থান বৌদ্ধ ধর্মের পরে। অনুসারীর সংখ্যা বিবেচনায় উপরে উল্লিখিত ধর্মসমূহের তুলনায় ইহুদী ধর্ম ক্ষুদ্র হলেও রাজনীতি, অর্থনীতিসহ নানা কারণে ইহুদী ধর্মও বর্তমান পৃথিবীতে অত্যন্ত আলোচিত একটি ধর্ম।

সার্বিক বিবেচনায় উপরে উল্লিখিত ধর্মসমূহই বর্তমান পৃথিবীর প্রধান ধর্ম। তাছাড়া উল্লিখিত ধর্মসমূহ অন্যান্য ধর্মসমূহের তুলনায় অনেক বেশি সুসংহত। এসব ধর্মের ধর্মীয়গ্রন্থসমূহ এখনও পাওয়া যায়।

যদিওবা কুরআন ব্যতীত অন্যান্য ধর্মগ্রন্থসমূহে যথেষ্ট সংযোজন, বিয়োজন ঘটেছে বলে বিশেষজ্ঞগণ মনে করে থাকেন। যাহোক গুরুত্ব বিবেচনায় এ ধর্মসমূহ নানা কারণেই অন্যান্য কম প্রসিদ্ধ ধর্মসমূহ থেকে বেশ এগিয়ে। যেকারণে বক্ষ্যমাণ অভিসন্দর্ভে ইসলামী হুদুদভুক্ত অপরাধের শাস্তির সাথে উল্লিখিত ধর্মসমূহে বর্ণিত ও প্রচলিত ঐ অপরাধসমূহের শাস্তির সাথে তুলনামূলক পর্যালোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে।

বর্তমানে হুদুদভুক্ত অপরাধের মাত্রা গোটা বিশ্বব্যপী বৃদ্ধি পেয়েছে। যেকারণে বিশ্বব্যাপী নানা বিষয়ে প্রভূত উন্নয়ন দৃশ্যমান হওয়া সত্ত্বেও মানুষ প্রশান্তি পাচ্ছে না। পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই সাধারণ মানুষ অপরাধী ব্যক্তি বা গোষ্ঠী দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছে, সাধারণ মানুষের অধিকার লংঘিত হচ্ছে। সকল মানুষের জন্য শান্তিপূর্ণ পৃথিবী নির্মাণে যাবতীয় অপরাধের মাত্রা শূণ্যের কোঠায় নিয়ে আসা অপরিহার্য। যেকারণে কোন আইন মানুষকে অপরাধ থেকে ফিরিয়ে রাখতে সর্বাধিক উপযোগী সে বিষয়ে বিস্তর গবেষণা আজ সময়ের দাবি। আর এ সমকালীন গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন পূরণ করার মহৎ লক্ষ্যে “ইসলামের হুদুদ আইন : ইয়াহুদী, খ্রিস্টান, হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের আইনের সাথে তুলনামূলক পর্যালোচনা” শীর্ষক গবেষণাকর্মে আমি আত্মনিয়োগ করেছি।

সুবিন্যস্তভাবে উপস্থাপনের জন্য বক্ষ্যমাণ গবেষণা অভিসন্দর্ভটি দশটি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায় ইসলামের পরিচয়, বৈশিষ্ট্য, আইনের পরিচয়, আইনের ইতিহাস এবং ইসলামী আইনের পরিচয়, ইতিহাস ও বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে ইসলামী শাস্তি আইনের পরিচয়, প্রকারভেদ তুলে ধরা হয়েছে। এর পাশাপাশি হুদুদভুক্ত অপরাধের শাস্তি সম্পর্কেও একটা নাতিদীর্ঘ ধারনা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে হুদুদ আইনের বিস্তার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। ইসলামী আইনের উৎপত্তি হযরত আদম (আ.) এর সময় থেকে শুরু হলেও এ অভিসন্দর্ভে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর যুগ থেকে আলোচনা করা হয়েছে। কারণ এ সময়ই রাষ্ট্রীয় পর্যায় সর্বাত্মকভাবে ইসলামী আইনের প্রচলন প্রথমবারের মতো শুরু হয়।

পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছদে যথাক্রমে ইয়াহুদী, খ্রিস্ট, হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের পরিচয়, ইতিহাস, বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি তুলে ধরা হয়েছে। এ অধ্যায়গুলোর দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে উল্লিখিত

ধর্মসমূহের হুদুদভুক্ত অপরাধের বিধিবিধান ও শাস্তি প্রসঙ্গে পর্যালোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে। বাংলাদেশে হুদুদ আইন প্রয়োগের সমস্যা ও সম্ভাবনা সম্পর্কে নবম অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। দশম অধ্যায়ে ইসলামী হুদুদ আইনের সাথে ইয়াহুদী, খ্রিস্টান, হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মীয় শাস্তি আইনের সাথে তুলনামূলক পর্যালোচনা করা হয়েছে। এরপর গবেষণার প্রাপ্তি, সুপারিশ অতঃপর একটি উপসংহার উল্লেখ করা হয়েছে।

বাংলাদেশের সমাজব্যাস্থা, আইন ও দণ্ডবিধিতে হুদুদভুক্ত অপরাধসমূহের প্রায় সবগুলোই অপরাধ হিসেবে স্বীকৃত। পরিশিষ্টে এ প্রসঙ্গে অর্থাৎ বাংলাদেশের আইন ও দণ্ডবিধিতে হুদুদভুক্ত অপরাধের শাস্তি তুলে ধরা হয়েছে। সর্বশেষে একটি সুবিস্তৃত গ্রন্থপঞ্জি উল্লেখ করা হয়েছে।

আমি প্রত্যাশা করি যে, আমার এ অভিসন্দর্ভের দ্বারা ভবিষ্যতে আরো ব্যাপক গবেষণার পথ উন্মুক্ত হবে। দৃঢ়ভাবে আমি এও বিশ্বাস করি যে, আমার এ গবেষণাকর্ম জ্ঞানের জগতে এক নতুন সংযোজন হবে ইনশাআল্লাহ। এ গবেষণা অভিসন্দর্ভের অনাকাঙ্খিত ভুলের জন্য আমি মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন এর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি। মহান আল্লাহ আমাকে এবং এ অভিসন্দর্ভের পাঠককুলকে এর দ্বারা উপকৃত হওয়ার তওফিক দান করুন। আমিন।

(ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ)
অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা- ১০০০
ও
গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক

(মো: সেলিম-উল ইসলাম সিদ্দিকী)
পিএইচ.ডি গবেষক
রেজি. নং- ১৪৪/২০১৬-২০১৭
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১০০০

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামের হুদুদ আইন : ইয়াহুদী, খ্রিস্টান, হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের আইনের সাথে তুলনামূলক পর্যালোচনা

(Hudud Law in Islam : A Comparative study with the Laws of Judaism, Christianity, Hinduism and Buddhism)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ.ডি. ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

তত্ত্বাবধায়ক
ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ
অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০

গবেষক
মোঃ সেলিম-উল ইসলাম সিদ্দিকী
পিএইচ.ডি. গবেষক
রেজি. নং- ১৪৪/২০১৬-২০১৭
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ
ডিসেম্বর ২০২১

প্রত্যয়নপত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের গবেষক মো: সেলিম-উল ইসলাম সিদ্দিকী কর্তৃক পিএইচ.ডি. ডিগ্রী লাভের নিমিত্তে উপস্থাপিত "ইসলামের হুদুদ আইন : ইয়াহুদী, খ্রিস্টান, হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের আইনের সাথে তুলনামূলক পর্যালোচনা" শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় রচিত হয়েছে। আমি এর পাণ্ডুলিপিটি আদ্যোপান্ত পাঠ করেছি। আমার জানা মতে, গবেষকের উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভের সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশ বিশেষ অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রী/ডিপ্লোমা লাভের জন্য কিংবা প্রকাশের জন্য উপস্থাপন করা হয়নি। সুতরাং গবেষককে পিএইচ.ডি. ডিগ্রী প্রদানের নিমিত্তে অভিসন্দর্ভটি পরীক্ষকগণের নিকট প্রেরণের জন্য জমা নেয়ার সুপারিশ করছি।

(ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ)
অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা- ১০০০
ও
গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক

ঘোষণাপত্র

আমি এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে পিএইচ.ডি. ডিগ্রী অর্জনের নিমিত্তে উপস্থাপিত "ইসলামের হুদুদ আইন : ইয়াহুদী, খ্রিস্টান, হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের আইনের সাথে তুলনামূলক পর্যালোচনা" শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় রচনা করেছি। এটা আমার একক মৌলিক গবেষণা কর্ম। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রী/ডিপ্লোমা অর্জন বা প্রকাশনার জন্য অভিসন্দর্ভটির সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশ বিশেষ উপস্থাপন করিনি।

(মো: সেলিম-উল ইসলাম সিদ্দিকী)
পিএইচ.ডি গবেষক
রেজি. নং- ১৪৪/২০১৬-২০১৭
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১০০০

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

পরম করুনাময় আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অশেষ মেহেরবানীতে অবশেষে “ইসলামের হুদুদ আইন : ইয়াহুদী, খ্রিস্টান, হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের আইনের সাথে তুলনামূলক পর্যালোচনা” শীর্ষক পিএইচ.ডি. অভিসন্দর্ভটি উপস্থাপন করতে পেরেছি। যথাসময়ে বিধি মোতাবেক অভিসন্দর্ভটি উপস্থাপন করতে পেরে আমি মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের শুকরিয়া আদায় করছি এবং নবী করীম (সা.) এর শানে দরুদ ও সালাম পেশ করছি।

এ সময়ে গভীর শ্রদ্ধা ও সম্মানের সাথে স্মরণ করছি আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ও সাবেক চেয়ারম্যান বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, আন্তজার্তিক খ্যাতিসম্পন্ন গবেষক ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ স্যারকে। তিনি আমাকে তাঁর তত্ত্বাবধানে গবেষণার সুযোগ দিয়েছেন। তাঁর মূল্যবান পরামর্শ ও দিক নির্দেশনার ফলেই অভিসন্দর্ভটি যথাযথ ভাবে সম্পন্ন করতে পেরেছি। তাঁর আন্তরিক সাহায্য সহযোগিতায় আমার এ গবেষণা কর্মের তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও এর অধ্যায়-উপাধ্যায় বিন্যস্তকরণ এবং এর অবয়ব ও ভাব সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি সম্ভব হয়েছে। বার বার তাগিদ দেয়ার কারণেই আমি গবেষণাকর্মটি যথাসময়ে শেষ করতে পেরেছি। এ জন্য আমি তাঁর প্রতি চিরকৃতজ্ঞ ও ঋণী। তাঁর যথাযথ তত্ত্বাবধানের কারণেই গবেষণা কর্মটি শেষ পর্যন্ত জমা দিতে পেরেছি। আমি তাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। সেই সাথে আমি তাঁর সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করছি।

আমি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি বিভাগীয় সকল শিক্ষকের প্রতি, যাদের নিরন্তর উৎসাহ,সঠিক পরামর্শ ও সার্বিক সহযোগিতা আমার গবেষণা কর্মে আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে।

আমার অভিসন্দর্ভটি রচনায় আমি বিশেষভাবে বিভিন্ন বিষয়ের উপর লিখিত দেশী-বিদেশী লেখকদের রচনার সাহায্য নিয়েছি। এজন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনার্থে আমি যথাস্থানে ‘পাদটীকা’ ‘উদ্ধৃতি’তে সেসকল লেখকের নাম ও তাঁদের গ্রন্থ বা প্রবন্ধের নাম উল্লেখ করেছি। তবু এখানে আরেকবারে ঐ সকল

লেখকের কাছে আমি কৃতজ্ঞতা জানাই। সর্বোপরি আমার এ অভিসন্দর্ভটি রচনার কাজে যেসব প্রতিষ্ঠান ও সুধীজন আমাকে বিভিন্নভাবে সাহায্য সহযোগিতা করেছেন তাঁদের প্রতি রইল আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

আমার এই গবেষণাকর্ম সম্পন্ন করতে গিয়ে শ্রদ্ধেয় মা-বাবা, শশুর-শাশুড়ি, সহধর্মিনী ভাই-বোনসহ যে সকল বন্ধু-বান্ধব, সহকর্মী, শ্রদ্ধাভাজন ও স্নেহাস্পদ এবং ঘনিষ্টজনেরা নানাভাবে আমাকে অনুপ্রেরণা ও উৎসাহ যুগিয়েছেন এবং দুষ্প্রাপ্য তথ্যাদি ও শ্রম দিয়ে আমাকে সাহায্য করেছেন, সর্বোপরি আমার এ গবেষণাকর্মটি সম্পাদনের জন্য যে সব প্রতিষ্ঠান ও সুধীজন তথ্য, উপাত্ত দিয়ে আমাকে সাহায্য সহযোগিতা করেছেন তাঁদের প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা রইল। আল্লাহ সকলকে উত্তম বিনিময় দান করুন।

(মোঃ সেলিম-উল ইসলাম সিদ্দিকী)

পিএইচ.ডি. গবেষক

রেজি. নং- ১৪৪/২০১৬-২০১৭

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

ব্যবহৃত শব্দ সংকেত

অনু	=	অনূদিত
অনু.	=	অনুবাদ
আ.	=	আলায়হিস সালাম
ইফাবা	=	ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
ইং	=	ইংরেজি
খ.	=	খণ্ড
খ্রি.	=	খ্রিস্টাব্দ
জ.	=	জন্ম
ড.	=	ডক্টর
ডা.	=	ডাক্তার/ চিকিৎসক
পৃ.	=	পৃষ্ঠা
বা/বাং	=	বাংলা
বি.দ্র.	=	বিস্তারিত/বিশেষ দ্রষ্টব্য
মৃ.	=	মৃত্যু
র/রহ.	=	রহমতুল্লাহি আলায়হি
রা.	=	রাদিয়ালাহু আনহু
সা.	=	সাল্লালাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম
হি.	=	হিজরি
Ed.	=	Edition/Editor/Edited
Ibid	=	(Ibidem) in the same place; from the same source.
JASE	=	Journal of Asiatic Society of Bangladesh.
Op.cit	=	Operae-citrae
p.	=	Page
pp.	=	Pages

ইসলামের হুদুদ আইন : ইয়াহুদী, খ্রিস্টান, হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের আইনের সাথে তুলনামূলক পর্যালোচনা

(Hudud Law in Islam : A Comparative study with the Laws of Judaism, Christianity, Hinduism and Buddhism)

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠ
প্রত্যয়নপত্র	ii
ঘোষণাপত্র	iii
উৎসর্গ	iv
কৃতজ্ঞতা স্বীকার	v
ব্যবহৃত শব্দ সংকেত	vii
সূচীপত্র	viii
ভূমিকা	vii
প্রথম অধ্যায় : ইসলাম, আইন ও ইসলামী আইন পরিচিতি	১৩
প্রথম পরিচ্ছেদ : ইসলাম পরিচিতি	১৪
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : আইন পরিচিতি	৩০
তৃতীয় পরিচ্ছেদ : ইসলামী আইন পরিচিতি	৩৯
দ্বিতীয় অধ্যায় : অপরাধ ও শাস্তির পরিচয় এবং ইসলামের হুদুদ আইন	১১৮
প্রথম পরিচ্ছেদ : অপরাধ ও শাস্তি পরিচিতি	১১৯
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : ইসলামের হুদুদ আইন পরিচিতি	১৩১
তৃতীয় পরিচ্ছেদ : হুদুদ আইন সংশ্লিষ্ট বিধিবিধান	২১৩
তৃতীয় অধ্যায় : ইসলামী হুদুদ আইন প্রয়োগের ঐতিহাসিক ক্রমধারা	২৩৭
চতুর্থ অধ্যায় : ইয়াহুদী ধর্ম ও ইয়াহুদী ধর্মের শাস্তি আইন	২৬৩
প্রথম পরিচ্ছেদ : ইয়াহুদী ধর্ম পরিচিতি	২৬৪

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : ইয়াহুদী ধর্মের শাস্তি আইন	২৭০
পঞ্চম অধ্যায় : খ্রিস্টধর্ম ও খ্রিস্টধর্মের শাস্তি আইন	৩০৪
প্রথম পরিচ্ছেদ : খ্রিস্টধর্ম পরিচিতি	৩০৫
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : খ্রিস্টধর্মের শাস্তি আইন	৩১২
ষষ্ঠ অধ্যায় : হিন্দু ধর্ম ও হিন্দু ধর্মের শাস্তি আইন	৩৩১
প্রথম পরিচ্ছেদ : হিন্দু ধর্ম পরিচিতি	৩৩২
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : হিন্দু ধর্মের শাস্তি আইন	৩৪১
সপ্তম অধ্যায় : বৌদ্ধ ধর্ম ও বৌদ্ধ ধর্মের শাস্তি আইন	৩৪৮
প্রথম পরিচ্ছেদ : বৌদ্ধ ধর্ম পরিচিতি	৩৪৯
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : বৌদ্ধ ধর্মের শাস্তি আইন	৩৫৯
অষ্টম অধ্যায় : বাংলাদেশে ইসলামী হুদুদ আইন প্রয়োগে সমস্যা ও সম্ভাবনা	৩৬৮
নবম অধ্যায় : ইসলামের হুদুদ আইনের সাথে ইয়াহুদী, খ্রিস্টান, হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মীয় শাস্তি আইনের সাথে তুলনামূলক পর্যালোচনা	৩৮৪
গবেষণার প্রাপ্তি ও সার্বিক পর্যালোচনা	৪০৭
সুপারিশ	৪১১
উপসংহার	৪১৪
পরিশিষ্ট	৪১৬
গ্রন্থপঞ্জি	৪৭০

ভূমিকা

আলহামদুলিল্লাহি ওয়াহদাহ। ওয়াস্‌সালাতু ওয়াস্‌সালামু ‘আলা মান লা নাবিয়্যাহ বা‘আদাহ। মানুষ সমগ্র সৃষ্টির মাঝে একটি ব্যতিক্রম সৃষ্টি। মানুষকে বিবেক-বুদ্ধি ও কর্মের স্বাধীনতা দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে, যা অন্য কোনো সৃষ্টিকে দেওয়া হয়নি। মানুষ তার বিবেক-বুদ্ধিকে ব্যবহার করে স্বধীনভাবে নিজেকে পরিচালনা করতে পারে। কর্মের স্বধীনতা মানুষকে ভালো কাজ করার সুযোগ করে দিয়েছে স্বাধীনভাবে। ভালো কাজের পাশাপাশি নানা ধরনের মন্দ কাজেও জড়িয়ে পড়েছে মানব জাতি।

মানুষের মন্দ কাজের সীমা অনেক সময় বর্বরতাকেও ছাড়িয়ে যায়। এক মানুষ অন্য মানুষের সম্পদ হরণ করে, চরিত্রে কালিমা লেপন করে, এমনকি খুন পর্যন্ত করে। নৈতিকতার সকল বাঁধা উপেক্ষা করে অবৈধ যৌনাচারে লিপ্ত, ক্ষেত্র বিশেষ জোরপূর্বক ধর্ষণ করে। মানুষের এই অন্যায়, অনৈতিক কর্মকাণ্ড মানব জাতির জন্য, মানব সভ্যতার জন্য চরম হুমকি স্বরূপ।

মানব জাতির আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষ্যে পৃথিবীতে অসংখ্য আইন, বিধিবিধান প্রণীত হয়েছে। প্রচীন সকল সভ্যতায় আমরা লিখিত বা অলিখিত অসংখ্য আইন দেখতে পাই। প্রচলিত ধর্মসমূহও নিজস্ব আইন দ্বারা পরিচালিত হয়। পবিত্র কুরআন, বাইবেল, মনুস্মৃতিসহ অন্যান্য ধর্মগ্রন্থে মানব জীবন পরিচালনার নানা দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

ইসলাম পৃথিবীর সর্বপ্রাচীন ধর্ম। ইসলামী আইনও পৃথিবীর প্রাচীনতম আইন। যার সূত্রপাত আদি পুরুষ আদম (আ.) এর সময় থেকে। ইসলামী আইন পূর্ণতা লাভ করে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর মাধ্যমে। অদ্যাবধি পৃথিবীতে এ আইন প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত রয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে।

ইসলামী আইনের প্রকারসমূহের মধ্যে অন্যতম একটি হুদুদ আইন। কুরআন কর্তৃক সুনির্ধারিত শাস্তি আইনকেই ইসলামের দৃষ্টিতে হুদুদ আইন বলা হয়। মদ্যপান, ব্যভিচার, ব্যভিচারের অপবাদ, চুরি, ডাকাতি ইত্যাদি হুদুদভুক্ত অপরাধ।

ইসলামী আইনে হুদুদ হিসেবে স্বীকৃত অপরাধসমূহ সমাজ ও রাষ্ট্রের স্থিতি ও শান্তি নষ্টের প্রধানতম কারণসমূহের একটি। এর প্রত্যেকটিই ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। মাদকাসক্তি মানুষের মস্তিস্ক নষ্ট করে দেয়, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমিয়ে দেয়। ব্যভিচার চরম অশ্লীলতার প্রকাশ। ব্যভিচারের অপবাদ আরোপের মাধ্যমে আরোপিত ব্যক্তিকে সামাজিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন করা হয়, অনেক সময় ঐ ব্যক্তিকে বিনা অপরাধে শাস্তি ভোগ করতে হয়। চুরি-ডাকাতির মাধ্যমে অপরের অধিকার হরণ করা হয়।

হুদুদভুক্ত অপরাধসমূহ নৈতিক সকল ধর্ম, সমাজ ও রাষ্ট্রের নিকটই অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত। যেকারণে পৃথিবীর প্রায় সকল ধর্ম ও নৈতিক রাষ্ট্রে এগুলোকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। মানুষকে এ অন্যায় অপকর্ম থেকে রক্ষা করতে শাস্তির ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে অধিকাংশ ধর্ম ও রাষ্ট্রব্যবস্থায়।

বর্তমান পৃথবীতে অসংখ্য ধর্ম বিদ্যমান রয়েছে। কমবেশি সব ধর্মেরই অনুসারী রয়েছেন। অনুসারীর সংখ্যা বিবেচনায় বর্তমান পৃথিবীর সর্ববৃহৎ ধর্ম খ্রিস্টধর্ম। এরপরই ইসলামের অবস্থান। গৌতম বুদ্ধ প্রতিষ্ঠিত বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারীর সংখ্যা ইসলামের পরেই। ভারতবর্ষে বেড়ে ওঠা হিন্দু ধর্মের অবস্থান বৌদ্ধ ধর্মের পরে। অনুসারীর সংখ্যা বিবেচনায় উপরে উল্লিখিত ধর্মসমূহের তুলনায় ইহুদী ধর্ম ক্ষুদ্র হলেও রাজনীতি, অর্থনীতিসহ নানা কারণে ইহুদী ধর্মও বর্তমান পৃথিবীতে অত্যন্ত আলোচিত একটি ধর্ম।

সার্বিক বিবেচনায় উপরে উল্লিখিত ধর্মসমূহই বর্তমান পৃথিবীর প্রধান ধর্ম। তাছাড়া উল্লিখিত ধর্মসমূহ অন্যান্য ধর্মসমূহের তুলনায় অনেক বেশি সুসংহত। এসব ধর্মের ধর্মীয়গ্রন্থসমূহ এখনও পাওয়া যায়। যদিওবা কুরআন ব্যতীত অন্যান্য ধর্মগ্রন্থসমূহে যথেষ্ট সংযোজন, বিয়োজন ঘটেছে

বলে বিশেষজ্ঞগণ মনে করে থাকেন। যাহোক গুরুত্ব বিবেচনায় এ ধর্মসমূহ নানা কারণেই অন্যান্য কম প্রসিদ্ধ ধর্মসমূহ থেকে বেশ এগিয়ে। যেকারণে বক্ষ্যমাণ অভিসন্দর্ভে ইসলামী হুদুদভুক্ত অপরাধের শাস্তির সাথে উল্লিখিত ধর্মসমূহে বর্ণিত ও প্রচলিত ঐ অপরাধসমূহের শাস্তির সাথে তুলনামূলক পর্যালোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে।

বর্তমানে হুদুদভুক্ত অপরাধের মাত্রা গোটা বিশ্বব্যপী বৃদ্ধি পেয়েছে। যেকারণে বিশ্বব্যাপী নানা বিষয়ে প্রভূত উন্নয়ন দৃশ্যমান হওয়া সত্ত্বেও মানুষ প্রশান্তি পাচ্ছে না। পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই সাধারণ মানুষ অপরাধী ব্যক্তি বা গোষ্ঠী দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছে, সাধারণ মানুষের অধিকার লংঘিত হচ্ছে। সকল মানুষের জন্য শান্তিপূর্ণ পৃথিবী নির্মাণে যাবতীয় অপরাধের মাত্রা শূণ্যের কোঠায় নিয়ে আসা অপরিহার্য। যেকারণে কোন আইন মানুষকে অপরাধ থেকে ফিরিয়ে রাখতে সর্বাধিক উপযোগী সে বিষয়ে বিস্তর গবেষণা আজ সময়ের দাবি। আর এ সমকালীন গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন পূরণ করার মহৎ লক্ষ্যে "ইসলামের হুদুদ আইন : ইয়াহুদী, খ্রিস্টান, হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের আইনের সাথে তুলনামূলক পর্যালোচনা" শীর্ষক গবেষণাকর্মে আমি আত্মনিয়োগ করেছি।

সুবিন্যস্তভাবে উপস্থাপনের জন্য বক্ষ্যমাণ গবেষণা অভিসন্দর্ভটি দশটি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায় ইসলামের পরিচয়, বৈশিষ্ট্য, আইনের পরিচয়, আইনের ইতিহাস এবং ইসলামী আইনের পরিচয়, ইতিহাস ও বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে ইসলামী শাস্তি আইনের পরিচয়, প্রকারভেদ তুলে ধরা হয়েছে। এর পাশাপাশি হুদুদভুক্ত অপরাধের শাস্তি সম্পর্কেও একটা নাতিদীর্ঘ ধারনা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে হুদুদ আইনের বিস্তার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। ইসলামী আইনের উৎপত্তি হযরত আদম (আ.) এর সময় থেকে শুরু হলেও এ অভিসন্দর্ভে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর যুগ থেকে আলোচনা করা হয়েছে। কারণ এ সময়ই রাষ্ট্রীয় পর্যায় সর্বাত্মকভাবে ইসলামী আইনের প্রচলন প্রথমবারের মতো শুরু হয়।

পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছদে যথাক্রমে ইয়াহুদী, খ্রিস্ট, হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের পরিচয়, ইতিহাস, বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি তুলে ধরা হয়েছে। এ অধ্যায়গুলোর দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে উল্লিখিত ধর্মসমূহের হুদুদভুক্ত অপরাধের বিধিবিধান ও শাস্তি প্রসঙ্গে পর্যালোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে। বাংলাদেশে হুদুদ আইন প্রয়োগের সমস্যা ও সম্ভাবনা সম্পর্কে নবম অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। দশম অধ্যায়ে ইসলামী হুদুদ আইনের সাথে ইয়াহুদী, খ্রিস্টান, হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মীয় শাস্তি আইনের সাথে তুলনামূলক পর্যালোচনা করা হয়েছে। এরপর গবেষণার প্রাপ্তি, সুপারিশ অতঃপর একটি উপসংহার উল্লেখ করা হয়েছে।

বাংলাদেশের সমাজব্যাস্থা, আইন ও দণ্ডবিধিতে হুদুদভুক্ত অপরাধসমূহের প্রায় সবগুলোই অপরাধ হিসেবে স্বীকৃত। পরিশিষ্টে এ প্রসঙ্গে অর্থাৎ বাংলাদেশের আইন ও দণ্ডবিধিতে হুদুদভুক্ত অপরাধের শাস্তি তুলে ধরা হয়েছে। সর্বশেষে একটি সুবিস্তৃত গ্রন্থপঞ্জি উল্লেখ করা হয়েছে।

আমি প্রত্যাশা করি যে, আমার এ অভিসন্দর্ভের দ্বারা ভবিষ্যতে আরো ব্যাপক গবেষণার পথ উন্মুক্ত হবে। দৃঢ়ভাবে আমি এও বিশ্বাস করি যে, আমার এ গবেষণাকর্ম জ্ঞানের জগতে এক নতুন সংযোজন হবে ইনশাআল্লাহ। এ গবেষণা অভিসন্দর্ভের অনাকাঙ্খিত ভুলের জন্য আমি মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন এর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি। মহান আল্লাহ আমাকে এবং এ অভিসন্দর্ভের পাঠককুলকে এর দ্বারা উপকৃত হওয়ার তওফিক দান করুন। আমিন।

প্রথম অধ্যায়

ইসলাম, আইন ও ইসলামী আইন পরিচিতি

প্রথম পরিচ্ছেদ : ইসলাম পরিচিতি

আসমান ও যমীনে যা কিছু রয়েছে এর সবকিছুই আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টি। মহান আল্লাহ তার অসংখ্য-অগণিত সৃষ্টির মধ্যে মানুষকে সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে ঘোষণা করেছেন। মানুষকে পৃথিবীতে প্রেরণ করা হয়েছে আল্লাহ তায়ালার ইবাদাত ও তার প্রতিনিধিত্ব করার জন্য। আদম আ. ও হাওয়া আ. এর আগমনের মাধ্যমে পৃথিবীতে মানুষের প্রতিনিধিত্বের সূচনা ঘটে। সৃষ্টির সেরা জীব এবং মহান আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে পৃথিবীকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা মানুষেরই দায়িত্ব। মানুষের এই মহান দায়িত্ব যথাযথভাবে বাস্তবায়নের দিকনির্দেশনা হিসেবে আল্লাহ তায়ালা ইসলামকে মনোনীত করেছেন।

ইসলাম একটা ধর্ম; একটা পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থার নাম। মানুষের সাথে অন্য সৃষ্টির সম্পর্ক কিরুপ হবে, মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক কিরুপ হবে, কেউ সে সম্পর্কে কোনরুপ ব্যত্যয় ঘটালে তার প্রতিবিধান কিভাবে হবে তা-ও ইসলামে বলে দেওয়া হয়েছে। মানুষের ব্যক্তিগত জীবন, পারিবারিক জীবন, অর্থনৈতিক জীবন, রাষ্ট্রীয় জীবনসহ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র পরিচালনার সঠিক পদ্ধতি ইসলামে আলোচিত হয়েছে। মোটকথা সৃষ্টির সূচনা থেকে কিয়মত পর্যন্ত মানুষের সকল জিজ্ঞাসার জবাবই ইসলাম দিয়েছে। ইসলামের সূচনা ঘটেছিল হযরত আদম আ. এর সৃষ্টির মাধ্যমে । ইসলাম পূর্ণতা পেয়েছে মহানবী (সা.) এর মাধ্যমে।

ইসলাম শব্দের আভিধানিক অর্থ

ইসলাম (إسلام) শব্দটি (سلم) সালমুন ও (سلم) সিলমুন শব্দ থেকে নির্গত। (إسلام) শব্দটি (س-ل-م) শব্দমূল হতে গঠিত। باب افعال - এর মাসদার (ক্রিয়ামূল)। যার অর্থ নিরাপত্তা ও শান্তি; এছাড়া আরো কিছু অর্থ রয়েছে। যেমনঃ সন্ধি ও বিরোধিতা পরিত্যাগ, আনুগত্য ও যুদ্ধ-সংঘাত ত্যাগের জন্য শান্তি প্রস্তাব, ইসলামী বিধান, যুদ্ধ পরিহার করার ও আত্মসমর্পণ করার প্রস্তাব।[১] পবিত্র কুরআনে আত্মসমর্পণ করা অর্থে ইসলাম শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন,

إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ

(স্মরণ করুন!) যখন ইব্রাহীমকে তাঁর প্রতিপালক বললেন, আত্মসমর্পণ কর, ইব্রাহীম বললেন, আমি বিশ্বজাহানের প্রতিপালকের নিকট আত্মসমর্পন করলাম'।[২]

আল মাওরিদ গ্রন্থে ইসলাম (الاسلام) শব্দের অর্থ করা হয়েছে الخضوع والانقياد অর্থাৎ আত্মসমর্পণ করা, আনুগত্য করা।[৩]যেমন কুরআনুল কারীমে বর্ণিত হয়েছে,

قُلْ اِنَّ صَلَاتِیْ وَ نُسُکِیْ وَ مَحْیَایَ وَ مَمَاتِیْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ .لَا شَرِیْکَ لَهٗ ۚ وَ بِذٰلِکَ اُمِرْتُ وَ اَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِیْنَ

[১] আবূ আব্দিল্লাহ্ মাহমূদ ইবন উমার আল-জামাখশারী, *আল-কাশ্শাফু আন হাকায়িকিল গাওয়ামিজিত তানযীল ওয়া উয়ূনুল আকাবীল ফী উজূহিত তা'বীল*, মিশরঃ মুস্তফা আল-বাবী আল-হালবী, ১৯৩৮ খ্রি., খ. ১ম, পৃ. ১২৮

[২] আল কুরআন, ২ : ১৩১

[৩] রুহুল বা'আলবাক্কী এবং মুনীর বা'আলবাক্কী, *আল মাওরিদ*, বৈরুত : দারুল 'ইলমী লিল মুল্লাইয়্যিন, ২০০৭ খ্রি. ,পৃ. ১০৭

বলুন! আমার সালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মরণ জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর উদ্দেশ্যে, তাঁর কোন শরীক নেই, আর আমি এরই জন্য আদিষ্ট হয়েছি এবং আমিই প্রথম মুসলমান।[১]

معجم لغة الفقهاء তে ইসলাম (الاسلام) এর অর্থ করা হয়েছে الطاعة والانقياد والتسليم অর্থাৎ মেনে চলা, আনুগত্য করা এবং শান্তি পাওয়া।[২] এর আরো একটি অর্থ হল السَّلَامَةُ নিরাপত্তা লাভ করা।

মু'অজামু মাক্বাইলিল লুগাত নামক অভিধানের গ্রন্থকার ইসলাম (الاسلام) শব্দের অর্থে বলেন,

أَنْ يَسْلَمَ الْإِنْسَانُ مِنَ الْعَاهَةِ وَالْأَذَى

অর্থাৎ দুঃখ-কষ্ট থেকে কোন ব্যক্তির নিরাপদ থাকা।[৩]যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ

এবং আল্লাহ নিরাপদ আবাসের দিকে ডাকবেন।[৪]

প্রখ্যাত অভিধানবেত্তা আবু মানসুর মুহাম্মাদ ইব্ন আহমদ ইসলাম শব্দের অর্থ করেছেন,

الصُّلْح .السَّلَام والتحية مَعْنَاهُمَا وَاحِد، ومعناهما السلامة من جَمِيع الْآفَات

الصُّلْح অর্থাৎ সন্ধি। যাবতীয় খারাপ কথা থেকে নিরাপদ থাকা। নরম ভাষায় কথা বলা এবং অনর্থক কথা থেকে বেঁচে থাকা।[৫] ইরশাদ হয়েছে,

وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا

অর্থাৎ যখন মূর্খ ব্যক্তিরা তাদের সাথে তর্ক করে তখন তারা বলে সালাম।[৬]

ব্যবহারিক বাংলা অভিধান গ্রন্থে বলা হয়েছে, ইসলাম শব্দের অর্থ প্রাকৃতিক শান্তির ধর্ম, আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ, হযরত মুহাম্মদ (সা.) একে পূর্ণতা দান করে প্রচার করেন।[৭]

মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে ইসলাম শব্দটি যুদ্ধ পরিহার অর্থে ব্যবহার হয়। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا

যদি তারা যুদ্ধ পরিহারে সম্মত হয়, তাহলে আপনিও তাতে সম্মত হোন।[৮]

শরী'আতের বিধান অর্থেও ইসলাম শব্দটির ব্যবহার হয়। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

---

[১] আল কুরআন, ৬ : ১৬২-১৬৩

[২] মুহাম্মদ রাওয়াছু কাল'আযী এবং হামিদ সাদিক কানীবী, *মু'অজামু লুগাতিল ফুকাহা*, দারুন নাফাইছ লিত তাবা'আতি ওয়ান নাশরী ওয়াততাওযী, ১৯৮৮ খ্রি. ,পৃ. ৬৮

[৩] আবুল হাসান আহমদ ইব্ন ফারিস আররাযী, *মু'অজামু মাক্বাইলিল লুগাত*, দামেশক: দারুল ফিকর, ১৯৭৯ খ্রি. , খ. ৩, পৃ. ৯০

[৪] আল কুরআন, ১০ : ২৫

[৫] আবু মানসুর মুহাম্মাদ ইব্ন আহমদ, *তাহযিবুল লুগাহ*, বৈরুত: দারু ইহয়াউত তুরাছিল আরাবী, ২০০১খ্রী., খ. ১২, পৃ. ৩১৩

[৬] আল কুরআন, ২৫ : ৬৩

[৭] ডক্টর মুহাম্মদ এনামুল হক ও শিব প্রসন্ন লাহিড়ী, *ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, প্রথম সংস্করণ ডিসেম্বর ১৯৭৪ ও জুন ১৯৮৪ইং, পৃ. ১৪৪

[৮] আল কুরআন, ৮ : ৬১

ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামের বিধানের মধ্যে দাখিল হয়ে যাও। আর শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।[১]

পবিত্র কুরআনে ইসলাম শব্দটির ব্যবহার বাহ্যিক আনুগত্য অর্থে লক্ষ্য করা যায়। ইরশাদ হচ্ছে,

قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا

বেদুইনরা বলে, আমরা ঈমান এনেছি। আপনি বলুন তোমরা ঈমান আননি বরং তোমরা বলো, আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি।[২]

শান্তি কামনার অর্থেও পবিত্র কুরআনে ইসলাম শব্দের ব্যবহার পাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَاْنِسُوْا وَ تُسَلِّمُوْا عَلٰى اَهْلِهَا

হে ঈমানদারগণ! তোমরা সালাম ব্যতিরেকে অন্যদের ঘরে প্রবেশ করো না।[৩]
ইসলামে আল্লাহর বিধানাবলির আনুগত্যে, তাঁর বিরোধিতা পরিত্যাগ দ্বারা শান্তি ও নিরাপত্তা বিধান করে। অনুরূপভাবে সাম্যের বিধান প্রতিষ্ঠার দ্বারা সমাজে শান্তি নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে। এ প্রসঙ্গে হাদীসের এক বর্ণনায় এসেছে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবন আমর (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ .مِنْ لِسَانِه وَيَدِهِ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَاجَرَ مَا نَهَى عَنْها

প্রকৃত মুসলিম ঐ ব্যক্তি যার হাত ও জিহ্বা থেকে অন্য মুসলমান নিরাপদ থাকে। আর প্রকৃতপক্ষে ঐ ব্যক্তিই মুহাজির যে ব্যক্তি আল্লাহ যা নিষেধ করেছেন তা থেকে হিজরত করে বা পরিত্যাগ করে।[৪]

ইসলামের সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য অর্থ আত্মসমর্পণ; আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ। আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণের মধ্যেই নিহিত আছে শান্তি, নিরাপত্তা, আল্লাহর আনুগত্য, আল্লাহর আনুকূল্য, পারস্পরিক সদাচারণ এর সবই।

ইসলামের পারিভাষিক অর্থ

মহান আল্লাহ কর্তৃক মনোনীত সর্বশেষ ধর্ম এবং পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থার নাম ইসলাম। ইসলামের সূচনা হযরত আদম (আ.)-এর সৃষ্টির মাধ্যমে, ইসলাম পূর্ণতা পেয়েছে মহানবী (সা.) এর মাধ্যমে। ইমামগণ ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলামকে ভিন্ন ভিন্ন ভাব ও ভাষায় সংজ্ঞায়িত করেছেন। ইসলাম নিয়ে ইমামগণের সংজ্ঞা একটির সাথে অন্যটি বিপরীতার্থক নয় বরং পরিপূরক। ইসলামের পরিচয় সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

الإِسْلاَمُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَتُقِيمَ الصَّلاَةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلاً.

---

[১] আল কুরআন, ২ : ২০৮
[২] আল কুরআন, ৪৯ : ১৪
[৩] আল কুরআন, ২৪ : ২৭
[৪] আবূ 'আব্দিল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল ইব্‌ন ইবরাহীম ইব্‌ন মুগীরাহ আল-বুখারী, *আল-জামি' আস-সহীহ আলমুসনাদ মিন উমূরি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিন সুনানিহি ওয়া আইয়ামিহি*, বৈরূতঃ দারু ইহইয়ায়িত তুরাছিল আরাবী, তা.বি., খ. ১, পৃ. ১৫, হাদীস নং-৯

ইসলাম হচ্ছে, তুমি সাক্ষ্য প্রদান করবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই এবং মুহাম্মাদ (সা.) আল্লাহর রাসূল; সালাত কায়েম করবে, যাকাত প্রদান করবে, রমযান মাসে সাওম পালন এবং সঙ্গতি থাকলে বাইতুল্লাহ শরীফের হজ্জ পালন করবে।[১]

ইমাম ফখরুদ্দীন আর-রাযী (রহ.) ইসলামের পরিচয় সম্পর্কে বলেছেন,

الإسلام هو الدخول في الإسلام أى في الانقياد والمتابعة

আনুগত্য ও আত্মসমর্পনের নিমিত্তে ইসলামে প্রবেশ করাই ইসলাম।[২]

আফীফ আবদুল ফাত্তাহ তাব্বারাহ এ প্রসঙ্গে বলেছেন,

الإسلام هو توحيد الله والانقياد والخضوع وإخلاص الضميرله والإيمان بالأصول الدينية التي جاءت من عند الله

একনিষ্ঠভাবে ও একাগ্রচিত্তে, আন্তরিকভাবে আল্লাহর তাওহীদের উপর আত্মসমার্পন ও আনুগত্য স্বীকার করা এবং আল্লাহ প্রদত্ত দ্বীনের উসূল তথা মৌলিক বিষয় সমুহের উপর বিশ্বাস করার নামই হলো ইসলাম।[৩]

ইসলামের সংজ্ঞায় ড. ইউছুফ হামেদ আল-আলেম বলেছেন, অবশ্যই ইসলাম হলো এক আল্লাহর জন্য অবতীর্ণ বিধানানুযায়ী আনুগত্য করা, যে সকল বিধান পালনের দ্বারা ইবাদত হয় এবং অনুসরণ ও পরিচালনার দ্বারা হেদায়েত করা হয়।[৪]

ড: মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ দাররাজ ইসলামের সংজ্ঞায় বলেছেন, ইসলাম হলো মনে প্রাণে মেনে নেয়া, যা মুখের স্বীকৃতি দ্বারা হোক, কিংবা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা পালনে হোক। আর উহার মূল বস্তু হলো অন্তঃকরণ দ্বারা সত্য বলে মেনে নেয়া।[৫]

শরীয়তের পরিভাষায় ইসলাম হলো, আল্লাহর অনুগত হওয়া, আনুগত্য করা, তার নিকট আত্মসমর্পন করা; বিনা দ্বিধায় তাঁর আদেশ-নিষেধ মেনে চলা এবং তাঁর দেওয়া বিধানানুসারে জীবন যাপন করা। আর যিনি ইসলামের বিধানানুসারে জীবন যাপন করেন, তিনি হলেন মুসলিম বা মুসলমান।[৬]

আ. ফ. ম. আবদুল হক ফরিদী কর্তৃক সম্পাদিত *ইসলামী বিশ্বকোষে* বলা হয়েছে, আল্লাহ্র প্রতি আনুগত্য প্রকাশ ও আত্মসমর্পণ এবং রাসূল (সা.) কর্তৃক আল্লাহ্ তা'আলার নিকট হতে আনীত সুন্নাহকে দৃঢ়রূপে গ্রহণ ও ধারণ করার নামই ইসলাম।[১]

---

[১] ইমাম আবুল হুসায়ন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল কুশায়রী আন নিশাপুরি (র.), *মুসলিম শরীফ*, সম্পাদনা পর্ষদ কর্তৃক অনূদিত এবং সম্পাদিত, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০১০, খ. ১, পৃ. ৭৪, হাদীস নং- ১

[২] ফখরুদ্দীন আল-রাযী, তাফসীর-ই- কাবীর, খ. ২, পৃ. ২৬৮; মো : মনোয়ার পারভেজ মুন্না, *ইসলামে শিশুর মৌলিক অধিকার ঃ বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ.ডি ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি(অপ্রকাশিত), ২০১৪, পৃ. ২২

[৩] আফীফ আব্দুল ফাত্তাহ তাব্বারাহ, *আল-মার'আহ ওয়া হুকূকুহা ফিল ইসলাম*, বৈরূত: দারু ইহইয়াইত তুরাছিল 'আরাবী, তা.বি., পৃ. ১৪,

[৪] ড. ইউছুফ হামেদ আল-আলেম, *আল-মুসলিহাতুল' আম্মা লিশ শরীয়াতিল ইসলামিয়া*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০৮; মো : মনোয়ার পারভেজ মুন্না, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২

[৫] ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ দাররাজ, *আদদ্বীন*, মিশর: আসসায়াদা: ১৩৮৯ হিজরী, পৃ. ৪৪; আশ-শাইখ মুস্তফা আব্দুর রাজ্জাক এর গবেষণা প্রবন্ধ, খ. ১, রিয়াদ: দায়িরাতুল মায়ারিফ আল-ইসলামিয়াহ, তাবি, পৃ. ৭৯,

[৬] সম্পাদনা পরিষদ সম্পাদিত, *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, লেখকমণ্ডলী, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুন ২০০০ খ্রি., পৃ. ৩৩

এ বিষয়ে আলী ইবন মুহাম্মাদ আল- জুরজানী বলেন,

الإسلام هو الخضوع والانقياد لما أخبر به الرسول صلي الله عليه وسلم

ইসলাম হলো রাসূলুল্লাহ (সা.) যা নিয়ে এসেছেন তার প্রতি আনুগত্য ও বিনয় প্রকাশ করা।[২]

ইসলামের পরিচয় দিতে গিয়ে জর্জ বার্নাড'শ বলেন, আমি সকল সময়েই মুহাম্মদের ধর্মের প্রতি তাঁর চমৎকার প্রাণবন্ত ধর্মের কারণে অতিমাত্রায় শ্রদ্ধা পোষণ করতাম। আমার নিকট প্রতীয়মান হয় যে, এটিই একমাত্র ধর্ম যা অস্তিত্বের পরিবর্তনশীল অবস্থানসমূহের সঙ্গে এসে মিলিয়ে চলতে পারার ক্ষমতার অধিকারী। এর ফলেই এই ধর্মটি প্রত্যেক যুগেই তাঁর আবেদন বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে।[৩]

এডওয়ার্ড ক্লড বলেন, ইসলাম এমন একটি ধর্ম যেটি প্রায় চতুর্দশ শতাব্দী যাবৎ কোটি কোটি মানুষের হৃদয়ের ক্ষুধা নিবৃত্ত করেছে, সেটি ধোঁকাবাজির দ্বারা চালিত হতে পারে না। সংগ্রামের মধ্যেই এর উদ্ভব কারণ যদি পাথরের আঘাত আর বিদ্রুপের তীক্ষ্ণ ফলক একে হত্যা করতে সক্ষম হতো, তাহলে মুহাম্মদের জীবদ্দশাতেই এই ধর্মের বিলুপ্তি ঘটত।[৪]

Habibeh Rahim "*Understanding Islam*" নামক প্রবন্ধে ইসলামের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন, The faith of Islam is based on the concept of the connection between the human and the divine. The term Islam refers to the submission of the individual to the Transcendent Lord and the resulting peace for the soul. People who follow this faith are called Muslims.[৫]

ইসলামকে বৈজ্ঞানিক ও যুক্তিবাদি ধর্ম হিসেবে চিহ্নিত করে Shamim Akhter তার '*Faith & Philosophy of Islam*' নামক প্রবন্ধে বলেন, Islam is a scientific religion, based on logic and reasoning, with a rational attitude towards life and the World. Islam believes in equality of humanity without any discrimination on the basis of caste, creed, race or gender. It covers all these important aspects of Islam in a very systematic manner.[৬]

---

[১] আ. ফ. ম. আবদুল হক ফরিদী ও অন্যান্য (সম্পা.), *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৮, খ. ৫, পৃ. ২৯৬

[২] আলী ইবনু মুহাম্মাদ আল-জুরজানী, *মু'জামুত তা'রীফাত*, কায়রো: দারুল ফাযীলাহ, তা. বি., পৃ. ২৩.

[৩] বেগম আয়েশা বাওয়াকী, *ইসলাম প্রথম ও চূড়ান্ত ধর্ম*, খন্দকার হাবীবুর রহমান (অনু.), ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ,২০০৪, পৃ. ৬৪,

[৪] বেগম আয়েশা বাওয়াকী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৬,

[৫] Habibeh Rahim, "Understanding Islam", *Journal of The Furrow,* Vol. 52, No. 12 (Dec., 2001), p. 670,

[৬] Shamim Akhter, *Faith & Philosophy of Islam,* India: Kalpaz Publications, 2009, p. 8

ইসলামের মূল ভিত্তি

আল্লাহ তায়ালা ইসলামের সকল বিধিবিধা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। ইসলামের কোন বিধানের কি ফযীলত, কি মর্যাদা তা কুরআন ও হাদীসে বিস্তারিত তুলে ধরা হয়েছে। ইসলাম পাঁচটি বিশেষ বিধানকে ইসলামের মৌলিক স্তম্ভ ও অন্যান্য বিধানের তুলনায় অধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে ঘোষণা দিয়েছে। এই পাঁচটি বিধানের প্রথমটি বিশ্বাসের সাথে সম্পৃক্ত এবং বাকি চারটির সম্পর্ক কর্মের সাথে। ইসলামের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিধান পাঁচটির পরিচয় হাদীসে তুলে ধরা হয়েছে। হাদীসের ভাষায়,

عَنِ ابْنِ عُمَرَ ـ رضى الله عنهما ـ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ .

হযরত ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, পাঁচটি বিষয়ের উপর ইসলাম প্রতিষ্ঠিত। আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্য কোনো মা'বূদ নেই, এবং মুহাম্মাদ (সা.) আল্লাহ তা'আলার রাসূল এ কথার উপর সাক্ষ্য প্রদান করা, সালাত কায়েম করা, যাকাত প্রদান করা, হজ্জ পালন করা, রমযান মাসে রোযা পালন করা।[১]

উপরে উল্লেখিত হাদীসে পাঁচটি বিষয়ের উপর ইসলাম প্রতিষ্ঠিত বলে বর্ণিত হয়েছে। বিষয় পাঁচটি হচ্ছে- ঈমান, সালাত, যাকাত, হজ্ব ও সাওম।

ঈমান

ঈমান হচ্ছে ইসলামের মৌলিক পাঁচটি স্তম্ভের প্রথম ও প্রধান স্তম্ভ । ইসলামী শরী'আতের যাবতীয় হুকুম–আহকাম অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করাই হচ্ছে ঈমান। যিনি শরী'আতের বিষয়গুলোকে গভীরভাবে বিশ্বাস করেন তিনিই পরিপূর্ণ মু'মিন। ইসলামের প্রথম শর্ত হল ঈমান আনয়ন। যেমনঃ এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

لَيۡسَ الۡبِرَّ اَنۡ تُوَلُّوۡا وُجُوۡہَکُمۡ قِبَلَ الۡمَشۡرِقِ وَ الۡمَغۡرِبِ وَ لٰکِنَّ الۡبِرَّ مَنۡ اٰمَنَ بِاللّٰہِ وَ الۡیَوۡمِ الۡاٰخِرِ وَ الۡمَلٰٓئِکَۃِ وَ الۡکِتٰبِ وَ النَّبِیّٖنَ

নেক কাজ মানে এটা নয় যে, তোমরা পূর্ব দিকে বা পশ্চিম দিকে মুখ করে নিলে; বরং আসল নেক কাজ হলো এই যে, মানুষ আল্লাহ, আখিরাত, ফেরেশতা, কিতাব ও নবীগণের ওপর ঈমান আনে।[২]

ঈমান শব্দের আভিধানিক অর্থ

ঈমান (الإيمان) শব্দটি আরবী। শব্দটি (أ-م-ن) মূলধাতু হতে গঠিত। যা বাবে إفعال এর মাস্‌দার। নিম্নে ঈমানের আভিধানিক অর্থ তুলে ধরা হলো ।

الإيمان শব্দের মূলধাতু أمن এর অর্থ শান্তি বা নিরাপত্তা, আশঙ্কামুক্তি।[১] আরবী ভাষায় ঈমান (الإيمان) শব্দটি বিভিন্নভাবে ব্যবহৃত হয়। ব্যবহারের বিভিন্নতার প্রেক্ষিতে এর অর্থের মধ্যেও কিছুটা তারতম্য পরিলক্ষিত হয়।

---

[১] আবূ 'আব্দিল্লাহ্‌ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল ইব্‌ন ইবরাহীম ইব্‌ন মুগীরাহ আল-বুখারী, *আল-জামি' আস-সহীহ আলমুসনাদ মিন উমূরি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিন সুনানিহি ওয়া আইয়ামিহি*, বৈরূতঃ দারু ইহইয়ায়িত তুরাছিল আরাবী, তা.বি., ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫, হাদীস নং-৭

[২] আল কুরআন, ২ : ১৭৭

ক্ষেত্র বিশেষ তা বিশ্বাস করা, স্বীকার করা, ভরসা করা, এবং নিরাপত্তা প্রদান করা ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অপর বর্ণনায়-ঈমানের আভিধানিক অর্থ- التصديق بالقلب অন্তরে বিশ্বাস করা।

আর-রাগিব আল-ইসফাহানী এর মতে ঈমান শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো- (إذعان النفس للحق على سبيل التصديق) আন্তরিক বিশ্বাসের সহিত কোন ব্যক্তির সত্যের (আল্লাহর অস্তিত্ব) স্বীকৃতি প্রদান এবং উহার প্রতি আনুগত্য প্রকাশকে ঈমান বলে।

আলকামুসুল ফিকহি প্রণেতার মতে ঈমান শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে বিশ্বাস করা, নির্ভর করা, অন্তরে প্রশান্তি লাভ করা।[২]

ঈমান শব্দের পারিভাষিক অর্থ

ইসলামের সকল বিধিবিধান, আদেশ-নিষেধ সত্য বলে অন্তরে দৃঢ় বিশ্বাস রাখা, মুখে বিশ্বাস অনুযায়ী স্বীকৃতি দেওয়া এবং তা কর্মের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করার নামই ঈমান। ঈমানকে ইমামগণ ভিন্নভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। আল্লামা আইনি (রহ.) ঈমানের সংজ্ঞায় বলেন,

الايمان عبارة عن مجموع ثلاثة أشياء التصديق بالجنان والاقرار باللسان والعمل بالاركان

অর্থাৎ, ঈমান তিনটি কাজের সমষ্টির নাম।

(১) তাসদিক বিল জিনান বা অন্তরে দৃঢ় বিশ্বাস করা

(২) ইক্বরার বিল লিসান বা মৌখিক স্বীকৃতি প্রদান করা

(৩) আমল বিল আরকান বা বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করা।[৩]

ইমাম আযম আবু হানীফা (রহ.) বলেছেন,

الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان و المعرفة بالقلب

ঈমান হলো, মৌখিক স্বীকারোক্তি (ইকরার) আন্তরিক বিশ্বাস (তাস্‌দীক বিল-জিনান)এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞান (ওয়া মা'রিফা বিল-কাল্‌ব)-এর নাম।[৪]

ঈমানের সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা হচ্ছে,

الايمان هو التصديق بما جاء به النبى صلى الله عليه و سلم اعتماداعليه

নবী করীম (সা.) যা নিয়ে এসেছেন, তার প্রতি পূর্ণ আস্থা রেখে বিশ্বাস করাই ঈমান।[৫] সারকথা হচ্ছে ইসলামের মৌলিক বিষয়াবলীর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসই হচ্ছে ঈমান।

---

[১] ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আরবী-বাংলা ব্যবহারিক অভিধান*, রিয়াদ প্রকাশনী, ঢাকা : ২০১৩, পৃ. ১১৬

[২] সা'দি আবু জায়েব, *আলকামুসুল ফিকহি*, ইদারাতুল কুরআন অলউলুমিল ইসলামিয়া, করাচি, পাকিস্থান: তা.বি., খ. ১, পৃ. ২৫

[৩] বদরুদ্দিন আল আইনি আল হানাফি, *উমদাতুল ক্বারি ফি শারহলি বুখারি*, সৌদিআরব: মুলিফফাতে উরুদে মিন মুতালাক্বাহ আহলুল হাদিস, ২০০৬, খ. ১, পৃ. ২৭৫

[৪] সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯২, খ. ৫, পৃ. ৪৫১

[৫] ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী, *তাফসীরে জালালাইন*, মাওলানা আব্দুল গফ্‌ফার শাহপুরী ও অন্যান্য অনূদিত, ঢাকা: ইসলামিয়া কুতুবখানা, তা.বি., পৃ. ১৯৪

ঈমানের মৌলিক উপাদানসমূহ

ঈমানের মৌলিক বিষয়গুলো পবিত্র কুরআন ও হাদীসে বিশদভাবে বর্ণিত। ঈমানের মৌলিক বিষয়গুলোর পরিচয় তুলে ধরে মহান আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ وَ الْكِتٰبِ الَّذِىْ نَزَّلَ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَ الْكِتٰبِ الَّذِىْٓ اَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ

হে ঈমানদারগণ! তোমরা ঈমান আন আল্লাহর উপর, তাঁর রাসূলগণের উপর, তাঁর (নাযিলকৃত) কিতাবসমূহের উপর যা তিনি রাসূলগণের উপর নাযিল করেছেন, ঐ কিতাবের উপর যা তিনি পূর্বে নাযিল করেছেন।[১]

উপরোক্ত আয়াতে উল্লিখিত বিষয়গুলোর উপর দৃঢ় বিশ্বাস ব্যতীত কখনোই কারো ঈমান পরিপূর্ণ হবে না। যিনি এগুলোতে আন্তরিক বিশ্বাস রাখেন তাকেই মু'মিন বলা হবে। আর যে ব্যক্তি এ বিষয়গুলোকে অবিশ্বাস করবে, অস্বীকার করবে নিঃসন্দেহে সে পথভ্রষ্ট। পবিত্র কুরআন কারীমের ভাষায়,

وَ مَنْ يَّكْفُرْ بِاللّٰهِ وَ مَلٰٓئِكَتِهٖ وَ كُتُبِهٖ وَ رُسُلِهٖ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا بَعِيْدًا

যে অবিশ্বাস করেছে আল্লাহতে, তাঁর ফেরেশতাগণে, তাঁর কিতাবসমূহে, তাঁর রাসূলে, এবং পরকালে, সে নিশ্চিতরুপে সঠিক পথ হতে অনেক দূরে সরে গেছে। [২]

তাকদীর ঈমানের মৌলিক বিষয় গুলোর একটি। তাকদীর সম্পর্কে আল কুরআনে আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেছেন,

مَآ اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ فِى الْاَرْضِ وَ لَا فِيْٓ اَنْفُسِكُمْ اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ مِّنْ قَبْلِ اَنْ نَّبْرَاَهَا ؕ اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ

দুনিয়ায় (সাধারনতঃ) এবং ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের উপর যে কোন বিপদ পৌঁছে থাকুক না কেন, তা তোমাদের সৃষ্টি করার পূর্বেই কিতাবে (লাওহে মাহফুযে) নির্ধারিত করা আছে। আল্লাহর পক্ষে এটা খুবই সহজ। [৩]

ইসলামী বিশ্বাস মতে মৃত্যু পরবর্তী জীবন, কিয়ামত, জান্নাত-জাহান্নাম সত্য। কিয়ামত ও পুনরুত্থান সম্পর্কে ইরশাদ হচ্ছে,

وَّ اَنَّ السَّاعَةَ اٰتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيْهَا ۙ وَ اَنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُ مَنْ فِى الْقُبُوْرِ

এবং কিয়ামত অবশ্যম্ভাবী, এতে কোন সন্দেহ নেই আর নিশ্চয় আল্লাহ পুনরুত্থিত করবেন তাদের, যারা কবরে আছেন।[৪]

আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাতের ইমামগণের সর্বসম্মত মতে ঈমানের রুকন বা স্তম্ভ মোট ছয়টি।[৫] যথা-

০১. আল্লাহর প্রতি ঈমান।

০২. ফেরেশতাগণের প্রতি ঈমান।

---

[১] আল কুরআন, ৪ : ১৩৬
[২] আল কুরআন, ৪ : ১৩৬
[৩] আল কুরআন, ৫৭ : ২২
[৪] আল কুরআন, ২২ : ৭
[৫] ইবনি আবিল ইযয আল হানাফি, *শারহুল আকিদাহ আত তাহাবিয়্যাহ*, মিসর: দারুল গাদ আল জাদিদ, ২০০৬, পৃ. ২৮৬

০৩. আসমানি কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান। ০৪. নবী-রাসূলগণের প্রতি ঈমান।

০৫. পরকালের প্রতি ঈমান। ০৬. তাকদিরের ভাল-মন্দের প্রতি ঈমান।

১. আল্লাহর প্রতি ঈমান

মহান আল্লাহ হলেন সকল সৃষ্টির এক ও অদ্বিতীয় স্রষ্টা, রিযিকদাতা, লালনপালনকারী। সমগ্র সৃষ্টিজগতের ইলাহ একমাত্র আল্লাহ। আল্লাহ তা'আলার রবুবিয়্যাত, উলুহিয়্যাত এবং তাঁর নাম ও সিফাতসমূহের উপর ঈমান আনা। আল্লাহ আসমান ও যমীন এবং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সকল কিছু তথা বিশ্বজাহানের সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা এ কথা মেনে নেয়া। একমাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্যই সমস্ত ইবাদত সম্পাদন করা। একমাত্র তাঁরই উপাসনা করা। তিনি ব্যতীত সকল মনগড়া বাতিল মা'বুদকে পরিত্যাগ করে শুধুমাত্র তাকেই সত্য ইলাহ বলে বিশ্বাস করা। কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত তাঁর যাবতীয় সুন্দর নামসমূহ এবং তাঁর গুণাবলীকে সত্য বলে বিশ্বাস স্থাপন করা।[১] যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ مَا بَیْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَ اصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهٖ ؕ هَلْ تَعْلَمُ لَهٗ سَمِیًّا

তিনিই আসমানসমূহ ও যমীনের প্রতিপালক এবং এদের উভয়ের মাঝে যা কিছু আছে, অতএব তোমরা একমাত্র তাঁরই ইবাদত করো এবং তাঁর ইবাদতের ওপরই কায়েম থাকো, তুমি তাঁর সম কোন নাম কি জান।[২]

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আরো বলেন,

وَ عِنْدَهٗ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ لَا یَعْلَمُهَاۤ اِلَّا هُوَ ؕ وَ یَعْلَمُ مَا فِی الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ ؕ وَ مَا تَسْقُطُ مِنْ وَّرَقَةٍ اِلَّا یَعْلَمُهَا وَ لَا حَبَّةٍ فِیْ ظُلُمٰتِ الْاَرْضِ وَ لَا رَطْبٍ وَّ لَا یَابِسٍ اِلَّا فِیْ كِتٰبٍ مُّبِیْنٍ

"গায়েবের চাবিগুলো সব তাঁর হাতেই নিবদ্ধ রয়েছে, সেই খবরতো তিনি ছাড়া আর কারোই জানা নেই; জলে-স্থলে যা কিছু আছে তা শুধু তিনিই জানেন; একটি পাতাও ঝরে না, যা তিনি জানেন না। মাটির অন্ধকারে একটি শস্যকণাও নেই, নেই কোনো তাজা সবুজ এবং শুকনো কিছু যার বিবরণ একটি সুস্পষ্ট গ্রন্থে মজুদ নেই।" [৩] আল্লাহর প্রতি ঈমানের মূল কথা হলো - الايمان بتوحيد الله অর্থ্যাৎ আল্লাহর তাওহিদে (একত্ববাদে) বিশ্বাস করা।

তাওহিদের পরিচয়

তাওহীদ অর্থৎ মহান আল্লাহর একত্ববাদের স্বীকৃতি দেওয়া ঈমান গ্রহণের প্রথম শর্তই। তাওহীদের স্বীকৃতি প্রদান ব্যতীত কোন মানুষই নিজেকে মুমিন বলে দাবি করতে পারবে না। توحيد এর আভিধানিক অর্থ- একত্ববাদ বা কাউকে একক নির্ধারণ করা।[৪]

توحيد এর পারিভাষিক সংজ্ঞায় বলা হয়েছে,

إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وترك عبادة ما سواه

[১] রাফিয়া সুলতানা, *ইসলাম ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি : প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ ও বহির্বিশ্ব*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ.ডি ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি (অপ্রকাশিত), ২০১৬, পৃ. ২৮

[২] আল কুরআন, ১৯ : ৬৫

[৩] আল কুরআন, ৬ : ৫৯

[৪] শাইখ সুলাইমান ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাব, *তাইসিরিল আযিযিল হামিদ*, বৈরুতঃ দারু ইবনে হাযম, ২০০৪,পৃ. ১৮

ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহর একত্ব প্রতিষ্ঠা করা, গায়রুল্লাহর ইবাদত ছেড়ে দেওয়া। অর্থাৎ মা'বুদ হিসেবে একমাত্র আল্লাহকেই নির্ধারণ করাকে তাওহিদ বলে।[১]

আত তা'লিকাতুল মুখতাসার প্রণেতা তাওহীদের সংজ্ঞায় বলেন,

التوحيد هو أن يؤحد الله تعالى ويفرده بأفعاله ويوحده في عبادته وأسمائه وصفاته والتنزه عما نزهه عنه نفسه وعما نزهه عنه رسوله صلي الله عليه وسلم من العيوب والنقائص

এ ঘোষণা ও স্বীকারোক্তি দেওয়া যে, সকল বিষয়েই আল্লাহ এক ও একক। তাঁর কাজে তিনি এক ও একক, ইবাদতের সার্বভৌম অধিকারেও তিনি এক ও একক, নামসমূহ ও গুণাবলীতেও তিনি এক ও একক। কলুষ, কালিমা, ত্রুটি বিচ্যুতি ও অসম্পূর্ণতার যা কিছু থেকে তিনি নিজেকে পবিত্র ঘোষণা করেছেন তাঁর সবকিছু থেকেই তিনি পূতপবিত্র। অনুরূপভাবে তাঁর রাসূলও তাঁকে যেসব ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতা থেকে পূত-পবিত্র ঘোষণা করেছেন তা থেকেও তিনি মুক্ত।[২]

২. ফেরেশতাগণের প্রতি ঈমান

আল্লাহ তা'আলার ফেরেশতাগণের প্রতি ঈমান আনা ফরয। ফেরেশতা শব্দটি ফারসী, এর আরবী প্রতিশব্দ 'মালাইকা' (ملائكة)। আরবি 'মালাক' (ملك) শব্দের বহুবচন 'মালাইকা' (ملائكة)। 'মালাক' শব্দের মূল আভিধানিক অর্থ পত্র, বাণী, দূত ইত্যাদি, আর ব্যবহারিক অর্থ আল্লাহর দূত (angel)।[৩]

মানব সৃষ্টির পূর্বেই মহান আল্লাহ ফেরেশতাদের সৃষ্টি করেছেন। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে,

وإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ فَإِذَا سَوَّيْتُه وَنَفَخْتُ فِيه مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَه سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ

স্মরণ কর! (সে সময়ের কথা) যখন তোমার প্রতিপালক ফেরেশতাদেরকে বলেছিলেন- আমি মানুষ সৃষ্টি করছি মাটি থেকে, যখন আমি তাঁকে সুষম করব এবং তাতে আমার রূহ সঞ্চার করব, তখন তোমরা তাঁর প্রতি সাজদাবনত হবে। তখন ফেরেশতারা সকলেই সাজদাবনত হলেন।[৪]

ফেরেশতাগণ মহান আল্লাহর সৃষ্টি। যাদেরকে নূর দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে। তাদেরকে সৃষ্টির উদ্দেশ্য একমাত্র আল্লাহর নির্দেশ পালন। পবিত্র কুরআনে ফেরেশতাদের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন,

وَ قَالُوا اتَّخَذَ الرَّحۡمٰنُ وَلَدًا سُبۡحٰنَہٗ ؕ بَلۡ عِبَادٌ مُّکۡرَمُوۡنَ. لَا یَسۡبِقُوۡنَہٗ بِالۡقَوۡلِ وَ هم بِاَمۡرِهٖ یَعۡمَلُوۡنَ. یَعۡلَمُ مَا بَیۡنَ اَیۡدِیۡهِمۡ وَ مَا خَلۡفَهُمۡ وَ لَا یَشۡفَعُوۡنَ ۙ اِلَّا لِمَنِ ارۡتَضٰی وَ هم مِّنۡ خَشۡیَتِهٖ مُشۡفِقُوۡنَ

লোকেরা বলে, রহমান তাদেরকে নিজের সন্তান বানিয়ে নিয়েছেন; তিনি অনেক পবিত্র বরং তারা হচ্ছেন সম্মানিত বান্দাহ। তারা তাঁর সামনে আগে বেড়ে কথা বলেন না, তারা তো তাঁর আদেশ অনুসারেই কাজ

[১] সালেহ ইবনে ফাউজান, *আত তা'লিকাতুল মুখতাসার*, সৌদিআরব: মাকতাবাতুল ইলমিয়্যা, তা.বি, খ.১, পৃ.১৩
[২] *প্রাগুক্ত*
[৩] আবি আব্দির রহমান খালিল ইবনু আহমাদ আল ফারাহিদি, *কিতাবুল আইন*, দারু মাকতাবাতুল হিলাল, সৌদিআরব: তা.বি, খ. ১, পৃ. ৪৪৫
[৪] আল কুরআন ৩৮ : ৭১

করেন। তাদের সামনেপেছনে যা কিছু আছে তা সবই তিনি জানেন, তারা তাঁর কাছে সে সব লোক ছাড়া অন্য কারোর জন্য সুপারিশ করেন না যাদের প্রতি তিনি সন্তুষ্ট রয়েছেন। তারা তাঁর ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত।[১]

আল্লাহ আরো বলেন,

وَ لَهٗ مَنۡ فِی السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضِ ؕ وَ مَنۡ عِنۡدَهٗ لَا یَسۡتَكۡبِرُوۡنَ عَنۡ عِبَادَتِهٖ وَ لَا یَسۡتَحۡسِرُوۡنَ. یُسَبِّحُوۡنَ الَّیۡلَ وَ النَّهَارَ لَا یَفۡتُرُوۡنَ

তাঁর সান্নিধ্যে যারা আছেন তারা কখনো তাঁর ইবাদাত করতে অহংকার করেন না, তারা কখনো ক্লান্তিও বোধ করেন না, তারা দিবারাত্রি তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করেন, তারা কখনো কোন অলসতা করেন না।[২]

৩. আল্লাহর কিতাবসমূহে ঈমান

ইমানের তৃতীয় স্তম্ভ হলো আসমানি কিতাবসমূহের উপর ঈমান। মহান আল্লাহ নবী রাসূলগণের উপর মানবজাতির হেদায়াত ও মুক্তির উদ্দেশ্যে আসমানী কিতাবসমূহ অবতীর্ণ করেছেন। এ সকল কিতাব তাঁর কালাম বিশেষ। এমন দৃঢ় ও অটল বিশ্বাস রাখাই হচ্ছে আসমানী কিতাবসমূহের প্রতি ঈমানের দাবি।

৪. নবী রাসূলগণের প্রতি ঈমান

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পৃথিবীতে প্রত্যেক জাতির কাছেই তাঁর নবী বা রাসূল প্রেরণ করেছেন। নবী (النبى) শব্দটির অর্থ সংবাদদাতা, পয়গম্বর।[৩] النبى এর বহুবচন হলো انبياء। অর্থ নবীগণ, সংবাদবাহকগণ। রাসূল (رسول) শব্দের অর্থ নবী, পয়গম্বর, আল্লাহর প্রেরিত দূত।[৪]

ইসলামী পরিভাষায়, ফেরেশতার মাধ্যমে অথবা সরাসরি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে যাঁর প্রতি বিশেষ ধরনের প্রত্যাদেশ বা ওহী অবতীর্ণ হয়, তাঁকে নবী বলে। আর রাসূল ঐ ব্যক্তিকে বলা হয়, যাঁর প্রতি কিতাব নাযিল করে প্রত্যাদেশ করা হয়েছে এবং আল্লাহর পক্ষ হতে যাকে মানুষের নিকট তাঁর পয়গাম পৌছানোর দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে।[৫]

ইসলামের মৌল বিশ্বাসের মধ্যে নবী-রাসূলগণের উপর ঈমান অন্যতম। সকলকেই আল্লাহর সত্য নবী ও রাসূল বলে স্বীকার করা ঈমানের অন্যতম দাবি। পবিত্র কুরআনে ইরাশাদ করা হয়েছে,

آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ

রাসূল সে বিষয়ের ওপর ঈমান এনেছে যা তাঁর ওপর তাঁর মালিকের পক্ষ থেকে নাযিল করা হয়েছে, আর যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে তারাও ঈমান এনেছে। তারা সবাই ঈমান এনেছে আল্লাহর উপর, তাঁর ফেরেশতাগণের

[১] আল কুরআন, ২১ : ২৬-২৮
[২] আল কুরআন, ২১ : ১৯-২০
[৩] আবুল ফযল মাওলানা আব্দুল হাফিয বালয়াভি, *মিসবাহুল লুগাত*, থানভি লাইব্রেরী, ঢাকা: ২০০৩, পৃ. ৮৮২
[৪] শিবপ্রসন্ন লাহিড়ী, *ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা: ২০০৯, পৃ. ১০২৩
[৫] মোহাম্মদ রেজাউল হোসাইন, *বিশ্বায়নের ধারণাও ইসলামী বিকল্প: একটি তুলনামূলক অধ্যয়ন*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ.ডি ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি (অপ্রকাশিত), ২০১৬, পৃ. ১০

ওপর, তাঁর কিতাবসমূহের ওপর, তাঁর রাসূলগণের ওপর। আমরা তাঁর নবী রাসূলগণের কারো মাঝে কোনো রকম পার্থক্য করি না।[১]

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আরো বলেন,

اِنَّ الَّذِیۡنَ یَکۡفُرُوۡنَ بِاللّٰہِ وَ رُسُلِہٖ وَ یُرِیۡدُوۡنَ اَنۡ یُّفَرِّقُوۡا بَیۡنَ اللّٰہِ وَ رُسُلِہٖ وَ یَقُوۡلُوۡنَ نُؤۡمِنُ بِبَعۡضٍ وَّ نَکۡفُرُ بِبَعۡضٍ ۙ وَّ یُرِیۡدُوۡنَ اَنۡ یَّتَّخِذُوۡا بَیۡنَ ذٰلِکَ سَبِیۡلًا. اُولٰٓئِکَ ہُمُ الۡکٰفِرُوۡنَ حَقًّا ۚ وَ اَعۡتَدۡنَا لِلۡکٰفِرِیۡنَ عَذَابًا مُّہِیۡنًا

যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের মাঝে পার্থক্য করতে চায় তারা বলে, আমরা কয়েকজনকে স্বীকার করি আবার কয়েকজনকে অস্বীকার করি। এর দ্বারা এরা একটা মাঝামাঝি রাস্তা বের করে নিতে চায়। এরাই হচ্ছে সত্যিকারের কাফের, আর আমি এ কাফেরদের জন্যই নির্দিষ্ট করে রেখেছি এক চরম লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।[২]

আল্লাহর পক্ষ থেকে সকল নবী রাসূলের রিসালাত বা নবুওয়াত এসেছে এ কথার ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা তাদের সমস্ত খবর বিশুদ্ধ একথার ওপর বিশ্বাস করা আবশ্যক। যেমন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেছেন,

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ

"আমি অবশ্যই প্রত্যেক জাতির কাছে রাসূল পাঠিয়েছি, যেন তোমরা এক আল্লাহর ইবাদাত করো এবং তাগুত থেকে বেঁচে থাক।[৩]

৫. তাকদীরের উপর ঈমান

তাকদীরের উপর বিশ্বাস ইসলামের মৌল আকীদাসমূহের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। তাকদীর (تقدير) শব্দটি (قدر) শব্দমূল থেকে উদ্ভূত । যার অর্থ হচ্ছে অনুমান করা, চিন্তাভাবনা করা, এক বস্তুকে অন্য বস্তুর সাথে তুলনা করা, নির্ধারণ করা।[৪] পরিভাষায় তাকদীর এর সংজ্ঞা হলো, প্রত্যেক সৃষ্টির জন্য যাবতীয় বিষয় পরিমিত ও নির্ধারণ করা। এর ব্যাখ্যা হল, সৃষ্টিজগতের জন্য আল্লাহর নির্ধারণ। অর্থাৎ সৃষ্টিজগতের মধ্যে কার কি প্রকৃতি, কার কি কর্ম, কার কী দায়িত্ব, কার কী গুনাগুণ, কার কী বৈশিষ্ট্য, কার জন্য মৃত্যু কখন, কোথায় কিভাবে হবে ইত্যাদি বিষয় স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা নির্ধারণ করেছেন। এর মধ্যে সৃষ্টির কোন ইখতিয়ার নেই। মহান আল্লাহর এ নির্ধারণকে তাকদীর (ভাগ্যলিপি) বলে।[৫] তাকদীর প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন,

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ

আমি সবকিছু সৃষ্টি করেছি নির্ধারিত পরিমাপে।[৬]

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন,

اللّٰہ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَى وَمَا تَغِيضُ لأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ

[১] আল কুরআন, ২ : ২৮৫
[২] আল কুরআন, ৪ : ১৫০-১৫১
[৩] আল কুরআন, ১৬ : ৩৬
[৪] মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, *আল-কাওসার*, ঢাকা: মদীনা পাবলিকেশান্স, ২০০৩, পৃ. ১১৯
[৫] মোঃ মনোয়ার পারভেজ মুন্না, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৭
[৬] আল কুরআন, ৫৪ : ৪৯

প্রত্যেক নারী যা গর্ভে ধারণ করে এবং জরায়ুতে যা কিছু হ্রাস-বৃদ্ধি পায় আল্লাহ তা জনেন এবং তাঁর বিধানে প্রত্যেক বস্তুরই এক নির্দিষ্ট পরিমাণ আছে।[১]

তিনি আরো ইরশাদ করেছেন,

وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ

গায়েবের চাবিগুলো সব তাঁর হাতেই নিবদ্ধ রয়েছে, সেই খবর তো তিনি ছাড়া আর কারোই জানা নেই; জলে-স্থলে যা কিছু আছে তা শুধু তিনিই জানেন প্রত্যেকটি পাতা ঝড়ে না, যার খবর তিনি জানেন না। মাটির অন্ধকারে একটি শস্য কণাও নেই, নেই কোনো তাজা সবুজ, শুকনো, যার বিবরণ একটি সুস্পষ্ট গ্রন্থে মজুদ নেই।[২]

৬. কিয়ামত ও আখিরাতের উপর ঈমান

সকল সৃষ্টি মরণশীল। মানুষকেও অন্যান্য সৃষ্টির ন্যায় মৃত্যুবরণ করতে হবে। অন্যান্য সৃষ্টির মধ্যে মানুষের মৃত্যু এবং অন্যান্য সৃষ্টির মৃত্যুর মধ্যে রয়েছে বিস্তর ফারাক। কারণ মৃত্যুর পর মানুষের জন্য এক অবধারিত জীবন অপেক্ষা করছে। যে জীবনে পার্থিব জীবনের কর্মফল প্রদান করা হবে এগুলো বিশ্বাস করা আবশ্যক। এছাড়া পবিত্র কুরআন ও হাদীসে মানুষের মৃত্যু পরবর্তী জীবন সম্পর্কে যত বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে সকল কিছুকে সত্য বলে বিশ্বাস করা। যেমনঃ কবরের সাওয়াল-জাওয়াব, আযাব, নিয়ামত, হাশর, পুলসিরাত, জান্নাত, জাহান্নাম ইত্যাদি। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى بَلَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

এ লোকগুলো কি এটা বুঝতে পারেনা যে, মহান আল্লাহ তা'আলা অসমানসমূহ ও যমীন বানিয়েছেন এবং এ সবকিছু সৃষ্টি যাকে সামান্যতম ক্লান্তও করতে পারেনি, তিনি কি একবার মরে গেলে মানুষকে পুনরায়, জীবন দান করতে সক্ষম? অবশ্যই তিনি সব কিছুর ওপর ক্ষমতাবান।[৩]

পবিত্র কুরআনে আরো ইরশাদ হচ্ছে,

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ

তোমরা কি ধরে নিয়েছো যে, আমি তোমাদের এমনিই অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদের আমার কাছে একত্রিত করা হবে না?[৪]

কিয়ামত কখন সংঘটিত হবে এ সম্পর্কে মহান আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত। এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন,

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ

[১] আল কুরআন, ১৩ : ৮
[২] আল কুরআন, ৬ : ৫৯
[৩] আল কুরআন, ৪৬ : ৩৩
[৪] আল কুরআন, ২৩ : ১১৫

নিশ্চয়ই কিয়ামতের জ্ঞান আল্লাহর কাছে রয়েছে।[১]

মৃত্যু পরবর্তী জীবন হচ্ছে পার্থিব জীবনের কর্মফল প্রাপ্তির স্থান। ভালো কিংবা খারাপ সব ধরণের কাজের প্রতিদানই মৃত্যুর পরে প্রত্যেক মানুষ ভোগ করবে। পবিত্র কুরআনের ভাষায়,

فَمَنۡ يَّعۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّةٍ خَيۡرًا يَّرَهٗ. وَ مَنۡ يَّعۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ

অতএব যে ব্যক্তি অণু পরিমাণ ভাল কাজ করবে সে তা দেখতে পাবে। আবার কেউ অণু পরিমাণ মন্দ কাজ করলে তাও সে দেখতে পাবে।[২]

সালাত

ঈমানের পর মানুষের জন্য প্রথম আবশ্যক কর্তব্য হলো সালাত। আল্লাহর সাথে বান্দার সম্পর্ক স্থাপিত হয় ঈমান দ্বারা। সে সম্পর্ক হয় গাঢ় ও সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নামায দ্বারা। নবীজি (সা:) মি'রাজ রজনীতে মহান আল্লাহর সাক্ষাত লাভে ধন্য হন। আর নামায হলো মু'মিনের মি'রাজ । এই নামাযের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক এবং পার্থিব বহুমাত্রিক কল্যণ সাধিত হয়। নামায মানুষকে পাপাচার থেকে রক্ষা করে।

সালাতের আভিধানিক অর্থ

'সালাত' শব্দটি ফারসী 'নামায' শব্দ-এর আরবী প্রতিশব্দ। আর সালাত-এর আভিধানিক অর্থ-দু'আ, প্রার্থনা, ইসলামের বিধান অনুযায়ী ইবাদত বা উপাসনা, ইস্তিগফার, দূরূদ, দোয়া, আশির্বাদ।[৩] ইসলাম ধর্ম মতে নামায শব্দের অর্থ -ফজর, যোহর, আসর, মাগরিব ও ইশা দৈনিক এ পাঁচবার অবশ্য নির্ধারিত সময়ে নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করে আবশ্যক করণীয় (ফরজ) ইবাদাত।

সালাতের পারিভাষিক অর্থ

ইসলামী শরিয়তের পারিভাষায় সালাত হলো, সেই সুনির্দিষ্ট 'ইবাদতের নাম যা আরকান-ই ইসলাম তথা ইসলামের স্তম্ভসমূহের অন্তর্গত'। ইসলামের পাঁচটি মূলস্তম্ভের মধ্যে দ্বিতীয় স্তম্ভ হ'ল সালাত। সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব আল্লাহর খলীফা বা প্রতিনিধি হিসেবে স্রষ্টার প্রতি করণীয় ইবাদতগুলোর মধ্যে সালাত কায়েম করা হল প্রথম এবং প্রধান ইবাদত। একজন মানুষ এ সালাত আদায় করে মুসলমানদের অন্তর্ভূক্ত হতে পারে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন সালাত প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে নির্দেশ প্রদান করে বলেন,

يٰبُنَیَّ اَقِمِ الصَّلٰوۃَ وَ اۡمُرۡ بِالۡمَعۡرُوۡفِ وَ انۡهَ عَنِ الۡمُنۡکَرِ وَ اصۡبِرۡ

"হে আমার প্রিয় বৎস! সালাত কায়েম কর, সৎ কাজে আদেশ দাও এবং অসৎ কাজে নিষেধ কর আর ধৈর্য ধারন করো।"[৪]

সাওম

প্রাপ্তবয়স্ক এবং শারীরিকভাবে সক্ষম সকল মুসলমানকে হিজরী বছরের রমযান মাসে দীর্ঘ এক মাস রোযা রাখতে হয়। এটি ইসলামের ফরয বিধান। সাওম পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণের সময় ফরয ছিল। সাওম ফরয করার

---

[১] আল কুরআন, ৩১ : ৩৪
[২] আল কুরআন, ৯৯ : ৭-৮
[৩] ইবন মানযুর, *লিসানুল আরাব*, ইরান : নাশ্‌রু আদাবিল হাওযাহ, ১৪০৫ হি., ২খ., পৃ. ৩৯৮
[৪] আল কুরআন, ৩১ : ১৭

উদ্দেশ্য বান্দাকে মুত্তাকী হিসেবে গড়ে তোলা। কুরআন কারীম ও হাদীস শরীফে সাওম পালনের অসংখ্য ফযিলত বর্ণিত হয়েছে।

সাওমের আভিধানিক অর্থ

'রোযা' শব্দটি ফারসী। এর আরবী প্রতিশব্দ صوم। রোযার আভিধানিক অর্থ প্রসঙ্গে লিসানুল আরব গ্রন্থের প্রণেতা বলেন, "রোযা হচ্ছে, খানা পিনা, অনর্থক কথা ও স্ত্রী সহবাস পরিত্যাগ করা। এখানে রোযা অর্থ চুপ থাকা।"[১] যেমন আল-কুরআনে এসেছে, "নিশ্চয়ই আমি প্রভুর জন্য একটি রোযা মান্নত করেছি।"[২]

সাওমের পারিভাষিক অর্থ

পারিভাষিক অর্থে রোযা সম্পর্কে সাইয়্যেদ সাবিক বলেন, রোযার নিয়তে সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত যাবতীয় পানাহার থেকে বিরত থাকাকে রোযা বলে।[৩]

হজ্জ

হজ্জ ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ ফরয ইবাদাত। প্রাপ্ত বয়স্ক, সুস্থ মস্তিস্কসম্পন্ন, শারীরিক ও আর্থিকভাবে সক্ষম সকল মুসলিমের উপর হজ্জ ফরয। হজ্জের সময় নির্দিষ্ট মিকাত থেকে ইহরাম বেঁধে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ ও আরাফার ময়দানে অবস্থান করা আবশ্যক। হজ্জের বেশ কিছু বিধিবিধান নির্ধারিত হয়েছে হযরত ইবরাহীম (আ.) ও ইসমাইল (আ.)-এর স্মৃতিকে কেন্দ্র করে।

হজ্জের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ

হজ্জ(حج)শব্দটি আরবী শব্দ। (ح-ج-ج) শব্দমূল থেকে বাবে نصر এর মাস্‌দার। লিসানুল আরব প্রণেতা বলেন, الحج :القصد বা ইচ্ছাকরা, حج إلينا فلان أى قدم বা আগমণ করা।[৪] মোট কথা হজ্জের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে ইচ্ছা বা সংকল্প করা ।

হজ্জের পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রদানে সাইয়্যেদ সাবিক বলেন, তাওয়াফ এর নিয়তে মক্কা শরীফ পরিভ্রমণ করা কে হজ্জ বলে।[৫]

মোটকথা, ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট সময়ে, নির্ধারিত তারিখ ও নির্ধারিত নিয়মে কা'বা শরীফ ও সংশ্লিষ্ট স্থান সমূহকে যিয়ারত করাকে হজ্জ বলে।

যাকাত

ইসলামের ইবাদাত দুই প্রকার। ১. শারীরিক ইবাদাত ২. আর্থিক ইবাদাত। যাকাত ইসলামের আর্থিক ইবাদাতের অন্তর্গত। ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার মূল ভিত্তিই হচ্ছে যাকাত। যাকত হচ্ছে ধনীদের সম্পদে দরিদ্রদের হক বা অধিকার। যে অধিকার স্বয়ং আল্লাহ নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এর মাধ্যমে সমাজ থেকে ধনী দরিদ্রের বৈষম্য দূর করার পাশাপাশি দারিদ্র্য দূর করাও সম্ভব।

---

[১] ইবন মানযুর, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪০৩
[২] আল কুরআন, ১৯ : ২৬
[৩] সাইয়েদ আস-সাবিক রহ., *ফিক্‌হুস্‌-সুন্নাহ*, বৈরুত: দারুল ফিকর, ১৯৮৩, পৃ.৩২১
[৪] ইব্‌ন মানযুর, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৬
[৫] সাইয়্যেদ সাবিক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩২১

যাকাতের আভিধানিক অর্থ

আভিধানিক দৃষ্টি কোণ থেকে যাকাত শব্দের অর্থ শুচিতা ও পবিত্রতা, শুদ্ধি ও বৃদ্ধি। যাকাত শব্দটি আরবী (ز- ك-و) শব্দমূল হতে গঠিত। এটি বাবে ضرب এর মাস্‌দার। নিচে এর আভিধানিক অর্থ বর্ণনা করা হলো : বর্ধিত হওয়া, পরিশুদ্ধ করা বা হওয়া। অতএব যাকাত অর্থ পরিবৃদ্ধি, পরিশুদ্ধি, কোন জিনিসের উত্তম অংশ।[১]

যাকাতের পারিভাষিক অর্থ

আল্লামা ইউসুফ আল-কারযাভী বলেন, শরী'য়তের দৃষ্টিতে যাকাত শব্দটি মানুষের ধন-সম্পদে আল্লাহ্‌ কর্তৃক সুনির্দিষ্ট ও ফরযকৃত অংশ বুঝাবার জন্য ব্যবহৃত হয়। যাকাত পাবার যোগ্য লোকদের ফরযকৃত নির্দিষ্ট অংশের ধন-সম্পদ প্রদান করাকেও যাকাত বলা হয়।[২]

এককথায়, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তি কর্তৃক কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে তার কোন নির্দিষ্ট মালের নির্ধারিত অংশের স্বত্ব অর্পণ করাকে যাকাত বলে।

---

[১] *ইসলামী বিশ্বকোষ*, *প্রাগুক্ত*, খ. ২১, পৃ. ৪৭৫

[২] আল্লামা ইউসূফ আল কারযাভী, *ইসলামের যাকাত বিধান*, অনুবাদ: মাওলানা আব্দুর রাহীম, ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, প্রথম খন্ড, ২০০০ ইং, পৃ. ৪৬

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : আইন পরিচিতি

আইন হচ্ছে কতগুলো নিয়ম বা পদ্ধতি। সামাজিক স্থিতি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখতে আইনের ভূমিকা অনস্বীকার্য। আইন মানুষকে ন্যায়-নিষ্ঠ পন্থা অবলম্বনে বাধ্য করে এবং সমাজকে সকল প্রকার অন্যায় আচরণ থেকে রক্ষা করে। ব্যক্তিগত জীবন থেকে পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন, রাষ্ট্রীয় জীবন এবং আন্তর্জাতিক জীবনে পারস্পরিক আচরণের ক্ষেত্রে আমরা নানা ধরনের সমস্যার মুখোমুখি হই। এসব সমস্যা থেকে মানুষকে রক্ষা করতেই আইনের উৎপত্তি।

আইনের শাব্দিক অর্থ

আইন' শব্দটি ফারসী ভাষার শব্দ। শব্দটি কানুন, প্রথা, নিয়ম ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হতো। হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীতে ইবনল মুকাফ্ফা কর্তৃক সংকলিত পাহলবী হতে আরবীতে অনূদিত গ্রন্থসমূহের তালিকায় 'আঈননামাহ' নামক একটি গ্রন্থে শব্দটির উল্লেখ পাওয়া যায়।[১] আইন শব্দটির ইংরেজি পরিভাষা হলো, Law, Act, Order, Ordinance, Ethic. ইত্যাদি। বাংলা ভাষায় Law এবং Act এই দুটি শব্দের জন্যই সাধারণত আইন শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে।[২]

আইনের সংজ্ঞা

Oxford Dictionary- তে আইনের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে এভাবে-"আইন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আরোপিত আচরণ বিধি যা রাষ্ট্রের বা সমাজের সকলে মানতে বাধ্য।"[৩] আইনের সংজ্ঞা ও প্রকৃতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রদার্শনিকগণের মধ্যে যথেষ্ট মতপার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। অস্টিন তাঁর- Lectures on Jurisprudence গ্রন্থে বলেন, আইন হলো সার্বভৌমের নির্দেশ।[৪]

ভিশিনস্কী (Vyshinsky)-এর মতে, আইন হলো সেসব আচরণবিধি, যা সমাজের প্রতিপত্তিশালীর শ্রেণীর ইচ্ছার প্রকাশ মাত্র।[৫] ভি. তুমানোভ (V. Tumanov) তাঁর লেখা Does Marxism Underestimate Law? নামক প্রবন্ধে বলেছেন, আইন হলো এমন একটি সামাজিক অভিব্যক্তি যার প্রধান লক্ষ্য হলো সামাজিক সম্পর্কগুলোর ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট নিয়ন্ত্রণ রচনা করা এবং মানুষের কর্মকে প্রভাবিত করা...।'[৬]

Justinian বলেন, Law is the king of all mortal and immortal affairs, which ought to be the chief, the ruler and the leader of the noble and the base and thus the standard of

---

[১] ইবনে খালিকান, *ওয়াফাতুল আইয়ান*, আল-কাহেরা : ১৮৮১, খ. ১, পৃ. ১৯৭
[২] মুহাম্মদ ছালাহ উদ্দিন, *বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থায় শারী'আ আইনের প্রয়োগ : একটি পর্যালোচনা*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ.ডি ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি(অপ্রকাশিত), ২০১৫ পৃ. ৯
[৩] Johari, J. C., *Contemporary Political Theory, Basic Concepts and Major Trends* (Sterling Publisher Pvt. Ltd.1980), p.196
[৪] Dunning, *A History of Political Theories. From Rousseau to Spencer* (Central Book Depot, Allahbad, 1967), p.229
[৫] A.Y. Vyshinsky: *The law of the Soviet State* (New York: Macmillan,1948), p.37
[৬] Johari, J. C., Contemporary Political Theory, Basic Concepts and Major Trends (Sterling Publisher Pvt. Ltd.1980), p.209

what is just and unjust, the commander to animals naturally social of what they should do, forbidder of what they should not do.[১]

Blackstone বলেন, Law its most general and comprehensive sense significs a rule of action and is applied indiscriminately to all kinds of actions, Whether animate or inanimate, rational or irrational. Thus we say the law of gravitation or optics, as well as the laws of nature and of nations.[২]

Bentham বলেন, Law or the law, indefinitely, is an abstract or collective term, which when it means anything, can mean meither more or less than the sum total of a number of individual laws taken together.[৩]

Salmond বলেন, Law is a collection of the rules which the State recognises and applies in the administration of justice.[৪]

Woodrow Wilson বলেন, Law is that portion of the established ought and habit which has gained distinct and formal recognition in the shape of uniform rules backed by the authority and power of the government.[৫]

Professor Willoughby বলেন, Laws are those rule of conduct that control courts of justice in the exercise of their jurisdictions. As distinguished from all rules of conduct that obtain more or less general recognition in a community of men, they are such as have for their ultimate enforcement -the entire power of the state.[৬]

বিশিষ্ট আইনজ্ঞ গাজী শামছুর রহমান বলেন, আইন হচ্ছে মানুষের মধ্যে যে সময়ের জন্য যে আইন প্রণীত হয়ে সেকালের ধারণানুযায়ী শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্য রাষ্ট্র অনুমোদিত বা সেই সময়কার সার্বভৌম শক্তি অনুমোদিত অবশ্য পালনীয় বিধিমালা।[৭]

মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান বলেন, আইন বলতে মানুষের বাহ্যিক আচরণ নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে শাসন-ক্ষমতার অধিকারী নির্বাহী বিভাগ কর্তৃক প্রণীত ও প্রয়োগকৃত বিধিসমূহ বুঝায়।[৮]

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর মদীনায় হিজরতের প্রথম বছরই সর্বপ্রথম ইসলামী আইন বিধিবদ্ধ ও কার্যকর হয়েছিল। কোন রাষ্ট্রপ্রধানের পক্ষ থেকে এটাই ছিল বিধিবদ্ধ ও জারীকৃত পৃথিবীর সর্বপ্রথম ইসলামী আইন।

---

১ V.D. Mahajan, Jurisprudence and Legal theory, India: Estern Book company, Law publishers and Book sellers, 2003. P. 27

২ *Ibid*

৩ *Ibid*

৪ R.C Agarwal, *Political Theory*, New Delhi: S. Chand & Company Pvt. Ltd., 2014, P. 202

৫ *Ibid*

৬ *Ibid*

৭ গাজী শামছুর রহমান, *আইনবিদ্যা*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩, পৃ.৩৩

৮ মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান, *ইসলামিক জুরিসপ্রুডেন্স ও মুসলিম আইন*, ঢাকা : আমিন ল’ বুক সেন্টার, ২০১০, পৃ. ২৩

আইনের উৎসসমূহ

সাধারণভাবে রাষ্ট্রকে সকল আইনের উৎস বলে গণ্য করা হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্র ছাড়াও আইনের বহুবিধ উৎস রয়েছে। আইনবিদ অস্টিনের মতে, সার্বভৌম রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ হলো আইনের একমাত্র উৎস। কিন্তু বাস্তবে রাষ্ট্রের মতো আইনও ঐতিহাসিক বিবর্তনের ফলস্বরূপ। সুতরাং সার্বভৌম কর্তৃপক্ষের আদেশই আইনের একমাত্র উৎস নয়। মানব সমাজের আদিম যুগ থেকে অদ্যাবধি নানা সূত্র থেকে আইনের সৃষ্টি হয়েছে।[১] অধ্যাপক হল্যান্ডের মতে আইনের উৎস হচ্ছে-[২]

১. প্রথা
২. ধর্ম
৩. বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত
৪. বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা
৫. ন্যায়বিচার
৬. আইন পরিষদ।

এগুলো ছাড়াও আইনের আরও কয়েকটি উৎস রয়েছে। যথা: জনমত, নির্বাহী ঘোষণা আদালতের রায় ও ডিক্রি, সংবিধান, বৈদেশিক চুক্তি, বিন্যস্তকরণ, আন্তর্জাতিক আইন। নিম্নে আইনের উৎসসমূহ আলোচনা করা হলো[৩]-

১. প্রথা

প্রথা আইনের সবচেয়ে প্রাচীন উৎস। সমাজে দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি এবং লোকাচারকে প্রথা বলা হয়। অধ্যাপক হল্যান্ড-এর মতে, কোনো এক সময়ে কোনো ব্যক্তি কোনো উদ্দেশ্যে বা আকস্মিকভাবে বিশেষ রীতি সমাজের মধ্যে প্রবর্তন করে। পরবর্তীকালে যখন সমাজের অনেকেই সেই রীতি মেনে চলতে থাকে, তখনই প্রথার সৃষ্টি হয়। অধ্যাপক হল্যান্ড বলেন, একটি মাঠের ভিতর দিয়ে যেমন করে একটি পায়ে চলার পথ তৈরি হয়, তেমন করে প্রথার উদ্ভব হয়। প্রাচীনকালে প্রথার সাহায্যে সমাজের দ্বন্দ্ব-বিরোধের মীমাংসা করা হতো। পরবর্তীকালে বহু প্রথা রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতির মাধ্যমে আইনে পরিণত হয়। আধুনিককালেও প্রতিটি রাষ্ট্রের আইনের মধ্যে প্রথাগত আইনের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।[৪] প্রথাকে আইন বলে গণ্য করা না গেলেও এটি আইনের প্রধান উৎস।[৫]

ইংল্যান্ডের সাধারণ আইনগুলো প্রথার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। হিন্দু আইনও প্রথা ভিত্তিক। মুসলিম আইনেও প্রথা গুরুত্বপূর্ণ উৎস।[৬] এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক ম্যাকাইভার বলেন, "আইনের বিরাট গ্রন্থে রাষ্ট্র এখানে সেখানে কিছু নতুন আইন সংযোজন করে, কিছু পুরাতন আইন সংশোধন করে, রাষ্ট্র অধিকাংশ আইন রচনা

---

[১] মোহাম্মদ আবদুস সালাম ও অন্যান্য, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৪-১১৭
[২] Johari, J. C., Contemporary Political Theory, Basic Concepts and Major Trends (Sterling Publisher Pvt. Ltd.1980), p.198
[৩] মোহাম্মদ আবদুস সালাম ও অন্যান্য, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৪-১১৭
[৪] উম্মে হাবিবা, *আইনগত ও নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে মানবাধিকার চর্চা*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ.ডি ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি (অপ্রকাশিত), ২০১৫, পৃ. ৪৭
[৫] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৫
[৬] ডঃ এমাজউদ্দীন আহমদ, *রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কথা*, বাংলাদেশ বুক করপোরেশন লিঃ, ঢাকা : ২০১০, পৃ. ২২১

করে না, রাষ্ট্র যা করে তা হলো প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে বিভিন্ন আইন সংযোজন ও বিয়োগ করা।" (In the great book of law, the state merely write new sentences here and there scratches out an old one. Much of the book was never written by the state at all by all of it the state itself bound. Save as it modifies the code from generation to generation. The state can no more reconstitute at any time the law as a whole than a man can remake his body).[১]

২. সংবিধান

আইনের সবচেয়ে বড় উৎস সংবিধান। সংবিধানে রাষ্ট্রের গঠন, সরকারের বিভিন্ন বিভাগের গঠন ও ক্ষমতা, সরকারের সাথে নাগরিকদের সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকে। সংবিধান আইনের অন্যতম মৌলিক দলিল।[২] সংবিধানের আলোকে আইনসভা আইন প্রণয়ন করে থাকে। সংবিধানকে কোনো কোনো দেশের সর্বোচ্চ আইন বলা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্ট সংবিধানের পরিপন্থী যে কোনো আইন বাতিল ঘোষণা করতে পারে। বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্ট সংবিধানের সাথে অসামঞ্জস্য যে কোনো আইনকে অবৈধ বলে ঘোষণা করতে পারে।[৩]

৩. ধর্ম

আদিম সমাজে ধর্মের উদ্ভব ঘটে। তখন ধর্মীয় অনুশাসনের মাধ্যমে মানুষের আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রিত হতো। এই ধর্মীয় রীতিনীতিগুলো সমাজে শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখত। তাই মানুষ ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলত। এ ধর্মীয় অনুশাসন ও ধর্মগ্রন্থের বিধানসমূহ রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের স্বীকৃতির মাধ্যমে আইনের মর্যাদা লাভ করেছে। প্রাচীন গ্রিস ও রোমের অধিকাংশ আইন হলো ধর্মভিত্তিক। উড্রো উইলসন বলেন, "আদিতে রোমান আইন কতিপয় ধর্মীয় সূত্র ছাড়া আর কিছুই ছিল না।" তাঁর ভাষায়, "Indeed the early law of Rome was little more than a body of technical religious rules, a system of means for obtaining religious rights through the proper carrying out of certain religious formulas."[৪] মুসলমান ও হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থ থেকে বিবাহ, উত্তরাধিকার, সামাজিক সম্পর্ক, তালাক ইত্যাদি সংক্রান্ত বিভিন্ন আইন তৈরি হয়েছে। ভারতীয় হিন্দু আইনের উৎস ধর্মগ্রন্থ মনুসংহিতা, মুসলিম আইনের উৎস শরীয়া। ইহুদীদের আইনকে প্রধানত ধর্ম ভিত্তিক বলা হয়।[৫] আধুনিক সমাজ ব্যবস্থায়ও ধর্মীয় আইনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য অপরিসীম।

৪. বিচারের রায়

সমাজব্যবস্থায় জটিলতা বৃদ্ধি পাবার ফলে প্রথা ও ধর্মীয় অনুশাসনের মাধ্যমে দ্বন্দ্ব-বিরোধের মীমাংসা করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাই বিচারপতিগণ অনেক সময় ব্যক্তিগত বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করে দ্বন্দ্ব-বিরোধের মীমাংসা করতেন। পরবর্তীকালে এ সকল বিচারের রায় আইন হিসেবে পরিগণিত হয়। বর্তমানেও বিচারকের রায় অনেক নতুন আইন সৃষ্টি করছে। বিচারকগণ বিদ্যমান আইনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে আইনের অস্পষ্টতা দূর করেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক বিচারপতি হোমস বলেন, বিচারকগণ আইন প্রণয়ন করেন এবং চিরকালই করে

---

[১] R.C Agarwal, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০৪
[২] মো. শেখ রাসেল, মাহবুব হাসান রিংকু, *রাজনৈতিক তত্ত্ব পরিচিতি*, ঢাকা : দুরন্ত পাবলিকেশন্স, ২০১৯-২০২০, পৃ. ২০৫
[৩] মোহাম্মদ আবদুস সালাম ও অন্যান্য, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৬
[৪] R.C Agarwal, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০৪
[৫] ডঃ এমাজউদ্দীন আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২১

যাবেন। বিচারের রায়ে নির্মিত আইনকে বিচারক সৃষ্ট আইন বলে। সুতরাং বিচারকের রায় আইন প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।[১]

অধ্যাপক গেটেল বলেন, "আইন প্রণেতা হিসেবে রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়নি, রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়েছিল প্রথার ব্যাখ্যাকর্তা ও প্রয়োগকারী হিসেবে।" (State arose not as the creator of law but as the interpreter and enforcer of customs)[২] আইনের ব্যাখ্যা এবং তার সঠিক প্রয়োগই হচ্ছে বিচারকের গুরুত্বপূর্ণ কাজ। কোনো আইনকে অপর্যাপ্ত যা অস্পষ্ট মনে হলে বিচারকগণ আইনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেন এবং সঠিক অর্থ নির্ধারণ করে তা বিশেষ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন। পরবর্তীতে এসব রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত ও অনুমোদিত হয়।[৩]

৫. জনমত

আইনের আর একটি উৎস হলো জনমত। আইনসভা জনগণের আকাঙ্ক্ষা ও চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে আইন প্রণয়ন করে। আইনসভার সদস্যগণ জনগণের প্রতিনিধি। তাই তারা জনমতের উপর ভিত্তি করে আইন প্রণয়ন করেন। আইনসভা কর্তৃক প্রণীত আইন প্রকৃতপক্ষে জনমতের অভিব্যক্তি। আইন সভা কখনো কখনো জনমত যাচাই করে আইন প্রণয়ন করে।[৪] জনমতের পরিপন্থী কোনো আইন টিকে থাকতে পারে না। জনমতকে উপেক্ষা করে আইনসভা কোনো আইন প্রণয়ন করতে পারে না। ওপেনহাইম আইনের একমাত্র উৎস হিসেবে জনমতকে চিহ্নিত করেছেন।[৫]

৬. ন্যায়বিচার

সর্বকালের এবং সর্বদেশের ন্যায়নীতি আইনের বিরাট উৎস হিসেবে পরিগণিত হয়।[৬] ন্যায়নীতি বলতে সাম্য, সততা ও বিবেকবুদ্ধি অনুসারে বিচার করাকে বোঝায়।[৭] বিচারকগণের দায়িত্ব ন্যায়বিচার করা। কিন্তু অনেক সময় দেশে প্রচলিত আইনের সাহায্যে ন্যায়বিচার সুনিশ্চিত করা সম্ভব হয় না। কারণ তারা দেখেন কোনো মামলার বিবাদ নিষ্পত্তির জন্য সম্পূর্ণরূপে আইনের অনুপস্থিতি রয়েছে অথবা প্রচলিত আইন কালের পরিবর্তনের সাথে সাথে অচল ও অপ্রাসঙ্গিক হয়ে গিয়েছে। তখন বিচারকগণ নিজেদের বিবেকবুদ্ধি অনুসারে বিচারকার্য সম্পন্ন করেন। ফলে নতুন আইনের সৃষ্টি হয়। ন্যায়বিচারের দ্বারা যে আইন সৃষ্টি হয় তাকেও বিচারক সৃষ্ট আইন বলে।[৮]

স্যার হেনরি মেইন বলেছেন, "আইনকে সমাজের ন্যায়বোধের সাথে সম্পর্কযুক্ত রাখতে হলে আনুষ্ঠানিক পদ্ধতি ছাড়া অন্য কোনো পদ্ধতিতে সর্বদা আইনের সংশোধনের ব্যবস্থা রাখা আবশ্যক, আর এটাই ন্যায়বোধ।"[৯]

অতীতে রোমের প্রেটরগণ দায়িত্ব নেয়ার পর ন্যায়বোধের মাধ্যমে আইন প্রণয়ন করতেন। ব্রিটেনে অতীতকাল থেকে ন্যায়বোধের ভিত্তিতে আইন প্রণীত হয়ে আসছে।

৭. আইনজ্ঞদের ভাষ্য

অনেক আইনবিদদের রচনাবলিও আইনের উৎস হিসেবে কাজ করে। তাদের ব্যাখ্যা ও আলোচনা আইনের প্রকৃত অর্থ, অভিপ্রায় ও মর্ম উদঘটন করে। এসব গ্রন্থে অনেক আইনগত নীতি থাকে, যেগুলো বিভিন্ন রাষ্ট্রে পরবর্তীতে আইনের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।[১]

---

[১] মোহাম্মদ আবদুস সালাম ও অন্যান্য, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৫
[২] R.C Agarwal, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০৪
[৩] মোহাম্মদ আবদুস সালাম ও অন্যান্য, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৫
[৪] মো. শেখ রাসেল, মাহবুব হাসান রিংকু, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০৫
[৫] মোহাম্মদ আবদুস সালাম ও অন্যান্য, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৬
[৬] ডঃ এমাজউদ্দীন আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২১
[৭] উম্মে হাবিবা, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৮
[৮] মোহাম্মদ আবদুস সালাম ও অন্যান্য, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৫
[৯] R.C Agarwal, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০৫

৮. বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা

প্রখ্যাত আইনজ্ঞ পন্ডিতগণ আইন সম্পর্কে বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁদের আইন সংক্রান্ত বিভিন্ন টীকা, আলোচনা, ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ আইনের প্রকৃত অর্থ প্রকাশে সহায়তা করে। বিচারকগণকে আইনজ্ঞগণের বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা শ্রদ্ধার সাথে আমলে নিয়ে মামলার রায় প্রদানসহ পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে দেখা যায়।

অধ্যাপক গিলক্রাইস্ট বলেন, "The commentator by collecting comparing and logically arranging legal principles, customs, decisions and laws lays down guiding principles for possible cases" উদাহরণস্বরূপ বলা যায় মুসলিম আইনের সম্পাদনায় "হেদায়া" ও "আলমগিরি"-এর গুরুত্ব অপরিসীম। ইংল্যান্ডের কোক -এর *Institutes,* ব্লাকস্টোন -এর *Commentaries on the laws of England,* ডাইসি -এর *Law of the constitution* এবং এরস্কিন -এর *Parliamentary Practice* আইন সংশ্লিষ্ট ইত্যাদি গ্রন্থসমূহকে আধুনিক আইনের গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে।[২] ড. অ্যাপ্পাডোরাই-এর মতে, "The opinion of learned writers on law have often been accepted as correct law in England, for instance the opinion of Coke and Blackstone, in America of story and kent, in India of Vijaneswara and Aparaka."[৩]

৯. আইনসভা

আধুনিক ও গণতান্ত্রিক বিশ্বে জাতীয় সংসদ বা আইন পরিষদ বা আইন সভা সকল প্রকার আইনের প্রথম ও প্রধানতম উৎস হিসেবে বিবেচ্য হয়ে আসছে। বর্তমানে পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই আইন প্রণয়ণের জন্য আইন সভা রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। বর্তমান বাংলাদেশের সকল আইন জাতীয় সংসদেই প্রণয়ন করা হয়। এমনকি আইনের অন্যান্য উৎস থেকে গৃহীত আইনও জাতীয় সংসদের অনুমোদন ছাড়া আইনের মর্যাদা পায় না।

অধ্যাপক গিলক্রাইস্ট বলেছেন, "এটি আইনের প্রধান উৎস হিসেবে অন্যান্য আইনের উৎসের স্থান দখল করে চলেছে।" (It is the chief source of law and is tending to supplaint the other sources). বর্তমানে অধিকাংশ আইন আইনসভার দ্বারা প্রণীত হয়। প্রকৃতপক্ষে আইনসভাই জনমত, প্রথা, ন্যায়নীতি প্রভৃতিকে আনুষ্ঠানিকভাবে আইনের মর্যাদা দান করে থাকে। অধ্যাপক গেটেল বলেন, "আধুনিক রাষ্ট্রে আইনের প্রধান উৎস হলো আইনসভা।" (Legislature is the chief source of law in modern state).[৪]

আইনসভার প্রধানতম কাজ হচ্ছে নাগরিকদের কল্যাণ ও প্রয়োজন বিবেচনা করে যুৎসই নতুন আইন প্রণয়ণ করা, পুরাতন আইন সংশোধন করা ও অপ্রয়োজনীয় আইন বাতিল করা। এক্ষেত্রে জনস্বার্থ ও জনগণের চাহিদা প্রধান বিবেচ্য বিষয়। আমেরিকার সাবেক রাষ্ট্রপতি উড্রো উইলসন বলেন, "Legislation has had and is having a notable development and is now the almost exclusive means of the formulation of new laws."[৫]

---

[১] মো. শেখ রাসেল, মাহবুব হাসান রিংকু, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০৫
[২] মোহাম্মদ আবদুস সালাম ও অন্যান্য, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৬
[৩] R.C Agarwal, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০৫
[৪] মোহাম্মদ আবদুস সালাম ও অন্যান্য, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৬
[৫] *প্রাগুক্ত*

১০. আন্তর্জাতিক আইন

বর্তমানে আন্তর্জাতিক আইনকে আইনের একটি অন্যতম উৎস হিসেবে গণ্য করা হয়। বর্তমানে কোনো রাষ্ট্রই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। প্রত্যেকটি রাষ্ট্রকে অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে কোনো না কোনো সম্পর্ক বজায় রাখতে হয়। ফলে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ও গৃহীত আইনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রত্যেকটি রাষ্ট্র আইন প্রণয়ন করে। আন্তর্জাতিক আইন আমরা পাই দেশসমূহের মধ্যে সন্ধি বা চুক্তি থেকে। দেশের মধ্যে আইন প্রণয়ন করে দেশের সার্বভৌম শক্তি। আন্তর্জাতিক আইন প্রণয়নের জন্য কোন সার্বভৌম শক্তি নেই। আন্তর্জাতিক আইন স্বাধীন রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তি পরস্পর মিলিত হয়ে আন্তর্জাতিক আইন প্রণয়ন করে।[১]

১১. নির্বাহী আদেশ

আধুনিককালে শাসনব্যবস্থার জটিলতার কারণে আইনসভা নিজের ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের কিছু কিছু অংশ নির্বাহী বিভাগের হাতে অর্পণ করেছে। ফলে নির্বাহী বিভাগ বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্রকার নির্বাহী আদেশ জারি করে থাকে। এ অবস্থায় শাসন বিভাগের জারিকৃত ঘোষণা ও আদেশ আইনে পরিণত হয়।[২] নির্বাহী আদেশ সাধারণত অধ্যাদেশ আকারে ঘোষিত হয়। পরবর্তীতে আইনসভার অনুমোদনের মাধ্যমে তা আইনে পরিণত হয়।

১২. বৈদেশিক চুক্তি

নির্বাহী ক্ষমতা বলে সরকার বিভিন্ন রাষ্ট্রের সাথে বৈদেশিক চুক্তি সম্পাদন করে থাকে। এ সকল বৈদেশিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার পর তা আইনসভায় গৃহীত হয়ে আইনে পরিণত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট কর্তৃক সম্পাদিত যে কোনো বৈদেশিক চুক্তি বা সন্ধি সিনেটের অনুমোদন সাপেক্ষ। সিনেট অনুমোদন না করলে কোনো আন্তর্জাতিক চুক্তি বা সন্ধি কার্যকর হয় না।[৩]

১৩. বিন্যস্তকরণ

আইন প্রণয়নের পর সেগুলোকে যথাযথভাবে বিন্যস্তকরণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এর মাধ্যমে আইনের মধ্যে সৃষ্ট অসঙ্গতি দূর করা হয়। আইনকে প্রকৃতি অনুযায়ী সাজানো এবং এর অসঙ্গতি দূর করাকে বিন্যস্তকরণ বলে। বস্তুত বিন্যস্তকরণের মাধ্যমে পুরাতন আইনের কিছুটা রদবদল করা হয়। ফরাসি সম্রাট প্রথম নেপোলিয়ন কর্তৃক ঘোষিত "নেপোলিয়ন কোড" আধুনিক আইন বিন্যস্তকরণের প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

পরিশেষে বলা যায়, আইনের উৎস হিসেবে উপরিউক্ত বিষয়সমূহের ভূমিকা রয়েছে। কোনো একটি উপাদান বা বিষয়কে আইনের একমাত্র বিষয় হিসেবে চিহ্নিত করা যায় না। এর উৎস অনেক। তবে বর্তমানে আইনসভাকে আইনের সর্বপ্রধান উৎস হিসেবে অভিহিত করা যায়। আইনের প্রত্যেক উৎসেরই কম-বেশি গুরুত্ব রয়েছে। এ প্রসঙ্গে উড্রো উইলসন বলেন, "প্রথা আইনের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন উৎস হলেও ধর্ম সমসাময়িক ও প্রায় সমান ফলপ্রসূ উৎপত্তিস্থল। তারপর বিবর্তনের ধারায় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা সৃষ্টির সাথে সাথে আইনের উৎস হিসেবে বিচারকের রায় ও ন্যায়বিচারের ভূমিকা পরিলক্ষিত হয়েছে। আবার রাষ্ট্র শাসন পদ্ধতির যথেষ্ট উন্নতি লাভের পর আইন সম্পর্কিত বৈজ্ঞানিক আলোচনা আইনের উৎস হিসেবে কার্যকর হয়েছে।"[৪]

---

[১] গাজী শামসুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৪
[২] মো. শেখ রাসেল, মাহবুব হাসান রিংকু, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০৫
[৩] মোহাম্মদ আবদুস সালাম ও অন্যান্য, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৭
[৪] *প্রাগুক্ত*

আইনের শ্রেণিবিভাগ

বিভিন্ন আইনজ্ঞ, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও সমাজবিজ্ঞানী বিভিন্নভাবে আইনের শ্রেণিবিভাগ করেছেন। এ কারণে আইনের শ্রেণিবিভাগ সম্পর্কে তাঁদের মধ্যে মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী হল্যান্ড কাজের পরিধি ও ধরনের ভিত্তিতে আইনকে প্রধান দুটি ভাগে বিভক্ত করেছেন। যথা– ক. জাতীয় আইন এবং খ. আন্তর্জাতিক আইন ।

জাতীয় আইনকে তিনি আবার দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন। যথা– ১. সরকারি আইন এবং ২. বেসরকারি বা ব্যক্তিগত আইন ।

হল্যান্ড এবং তাঁর সমর্থকগণ সরকারি আইনকে আবার তিন ভাগে বিভক্ত করেছেন। যথা– ১. সাংবিধানিক আইন, ২. প্রশাসনিক আইন এবং ৩. ফৌজদারি আইন।[১]

অধ্যাপক ম্যাকাইভার রাজনৈতিক আইনকে প্রধানত দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন। যখা:

ক. জাতীয় আইন এবং খ. আন্তর্জাতিক আইন ।

তিনি জাতীয় আইনকে আবার দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন। যথা:

১. সাংবিধানিক আইন এবং ২. সাধারণ আইন

সাধারণত আইনকে আবার দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন। যথা–

১. সরকারি আইন এবং ২. বেসরকারি বা ব্যক্তিগত আইন ।

সরকারি আইনকে আবার অধ্যাপক ম্যাকাইভার দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন। যথা:

১. প্রশাসনিক আইন এবং ২. অন্যান্য সাধারণ আইন।

অধ্যাপক সালমন্ড আইনকে আট ভাগে বিভক্ত করেছেন। যথা:

১। প্রাকৃতিক আইন, ২। আদেশমূলক আইন, ৩। নৈতিক আইন, ৪। চুক্তিভিত্তিক আইন, ৫। প্রথাভিত্তিক আইন, ৬। ব্যবহারিক আইন, ৭। আন্তর্জাতিক আইন এবং ৮। জাতীয় আইন।

অধ্যাপক হল্যান্ড, অধ্যাপক ম্যাকাইভার এবং অধ্যাপক সালমন্ডের আইনের শ্রেণিবিভাগকে অতি সাম্প্রতিককালের রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ অসম্পূর্ণ ও অবৈজ্ঞানিক বলে মনে করেন। কেননা তাঁরা কেউই আন্তর্জাতিক আইনের শ্রেণিবিভাগ করেননি। কিন্তু বর্তমানে আন্তর্জাতিক আইনকে দু'ভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা:

১. ব্যক্তিকেন্দ্রিক আন্তর্জাতিক আইন এবং
২. সরকারি আন্তর্জাতিক আইন।

সরকারি আন্তর্জাতিক আইনকে আবার তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা:

১. শান্তি সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক আইন
২. যুদ্ধ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক আইন এবং
৩. নিরপেক্ষতা সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক আইন।

---

[১] ডঃ এমাজউদ্দীন আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২৩

R.C Agarwal তার Political Theory গ্রন্থে আইনকে ৮ ভাগে ভাগ করেছেন। যথা-

(1) Private Laws.
(2) Public Laws.
(3) Constitutional Laws.
(4) Statute Laws.
(5) Ordinances.
(6) Common Laws.
(7) Administrative Laws.
(8) International Laws.

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : ইসলামী আইন পরিচিতি

সমাজ থেকে সকল ধরনের অন্যায়-অবিচার নির্মূল করা ইসলামের অন্যতম উদ্দেশ্য। এর মধ্যমে একটি শান্তিপূর্ণ, নিরাপদ সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব। অপরাধ প্রবণতা মানুষের সহজাত স্বভাব। মানুষকে এই প্রবণতা থেকে ফিরিয়ে রাখতে ইসলাম অসংখ্য আইন প্রণয়ন করেছে। ইসলাম যে সকল আইন প্রণয়ন করেছে তার বাস্তবায়ন আমরা ইসলামের স্বর্ণযুগে দেখতে পাই। ইসলামী আইন বাস্তবায়নের মাধ্যমেই বর্বর আরব জাতি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতিতে রূপান্তরিত হয়েছিল। ইসলাম প্রণীত সকল আইনের উদ্দেশ্য একটাই; মানুষকে অপরাধ থেকে ফিরিয়ে রাখা, সকল সৃষ্টির নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

ইসলামী আইনের পরিচয়

মহান আল্লাহ মানব জীবনকে নিষ্কণ্টক করার লক্ষ্যে জীবন পরিচালনার জন্য যেসকল বিধিবিধান নির্ধারণ করে দিয়েছেন তাই ইসলামী আইন। ইসলামী আইনের পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক। এর ব্যাপ্তি গোটা মানব জীবনব্যাপী। ইসলামী স্কলারগণ বিভিন্ন ভাব ও ভাষায় ইসলামী আইনকে সংজ্ঞায়িত করেছেন। বিশিষ্ট আইনবিদ আলিমুজ্জামান চৌধুরী বলেন, "ইসলামী আইন হলো, পবিত্র কুরআনে বিধিবদ্ধ, হাদীসে নির্দেশিত, আলিমগণের ঐকমত্যের (ইজমা) উপর প্রতিষ্ঠিত এবং তুলনামূলক অবরোহন প্রক্রিয়ায় (কিয়াস) সুসংহত বিধানাবলি, যার ভিত্তিতে একজন মুসলিমের রাষ্ট্রীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ব্যক্তিগত জীবনের সর্ববিষয় আবর্তিত।"[১]

প্রখ্যাত আইনজ্ঞ মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান বলেন, "ইসলামী আইন হলো, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মাধ্যমে প্রকাশিত আল্লাহর নির্দেশ। যা স্বর্গীয়ভাবে বিন্যস্ত আকারে অগ্রগামী হয়ে ইসলামী সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং কখনই ইসলামী সমাজ বা রাষ্ট্র অগ্রগামী হয়ে উক্ত আইনকে নিয়ন্ত্রণ করে না।"[২]

এন.জে. কুলসন বলেন, Law, in the classical Islamic theory, is the revealed will of God, a divinely ordained system preceding and not preceded by the Muslim state, controlling and not controlled by Muslim society.[৩]

বিশিষ্ট আইনজ্ঞ আলহাজ্জ বদিউল আলম বলেন, "আরবী 'ফিকহ' শব্দের প্রায়োগিক অর্থ আইন'। কাজেই ইসলামী আইন হচ্ছে মানবজাতিকে এ পৃথিবীতে সীরাতে মুস্তাকীমের পথে পরিচালিত করার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে সুবিন্যস্ত বিধান।"[৪] এই সংজ্ঞা দ্বারা বোঝা যায় যে ফিকহ এবং ইসলামী আইন এক এবং অভিন্ন বিষয়।

ফিকহ্ (فقه)শব্দটি আরবী। এটি كرم ও سمع এ উভয় বাব থেকেই ব্যবহৃত হয়। باب كرم থেকে ব্যবহৃত হলে এর অর্থ হবে ফকীহ্ হওয়া। যেমন বলা হয়- فقه فقاهة وهو فقيه من قوم فقهاء قد। আর باب سمع থেকে ব্যবহৃত হলে এর অর্থ হবে জানা, জ্ঞাত হওয়া বা অবহিত হওয়া।

---

[১] আলিমুজ্জামান চৌধুরী, *ইসলামিক জুরিস্প্রুডেন্স ও মুসলিম আইন*, ঢাকা : কুমিল্লা ল' বুক হাউজ, ২০০৫, পৃ. ২৬

[২] মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান, *ইসলামিক জুরিসপ্রুডেন্স ও মুসলিম আইন*, ঢাকা : আমিন ল' বুক সেন্টার, ২০১০, পৃ. ২৩

[৩] এন.জে. কুলসন, *এ হিস্ট্রি অব ইসলামিক ল'*, ইডেনবার্গ, ইডেনবার্গ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৬৪, পৃ. ২

[৪] আলহাজ বদিউল আলম, ইসলামী আইন ও বিচার ব্যবস্থা : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ, *ইসলামী আইন ও বিচার পত্রিকা*, ঢাকা : ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, জানুয়ারী-মার্চ ২০০৫, পৃ. ৪৯-৫০

প্রখ্যাত অভিধান বিশারদ আল্লামা আবুল ফযল জামালুদ্দীন মুহাম্মদ ইবন মুকাররাম ইব্‌ন মানযুর আফরীকী আল-মিসরী (রহ.) বলেন, "ফিকহ শব্দের (আভিধানিক) অর্থ হল, কোন কিছু সম্বন্ধে জানা ও বুঝা। পরে অন্যান্য ইল্‌ম তথা জ্ঞান-বিজ্ঞানের উপর শার'ঈ ইলমের শ্রেষ্ঠত্ব, ফযীলত ও মাহাত্মের কারণে এর ব্যবহার শার'ঈ ইল্‌মে ক্ষেত্রেই বিশেষভাবে হতে থাকে।"[১] আরবদের পরিভাষায় বলা হয়: অর্থাৎ অমুক ব্যক্তিকে দ্বীন বিষয়ে অনুধাবনশক্তি দান করা হয়েছে।[২]

দুররুল মুখতার গ্রন্থকার বলেন, 'ফিকহ' শব্দের আভিধানিক অর্থ- কোন কিছু অবগত হওয়া। পরবর্তীতে এটি শার'ঈ বিষয়াবলী অবগত হওয়ার সাথে নির্দিষ্ট হয়ে যায়। এ শব্দটি باب سمع থেকে ব্যবহৃত হলে এর مصدر (ক্রিয়ামূল) হবে فقه । অর্থ সে জেনেছে বা জ্ঞাত হয়েছে। আর باب كرم থেকে ব্যবহৃত হলে এর مصدر হবে فقه فقاهة অর্থ সে ফকীহ হয়েছে।[৩] আল্লামা ইব্‌ন নুজাইম (রহ.) ও তৎপ্রণীত আল-*বাহরুর রায়িক*' গ্রন্থে অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।[৪]

আল ফিকরুস সামী গ্রন্থকার বলেন, ফিকহ শব্দের শাব্দিক অর্থ কোন কিছু অবগত হওয়া, উপলব্ধি করা, অনুধাবন করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তাদের অন্তর রয়েছে। কিন্তু তারা তা অনুধাবন করতে পারে না'। الفقه শব্দটি থেকে খাস।[৫] কেউ কেউ বলেন, فقه শব্দটি فقاهة এর ওযনে বাবে كرم হতেও ব্যবহৃত হয়। আর বাবে كرم থেকেই (فقيه) ফকীহ পরিভাষাটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। (فقيه) ফকীহ-এর অর্থ জ্ঞানী, বুদ্ধিমান। বিশেষতঃ فقيه শব্দ দ্বারা فقه সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি তথা ফিকহশাস্ত্রবিদ উদ্দেশ্য।[৬]

ফিকহ-এর সংজ্ঞায় ইমাম আবু হানীফা (রহ.) বলেন, (مَعْرِفَةُ النَّفْسِ مَا لَهَا وَمَا عَلَيْهَا) "নফস ও আত্মার জন্য যে সব বিষয় কল্যাণকর এবং যে সব বিষয় কল্যাণকর নয় তা সহ নফ্‌স সম্বন্ধে যথাযথ অবহিত হওয়াকে ফিকহ বলা হয়।"[৭] এ সংজ্ঞায় আকীদা বিশ্বাস, তথা আখলাক ও তাসাউফ এবং সালাত, সাওম, বেচা-কেনা ইত্যাদি সব কিছুই এর অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। কিন্তু পরবর্তীকালে যখন জ্ঞানের প্রতিটি শাখা 'স্বতন্ত্র' রূপ পরিগ্রহ করে তখন আকাইদ সম্পর্কিত ইলমের নাম হয় 'ইলমুল কালাম'। আধ্যাত্মিকতা সম্পর্কিত 'ইলমের নাম হয় 'ইলমুত্‌ তাসাউফ' এবং আমলী জীবনের সাথে সম্পর্কিত বিধি-বিধানের নাম হয় 'ইলমুল ফিকহ'।[৮]

ইমাম শাফি'ঈ (রহ.) ফিকহের সংজ্ঞায় বলেন, اَلْفِقه اَلْعِلْمُ بِالْاَحْكَامِ الشَّرْعِيَةِ الْعَمْلِيَّةِ الْمُكْتَسَبِ مِنْ اَدِلَّتِهَا التَّفْصِلِيَّةِ- "শরী'আতের বিস্তারিত প্রমাণাদি থেকে আমলী শরী'আতের বিধি-বিধান সম্বন্ধে জ্ঞাত হওয়াকে ফিকহ বলা হয়।"[৯] বিশিষ্ট দার্শনিক ইবনে খালদুনের মতে, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে আদিষ্ট অত্যাবশ্যকীয়

---

[১] ইবনে মানযুর আল আফরিকী আল মিসরী, *লিসানুল 'আরব*, ৪র্থ সংস্করণ, খ.১১, বৈরুত ঃ দারু সাদির, ২০০৪, পৃ.২১০

[২] *প্রাগুক্ত* , পৃ.৫২২

[৩] মুহাম্মদ 'আলাউদ্দীন হাসকাফী, *দুররুল মুখতার*, দেওবন্দ : মাকতাবায়ে যাকারিয়্যা, তাবি, খ. ১, পৃ. ১১৮

[৪] আল্লামা ইবনে নুজাইম, *আল বাহরুর রায়িক*, পাকিস্তান : মাকতাবায়ে রাশীদিয়া, কোয়েটা, তাবি, খ. ১, পৃ.৩

[৫] মুহাম্মদ ইকসুল হাসান আল ফাসী, *আল ফিকরুস সামী ফী তারীখিল ফিকহিল ইসলামী*, মদীনাহ মুনাওয়ারাহ : আল সাকবাতুল ইসলামিয়্যাহ, তাবি, খ. ১, পৃ. ৪

[৬] মাওলানা উবাইদুল হক ও অন্যান্য সম্পাদিত, *ফাতওয়া ও মাসাইল*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৬, খ. ১, পৃ.৩; আবুসাঈদ মোহাম্মদ আবদুল্লাহ, *ফিক্‌হ শাস্ত্রের ক্রমবিকাশ*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ৩য় সংস্করণ, ১৯৯৯, পৃ.৪-৬

[৭] ড. ওয়াহবাতুয যুহায়লী, *আল ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু*, সপ্তম সংস্করণ, পাকিস্তান: আল- মাকতাবাতুল হাক্কানিয়া, ২০০৬, খ. ১, পৃ. ২৯; গাজী শামছুর রহমান, *ইসলামী আইন তত্ত্বের বিকাশ ও পরিচিতি*, ঢাকা: ইসলামমিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রথম প্রকাশকাল, ডিসেম্বর, ১৯৮৫ খ্রি. পৃ. ১-২

[৮] ড. যুহায়লী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫-১৬

[৯] *প্রাগুক্ত*, পৃ.৩০

(ফরয, ওয়াজিব) নিষিদ্ধ (হাযবুন), অনুমোদিত (নদব), অপসন্দনীয় (কারাহাত), বৈধ (ইবাহাত) ইত্যাদি বিষয় আল-কুরআন, সুন্নাহ ও শরীয়াহ প্রণেতা কর্তৃক অনুমোদিত প্রমাণাদির মাধ্যমে নির্ধারিত বিধানাবলীকে ফিকহ বলে।[১]

ইমাম আল গাযালী (রহ.) বলেন, আলিমগণের পরিভাষায় ফিকহ হচ্ছে মানুষের (শার'ঈ বিধান যাদের উপর প্রযোজ্য) সার্বিক কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য শরী'আতের বিধানবলী সংক্রান্ত জ্ঞান।'[২] আবূ বকর ইবনে মাসউদ আল কাসানী বলেন, "ইসলাম হচ্ছে একমাত্র জীবনব্যবস্থা; যা মানুষের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবনকে একই সূত্রে গেঁথে রেখেছে। ইসলাম একদিকে স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির সম্পর্ক সমুন্নত করে, অন্যদিকে সৃষ্টির সাথে সৃষ্টির সম্পর্ক অটুট ও অব্যাহত রাখে। মানুষের এই দ্বিবিধ সম্পর্কের পরিগঠন ও পরিশীলনের জন্য ইসলামী শরীয়াতে যে সকল নিয়ম-কানুন ও নীতিমালা বিধৃত হয়েছে, তা-ই ইসলামী আইন।"[৩]

ইসলামী আইন মূলত শরিয়া আইন হিসেবেই বহুল পরিচিত। শরীয়া আইন ও ইসলামী আইন এক ও অভিন্ন। শুধু শব্দগত পার্থক্য। আভিধানিক দৃষ্টিকোণে শরীয়াত (الشريعة) শব্দটি একটি আরবী পরিভাষা। এর আভিধানিক অর্থ– জলাশয় কিংবা কূপে যাবার পথ, অনুসরণীয় স্পষ্ট পথ বা সেই পানি, যাকে কেন্দ্র করে পিপাসার্তরা একত্রিত হয় এবং তা পান করে, আইনানুগতা, বৈধতা, আইনসম্মত ইত্যাদি।[৪] ইমাম রাগিব আল ইস্পাহানী বলেন, শরীয়াতকে এ নামে অভিহিত করার কারণ, যে ব্যক্তি যথার্থভাবে শরীয়াত গ্রহণ করবে সে বিশুদ্ধ পানির ন্যায় পবিত্র হয়ে যায়।[৫]

পবিত্র কুরআনের সূরা আশ শূরার ১৩ ও ২১ নং আয়াতদ্বয়ে, সূরা আল জাসিয়ার ১৮ নং আয়াত এবং সূরা আল মায়িদাহ এর ৪৮ নং আয়াতে শরীয়া/শরীয়াত শব্দের প্রয়োগ আমরা দেখতে পাই। শরীয়াতের কিছু প্রামাণ্য সংজ্ঞা নিম্নে তুলে ধরা হলো।

(ক) শরীয়াত বলতে বুঝায় ইসলামের আইন-কানুন।[৬]

(খ) শরীয়াতের পরিচয় প্রদানে মওলানা আবদুর রহীম বলেন,

الطريقة المستقيمة التى يفيد منها المتمسكون بها هداية وتوفيقا

"এক সুদৃঢ় ঋজু পথ, যদ্বারা তার অবলম্বনকারী লোকেরা হিদায়াত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ কর্মপন্থা লাভ করতে পারে।"[৭]

(গ) মান্না-আল-কাত্তান বলেন, "আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য আকীদা, ইবাদাত, আখলাক ও লেনদেন এবং জীবনের বিভিন্ন দিক ও বিভাগে বান্দাদের সাথে তাদের প্রভুর ও তাদের পরস্পরের মধ্যকার সম্পর্ক পরিচালনা এবং দুনিয়া ও আখিরাতে তাদের সুখ-সমৃদ্ধি লাভের জন্য যেসব বিধান নির্ধারণ করেছেন তাই শরীয়াত।"[৮]

---

[১] আব্দুর রহমান ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে খালদুন, *তারিখ ইবনে খালদুন*, বৈরুতঃ দারুল ফিকর, ১৯৭৯, খ. ১, পৃ.৩৭২

[২] আল গাযালী, *আল মুস্তাসফা মিন 'ইলমিল উসুল*, করাচী : ইদারাতুল ফরমান ওয়াল 'উলুমূল ইসলামিয়্যাহ, খ. ১, পৃ.৩

[৩] ইমাম আলাউদ্দিন আবূবকর ইবনে মাসউদ আল কাসানী, *বাদাইউস সানাই ফী তারতিবিশ শারাঈ*, কাহেরা : দারুন নাহদা, ১৩৭৮ হি, খ. ৬, পৃ. ৪৮১

[৪] ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান, *আল মুনীর আরবী-বাংলা অভিধান*, ঢাকা : দারুল হিকমা বাংলাদেশ, ২০১০, পৃ. ৪৮৪

[৫] আবুল কাসেম হুসাইন বিন মুহাম্মদ মা'রুফ বির রাগেব আল-ইস্পাহানী, *আল-মুফরাদাতু ফী গারীবিল কুরআন*, দামেশক : দারুল কালাম, ১৪১২ হি.), খ. ১, পৃ. ৪৫০

[৬] সম্পাদনা পরিষদ,*সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ*, ঢাকা : ইসলামমিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮২, খ. ২, পৃ. ৪০৯

[৭] মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, *ইসলামী শরীয়াতের উৎস*, ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, ২০০৬, পৃ. ৯

[৮] মান্না বিন খলীল আল কাত্তান, *তারীখুত তাশরীইল ইসলামী*, দামেশক : মাকতাবাতু ওহবিয়্যাহ, ১৪২২ হি., খ. ১, পৃ. ১৩-১৪

(ঘ) ড. ইউসুফ হামিদ আল আলিম বলেন, "ইসলামী শরীয়াহ্ হচ্ছে তাই, যা আল্লাহ্ তাঁর বান্দাহ্গণের জন্য দ্বীন হিসেবে মনোনীত করেছেন এবং তাদের ওপর তা অপরিহার্য করেছেন।"[১]

(ঙ) ইমাম কাতাদাহ (রহ.) বলেন, "শরীয়াত হচ্ছে আদেশ-নিষেধ এবং হুদুদ (শাস্তি) ও ফরজসংক্রান্ত বিধান। কারণ শরীয়াত একটি পথ, যা সত্যের দিকে চলে।"[২]

(চ) ড. আবদুল করীম যায়দান বলেন, "মহান আল্লাহ তাঁর বান্দার জন্য যেসব বিধিবিধান জারি করেছেন তাকে শরীয়াত বলা হয়। সে বিধান কুরআন অথবা মহানবী (সা.)-এর বাণী, কর্ম বা সম্মতির ভিত্তিতে নির্ধারিত হতে পারে।"[৩]

(ছ) ইমাম শাতিবি (রহ.) বলেন, "ইসলামী শরীয়াহ্ হচ্ছে সেই বিধান, যা দায়িত্বশীল মানুষের কথা, কাজ ও বিশ্বাসকে একটা সীমারেখার মধ্যে সীমাবদ্ধ ও নিয়ন্ত্রিত করে।"[৪]

(জ) শরীয়াত বা ইসলামী শরীয়াত বলতে ঐ সকল বিধিবিধানকে বুঝায় যা বাস্তবায়নের দায়িত্ব দিয়ে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাদের জন্য প্রবর্তন করেছেন, যাতে তারা ইহকাল ও পরকালে সৌভাগ্যবান হওয়ার লক্ষ্যে তাতে ঈমান আনয়ন করে এবং তদনুযায়ী আমল করে।[৫]

(ঝ) কখনো কখনো শরীয়াত দ্বারা দ্বীনকে বুঝায়। তখন তার অর্থ দাঁড়ায় মানবতাকে সঠিক পথ প্রদর্শনের নিমিত্তে রাসূলুল্লাহ (সা.) আনীত জীবন বিধান, যাতে তাদের আকীদা-বিশ্বাস, 'ইবাদাত ও মু'আমালাতসংক্রান্ত সকল বিষয়ে দিকনির্দেশনা রয়েছে।[৬]

(ঞ) কারো কারো মতে– আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলুল্লাহ (সা.) যে সকল আদেশ-নিষেধ প্রবর্তন করেছেন, খুলাফায়ে রাশেদীন যা প্রচলন করেছেন এবং মুসলিম আলিম ও মুজতাহিদগণ যা কিছু ইজতাহিদ করেছেন ও যে সকল বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেছেন তা-ই ইসলামী শরীয়াত।[৭]

(ট) শায়খ মাহমুদ শালতুতের ভাষায় ইসলামী শরীয়াত বলতে আল্লাহ্ তা'আলা প্রবর্তিত ঐ সকল বিধিবিধান ও তার মূলনীতিসমূহকে বুঝায় যাতে মানুষের সাথে তার প্রতিপালকের সম্পর্ক, মুসলিম ভাইয়ের সাথে তার সম্পর্ক, সাধারণ মানুষের সাথে তার সম্পর্ক এবং জীবন ও জগতের সাথে তার সম্পর্ক বিষয়ে আলোচনা রয়েছে।[৮]

---

[১] ড. ইউসুফ হামিদ আল আলিম, *আল মাকাসিদুল আম্মা লিশ্ শারী'আতিল ইসলামিয়্যাহ*, রিয়াদ : আল মাহমুদ আলাম আল ইসলামী, ১৪১৫ হি., পৃ. ১৯-২১

[২] ড. ইউসুফ হামেদ আল আলেম, *ইসলামী শরীয়তের তাৎপর্য ও উৎস*, ঢাকা : ইসলামী আইন ও বিচার পত্রিকা, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, জানুয়ারী-মার্চ ২০০৫, পৃ. ১১

[৩] ড. আবদুল করীম যায়দান, *আল-মাদখাল লিদ দিরাসাতিশ শরীআতিল ইসলামিয়্যাহ*, আলেকজান্দ্রিয়া : দারু উমর ইবনিল খাত্তাব, ১৯৬৯ ইং, পৃ. ৩৯

[৪] ড. মুহাম্মদ আত-তাহের আর-রিযকী, *মানবাধিকার ও দণ্ডবিধি*, ঢাকা : ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ, ২০০৮, পৃ. ১২

[৫] মুহাম্মাদ রশীদ রেজা, *তাফসীরুল মানার*, বৈরুত : দারুল মা'রিফা, তাবি, খ. ৬, পৃ. ৪১৪

[৬] মুহাম্মাদ ফখরুদ্দীন রাযী, *আত-তাফসীর আল কাবীর*, তেহরান : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, তাবি, খ. ৭, পৃ. ৩৩৩

[৭] আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন আহমাদ আল-কুরতুবী, *আল-জামি' লি আহকামিল কুরআন*, বৈরূত : দারু ইহয়িয়ায়িত্ তুরাছ আল-আরবী, তাবি, খ. ১৬, পৃ. ১৬৩

[৮] মাহমুদ শালতুত, *আত-তাফসীর আল ওয়াদেহ*, মিশর : মাতবা'আতুল ইস্তিকলাল আল-কুবরা, তাবি, খ. ৪, পৃ. ৪১৪

ইসলামী আইন (ফিকহ) সংকলনের ইতিহাস

ইসলামী আইনের অপর নাম ফিকহ। ইসলামী বিধিবিধানের পূর্ণাঙ্গরূপই হলো 'ইলমে ফিকহ বা ফিকহশাস্ত্র। ফিকহ নব সৃষ্ট কোন বিষয় নয়। কুরআন ও হাদীস থেকেই এর উৎপত্তি হয়েছে। তবে নবী করীম (সা.) এবং খুলাফা-ই-রাশিদানের যুগে এ শাস্ত্রের স্বতন্ত্র সত্তা বা শাস্ত্র হিসেবে স্বীকৃত ছিল না। পরবর্তীকালে গণমানুষের মাঝে কুরআন-সুন্নাহর জ্ঞান সহজে ছড়িয়ে দিতে এবং ইসলাম পালন সহজতর করতে ফিকহ স্বতন্ত্র শাস্ত্র বা বিজ্ঞান হিসেবে পরিচিতি লাভ করে।

পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহয়ে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ফিক্‌হ চর্চার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আল কুরআন ও আস-সুন্নাহর আলোকে ফিকহ শাস্ত্র-এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে সাহাবায় কিরাম (রা.) এবং তাবি'ঈন (রহ.) 'ফিকহ' (فقه) শিক্ষা করা ও অন্যকে শিক্ষা দেওয়ার উপর যথেষ্ট গুরুত্ব প্রদান করেন। হযরত 'উমর (রা.) আবদুর রহমান ইব্‌ন গানাম (রা.)কে শুধু 'ইলমুল-ফিকহ' শিক্ষা দেওয়ার জন্য সিরিয়া প্রেরণ করেছিলেন। ইমাম মালিক (রহ.) নিজ ভাগ্নে আবু বকর (রহ.) ও ইসমা'ঈল (রহ.)-কে উদ্দেশ্য করে বলেছেন যে, "আমি দেখছি যে, হাদীস চর্চার প্রতি তোমাদের আগ্রহ অধিক। তবে যদি চাও যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের লাভবান ও কল্যাণ করুন, তাহলে তোমরা হাদীসের রিওআত কম কর এবং 'ফিকহ' বেশি অর্জন কর"।[১]

স্কলারগণ ফিকহের ক্রমবিকাশের ধারাকে ছয়টি ভাগে ভাগ করেছেন।[২] যথা-

১। প্রথম যুগঃ রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর যুগ (তাঁর নবুওয়াত প্রাপ্তি থেকে দশম হিজরী সন পর্যন্ত)

২। দ্বিতীয় যুগঃ কিবারে (كبار) সাহাবায়ে কিরামের যুগ। এ যুগ খোলাফায়ে রাশিদীনের সমাপ্তি লগ্নে এসে শেষ হয়েছে।[৩]

৩। তৃতীয় যুগঃ সিগারে (صغار) সাহাবা ও তাবিঈনে কিরামের যুগ। এ যুগ খুলাফায়ে রাশিদীনের সমাপ্তিকালের পর থেকে শুরু হয়ে হিজরী প্রথম শতকের শেষ সময় পর্যন্ত অথবা হিজরী দ্বিতীয় শতকের প্রারম্ভকাল পর্যন্ত বিস্তৃত।[৪]

৪। চতুর্থ যুগঃ ফিকহ সংকলন, সম্পাদন ও ইজতিহাদের যুগ এবং 'ইলমে ফিকহ স্বতন্ত্র এক 'ইলম রূপ পরিগ্রহ করার যুগ। এ যুগেই ঐ সমস্ত মহান ফুকাহায়ে কেরাম এ ধরা পৃষ্ঠে আবির্ভূত হয়েছেন যাঁদের অবিস্মরণীয় ও অনবদ্য কীর্তি যুগ যুগ ধরে স্মরণীয় হয়ে আসছে ও থাকবে। এ যুগে তাঁদের স্বনামধন্য শিষ্যবৃন্দও এ পৃথিবীতে এসে ফিকহ জগতে আলোড়ন সৃষ্টিকারী এক অনন্য খিদমত আঞ্জাম দিয়েছেন। এ যুগ তৃতীয় শতকের শেষ লগ্ন পর্যন্ত। অথবা চতুর্থ শতাব্দীর অর্ধকাল পর্যন্ত বিস্তৃত।[৫]

---

[১] মুহাঃ গোলাম ছরোয়ার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭

[২] মাওলানা মুহাম্মাদ ইসহাক ফরীদী ও অন্যান্য সম্পাদিত, *ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪, পৃ. ৩৫

[৩] মোঃ জসিম উদ্দিন, *ফিক্‌হশাস্ত্রে মুফতী মুহাম্মদ ফয়যুল্লাহ-এর অবদান : একটি পর্যালোচন*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ.ডি ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি(অপ্রকাশিত), ২০১৬, পৃ. ১০

[৪] *প্রাগুক্ত*

[৫] মুহাঃ গোলাম ছরোয়ার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭

৫। পঞ্চম যুগ: ফিকহ সংকলনের ও সম্পাদনের পূর্ণাঙ্গতার ও তাকলীদের যুগ এবং ‘ইলমে ফিকহ মুনাযারার বিষয়ে পরিণত হওয়ার যুগ। আইম্মায়ে মুজতাহীদিন কুরআন ও হাদীস গবেষণা করে যে সব মাসআলা মাসাইলের উদ্ভাবন করেছিলেন এ যুগে এসে সে সব মাসাইলের তাহকীক (تحقيق) ও তাফতীশ (تفتيش) এর ব্যাপারে মুনাযারা এবং বাহাস-বিতর্কের সূচনা হয়েছিল। সর্বোপরি এ যুগে সংকলিত হয়েছিল ফিকহ শাস্ত্রের উপর আলোড়ন সৃষ্টিকারী বহু গ্রন্থ। আব্বাসী খিলাফতের যবনিকাপাত হওয়া এবং বাগদাদে তাদের লোমহর্ষক আক্রমণ সংঘটিত হওয়া পর্যন্ত এ যুগের বিস্তৃতি। অবশ্য এ সময়ের পরও মিসরে এ যুগের কিছুটা বিস্তৃতি পরিলক্ষিত হয়।[১]

৬। ষষ্ঠ যুগঃ এ যুগ প্রকৃত তাকলীদ বা অনুসরণের যুগ হিসেবে পরিচিত। হিজরী সপ্তম শতকের সূচনাতেই এ যুগের পত্তন ঘটে। মুজতাহিদ ইমামগণের অনুপস্থিতির এ যুগে ইজতিহাদ করার প্রবণতা হ্রাস পায়। যে কারণে সাধারণ মানুষ ও বিশিষ্ট লোক প্রায় সকলেই পূর্ববর্তী যুগের ইমামগণের তাকলীদ করতে শুরু করে। অদ্যাবধি প্রকৃত অনুসরণের প্রবণতা বহমান রয়েছে।

১ম পর্যায় : রাসূলুল্লাহুল্লাহ (সা.)-এর যুগ (নবুওয়াত প্রাপ্তি থেকে দশম হিজরী সন পর্যন্ত)

মহানবী (সা.)-এর নবুয়্যতকালীন সময় অর্থাৎ ৬১০ খ্রি. থেকে ৬৩২ খ্রি. পর্যন্ত হচ্ছে এ যুগের পরিব্যাপ্তি। এ সময় ফিকহ (فقه) এর উন্মেষ ঘটে এবং স্বীয় অবকাঠামোতে আত্মপ্রকাশ করে।

এ যুগটিকে পণ্ডিতগণ দু' ভাগে বিভক্ত করেছেন[২]- ১। হিজরত পূর্বকাল ২। হিজরতের পরবর্তীকাল

১। হিজরত পূর্বকাল (৬১০ খ্রি.-৬২২ খ্রি.)

হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর প্রতি মক্কা শরীফে প্রথম অহী অবতীর্ণ হয় ৬১০ খ্রিস্টব্দে। নবুয়ত প্রাপ্তি থেকে সূচীত হয়ে মদীনায় হিজরতের পূর্ব-মূহূর্ত পর্যন্ত এ ভাগটি সীমিত। তখন পর্যন্ত ইসলামী সমাজ পুরোমাত্রায় গড়ে উঠেনি এবং ইসলামী রাষ্ট্রও প্রতিষ্ঠিত হয়নি। তখন এর প্রয়োজন দেখা দেয়নি। প্রায় তেরটি বছর এ সময় কাল। এ সময় কালে ইসলামী ফিকহ সৃষ্টিতে কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা সংঘটিত হয়নি। এ সময়টা ইসলামী দাওয়াত প্রচার, আকীদা-বিশ্বাস বিশুদ্ধকরণ এবং লোকদের চরিত্র ও নৈতিকতা ইসলামী আদর্শে গড়ে তোলার চেষ্টা-প্রচেষ্টা অতিবাহিত হয়েছে।[৩]

২। হিজরতের পরবর্তী কাল (৬২২খ্রি.- ৬৩২ খ্রি.)

মহানবী (সা.) ৬২২ খিস্টব্দে মাক্কা থেকে হিজরত করে মদিনায় গমন করেন। হিজরত পরবর্তীকাল রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর যুগে ফিকহ চর্চার দ্বিতীয় ভাগ। মোট দশটি বছর এ ভাগের মেয়াদকাল। ইসলামী সমাজ কাঠামো গঠন এবং রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা এ সময়ই সূচিত হয়। তাই এ সময় শরীয়াত ভিত্তিক নিয়ম- নীতি ও আইন কানুনের আনুষ্ঠানিকতার প্রয়োজন দেখা দেয় তীব্রভাবে। সে সময় যাবতীয় বিষয় রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে সম্পৃক্ত ছিল। আইন প্রণয়ন, উদ্ভূত পরিবর্তিত পরিস্থিতির মুকাবিলায় প্রয়োজনীয় ও যথোপযুক্ত ফাতওয়া, ব্যাখ্যা-

[১] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮
[২] মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪০-৪১
[৩] মুহাঃ গোলাম ছরোয়ার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯

বিশ্লেষণ ইত্যাদি সবই আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত ওহী (وحى)-এর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (সা.) নিজেই সম্পাদন করতেন।[১]

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর যুগে ফিকহী চর্চার বৈশিষ্ট্য

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর যুগে ফিকহ চর্চার ধরণগুলো হল[২]-

প্রথমত: শরীয়াত প্রণয়ণ এবং এ ব্যাপারে চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব একমাত্র রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর উপরই ন্যাস্ত ছিল। এতে অন্য কারো কর্তৃত্ব বা অংশগ্রহণ ছিল না।

দ্বিতীয়ত: সাহাবীগণ বিভিন্ন বিষয়ে জানার জন্য মহানবী (সা.)কে বিভিন্ন প্রশ্ন করতেন। রাসূলুল্লাহ (সা.)ও সাহাবীদের প্রশ্ন করতে উদ্বুদ্ধ করতেন। কুরআন কারীমের বিধান সম্পর্কিত আয়াতসমূহ উদ্ভূত পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে আবার কখনো সাহাবীগণের কোন প্রশ্নের জবাবে অবতীর্ণ হত। আবার অনেক বিষয় রাসূলুল্লাহ (সা.) সাহাবীদের পরামর্শ চাইতেন। সাহাবীরা তাদের নিজস্ব ইজতিহাদ অনুযায়ী পরামর্শ দিতেন। ক্ষেত্র বিশেষ সাহাবীদের পরামর্শই আইন হিসেবে গ্রহণ করা হতো।[৩]

তৃতীয়ত: ইসলামী শরীয়াত এর যাবতীয় বিধান একবারই সম্পাদিত হয়নি, বরং কুরআন ও সুন্নাহ যে অবস্থা ও ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সম্পন্ন হয়েছে অনুরূপভাবে এটিও কুরআান ও সুন্নাহর ন্যায় বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সম্পাদিত হয়েছে।[৪]

চতুর্থত: রাসূলের (সা.) সময় শরী'আতের বিধানাবলী (احكام الشريعة) প্রণয়ন পরবর্তীকালে ফকীহগণের ন্যায় ছিল না, বরং মৌলিক নীতিমালার ভিত্তিতে বিধানাবলী প্রণীত হয়েছে। আবার কখনো এর 'ইল্লাত (علت) বা কার্যকরণ বর্ণনা রাসূলুল্লাহ (সা.) করতেন।[৫]

পঞ্চমত: সে সময় স্বতন্ত্র ও নিয়মতান্ত্রিকভাবে ফিকহ শাস্ত্র প্রণয়নের বাস্তব উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি।

ষষ্ঠত: সাহাবায় কেরাম নবীজি (সা.)-এর পূর্ণাঙ্গ আনুগত্য করতেন। জীবনের সকল ক্ষেত্রেই তাঁর আদেশ নিষেধ পালন করে চলতেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) কর্তৃক সমস্যা সমাধানের এবং উত্থাপিত প্রশ্নের জবাব দানের ব্যাপারে সাহবায়ে কেরামের (রা.) মাঝে কোন সন্দেহ বা সংশয়ের অবকাশ ছিল না, তাঁরা রাসূলের (সা.) প্রতি ছিলেন নিঃশর্ত আনুগত্যশীল।

সপ্তমত: রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সময় ফিকহ এর মূল উৎস ও ভিত্তি ছিল দুটি। একটি হচ্ছে আল- কুরআন এবং অপরটি হল আস-সুন্নাহ।[৬]

২য় পর্যায়: সাহাবীদের যুগে ফিকহ শাস্ত্র (৬৩৩খ্রি./১১হি.-৪০হি./৬৬২খ্রি.)

---

[১] মাওলানা ওবায়দুল হক ও অন্যান্য সম্পাদিত, *ফাতওয়া ও মাসাইল*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৬ খ্রি., পৃ.১৪-১৮; মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪০-৪৮

[২] মুহাঃ গোলাম ছরোয়ার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯

[৩] মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৪-৪৬

[৪] মুহাঃ গোলাম ছরোয়ার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯

[৫] গাজী শামছুর রহমান, *ইসলামী আইন তত্ত্বের বিকাশ ও পরিচিতি*, ঢাকা: ইসলামমিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রথম প্রকাশকাল, ডিসেম্বর, ১৯৮৫ খ্রি. পৃ.৬-২০; মাওলানা ওবায়দুল হক ও অন্যান্য সম্পাদিত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৩-৪৯

[৬] মোঃ জসিম উদ্দিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ইন্তিকালের পর শুরু হয় খোলাফায় রাশেদার শাসনামল। একাদশ হিজরী সনে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ থেকে এ যুগের শুরু এবং শেষ চল্লিশ হিজরীতে হযরত আলী (রা.)-এর শাহাদাতের মধ্য দিয়ে। ফিকহ চর্চার দ্বিতীয় পর্যায় হিসেবে খিলাফত রাশিদার সময়-কালকে বিবেচনা করা হয়।

খোলাফায় রাশেদের শাসনামলে ব্যাপকভাবে ইসলামী সাম্রাজ্য বাড়তে শুরু করে। সেই সাথে নবমুসলিমের সংখ্যাও জ্যামিতিক হারে বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। আরবের বাইরেও এ ধারা চলতে থাকে। ফলে তখন সামাজিক, রাজনৈতিকসহ জীবনের নানা ক্ষেত্রে নতুন নতুন সমস্য উদ্ভব হতে শুরু করে।[১] সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আনেক নবতর প্রশ্ন দেখা দেয়। তাছাড়া বিভিন্ন অঞ্চল, দেশ ও জাতি এবং সংস্কৃতির মানুষের পারস্পরিক জীবন, মুয়ামিলাত, পারস্পরিক সম্পর্ক, সমাজ-সমষ্টির সাথে তাদের সম্পর্ক এবং বিভিন্ন জাতি, গোষ্ঠী ও রাষ্ট্রের পারস্পারিক সম্পর্কের ব্যাপারে অসংখ্য নতুন প্রশ্ন ও নবতর সমস্য মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। এ সময় মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য রূহানী এবং জাগতিক কর্তৃত্বের দায়িত্ব তাঁর সাহাবীগণের উপর স্বাভাবিকভাবেই অর্পিত হয়।[২] সামগ্রিক কারণে খোলাফায় রাশেদার যুগে ফিকহ বা ইসলামী আইনের এক নূতন যুগের, এক নব দিগন্তের সূচনা হয়।

ফিকহ চর্চার এ পর্যায় কুরআন মাজীদ কিংবা সুন্নাতে রাসূলে সে সব সমস্যা, প্রশ্ন ও জটিলতা সম্পর্কে কোন পথ নির্দেশনা পাওয়া যাচ্ছিল না। ফলে এসব সমস্যার সমাধানকল্পে সাহাবাগণ ব্যাপক ইজতিহাদ ও গবেষণা শুরু করেন। এরূপ অবস্থায় ইজতিহাদ করা ছাড়া শরী'আতের অকাট্য স্পষ্ট নিয়ম-নীতি ও বিধানের ভিত্তিতে চিন্তা-গবেষণা করে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে শরী'আতের সিদ্ধান্ত জানতে চেষ্টা করা ব্যতীত কোন উপায়ই তাঁদের ছিল না।[৩]

এ যুগের মুসলিম জাহানের ফাতাওয়ার কেন্দ্রসমূহ ছিল-

ক. মদীনা খ. মক্কা গ. কূফা ঘ. বসরা ঙ. সিরিয়া চ. মিসর ও ছ. ইয়ামান।[৪]

এ যুগের গভীর ফিকহী জ্ঞানসম্পন্ন সাহাবা ছিলেন-১. হযরত আবূ বকর সিদ্দীক রা.(১৩ হি./৬৩৪ খৃ.) ২.হযরত ওমর রা.(মৃ- ২৩ হি.) ৩.হযরত উসমান(রা.)(মৃ-৩৫ হি.) ৪.যায়িদ ইব্ন সাবিত(রা.)(মৃ-৪৮ হি.)৫. আব্দুল্লাহ ইব্ন ওমর(রা.)(মৃ-৭৩ হি.) ৬. উবাই ইব্ন কা'ব(রা.)(মৃ-২১ হি.) ৭. মু'আয ইব্ন জাবাল(রা.)(মৃ-১৮ হি.) ৮. আবূ মূসা আশআরী রা.(মৃ-৫৪ হি.) ৯. আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসউদ(রা.)(মৃ-৩২ হি.);[৫] আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)কে রইসুল ফোকাহা বা ফকীহগণের নেতা বা প্রধান ফকীহ বলা হয়।

তৃতীয় পর্যায় : সিগারে (صغار) সাহাবা ও তাবেঈগণের যুগ (৪১ হিজরী থেকে হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্যন্ত।)

এ পর্যায়টি ছিল ৪১ হিজরী থেকে শুরু হয়ে হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথম ভাগ তথা দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত ব্যপৃত। এ সময়কালের মধ্যেই সমস্ত সাহাবী ইন্তিকাল করেন। তবে এ যুগে যেমন অনেক বয়োকনিষ্ঠ সাহাবী (রা.) বেঁচে

---

[১] *প্রাগুক্ত*

[২] মুহাঃ গোলাম ছরোয়ার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৬

[৩] *প্রাগুক্ত*

[৪] মাওলানা নূর মোহাম্মদ আ'জমী (র.), *হাদীছের তত্ত্ব ও ইতিহাস*, এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা : ১৯৯২, ৪র্থ সংস্করণ, পৃ ৪৮-৫০

[৫] মাওলানা মুহাম্মদ তকী আমীন, *ইসলামী ফিকহের ঐতিহাসিক পটভূমি*, আবদুল মান্নান তালিব অনূদিত, বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার, ঢাকা : ২০১৪, পৃ. ৪৯

ছিলেন, তেমনি বয়োজ্যেষ্ঠ তাবি'ঈগণের (রহ.) একটি বিরাট দল বিদ্যমান ছিলেন, যাঁরা ফিকহ শাস্ত্রকে সমৃদ্ধ করেছেন। কিয়াস ভিত্তিক সমাধানের প্রবণতা এ সময় থেকেই শুরু হয়। ফিকহ সংকলন, বিন্যাস ও গ্রন্থাবদ্ধ করণের যাবতীয় উপাদান এ সময়েই সংগ্রহিত হয়। এ পর্যায়টিকে ফিকহ বিন্যাস, গ্রন্থনা ও সংস্থাপনের ভিত্তি যুগ বলা যেতে পারে।[১] ফিকহ্ চর্চার এ পর্যায় ফোকাহায় কেরামগণের মধ্যে উসূলগত ভিন্নতা দেখা দিলেও মাযহাব তখনও সৃষ্টি হয়নি।

তাবি'ঈগণের যুগে সাতটি কেন্দ্রে ছিল প্রসিদ্ধ[২]-

১. মদীনা কেন্দ্র ২. মক্কা কেন্দ্র ৩. কুফা কেন্দ্র ৪. বসরা কেন্দ্র ৫. সিরিয়া ৬. মিসর ৭. ইয়েমেন কেন্দ্রে ফিকহ ও ফাতওয়া চর্চা হলেও হিজাযী ও ইরাকী কেন্দ্রে ফিকহী চিন্তাধারায় প্রভূত প্রভাব বিস্তার করে।

ফিকহ শাস্ত্র সংকলনের কারণ

১। এ সময় যে সকল সাহাবায়ে কিরাম জীবিত ছিলেন তাঁদের অনেকেই ইসলামী খিলাফতের বিশাল সাম্রাজ্যে ছড়িয়ে পড়েন। অপরদিকে এককভাবে কোন সাহাবীর পক্ষে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সকল হাদীস জানা সম্ভব ছিল না। তাই নব উদ্ভূত সমস্যার সমাধান তাঁরা নিজ নিজ রায় মুতাবিক দিতে বাধ্য থাকেন। এভাবে সঙ্গত কারণেই বিভিন্ন অঞ্চলে সাহাবায়ে কিরামের রায়ও বিভিন্ন হতে থাকল।[৩]

২। রাজনৈতিক কারণে এ সময়ে অনেক ভ্রান্ত মতবাদ ও দলের সৃষ্টি হয়। এসব ভ্রান্ত মতবাদ ও দলের অনুসারী চরমপন্থী ও বিপথগামী ফিরকা যেমন- শিআ, খারিজী ইত্যাদি সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটে।[৪] তারা হীন স্বার্থে নিজ নিজ আকীদা ও মতবাদ অনুযায়ী সমস্যার সমাধান দিতে শুরু করে। ফলে আকীদা ও মাসলা-মাসাইলের ক্ষেত্রে আহলুস সুন্নাহ-এর সাথে তাদের মধ্যে চরম ভিন্নতা দেখা দেয়।

৩। এ যুগে অনারব লোকদের মধ্যে বিপুল পরিমাণে ইসলাম গ্রহণ করে। এ কারণেও ফাতওয়ার মধ্যে বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়।

৪। ইসলাম বিদ্বেষী ও স্বার্থান্বেষী লোকদের হীন স্বার্থ চরিতার্থ করার উদ্দেশ্য রচিত জাল হাদীসও এ সময় মুসলিম জাহানে ছড়িয়ে পড়ে। এ সব বানোয়াট ও জাল হাদীসের কারণেও মাসআলা মাসাইলের মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়।[৫]

৫। আহলুল হাদীস ও আহলুর রায় এ দু দলের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি হওয়া। অর্থাৎ আহলুল হাদীস যদি কুরআন ও হাদীসেকোন সমস্যার সমাধান খুঁজে না পেতেন তখন সাধারণত তাঁরা এ ব্যাপারে কিয়াস ও ইজতিহাদের আলোকে রায় প্রদান করা থেকে বিরত থাকতেন। অপর পক্ষে আহলুর রায়' তথা উলামায়ে মুজতাহিদ্বীন যদি কুরআন ও হাদীসে কোন সমস্যার সমাধান খুঁজে না পেতেন, তখন তাঁরা কিয়াস ও ইজতিহাদের আলোকে নিজস্ব রায় অনুযায়ী ফাতওয়া প্রদান করতেন। এতেও ঐ দু সম্প্রদায়ের মধ্যে মাসলা-

[১] মুহাঃ গোলাম ছরোয়ার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৮
[২] আবূ ছাইদ মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ, *ফিক্হ শাস্ত্রের ক্রমবিকাশ*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ,১৯৮২, পৃ. ৩৮
[৩] মুহাঃ গোলাম ছরোয়ার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৮
[৪] মোঃ জসিম উদ্দিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১
[৫] মাওলানা মুহাম্মাদ ইসহাক ফরীদী ও অন্যান্য সম্পাদিত , *প্রাগুক্ত*, পৃ. পৃ.৪৪

মাসাইলের ক্ষেত্রে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়।[১] এ সমস্ত কারণে ইসলামের হিফাযতের লক্ষ্যে শরী'আতের হুকুম আহকামকে সুবিন্যস্ত করা অর্থাৎ ফিকহ প্রণয়ন ও সংকলন করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

৩য় যুগে ফিকহ চর্চায় সাহাবাদের অনুসরণ

সাহাবীগণ নবীজি (সা.)-এর জীবদ্দশায় সরাসরি নবীজি (সা.)-এর কাছে দ্বীন শেখার সুযোগ লাভ করেছিলেন। যে সকল সাহাবী (রা.) রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট প্রশিক্ষণ লাভ করেছেন এবং তাঁর থেকে সরাসরি জ্ঞান অর্জন করেছেন, তাবি'ঈগণ সেসব সাহাবী (রা.) এর হাতে প্রশিক্ষণ লাভ করেছেন এবং তাঁদের কাছে ফিকহ ও ফাত্ওয়া শিক্ষা লাভ করেন। তাবি'ঈগণ যে সব সাহাবী থেকে 'ইলম ও ফিকহ শিক্ষা লাভ করেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন- ১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদ (রা.) ২. হযরত যায়িদ ইবনে সাবিত (রা.) ৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 'উমর (রা.) ৪. হযরত 'উসমান (রা.) ৫. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) ৬. হযরত আয়িশা (রা.) প্রমুখ।[২]

বিভিন্ন শহরে প্রতিষ্ঠিত প্রসিদ্ধ ফাতওয়া কেন্দ্রের প্রধান প্রধান ফকীহগণের তালিকা নিম্নরূপ-

মদীনার প্রসিদ্ধ ফকীহগণ:

১. উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রা.)	২.আব্দুল্লাহ ইব্ন ওমর (রা.)
৩.আবূ হুরায়রা (রা.)	৪.সা'ঈদ ইবনল মুসাইয়্যাব (রা.)
৫. উরওয়া ইব্ন যুবাইর (রা.)	৬.আবূ বকর ইব্ন আব্দুর রহমান (রা.)
৭. আলী ইব্ন হুসাইন (রা.) যয়নুল আবেদ্বীন	৮. মুসলিম ইব্ন আব্দুল্লাহ ইব্ন ওমর (রা.)
৯. সুলায়মান ইব্ন ইয়াসার (রা.)	১০. কাসিম ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আবূ বকর
১১. হযরত নাফে' (রা.)	১২. মুহাম্মদ ইব্ন মুসলিম ইব্ন শিহাব যুহরী
১৩. ইয়াহইয়া ইব্ন সা'ঈদ আল-আনসারী (রহ.)	১৪. আনাস ইব্ন মালিক (রা.) প্রমুখ।[৩]

মক্কার প্রসিদ্ধ ফকীহগণ:

১.আব্দুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা.)	২. মুজাহিদ ইব্ন যুবায়র (রা.)
৩. ইকরামা (রা.)	৪.আতা ইব্ন আবী রাবাহ (রহ.) প্রমুখ।[৪]

কূফার প্রসিদ্ধ ফকীহগণ:

১.আলকামাহ ইব্ন কায়স নখয়ী (রহ.)	২. উবায়দা ইব্ন আমর সালমানী
৩. আসওয়াদ ইব্ন ইয়াযিদ নখয়ী (রহ.)	৪. ইবরাহীম ইব্ন ইয়াযিদ নখয়ী (রহ.)
৫. সা'ঈদ ইব্ন যুবায়র (রহ.)	৬. আমর ইব্ন শুরাহবিল (রহ.)

[১] লেখকমণ্ডলী, *তারিখে ফিকহে ইসলামী*, করাচী : দারুল ইশা'আত মৌলভী মুসাফিরখানা, পৃ. ১৯৪-২১০
[২] মুহাঃ গোলাম ছরোয়ার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৯
[৩] মাওলানা মুহাম্মদ তকী আমীন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫০-৫১
[৪] *প্রাগুক্ত*

৭. আমীর শা'বী (রহ.)

৮. হাম্মাদ ইব্‌ন আবি সুলায়মান (রহ.)।[১]

বসরার প্রসিদ্ধ ফকীহগণ:

১. আনাস ইব্‌ন মালিক আনসারী (রা.)

২. আবুল আলিয়া ইব্‌ন মিহরান (রহ.)

৩. আবূ শা'শা জাবির ইব্‌ন ইয়াযিদ (রহ.)

৪. কাতাদাহ ইব্‌ন দাআমাহ (রহ.)

৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন সিরীন (রহ.) প্রমুখ।[২]

সিরিয়ার প্রসিদ্ধ ফকীহগণ:

১. আব্দুর রহমান ইব্‌ন গানাম (রহ.)

২. আবূ ইদরীস খাওলানী আশআরী (রহ.)

৩. মাকহূল ইব্‌ন আবূ মুসলিম (রহ.)

৪. ওমর ইব্‌ন আব্দুল আযীয (রহ.) প্রমুখ।[৩]

মিসরের প্রসিদ্ধ ফকীহগণ:

১. আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আমর ইবনল আস (রা.)

২. আবূ খায়র মুরশিদ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ (রহ.)

৩. ইয়াযিদ ইব্‌ন আবূ হাবীব (রহ.) প্রমুখ।[৪]

ইয়ামানের প্রসিদ্ধ ফকীহগণ:

১. তাউস ইব্‌ন কায়সান জুনদী (রহ.)

২. ওয়াহাব ইব্‌ন মুনাব্বিহ (রহ.)

৩. ইয়াহইয়া ইব্‌ন আবূ কাসিম (রহ.) প্রমুখ।[৫]

সমসাময়িক অনেকেই তখন ফিকহ্ চর্চায় উদ্বুদ্ধ হন এবং এসকল মহান ইমামদের নিকট থেকে ফিকহী ইলম অর্জন করেন। এভাবে তারা এঁদের নিকট থেকে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর হাদীস, সাহাবায়ে কিরামের (রহ.) বক্তব্য ও ফতোয়া এবং এ লোকদের মতামত বিশ্লেষণ সংগ্রহ করেন। অতঃপর তাঁদের কাছে ফতোয়া চাইতে আসে অসংখ্য লোক । তাদের সম্মুখে আসে হাজারো মাসায়েল। উত্থাপিত হয় শত শত মামলা মোকদ্দামা। (এ সকল বিষয়ে তাদেরকে ফতোয়া দিতে হয় এবং ব্যক্ত করতে হয় নিজেদের মতামত)।[৬]

তৃতীয় যুগের বৈশিষ্ট্য

এ যুগের কতিপয় বৈশিষ্ট ছিল যা 'ফিকহ' চর্চা ও বিন্যাসের উপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছিল। পরবর্তী যুগেও এর উপস্থিতি লক্ষণীয়। যথা[৭]:

---

[১] *প্রাগুক্ত*
[২] *প্রাগুক্ত*
[৩] *প্রাগুক্ত*
[৪] *প্রাগুক্ত*
[৫] *প্রাগুক্ত*
[৬] শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী (র.), *মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ে সঠিক পন্থা অবলম্বনের উপায়*, পৃ. ২৩-২৪
[৭] মুহাঃ গোলাম ছরোয়ার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪০

প্রথমত

প্রত্যেকেই নিজ নিজ মতবাদ অনুসারে রায় প্রদান করতে অভ্যস্ত ছিলেন এবং রিওয়াত গ্রহণের ক্ষেত্রেও নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিকে অগ্রাধিকার প্রদান করতেন।

দ্বিতীয়ত

বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়া মুফতী সাহাবীগণের সংস্পর্শে এসে তাবি'ঈগণের একটি দল সৃষ্টি হয়, যাঁরা ফিকহী মাসআলা উদ্ভাবন ও ফাত্ওয়া দানে সাহাবীগণের প্রায় সমকক্ষ হয়ে উঠেন।

তৃতীয়ত

হাদীসের ব্যাপক প্রচলন এবং হাদীস বর্ণনা ও শ্রবণরীতি এবং হাদীস পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভূক্ত হওয়ার ফলে তাবি'ঈগন এতদ্বিষয়ে দক্ষ হয়ে উঠেন।

চতুর্থত

অনারবদের (আজমী) মধ্য থেকে একটি বিরাট দল ইসলামী শরীয়াত এর জ্ঞানে সমৃদ্ধ হয়ে উঠে। ফলে অনারবদের জন্য ইসলামী শরীয়াত অনুশীলন সহজতর হয়ে যায়।

পঞ্চমত

এ যুগের আলিমগণ আহলুর রায় (اهل الرائى) এবং আহলুল হাদীস (اهل الحديث) এ দুটি দুলে বিভক্ত হয়ে পড়ে।

ষষ্ঠত

এ যুগের ফকীহগণ মাসআলা উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে কিয়াস (قياس), ইস্তিহসান (استحسان) এবং ইস্তিসলাহ (استصلاح) ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করেন।[১]

৪র্থ পর্যায়ঃ ফিকহ সংকলন, সম্পাদনা ও ইজতিহাদের যুগ (হিজরী তৃতীয় শতকের শেষ লগ্ন পর্যন্ত এবং ৪র্থ শতাব্দীর অর্ধকাল)

মূলত এ যুগেই ফিকহ স্বতন্ত্র শাস্ত্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। এ যুগের ভিত্তি স্থাপিত হয় তৃতীয় যুগের পর। হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রারম্ভ হতে চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত বিস্তৃত এ যুগ। এর স্থায়িত্ব আড়াইশ' বছর। এটা আইন সংকলক ইজতিহাদকারী ইমামগণের যুগ। এ যুগে ইসলামী আইন সংকলন ও লিপিবদ্ধকরণ হয় স্বতস্ফূর্ত ভাবে।

এ যুগেই আবির্ভূত হয়েছেন খ্যাতিমান ফিকহবিদগণ। ফিকহ শাস্ত্রে যাদের অনবদ্য অবদান চির স্মরণীয়। তাদের স্বনামধন্য শিষ্যবৃন্দও ফিকহের জগতে যুগান্তকারী খেদমতের আঞ্জাম দিয়ে গিয়েছেন। তারাঁই পরবর্তী যুগে ইসলামী ফিকহের গতি বিধি নির্ধারণ করে দিয়ে গেছেন। এ যুগেই ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.) ও তাঁর শাগরিদের সহায়তায় ফিকহের নিয়মতান্ত্রিক সংকলন শুরু করেন। এবং তাঁর জীবদ্দশায়ই এর সম্পাদনাও

[১] মুহাম্মদ তাকী আমীন, অনুবাদ- আব্দুল মান্নান তালিব, *ইসলামী ফিক্হের পটভূমি ও বিন্যাস*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ,ফেব্রুয়ারী, ২০০৬, পৃ. ৩৮-৪০

সম্পন্ন করেন। পরবর্তী সময়ে অন্যান্য ইমামগণও নিয়মিতভাব 'ইলমে ফিকহ গ্রন্থ আকারে রচনা ও প্রকাশ করেন এবং মুসলিম উম্মাহ ব্যাপকভাবে তা অনুসরণ করতে থাকে। বিচারক এবং কাযীগণও ঐ ফিকহের অনুসরণে মুকাদ্দামার ফয়সালা দিতেন।[১]

এটা ফিকহ প্রণয়নের স্বর্ণ যুগ। ফিকহর পরিপক্কতা অর্জনের যুগ। ফিকহ সমৃদ্ধশালী হবার যুগ।এ যুগে সাহাবা, তাবি'ঈ ও তাবে'তাবি'ঈগণের ফাতাওয়াসমূহ এবং রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর হাদীসসমূহ সংকলিত হয়। এই যুগে হাদীসের ছয়টি বিশুদ্ধ কিতাবসহ হাদীসের অসংখ্য কিতাব সংকলিত হয়। হাদীসের সাথে সাহাবা ও তাবি'ঈগণের বক্তব্যও যুক্ত করার নীতি প্রচলিত হয়। এ যুগে মুহাদ্দিসগণ হাদীস বর্ণনাকারীদের ব্যক্তিগত, নৈতিক ও চারিত্রিক গুণাবলী, স্মরণশক্তি ধারনশক্তি ইত্যাদির অনুসন্ধান,পর্যালোচনাকে নিজেদের অভিষ্ঠ লক্ষে পরিণত করেন। এ যুগে ফিকহর মূলনীতিসমূহ রচিত হয়। ভবিষ্যতে সংঘটিত হতে পারে এমন ধারণার উপরও বিধান রচিত হয়। এ ক্ষেত্রে ইরাকের ফকীহগণ ছিলেন অগ্রগামী। এ যুগের সমূদয় রচনাবলী সংরক্ষিত আছে।[২]

এ যুগের ফকীহদের মধ্য মতপার্থক্য ছিলো প্রকট। এ মত পার্থক্যের উল্লেখযোগ্য কারণ সম্পর্কে মোঃ জসিম উদ্দিন বলেন,[৩]

১. হাদীসের গ্রহণযোগ্যতা যাচাইয়ে মতবিরোধ। প্রত্যেক ফকীহ নিজ মানদন্ড অনুযায়ী হাদীস যাচাইয়ের নীতি নির্ধারণ করেন।

২. কিয়াস ও ইসতিহসানকে ফিকহর উৎস গণ্য করতে মতবিরোধ। মুহাদ্দিসগণ ছিলেন কিয়াস ব্যবহারের বিপক্ষে। ইমাম শাফি'ঈ (রহ.) ছিলেন ইসতিহসানের বিপক্ষে। ইমাম দাউদ জাহেরীর অনুসারীগণ ছিলেন কিয়াসের বিপক্ষে এবং শব্দের প্রকাশ্য অর্থ গ্রহণের পক্ষে।

৩. ইমামগণের মধ্যে ইজমার শর্তসমূহের বিষয়ে দ্বিমত।

৪. ফিকহী কোন বিধানের কি মর্যাদা এবং কোন দলীল দ্বারা তা সাব্যস্ত হয়েছে এ নিয়ে মতবিরোধ। চতুর্থ যুগের ফকীহগণ ফিকহর মূলনীতি বিষয়ে অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করেছেন। তদ্বারা পরবর্তী ফকীহগণ পথনির্দেশ লাভ করেছেন। এ যুগে বিধানসমূহের শ্রেণীবিন্যাস হয়েছে। যেমন-ফরয, ওয়াযিব, সুন্নাত, মুস্তাহাব মুবাহ ইত্যাদি নির্ধারণ করা হয়েছে। কারণেই ইমামগণের অভিমতে দ্বিমত রয়েছে।

এ যুগের বিখ্যাত ফকীহগণ হলেন:

১. ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)

২. সুফিয়ান সাওরী (রহ.)

৩. শাকীক ইব্ন আব্দুল্লাহ নখঈ (রহ.)

৪.মুহাম্মদ ইব্ন আব্দুর রহমান (রহ.)

৫. ইমাম আবূ ইউসুফ (রহ.)

৬. ইমাম মুহাম্মদ (রহ.)

৭. ইমাম যুফার (রহ.)

৮. হাসান ইব্ন যিয়াদ কূফী (রহ.)

৯. ইমাম মালিক ইব্ন আনাস (রহ.)

[১] মুহাঃ গোলাম ছরোয়ার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪১
[২] মাওলানা নূর মোহাম্মদ আ'জমী (র.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৫-৭৭
[৩] মোঃ জসিম উদ্দিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২

১০. ইমাম মুহাম্মদ ইব্‌ন ইবরাহীম শাফি‘ঈ (রহ.)

১১. ইমাম আহমদ ইব্‌ন হাম্বল (রহ.) প্রমুখ।[১]

নিম্নে প্রসিদ্ধ চারজন ইমামের সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত তুলে ধরা হলো।

ইমাম আজম আবু হানীফা (রহ.)

ফিকহ শাস্ত্রের প্রাণ পুরুষ ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর জন্ম ৮০ হি. সনে এবং মৃত্যু ১৫০ হি. সনে। তাঁকেই ফিকহ শাস্ত্রের জনক হিসেবে স্বীকার করা হয়। তিনিই সর্বপ্রথম ফিকহ শাস্ত্রকে একটি স্বতন্ত্র ইসলামী শাস্ত্রের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেন। যুগ ও সমাজের চাহিদাকে মূল্যায়ন করে তিনি মাস’আলাগুলোকে বিন্যস্ত করে ফিকহ শাস্ত্রের উপর গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি একটি ফিকহ বের্ড প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই বোর্ডের অধীনে প্রায় ৮৩ হাজার মাসআলা সমাধানসহ সংকলন করা হয়।

হানাফী মাযহাবের বৈশিষ্ট্য

বর্তমান পৃথিবীর অধিকাংশ মুসলিম ইমাম আবূ হানিফা (রহ.)-এর মাযহাবের অনুসারী। এর কারণ হানাফী মাযহাব দলীল নির্ভর এবং তুলনামূলক সহজবোধ্য। হানাফী মাযহাবের কিছু বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ[২]-

আল-কুরআনের গুরুত্ব

ইসলামী জ্ঞানের মূল ভিত্তি কুরআন কারীম। হানাফী ফিকহের মূল ভিত্তিও আল-কুরআন। ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর ফাতওয়া প্রদানের ক্ষেত্রেমৌলিক দলীল কুরআন কারীম।

হাদীসের অনুসরণ

ইমাম আবু হানীফা (রহ.) মাসাআলা প্রদানের ক্ষেত্রে আল-কুরআনকে প্রধান্য দিতেন। এর পর হাদীসের দিকে প্রত্যবর্তন করতেন। হাদীস গ্রহণের ক্ষেত্রে কুরআনের মৌল আদর্শের পরিপন্থি ও যুক্তির বিপরীত, এমন হাদীসের অনুসরণ করা থেকে বিরত থাকতেন।

তত্ত্ব -তথ্য হিকমতভিত্তিক ও যুক্তি নির্ভর ফিকহ

হানাফী মাযহাবে পরিপ্রেক্ষিত, যৌক্তিকতা ইত্যাদি বিষয়কে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়। ইমাম আবু হানীফা (রহ.) প্রত্যেকটি মাসআলা, তত্ত্ব, তথ্য, হিকমত ও মানুষের কল্যাণকারিতার উপর পর্যালোচনা করে প্রদান করতেন। তিনি বলেছেন, শরী‘আতের মাসআলাসমূহ নিছক দাসানুগ নয়। প্রত্যেকটি বিধানে মুসলিহাত বা হিকমত বিদ্যমান। যেমন- অন্যান্য ইমামগণ যখন সালাত বা অন্যান্য ফরয বিষয়কে এজন্য ফরয মনে করতেন যে, এটা শরীয়াত প্রবর্তকের নির্দেশ। কিন্তু ইমাম আযম (রহ.) সালাত বা অন্যান্য ফরযসমূহের কল্যাণকারিতার দৃষ্টিকোন যাচাই করতেন।[৩]

---

[১] মাওলানা মুহাম্মদ তকী আমীন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৮
[২] মুহাঃ গোলাম ছরোয়ার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪১
[৩] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪১

সরল-সহজ ফিকহ

সহজতা এবং জনস্বার্থকে গুরুত্ব দেওয়া হানাফী মাযহাবের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বস্তুত হানাফী ফিকহ প্রচলিত অন্যান্য ফিকহী মযহাব বা ধারা অপেক্ষা খুবই সহজ-সরল। যা সাধারণ মানুষের জন্য অধিক কল্যাণময়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়- হানাফী ফিকহ মতে, ন্যূণতম এক আশরাফী বা স্বর্ণমুদ্রা বা তৎসম অর্থ চুরি না করলে হাত কাটা যাবে না। অন্যান্য জমহুর ইমামের মতে, ন্যূণতম ১/৪ স্বর্ণমুদ্রা চুরি করলেই হাত কাটা যাবে।

সুফিয়ান বলেন, আমি ইমাম আবূ হানীফাকে বলতে শুনেছি, আমি ফিকহী বিষয়ে প্রথমে কিতাবুল্লাহ হতে বিধান গ্রহণ করি। কিতাবুল্লাহয় উক্ত বিষয়ে হুকুম না পেলে রাসূলের সুন্নাহ থেকে গ্রহণ করি। উক্ত দুটোতে না পেলে রাসূলের সাহাবাগণের মধ্যে যার বক্তব্য গ্রহণযোগ্য মনে করি তা গ্রহণ করি। সাহাবাগণের বক্তব্যে কোন হুকুম না পাওয়া গেলে ইবরাহীম নখয়ী, শা'বী,ইব্‌ন সীরীন, হাসান, আতা সা'ঈদ ইবনল মুসাইয়্যাব-এর ন্যায় শ্রেষ্ঠ তাবি'ঈগণের নিকট জিজ্ঞেস করি। তবে যেহেতু তাঁদের বক্তব্য ইজতিহাদের উপর প্রতিষ্ঠিত, তদ্রূপ আমিও কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাতে রাসূলকে সামনে রেখে ইজতিহাদ করি যেমনটি তাঁরা করতেন।[১]

ইমাম আবূ হানীফা মনে করতেন, মুজতাহিদের দায়িত্ব হল জনসাধারণের জন্য ফিকহী মাসআলা বের করার রাস্তা উম্মুক্ত করা। মুজতাহিদকে অবশ্যই এমন সব বিষয়ে জ্ঞান থাকতে হবে যা এখনো সংঘটিত হয়নি তবে ভবিষ্যতে হতে পারে। তিনি ফিকহর মূলনীতি এবং শাখা- প্রশাখার বিন্যাস এবং ফিকহী মাসাইল উদ্ভাবনে যথাযথ কর্ম পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন। শায়খুল আইম্মা কারদানী (রহ.) বলেন, ইমাম আবু হানীফার মাসআলার সংখ্যা ছয় লাখ।[২]

ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর যুগে কুফা নগরীতে আরো অনেক ফকিহ্ ছিলেন। যাদের মধ্যে তিনজন অধিক প্রসিদ্ধ। তারা হলেন[৩]:

১। হযরত সুফিয়ান সাওরী (রহ.): তিনি (জ.৯৭হি./মৃ.১৬১হি.) ইমামুল মুহাদ্দীসীন ছিলেন। তাঁর দ্বীনদারী, পরহেযগারী এবং যুহদ ও তাকওয়ার উপর সমস্ত মানুষ একমত ছিলেন।

২। শরীক ইব্‌ন আবদুল্লাহ নাখঈ(রহ.): তিনি(জ.৯৫হি./মৃ.১৭৭হি)একজন ধীমান ও প্রজ্ঞাবান ফকীহ ছিলেন।

৩। মুহাম্মদ ইবনে আবদুর রহমান ইব্‌ন আবু লায়লা (রহ.): তিনি (জ.১৭৪হি./মৃ.১৪৮হি.) একজন বিদগ্ধ ফকীহ্ ছিলেন।

ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর অগণিত ছাত্র ছিল। তার ছাত্রদের মধ্যে এমন কিছু প্রসিদ্ধ ছাত্র ছিলেন যারা নিজেরাই স্বতন্ত্র মাযহাব প্রতিষ্ঠায় সক্ষম ছিলেন। ইমাম আযম আবু হানীফা (রহ.)-এর শিষ্যদের মধ্যে যাঁরা তার নিকট থেকে ফিকহের তা'লীম হাসিল করেছেন এবং ইজতিহাদ ও মাসাইল উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে যাঁরা বিপুল পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন:

- ইমাম আবু ইউসুফ ইয়াকুব ইব্‌ন ইবরাহীম (রহ.) (জ.১১৩হি./মৃ.১৮৩হি.)
- ইমাম যুফার (রহ.) (জ.১১০হি./মৃ.১৫৮হি.)

---

[১] মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯২

[২] এ. এম. এম. সিরাজুল ইসলাম, *ইমাম আযম আবূ হানীফা র.*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৭, ৩য় সংস্করণ, পৃ. ৪৩১

[৩] মুহাঃ গোলাম ছরোয়ার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪২

- ইমাম মুহাম্মাদ ইবন হাসান শায়বানী (রহ.)(জ.১৩২হি./মৃ.১৮৯হি.)
- ইমাম হাসান ইব্‌ন যিয়াদ ল'লুয়ী (রহ.)(মৃ.২০৪হি.)
- ইমাম মুহাম্মদ (রহ.)

মনীষীদের দৃষ্টিতে ইমাম আবূ হানীফা

তার পিতা সাবিত হযরত আলী (রা.)- এর একান্ত সাক্ষাতে ধন্য হয়েছেন। হযরত আলী (রা.) সাবিতের সন্তানদের জন্য দুআ করেছেন। আবূ হাফ্‌স কাবীরের মতে মুসলিম জাহানের বিভিন্ন কেন্দ্রে প্রায় সাড়ে চার হাজার মুহাদ্দিসের নিকট হতে হাদীস শ্রবণ করেছেন। তাঁর নিকট হতেও বিপুল সংখ্যক রাবী হাদীস শ্রবণ করেছেন। তাঁর শিষ্যদের সংখ্যা এত অধিক ছিল যে, তাঁদের মধ্যে ৮৮০ জন যুগের শ্রেষ্ঠ ফকীহ কাযী ছিলেন। ইব্‌ন ইউসুফ আস-সালিহী বলেন, আবূ হানীফা হাদীসের বড় বড় হাফিজ ও ইমামগণের মধ্যে গণ্য। হাদীসের প্রতি অতি মনোযোগী ও ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন না হলে ফিকহর মাসআলা বের করতে পারতেন না।[১]

তিনি ছিলেন আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত তীক্ষ্ণ প্রতিভা, মেধা, প্রখর বুদ্ধিদীপ্ত এবং অসাধারণ স্মৃতিশক্তির অধিকারী। সুন্দর ও আকর্ষণীয় চেহারা, উন্নত ললাটধারী, উত্তম পোষাকে ভূষিত, আতর সুগন্ধিতে অভ্যস্ত, উঁচুমানের দ্বীনদার, আলিম, আবিদ, পরহিজগার, সাধক, 'ইবাদতগুজার, রাতে সালাতে নিমগ্ন, দিনে রোজাদার, কুরআনে হাদীসে অভিজ্ঞ ও নির্ভরযোগ্য, পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের প্রতি আসক্ত, দানশীল, মহৎপ্রাণ, অসীম সাহসী, সত্যবলায় নির্ভিক ও অটল এবং উন্নত ভাষা প্রয়োগের অধিকারী। সত্যের উপর অটল থেকে কারাগারে জীবন দিয়েছেন। তিনি ধনসম্পদ ও 'ইলম বিতরণে ছিলেন উদার।[২]

ইয়াহইয়া ইব্‌ন সা'ঈদ আল-কাত্তান (রহ.) বলেন, আল্লাহর শপথ আবূ হানীফা বর্তমান উম্মতের মধ্যে আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের হাদীস সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞানী।[৩] তিনি আরো বলেন, আবূ হানীফা অত্যন্ত দ্বীনদার , বিশ্বস্ত, সত্যবাদী ও নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিস ছিলেন। কেউ তাঁকে মিথ্যা বর্ণনার অভিযোগে অভিযুক্ত করেনি। তিনি আল্লাহর দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। হাদীস বর্ণনায় পূর্ণ সত্যবাদী ছিলেন।[৪]

আল-আইনী গ্রন্থের দ্বিতীয় খন্ডে উল্লেখ করা হয়েছে, বিখ্যাত মুহাদ্দিস ইয়াহইয়া ইব্‌ন মু'ঈন (মৃ-২৩৩/৮৪৮) ইমাম আবূ হানীফা সম্বন্ধে বারবার বলতেন, অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য, বিশ্বস্ত, ভুলভ্রান্তিমুক্ত, হাদীসে কেউ তাঁকে দুর্বল, অগ্রহণযোগ্য বলেছেন বলে শুনিনি। তিনি আরো বলেন. ' ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) খুবই নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিস ছিলেন। তিনি স্বীয় মুখস্ত ও সংরক্ষিত হাদীস বর্ণনা করতেন। যা তাঁর মুখস্ত নেই তা কখনো বর্ণনা করেননি।'[৫] শায়খুল ইসলাম ইয়াযিদ ইব্‌ন হারূন বলেন, ইমাম আযম অত্যন্ত মুত্তাকী, পরিচ্ছন্ন গুণসম্পন্ন সাধক, আলিম, সত্যবাদী ও সমসাময়িক কালের হাদীসের সর্বাপেক্ষা বড় হাফিজ ছিলেন।[৬]

---

[১] মোঃ জসিম উদ্দিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২-১৩
[২] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩
[৩] মাওলানা আব্দুর রহীম, *হাদীস সংকলনের ইতিহাস*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৬, পৃ. ৩৩৩; মাসিক মদীনা, বর্ষ ৪৮. সংখ্যা ৩, জুন ২০১২, পৃ. ৩৩
[৪] ড. মুহাম্মদ জামাল উদ্দীন, *রিজালশাস্ত্র ও জালহাদীসের ইতিবৃত্ত*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪, পৃ ৪০৬
[৫] মাওলানা আব্দুর রহীম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪০৬
[৬] *প্রাগুক্ত*

তারীখে বাগদাদ গ্রন্থে বলা হয়েছে, ইমাম আইউবের বলেন, প্রকৃত 'ইলম মহান আল্লাহর পক্ষ হতে মুহাম্মদ (সা.)- এর নিকট পৌঁছেছে, তারপর সাহাবাগণ তা লাভ করেছেন, সাহাবাগণের নিকট হতে তাবি'ঈগণ পেয়েছেন। আর তাবি'ঈগণ হতে তা কেন্দ্রীভূত হয়েছে ও পরিপূর্ণতা পেয়েছে ইমাম আবূ হানীফার মধ্যে।[১]

ইমাম মালিক (রহ.)

ইমাম মালিক (রহ.)-এর জন্ম ৯৩ হি. সনে এবং মৃত্যু ২১২হি. সনে। তিনি আবদুর রহমান ইবন হুরমুয (রহ.)-এর নিকট থেকে প্রথমেই হাদীসের 'ইলম হাসিল করেন। তিনি ইমাম যুহরী, নাফি ইবনে যাকওয়ান এবং ইয়াহইয়া ইব্‌ন সাঈদ (রহ.)-এর নিকট থেকেও হাদীস শ্রবণ করতেন। ইমাম মালিক (রহ.) হাদীসের সর্বস্বীকৃত ইমাম ছিলেন। ফিকহ সংকলনে এবং ফাতওয়া দানের ক্ষেত্রে তাঁর মূলনীতি ছিল, প্রথমে তিনি কুরআন মাজীদের উপর অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সমস্ত হাদীস যেগুলোকে তিনি বিশুদ্ধ মনে করতেন, সেগুলোর উপর নির্ভর করতেন। মদীনাবাসীদের আমল এবং তাঁদের মধ্যে প্রচলিত সামাজিক প্রথাকেও তিনি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতেন।[২]

তিনি তৎকালীন শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দীসদের একজন। তিনি সহীহ হাদীস সংগ্রহ করে যে গ্রন্থখানি প্রণয়ন করেন তার নাম আল-মুয়াত্তা'। হাদীস গ্রন্থ সংকলনের ইতিহাসে এ গ্রন্থের নাম তালিকার শীর্ষে। কয়েকজন সাহাবী ও তাবেয়ীর দেওয়া ফাতোয়াও তিনি একত্র করেছিলেন। সেই সঙ্গে তার নিজের বিশেষ বিশেষ ইজতিহাদও উল্লেখ করেছেন। তাই ফিকহ গ্রন্থ প্রণয়নের দিক দিয়েও এই গ্রন্থখানি প্রথম।[৩]

ইমাম মালেক (রহ.)-এর মিসরী ছাত্র এবং ছাত্রের ছাত্র দ্বারাই মূলতঃ মালিকী মাযহাবের অধিক প্রসার লাভ ঘটেছে। যাদের মধ্যে অন্যতম হল:

- আবু মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ইবনে ওয়াহাব ইবনে মুসলিম কুরাশী (রহ.) (মৃ.১৯৭হি.)
- আবু আবদুল্লাহ আবদুর রহমান ইবনে কাসিম আতাকী (রহ.)(মৃ.১৯১ হি.)
- আশহাব ইবন আবদুর আযীয আল কায়সী আল-আমেরী আল-জা'দী (রহ.) (মৃ.২০৪ হি.)
- আবু মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ইবন হাকাম ইবন আ'য়ান (রহ.).(মৃ.২২৪ হি.)
- আসবাগ ইবন ফারাজ উমুভী (রহ.)
- মুহাম্ম ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবদুল হাকাম (রহ.)(মৃ.২৬৮ হি.)
- মুহাম্মদ ইবন ইবরাহীম ইব্‌ন যিয়াদ ইস্কান্দারী (রহ.) (জ.১৮০হি./মৃ.২৬৯হি.)

ইমাম শাফে'ঈ (রহ.)

ইমাম শাফে'ঈ (রহ.)-এর জন্ম ১৫০ হি. সনে এবং মৃত্যু ২০৪ হি. সনে। ইসলামী ফিকহের ভিত্তিমূল প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে যে চার জন ব্যক্তি অনবদ্য অবদান সর্বজন স্বীকৃত তাঁদের মধ্যে ইমাম শাফে'ঈ (রহ.) অন্যতম। তিনি ইরাকে আগমন করে ইজতিহাদে আত্মনিয়োগ করেন। প্রাথমিক অবস্থায় তিনি ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর অনুসারী ছিলেন। পরবর্তীতে ১৯৫ হিজরীতে তিনি নিজেই একটি ফিকহী মাযহাব প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৮ হিজরীতে মিসরে এসে তাঁর চিন্তাধারার অনেক পরিবর্তন ঘটান। মিসরের সার্বিক অবস্থা ও পরিবেশ-পরিস্থিতির

[১] মোঃ জসিম উদ্দিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩
[২] মাওলানা মুহাম্মাদ ইসহাক ফরীদী ও অন্যান্য সম্পাদিত, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৬৫
[৩] মাওলানা আব্দুর রহীম, ইসলামী শরীয়াতের উৎস, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৭

বিবেচনা করে আগের মাযহাবের কিছুটা সংশোধন করেন। তাঁর মাযহাবের মূলনীতি ছিল এই যে, প্রথমে তিনি কুরআন মাজীদের যাহিরী অর্থকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করতেন। কিন্তু যদি কোন দলীল দ্বারা প্রমাণিত হত যে, এখানে কুরআনের যাহিরী অর্থ উদ্দেশ্য নয়, তাহলে তিনি এটিকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করতেন না।[১]

ইমাম শাফিঈ (রহ.)-এর প্রথম যুগের ছাত্র এবং ছাত্রের ছাত্র যারা তাঁর ফিকহের প্রচার করেছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন:

- আবু সাত্তর ইবরাহীম ইব্ন খালিদ ইবনে ইয়ামান কাল্বী আল-বাগদাদী (রহ.)
- ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল (রহ.)
- হাসান ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন সাববাহ আয্‌যাফরানী আল বাগদাদী (রহ.)
- আবু আলী হুসায়ন ইব্ন আলী -কারাবাসী (রহ.)
- আবু উসমান ইব্ন সাঈদ আনমাতী (রহ.)
- আবুল আব্বাস আহমাদ ইবন উমর ইব্ন সুরায়জ (রহ.)
- আবুল আব্বাস আহমাদ ইবন আবু আহমাদ তাবারাণী (রহ.)

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহ.)

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহ.)-এর জন্ম ১৬৪ হি. সনে এবং মৃত্যু ২৪১ হি.সনে। তাকে মনে করা হয় ফিকহ জগতের চতুর্থ নক্ষত্র। তিনি ইয়ামেনে গমন করে সেখানকার শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস আবদুর রাজ্জাক -এর নিকট হাদীস অধ্যায়ন করেন। অবশেষে ইমাম শাফেঈ (রহ.)-এর নিকট ফিকহ শিক্ষা গ্রহণ করেন।

তাঁর মাযহাবের বৈশিষ্ট্য হল:

- ইমাম আহমদের ফিকহে কুরআন ও হাদীসের বাহ্যিক প্রতিফলন ঘটেছে।
- তিনি হাদীসের মারফু ও মাউকুফের সমমর্যাদা দিয়ে ফিকহ রচনা করেছেন।
- যথা সম্ভব তিনি কিয়াস বর্জন করেছেন।
- তাঁর ফিকহ খুবই সহজ ও সরল
- বুদ্ধি ও যুক্তি -তর্কের স্থান তাঁর মাযহাবে অতি কম ছিল।

ইমাম আহমাদ ইবনে (রহ.)-এর ছাত্র যারা তাঁর থেকে ফিকহে হাম্বলী রিওয়ায়েত করেছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন: আবু বকর আহমাদ ইবন মুহাম্মদ ইবন হানী ওরফে আসরাম(রহ.), ইসহাক ইবনে ইব্রাহীম ওরফে ইব্ন রাহওয়াহ (রহ.), আহমাদ ইব্ন হাজ্জায মিরওয়াযী প্রমুখ।

পঞ্চম পর্যায়: ফিকহ সংকলন, সম্পাদনার পূর্ণাঙ্গতা ও তাকলীদের যুগ (হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে হিজরী সপ্তম শতাব্দী)

প্রসিদ্ধ চার মাযহাবের সূচন ঘটে ফিকহ সংকলনের চতুর্থ যুগে। পঞ্চম যুগ হচ্ছে হচ্ছে ফিকহ সংকলন ও সম্পাদনার পূর্ণাঙ্গতার যুগ এবং তাকলীদের যুগ। বিশিষ্ট ইমামগণের তাকলীদের প্রচলন উলামায় কেরাম এবং সাধারণ মানুষ নির্বিশেষে সকলের মধ্যেই শুরু হয় এ যুগে। প্রসিদ্ধ ইমামগণ কুরআন-হাদীস গবেষণা করে এবং

[১] মুহাঃ গোলাম ছরোয়ার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪২

সাহাবী ও তাবেয়ীদের বর্ণনা ও আমল পর্যালোচনা করে যেসব মাসআলা উদ্ভাবন করেছিলেন -এ যুগে এসে সেসব মাসাইলের বিশ্লেষণ, পর্যালোচনা ও সমর্থনে পক্ষে-বিপক্ষে বাহাস-বিতর্কের সূচনা হয়। প্রধান চার ইমাম- আবু হানীফা (রহ.), ইমাম শাফীঈ(রহ.) ইমাম মালেক (রহ.) এবং ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল (রহ.)-এর মত ও মাযহাবকে অধিক গ্রহণযোগ্য মুসলিম উম্মাহ স্বীকার করে নেয়। হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ (রহ.) বলেন, "মাযহাব অবলম্বনের ক্ষেত্রে এ চারটির মধ্যে সীমিত থাকার উপযোগিতা ও বাস্তবতা অনস্বীকার্য। এর ব্যতিক্রম হলে সমূহ বিশৃংখলা ও ক্ষতির আশংকা রয়েছে"।[১] এর কারণ সম্পর্কে হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ (রহ.) বলেন,[২]

১। মুসলিম উম্মাহ এ বিষয়ে ইজ্মায়ে (ঐক্যমতে) উপনীত হয়েছে যে, শরী'আতের পরিচিতি লাভের জন্য পূর্বসূরী সালফে সালিহীনের অনুসরণ করতে হবে। আর প্রতিষ্ঠিত এ চার মাযহাবের মধ্যে যেহেতু পূর্বসূরী আয়িয়াম্মায়ে মুজতাহিদীনের গবেষণালব্ধ ব্যাখ্যা ও অভিমত বিশুদ্ধভাবে সন্নিবেশিত হয়েছে তাই এর অনুসরণ অপরিহার্য।

২। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, বৃহত্তম মুসলিম জামাআতের অনুসরণ করবে। যেহেতু পূর্বেকার অন্যান্য মাযহাবের ধারাবাহিকতা বিলুপ্ত হয়ে মাযহাব কেবল চারটিতে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে এবং বিশ্ব মুসলিম এরই অনুসরণ করছে তাই এখন আর এর ব্যতিক্রম করার কোন অবকাশ নেই।

৩। خير القرون তথা 'উত্তম যুগ' থেকে যেহেতু সময়ের ব্যবধান দীর্ঘতর হয়ে গেছে। আমানতদারী ও বিশ্বস্ততার চরম অভাব দেখা দিয়েছে এবং কারো মধ্যে ইজতিহাদী শর্তাবলী বিদ্যমান আছে তা যাচাই করে দেখাও অত্যন্ত দূরহ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে, কাজেই স্বীকৃত ও প্রসিদ্ধ এ চার মাযহাবের অনুসরণ করাই অপরিহার্য।

এ যুগে হানাফী মাযহাবের প্রচার ও প্রসারে যে সমস্ত ফকীহগণ অবদান রেখেছেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন[৩]:

১। ইমাম আবুল হাসান উবায়দুল্লাহ ইব্ন হাসান কারখী (রহ.)

২। আবু বকর আহমাদ ইব্ন আলী আর রাযী আল-জাস্‌সাস (রহ.)

৩। আবু জাফর মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ আল-বালখী ওরফে ছোট আবু হানীফা (রহ.)

৪। আবু আবদুল্লাহ ইউসুফ ইব্ন মুহাম্মদ জুরজানী (রহ.)

৫। আবুল হাসান আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ কুদূরী (রহ.)

৬। আবু যায়িদ আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর আদ্দাবূসী সামারকান্দী (রহ.)

৭। আবু আবদুল্লাহ হুসায়ন ইব্ন আলী আয্‌যামীরী (রহ.)

৮। শামসুল আইম্মাহ আবদুল আযীয ইব্ন আহমাদ হালওয়ালী আল-বুখারী (রহ.)

---

[১] আবু ছাইদ মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ, *ফিক্হ শাস্ত্রের ক্রমবিকাশ*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮২, পৃ. ১৪৪
[২] উদ্ধৃত, মুহাঃ গোলাম ছরোয়ার, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৪৪
[৩] আবু ছাইদ মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৯-১৫৭

৯। শামসুল আইম্মা মুহাম্মাদ ইব্‌ন আহমাদ সারাখ্‌সী (রহ.)

১০। আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী দামগানী (রহ.)

১১। শামসুল আইম্মা আবু বকর ইবনে মুহাম্মাদ যুরনাজী (রহ.)

মালেকী মাযহাবের ফোকাহায় কেরামদের মধ্যে অন্যতম যারা[১]:

১। মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইয়াহইয়া ইব্‌ন লাবাবা উন্দেলুসী (রহ.)

২। আবু বকর ইব্‌ন আলা আল-কুশায়রী (রহ.)

৩। আবু ইসাহাক মুহাম্মাদ ইব্‌ন কাসিম ইব্‌ন শাবান আল-আনাসী (রহ.)

৪। মুহাম্মাদ ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন আসাদ আল-খুলানী (রহ.)

৫। আবু বকর মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুলাহ আল-মুআয়তী আল-উন্দোলুসী (রহ.)

৬। ইউসুফ ইব্‌ন উমর ইব্‌ন আবদুল বার(রহ.)

৭। আবু মোহাম্মাদ আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবু যায়িদ আবদুর রহমান নাকরী আল-কীরওয়ালী (রহ.)

৮। আবু সাঈদ খালাফ ইব্‌ন আবুল কাসিম আযদী ওরফে বরদাঈ (রহ.)

৯। আবু বকর মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ওরফে আবু যিমনীন আল-বীরী (রহ.)

১০। আবু বকর মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ আবহুরী (রহ.)

এ যুগের শাফিঈ মাযহাবের ফুকাহায়ে কিরাম যারা এ মাযহাবের প্রচার ও প্রসারে বিরাট অবদান রেখেছেন, তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন[২]:

১। আবু ইসহাক ইবরাহীম ইব্‌ন আহমাদ মিরওয়াযী (রহ.)

২। আবু আহমাদ মুহাম্মাদ ইবন সাঈদ ইব্‌ন আবুল কাযী খাওয়ারিযমী (রহ.)

৩। আবু আলী হুসায়ন ইব্‌ন হুসায়ন ওরফে ইব্‌ন আবু হোরায়রা (রহ.)

৪। আবুস্‌ সায়িব উতবা হুসায়ন ওরফে ইব্‌ন আবু হুরায়রা (রহ.)

৫। মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসমাঈল (রহ.)

এ যুগে হাম্বলী মাযহারে অনুসারী ফুকাহায়ে কেরাম যাঁরা এর মাযহাবের প্রচার ও প্রসারে অবদান রেখেছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন[৩]:

১। শায়খুল ইসলাম আবু ইসমাঈল আবদুল্লাহ্‌ ইবন মুহাম্মদ হিরুবী আল্‌-আনসারী (রহ.)

২। হাফিয শামসুদ্দীন আবুল ফারাহ আবদুর রহমান ইব্‌ন আলী আল-বাগদাদী (রহ.)[১]

[১] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৭-১৬২
[২] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬২-১৬৮
[৩] আবু ছাইদ মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৮

৬ষ্ঠ পর্যায়: প্রকৃত তাকলীদের যুগ

হিজরী সপ্তম শতকের প্রারম্ভ থেকে এ যুগের সূচনা হয়। এ যুগে কুরআন-হাদীস ঘেটে শরয়ী মাসআলা বের করার মত যোগ্যতাসম্পন্ন লোক ক্রমেই হ্রাস পেতে থাকে। ফলে ইজতিহাদ প্রক্রিয়াও কমতে শুরু করে। যেকারণে আলেমগণ এবং জনসাধারণ সকলেই প্রসিদ্ধ ইমামগণের অনুসরণ করতে আরম্ভ করেন। এযুগে এমনকি মাসআলার বাখ্যা এবং অনুশীলনেরও প্রয়োজন পড়ে না। কারণ এর পূর্ববর্তী যুগের ফিকহের ইমামগণ একটি পূর্ণাঙ্গ ফিকহ শাস্ত্র বা ইসলামী আইন শাস্ত্র তৈরী করে গিয়েছেন। যাতে মানব জীবনের প্রায় সকল সমস্যার সমাধান দেওয়া হয়েছে।[২]

তবে ইসলামে যেমনিভাবে ইজতিহাদের দ্বার অবরূদ্ধ নয় এমনভাবে বল্গাহীন ইজতিহাদেরও সুযোগ নেই। এ যুগে কয়েকজন বিশিষ্ট আলিমই দরজায়ে ইজতিহাদে পৌঁছেছিলেন। তবে তা ছিল এ যুগের প্রথমার্ধের দিকে। যেমন হানাফী মাযহাবে আল্লামা কামাল ইব্ন হুমাম (রহ.), আল্লামা জামালুদ্দীন যায়লাঈ (রহ.) এবং আল্লামা কামাল ইবনে পাশা (রহ.) প্রমুখ, মালিকি মাজহাবে আল্লামা ইব্ন দাকীকুল ঈদ (রহ.) প্রমুখ, শাফিঈ মাযহাবে আল্লামা ইযযুদ্দীন আবদুস সালাম(রহ.) শায়খ তাকী উদ্দীন সুয়ুকী (রহ.), আল্লামা জালালুদ্দীন সূয়ূতী (রহ.) ও শায়খ জালালুদ্দীন মুহাল্লী (রহ.) প্রমুখ এবং হাম্বলী মাযহাবের আল্লামা ইবন তায়মিয়া (রহ.) ও আল্লামা ইব্ন কায়্যিম (রহ.) প্রমুখ। তাঁরা নিজ নিজ ইমামের মূলণীতি অনুসারে কিতাবাদি রচনা করে ফিকহের ক্রম বিকাশের এ ধারাকে অব্যহত রেখেছেন।[৩]

---

[১] *তারিখে ফিকহে ইসলামী*, দারুল ইমামত, মৌলভী মুসাফির খানা, করাচী, পাকিস্তান, পৃ.৪০১-৪১৫

[২] আবু ছাইদ মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৬৯-৭১

[৩] মুহাঃ গোলাম ছরোয়ার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৬

ইসলামী আইন বা শরী'আতের উৎস

সকল ইমাম এ ব্যাপারে একমত যে, ইসলামী আইনের প্রধান উৎস কুরআন এবং সুন্নাহ। এ দুটি উৎসকে অহী ভিত্তিক উৎস বলা হয়। কুরআন কারীমের একাধিক আয়াতে কুরআন ও সুন্নাহকে স্পষ্ট ভাষায় ইসলামী আইনের উৎস হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। এছাড়া আরও যে উৎসগুলো রয়েছে তা নিয়ে ইমামদের মাঝে মতভেদ আছে। আল্লামা নাজমুদ্দিন তুফি মোট ১৯ টি উৎসের কথা উল্লেখ করেছেন।[১] ড. আহমাদ আবদুর রহীম আস-সিয়াহ মোট ৪৫ টি উৎসের কথা বলেছেন।[২]

ইসলামী আইনের উৎসসমূহকে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে বিভিন্ন প্রকারে ভাগ করা হয়েছে। যেমন কিছু উৎস আছে বর্ণনাভিত্তিক, কুরআন, সুন্নাহ, উরফ, সাহাবীদের বর্ণনা ইত্যাদি বর্ণনাভিত্তিক। কিয়াস, মাসালিহ, ইসতিহসান ইত্যাদি ইসলামী আইনের বুদ্ধিভিত্তিক উৎস।[৩] আধুনিক ইসলামী আইনবিদগণ ইসলামী আইনের উৎসকে মোটাদাগে দুই ভাগে ভাগ করেছেন।

১. মৌলিক উৎস

২. সম্পূরক উৎস

১.মৌলিক উৎস

ইসলামী আইন তথা শরীয়া আইনের মৌলিক উৎস চারটি। যথা-

১. কুরআন ২. সুন্নাহ ৩. ইজমা ও ৪. কিয়াস।

এগুলোকে মুত্তাফাকুন আলাইহি মূলনীতি বলা হয়।[৪] সমগ্র ফকীহ এ ব্যাপরে ঐকমত্যে উপনীত হয়েছেন যে, কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস দ্বারা যেসব হুকুম প্রমাণিত তা মেনে চলা ওয়াজিব। কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللهَ وَ اَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَ اُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِىْ شَىْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللهِ
وَ الرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّ اَحْسَنُ تَاْوِيْلًا

“হে মুমিনগণ, তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর ও আনুগত্য কর রাসূল (সা.)-এর এবং তোমাদের মধ্য থেকে কর্তৃত্বের অধিকারীদের। অতঃপর কোন বিষয়ে যদি তোমরা মতবিরোধ কর তাহলে তা আল্লাহ ও রাসূল (সা.)-এর দিকে অর্পণ কর– যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখ। এটি উত্তম এবং পরিণামে উৎকৃষ্টতর।”[৫]

---

[১] মুহাম্মদ রহমাতুল্লাহ খন্দকর, *মাকাসিদ আশ্ শরী'আহ ও ইসলামের সৌন্দর্য*, মুক্তদেশ, ঢাকা : ২০১৫, পৃ. ৩৮

[২] নাজমুদ্দিন আত-তুফি, *রিসালাতুন ফি রিআয়াতিল মাসলিহা*, বিশ্লেষণ : ড. আহমাদ আবদুর রহীম আস-সিয়াহ, দারুল মিসরিয়্যাহ লিবানিয়্যাহ, লেবানন : পৃ. ১৩-২১

[৩] ড. মুহাম্মদ রুহুল আমিন, *ইসলামী আইনের উৎস*, বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার, ঢাকা : ২০১৭, পৃ. ৩৭

[৪] সম্পাদনা পরিষদ, *ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন*, ঢাকা : ইসলামমিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৬ খ্রি., পৃ. ২১৩

[৫] আল কুরআন, ৪ : ৫৯

উপরিউক্ত আয়াতে বর্ণিত আল্লাহর আনুগত্য মানে আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ কিতাব আল কুরআনের আনুগত্য। রাসূল (সা.)-এর আনুগত্য মানে রাসূল (সা.)-এর সুন্নাত বা হাদীসের আনুগত্য। আর أُولِى الْأَمْرِ বলতে মুসলমানদের মধ্যে মুজতাহিদদের ঐকমত্য বা ইজমাকে বুঝানো হয়েছে। আর বিতর্কিত বিষয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা.)-এর দিকে প্রত্যাগমনের অর্থ হলো যেখানে নস ও ইজমা নেই সেখানে কিয়াস করার প্রতি আদেশ করা হয়েছে।[১]

এ আয়াত দ্বরা প্রমাণিত হয় যে, মহান আল্লাহ আমাদেরকে কুরআন, হাদীসের সাথেসাথে ইজমা ও কিয়াসও অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। এ কারণেই সকল ইমামগণ এ চারটি বিষয় শরীয়াতের উৎস হওয়ার ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করেছেন।

২. সম্পূরক উৎস

মৌলিক চারটি উৎসের বাইরে আরো কয়েকটি উৎস রয়েছে। সেগুলো হলো-

১. ইসতিহসান (অনুমোদিত আইন)

২. ইসতিসলাহ (জনকল্যাণমূলক)

৩. ইসতিসহাব (পূর্বের বিধান অক্ষুন্ব রাখা)

৪. ইসতিদলাল

৫. আল মুসলিহাত

৬. মাসালিহুল মুরসালাহ

৭. সাদ্দুয্ যরায়ে (অন্যায়ের উপকরণ রোধকরণ)

৮. উরফ (প্রথা)

৯. পূর্ববর্তী নবীগণের শরীয়াত। এগুলোকে মুখতালাফ ফীহ মূলনীতি বলা হয়।[২]

এ উৎসগুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরা হলো–

---

[১] মুহাম্মদ ছালাহ উদ্দিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮

[২] সম্পাদনা পরিষদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১৩

১. আল কুরআন (কিতাবুল্লাহ)

আল্লাহ তায়ালা মানব জাতির হেদায়েতের লক্ষ্যে তাঁর মনোনীত রাসূলদের নিকট কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে মহানবী (সা.)-এর উপর অবতীর্ণ আসমানী কিতাবের নামই আল-কুরআন। আরও ব্যাপকভাবে বললে আল কুরআন বলতে আল্লাহ তা'আলার সে কালামকে বুঝানো হয় যা জিবরাঈল (আ.) রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর অন্তরে অর্থসম্বলিত আরবী শব্দাবলীসহ অবতীর্ণ করেছেন। এ কুরআন মাসহাফ আকারে সংকলিত। সূরা ফাতিহা দিয়ে শুরু আর সূরা নাস দ্বারা শেষ। এ কুরআন আমাদের কাছে মুতাওয়াতির সনদে মৌখিকভাবে ও লিখিত আকারে এক প্রজন্ম হতে অপর প্রজন্ম পর্যন্ত পৌঁছেছে। তাতে কোন ধরনের পরিবর্তন পরিবর্ধন বা বিকৃতি ঘটেনি। এবং কিয়ামত পর্যন্ত ঘটবে না।[১] কারণ তার হিফাযতের দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ পাকই নিয়েছেন,

اِنَّا نَحۡنُ نَزَّلۡنَا الذِّكۡرَ وَ اِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوۡنَ

"নিশ্চয় আমি কুরআন নাযিল করেছি, আর আমিই তার হেফাযতকারী।"[২]

আল কুরআন পরিচিতি

আল-কুরআন (القران) শব্দটি قرأ-يقرأ ক্রিয়ার বাব فتح-يفتح এর قرن মূলধাতু থেকে উৎকলিত। আভিধানিক অর্থ হচ্ছে : পড়া, অধ্যয়ন করা, আবৃত্তি করা, পঠিত বা আবৃত্ত, একত্রিত করা, মিলিত হওয়া বা অন্তর্ভুক্ত করা, অধিক পঠিত ইত্যাদি।[৩]

ইমাম শাফেয়ী, ফাররা ও আবুল হাসান (রহ.) বলেন, কুরআন (قران) শব্দটি হামযা-বিহীন পড়তেন। ইমাম শাফেয়ী কুরআন (قران) কোনো শব্দ থেকে গঠিত নয় বলেও অভিমত ব্যক্ত করেছেন। অপর এক বর্ণনা মতে কুরআন (قران) শব্দটি কিরআতুন (قراة) থেকে উদ্ভূত, যা মাকরুউন (مقروء) এর অর্থে ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ পঠিত বিষয়। পূর্ববর্তী নবীদের উপর অবতীর্ণ হতো লিখিত কিতাব; কিন্তু হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর উপর অবতীর্ণ হয় পঠিত কিতাব। কারণ হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস্ সালাম রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে তাঁকে মহান আল্লাহর কালাম পড়ে শুনাতেন। ইরশাদ হচ্ছে,

تَنۡزِيۡلُ الۡكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الۡعَزِيۡزِ الۡعَلِيۡمِ

"মহা পরাক্রমশালী মহাজ্ঞানী আল্লাহর পক্ষ থেকে এই কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে।"[৪]

অপর আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে,

اَفَلَا يَتَدَبَّرُوۡنَ الۡقُرۡاٰنَ ؕ وَ لَوۡ كَانَ مِنۡ عِنۡدِ غَيۡرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوۡا فِيۡهِ اخۡتِلَافًا كَثِيۡرًا

"তারা কি আল কুরআন নিয়ে গবেষণা করে না? এটা যদি আল্লাহ ব্যতীত অপর কারো পক্ষ থেকে হতো, তবে এতে অবশ্যই বহু বৈপরীত্য দেখতে পেত।"[৫]

---

[১] মুহাম্মদ ছালাহ উদ্দিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯

[২] আল কুরআন, ১৫ : ৯

[৩] ড. আহমাদ সান্‌বাতী, *তরজুমাতুল মা'আনিল কুরআনিয়্যাহ*, কাতার : মাতাবি'আদ দা'ওয়াতুল হাদীছাহ, তাবি, পৃ. ৩৮

[৪] আল কুরআন, ৪০ : ২

[৫] আল কুরআন, ৪ : ৮২।

পবিত্র কুরআন কারীম অবতীর্ণ হয়েছে মানব জাতিকে আত্মিক ও নৈতিক প্রশিক্ষণ দেওয়ার লক্ষ্যে। আল-কুরআনের ভাব, ভাষা, মর্ম ও বিষয়বস্তু সবকিছুই আল্লাহ তা'আলার নিজের। এ গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে পূর্ববর্তী সকল নবী-রাসূলের দাওয়াত ও কর্মপদ্ধতি, শরিয়ত এবং সকল আসমানি গ্রন্থের সারনির্যাস। মহান আল্লাহ এ সম্পর্কে বলেন,

وَ مَا كَانَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ اَنْ يُّفْتَرٰى مِنْ دُوْنِ اللهِ وَ لٰكِنْ تَصْدِيْقَ الَّذِىْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَ تَفْصِيْلَ الْكِتٰبِ لَا رَيْبَ فِيْهِ مِنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ

"এ কুরআন আল্লাহ ছাড়া অপর কারো রচনা নয়। এর পূর্বে যেসব আসমানি কিতাব অবতীর্ণ হয়েছিল, তার সমর্থনকারী। এটা বিধিবিধানসমূহের বিশদ ব্যাখ্যাদানকারী। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, এটা বিশ্ব প্রভুর পক্ষ হতে অবতারিত গ্রন্থ।"[১]

কুরআনের বাহক মহানবী (সা.) বলেন, "আল-কুরআন আল্লাহর রজ্জু। আল্লাহর পক্ষ থেকে অতি উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা, কল্যাণময় প্রতিষেধক। যে সাদরে সযত্নে কুরআনকে আঁকড়ে ধরবে সে সম্মান পাবে এবং যে অনুসরণ করবে, সে মুক্তির রাজপথ পাবে।"[২]

আল-কুরআনের পরিচয় প্রসঙ্গে রাসূল (সা.) বলেন, "আল্লাহর কিতাব যাতে তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিসমূহের সংবাদ রয়েছে। তোমাদের পরবর্তী অবস্থা সম্পর্কে বিবরণ আছে। তোমাদের পার্থিব জীবনের হালাল-হারাম ইত্যাদি বিষয়ের নির্দেশ আছে। এটা এমন এক চূড়ান্ত পার্থক্যকারী (হক ও বাতিলের মধ্যে) এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ গ্রন্থ যাতে অসামঞ্জস্যপূর্ণ কোনো কিছুই নেই। অহংকারবশত যে ব্যক্তি এটিকে পরিত্যাগ করবে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দেবেন। যে এটা ব্যতীত অন্যত্র হিদায়াত কামনা করবে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে পথভ্রষ্ট করে দিবেন। এটি আল্লাহ্ প্রদত্ত মজবুত রজ্জু বা রশি। এটি বিজ্ঞানপূর্ণ স্মারক। এটি সিরাতুল মুসতাকীম তথা সহজ-সরল পথ। এটি এমন এক গ্রন্থ যাকে প্রবৃত্তির অনুসারীরা পরিবর্তন করতে সক্ষম হবে না। এমন কি অন্য কোনো ভাষা অথবা কোনো কিছুর সাথে সংমিশ্রিত হবে না। এর অধ্যয়ন ও জ্ঞানান্বেষণে আলিমগণ পরিতৃপ্ত হবে না। পুনঃ পুনঃ তিলাওয়াতে এর স্বাদ হ্রাস পাবে না। এর অভিনবত্বের পরিসমাপ্তি ঘটবে না।..."[৩]

কুরআন কারীমের একটি বিশেষ পরিচয় হচ্ছে, "এ মহান গ্রন্থ মহান আল্লাহ্র পক্ষ থেকে বিশ্বস্ত ফেরেশতা জিব্রাঈল আ.-এর মাধ্যমে নাযিলকৃত কিতাব যা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি নাযিল করা হয়েছে।"[৪] এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "নিশ্চয় এ কুরআন রাব্বুল আলামীনের নাযিলকৃত; বিশ্বস্ত ফেরেশতা জিব্রাঈল একে নিয়ে এসেছেন-আপনার অন্তরে, যাতে আপনি সতর্ককারী হতে পারেন, (তা নাযিল করা হয়েছে) সুস্পষ্ট আরবী ভাষায়।"[৫] বিখ্যাত ইসলামিক স্কলার ড. সুবহী সালিহ বলেন, এটা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর নাযিলকৃত এমন এক মু'জিজাপূর্ণ বাণী যা মাসাহিফে লিপিবদ্ধ, তাঁর থেকে ধারাবাহিকভাবে বর্ণিত এবং যার তিলাওয়াত ইবাদত হিসেবে পরিগণিত।[৬]

---

[১] আল কুরআন, ১০ : ৩৭
[২] ইমাম বায়হাকী, *শুআবুল ঈমান*, হিন্দ : দারে সালাফিয়্যা, ১৪২৩ হি., খ. ৩, পৃ. ৩৩৩, হাদীস নং : ১৭৮৬
[৩] ইমাম বায়হাকী, *প্রাগুক্ত*, খ. ৩, পৃ. ৩৩৫, হাদীস নং-১৭৮৮
[৪] মুহাম্মদ ছালাহ উদ্দিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০
[৫] আল কুরআন, ২৬ : ১৯২-১৯৫
[৬] ড. সুবহি সালিহ, *মাবাহিছ ফী 'উলূমিল কুরআন*, মিশর : দারুর ইলম, ২০০০, খ. ১, পৃ. ২১

বিখ্যাত উসূলবিদ মান্না-আল-কাত্তান বলেন,

هو كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته -

"কুরআন আল্লাহ্ তা'আলার কালাম। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর এটা অবতীর্ণ হয়েছে। এর তিলাওয়াত করা 'ইবাদত হিসেবে গণ্য।"[১]

আল-কুরআন এর সংজ্ঞা সম্পর্কে ফিকহ ও উসূলবিদদের দৃষ্টিভঙ্গি হলো:

انه اللفظ المنزل على النبى صلى الله عليه من اول الفاتحة الى اٰ خر سورة الناس -

"নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর অবতীর্ণ প্রথম সূরা "ফাতিহা" থেকে শেষ সূরা "নাস" পর্যন্ত সকল বাণীই হলো আল-কুরআন।"[২]

আল্লামা যারকানী বলেন,

ان القراٰ ن علم اى كلام ممتاز عن كل ما عداه من الكلام الالهى

"আল-কুরআন হলো আল্লাহর অন্যান্য কালাম বা বাণী থেকে পৃথক অনন্য উৎকৃষ্ট এক ধরনের বাণী যা তার পূর্ববর্তী সকল অহি থেকে মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।"[৩]

আল্লামা নাসাফী (রহ.) কুরআনের সংজ্ঞা প্রদান করেছেন এভাবে :

اما الكتاب فالقران المنزل على الرسول عليه السلام المكتوب فى المصاحف المنقول عنه نقلا متواترا بلا شبهة

"কিতাব হলো কুরআন, যা রাসূল (সা.)-এর উপর অবতীর্ণ হয়েছে, এটি মাসাহিফের মধ্যে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, আর এটি রাসূল (সা.) থেকে মুতাওয়াতির পর্যায়ে এমনভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, যাতে কোনো প্রকার সন্দেহের অবকাশ নেই।"[৪]

ইমাম রাগিব ইসফাহানী লিখেছেন, "কুরআন' শব্দটি একমাত্র হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর উপর নাযিলকৃত কিতাবের নামের জন্যই নির্দিষ্ট রয়েছে। যেমন 'তাওরাত' শব্দটি মূসা (আ.) এবং 'ইনজীল' শব্দটি ঈসা (আ.)-এর উপর নাযিলকৃত গ্রন্থদ্বয়ের জন্য নির্দিষ্ট রয়েছে।"[৫]

ড. মুহাম্মদ মুস্তফা আয-যুহাইলী বলেন, কুরআন আল্লাহর বাণী, যা আমাদের নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর উপর আরবী ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে, নিরবচ্ছিন্ন বর্ণনাধারায় আমাদের পর্যন্ত পৌঁছেছে, যা গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ এবং তার তিলাওয়াত ইবাদত হিসেবে গণ্য; সূরা আল-ফাতিহা দ্বারা শুরু হয়ে সূরা আননাস দ্বারা যা সমাপ্ত।[৬]

---

[১] মান্না' আল-কাত্তান, *মাবাহিছ ফী 'উলূমিল কুরআন*, মিশর : মাকতাবাতুল মাআরেফ, ১৪২১ হি, খ.১, পৃ. ১৭
[২] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০
[৩] মুহাম্মদ আব্দুল আযীম আয-যারকানী, *মানাহিলুল 'ইরফান ফী 'উলূমিল কুরআন*, হালব : মাতবাআতু ইশা আলবালী, তাবি, খ. ১, পৃ. ১৭
[৪] আলী ইবন আহমদ আল-জুরজানী, *আত-তা'আরিফাত*, ইস্তাম্বুল : মাতবা'আহ আহমাদ কামিল, ১৩২৭ হি., পৃ. ২২৩
[৫] ইমাম রাগিব ইসফাহানী, *আল মুফরাদাত ফী গারীবিল কুরআন*, পৃ. ৪০১-০২
[৬] ড. মুহাম্মদ মুস্তফা আয-যুহাইলী, *আল-ওয়াজীয ফী উসূলিল ফিকহিল ইসলামী*, দামেশক : দারুল খাইর, ২০০৩ ইং, পৃ. ১৩৯

২. সুন্নাহ (আল-হাদীস)

সুন্নাহ ইসলামী শরীয়াতের দ্বিতীয় উৎস। ইসলামী শরীয়াতে কুরআনের পরেই সুন্নাহ এর স্থান। নবী কারীম (সা.)-এর কথা, কাজ, মৌন অনুমোদনকে সুন্নাহ বলা হয়। শরীয়াতের মাসআলা নির্ধারণে সুন্নাতের গুরত্ব অত্যধিক। রাসূলুল্লাহ (সা.) ও তাঁর নবুওয়তী জীবন সম্পর্কে জানা, বুঝা এবং সে অনুযায়ী কার্য পরিচালনার জন্য হাদীসের গুরুত্ব অপরিসীম।

আভিধানিক অর্থ

সুন্নাহ শব্দটি কর্মপন্থা, পদ্ধতি, রীতি- নীতি, পদ্ধতি, স্বভাব, আচরণ, পরিণতি, বিধান ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়।[১] আল মুফরাদাত গ্রন্থের প্রণেতা গরীবুল কুরআনে উল্লেখ করেন, السنن শব্দটি سنة শব্দের বহুবচন। আর রাসূল (সা.)-এর সুন্নাত, এ কথার অর্থ রাসূল (সা.)-এর আদর্শ যা তিনি পালন করতেন। আল্লাহর সুন্নাত এ কথার অর্থ, আল্লাহর পথ ও পদ্ধতি, তার হিকমত এবং তার আনুগত্যের নিয়ম ও পদ্ধতি। 'সুন্নাহ' এ অর্থেই কুরআন ও হাদীসের একাধিক স্থানে ব্যবহৃত হয়েছে।[২] যেমন- পবিত্র কুরআনুল করীমে মহান আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ ۙ فَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ

তোমাদের পূর্বে অতীত হয়ে গেছে অনেক ধরনের জীবন পদ্ধতি, রীতি ও নীতি। তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর এবং দেখ- যারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে তাদের পরিণতি কী হয়েছে।[৩]

অত্র আয়াতে سنن শব্দটি سنة সুন্নাহ এর বহুবচন, এ শব্দটি এখানে জীবন পদ্ধতি ও রীতি-নীতি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সুন্নাহ سنة শব্দটি একই অর্থে হাদীসেও বহুবার ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন–

عَنْ اَ بِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلي اللهُ عليه وَسَلَّمَ لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا فِي جُحْرِ ضَبٍّ لاَ تَّبَعْتُمُوهُمْ قُلْنَا يَا رَسُ ولَ اللهِ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى؟ قَالَ: فَمَنْ ؟

আবু সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : "তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তী জাতির রীতি-নীতি বিঘতে-বিঘত, হাতে-হাত অর্থাৎ হুবহু অনুসরণ করবে, এমনকি তারা গুই সাপের গর্তে প্রবেশ করলে তোমরাও তাদের অনুসরণ করে একই গর্তে প্রবেশ করবে। আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! পূর্ববর্তী জাতি বলতে কি ইয়াহুদ ও নাসারা? তিনি বললে, তাহলে আবার কারা?"[৪]

এ হাদীসে لتتبعن سنن এর মধ্যে سنن শব্দটি সুন্নাহ (سنة)অর্থাৎ রীতি-নীতি ও জীবন পদ্ধতি অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। এরূপ আরও বহু হাদীসে এসেছে।

---

[১] ইব্‌ন মানযূর, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬খ. পৃ.৩৯৫-৪০৪
[২] মুহাম্মদ ছালাহ উদ্দিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪১
[৩] আল কুরআন, ৩ : ১৩৭
[৪] ইমাম মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আন নিশাপুরী, *আস সহিহ*, বৈরুত : দারে এহইয়া আত তুরাস আল আরাবী, তাবি, খ. ৪, পৃ. ২০৫৪, হাদীস নং : ২৬৬৯

পারিভাষিক অর্থ

উসূলবিদদের পরিভাষায়, সুন্নাহ হলো ঐ সকল উক্তি, কাজ বা স্বীকৃতি যা রাসূলুল্লাহ (সা.) হতে বর্ণিত। অর্থাৎ যা দ্বারা কোন শরীয়া হুকুম প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়।[১] ফকীহগণের পরিভাষায় ফরজ ও ওয়াজিব ছাড়া রাসূলুল্লাহ (সা.) হতে যে শারয়ী হুকুম প্রমাণিত তা হলো সুন্নাহ। শরীয়াতের পাঁচটি হুকুমের মধ্যে সুন্নাহ ফরজ ও ওয়াজিব এর মোকাবিলায় ব্যবহৃত হয়।[২]

ইসলামী শরীয়াতের পরিভাষায়, কুরআন ব্যতীত রাসূলুল্লাহ (সা.) থেকে যা কিছু এসেছে, তার বক্তব্য, কাজ ও নীরব সম্মতির সমষ্টিই সুন্নাহ।[৩] মুহাদ্দিসগণের মতে, তাই হলো সুন্নাত যা শরীয়াতের দলীলরূপে প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত। হয় তা কুরআনে থাকুক, অথবা নবী করীম (সা.) হতে বর্ণিত হয়ে থাকুক, কিংবা তা সাহাবা কেরামের ইজতিহাদ দ্বারা সাব্যস্ত হয়ে থাকুক।[৪]

আশ-শাওকানি বলেন, ব্যাপক পরিসরে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ইশারা-ইঙ্গিত, চিঠিপত্র, চুক্তিনামা, সন্ধি ইত্যাদি এর সবকিছুই সুন্নাহভূক্ত।[৫]

শরীয়াতের উৎস হিসেবে সুন্নাহ

ক. পবিত্র কুরআনের আলোকে সুন্নাহ ইসলামের মৌলিক উৎসসমূহের একটি। এ প্রসঙ্গে কুরআন কারীমে পঞ্চাশের অধিক আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। যেমন মহানবী (সা.)-এর সামগ্রিক নির্দেশনাকে অনুসরণ ও নিষেধাজ্ঞাকে বর্জনের নির্দেশ প্রদান করে মহান আল্লাহ বলেন,

وَمَا اٰ تَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْه فَانتَهُوا

অর্থাৎ, এবং রাসূলুল্লাহ তোমাদের নিকট যা নিয়ে এসেছেন তা গ্রহণ কর এবং যা হতে তোমাদের নিষেধ করেন তা হতে বিরত থাক।[৬]

মহানবী (সা.)-এর আনুগত্য প্রকাশ ও তাঁর অনুসরণের জন্যেও কুরআনে নির্দেশ রয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন,

وَ اَ طِيعُوا اللهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُون

অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহ্ ও রাসূল (সা.)-এর আনুগত্য কর, নিশ্চয়ই তোমরা রহমতপ্রাপ্ত হবে।[৭]

مَّن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اَ طَاعَ اللهَ

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি রাসূল (সা.)-এর আনুগত্য করল বস্তুত সে আল্লাহরই আনুগত্য করল।[৮]

قُلْ اِ نْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللهَ فَا تَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَاللهُ غَفُوْرٌ رَحِيْم

---

১ ড. মুসতাফা হুসনী আস্-সুবায়ী, *ইসলামী শরীয়াহ ও সুন্নাহ*, অনু. এ,এম,এম সিরাজুল ইসলাম, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৯, পৃ. ১

২ ড. ওয়াহাবাহ আয-যুহাইলী, *উসূলুল ফিকহীল ইসলামী*, দরুল খাইর, দামেশক: ২০০৩, খ. ১, পৃ. ৪৩২

৩ আবদুল করিম যায়দান, *আল-মাদখালা লি দিরাসাতিশ শারইয়্যা আল-ইসলামিয়া*, খ. ৪, পৃ. ১০৪

৪ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২

৫ মুহাম্মদ ইবনে আলী আশ্-শাওকানী, *ইরশাদুল ফুহুল*, দারুল ফাদিলাহ, রিয়াদ : ২০০০, খ. ১, পৃ. ১৮৬

৬ আল কুরআন, ৫৯ : ৭

৭ আল কুরআন ৩ : ১৩২

৮ আল কুরআন ৪ : ৮০

অর্থাৎ, আপনি বলে দিন, যদি তোমরা একান্তই আল্লাহকে ভালোবাস, তবে আমার আনুগত্য কর, আল্লাহ্ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তিনি তোমাদের গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেবেন।[১]

মহানবী (সা.)-এর আদেশ-নিষেধ প্রতিপালন ও তাঁর আনুগত্য প্রকাশের ক্ষেত্রে সুন্নত বা হাদীসের জ্ঞান অর্জন অপরিহার্য। উপরে উল্লিখিত আয়াত ব্যতীত আরও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক আয়াতে সুন্নাহকে শরীয়াতের উৎস হিসেবে সাব্যস্ত করা হয়েছে। তার মধ্যে অন্যতম হলো, সূরা আলে ইমরান : ৩২, সূরা আনফাল : ২৪, সূরা নূর : (৪৭-৫৪), ৬২, আল আহযাব : ৩৬, সূরা নূর : ৬২ ও ৬৩ ইত্যাদি।

সুন্নাহর প্রামাণ্যতার একটি বড় প্রমাণ হচ্ছে মহানবী (সা.)-এর অনুপম আদর্শ। পবিত্র কুরআনে যার স্বীকৃতি ও অনুসরণের নির্দেশ রয়েছে। যেমন- মহান আল্লাহ বলেন,

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللهَ وَ الْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَ ذَكَرَ اللهَ كَثِيْرًا

তোমাদের জন্য আল্লাহর রসূলের মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে যারা আল্লাহ ও শেষ দিনের আশা রাখে আর আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে। [২]

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আদর্শ সম্পর্কে জানা ও তার অনুসরণের ক্ষেত্রে সুন্নাহ-এর বিকল্প নেই। এছাড়া মহানবী (সা.) সম্পর্কে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামায়াতের আকিদা এই যে, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতিটি কথা, কাজ ও অনুমোদন শরীয়াতের অকাট্য দলীল। তিনিসহ সকল নবী-রাসূলই মাসুম অর্থাৎ নিষ্পাপ। তাঁরা সকলেই সর্ব প্রকারের ভুল-ত্রুটি ও অনিশ্চয়তা থেকে মুক্ত। এটি ইজমায়ে উম্মাহ দ্বারা স্বীকৃত।

মহান আল্লাহ বলেন,

وَ لَوْ لَآ اَنْ ثَبَّتْنٰکَ لَقَدْ كِدْتَّ تَرْكَنُ اِلَيْهِمْ شَيْـًٔا قَلِيْلًا

আর আমি যদি তোমাকে অবিচল না রাখতাম, তবে তুমি তাদের প্রতি কিছুটা ঝুঁকে পড়তে।[৩]

মহানবী (সা.) আল্লাহর নিকট পূর্ণাঙ্গরূপে আত্মসমার্পণ করেছিলেন। তিনি স্বপ্রণোদিত হয়ে বা নিজ থেকে কোনো কাজই করতেন না এমনকি কোনো কথাও বলতেন না। বরং তিনি তাই বলতেন বা করতেন যা মহান আল্লাহ তাঁকে নির্দেশ করতেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

وَ مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى .اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُّوْحٰى

"আর তিনি (মুহাম্মদ (সা.) খেয়ালের ছলে কথা বলেন না। বরং তা ওহী যা নাযিল করা হয়।"[৪] মহান আল্লাহর এই ঘোষণাও হাদীসের গ্রহণযোগ্যতা ও প্রামাণ্যতারই প্রমাণ বহন করছে।

এক্ষেত্রে আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে, পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ মহানবী (সা.)-এর সব ধরনের পবিত্রতার সাক্ষ্য দেওয়া হয়েছে। যেমন-

---

[১] আল কুরআন, ৩ : ৩১
[২] আল কুরআন, ৩৩ : ২১
[৩] আল কুরআন, ১৭ : ৭৪
[৪] আল কুরআন, ৫৩ : ৩-৪

সর্বাঙ্গীণ পবিত্রতার অধিকারী

মহানবী (সা.) ছিলেন সর্বাঙ্গীণ পবিত্রতার অধিকারী এবং আদর্শ মানুষের সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত। ইরশাদ হয়েছে,

وَ اِنَّکَ لَعَلٰی خُلُقٍ عَظِیۡمٍ

নিশ্চয়ই আপনি মহান আদর্শের ওপর প্রতিষ্ঠিত।[১]

সর্বাঙ্গীণভাবে পূতপবিত্র নবী (সা.)-এর অনুসরণই মানবজাতিকে মুক্তির পথ দেখাতে পারে। আল্লাহ বলেন,

رَّسُوۡلًا یَّتۡلُوۡا عَلَیۡکُمۡ اٰیٰتِ اللّٰہِ مُبَیِّنٰتٍ لِّیُخۡرِجَ الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَی النُّوۡرِ

একজন রাসূল, যিনি তোমাদের কাছে আল্লাহর সুস্পষ্ট আয়াতগুলো পাঠ করে, যারা মুমিন ও সৎকর্মপরায়ণ তাদের অন্ধকারথেকে আলোর পথে আনার জন্য।[২]

চিন্তা ও মননের পবিত্রতা

মহানবী (সা.)-এর চিন্তা, ভাবনা ও মেধাশক্তি ছিল পঙ্কিলতামুক্ত। আল্লাহ বলেন,

مَا ضَلَّ صَاحِبُکُمۡ وَ مَا غَوٰی

তোমাদের সঙ্গী বিভ্রান্ত নয়, বিপথগামীও নয়।[৩]

পবিত্র পথের দিশা দানকারী

রাসূলুল্লাহ (সা.) মানুষকে সরল ও সঠিক পথ প্রদর্শন করেছেন। ইরশাদ হয়েছে,

وَ اِنَّکَ لَتَہۡدِیۡۤ اِلٰی صِرَاطٍ مُّسۡتَقِیۡمٍ

আপনি তো কেবল সরল সঠিক পথ প্রদর্শন করেন।[৪]

কথা, বচন ও শ্রবণশক্তির পবিত্রতা

মহানবী (সা.) কথাবার্তায় সংযত ও পবিত্র ছিলেন। ইরশাদ হয়েছে,

وَ مَا یَنۡطِقُ عَنِ الۡہَوٰی .اِنۡ ہُوَ اِلَّا وَحۡیٌ یُّوۡحٰی

এবং তিনি মনগড়া কথাও বলেন না। এটাতো ওহি যা তাঁর প্রতি প্রত্যাদেশ হয়।[৫]

পবিত্র কিতাবের ধারক

নবীজি (সা.)-এর ওপর অবতীর্ণকুরআন একটি আলোকদীপ্ত ঐশী গ্রন্থ, যা মানুষকে সঠিক পথ প্রদর্শন করে। আল্লাহ বলেন,

اِنَّ ہٰذَا الۡقُرۡاٰنَ یَہۡدِیۡ لِلَّتِیۡ ہِیَ اَقۡوَمُ وَ یُبَشِّرُ الۡمُؤۡمِنِیۡنَ الَّذِیۡنَ یَعۡمَلُوۡنَ الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَہُمۡ اَجۡرًا کَبِیۡرًا

---

[১] আল কুরআন, ৬৮ : ৪
[২] আল কুরআন, ৬৫ : ১১
[৩] আল কুরআন, ৫৩ : ২
[৪] আল কুরআন, ৪২ : ৫২
[৫] আল কুরআন, ৫৩ : ৩-৪

নিশ্চয়ই এ কুরআন হিদায়াত করে সে পথের দিকে, যা সুদৃঢ় এবং সৎকর্মপরায়ণ মুমিনদের সুসংবাদ দেয় যে তাদের জন্য আছে মহাপুরস্কার।[১]

পবিত্র দ্বীনের ধারক

মহানবী (সা.) পবিত্র দ্বীন ইসলামের ধারক ও বাহক ছিলেন। আল্লাহ বলেন,

هُوَ الَّذِیۡۤ اَرۡسَلَ رَسُوۡلَهٗ بِالۡهُدٰی وَ دِیۡنِ الۡحَقِّ لِیُظۡهِرَهٗ عَلَی الدِّیۡنِ کُلِّهٖ ۙ وَ لَوۡ کَرِهَ الۡمُشۡرِکُوۡنَ

তিনিসেই পবিত্র সত্তা, যিনি তাঁর রাসূলকে পথনির্দেশ ও সত্য দ্বীন সহ প্রেরণ করেছেন। যাতে তা সব দ্বীনের ওপর বিজয়ী হয়। যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে।[২]

ওহি পৌঁছানো ও তা গ্রহণে পবিত্রতা :

মহানবী (সা.) সঠিকভাবে ওহি গ্রহণ ও তা প্রচার করেছেন। আল্লাহ বলেন,

عَلَّمَهٗ شَدِیۡدُ الۡقُوٰی .ذُوۡ مِرَّۃٍ ؕ فَاسۡتَوٰی

তাঁকে শিক্ষা দান করে শক্তিশালী প্রজ্ঞাবান- অতঃপর সে স্থির হয়েছিল।[৩]

দৃষ্টিশক্তির পবিত্রতা :

দৃষ্টিশক্তি নবী (সা.)-কে কখনো বিভ্রান্ত করেনি। আল্লাহ বলেন,

مَا زَاغَ الۡبَصَرُ وَ مَا طَغٰی

তাঁর দৃষ্টিবিভ্রম হয়নি, দৃষ্টি লক্ষ্যচ্যুতও হয়নি।[৪]

অন্তরের পবিত্রতা :

আল্লাহ মহানবী (সা.)-এর অন্তরকে সব ধরনের সংকীর্ণতামুক্ত করেন এবং তাতে প্রশস্ততা দান করেন। ইরশাদ হয়েছে,

اَلَمۡ نَشۡرَحۡ لَکَ صَدۡرَکَ

আমি কি আপনার হৃদয়কে প্রশস্ত করিনি?[৫]

মর্যাদা ও খ্যাতির পবিত্রতা :

আল্লাহ মুহাম্মদ (সা.)-কে পৃথিবীর সর্বোচ্চ সম্মান, মর্যাদা ও খ্যাতি দান করেছেন।কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

وَ رَفَعۡنَا لَکَ ذِکۡرَکَ

এবং আমি আপনার খ্যাতিকে উচ্চ মর্যাদা দান করেছি।[৬]

---

[১] আল কুরআন, ১৭ : ৯
[২] আল কুরআন, ৯ : ৩৩
[৩] আল কুরআন, ৫৩ : ৫-৬
[৪] আল কুরআন, ৫৩ : ১৭
[৫] আল কুরআন, ৯৪ : ১
[৬] আল কুরআন, ৯৪ : ৪

মানবতার বন্ধু

মহানবী (সা.) ছিলেন মানবতার বন্ধু। মানুষ ও মানবতা বিপন্ন হয় এমন বিষয়ে তিনি কষ্ট পেতেন। আল্লাহ বলেন,

لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ

অবশ্যই তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের কাছে এসেছে একজন রাসূল। তোমাদের যা বিপন্ন করে তা তাঁর জন্য কষ্টদায়ক। সে তোমাদের মঙ্গলকামী, মুমিনের প্রতি সে দয়ার্দ্র ও পরম দয়ালু।[১]

ভারমুক্ত জীবন

আল্লাহ মহানবী (সা.) কে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত নিষ্কলুষ ও ভারমুক্ত রেখেছেন। ইরশাদ হয়েছে,

وَ وَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ .الَّذِىْٓ اَنْقَضَ ظَهْرَكَ

আমি অপসারণ করেছি আপনার ভার, যা ছিল আপনার জন্য অতি কষ্টদায়ক।[২]

উপরে উল্লিখিত প্রতিটি আয়াতে মহানবী (সা.)-এর অনুপম গুণাবলী, মর্যাদা শ্রেষ্ঠত্বের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং তাঁর আদর্শ ও গুণাবলী চর্চার মধ্যেই রয়েছে মানবতার কল্যাণ। সুন্নাহর মাধ্যমেই তাঁর পূর্ণাঙ্গ আদর্শ সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া যায়। সুতরাং এ দৃষ্টিকোণেও সুন্নাহর গ্রহণযোগ্যতা প্রমাণিত।

খ. মহানবী (সা.) অসংখ্য হাদীসে কুরআনের পাশাপাশি তার সুন্নাহকেও আঁকড়ে ধরার নির্দেশ দিয়েছেন। এমন কথাও বলেছেন যে, কেউ যদি পথভ্রষ্টতা থেকে বাঁচতে চায় তাহলে সে যেন প্রতমত: কিতাবুল্লাহ; দ্বিতীয়ত: সুন্নাহ-এর পূর্ণঙ্গ অনুসরণ করে। সুন্নাহতে এমন আহকাম রয়েছে যা কুরআনে বর্ণিত হয়নি, তাছাড়া সুন্নাহ দ্বারা যে সব আহকাম প্রতিষ্ঠিত হয়, তা কুরআনের প্রতিষ্ঠিত আহকামের ন্যায় গ্রহণ করা ওয়াজিব। তন্মধ্যে একটি হাদীস এই যে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, নিকটবর্তীকালে তোমাদের মধ্যে কতক লোক এ বলবে যে, আল্লাহর এ কিতাব এতে যা কিছু হালাল আমরা তা হালাল মানব, যা কিছু হারাম আছে তা আমরা হারাম বলব।[৩] রাসূলুল্লাহ (সা.) আরও বলেছেন, তোমরা স্মরণ রাখবে, যে কারো নিকট আমার কোন হাদীস পৌঁছল আর সে তা মিথ্যা প্রতিপন্ন করল, তবে সে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল এবং যে ব্যক্তি তার নিকট হাদীস পৌঁছাল তাঁকেও মিথ্যা সাব্যস্ত করল।[৪]

হযরত মুআজ ইবনে জাবাল (রা.)-এর হাদিসে বর্ণিত হয়েছে। যখন তাঁকে রাসূলুল্লাহ (সা.) ইয়ামেনে গভর্নর পদে নিযুক্ত করেছিলেন তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) মুআজ বিন জাবাল (রা.)কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, মুআজ তুমি কী দিয়ে বিচারকার্য পরিচালনা করবে? তিনি (মুআজ) বলেছিলেন, আল্লাহর কিতাব দিয়ে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, যদি আল্লাহর কিতাবে না পাও? মুআজ (রা.) বললেন, আল্লাহর রাসূল (সা.)-এর সুন্নাহ দিয়ে। মহানবী (সা.) বললেন, যদি আল্লাহর রাসূল (সা.)-এর সুন্নাতেও না পাওয়া যায়? তিনি বললেন, আমি আমার

[১] আল কুরআন, ৯ : ১২৮

[২] আল কুরআন, ৯৪ : ২

[৩] হাদীসটি উদ্ধৃত; ড. মুসতাফা হুসনী আস্-সুবায়ী, *ইসলামী শরীয়াহ ও সুন্নাহ*, অনু. এ,এম,এম সিরাজুল ইসলাম (ঢাকা : ইসলামীক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৯পৃ. ৪০৭

[৪] শায়েখ ওয়ালিউদ্দীন, *মিশকাতুল মিসাবীহ*, অনু. ও সম্পা. মাওলানা আহমাদ মায়মুন ও অন্যান্য, ঢাকা : ইসলামিয়া কুতুবখানা, হাদীস নং ১৮৮

বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে পূর্ণ চেষ্টা করব এবং মোটেই অবহেলা করব না। মহানবী (সা.) বললেন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি আল্লাহর রাসূল (সা.)-এর প্রতিনিধিকে এমন পন্থা অবলম্বনের তাওফিক দিয়েছেন যা আল্লাহর রাসূল (সা.)-এর পছন্দনীয়।[১]

গ. আল কুরআনের ন্যায় সুন্নাহের অনুসরণকে রাসূলুল্লাহ (সা.) আবশ্যক সাব্যস্ত করেছেন। বিদায় হজের ভাষণে রাসূলুল্লাহ (সা.) মুসলিম উম্মাহকে লক্ষ্য করে ইরশাদ করেন,

تَرَكْتُ فِيكُمْ اَ مْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوْ ا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا :كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيه

"আমি তোমাদের কাছে দু'টি বিষয় রেখে যাচ্ছি। তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত পথভ্রষ্ট হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা এ বিষয় দু'টিকে আঁকড়ে ধরে থাকবে। বিষয় দু'টি হচ্ছে, আল্লাহ্‌র কিতাব ও আমার সুন্নাহ।"[২]

ঘ. সকল যুগের সকল হক্বপন্থী আলেম এ ব্যাপারে একমত যে, সুন্নাহ শরীয়াতের দ্বিতীয় উৎস। এক্ষেত্রে পদ্ধতি হল, কুরআনের আয়াত সাধারণত সংক্ষিপ্ত হয়ে থাকে। আর সুন্নাহ তা বিশ্লেষণ করে। কুরআনের মুজমাল বা সংক্ষিপ্ত আহকাম কিভাবে কার্যকর হবে, সুন্নাহ সে অবস্থা বর্ণনা করেছে। সুতরাং সালাত সম্পর্কিত বর্ণনাসমূহ, পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের সময়, রুকু সাজদা এবং সালাতে অন্যান্য আহকাম সুন্নাহর মাধ্যমে আমরা পেয়েছি। এমনিভাবে যাকাত সম্পর্কিত আয়াতগুলোর ক্ষেত্রে কোন কোন মালে যাকাত দিতে হবে, কতটুকু দিতে হবে, যাকাতের পরিমাণ কত, কোন সময় দিতে হবে, কেন যাকাত দিতে হবে ইত্যাদি বিষয়ের সমাধান সুন্নাহ্‌র মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এভাবে সাওম সম্পর্কিত বিধিবিধান, হাজ্জের নিয়ম-কানুন, কুরবানীর নিয়মাবলী, বিবাহ-তালাক, ক্রয়-বিক্রয়, অপরাধের শাস্তি, কিসাস, দিয়াত ইত্যাদি সম্পর্কিত কুরআনের মুজমাল আয়াতের বিস্তারিত সমাধান সুন্নাহর মাধ্যমে সাব্যস্ত হয়েছে।[৩] পবিত্র কুরআনেই এ কথার স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে যে, সুন্নাহের এ সব ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণমূলক আহকাম কুরআনের সাথে সম্পৃক্ত। মহান আল্লাহ বলেন,

اَ نزَلْنَا اِ لَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِ لَيْهِمْ

অর্থাৎ "আমরা আপনার প্রতি এই কুরআন নাযিল করেছি যাতে আপনি লোকদের নিকট বিস্তারিতভাবে তুলে ধরতে পারেন, যা তাদের জন্যই নাযিল হয়েছে।"[৪]

ইমাম আওযায়ী (রহ.) বলেন,

الكتاب الى السنة من السنة الى احوج الكتاب

অর্থাৎ "কুরআন সুন্নাহর প্রতি তার চেয়ে অধিক মুখাপেক্ষী যতটুকু সুন্নাহ কুরআনের প্রতি মুখাপেক্ষী।"[৫]

ইমাম আওযায়ীর উপরোক্ত বক্তব্যের ব্যাখ্যায় হাফেজ ইবনে আব্দুল বার মালেকী বলেন, সুন্নাহ কুরআনের অর্থ ও মর্মের ফয়সালা এবং তার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে। ইমাম আহমদ (রা.) কে, হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে

[১] আবু ঈসা মুহাম্মদ বিন ঈসা আত তিরমিযী, *আস-সুনান*, মিশর : শিরকাতু মাকতাবাতু মাতবাআতু মুস্তফা আল বালী আল হালী, ১৩৯৫ হি., খ. ৩, পৃ. ৬০৮, হাদীস নং : ১৩২৭

[২] মালেক বিন মালেক বিন আনাস বিন আমের মাদানী, *আল মুয়াত্তা*, বৈরুত : মুআস্‌সাতুর রিসালাহ, তাবি, খ. ৫, পৃ. ১৩২৩, হাদীস নং- ৩৩৩৮

[৩] মুহাম্মদ ছালাহ উদ্দিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৬

[৪] আল কুরআন, ১৬ : ৪৪

[৫] ড. মুসতাফা হুসনী আস-সুবায়ী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪১৪

তিনি বলেন, আমি এসব কথা বলার সাহস করতে পারি না, তবে এতটুকু বলতে পারি যে, সুন্নাহ কুরআনের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করে। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) বলেন, "সুন্নাহ না হলে আমাদের কেউ কুরআন বুঝতো না।" ইমাম শাফেঈ (রহ.) বলেন, "মুসলিমগণের মধ্যে এ ব্যাপারে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যখন কারো কাছে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সুন্নাহ স্পষ্ট হয় তখন তার জন্য অপর কারো কথার ভিত্তিতে সে সুন্নাহ পরিহার করা জায়েয নয়।"[১] ইমাম মালিক (রহ.) বলেন, "যা কিছু কিতাব ও সুন্নাহর সাথে সামঞ্জস্যশীল হয়, তা গ্রহণ কর আর যা কিছু এ দুইয়ের বিরোধী হয় তা বর্জন করো।"[২] ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বাল (রহ.) বলেন, "যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর হাদীস প্রত্যাখ্যান করে, সে যেন ধ্বংসের কিনারে এসে দাঁড়ায়।"[৩]

৩. ইজমা

ইসলামী জ্ঞান এবং আইনের উৎস হিসেবে সুন্নাহ-এর পরেই ইজমার স্থান। মহানবী (সা.)-এর জীবদ্দশায় তিনিই ছিলেন ইসলাম ও ইসলাম সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়ের কেন্দ্রবিন্দু। সাহাবীগণ কোনো নব সঙ্কটের মুখোমুখি হলে মহান আল্লাহ নবীজি (সা.)-এর উপর ওহী অবতীর্ণের মাধ্যমে উক্ত সমস্যার সমাধান দিতেন। ওহী অবতীর্ণ না হলে মহানবী (সা.) সমস্যার সমাধান নির্ধারণ করতেন। যে কারণে তাঁর যুগে ইজমার কোনো প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়নি।

মহানবী (সা.)-এর ইন্তিকালের পর নতুন নতুন বিষয়ের বিধান উদ্ভাবনের অপরিহার্যতা সামনে রেখে সামষ্টিক ইজতিহাদের মাধ্যমে ইজমার সূচনা হয়। ইসলামী শরীয়াতের এ উৎসমালা মানবজীবনের সার্বিক সমস্যা সমাধানের জন্য যথেষ্ট। কেননা, এটা যুগে যুগে নতুন সত্যের জন্ম দিয়েছে। অভিনব সত্যের সন্ধান দিতে সমর্থ হয়েছে। কুরআন ও হাদীস দ্বারা ইজমার গ্রহণযোগ্যতা ও বৈধতা প্রমাণিত। এটি আইনের এমন একটি উৎস যা উম্মাহর বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের মত যা উম্মাহ দ্বারা স্বীকৃত ও সমন্বিত। এ ধরনের আইন সাহাবীদের যুগ থেকে শুরু করে কিয়ামাত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে।[৪]

কুরআন মজিদে ইজমা প্রসঙ্গে ইরশাদ হয়েছে,

فَاَ جْمِعُوْ ا اَ مْرَكُمْ وَشُرَكَاَءَكُم

"তোমরা নিজেদের ব্যাপারে স্থির সিদ্ধান্ত করে নাও এবং নিজেদের শরিকদের জমায়েত কর।"[৫] মহানবী (সা.) তাঁর উম্মতের প্রতি অগাধ আস্থা স্থাপনের কথা ব্যক্ত করে বলেছেন,

انَّ اُ مَّتِي لاَ تَجْتَمِعُ عَلَى ضَلاَ لَةٍ، فَاِ ذَ ا رَاَ يْتُمُ اخْتِلاَ فًا فَعَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الاْ عْظَمِ -

"আমার উম্মত কখনো পথভ্রষ্টতার ওপর ঐকমত্য ঘোষণা করবে না। যখন তোমরা উম্মতের মাঝে মতপার্থক্য দেখবে তখন বড় জামাতের সাথে সম্পৃক্ত থাকবে।"[৬]

---

[১] ইবনুল কায়্যিম আল জাওযিয়া, *ইলামুল মুওয়াক্কিঈন*, আল কাহেরা : দারুল হাদীস, ২০০১, খ. ১, পৃ. ৬৩
[২] লেখকমণ্ডলী ও সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামী আইন ও আইন বিজ্ঞান*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, খ. ১, পৃ. ৭৯
[৩] *প্রাগুক্ত*
[৪] মুহাম্মদ ছালাহ উদ্দিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫১
[৫] আল কুরআন, ১০ : ৭১
[৬] আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইয়াযিদ ইবনে মাজাহ, *আস সুনান*, মিশর : দার এহয়া কুতুবুল আরাবী, তা.বি., খ. ২, হাদীস নং ৩৯৫০

ইজমা পরিচিতি

ইজমা (اجماع) শব্দটি সাধারণত দুটি অর্থে ব্যবহৃত হয়।[১] প্রথমত : দৃঢ় সংকল্প করা, দৃঢ় অভিপ্রায় ব্যক্ত করা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।[২] পবিত্র কুরআনে এ অর্থের সমর্থন পাওয়া যায়। মহান আল্লাহ বলেন,

وَ اتۡلُ عَلَیۡہِمۡ نَبَاَ نُوۡحٍ ۘ اِذۡ قَالَ لِقَوۡمِہٖ یٰقَوۡمِ اِنۡ کَانَ کَبُرَ عَلَیۡکُمۡ مَّقَامِیۡ وَ تَذۡکِیۡرِیۡ بِاٰیٰتِ اللّٰہِ فَعَلَی اللّٰہِ تَوَکَّلۡتُ فَاَجۡمِعُوۡۤا اَمۡرَکُمۡ وَ شُرَکَآءَکُمۡ ثُمَّ لَا یَکُنۡ اَمۡرُکُمۡ عَلَیۡکُمۡ غُمَّۃً ثُمَّ اقۡضُوۡۤا اِلَیَّ وَ لَا تُنۡظِرُوۡنِ

আর তুমি তাদেরকে নূহের ইতিবৃত্ত পড়ে শোনাও, যখন সে নিজের কাওমকে বলল: হে আমার কাওম! যদি তোমাদের কাছে দুর্বহ মনে হয় আমার অবস্থান এবং আল্লাহর আদেশাবলীর নাসীহাত করা, তাহলে আমারতো আল্লাহরই উপর ভরসা। সুতরাং তোমরা তোমাদের (কল্পিত) শরীকদেরকে সঙ্গে নিয়ে নিজেদের ষড়যন্ত্র মাযবূত করে নাও, অতঃপর তোমাদের সেই তদবীর (গোপন ষড়যন্ত্র) যেন তোমাদের দুশ্চিন্তার কারণ না হয়, তারপর আমার সাথে (যা করতে চাও) করে ফেল, আর আমাকে মোটেই অবকাশ দিওনা।[৩]

দ্বিতীয়ত একমত হওয়া, ঐক্যমত পোষণ করা, সাধারণকরণ, সার্বজনীনকরণ, ব্যাপককরণ।[৪]

ইজমা (اجماع)-এর সংজ্ঞায় মানার প্রণেতা আল্লামা নাসাফী (রহ.) বলেন,

اَ لاْ جْمَاعُ فِیْ الشَّرِیْعَةِ اِ تِّفَاقُ مُجْتَہِدِیْنَ صَالِحِیْنَ مِنْ اُ مَّةِ مُحَمَّدٍ (ص)فِیْ عَصْرٍ وَاحِدٍ عَلٰی اَ مْرٍ قَوْلِیٍّ اَ وْ فِعْلِی

অর্থাৎ কোনো কথা বা কর্মের ওপর সমকালীন উম্মতে মুহাম্মদীর সৎকর্মশীল মুজতাহিদগণের ঐক্যবদ্ধ হওয়াকে শরীয়াতের পরিভাষায় ইজমা বলে।

আল্লামা মোল্লাজিউন বলেন, "একই যুগের উম্মতে মুহাম্মদীর সকল সৎকর্মশীল মুজতাহিদ কর্তৃক কোনো বাচনিক অথবা কর্মসূচক ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করাকে ইজমা বলা হয়।"[৫] মুহাম্মদ তাকী আমীনী বলেন, "হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর উম্মাহর মধ্যে যারা বিশেষজ্ঞ ও সিদ্ধান্ত দানের যোগ্যতাসম্পন্ন এমন বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গের কোন বিষয়ে ঐকমত্যে পৌঁছার নাম ইজমা।[৬]

ইমাম শাওকানী বলেন, মহানবী (সা.) তাঁর উম্মাতের প্রতি যে অগাধ আস্থা স্থাপনের কথা ব্যক্ত করেছেন, উপরিউক্ত হাদীসসমূহ থেকে তাই প্রমাণিত হয়। তবে আস্থা সার্বজনীন হতে পারে না। এ কথাই ফকীহগণ স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন, "ইজমার ক্ষেত্রে পক্ষেবিপক্ষে সাধারণ মানুষের বক্তব্য মূল্যহীন-গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ সবাই শরীয়াতের ব্যাপারে গভীর দূরদৃষ্টির অধিকারী নয়, তাদের দলীল-প্রমাণ অনুধাবনের ক্ষমতাও সবার থাকার কথা নয়।"[৭]

---

[১] আশ্-শাওকানী, *ইরশাদুল ফুহুল*, *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ৩৪৭
[২] ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৯
[৩] আল কুরআন, ১০ : ৭১
[৪] ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৯
[৫] আহমদ মোল্লাজিউন, *নুরুল আনওয়ার*, দিল্লী : রশিদীয়া কুতুবখানা, তাবি, পৃ. ৩১৬
[৬] মুহাম্মদ তাকী আমীনী, *ইসলামী ফিকহের পটভূমি ও বিন্যাস*, ঢাকা : ইসলামমিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪, পৃ. ৫০ এইড
[৭] মুহাম্মদ ইবনে আলী আশ শাওকানী, *ইরশাদুল ফুহুল লি তাহকীকিল হক মিন ইলমিল উসূল*, রিয়াদ : দারুল ফাদীলাহ, তা.বি., পৃ. ৯৭

সারকথা হচ্ছে মহানবী (সা.)-এর ইন্তিকালের পরবর্তী কোনো এক সময়ের মুজতাহিদগণ একত্রিত ও সম্পূর্ণ একমত হয়ে ইজতিহাদযোগ্য বিষয়ে শরীয়াতের যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন, পরিভাষায় তা-ই হলো ইজমা।

ইজমার প্রামাণিকতা

ক. আল কুরআনের প্রমাণ

আল কুরআনে ইজমা শব্দের প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে,

فَاَجۡمِعُوۡۤا اَمۡرَكُمۡ وَ شُرَكَآءَكُمۡ

"তোমরা নিজেদের ব্যাপারে স্থির সিদ্ধান্ত করে নাও এবং নিজেদের শরীকদের জামায়েত করে।"[১]

মহান আল্লাহ আরো বলেন,

یٰۤاَیُّہَا الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡۤا اَطِیۡعُوا اللّٰہَ وَ اَطِیۡعُوا الرَّسُوۡلَ وَ اُولِی الۡاَمۡرِ مِنۡکُمۡ ۚ فَاِنۡ تَنَازَعۡتُمۡ فِیۡ شَیۡءٍ فَرُدُّوۡہُ اِلَی اللّٰہِ وَ الرَّسُوۡلِ اِنۡ کُنۡتُمۡ تُؤۡمِنُوۡنَ بِاللّٰہِ وَ الۡیَوۡمِ الۡاٰخِرِ

অর্থাৎ "হে মুমিনগণ! যদি তোমরা আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাস কর, তবে তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর, আনুগত্য কর রাসূল (সা.)-এর এবং তাদের যারা তোমাদের মধ্যে ক্ষমতার অধিকারী। যদি তোমাদের মধ্যে কোন বিষয়ে মতভেদ ঘটে তা আল্লাহ্ ও রাসূল (সা.)-এর নিকট সোপর্দ কর।"[২]

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) সহ অনেক মুফাসসিরের মতে, اولی الامر দ্বারা উলামা ও মাশায়েখ উদ্দেশ্য। আল কুরআনের সূরা নিসার ৮৩, ১১৫ ও সূরা আল- বাকারার ১৪৩ নং আয়াতে ইজমার ইঙ্গিত রয়েছে।[৩]

খ. সুন্নাহয় ইজমার প্রমাণ

মহানবী (সা.)ও উম্মার ইজমার গ্রহণযোগ্যতার ব্যাপারে স্বীকৃতি দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

انَّ أُ مَّتِي لاَ تَجْتَمِعُ عَلَى ضَلاَ لَةٍ، فَإِ ذَ ا رَأَ يْتُمُ اخْتِلاَ فًا فَعَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الاْ عْظَمِ -

"আমার উম্মত কখনো পথভ্রষ্টতার ওপর ঐকমত্য ঘোষণা করবে না। যখন তোমরা উম্মতের মাঝে মতপার্থক্য দেখবে তখন বড় জামাতের সাথে সম্পৃক্ত থাকবে।"[৪]

ইজমার ভিত্তি

কোন দলীলের ভিত্তিতে ইজমা সম্পন্ন হবে তা নিয়ে ইমামদের মতভেদ রয়েছে। ইবনে হাযমের মতে, নসের ভিত্তি ছাড়া ইজমা গ্রহণযোগ্য নয়।[৫] জমহুরে উলামায়ে কিরামের মতে, ইজমার আইনি ভিত্তি হিসেবে কুরআন ও সুন্নাহর নস কিংবা কিয়াস অবশ্যই থাকতে হবে।

---

[১] আল কুরআন, ১০ : ৭১
[২] আল কুরআন, ৪ : ৫৯
[৩] মুহাম্মদ ছালাহ উদ্দিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৩
[৪] আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইয়াযিদ ইবনে মাজাহ, *আস সুনান*, মিশর : দার এহয়া কুতুবুল আরাবী, তা.বি., খ. ২, হাদীস নং ৩৯৫০
[৫] আলী ইবনে আহমদ ইবন্ হাযম, *আল-ইহকামু ফী উসূলিল আহকাম*, দারুল হাদীস, কায়রো : ১ম প্রকাশ, পৃ. ৪৯৫

কিয়াস ইজমার দলীল হওয়ার মর্যাদা রাখে কিনা এ ব্যাপারে ইমামদের মতভেদ রয়েছে। যাহিরি ও শিয়াগণ এবং ইমাম তাবারির মতে, অকাট্য দলিল ছাড়া ইজমার ভিত্তি হতে পারে না। অতএব খবরে আহাদ ও কিয়াস ইজমার ভিত্তি নয়।[১] কিন্তু অধিকাংশের মতে, ইজমার ভিত্তি অকাট্য দলিল তথা কুরআন, মুতাওয়াতির হাদিস এবং ধারণাপ্রসূত দলিল তথা খবরে আহাদ ও কিয়াস উভয় হতে পারে।[২]

ইজমার আইনী মর্যাদা

ইজমার প্রামাণিকতা সাব্যস্তকারীগণ এর আইনী মর্যাদার ধরন নিয়ে মতভেদ করেছেন। অধিকাংশের মতে, এটি অকাট্য প্রমাণ বিধায় কেউ ইজমার প্রামাণিকতা অস্বীকার করলে সে কাফির, পথভ্রষ্ট ও বিদআতী গণ্য হবে।[৩] এ বিধান তখনই প্রযোজ্য হবে যখন উক্ত ইজমা মুতাওয়াতির বর্ণনাধারার মাধ্যমে আমাদের পর্যন্ত পৌঁছাবে। আর যদি আহাদ বর্ণনাধারার মাধ্যমে পৌছায় অথবা সম্মতিসূচক ইজমা হয়, তবে তার মাধ্যমে ধারণাপ্রসূত জ্ঞান অর্জিত হবে।[৪] ইমাম আল-আমিদী, আল-ইসনাভী ও ইবনুল হাজিব প্রমুখের মতে, ইজমা যদি অকাট্য ও ব্যাপকভাবে প্রসিদ্ধ হয়, যেমন পাঁচ ওয়াক্ত নামায ইত্যাদি, তবে এ জাতীয় ইজমা অস্বীকার করলেই কেবল কাফের হবে; অন্যথায় নয়।[৫] ইমাম আর-রাযীসহ একদলের মতে, সর্বাবস্থাতেই ইজমার বিধান ধারণাপ্রসূত।[৬] ইমাম আল-বাযদাভীসহ হানাফী মাযহাবের একদল উসূলবিদের মতে, ইজমার কয়েকটি স্তর রয়েছে। সাহাবীগণের ইজমা মর্যাদার দিক থেকে কুরআন ও মুতাওয়াতির সুন্নাহর, তাবিঈ ও তাবে তাবিঈগণের ইজমা মাশহুর সুন্নাহর এবং যে ইজমার ব্যাপারে পূর্বযুগে মতভেদ রয়েছে তার মর্যাদা খবরে আহাদের মত।[৭]

অতএব ইজমা অস্বীকারকারীকে ব্যাপক ভিত্তিতে কাফের বলা ঠিক নয়। এক্ষেত্রে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের অবকাশ রয়েছে। যারা ইজমার বিধানকে নস্ ও মুতাওয়াতির সুন্নাহর মত অকাট্য মনে করেন, তাদের দৃষ্টিতে যদি কেউ সাহাবীগণ থেকে মুতাওয়াতির বর্ণনার ভিত্তিতে বর্ণিত ইজমা অস্বীকার করে, তবে সে কাফের গণ্য হবে। কেননা কুরআন ও সুন্নাহ অস্বীকারকারী নির্দ্বিধায় কাফির।[৮] পক্ষান্তরে যারা ইজমার আইনী মর্যাদাকে ধারণাপ্রসূত মনে করেন, তাদের দৃষ্টিতে উক্ত ব্যক্তি কাফির হবে না। কেননা এক্ষেত্রে সে খবরে আহাদ বা কিয়াস অস্বীকারকারীর মতো।[৯]

ইজমার রুকন

অধিকাংশ উসূলবিদের মতে, ইজমার রুকন বা স্তম্ভ মাত্র একটি। তা হল, ঐকমত্য।[১০] কোনো কোনো আলিমের মতে, ইজমার রুকন চারটি।[১]

---

[১] আবূ হামিদ মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ আল গাযালী, *আল মুসতাসফা ফী ইলমিল উসূল*, বিশ্লেষণ মুহাম্মদ আব্দুস সালাম আব্দুশ শাফী, দারুল কুতুবিল ইসলামিয়া, বৈরূত : ১ম প্রকাশ, ১২৩

[২] মুহাম্মদ রহমাতুল্লাহ খন্দকর, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৩

[৩] ইবন বাদরান আল-হাম্বালী, *আলা মাদাখিল ইলা মাযহাবিল আহমদ ইবন হাম্বল*, আল-মাকতাবাতুল মুনিরীয়্যাহ, মিসর : তাবি, পৃ. ১২৯

[৪] ড. মুহাম্মদ রুহুল আমিন, ৯৬

[৫] সাইফুদ্দীন আলী ইবন মুহাম্মদ আল আমিদী, *আল ইহকামু ফী উসূলিল আহকাম*, দারুস সামীয়ী লিন নাশর ওয়াত তাওযীঈ, রিয়াদ : ১ম প্রকাশ, খ. ১, পৃ. ৩৬৮

[৬] ফখরুদ্দীন মুহাম্মদ ইবন আলী আর রাযী, *আল-মাহাসূলু ফী উসূলিল ফিক্হ*, মুআসসাসাতুর রিসালাহ, বৈরূত : ২য় প্রকাশ, খ. ৪, পৃ. ২১০

[৭] আলাউদ্দীন আব্দুল আজিজ ইবনে আহমদ আল-বুখারী, *কাশফুল আসারার আলা উসূলি ফাখরিল ইসলাম আল-বাযদাভী*, দারুল কিতাবিল আরাবী, বৈরূত : তাবি, খ. ৩, পৃ. ২৫১

[৮] ড. মুহাম্মদ রুহুল আমিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৬

[৯] আদুদদ্দীন আব্দুর রহমান ইব্ন আহমদ, *শরহু আলা মুখতাসিরুল মুনতাহা লি-ইবনিল হাজিব*, আল-মাকতাবাতুল আমীরিয়্যাহ, কায়রো : ১ম প্রকাশ, খ. ২, পৃ. ৪৪

[১০] ড. আব্দুল ওয়াহাব, *উসূলুল ফিকহিল ইসলামী*, খ. ১, পৃ. ৫১২

এক : বিধানের ব্যাপারে যাদের ঐকমত্য সংঘটিত হবে তাদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হওয়া। অতএব এক বা দু'জন মুজতাহিদের ঐকমত্যের মাধ্যমে ইজমা সংঘটিত হবে না।

দুই : বিধানের উপর সমস্ত মুজতাহিদের ঐকমত্য অনুষ্ঠিত হওয়া। অধিকাংশ মুজতাহিদ ঐকমত্য পোষণ করলেও ইজমা অনুষ্ঠিত হবে না।

তিন : ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে মুসলিম বিশ্বের সমস্ত এলাকার মুজতাহিদের সম্পৃক্ততা। আঞ্চলিক মুজতাহিদদের ইজমা গ্রহণযোগ্য নয়।

চার : প্রত্যেক মুজতাহিদের স্পষ্ট মত উল্লেখের মাধ্যমে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়া। উক্ত ঐকমত্য বাণীসূচক বা কর্মসূচক উভয়ই হতে পারে। কেউ কেউ আরও একটি রুকন উল্লেখ করেছেন। তা হলো, ঐকমত্য শারঈ বিধানের উপর হওয়া। অন্য বিষয়ে হলে তা ইজমা হিসেবে গণ্য হবে না। যেমন ভাষাগত বিষয়, ইতিহাস ইত্যাদি। কেননা এগুলো শারী'আতের উৎস নয়।[২]

ইজমার শর্ত

ইজমা সংঘটনের জন্য বিভিন্ন শর্ত রয়েছে। কিছু শর্তের ব্যাপারে আলিমগণের ঐকমত্য রয়েছে এবং কিছু শর্তের ব্যাপারে তাদের মতভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়।[৩] ইজমার গুরুত্বপূর্ণ শর্তগুলো নিম্নরূপ[৪]:

১. ইজমা কুরআন-সুন্নাহর নাস অথবা পূর্বের কোনো ইজমা বিরোধী হবে না। শারীআতের দলীল হিসেবে নাস প্রথম স্তরের এবং ইজমা দ্বিতীয় স্তরের। সুতরাং দ্বিতীয় স্তরের প্রমাণ প্রথম স্তরের প্রমাণ খণ্ডন করতে পারে না।[৫]

২. ইজমা বা ঐকমত্য হওয়া বিধানের মূলভিত্তি অবশ্যই শারঈ দলীলের সাথে সামঞ্জস্যশীল হতে হবে। কেননা মুজতাহিদ শারী'আতের সীমানার ভিতরে থেকেই আইন গবেষণায় বাধ্য। ইমাম ইবন হাযম এ ব্যাপারে কঠোর অবস্থান গ্রহণ করেছেন। তাঁর মতে নাসসের ভিত্তিতে ছাড়া ইজমা গ্রহণযোগ্য নয়।[৬]

৩. যে যুগে ইজমা সংঘটিত হবে সে যুগের মুজতাহিদদের সংখ্যা এ পরিমাণ হওয়া যে, যোগসাজশ করে তারা মিথ্যা বলবেন এমন বিশ্বাস করা যায় না।

৪. ঐকমত্য সকল মুজতাহিদের পক্ষ থেকে হতে হবে।

৫. ইজমা শারী'আতের কোনো বিধানের উপর হতে হবে। জমহুর ফকীহ এ শর্ত প্রদান করেছেন। কেউ কেউ বলেন, যে কোনো বিষয়ে ইজমা অনুষ্ঠিত হতে পারে।

৬. মাসআলার উপর একমত হওয়া মুজতাহিদগণের যুগ অতিবাহিত এবং তাঁদের সকলেই মৃত্যুবরণ করা। যাতে তাদের কারও পক্ষ থেকে উক্ত মত প্রত্যাহার করার অবকাশ না থাকে।

৭. ইমাম আবু হানীফা (রাহ.) -এর মতে, যে মাসআলায় ইজমা সম্পন্ন হবে তাতে আলিমগণের মধ্যে পূর্বে কোনো মতবিরোধ না থাকাও ইজমার শর্ত।

৮. মুজতাহিদগণের মধ্যে ইজতিহাদের শর্তাবলি যথার্থভাবে প্রতিফলিত হওয়া।[১]

---

[১] আবদুল ওয়াহাব খাল্লাফ, *ইলমুল উসূলিল ফিক্হ*, মাতবাআতুন নাসার, কায়রো : ১৯৫৬, পৃ. ৪৯
[২] ড. মুহাম্মদ রুহুল আমিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৯
[৩] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৬
[৪] আশ শাওকানী, *ইরশাদুল ফুহুল*, খ. ১, পৃ. ৩৪৮-৩৪৯
[৫] মুহাম্মদ ইবনে ইদরীস আশ-শাফেয়ী, *আর রিসালাহ*, শরিকাতুত তিবাআতিল ফান্নিয়্যাতিল মুত্তাহাদা, খ. ৪, পৃ. ৪৯৫
[৬] ইব্ন হায্ম, *আল ইহকাম ফিল আহকাম*, খ. ৪, পৃ. ৪৯৫

৪. কিয়াস

কিয়াস ইসলামী আইনের চতুর্থ উৎস। ইজমার পরে কিয়াসের অবস্থান। ইসলামী শরীয়াতই মানবতার একমাত্র কল্যাণকর পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান। মানব জীবনে যেসব সমস্যার সমাধান কুরআন, হাদীস কিংবা ইজমায়ে কোনো স্পষ্ট নির্দেশনাই নেই, সেসব সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যেই কিয়াসের অনুমোদন ইসলাম করেছে। কিয়াস-এর উপর ভিত্তি করে ইসলামী শরীয়াতের অনেক সমস্যার সমাধান করা হয়েছে।

কিয়াসের পরিচয়

কিয়াস অর্থ অনুমান করা, সামঞ্জস্য করা, সমন্বিত করা, যুক্ত করা, মাপ, পরিমাপ, অনুপাত, নমুনা, সাদৃশ্য, নিয়ম ইত্যাদি।[২] সুতরাং কিয়াস (القياس) শব্দের বাংলা অর্থ হলো অনুমান করা, তুলনা করা, পরিমাপ করা, সামঞ্জস্যপূর্ণ করা ইত্যাদি।[৩]

ইসলামী পরিভাষায় কুরআন ও সুন্নাহর আইন বা নীতির সাদৃশ্যের ভিত্তিতে বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগ করে পরবর্তী সময়ে উদ্ভূত সমস্যার সমাধান দেওয়াকে কিয়াস বলে। কিয়াসের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে ড. আব্দুল করীম যায়দান বলেন, "যে বিষয়ের বিধানে কোনো নস (نص) বর্ণিত হয়নি, উক্ত বিষয়ের বিধান নির্ণয়ের জন্য তাকে যে বিষয়ের বিধানে 'নস' (نص)বর্ণিত হয়েছে, তার সাথে এ ভিত্তিতে মিলানো যে, উক্ত বিধানের ইল্লাতের (কার্যকারণ) ক্ষেত্রে উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য বর্তমান।"[৪]

আল্লামা ইবনল হাজিব সংক্ষেপে বলেছেন, "বিধানের ইল্লাতের দিক থেকে শাখা-প্রশাখা মূলের অনুরূপ হওয়া।"[৫] ইবনল হাজিবের উক্ত সংজ্ঞায় প্রধানত পাঁচটি দিক উঠে এসেছে। ১. সামজ্ঞস্য ২. শাখা ৩. মূল ৪. ইল্লত ৫. বিধান।[৬]

বিচারপতি শহীদ আবদুল কাদির আওদাহ (রহ.) বলেন, যে বিষয় সম্পর্কে শরীয়াতের 'নস' (نص) বিদ্যমান নেই সেই বিষয়কে কারণসমূহের অভিন্নতার ভিত্তিতে এমন একটি বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত করা, যার সম্পর্কে শরীয়াতের 'নস' (نص) ভিত্তিক বিধান বিদ্যমান আছে তাকে কিয়াস বলা হয়।[৭]

উসুলূল ফিকহের অনুসারে, হুকুমকে মূল হতে শাখার দিকে স্থানান্তরিত করাকে কিয়াস বলে।[৮] উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, এমন কতগুলো বিষয় উদ্ভূত হয়েছে যেগুলো সম্পর্কিত বিধান শরীয়াতে বিদ্যমান নেই কিন্তু উক্ত বিষয়গুলোর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ কতগুলো বিষয় সম্পর্কিত আইন আছে। এরূপ অবস্থায় প্রথমে বিদ্যমান বিষয়সমূহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিধানাবলীর কারণসমূহ নির্ণয় করতে হবে। অতঃপর উক্ত কারণসমূহ উদ্ভূত বিষয়সমূহের মধ্যেও বিদ্যমান পাওয়া গেলে সে ক্ষেত্রে ঐ একই দিকে বিধান প্রযোজ্য হবে।[৯]

---

[১] ড. মুহাম্মদ রুহুল আমিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৯-১০০
[২] ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮২০
[৩] ড. ওয়াহাবাহ আয-যুহাইলী, *উসূলুল ফিকহিল ইসলামী*, খ. ১, পৃ. ৫৭২
[৪] ড. আব্দুল করীম যায়দান, *আল-ওয়াজীয ফী উসূলিল ফিকহ*, বৈরুত : মুআস্সাসাতুর রিসালাহ, তাবি, পৃ. ১৯৪
[৫] শামসুদ্দীন মাহমুদ ইবন আবদুর রমান ইবন আহমদ আল-ইস্পাহানী, *বায়ানুল মুখতাসার শারহে মুখতাসারি ইবনুল হাজিব*, মক্কা : উম্মুল কুরা বিশ্ববিদ্যালয়, তাবি, খ. ৩, পৃ. ৫
[৬] ড. মুহাম্মদ আয-যুহাইলী, *আল ওয়াজীয ফী উসূলুল ফিকহিল ইসলামী*, পৃ. ২৩৮
[৭] বিচারপতি আবদুল কাদির আওদাহ, *আত তাশরীউল জিনাইল ইসলামী*, বৈরুত : মুয়াসসাআনতুর রিসালাহ, ১৯৮৬, খ. ১, পৃ. ১৮২
[৮] লেখকমণ্ডলী ও সম্পাদনা পরিষদ, *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ৯৮
[৯] আহমদ মুল্লাজিউন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭

কিয়াসের উদাহরণ

আল কুরআনের সূরা আল মায়েদার ৯০-৯১ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা মদকে হারাম সাব্যস্ত করেছেন। আয়াতে 'খামর' শব্দের ব্যবহার করা হয়েছে। খামর (خمر) শব্দের অর্থ আঙুরের রস থেকে তৈরি করা মদ, যা নেশা সৃষ্টি করে। সুতরাং এ শব্দের কিয়াস করে নেশা বা অপ্রকৃতিস্থতা সৃষ্টিকারী অন্যান্য বস্তুগুলোকেও খামার-এর হুকুমের অন্তর্ভুক্ত মনে করেন মুজতাহিদগণ। অনুরূপভাবে উক্ত আয়াতে জুয়াকেও হারাম সাব্যস্ত করা হয়েছে। জুয়া হারাম ঘোষিত হওয়ার কারণ হলো, ধোঁকা ও প্রতারণার মাধ্যমে অন্যের সম্পদ কেড়ে নেয়া। ঠিক একই কারণ লটারির মধ্যেও বিদ্যমান। কাজেই জুয়ার উপর কিয়াস করে লটারি ও এ ধরনের প্রতারণামূলক আর্থিক পদ্ধতি শরীয়াতে হারাম সাব্যস্ত হয়েছে। অনুরূপভাবে উক্ত আয়াতে ভাগ্য নির্ণয়ক শরকে হারাম সাব্যস্ত করা হয়েছে। এ শব্দ থেকে কিয়াস করে ভাগ্য গণনা, রাশি দেখা, রাশিফল ইত্যাদি কর্মকাণ্ডও হারাম সাব্যস্ত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, হাদীসে গণকদের সম্পর্কে সুস্পষ্ট বিধান রয়েছে।[১]

কিয়াসের রুকন

ইসলামী আইনবিদগণ চারটি বিষয়কে কিয়াসের রুকন হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। কিয়াসের রুকনগুলো হচ্ছে,

১. মূল : এটি হল কিয়াসের প্রধান ও মূল বিষয়। নতুন উদ্ভাবিত বিষয়টিকে যেটির সাথে তুলনা করা হয় সেটি হল আল আসলু বা মূল। এটি একটি কুরআনের আয়াত অথবা হাদীস অথবা গ্রহণযোগ্য ইজমা হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

২. শাখা

এটি হল শাখা বিধান। যেসকল সমস্যাসমূহের সমাধান কুরআন-হাদীস,ইজমাতে পাওয়া যায়নি তাদেরকে ফারয়া বলা হয়।এই ফারয়া কিয়াসের মূল বা আল-আসলুর সাথে তুলনীয়।

৩. কারণ: ইল্লত অর্থ হল কারণ বা যুক্তি। কিয়াসের রুকন হল ইল্লাতুল জামিয়া বা সমন্বিতকরণ। অর্থাৎ, যে কারণ বা যুক্তির ভিত্তিতে মূল-বিধান থেকে তা শাখাবিধানে বর্তমান থাকে।

৪. হুকুম বা বিধান: আসলুর ইল্লত বা ফরয়া বা শাখার মধ্যে বিদ্যমান থাকার প্রেক্ষিতে আসলুর হুকুম ফরয়ার ভিতর স্থানান্তরিত করার ফলে নতুন সমস্যার যে সমাধান পাওয়া যায় তাই হল হুকুম।

কিয়াসের উৎপত্তি

কিয়াসের উৎপত্তি মহানবী (সা.)-এর জীবদ্দশায়ই। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) যখন তাঁর বিশিষ্ট সাহাবী হযরত মুআয ইবন জাবাল (রা.)কে ইয়ামানের শাসনকর্তা মনোনীত করে পাঠান, তখন তিনি তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন, বিচার সংক্রান্ত ব্যাপারে কোন নতুন সমস্যার উদ্ভব হলে তিনি (মুআয) কী ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন? তিনি বলেন, তিনি কুরআনের অনুসরণ করবেন। তিনি তাঁকে প্রশ্ন করলেন, "যদি কুরআনে সুস্পষ্ট নির্দেশ না থাকে?" তখন মুআয (রা.) উত্তর দিলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ-এর সুন্নাহর হাদিসের অনুসরণ করবেন। আর রাসূল (সা.)-এর সুন্নাহর দ্বারা ফায়সালা করতে না পারলে তিনি তাঁর নিজস্ব বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগ করবেন। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাঁর জবাবে অত্যন্ত সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং তাঁর জন্য দুআ করেন। অন্য একটি

---

[১] মুহাম্মদ ছালাহ উদ্দিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৬-৫৭

হাদিসে আছে, হযরত মুহাম্মদ (সা.) আবু মূসা আল-আশআরীকে বললেন, "আল্লাহর কিতাব কুরআন অনুযায়ী বিচার কর। তোমার যা প্রয়োজন, তা যদি এতে না থাকে তবে তেমাদের নবী (সা.)- এর সুন্নাহ হতে খোঁজ কর। সেখানেও যদি না পাও তখন নিজের মতামত ব্যক্ত কর।"[১]

কিয়াসের-এর নীতমালা

মহানবীর (সা.) ইন্তিকালের পর সাহাবীগণ কুরআন-সুন্নাহর সাথে সাথে কিয়াসের অনুসরণে নতুন নতুন সমস্যার সমাধান করতেন। পরবর্তীকালে ইসলামের মাযহাব চতুষ্টয়ের ইমামগণও কিয়াস প্রয়োগ করতেন। কিয়াস এমন সব সমস্যার সমাধান করে যা কুরআন-হাদিসে স্পষ্ট উল্লেখ নেই।[২] ইমামগণ নিম্নলিখিত নীতিমালার ওপর লক্ষ্য রেখে কিয়াস গ্রহণ করতেন[৩]-

ক. কিয়াস কুরআন-হাদিস ও ইজমার পরিপন্থী হবে না।
খ. কুরআন-হাদিস ও ইজমা দ্বারা প্রবর্তিত কোন আইনের মূলনীতি বিরোধী কোন আইন তৈরি করা কিয়াসের আওতা বহির্ভূত।
গ. কিয়াসের মূলনীতি মানুষের জ্ঞানের পরিসীমার মধ্যে থাকতে হবে।
ঘ. যে সকল সমস্যার সমাধান কুরআন, হাদিস ও ইজমা দ্বারা করা হয়েছে, সে সকল বিষয়ে কিয়াস প্রযোজ্য নয়।

কিয়াসের প্রামাণিকতা

মহান আল্লাহ এক বিষয় থেকে অন্য বিষয়ের জন্য শিক্ষা গ্রহণ করার নির্দেশ প্রদান করেছেন। আল কুরআনের বাণী, 'অতএব হে চক্ষুষ্মান ব্যক্তিগণ! তোমরা উপদেশ গ্রহণ করো।'[৪] এছাড়া মুআয ইবনে জাবাল (রা.) বর্ণিত হাদিসটি ইজতিহাদ ও কিয়াস উভয়ের ক্ষেত্রেই দলিল।

এ ছাড়া কিয়াসের দলিল হিসেবে ব্যবহৃত আরো একটি হাদিস হলো, খাছআম গোত্রের এক মহিলা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে এসে বললেন, আমার পিতার ওপর হজ্ব ফরয হয়েছে কিন্তু তিনি অত্যন্ত বৃদ্ধ, তার পক্ষে হজ্ব পালন করা সম্ভব নয়। কাজেই আমি যদি তার পক্ষ থেকে হজ্ব আদায় করি তবে কি তাতে তার কোনো লাভ হবে? তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি মনে কর যে, তোমার পিতার যদি ঋণ থাকে আর তা যদি তুমি পরিশোধ করে দাও, তাতে কি তার লাভ হবে? সে বলল, হ্যা। তখন তিনি তাকে বললেন, তাহলে আল্লাহর ঋণ পরিশোধ করা আরো অধিক আবশ্যক। এ হাদিসে রাসূলুল্লাহ (সা.) আল্লাহর ঋণকে বান্দাহর ঋণের সাথে কিয়াস বা তুলনা করে অনাদায়ী হজ্ব আদায়ের ব্যাপারে তাগিদ প্রদান করেছেন।

৫. ইসতিহসান

ইমামগণ ইসলামী আইনের মৌলিক চারটি উৎসের পাশাপাশি আরও বেশ কিছু বিষয়কে সম্পূরক উৎস হিসেবে গ্রহণ করেছেন। ইসতিহসান ইসলামী শরীয়াতের মৌলিক চারটি উৎসের পরের সম্পূরক ধাপগুলোর মধ্যে অন্যতম। আরবী ইসতিহসান শব্দটি হুসনুন থেকে উৎপন্ন। হুসনুন শব্দের অর্থ উত্তম, ভালো, সুন্দর।[৫]সে

---

[১] আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা আত-তিরমিযী (রহ.), *তিরমিযী শরীফ*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ,হাদীস নং ১৩৩১
[২] ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ ও অন্যান্য সম্পাদিত, *ইসলাম শিক্ষা দ্বিতীয় পত্র*, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর : ২০১৫, পৃ. ২১৫
[৩] *প্রাগুক্ত*
[৪] আল কুরআন, ৫৯ : ২
[৫] ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আরবী-বাংলা ব্যবহারিক অভিধান*, ঢাকা : রিয়াদ প্রকাশনী, ২০১৩, পৃ. ২৮৮

হিসেবে ‘ইসতিহসান’-এর অর্থ কোনো বস্তুকে উত্তম ও ভালো মনে করা। কোনো কিছু উত্তম বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হওয়াকে ইসহিসান বলা হয়।[১]

উসূলে ফিকহের পরিভাষায়, ইসতিহসান শরীয়াতের এমন এক দলীল, যা মুজতাহিদের অন্তরে প্রকাশ পায়, কিন্তু তা ভাষায় বিশ্লেষণ জটিল হয়।[২] মুহাম্মদ তাকী আমীনী বলেন, “ইসতিহসান হলো কোনো বিষয়ের হুকুমকে তার নযীরসমূহ থেকে অধিকতর শক্তিশালী যুক্তির কারণে পৃথক করে নেয়া।”[৩] মওলানা আবদুর রহীম (রহ.) বলেন, একটি সামগ্রিক হুকুম বাদ দিয়ে এমন কোনো দলীলের ভিত্তিতে কোনো ব্যতিক্রমধর্মী হুকুমের দিকে মুজতাহিদের প্রত্যাবর্তন করা, যা এই প্রত্যাবর্তনকে তার নিকট অগ্রাধিকারী বানিয়ে দিয়েছে তাকে ইসতিহসান বলা হয়।[৪]

ফকীহগণের পরিভাষায়, কোন বিষয়ের দুটো দিকের মধ্য থেকে একটি দিককে দলীলপ্রমাণের ভিত্তিতে অগ্রাধিকার দেওয়ার নাম ইসতিহসান।[৫] নূরুল আনোয়ার গ্রন্থকার বলেন, “যদি প্রকাশ্য কিয়াস একটি হুকুম কামনা করে, আর হাদীস বা ইজমা অথবা গোপন কিয়াস এই কথার বিপরীত কামনা করে, এমতাবস্থায় কিয়াস ত্যাগ করে বিপরীত হুকুমের উপর আমল করাকে ইসতিহসান বলা হয়।”[৬]

ইসতিহসানের শরয়ী ভিত্তি

কুরআন ও হাদীসে ইসতিহসানের পক্ষে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ইঙ্গিত রয়েছে। ফলে ইমামদের ঐকমত্যের ভিত্তিতে শরীয়াতের একটি উৎস হিসেবে ইসতিহসানকে গ্রহণ করা হয়েছে। ইমাম আবু হানিফা (রহ.), ইমাম মালিক (রহ.) ও আহমাদ ইবনে হাম্বাল (রহ.) ইসতিহসানকে শরীয়াতের দলীল মনে করেন। অধিকন্তু ইমাম মালেক (রহ.)-এর মতে, ‘ইসতিহসান জ্ঞানের উনিশভাগের একভাগ।[৭] তবে ইমাম শাফি‘ঈ (রহ.) ইস্‌তিহসানের বিষয় দ্বিমত পোষণ করেন। তিনি এটিকে শরীয়াতের উৎস মনে করেন না। ইসতিহসানের সমর্থনে অথবা এর প্রতি ইঙ্গিতবাহী আয়াত আল কুরআনে বিদ্যমান। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِيْنَ يَسْتَمِعُوْنَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُوْنَ اَحْسَنَهٗ ؕ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ هَدٰىهُمُ اللّٰهُ وَ اُولٰٓئِكَ هُمْ اُولُوا الْاَلْبَابِ

“অতএব সুসংবাদ দাও আমার বান্দাদের যারা মনোযোগ সহকারে কথা শুনে এবং তার মধ্যে যা উত্তম তা গ্রহণ করে। ওরাই তারা যাদের আল্লাহ সৎপথে পরিচালিত করেন এবং এরাই বোধশক্তিসম্পন্ন।”[৮]

অপর এক আয়াতে বর্ণিত হয়েছে :

وَ مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ

“আর তিনি দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোন প্রকার কঠোরতা আরোপ করেননি।”[৯]

---

[১] আল কাসানী, *বাদায়িউস সানায়ে*, খ. ৫, পৃ. ১১৮
[২] আল আমিদী, *আল-ইহকাম*, খ. ৪, পৃ. ১৯২
[৩] মুহাম্মদ তাকী আমীনী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৯
[৪] মওলানা আবদুর রহীম (রহ.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩১
[৫] লেখকমণ্ডলী ও সম্পাদনা পরিষদ, ইসলামী আইন ও আইন বিজ্ঞান, খ. ১, পৃ. ১০৯
[৬] আহমদ মুল্লাজিউন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫২-৩৫৪
[৭] মুহাম্মদ ছালাহ উদ্দিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৯
[৮] আল কুরআন, ৩৯ : ১৭-১৮
[৯] আল কুরআন, ২২ : ৭৮

পবিত্র কুরআন কারীমের উপরে উল্লিখিত আয়াত থেকে ইসতিহসান শরীয়াতের দলীল হওয়ার বিষয়ে প্রমাণ পাওয়া যায়।

ইসতিহসান পক্ষে মহানবী (সা.)-এর হাদীসের পরোক্ষ সমর্থন পাওয়া যায়। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) সূত্রে বর্ণিত হাদীসে এসেছে,

فَمَا رَ اَ ى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا، فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ ، وَمَا رَ اَ وْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ سَيِّئ

"মুসলিমগণ যা উত্তম মনে করে তা আল্লাহর নিকটও উত্তম আর মুসলিমগণ যা মন্দ বিবেচনা করেন তা আল্লাহর নিকটও মন্দ।"[১]

৬. ইসতিদলাল

ইসলামী আইনের আরেকটি উৎস হচ্ছে ইসতিদলাল। ইসতিদলাল শব্দের অর্থ তলব করা, আলাদা করা, খোঁজ করা বা দলীলের সাহায্যে কোনো কিছু প্রমাণ করা।[২]

ইসলামী ফিকহ্ শাস্ত্রের পরিভাষায় " ইসতিদলাল হচ্ছে এমন একটি পরিভাষা যার সাহায্যে কোনো কিছু প্রমাণ করা হয়।"[৩]

ইসতিদলালের প্রয়োগ

এ আইনটিকে কখনো কখনো ইসতিহসানের চেয়েও ব্যাপক ও শক্তিশালী মনে করা হয়। তবে ইজতিহাদ ও সমস্যা সমাধান নির্ণয়ের কোনো বিশেষ পদ্ধতির সাথে এর সম্পর্ক সীমাবদ্ধ নয়; বরং ফিকহবিদগণ ইজতিহাদ করার জন্য যেসব পদ্ধতি ব্যবহার করেন তার প্রায় সবই ইসতিদলালের অন্তর্ভুক্ত। ইসতিদলাল অবস্থা ও কালের পরিবর্তনের সাথে কোন কোন বিধানের পরিবর্তন ঘটায়। এটি অবস্থার দাবি হিসেবে দলীলরূপে প্রতিভাত হয়।[৪]

মওলানা আবদুর রহীম-এর মতে ইসতিদলাল তিন প্রকারের হতে পারে। যথা-

(১) একটি বিষয়ের সাথে অন্য বিষয়ের যখন যোগ ঘটে এবং সে যোগের পশ্চাতে কোন কার্যকরী কারণ থাকে না, তখন সে যোগের ফলাফলকে এক প্রকার ইসতিদলাল বলা যায়।

(২) বিলোপ বা বিরতি যতক্ষণ না করা যায় ততক্ষণ পর্যন্ত ধরে নেয়া হয় যে, কোন বস্তু বা তার অবস্থা বহাল আছে।

(৩) অতীতে যা প্রমাণিত হয়েছিল। ভবিষ্যতে তাকে স্থিত রাখাই নীতি।

৭. মুসলিহাত

মুসলিহাত (مصلحة)-এর শাব্দিক অর্থ স্বার্থ, কল্যাণ, উপকার, দফতর।[৫] মুসলিহাত বলতে বুঝায় এমন প্রত্যেক কল্যাণকে, যে বিষয়ে শরীয়াত দাতার পক্ষ থেকে এমন অকাট্য ও স্পষ্ট দলীল এসে পৌঁছায়নি, যা

---

[১] ইমাম আহমদ, *আল মুসনাদ*, বৈরুত : মুআসসাসাতুর রিসালা, ১৪২১ হি, খ. ৬, পৃ. ৮৪, হাদীস নং : ৩৬০০
[২] ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০৯
[৩] মুফতীসাইয়্যিদ মুহাম্মদআমীমুল ইহসান, *কাওয়াইদুল ফিক্হ*, দেওবন্দ : আশরাফিয়া বুক ডিপো, তাবি, পৃ, ১৭২
[৪] মুহাম্মদ ছালাহ উদ্দিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬২
[৫] ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭০৭

তাকে গণ্য করার আহ্বান জানায় এবং যার কোন মূল নেই, যার উপর ভিত্তি করে কিয়াস করা যেতে পারে। তবে তা গ্রহণে কল্যাণ নিহিত রয়েছে, ক্ষতির কোন আশংকা থাকবে না। এটি অকাট্য ও স্পষ্ট দলীলের বিরোধী হবে না অথবা ইজমারও বিরোধী হবে না।[১]

মুসলিহাতকে অনেকে মাসালিহ মুরসালাহ নামেও উল্লেখ করেছেন। ইমাম আশ-শাতিবী মাসালিহ মুরসালার বিস্তারিত সংজ্ঞায় বলেন, মাসালিহ মুরসালাহ বলা হয় ঐসব বৈশিষ্ট্য বা গুণাবলিকে, যা শারীআত প্রণেতার উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, কিন্তু তা গ্রহণ বা পরিত্যাগ করার পক্ষে-বিপক্ষে কোনো দলীল নেই। অথচ তা বিবেচনায় এনে কোনো বিধান প্রণয়ন করলে মানুষের কল্যাণ সাধিত অথবা অকল্যাণ দূরীভূত হয়।[২]

কোনো বিধানের ঐ কল্যাণচিন্তা যা বাস্তবায়নের ব্যাপারে শরীয়াত প্রণেতার পক্ষ থেকে কোনো বর্ণনা আসেনি এবং যা গ্রহণ বা পরিত্যাগ করার ব্যাপারেও কোনো শারয়ী দলীল বিধৃত হয়নি।[৩] ব্যাপকার্থে মাসলাহা শব্দটি কল্যাণ নিশ্চিত ও অকল্যাণ দূরীকরণ এ দু'টি বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে।[৪]

এর ইতিবাচক ও নেতিবাচক দু'টি দিক রয়েছে, কিন্তু মাসলাহা শুধু ইতিবাচক দিক তথা কল্যাণ নিশ্চিতকরণ বুঝাতে ব্যবহৃত হয়। কেননা মানুষের কল্যাণ নিশ্চিত করতে অকল্যাণ দূরীকরণ পূর্ব শর্ত।[৫] এ কারণেই ফকীহগণ বলেন, কল্যাণ সাধনের চেয়ে অকল্যাণ প্রতিরোধ প্রাধান্যপ্রাপ্ত।[৬]

মুসলিহাত মানব কল্যাণে রচিত

ইসলামী শরীয়াতের যাবতীয় বিধিবিধান মানব কল্যাণের নিমিত্তে রচিত। ইসলামী আইনবিদগণ এই সাধারণ কল্যাণকে আইনের অন্যতম উৎস হিসাবে গ্রহণ করেছেন।

মুসলিহাতের প্রামাণিকতা

মুসলিহাত শরীয়াতের দলীল-এর সমর্থনে কুরআন ও হাদীসের একাধিক বর্ণনা রয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, ইসলামী শরীয়াতে বিধান প্রণয়নের ক্ষেত্রে জনকল্যাণ প্রধান উদ্দেশ্য হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। সামগ্রিক বিধানের ক্ষেত্রে জনস্বার্থ সংরক্ষণের এ দৃষ্টান্ত থেকে প্রমাণিত হয়, নতুন বিষয়ের বিধান উদ্ভাবনে জনকল্যাণ বিবেচনা করা আবশ্যক।[৭] ইসলামী বিধানের ক্ষেত্রে জনকল্যাণের অগ্রগণ্যতার প্রমাণ নিম্নোক্ত আয়াতগুলোতে পাওয়া যায় :

يريد الله بكم اليسر ولا يريد به العشر.

আল্লাহ তোমাদের জন্য যা সহজ তাই চান এবং যা তোমাদের জন্য কষ্টকর তা চান না।[৮]

অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন,

---

[১] লেখকমণ্ডলী ও সম্পাদনা পরিষদ, *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ, ১১৮
[২] আল শাতিবী, *আল-মুআফাকাত*, খ. ১, পৃ. ২৪৩
[৩] খাল্লাফ, *উসুলুল ফিকহিল ইসলামী*, পৃ. ৯৪
[৪] আল-গাযালী, *আল-মুসতাসফা*, খ. ১, পৃ. ১৩৯
[৫] ড. মুহাম্মদ রুহুল আমিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫০
[৬] ড. যায়দান, *আল-ওয়াজীয ফী উসূলিল ফিকহ*, পৃ. ২৩৬
[৭] ইবন কাইয়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ, *আলামুন মুওয়াক্কীঈন*, খ. ৩, পৃ. ১৪
[৮] আল কুরআন, ২ : ১৮৫

فمن اضطر في مختصة غير متجانف لإثم فإن الله غفوررحيم

তবে কেউ পাপের দিকে না ঝুঁকে ক্ষুধার তাড়নায় বাধ্য হলে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।[১]

অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন,

يَاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَّوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَ شِفَاءٌ لِّمَا فِى الصُّدُوْرِ وَ هُدًى وَّ رَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ

হে মানবমণ্ডলী, তোমাদের কাছে এসেছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে উপদেশ ও তোমাদের অন্তরে যা আছে তার নিরাময় এবং মুমিনদের জন্য হিদায়াত ও রহমত।[২]

সাহাবী ও তাদের পরবর্তী মুজতাহিদগণ ইজতিহাদের ক্ষেত্রে জনকল্যাণকে সব সময় প্রাধাণ্য দিতেন। এ ব্যাপারে তাদের মধ্যে কোনো প্রকার ভিন্ন মত পরিলক্ষিত হয়নি। যা থেকে প্রমাণিত হয়, এ বিষয়ে তাদের মধ্যে ইজমা সংঘটিত হয়েছে।[৩]

এর অসংখ্য প্রমাণ রয়েছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, কুরআন গ্রন্থবদ্ধকরণ, উমর রাদিআল্লাহু আনহু কর্তৃক যাকাত ব্যয়ের খাতগুলো থেকে মুআল্লাফাতুল কুলুব-এর অংশ কর্তন, মৃত্যুশয্যায় স্ত্রীকে তালাক প্রদান করলেও উক্ত স্ত্রীকে মীরাছ প্রদানের বিধান, উসমান রাদিআল্লাহু আনহু কর্তৃক মুসলিম সাম্রাজ্যের সকল এলাকায় একই পঠনরীতিতে কুরআন তিলাওয়াত বাধ্যতামূলক করা ইত্যাদি।[৪]

৮. উরফ বা সামাজিক প্রথা ও রেওয়াজ

উরফ (عرف) শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন– কল্যাণ, উত্তম, খারাপের বিপরীত, ধৈর্য, সহিষ্ণুতা ইত্যাদি।[৫] উরফ শব্দটি প্রচলন, প্রথা, রীতি, ঐতিহ্য ইত্যাদি অর্থেও ব্যবহৃত হয়।[৬] উরফ এর সমার্থক আরেকটি শব্দ আদাত। এ উরফের সাথে সামঞ্জস্যশীল আর একটি শব্দ হচ্ছে ইসতিমাল। ইসতিমাল হচ্ছে– "লোকদের ব্যবহারিক রীতি (ইসতিমাল) শরীয়াতের দলীল। এর উপর আমল করা ওয়াজিব।"[৭]

উরফ ইসলামী আইনের বিকাশে বিশেষ অবদান রেখেছে। পরিভাষায় উরফ হল, মুহাম্মদ তাকী আমীনী বলেন, "কথা ও কাজে বিপুলসংখ্যক মানুষের অভ্যাস এর নাম উরফ।"[৮]

ভাষাগত দিক থেকে উরফের সমার্থবোধক শব্দ আদাত'। ফকীহগণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে শব্দ দুটিকে সমার্থক হিসেবে একসাথে ব্যবহার করেছেন। আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে আদাত (عادة) শব্দটি (عود) থেকে নির্গত, যার অর্থ প্রত্যাবর্তন।[৯] তবে ব্যবহারিক দিক থেকে শব্দটি পুনরাবৃত্তি বা পুনঃপৌনিকতার অর্থ প্রদান করে।[১০]

---

১ আল কুরআন, ৫ : ৩
২ আল কুরআন, ১০ : ৫৭
৩ ড. মুহাম্মদ রুহুল আমিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৯
৪ ড. মুহাম্মদ রুহুল আমিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৯
৫ ড. ওয়াহাব আয-যুহাইলী, *উসূলুল ফিকহিল ইসলামী*, দামেশক : দারুল ফিকর, তাবি, খ. ২, পৃ. ১০৪
৬ ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭০৭
৭ মুহাম্মদ তাকী আমীনী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮৭
৮ *প্রাগুক্ত*
৯ ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫২৩
১০ ড. মুহাম্মদ আয-যুহাইলী, *আল-ওয়াজীয ফী উসূলিল ফিকহিল ইসলামী*, পৃ. ২৬৫

পরিভাষায় আদাত’ বলা হয় ঐসব কর্মকাণ্ডকে, যার পুনরাবৃত্তি করতে কোনো প্রকার বিবেচনার প্রয়োজন হয় না।[১] অর্থাৎ যে কাজ করার সময় এর ভালোমন্দ দিক ভাবার প্রয়োজন হয় না। কেননা স্বীকৃত কাজ হিসেবে সমাজে এর প্রচলন রয়েছে। এক কথায় প্রচলিত উত্তম রীতিনীতিকেই আদাত’ বলা হয়।[২]

ড. ওয়াহাব আয-যুহাইলী বলেন, “যেসব বিষয় মানুষের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে বা তাদের মধ্যে প্রচলিত কর্মকাণ্ড যাতে তারা অভ্যস্ত হয়েছে, অথবা যেসব শব্দ প্রকৃত অর্থের বিপরীতে বিশেষ অর্থ প্রদানের জন্য তারা ব্যবহার করে, যা অন্যরা শ্রবণ করলে সহজবোধ্য হয় না।”[৩]

উরফ এর শ্রেণি বিভাগ

ইসলামী আইনবিদগণের মতে উরফ দুই প্রকার। যথা : ১. উরফে খাস এবং ২. উরফে আম।

১. উরফে খাস : কোন বিশেষ এলাকায় পেশায় বা বিশেষ ব্যবসায়ী শ্রেণির মধ্যে প্রচলিত উরফকে উরফে খাস বলা হয়।

২. উরফে আম : ব্যাপকভাবে প্রচলিত উরফ যা কোন ব্যক্তি কিংবা শ্রেণির সাথে সংশ্লিষ্ট নয়। তাকে উরফে আম বলা হয়।

উরফের প্রামাণিকতা

আলিমগণ বিশুদ্ধ উরফকে শরীয়াতের প্রমাণ ও উৎস হওয়ার ব্যাপারে একমত পোষণ করেন। যদিও তারা এ সংক্রান্ত কিছু শর্তের ব্যাপারে মতভেদ করেছেন। হানাফী ও মালিকীগণ উরফ ব্যাপকভাবে গ্রহণ করেছেন। হাম্বলী মাযহাবে অন্যদের তুলনায় ইমাম ইবন কাইয়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ এটা বেশি গ্রহণ করেছেন।[৪]

ইমাম শাফেয়ী (রাহ.) শুধু ঐসব প্রথা গ্রহণের পক্ষে মত দিয়েছেন, সরাসরি শরীয়াত প্রণেতা যেগুলোর স্বীকৃতি দিয়েছেন। ফকীহগণ উরফকে অনেক ব্যবহারিক বিধানের আইনী ভিত্তিরূপে গণ্য করেছেন এবং না বুঝার ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ করেছেন।[৫] তারা উরফ শরীয়াতের প্রমাণ ও উৎস হওয়ার পক্ষে কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস থেকে প্রমাণ পেশ করেন। মহান আল্লাহর বাণী, আর ক্ষমাপরায়ণতা অবলম্বন করো, উরফের (সৎকাজের) নির্দেশ দাও এবং মূর্খদের এড়িয়ে চলো।[৬] এ আয়াতে আল্লাহ সরাসরি উরফ শব্দ ব্যবহার করে তা অনুসরণের নির্দেশ দিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে আয়াতে উরফ শব্দটি তার শাব্দিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। ফকীহগণ নির্ধারিত পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। তবে শাব্দিক অর্থ উরফের পারিভাষিক অর্থ অনুধাবনে সহায়ক। তাছাড়া শাব্দিক অর্থ পারিভাষিক অর্থের চেয়ে ব্যাপক হয়ে থাকে। অতএব এক কথায় বলা যায়, এ আয়াতের মাধ্যমে ইসলামী আইনের উৎস হিসেবে উরফের প্রামাণিকতা সাব্যস্ত হয় না ঠিকই; তবে অন্যান্য প্রমাণের সহায়ক হিসেবে কাজ করে।[৭]

---

[১] ড. ওয়াহাবাহ আয-যুহাইলী, *উসূলিল ফিকহিল ইসলামী*, খ. ২, পৃ. ১০৪
[২] ড. মুহাম্মদ রুহুল আমিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৪
[৩] আয-যুহাইলী, *উসূলুল ফিকহিল ইসলামী*, খ. ২, পৃ. ১০৪
[৪] ড. মুহাম্মদ রুহুল আমিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৬
[৫] *প্রাগুক্ত*
[৬] আল কুরআন, ৭ : ১৯৯
[৭] ড. মুহাম্মদ রুহুল আমিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৭

৯. সাদ্দুয যারায়ে

সাদ্দুয যারায়ে (سد الذرائع) পরিভাষাটি দু'টি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত। সাদ্দ (سد) শব্দের অর্থ বাধা, প্রতিবন্ধকতা এবং ক্রিয়ামূল হিসেবে এর অর্থ বন্ধ করা, বাধাদেওয়া, নিবারণ করা ইত্যাদি।[১] যারায়ে (الذرائع) শব্দটি যারী'আহ (ذريعة) শব্দের বহুবচন। যার অর্থ মাধ্যম, উসিলা, পথ ইত্যাদি।[২]

এ ছাড়াও শব্দটি কারণ, তীর নিক্ষেপের কলা-কৌশল, শিক্ষার আসর ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়। শাব্দিক অর্থে ভালো-মন্দ উভয় বিষয়ের প্রতি পৌঁছার মাধ্যমকে 'যারীআহ' বলা হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে অকল্যাণকর কাজে প্রলুব্ধকারী উপকরণ বুঝানোর জন্য শব্দটি প্রয়োগ করা হয়। অতএব সাদ্দুয যারায়ে পরিভাষার শাব্দিক অর্থ উপায়উপকরণ বা কোনো কাজের মাধ্যম বন্ধকরণ। ইব্ন তাইমিয়াহ বলেন, "যারীআহ বলা হয় ঐ কর্মকে, বাহ্যিক দৃষ্টিতে যা অনুমোদিত; অথচ তা নিষিদ্ধ কাজের উপলক্ষ।"[৩] ইবন কাইয়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ -এর মতে 'সাদ্দুয যারায়ে' বলা হয়–

منع كل وسيلة مباحة, قصد بها التوسل الى مفسدة او لم يقصد, اذا افضت اليها غالبا, وكانت مفسدتها ارجح من مصلحتها

"এমন বৈধ উপকরণ রুদ্ধ করা, যা দ্বারা অকল্যাণ সাধিত হতে পারে, আবার নাও হতে পারে, তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা অকল্যাণের দিকে ধাবিত করে এবং তার কল্যাণের চেয়ে অকল্যাণই অধিক প্রাধান্য পায়।"[৪]

ড. যায়দানের মতে, "মূলগতভাবে নিষিদ্ধ হোক বা অনুমোদিত হোক, অকল্যাণের প্রতি উদ্বুদ্ধকারী কর্মকাণ্ডকে যারী'আহ বলা হয়। যেসব মাধ্যম নিষিদ্ধ তা সরাসরি কর্তাকে অকল্যাণে নিমজ্জিত করে এবং যেসব বৈধ কাজ নিষিদ্ধ কাজে প্রলুব্ধ করে, সেগুলো প্রথমে নিষিদ্ধ কাজে অতঃপর অকল্যাণে নিমজ্জিত করে।"[৫]

সাদ্দুয যারায়ে-এর প্রামাণিকতা

যারা সাদ্দুয যারায়েকে ইসলামী আইনের স্বতন্ত্র উৎস বিবেচনা করেন তারা এর পক্ষে কুরআন, সুন্নাহ ও সাহাবীগণের কর্মকাণ্ড থেকে প্রমাণ পেশ করেন। শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়াহ (রাহ.) এর পক্ষে ত্রিশটি ও ইবন কাইয়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ (রাহ.) নিরানব্বইটি প্রমাণ পেশ করেছেন।[৬] যেমন-মহান আল্লাহর বাণী :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَقُولُوا۟ رَٰعِنَا وَقُولُوا۟ ٱنظُرْنَا وَٱسْمَعُوا۟ ۗ وَلِلْكَٰفِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ

হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা 'রা'ইনা' বলে সম্বোধন করো না, (যার অর্থ আমাদের রাখাল) বরং তোমরা বলবে "উনযুরনা" (অর্থাৎ আমাদের প্রতি নেকদৃষ্টি দিবেন!) এবং শুনে নাও, বস্তুতঃ অবিশ্বাসীদের জন্যই রয়েছে কষ্টদায়ক শাস্তি।[৭]

---

[১] ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান*, ঢাকা : রিয়াদ প্রকাশনী, ২০০৯, পৃ. ৫৫৮

[২] মাজদুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াকুব ফিরোযাবাদী, *আল-কামূসুল মুহীত*, বৈরুত : দারু ইয়াহইয়া তুরাসিল আরাবী, ২০০৩, খ. ৩, পৃ. ২৩

[৩] তকী উদ্দীন মুহাম্মদ ইব্ন তাইমিয়াহ, *বায়ানুদ দালীল আলা বুতলানিত তাহলীল*, রিয়াদ : মাকতাবাতু লীনা লিননাশরি ওয়াত তাওযী, তাবি, পৃ. ৩৫১

[৪] মুহাম্মদ ইব্ন আবূবকর ইব্ন কাইয়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ, *আ'লামুল মুআক্কিঈন আন রাব্বিল আলামীন*, কায়রো : মাকতাবাতুল কুল্লিয়্যাতিল আযহারিয়্যাহ, ১৯৬৮, খ. ৩, পৃ. ১০৮

[৫] ড. আব্দুল করিম যায়দান, *আল-ওয়াজীয ফী উসূলিল ফিক্হ*, মিসর : দার উমর ইবনুল খাত্তাব, ১৯৭৫, পৃ. ২৪৫

[৬] ড. মুহাম্মদ রুহুল আমিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮৪

[৭] আল কুরআন, ২ : ১০৪

এ আয়াতে মহান আল্লাহ (رَاعِنَا) শব্দ ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। যদিও সাহাবীগণ সৎ উদ্দেশে এ শব্দটি ব্যবহার করতেন, কিন্তু ইহুদীরা একে ভিন্ন অর্থে প্রয়োগ করত এর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গালি দিত। এ কারণে মহান আল্লাহ তাঁর রাসূলকে গালি দেয়ার উপলক্ষ্য হবার কারণে ঐ শব্দ ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।[১]

আল্লামা আল-কুরতুবী বলেন, এ আয়াত থেকে দুটি বিষয় সাব্যস্ত হয়েছে-

১. কেউ হেয় প্রতিপন্ন বা অপমানিত হয় এমন শব্দ ব্যবহার থেকে দূরে থাকা।

২. সাদ্দুয যারায়ে নীতি গ্রহণ।[২]

ইসলামী আইনের বৈশিষ্ট্য

ইসলামী শরীয়াত আল্লাহ প্রদত্ত

মহান আল্লাহ প্রদত্ত দ্বীন, জীবন বিধান বা আইনই হচ্ছে ইসলামী শরীয়াত বা আইন। ইসলামী আইনের উৎস মূল হচ্ছেন স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা। মহানবী (সা.)-এর মাধ্যমে পৃথিবীর বুকে ইসলামী শরীয়াত-এর প্রচার ও প্রসার ঘটেছে। ইসলামী শরীয়াতের পূর্ণ প্রয়োগ আমরা মহানবী (সা.)-এর জীবদ্দশায় দেখতে পাই। খোলাফায় রাশেদাগণও ইসলামী শরীয়াত অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা করেছেন।

ইসলামী শরীয়াতের মূল উৎস হচ্ছে মহাগ্রন্থ আল কুরআন। মানব চিন্তাধারা প্রসূত বিধিবিধান থেকে ইসলামী শরীয়াত সম্পূর্ণ মুক্ত। ইসলামী শরীয়াত অসম্পূর্ণতা, অপারগতা, স্থান-কাল, অবস্থা, অভিজ্ঞতা, মেজাজ, প্রবৃত্তি এবং আবেগময়তা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। ইসলামী শরীয়াত তথা ইসলামী বিধিবিধান দাতা হলেন বিশ্বজগতের স্রষ্টা এবং নিয়ন্তা আল্লাহ তা'আলা। তিনি অবশ্যই জ্ঞাত আছেন কিসে মানবজাতি তথা সৃষ্টি জগতের উপকার এবং উন্নতি হবে এবং কিসে ও কীভাবে সমস্যার সমাধান হবে।[৩] মানবজীবনে আল্লাহর আইন বাস্তবায়ন না করার পরিণতি সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা কঠোর ভাষায় বলেন, "আল্লাহর দেওয়া বিধান অনুযায়ী যারা বিচার ফয়সালা করে না তারা কাফির। আল্লাহরদেওয়া বিধান অনুযায়ী যারা বিচার ফয়সালা করে না তারা জালিম। আল্লাহর দেওয়া বিধান অনুযায়ী যারা বিচার ফয়সালা করে না তারা ফাসিক।"[৪]

অপরাধ প্রবণতা বন্ধে ভূমিকা

ইসলামী শরীয়াত মানুষকে অপরাধ কর্মে জড়িত না হতে নানাভাবে উদ্বুদ্ধ করে। মানুষ হঠাৎ করেই অপরাধে জড়িত হয় না। বরং পারিপার্শিক নানান কারণ তাকে অপরাধে উদ্বুদ্ধ করে। যেসব কারণে মানুষের মাঝে অপরাধ প্রবণতা সৃষ্টি হতে পারে ইসলাম সেসব কর্ম থেকে বিরত থাকার উপদেশ দেয়। উদাহরণস্বরূপ ব্যভিচার বা ধর্ষণের কথা বলা যেতে পারে।

---

[১] ড. মুহাম্মদ রুহুল আমিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮৪-৮৫

[২] আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আহমদ আল-কুরতুবী, *আল জামি লি আহকামিল কুরআন*, দারু আলামিল কুতুব, রিয়াদ : ২০০৩, খ. ২, পৃ. ৫৭

[৩] ইউসুফ আল কারযাভী, *শরী'আতুল ইসলাম খুলুদুহা ওয়া ছালাহুহা লিততাতবিক ফি কুলি যামান ওয়া মাকান* (বৈরূত : আল মাকাতাবুল ইসলাম, তাবি), পৃ. ১৮

[৪] আল কুরআন ৪ : ৪৪-৪৭

ব্যভিচার বা ধর্ষণের একটি বড় কারণ চোখকে অবৈধ বস্তু দর্শন থেকে হেফাযত না করা। বারংবার অশ্লীল বস্তু যেমন পর্নোগ্রাফী, অশ্লীল সিনেমা-গান ইত্যাদি দেখার ফলে নিজের মাঝেও অশ্লীলতায় জড়িত হওয়ার প্রবণতা জেগে ওঠে। মানুষের মাঝে যাতে এই অবৈধ যৌন কামনা জেগে না ওঠে সেজন্য ইসলাম মানুষকে চোখ হেফাযতের নির্দেশ দিয়েছে। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " كُتِبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَصِيبُهُ مِنَ الزِّنَى مُدْرِكٌ ذَلِكَ لاَ مَحَالَةَ فَالْعَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظَرُ وَالأُذُنَانِ زِنَاهُمَا الاِسْتِمَاعُ وَاللِّسَانُ زِنَاهُ الْكَلاَمُ وَالْيَدُ زِنَاهَا الْبَطْشُ وَالرِّجْلُ زِنَاهَا الْخُطَا وَالْقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَنَّى وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ وَيُكَذِّبُهُ ".

আবু হুরায়রা (রা.) সুত্রে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আদম সন্তানের উপর যিনার যে অংশ লিপিবদ্ধ আছে তা অবশ্যই সে প্রাপ্ত হবে। দু'চোখের যিনা হল দৃষ্টিপাত করা, দু'কানের যিনা হল শ্রবণ করা, জিহ্বার যিনা হল কথোপকথন করা, হাতের যিনা হল স্পর্শ করা, পায়ের যিনা হল হেঁটে যাওয়া, অন্তরের যিনা হল আকৃষ্ট ও বাসনা করা। আর লজ্জাস্থান তা বাস্তবায়িত করে এবং মিথ্যা প্রতিপন্ন করে।[১]

ইসলামী আইন অবিনশ্বর

অবিনশ্বরতা ও সর্বজনীনতা ইসলামী আইনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। মহান আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত ইসলামী আইন পুরো বিশ্বের সকল দেশের, সকল পরিবেশের, সকল পরিস্থিতির এবং সকল সময়ের সাথে সাজুয্যপূর্ণ। অর্থাৎ পৃথিবীর যে কোন প্রান্তের মানুষের জন্যই ইসলামী আইন প্রতিপালন করা সম্ভব। কারণ মহানবী (সা.) কে আল্লাহ তা'আলা সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য রাসূল ও রহমত রূপে প্রেরণ করেছেন। তাই তাঁর প্রচারিত বিধিবিধানও বিশ্ববাসীর জন্য অনুসরণ করা আবশ্যক বলে ঘোষণা করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন,

قُلْ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا

"বলুন হে মানুষ! আমি তোমাদের সকলের জন্য আল্লাহর রাসূল।"[২]

অপর এক আয়াতে আছে,

وَ مَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّ نَذِيْرًا وَّ لٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ

"আমি তো তোমাকে সমগ্র মানবজাতির প্রতি সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।"[৩]

হাদীস শরীফে এসেছে, "আমি সমগ্র মানবজাতির জন্য প্রেরিত হয়েছি।"[৪]

উপরে উল্লিখিত কুরআন কারীমের আয়াতসমূহ এবং হাদীস প্রমাণ করে যে, মহানবী (সা.)- এর নবুয়্যত কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বিশেষের জন্য নয় বরং সাধারণভাবে সবার জন্য।

---

[১] আবুল হুসায়ন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল কুশায়রী আন নিশাপুরি (রহ.), *মুসলিম শরীফ*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ,হাদীস নং ৬৫১৩

[২] আল কুরআন, ৭ : ১৫৮

[৩] আল কুরআন, ৩৪ : ২৮

[৪] আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল বুখারী আল জুফী (রহ.), *বুখারী শরীফ*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ,হাদীস নং ৩২৮

সৎকর্মের পুরস্কার ও অসৎ কর্মের তিরষ্কার

পৃথিবীর দেশে দেশে শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য অসংখ্য অগণিত আইন রয়েছে। পৃথিবীর উন্নত-অনুন্নত সব দেশেই এসব রাষ্ট্রীয় আইন অত্যন্ত কঠোরভাবে পালন করা হয়। আইন ভঙ্গকারীর জন্য তিরস্কার-অর্থদণ্ড থেকে শুরু করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এমনকি মৃত্যুদণ্ডের শাস্তির ব্যবস্থাও রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে আমাদের দেশের দণ্ডবিধির কথা। আমাদের দেশের দণ্ডবিধির ৩০২ ধারায় খুনের অপরাধে খুনীকে মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করার বিধান রাখা হয়েছে এবং অর্থদণ্ডের বিধানও রাখা হয়েছে।

মানুষ সবসময়ই প্রশংসা, পুরষ্কার প্রত্যাশী। অপরাধের শাস্তির ভয়ের তুলনায় অপরাধ না করে পুরস্কার প্রাপ্তির ঘোষণা অপরাধ থেকে ফিরিয়ে রাখতে অধিক কার্যকর। তাই ইসলামী আইনে অপরাধের জন্য যেমনিভাবে শাস্তির ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। অনুরূপভাবে অপরাধ কর্ম থেকে বিরত ব্যক্তির জন্য পুরস্কারের ঘোষণাও দেওয়া হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন,

وَ بَشِّرِ الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمۡ جَنّٰتٍ تَجۡرِیۡ مِنۡ تَحۡتِهَا الۡاَنۡهٰرُ ؕ كُلَّمَا رُزِقُوۡا مِنۡهَا مِنۡ ثَمَرَةٍ رِّزۡقًا ۙ قَالُوۡا هٰذَا الَّذِیۡ رُزِقۡنَا مِنۡ قَبۡلُ ۙ وَ اُتُوۡا بِهٖ مُتَشَابِهًا ؕ وَ لَهُمۡ فِيۡهَاۤ اَزۡوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ ٭ۙ وَّ هُمۡ فِيۡهَا خٰلِدُوۡنَ

যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাদেরকে সুসংবাদ দাও যে, তাদের জন্য আছে জান্নাত, যার নিম্নদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত। তাদেরকে যখনই ফলমূল খেতে দেয়া হবে, তখনই তারা বলবে, আমাদেরকে পূর্বে জীবিকা হিসেবে যা দেয়া হতো, এতো তারই মতো। একই রকম ফল তাদেরকে দেয়া হবে এবং সেখানে রয়েছে তাদের জন্য পবিত্র সঙ্গিণী, তারা সেখানে চিরস্থায়ী হবে।[১]

ইসলামী আইন পৃথিবীর প্রাচীন আইন

ইসলামের উৎপত্তি মানব সৃষ্টির সূচনা লগ্নেই। হযরত আদম (আ.) থেকে শুরু করে পরবর্তী সকল নবী-রাসূল ও ঈমানদার ব্যক্তিগণ ইসলামী আইন অনুযায়ী সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনা করে এসেছেন। এ আইন পূর্ণতা লাভ করে মহানবী (সা.) এর উপর অবতীর্ণ শরীয়াতের মধ্য দিয়ে। মহানবী (সা.) এর ইন্তিকালের পরও ও খুলাফায়ে রাশেদ্বীন, উমাইয়া যুগ, উসমানী ও মোঘল শাসন ব্যবস্থা পরিচালিত হয়েছে এই ইসলামী আইন দ্বারা। ১৭৫৭ সনে বৃটিশরা বাংলা ও পরবর্তীতে পুরো ভারতীয় উপমহাদেশ দখল করে বৃটিশ শাসন চাপিয়ে দেয়। এর পূর্ব পর্যন্ত এ অঞ্চল মোটাদাগে ইসলামী আইন দ্বারাই পরিচালিত হয়ে আসছিল। ১৯২৩ সনে কামাল আতা তুর্ক তুরস্কের ক্ষমতা লাভ করে। এর পূর্ব পর্যন্ত উসমানীয় সালতানাতও এ আইন দ্বারাই পরিচালিত হতো। বর্তমান সময়ও বিভিন্ন রাষ্ট্রে ইসলামী আইনের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

ইনসাফের উপর প্রতিষ্ঠিত

পৃথিবীতে ইসলাম আগমনের অন্যতম উদ্দেশ্য ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা। শরীয়া আইনের অন্যতম প্রধান একটি বৈশিষ্ট্য হল, শরীয়া আইন শতভাগ ন্যায়-নিষ্ঠার উপর প্রতিষ্ঠিত। আল কুরআনের অসংখ্য আয়াতে মানুষের মাঝে ইনসাফ (সুবিচার) ও আদল (ন্যায়বিচার) প্রতিষ্ঠার সর্বোচ্চ তাকিদ এসেছে । যেমন মহান আল্লাহ বলেন, “আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ এবং নিকট আত্মীয়স্বজনকে দান করার আদেশ করেন এবং তিনি

[১] আল কুরআন, ২ : ২৫

অশ্লীলতা, অসঙ্গত কাজ এবং অবাধ্যতা থেকে নিষেধ করেন। তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন যাতে তোমরা স্মরণ রাখ।"[১]

পবিত্র কুরআন কারীমের বেশ কিছু আয়াতে সত্য ও ন্যায়বিচারের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। নবীদের, মুমিনদের ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার পক্ষে সংগ্রাম করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যেমন : "হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর জন্যে ন্যায়ের উপর সাক্ষী হয়ে অবিচলভাবে দাঁড়িয়ে থাকো, কোনো সম্প্রদায়ের দুশমনী যেনো তোমাদের এমনভাবে প্ররোচিত না করে যে, (এর মানে) তোমরা ন্যায় ও ইনসাফ করবে না। তোমরা ইনসাফ করো। কারণ এটি তাকওয়ার অধিক নিকটতর; তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তোমাদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অবগত।"[২] অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন, "আর মানুষের মধ্যে যখন তোমরা বিচার-ফয়সালা করবে তখন তোমরা ন্যায়ের ভিত্তিতে করবে।"[৩]

অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠাকে তাঁর নির্দেশ বলে ঘোষণা করেছেন। আল্লাহ তয়ালা বলেন, "আপনি বলে দিন আমার প্রতিপালক সুবিচারের নির্দেশ দিয়েছেন।[৪] ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে কুরআনে সব ধরনের স্বজনপ্রীতির উর্ধ্বে ওঠার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন, "যখন তোমরা কথা বল, তখন সুবিচার কর, যদিও সে আত্মীয় হয়।"[৫]

কর্মের প্রতিদান অবশ্যম্ভাবী

প্রচলিত আইনী কাঠামোতে একজন অপরাধী ঠিক তখনই শাস্তি প্রাপ্ত হবেন যখন আদালতে সাক্ষ্য প্রমাণ দ্বারা অপরাধী হিসেবে প্রমাণিত হবে। পৃথিবীতে এমন হত্যাকাণ্ড অহরহই ঘটছে যার কোনো সাক্ষ প্রমাণনেই। ফলে অপরাধী মাফ পেয়ে যাচ্ছে। আবার একই ব্যক্তি দ্বারা একাধিক হত্যাকাণ্ডের ঘটনাও ঘটতে পারে। সেক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হলেও একবারের অধিক মৃত্যুদণ্ড দেওয়া সম্ভব নয়। এ ক্ষেত্রেও অপরাধীর অপরাধের পূর্ণাঙ্গ শাস্তি হচ্ছে না। ন্যায় হোক আর অন্যায় কর্মের প্রতিদান অবশ্যম্ভাবী। ইসলামী শরীয়াতে মৃত্যু পরবর্তী জীবনে বিশ্বাস রাখা আবশ্যক ঘোষণা করা হয়েছে। পরকালীন শান্তি ও শাস্তির বিধান ইসলামে রয়েছে। দুনিয়াতে কেউ যদি অপরাধ করে পার পেয়েও যায় তাহলে তাকে অবশ্যই পরকালীন শাস্তি ভোগ করতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন,

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ، وَ مَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ

অতএব কেউ অণু পরিমাণও সৎ কাজ করলে সে তা দেখবে।আর কেউ অণু পরিমাণও অসৎ কাজ করলে সেও তা দেখবে।[৬]

ইসলামী আইন মানবপ্রকৃতির সাথে সংগতিপূর্ণ আইন

পৃথিবীর ধর্মসমূহের মধ্যে ইসলাম একটি অত্যন্ত বাস্তসম্মত ধর্ম। ইসলামের সকল বিষয়ই যৌক্তিক এবং সকল সৃষ্টির জন্য কল্যাণকর। ইসলামী আইনে যুক্তিহীনতা, অসঙ্গতি ও সামঞ্জস্যহীনতার স্থান নেই। এর গোটা

---

[১] আল কুরআন, ১৬ : ৯০
[২] আল কুরআন, ৫ : ৮
[৩] আল কুরআন, ৪ : ৫৮
[৪] আল কুরআন, ৭ : ২৯
[৫] আল কুরআন, ৬ : ১৫২
[৬] আল কুরআন, ৯৯ : ৭-৮

ব্যবস্থাপনাই মানবজাতির জন্য কল্যাণকর ও সঙ্গতিপূর্ণ। মিরাজ রজনীতে হযরত জিবরীল (আ.) ইসলামী শরীয়াতকে প্রকৃতির শরীয়াত অর্থৎ মানবপ্রকৃতির সাথে সংগতিপূর্ণ শরীয়াত হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন,

ثُمَّ أُتِيتُ بِإِنَاءٍ مِنْ خَمْرٍ وَإِنَاءٍ مِنْ لَبَنٍ وَإِنَاءٍ مِنْ عَسَلٍ فَأَخَذْتُ اللَّبَنَ فَقَالَ :هِيَ الْفِطْرَةُ أَنْتَ عَلَيْهَا وَأُمَّتُكَ ثُمَّ فُرِضَتْ عَلَيَّ

তারপর আমার সামনে হাজির করা হলো এক পাত্র মদ, এক পাত্র দুধ ও এক পাত্র মধু। তার মধ্য হতে আমি দুধ গ্রহণ করলাম (এবং তা পান করলাম)। তখন জিবরীল আলায়হিস সালাম বললেন, এটা ফিত্বরাত-এর (স্বভাব-ধর্মের) নিদর্শন। আপনি এবং আপনার উম্মত সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবেন।[১]

ইসলামী আইন নির্মোহ ভাবে বিশ্লেষণ করলে প্রতিটি আইনের ক্ষেত্রেই এটা দেখা যাবে যে, প্রতিটি আইনই মানব প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ এবং মানব জাতির জন্য কল্যাণকর। উদাহরণস্বরূপ আমরা ওযু-গোসলের কথা উল্লেখ করতে পারি। নামাযের পূর্বে ইসলামে ওযুর মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জনকে আবশ্যক করা হয়েছে। পবিত্রতা অর্জন অবশ্যই মানুষের জন্য কল্যাণকর ও মানবপ্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যশীল।

ইসলামী আইনে পবিত্রতার ভাবধারা বিদ্যমান

ইসলামী আইনের একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, ইসলামী আইনে পবিত্রতার ভাবধারা বিদ্যমান। আত্মিক এবং শারীরিক, উভয় প্রকার পবিত্রতা এবং পরিচ্ছন্নতার ব্যপারেই ইসলামে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। কুরআনের ভাষায় যে ব্যক্তি আত্মিক পবিত্রতা ও উৎকর্ষতা অর্জন করবে সে-ই কেবল সফল। আর যে ব্যক্তির আত্মা পরিশুদ্ধ নয় তার জন্য অপেক্ষা করছে সীমাহীন ব্যর্থতা। মহান আল্লাহ বলেন,

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰـهَا .وَ قَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰـهَا

সেই সফলকাম হয়েছেযে নিজ আত্মাকে পবিত্র করেছে। সেই ব্যর্থ হয়েছেযে নিজ আত্মাকে কলূষিত করেছে।[২]

দৈহিক পবিত্রতা অর্জনের ব্যপারেও রয়েছে কঠোর নির্দেশ। দৈহিক পবিত্রতা ব্যতীত কোনো ইবাদাতই মহান আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। যেমন নামাযের ব্যপারে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে,

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ تُقْبَلُ صَلاَةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ وَلاَ صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ "

ইবন উমর (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, পবিত্রতা ছাড়া নামায কবুল হয় না। আর হারাম উপায়ে প্রাপ্ত মালের সাদকাও কবুল হয় না।[৩]

ইসলামী আইন পূর্ণাঙ্গ

মানবজীবনের সার্বিক দিক পরিচালনার জন্য ইসলামী আইন পূর্ণাঙ্গ ও পরিপূর্ণ। মানুষের যাবতীয় কর্মকাণ্ড সম্পর্কেই ইসলামে সুস্পষ্ট ধারনা দেওয়া হয়েছে। ইসলামী শরীয়াতের পরিধি শুধুমাত্র কিছু ইবাদত-বন্দেগি,

---

[১] শায়েখ ওয়ালীউদ্দীন, *মিশকাতুল মাসাবীহ*, বাবু ফি মিরাজ, হাদীস নং ৫৮৬২

[২] আল কুরআন, ৯১ : ৯-১০

[৩] আবু ঈসা মুহাম্মদ বিন ঈসা আত তিরমিযী, *আস-সুনান*, (كتاب الطهارة عن رسول الله ﷺ), ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, হাদীস নং ১

আকিদা-বিশ্বাসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও আন্তর্জাতিক তথা মানবজীবনের সকল ক্ষেত্রের বিধিবিধান সম্পর্কেই ইসলামী শরীয়াতে আলোচনা করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَ اَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَ رَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا

আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন পূর্ণাঙ্গ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন মনোনীত করলাম।[১]

মহান আল্লাহ মহানবী (সা.)-এর মাধ্যমে নবুয়াতের ধারার সমাপ্তি ঘোষণা করেছেন। মহানবী (সা.)-এর নবুয়াতের সমাপ্তি ঘোষণার মধ্য দিয়ে ইসলামী শরীয়াতের পূর্ণাঙ্গতাও ঘোষিত হয়েছে। মানুষের প্রয়োজনীয় সকল বিধিবিধানই এর মধ্যে আলোচিত হয়েছে। যুগের পরিক্রমায় নতুন কোনো সঙ্কট সৃষ্টি হলে তা সমাধানের দিকনির্দেশনাও রয়েছে ইসলামী শরীয়াতে। মহানবী (সা.) যে শেষ নবী এ সম্পর্কে কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে,

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَآ اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَ لٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَ خَاتَمَ النَّبِيّٖنَ ؕ وَ كَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَیْءٍ عَلِيْمًا

"মুহাম্মদ তোমাদের মধ্যে কোন পুরুষের পিতা নয়; বরং সে আল্লাহর রাসূল এবং শেষ নবী। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ।"[২]

মহান আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপন

ইসলামী আইনের অন্যতম উদ্দেশ্য মহান আল্লাহর সাথে বান্দার সম্পর্ক স্থাপন। মানব জীবনের উদ্দেশ্যই হচ্ছে মহান আল্লাহর সাথে বান্দার সম্পর্ক স্থাপন। মহান আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপনের অর্থ হচ্ছে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন, সন্তুষ্টি অর্জনে সর্বাত্মকভাবে আত্মনিয়োগ করা। মানুষ যখন আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে সচেষ্ট হয় তখন তার সকল বিধিনিষেধ মেনে চলতে শুরু করে। মহান আল্লাহ কর্তৃক নিষেধাজ্ঞা জারিকৃত বিষয় থেকে নিজেদের রক্ষা করে চলে। মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে চেষ্টারত ব্যক্তি মাত্রই জানে যে সে কোনো অবস্থাতেই আল্লাহর অগোচরে যেতে সক্ষম হবে না। যেকারণে তার দ্বারা কোনো অন্যায় কর্মও সম্পাদন করা সম্ভব হয় না।

ইসলামী আইন অপরিবর্তনীয়

ইসলামী আইনের মৌলিক উৎস হচ্ছে কুরআন ও হাদীস; যা অপরিবর্তনীয় ও চিরস্থায়ী। কোন অবস্থায় তাতে কোন কিছুর সংযোজন কিংবা বিয়োজনের কোন সুযোগ নেই। যেমন বলা যায় নামাযের কথা। দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সুন্নত অনুযায়ী কিয়ামত পর্যন্ত সকল মুসলমানকেই আদায় করতে হবে। এক ওয়াক্ত নামায কম পড়া কিংবা নামায পড়ার পদ্ধতিতে কোনো ধরনের পরিবর্তন আনার সুযোগ নেই। রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি মৌলিক ইবাদতের ক্ষেত্রেও পরিবর্তন করার কোনো সুযোগ নেই।

আবার ইসলামী শরীয়াতে মানুষ হত্যার শাস্তিস্বরূপ কুরআন মাজীদে মৃত্যুদণ্ডের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে এবং পাশাপাশি বাদী ও বিবাদীর মধ্যে সমঝোতারও সুযোগ রাখা হয়েছে। পক্ষদ্বয়ের মধ্যে সমঝোতা না হলে

[১] আল কুরআন, ৫ : ৩
[২] আল কুরআন, ৩৩ : ৪০

মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হবে। কোন বিচারক কর্তৃক এ বিধান রহিত করার সাধ্য ও ইখতিয়ার কোনটাই নেই।[১] আল্লাহ তা'আলা বলেন,

سُنَّةَ مَنْ قَدْ اَرْسَلْنَا قَبْلَکَ مِنْ رُّسُلِنَا وَ لَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيْلًا

"আমার রাসূলগণের মধ্যে তোমার পূর্বে যাদেরকে পাঠিয়েছিলাম তাদের ক্ষেত্রেও ছিল এইরূপ নিয়ম এবং তুমি আমার নিয়মে কোন পরিবর্তন পাবে না।"[২]

অপর এক আয়াতে আছে:

وَ مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّ لَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللهُ وَ رَسُوْلُهٗ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ ؕ وَ مَنْ يَّعْصِ اللهَ وَ رَسُوْلَهٗ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا مُّبِيْنًا

"আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোন বিষয়ের নির্দেশ দিলে কোন মু'মিন পুরুষ কিংবা কোন মু'মিন নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার থাকবে না। কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করলে সে তা স্পষ্টই পথভ্রষ্ট হবে।"[৩]

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহ.) তার ইগাছাতুল লাহফান গ্রন্থে লিখেছেন, ইসলামী শরীয়াহর এক ধরনের বিধান এমন যে তা সবসময় একই অবস্থায় থাকে। স্থানকালের পরিবর্তনে তার মধ্যে কোনো ধরনের পরিবর্তন আসে না। ইমামগণ ইজতিহাদ করে তাতে কোনো ধরনের পরিবর্তন আনার অধিকার রাখেন না। যেমন ফরয, ওয়াজিব, হারাম, শরীয়াহর নির্ধারিত দণ্ডবিধি ইত্যাদি।[৪]

ইসলামী আইনে পরিবর্তনশীলতার সুযোগ

ইসলামী শরীয়ার মৌলিক উৎস কুরআন-সুন্নাহ। কুরআন-সুন্নাহর নীতিমালার ওপর ভিত্তি করে ইসলামী আইনবীদগণ আরও কিছু সম্পূরক উৎস নির্ধারণ করেছেন। যেমন ইজমা, কিয়াস, মাসলাহা, উরফ, ইসতিহসান ইত্যাদি। এসব সম্পূরক উৎসের উদ্দেশ্য হচ্ছে মানব কল্যাণে স্থান-কাল-পাত্র এবং পরিবেশ-পরিস্থিতি ও অবস্থার প্রেক্ষাপটে নব সৃষ্ট সমস্যার শরীয়াভিত্তিক সমাধানে পৌঁছাতে সাহায্য করা।

লেনদেন, ব্যবসা-বাণিজ্য, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ইত্যাদি বিধিবিধান যেগুলো মু'আমালার অন্তর্ভুক্ত সেগুলো স্থান-কাল-পাত্র ও অবস্থার প্রেক্ষাপটে ইজতিহাদের মাধ্যমে পরিবর্তন করা যায়। এমনিভাবে রাষ্ট্রীয় সংগঠন পরিচালনা, জরুরি অবস্থা মোকাবেলা, প্রতিরক্ষা ও সামরিক ব্যয়বহন, সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য জনগণের ওপর বিভিন্ন ধরনের কর আরোপ করতে হয়। এ ক্ষেত্রে সরকার প্রয়োজনে কর হার বাড়তে পারে আবার তা মওকুফও করতে পারে।[৫]

অনুরূপভাবে তাযীরের আওতাভুক্ত কোন অপরাধের ক্ষেত্রে বিচারক তার সুবিবেচনা মোতাবিক গুরুদণ্ডের পরিবর্তে লঘুদণ্ড অথবা লঘুদণ্ডের পরিবর্তে গুরুদণ্ড অনুমোদন করতে পারেন, একই অপরাধের জন্য বিভিন্ন অপরাধীকে অভিন্ন শাস্তি না দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন শাস্তিও দিতে পারেন। ইসলামী আইনের এই অধ্যায়ে মানব বুদ্ধি

---

[১] মোঃ ইকবল হোসেন ভূঁইয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮৪
[২] আল কুরআন, ১৭ : ৭৭
[৩] আল কুরআন, ৩৩ : ৩৬
[৪] মুহাম্মদ রহমাতুল্লাহ খন্দকর, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭
[৫] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮

প্রয়োগে আইন প্রণয়নের যথেষ্ট সুযোগ ও বিস্তৃত পরিধি রয়েছে এবং সরাসরি কুরআন মাজীদ তা অনুমোদন করেছে। অবশ্য এ কাজ কোন ইসলামী আইনে উচ্চতর প্রজ্ঞার অধিকারী বিশেষজ্ঞদের দ্বারাই সম্পন্ন হতে হবে।[১]

ইসলামী আইন যুগোপযোগীকরণের উপযোগী আইন ব্যবস্থা

পৃথিবীর ধর্মসমূহের মধ্যে ইসলাম ধর্ম একটি যুগোপযোগী ও প্রগতিশীল ধর্ম। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে মানুষের চাহিদার পরিবর্তন ঘটে, নিত্য নতুন সমস্যার সৃষ্টি হয়। কিয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত পৃথিবীতে উদ্ভূত সকল সমস্যার সমাধান ইসলামী শরীয়াহর আলোকে দেয়া সম্ভব। ব্যক্তিগত জীবন থেকে শুরু করে জীবনের সকল ক্ষেত্র নবসৃষ্ট সমস্যা যতোই বৃহৎ বা ক্ষুদ্র হোক না কেন, যতোই কঠিন ও আধুনিক হোক না কেনো, সব ক্ষেত্রেই শরীয়াহর সমাধান রয়েছে।

কুরআন সুন্নাহতে কোনো বিষয়ের সমাধান সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত না থাকলে অবশ্যই তাতে একটি ব্যাপক ও সুস্পষ্ট মূলনীতি বিদ্যমান থাকবে, যার ভিত্তিতে মুজতাহিদ উদ্ভূত পরিস্থিতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ আইন প্রণয়ন করতে পারেন। এ ক্ষেত্রে কুরআন-সুন্নাহ থেকে প্রাপ্ত মূলনীতির আলোকে মানববুদ্ধি ও প্রজ্ঞার মাধ্যমে সময়োপযোগী আইন প্রণয়ন করা সম্ভব। ইসলামী শরীয়াহতে গতিশীলতা ও নমনীয়তার সুযোগ রয়েছে বলেই তা সময়ের বিবর্তনের মোকাবেলা করতে ও সকল অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে চলতে সক্ষম। তাই বলা যায়, ইসলামী শরীয়াহর ভিত্তি ও লক্ষ্য সুদৃঢ় হওয়ার কারণে তা কখনো অস্তিত্ব হারায় না, বিনাশও হয় না![২]

মোটকথা, ইসলামী আইন অগণিত বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। এ আইনের সাহায্যে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, নির্বিশেষে সকলের ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করা সম্ভব। পক্ষান্তরে মানব রচিত আইন একদিকে যেমন ত্রুটিপূর্ণ, অপরদিকে তা অহরহ পরিবর্তনশীল। কাজেই ইসলামের আহবান যেহেতু সার্বজনীন (কুরআন বিশ্বমানের পথনির্দেশ), তাই মানবজাতি যদি ইসলামী আইনের দিকে ফিরে আসে, তাহলে বিশ্বমানবতা ইহলৌকিক জীবনে লাভ করবে কাঙ্ক্ষিত শান্তি এবং পরকালে লাভ করবে মহামুক্তি।[৩]

নতুন উদ্ভূত সমস্যা সমাধানের জন্য মহানবী (সা.) কুরআন-সুন্নাহর নীতি অনুসরণ করার, আহলে বাইত ও সাহাবায় কেরামের জীবনাদর্শ অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) বলেছেন: "হে মানবজাতি! নিশ্চয়ই আমি তোমাদের মাঝে এমন জিনিস রেখে গেলাম তোমরা তা ধারণ বা অনুসরণ করলে কখনো পথভ্রষ্ট হবে না। আল্লাহর কিতাব (আল কুরআন) এবং আমার ইতরাত অর্থাৎ আহলে বায়াত।"[৪]

সার্বজনীনতা

ইসলাম সার্বজনীন ধর্ম। ইসলামী শরীয়াহ কোনো বিশেষ শ্রেণি বা স্থানের মানুষের জন্য রচনা করা হয়নি; বরং স্থান-কাল-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের জন্য প্রযোজ্য এবং সকল মানুষের জন্য সামঞ্জস্যশীল করে প্রণয়ন করা

---

[১] মোঃ ইকবল হোসেন ভূঁইয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭৪
[২] মুহাম্মদ রহমাতুল্লাহ খন্দকর, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮
[৩] মোঃ ইকবল হোসেন ভূঁইয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭৩-১৭৪
[৪] ইমাম তিরমিযী, *আস সুনান*, রিয়াদ, দারুস্ সালাম, ২০০০, হা. নং ৩৭৮৬, পৃ. ২০৪১

হয়েছে। পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তের মানুষের পক্ষেই তা অনুশীলন করা সহজ ও সম্ভব। যেমন রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন, আমি সমগ্র মানবজাতির জন্য প্রেরিত হয়েছি।

ড. ইউসুফ আল কারযাভি বলেন, এ শরীয়াহ কোনো বিশেষ মানবগোষ্ঠী বা কোনো নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের জন্যে নয়; বরং শ্বেতাঙ্গ, কৃষ্ণাঙ্গ, আরব, অনারব, প্রাচ্যের, পাশ্চাত্যের তথা সর্বস্তরের মানুষের জন্যেই প্রদত্ত। এতে কোনো ধরনের সাম্প্রদায়িকতা, পক্ষপাতিত্ব, প্রতিক্রিয়াশীলতা এবং শ্রেণি-বৈষম্যের স্থান নেই। গোটা মানবজাতিই এর দৃষ্টিতে সমান।[১]

সহজতা প্রতিষ্ঠা ও কঠোরতার বিলোপ সাধন

মানুষের স্বভাবজাত প্রবৃত্তি হচ্ছে সহজতার অনুশীলন করা এবং কঠোরতা থেকে দূরে থাকা। আল্লাহ তা'আলা সেভাবেই তা প্রণয়ন করেছেন মানুষ যাতে ইসলামী আইন অত্যন্ত সহজে পালন করতে পারে। মানুষের সাধ্যের অধিক কিছু চাপিয়ে দেওয়া মহান আল্লাহর সাধারণ নীতিমালা বিরোধী। মহান আল্লাহ বলেন,

يُرِيْدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

"আল্লাহ তোমাদের জন্য যা সহজ তা চান এবং যা তোমাদের জন্য ক্লেশকর তা চান না।"[২]

অপর এক আয়াতে আল্লাহ বলেন, "আল্লাহ দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের উপর কঠোরতা আরোপ করেননি।"[৩] অপর এক আয়াতে উল্লেখ আছে: "আল্লাহ কারো উপর এমন কোন কষ্টদায়ক দায়িত্ব অর্পণ করেন না যা তার সাধ্যাতীত।"[৪]

সকল সৃষ্টির স্বার্থ সংরক্ষণ

ইসলামী শরীয়াতে মানুষের পাশাপাশি সকল সৃষ্টির স্বার্থ যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে। পশুপাখি, জীবজন্তু কোনো কিছুই ইসলামী শরীয়াতের নিরাপত্তা বেষ্টনীর বাইরে নয়। ইসলাম ধর্ম মতে, পশু-পাখির প্রতি নম্রতা প্রদর্শন ইবাদতের পর্যায়ভুক্ত। হাদিসে এসেছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " بَيْنَمَا كَلْبٌ يُطِيفُ بِرَكِيَّةٍ كَادَ يَقْتُلُهُ الْعَطَشُ، إِذْ رَأَتْهُ بَغِيٌّ مِنْ بَغَايَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَنَزَعَتْ مُوقَهَا فَسَقَتْهُ، فَغُفِرَ لَهَا بِهِ ".

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন যে, একদা একটি কুকুর এক কূপের চারদিকে ঘুরছিল এবং প্রবল পিপাসার কারণে সে মৃত্যুর নিকটে পৌঁছেছিল। তখন বনী ইসরাঈলের ব্যভিচারিণীদের একজন কুকুরটির অবস্থা লক্ষ্য করল, এবং তার পায়ের মোজার সাহায্যে পানি সংগ্রহ করে কুকুরটিকে পান করাল। এ কাজের প্রতিদানে আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্ষমা করে দিলেন।[৫]

---

[১] ড. ইউসুফ আল কারযাভী, *ইসলামী শরীয়াতের বাস্তবায়ন*, ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, ২০০৯, পৃ. ২৪

[২] আল কুরআন, ২ : ১৮৫

[৩] আল কুরআন, ২২ : ৭৮

[৪] আল কুরআন, ২ : ২৮৬

[৫] আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল বুখারী আল জুফী (রহ.), *বুখারী শরীফ*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, হাদীস নং ৩২২১

পশু-পাখিকে কষ্ট দেওয়া গুনাহের কাজ। অন্যায়ভাবে একটা পিপীলিকা হত্যা করাও ইসলামে নিষেধ করা হয়েছে। কোনো প্রাণির প্রতি কোনো মানুষ অন্যায় আচরণ করলে এর প্রতিদানে মানুষকে অবশ্যই শাস্তি ভোগ করতে হবে। হাদীসে এসেছে,

عَنِ ابْنِ عُمَرَ ـ رضى الله عنهما ـ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " دَخَلَتِ امْرَأَةٌ النَّارَ فِي هِرَّةٍ رَبَطَتْهَا، فَلَمْ تُطْعِمْهَا، وَلَمْ تَدَعْهَا تَأْكُلُ مِنْ خِشَاشِ الأَرْضِ ".

ইবন উমর (রা.) সূত্রে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একজন মহিলা একটি বিড়ালের কারণে জাহান্নামে গিয়েছিল, সে তাকে বেঁধে রেখেছিল। সে না তাকে খাবার দিয়েছিল, না তাকে ছেড়ে দিয়েছিল, যাতে সে যমীনের পোকামাকড় খেতে পারত।[১]

উদারতা

ইসলাম উদার ধর্ম। এ ধর্মের বিধিবিধান, আইন-কানুনও উদার। ফলে ইসলামী আইনে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, নির্বিশেষে সকলের জন্য সার্বিক নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ

“হে মু’মিনগণ! তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করোনা; কিন্তু তোমাদের পরস্পরের সম্মতিতে ব্যবসায় করা বৈধ।[২]

কুরআনের উপরোক্ত নির্দেশ জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, নির্বিশেষে সকলের জন্য প্রযোজ্য। মহানবী (সা.) বলেন, “আমাকে উদারতা সম্পন্ন দ্বীন সহকারে প্রেরণ করা হয়েছে।”[৩]

ইসলামী আইন স্থবির নয়

ইসলামী আইন হচ্ছে অত্যন্ত নিখুঁত ও পূর্ণাঙ্গ আইন। পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় সকল বিষয়ই ইসলামী আইনের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

مَا فَرَّطْنَا فِى ٱلْكِتَٰبِ مِن شَىْءٍ

“আমরা কিভাবে (আল কুরআনে) কোন কিছুই বাদ রাখিনি।”[৪]

মানুষের সামগ্রিক সমস্যার সমাধান কুরআন মাজীদে নিহিত রয়েছে। তবে প্রয়োজনে ইসলাম ইজতিহাদেরও সুযোগ রেখেছে। নব সৃষ্ট সমস্যার সমাধান ইজমা, কিয়াসসহ ইসলামী আইনের অন্যান্য উৎসসমূহও প্রয়োগের সুযোগ রয়েছে। কাজেই ইসলামী আইন স্থবির কিংবা সেকেলে নয়, বরং একান্তভাবে যুগোপযোগী।

ইসলামী আইন মধ্যমপন্থা অবলম্বনকারী আইন ব্যবস্থা

ইসলামী আইনে বাড়াবাড়ির কোনো সুযোগ নেই। ইসলামী আইন হচ্ছে মধ্যপন্থা অবলম্বনের আইন, জনস্বার্থ সংরক্ষণের আইন। মহান আল্লাহ বলেন,

---

[১] আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল বুখারী আল জুফী (রহ.), *প্রাগুক্ত*, হাদীস নং ৩০৮৪

[২] আল কুরআন, ৪ : ২৯

[৩] ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বাল, *আল মুসনাদ*, হাদীস নং ২৩৭১০, ২৪৭৭১

[৪] আল কুরআন, ৬ : ৩৮

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفۡسًا اِلَّا وُسۡعَهَا ؕ لَهَا مَا كَسَبَتۡ وَ عَلَيۡهَا مَا اكۡتَسَبَتۡ ؕ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذۡنَاۤ اِنۡ نَّسِيۡنَاۤ اَوۡ اَخۡطَاۡنَا ۚ رَبَّنَا وَ لَا تَحۡمِلۡ عَلَيۡنَاۤ اِصۡرًا كَمَا حَمَلۡتَهٗ عَلَى الَّذِيۡنَ مِنۡ قَبۡلِنَا ۚ رَبَّنَا وَ لَا تُحَمِّلۡنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ ۚ وَ اعۡفُ عَنَّا ٝ وَ اغۡفِرۡ لَنَا ٝ وَ ارۡحَمۡنَا ٝ اَنۡتَ مَوۡلٰىنَا فَانۡصُرۡنَا عَلَى الۡقَوۡمِ الۡكٰفِرِيۡنَ

"আল্লাহ কারো উপর এমন কোন কষ্টদায়ক দায়িত্ব অর্পণ করেন না যা তার সাধ্যাতীত। সে ভালো যা উপার্জন করে তার প্রতিফল তারই যা উপার্জন করে তার প্রতিফল তারই। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের পূর্ববর্তীগণের উপর যেমন গুরু দায়িত্ব অর্পণ করেছিলে আমাদের উপর অর্পণ করো না যা বহন করার শক্তি আমাদের নেই। আমাদের পাপ মোচন কর, আমাদেরকে ক্ষমা কর, তুমিই আমাদের অভিভাবক। সুতরাং কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে জয়যুক্ত কর।"[১]

অপর এক আয়াতে বলা আছে,

وَ كَذٰلِكَ جَعَلۡنٰكُمۡ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوۡنُوۡا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ

"এভাবে আমি তোমাদেরকে এক মধ্যপন্থী জাতিরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছি, যাতে তোমরা মানবজাতির জন্য সাক্ষীস্বরূপ এবং রাসূল তোমাদের জন্য সাক্ষীস্বরূপ হবে।"[২]

উপরে উল্লিখিত আয়াতদ্বয়ে মুসলিম জাতিকে মধ্যপন্থী জাতি হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। কাজেই কুরআন এবং হাদীসে মধ্যপন্থী উম্মতের উপযোগী আইনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

ইসলামী আইন ইজতিহাদের উপযোগী আইন ব্যবস্থা

ইসলাম চির প্রগতির ধর্ম। ইসলামী আইনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো এর গতিশীলতা। নতুন সৃষ্ট যেকোনো সমস্য সমাধানের উৎকৃষ্ট সমাধান পাওয়ার ক্ষেত্রে একটি পূর্ণাঙ্গ ও সুস্পষ্ট মূলনীতি ইসলামী আইনে বিদ্যমান আছে। যার ভিত্তিতে ইসলামী জ্ঞানসম্পন্ন মুজতাহিদগণ উদ্ভূত পরিস্থিতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ আইন প্রণয়ন করতে সক্ষম। কুরআন-সুন্নাহর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ মানববুদ্ধি প্রয়োগের বিরাট সুযোগ ইসলামী আইন প্রণয়নে ইজতিহাদ কওে দিয়েছে। ইসলামী আইনের প্রথম উৎস কুরআন মাজীদের পাশাপাশি আইন প্রণয়নে ইজতিহাদ চর্চা সরাসরি মহানবী (সা.) কর্তৃকও অনুমোদিত।

মহানবী (সা.) তাঁর প্রিয় সাহাবী মুআয ইবন জাবাল (রা.) কে ইয়ামানের শাসক বা বিচারক নিয়োগ করে তাকে বিদায়দেওয়ার সময় বলেন, "তুমি কিসের ভিত্তিতে মীমাংসা করবে? তিনি বললেন, আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী। তিনি বললেন, তাতেও যদি সমাধান না পাও? তিনি বললেন, তাহলে আল্লাহর রাসূলের সুন্নাহ অনুযায়ী। তিনি বললেন, তাতেও যদি সমাধান না পাও? তিনি বললেন, তাহলে আমি আমার বুদ্ধি প্রয়োগ করে সিদ্ধান্ত খুঁজে বের করব। তখন তিনি মুআয (রা.) কে বুকে টোকা দিয়ে বললেন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি আল্লাহর রাসূলের প্রতিনিধিকে তাঁর মনঃপুত সিদ্ধান্তে পৌঁছার তাওফিক দিয়েছে।"[৩]

ইসলামী আইনে নমনীয়তার সুযোগ

নমনীয়তা ইসলামী আইনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ইসলামী শরীয়াত চিরন্তন ও স্থায়ী হওয়া সত্ত্বেও মানুষের পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে ইসলামী আইনে নমনীয়তারও সুযোগ রাখা হয়েছে। এর

---

[১] আল কুরআন, ২ : ২৮৬

[২] আল কুরআন, ২ : ১৪৩

[৩] আবু দাউদ সুলায়মান ইবনুল আশ'আছ আস সিজিস্তানি (রহ.), *আবূ দাউদ শরীফ*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ,হাদীস নং ৩৫৫৩

উদ্দেশ্য উদ্ভূত নতুন সমস্যার সমাধানে মানবজীবন অচল ও স্থবির হয়ে না পরে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যে কোন প্রকারেই আল্লাহর সাথে শরীক করা ইসলাম আইনে চিরন্তনভাবে নিষিদ্ধ। কিন্তু কোন মু'মিন ব্যক্তি পৌত্তলিক বা নাস্তিকদের চরম নির্যাতনের শিকার হয়ে যদি মৃত্যুর আশংকা করে, সেই অবস্থায় সে তার ঈমান গোপন রেখে পৌত্তলিক বা নাস্তিকের উক্তি উচ্চারণ করতে পারে।[১] আল্লাহ তা'আলা বলেন,

مَنْ كَفَرَ بِاللهِ مِنْۢ بَعْدِ اِيْمَانِهٖٓ اِلَّا مَنْ اُكْرِهَ وَ قَلْبُهٗ مُطْمَئِنٌّۢ بِالْاِيْمَانِ وَ لٰكِنْ مَّنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللهِ ۚ وَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ

"কেউ ঈমান আনার পর আল্লাহকে অস্বীকার করলে এবং কুফরীর জন্য হৃদয় উন্মুক্ত রাখলে তার উপর আপতিত হবে আল্লাহর গজব এবং তার জন্য রয়েছে মহাশাস্তি; তবে তার জন্য নয় যাকে কুফরীর জন্য বাধ্য করা হয় অথচ তার অন্তর ঈমানে অবিচলিত।"[২]

অনুরূপভাবে কুরআন মাজীদে মৃত জন্তু, রক্ত ও শূকরের মাংস হারাম ঘোষণা করা হয়েছে,

اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِيْرِ

"নিশ্চয়ই আল্লাহর মৃত জন্তু ও শূকরের মাংস এবং যার উপর আল্লাহর নাম ব্যতীত অন্যের নাম উচ্চারিত হয়েছে তা তোমাদের জন্য হারাম হয়েছে।"[৩]

কিন্তু অক্ষম ব্যক্তির ক্ষেত্রে উক্ত নির্দেশের পরপরই একই আয়াতে বলা হয়েছে,

فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّ لَا عَادٍ فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِ ؕ اِنَّ اللهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

"কিন্তু যে ব্যক্তি অনন্যোপায় অথচ নাফরমান বা সীমালঙ্ঘনকারী নয়, তার কোন পাপ হবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতিশয় ক্ষমাশীল দয়ালু।"[৪]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, "রমযান মাস, এতে মানুষের দিশারী এবং সৎপথের স্পষ্ট নিদর্শন ও সত্যাসত্যের পার্থক্যকারীরূপে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা এই মাস (রমযান) পাবে তারা যেন এই মাসে সিয়াম পালন করে।"[৫]

এ আবশ্যক পালনীয় বিধান জারি করার পাশাপাশি বলা হয়েছে, "তোমাদের মধ্যে কেউ পীড়িত হলে বা সফরে থাকলে অন্য সময় এই সংখ্যা পূরণ করে দিতে হবে। আল্লাহ তোমাদের জন্য যা সহজ তা চান এবং যা তোমাদের জন্য ক্লেশকর তা চান না, এ জন্য যে, তোমরা সংখ্যাপূর্ণ করবে এবং তোমাদেরকে সৎপথে পরিচালিত করার কারণে তোমরা আল্লাহর মহিমা ঘোষণা করবে এবং যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পার।"[৬]

অপর এক আয়াতে ঘোষিত হয়েছে, "তুমি ক্লেশ পাবে এজন্য আমি তোমার প্রতি কুরআন নাযিল করিনি।"[৭]

ইসলামী শরীয়াত এমন যে, এর অনেক বিধান অলঙ্ঘনীয় আছে কিন্তু অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তাতে নমনীয়তা লক্ষ্য করা যায়। যেমন সফরের কারণে শরী'আতের বিধানে নমনীয়তা প্রদর্শন করা হয়েছে।

---

[১] মোঃ ইকবল হোসেন ভূঁইয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭৫
[২] আল কুরআন, ১৬ : ১০৬
[৩] আল কুরআন, ২ : ১৭৩
[৪] আল কুরআন, ২ : ১৭৩
[৫] আল কুরআন, ২ : ১৮৫
[৬] আল কুরআন, ২ : ১৮৫
[৭] আল কুরআন, ২০ : ২

নৈতিকতার লালন ক্ষেত্র

ইসলামী শরীয়াতে সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করা হয়েছে নৈতিকতার প্রতি। পৃথিবীর সকল ধর্মের অন্যতম উদ্দেশ্য মানুষকে নৈতিকতা চর্চায় উদ্বুদ্ধ করা। যতো আইন থাকুক না কেনো, শাস্তি যতো কঠোরই হোক না কেন মানুষের মাঝে নৈতিকতা জাগ্রত করা সম্ভব না হলে তার দ্বারা আইন পালন করানো, অপরাধ থেকে ফিরিয়ে রাখা কোনোটাই সম্ভব না। শাস্তি ভোগ করার পর পূনরায় সেই অপরাধে জড়িত হওয়ার অসংখ্য ঘটনা গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। কারণ এ সকল অপরাধী শাস্তি ভোগ করেছে, কিন্ত নৈতিকতা বোধ তাদের মধ্যে জাগ্রত হয়নি।

নৈতিকতা বা Morality শব্দের আরবী প্রতিশব্দ (الاخلاقية) যা আখলাক (الاخلاق) শব্দের বিশেষণ।[১] এর অর্থ স্বভাব, চরিত্র, সচ্চরিত্র, নৈতিকতা, সদাচার, নীতিবোধ এবং ভাল অভ্যাস ইত্যাদি।[২] (الاخلاق) আখলাক শব্দটি খুলুকুন (خلق) শব্দের বহুবচন, যার শাব্দিক অর্থ, মানুষের সহজাত স্বভাব ও প্রকৃতি, চরিত্র।[৩] রাগিব আল-ইসফাহানী বলেন, (خلق) খালক, (خلق) খুল্ক, (خلق) খুলুক মূলত এক ও অভিন্ন। তবে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে (خلق) খালক শব্দটি দৃশ্য, অবায়ব ও আকৃতির সাথে সংশ্লিষ্ট। আর (خلق) খুলুক শব্দটি স্বভাব-চরিত্র ও অভ্যাস-আচরণ সাথে সংশ্লিষ্ট।[৪]

ইসলামী নৈতিকতা বা আখলাকের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে আবূ হামিদ মুহাম্মাদ আল-গাযালী রহ. বলেন, আখলাক হচ্ছে অন্তরে বদ্ধমূল একটি প্রকৃতির নাম, যা দ্বারা ক্রিয়াকর্ম অনায়াসে ও চিন্তা-ভাবনা ব্যতিরেকে প্রকাশ পায়। এই প্রকৃতির দ্বারা প্রকাশিত ক্রিয়াকর্ম যদি বিবেক ও শরীয়াতের দৃষ্টিতে উৎকৃষ্ট হয় তবে সেই প্রকৃতিকে বলা হয় সচ্চরিত্র। পক্ষান্তরে, যদি তা দ্বারা মন্দ ক্রিয়াকর্ম প্রকাশ পায় তবে সেই প্রকৃতিকে বলা হয় অসচ্চরিত্র।[৫]

ইসলামের দৃষ্টিতে নৈতিকতা হচ্ছে প্রশস্ত হৃদয়ের অধিকারী হওয়া, আল্লাহ্ তা'আলার পথে অর্থ সম্পদ ব্যয় করা এবং কাউকে কষ্ট নাদেওয়া। এর সর্বনিম্নস্তর হচ্ছে সহনশীল হওয়া এবং প্রতিশোধ না নেয়া, মধ্যম স্তর হচ্ছে অত্যাচারীর প্রতি দয়া ও ক্ষমা প্রদর্শন করা এবং তার কল্যাণ কামনা করা আর সর্বোচ্চ স্তর হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য নিজেকে উৎসর্গ করে দেওয়া।[৬]

ইসলামের আলোকে ব্যক্তির দেহ, আত্মা এবং জীবনের পার্থিব ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধকে একাত্ব করে যে উন্নত চরিত্র তৈরি হয়, তা ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের অভিন্ন লক্ষ্য অর্জনে ঐক্য, সংহতি ও সুবিচার প্রতিষ্ঠায় দৃঢ় প্রত্যয়ী ব্যক্তিত্বের বহিঃপ্রকাশ ঘটায়, তাকে নৈতিকতা বলে।[৭] ইসলামি নৈতিকতা হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া অন্য কোন কিছুর দিকে মনযোগী না হওয়া, তিনি ছাড়া কারো নিকট কিছু প্রত্যাশা না করা,

---

[১] মুনির বা'লাবাক্কী, *আল-মাওরিদ*, বৈরুতঃ দারুল 'ইলম লিল মালাঈন, ১৯৭৭, পৃ.৫৯২; HANS WEHR, *A DICTIONARY OF MODERN WRITTEN ARABIC*, New York: Poken Language Services, Inc. p. p.258-59

[২] ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আধুনিক 'আরবী-বাংলা অভিধান*, ঢাকাঃ রিয়াদ প্রকাশনী, ৩য় সংস্করণ, ২০০৬ খ্রি., পৃ. ৩৭৬; ইবরাহিম মাদকুর ও অন্যান্য, আল মু'জামুল ওয়াসিত, ঢাকাঃ আল মাকতাবাতুল ইসলামিয়াহ্, ২০১৩ খ্রি., পৃ. ২৬১

[৩] আল কুরআন, ৬৮: ০৪; (خلق) খুলুক শব্দটি এ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে

[৪] রাগিব আল-ইসফাহানী, *আল-মুফরাদাত ফী গারীবিল কুরআন*, খ. ১, পৃ, ২১০

[৫] আবূ হামিদ মুহাম্মাদ আল গাযালী, *এহইয়াউ উলুমুদ্দীন*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, খ. ৩, পৃ. ৫৩

[৬] ইমাম আল গাযালি, অনু. আব্দুল খালেক, *সৌভাগ্যের পরশমণি*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ৭ম সংস্করণ, ২০০৫ খ্রি., খ. ৩, পৃ. ২৩

[৭] সাইয়েদ কুতুব শহীদ, অনু. মাওলানা কারামত আলী নিযামী, *ইসলামে সামাজিক সুবিচার*, ঢাকাঃ ইসলামিয়া কুরআন মহল, ৪র্থ সংস্করণ, ২০০২ খ্রি., পৃ. ৭৬

তাঁর সন্তুষ্টির জন্য জীবন ও সম্পদ উৎসর্গ করতে প্রস্তুত থাকা এবং অন্যের প্রাপ্য সম্পর্কে সর্বোচ্চ সতর্ক থাকা।[১] ইসলামি নৈতিকতা হচ্ছে মানব চরিত্রের এমন এক উন্নত অবস্থা যা তার মধ্যে চিন্তার ব্যাপকতা, পরকালে বিশ্বাস, অন্তরের উদারতা ও জীবনের প্রশস্ততাকে অনিবার্য করে তোলে। আর এগুলো মানুষের ব্যক্তিত্ব গঠনে অত্যন্ত জরুরি, যাতে সে পৃথিবীতে আল্লাহ্ তা'আলা প্রদত্ত মহান দায়িত্ব পালন করতে পারে।

আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের আভ্যন্তরীণ চিন্তা, চেতনাবোধ ও বাহ্যিক আচরণ এবং কর্মপদ্ধতির পরিশুদ্ধির জন্যই আল কুর'আন অবতীর্ণ করেছেন।[২] মানুষের আভ্যন্তরীণ পরিশুদ্ধি হচ্ছে, তার চিন্তার ভিত্তি, কল্পনার বিস্তৃতি, বিশ্লেষণের কৌশল, জ্ঞান অর্জনের লক্ষ্য, বিশ্বাসের যৌক্তিকতা, জীবন সম্পর্কে চেতনাবোধ ও সমগ্র প্রত্যাশা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির লক্ষ্যে আবর্তিত হওয়া। এ আবর্তনের ফলে তার সত্ত্বা জুড়ে আল্লাহ্ তা'আলার ভয় প্রবাহমান থাকবে এবং এ অবস্থায় তার দ্বারা উন্নত পর্যায়ের চরিত্র ও আচরণ প্রকাশিত হতে থাকবে। মানুষের কর্মের মাধ্যমে প্রকাশিত উন্নততর আচরণই হচ্ছে নৈতিকতা।[৩] মানুষের নৈতিক উৎকর্ষ সাধনই আল কুর'আনের মূল উদ্দেশ্য।

মানুষ সত্ত্বাগতভাবেই নৈতিক গুণসম্পন্ন জীব। ইসলাম তার নৈতিক স্বাধীনতা যেমন দিয়েছে তেমনি তার উপর নৈতিক দায় দায়িত্বও অর্পণ করেছে।[৪] নৈতিকতার কারণেই পৃথিবীর সকল জীবজন্তুর উপর মানুষকে বিশেষ মর্যাদা দান করা হয়েছে। পৃথিবীতে তাকে আল্লাহ্ তা'আলার প্রতিনিধি হওয়ার মর্যাদায়ও অভিষিক্ত করা হয়েছে এ নৈতিকতার ভিত্তিতেই।[৫] অতএব আল কুর'আনের দৃষ্টিতে মানবতার প্রাণ হচ্ছে মানুষের নৈতিকতা। মানুষের জীবনের গঠন, ভাঙ্গন, উন্নতি ও অবনতির চূড়ান্ত ভিত্তি হচ্ছে তার নৈতিকতা।[৬] মূলত মানুষের চূড়ান্ত সফলতা বা ব্যর্থতার উপর তার নৈতিক আচরণের প্রত্যক্ষ প্রভাব বিদ্যমান।

সাধারণ নৈতিক আচরণের পর উন্নততর যে নৈতিক আচরণ মানুষের চরিত্রে প্রকাশিত হতে পারে। তার ভিত্তি হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি অবিচল বিশ্বাস[৭] ও পূর্ণাঙ্গ আত্মসমর্পণ।[৮] তাঁর দেওয়া যাবতীয় বিধি-বিধান বাস্তব জীবনে অনুশীলনের মাধ্যমে তাঁকে ভয় করে নিষিদ্ধকাজ থেকে বিরত থাকা ও তাঁর সন্তুষ্টি লাভকেই জীবনের লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারণ করা।[৯] নৈতিকতার এ পর্যায়কে ইসলামি নৈতিকতা বলে। আল কুর'আন মানুষের নৈতিক চরিত্র গঠনের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছে এবং এ ক্ষেত্রে বাস্তবভিত্তিক ও ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। আখলাকে হাসানা বা নৈতিকতার গুরুত্ব সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন,

إِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ أَحْسَنَكُمْ أَخْلَاقًا

---

১ ইমাম আল গাযালি, *সৌভাগ্যের পরশমণি*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২৮২

২ জনাব আ. ফ. ম. আব্দুল হক ফরিদী, ড. সিরাজুল হক ও অন্যান্য কর্তৃক সম্পাদিত, *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২য় সংস্করণ, ২০১০ খ্রি., খ. ৮, পৃ. ৫২৬

৩ আবদুস শহীদ নাসিম অনূদিত, *ইসলামী জীবন ব্যবস্থার মৌলিক রূপরেখা*, ঢাকা: শতাব্দী প্রকাশনী, ৩য় সংস্করণ, ২০০৮ খ্রি., পৃ. ১২৪

৪ মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, *অপরাধ প্রতিরোধে ইসলাম*, ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, ৪র্থ প্রকাশ, ২০১০ খ্রি., পৃ. ১১৪

৫ আমরা আদম সন্তানকে সম্মান দান করেছি এবং স্থল ও জলপথে যানবাহনের ব্যবস্থা করে দিয়েছি, তাদের পবিত্র জিনিস দ্বারা রিয্ক এর ব্যবস্থা করেছি এবং আমরা যা সৃষ্টি করেছি তার বহু জিনিসের উপর তাকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি।' দ্র. আল কুরআন, ১৭: ৭০; মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান অনূদিত, ইসলামী সংস্কৃতির মর্মকথা, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪

৬ মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, *আল কুর'আনের আলোকে উন্নত জীবনের আদর্শ*, পৃ. ২৭০; আল্লাহ্ তা'আলা বলেন সেই ব্যক্তি সফলকাম হবে যে নিজেকে নৈতিকভাবে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন করবে এবং সে ব্যক্তিই ব্যর্থ হবে, যে নিজেকে অনৈতিক মন্দ স্বভাব দ্বারা কলুষিত করবে।' দ্র. আল কুরআন, ৯১: ০৯-১০

৭ প্রকৃত নিরাপত্তা তো তাদের জন্যই এবং তারাই সঠিক পথ প্রাপ্ত, যারা ঈমান এনেছে অতপর নিজেদের ঈমানকে যুল্‌মের সাথে মিশায়নি।' দ্র. আল কুরআন, ০৬: ৮২

৮ আল কুরআনে বর্ণিত আছে, যখন তার প্রতিপালক তাকে বলেছিল, আত্মসমার্পণ করো। সে বলেছিল আমি মহাজগতের প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে আত্মসমর্পণ করলাম।' দ্র. আল কুরআন, ০২: ১৩১

৯ আবদুস শহীদ নাসিম অনূদিত, *ইসলামী জীবন ব্যবস্থার মৌলিক রূপরেখা*, পৃ. ১২৬

'তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই সর্বোত্তম, যার চরিত্র সবচেয়ে ভাল'।[১] তিনি আরও বলেন,

مَا شَيْئٌ اَثْقَلَ فِىْ مِيْزَانِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ خُلُقٍ حَسَنٍ

'ক্বিয়ামতের দিন মুমিনের দাঁড়িপাল্লায় সর্বাপেক্ষা ভারী যে জিনিসটি রাখা হবে তা হচ্ছে উত্তম চরিত্র' ।[২]

সুতরাং নৈতিকতা মানব জীবনের জন্য কতটা প্রয়োজন ও গুরুত্বপূর্ণ, তা এই হাদীস থেকে সহজেই অনুমেয়। এবং ইসলামী আইনে এর গুরুত্বও উপরে উল্লেখিত হাদীস দ্বারা সহজেই অনুধাবন করা যায়।

ইসলামী আইন অবিভাজ্য

ইসলাম যেমনিভাবে একটি পরিপূর্ণ ধর্ম অনুরূপভাবে ইসলামী আইন ব্যবস্থাও একটি পূর্ণাঙ্গ আইন ব্যবস্থা ইসলামী আইন মানব জীবনের যাবতীয় আচরণকে নিজের আওতাভুক্ত করেছে। এখানে পার্থিব ও পারলৌকিক, 'ইবাদাত বন্দেগী, ব্যক্তিগত আচরণ, আকীদা বিশ্বাস, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ইত্যাদি বিষয় ইসলামী আইনের আওতাভুক্ত। সরকারি কার্যক্রম পরিচালনা সংক্রান্ত আইনসমূহ যেমন ইসলামী আইনের অন্তর্ভুক্ত, তদ্রুপ নামায, রোযা, যাকাত, হাজ্জ ইত্যাদি ধর্ম সংক্রান্ত বিধি-বিধানও ইসলামী আইনের অন্তর্ভুক্ত। এই আইনের আওতায় মানুষের ধর্মীয় জীবন ও একান্তভাবে পার্থিব কাজকর্ম সংশ্লিষ্ট জীবন অখণ্ড ও অবিভাজ্য অর্থাৎ মানুষের গোটা জীবনই তার ধর্মীয় জীবন। এ আইনের মাধ্যমে দল, সমাজ ও রাষ্ট্র গঠিত ও পরিচালিত হয় এবং ব্যক্তি ও সমাজের পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।[৩]

মোটকথা হচ্ছে ইসলাম মসজিদ থেকে রাষ্ট্রীয় ভবন এবং ইবাদত থেকে রাজনৈতিক নেতৃত্ব পর্যন্ত জীবনের সকল ক্ষেত্রেই নিজের গণ্ডিভুক্ত তাদের মাঝে সমতা বিধান করে এবং দ্বীন ও দুনিয়ার পারস্পরিক পার্থক্য দূর করে দেয়। যে কোন বিচারেই ধরা হোক, প্রকৃতপক্ষে ইসলামী আইনসমূহ পারলৌকিক জীবনে একমাত্র মানব কল্যাণেই রচিত। এ থেকে একটি বিষয় স্পষ্টতই অনুধাবন করা যায় যে, প্রতিটি পার্থিব কার্যক্রমেরই একটি পারলৌকিক দিক রয়েছে। চাই তো কোন 'ইবাদত সংক্রান্ত কার্যক্রম হোক বা সামাজিক প্রাকৃতিক হোক, কি শাসনতান্ত্রিক অথবা রাষ্ট্রীয় কর্তব্য পালন, কারো অধিকার আদায় করা বা না করা অথবা তা কাউকে শাস্তি দান বিষয়ক হোক, দুনিয়ার জীবনে তার উপর পড়ে। আবার এ কাজগুলোর প্রভাব পারলৌকিক জীবনের উপরেও পড়ে। একে আখিরাতের পুরস্কার বা শাস্তি বলা হয়। ইসলামী আইনের লক্ষ্যই যেহেতু মানুষকে দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণ নিশ্চিতকরণ, তাই এক্ষেত্রে এ উদ্দেশ্যকে বিভক্ত করা যায় না। কাজেই এর কিছু অংশ গ্রহণ করা এবং কিছু অংশ বর্জন করা এর মূল উদ্দেশ্যের পরিপন্থী।[৪]

স্বাধীন বিচারব্যবস্থা

প্রচলিত আইনে বিচার ব্যবস্থার স্বাধীনতা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ স্বাধীন বিচার ব্যবস্থা ব্যতীত ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। যেকারণে ইসলামী বিচারব্যবস্থা পুরোপুরি স্বাধীন। পৃথিবীতে এমন কোনো জাতি নেই, যাদের

---

[১] আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল বুখারী আল জুফী (রহ.), *বুখারী শরীফ*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ,হাদীস নং ৩৩০৭

[২] আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা আত-তিরমিযী (রহ.), *তিরমিযী শরীফ*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ,হাদীস নং ২০০৮

[৩] মোঃ ইকবল হোসেন ভূঁইয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮০

[৪] *প্রাগুক্ত*

বিচারকার্যে স্বাধীনতার নজির মুসলমানদের সমপর্যায়ে অবস্থান করতে পারে। মুসলিম বিচারক কোন নির্দিষ্ট মতাদর্শের অধীন নন যে, ঐ মতামতের বিরুদ্ধাচরণ করায় তার ক্ষমতা থাকবে না। তেমনিভাবে তিনি আপন আইনের বলয়ে আবদ্ধ থাকবেন না, যা থেকে বেরিয়ে আসার সুযোগ রহিত হবে। বিচারকের উপর কোনো শাসকের বিচারকার্যে হস্তক্ষেপ থাকবে না। মুসলমানরা বিভিন্ন দেশে ও ভূখণ্ডে অবস্থান করেছে। শাসকের পরিবর্তন হয়ে ন্যায়পরায়ণ ও জালিম শাসকের আবির্ভাব হয়েছে। কিন্তু বিচার বিভাগ দুর্ভেদ্য দুর্গে সংরক্ষিত ছিল। ন্যায়নিষ্ঠ ও জালেম এবং সত্যনিষ্ঠ ও অত্যাচারী শাসক কারো হাতই তাকে স্পর্শ করেনি। বিচারক ও তার ইজতিহাদের উৎস হলো আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূল (সা.)-এর সুন্নাত, তত্ত্বাবধায়ক হলো তার বিবেক ও দ্বীনদারী এবং অন্যায়ে বাধাদানকারী হলো তার ঈমান ও বলিষ্ঠ প্রত্যয়।[১]

[১] মুহাম্মদ ছালাহ উদ্দিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৭

ইসলামী আইনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

মানব সমাজকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে, মানব সভ্যতার উন্নয়ন নিশ্চিত করতে, সার্বজনীন নিরাপত্তা বিধান করতে ইসলামী আইনের বিকল্প নেই। ইসলামী আইন শান্তিপূর্ণ পৃথিবীর একমাত্র রক্ষাকবচ। সার্বজনীন কল্যাণের উৎসও ইসলামী আইন। উন্নততর মানব সভ্যতার উন্মেষ ও সভ্য সমাজ গঠনে ইসলামী আইন এক অপরিহার্য বিষয়।

ইসলামী আইন মানবজাতিকে কল্যাণ ও সমৃদ্ধির পথে পরিচালিত করে এবং স্বার্থপরতা, ধ্বংস, পতন ও ক্ষতির হাত থেকে মানব সভ্যতাকে রক্ষা করে। ইসলামী আইন মানুষের যোগ্যতা ও প্রতিভা বিকাশের সহায়ক। সর্বোপরি এই আইন নৈতিক অবক্ষয় ও দেউলিয়াপনা থেকে সমাজ জীবনকে রক্ষা করে মানবীয় মূল্যবোধের উৎকর্ষ সাধন করে। বস্তুত ইসলামী আইনের অনুসরণ ব্যতীত পূর্ণাঙ্গ ঈমানদার হওয়া সম্ভব নয়। এই আইন মেনে চলার এবং তার বিপরীত আইন বর্জন করার জন্য কুরআন মাজীদের বহু জায়গায় তাগিদদেওয়া হয়েছে।[১] আল্লাহ তা'আলা বলেন,

شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا وَصّٰى بِهٖ نُوْحًا وَّ الَّذِيْۤ اَوْحَيْنَاۤ اِلَيْكَ وَ مَا وَصَّيْنَا بِهٖۤ اِبْرٰهِيْمَ وَ مُوْسٰى وَ عِيْسٰۤى اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَ لَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ

"তিনি তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করেছেন দ্বীন , যার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি নূহকে, আর যা আমি ওহী করেছি তোমাকে এবং যার নির্দেশ দিয়েছিলাম ইবরাহিম, মূসা ও ঈসা (আ.) কে এই বলে যে, তোমরা দ্বীন কে প্রতিষ্ঠিত কর এবং তাতে মতভেদ করো না।"[২]

শরীয়াত পরিভাষাটি এই আয়াত থেকেই গ্রহণ করা হয়েছে । আল্লাহ তা'আলা বলেন,

ثُمَّ جَعَلْنٰكَ عَلٰى شَرِيْعَةٍ مِّنَ الْاَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَ لَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ

"অত:পর আমি তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করেছি দ্বীনের বিশেষ বিধানের উপর। সুতরাং তুমি তাঁর অনুসরণ কর, অজ্ঞদের খেয়াল খুশির অনুসরণ করবে না।"[৩]

উপরে উল্লিখিত আয়াতে মহান আল্লাহ স্পষ্টভাবে ঘোষণা দিয়েছেন যে, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে মানব জাতির জন্য একটি আইন কাঠামো দান করা হয়েছে। সকল মানুষেরসেই আইনের অনুসরণ করা আবশ্যক। এবং মানব রচিত আইনের অনুসরণ করা অবৈধ। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَ مَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ ۚ وَ هُوَ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ

"কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দ্বীন গ্রহণ করতে চাইলে কখনো তা গ্রহণযোগ্য হবে না এবং সে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভুক্ত হবে।"[৪]

উপরে উল্লিখিত আয়াতসমূহের মূল কথা হচ্ছে, মু'মিন-মুসলমান কারো জন্য মহান আল্লাহ নির্ধারিত ইসলামী আইন ব্যতীত মানব রচিত আইন অনুসরণ করার অনুমতি নেই। কোনো ব্যক্তি যদি মহান আল্লাহর বিধান

[১] মোঃ ইকবল হোসেন ভূঁইয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৩
[২] আল কুরআন, ৪২ : ১৩
[৩] আল কুরআন, ৪৫ : ১৮
[৪] আল কুরআন, ৩ : ৮৫

অস্বীকার করে, নির্দেশ মতো প্রতিপালন না করে তাহলেসেই ব্যক্তি কাফির (অবিশ্বাসী),[১] যালিম (অত্যাচারী)[২] ও ফাসিক (পাপিষ্ঠ)[৩] হিসেবে আখ্যায়িত হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

اِتَّبِعُوْا مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَ لَا تَتَّبِعُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءَ ؕ قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ

"তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট যা নাযিল করা হয়েছে তোমরা তার অনুসরণ করো এবং তাঁকে ছাড়া অন্য অভিভাবকের অনুসরণ করো না। তোমরা অতিশয় অল্পই উপদেশ গ্রহণ করো।"[৪]

ইসলামী আইনের পূর্ণ অনুসরণের উপরই নির্ভর করছে পার্থিব উন্নতি, অগ্রগতি, প্রতিপত্তি অর্জন, মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠান এবং আখিরাতের মুক্তি। দীর্ঘকালব্যাপী মুসলিম অধ্যুষিত অধিকাংশ দেশ মানব রচিত আইনে শাসিত হয়ে আসছে। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষী যে, উক্ত আইন ব্যবস্থা তাদেরকে সর্বজনীন টেকসই উন্নতি ও নিরাপত্তা যা মানব জীবনের একমাত্র লক্ষ্য, তার কোনটারই পূর্ণ নিশ্চয়তা বিধান করতে পারেনি। পক্ষান্তরে তারা পরিণত হয়েছে এক মূল্যহীন, পশ্চাদপদ, মর্যাদাহীন জাতিতে। পৃথিবীর সর্বত্রই আজ তারা লাঞ্ছিত, নিগৃহীত ও পদদলিত। তাদের এ শোচনীয় অবস্থার জন্য দায়ী মানব রচিত ভুলে ভরা আইনের অনুসরণ এবং অনেকাংশে ইসলামী আইনের অনুসরণ থেকে তাদের পিছুটান।[৫] আল্লাহ তা'আলা বলেন, "তবে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশ বিশ্বাস করো এবং কিছু অংশকে প্রত্যাখ্যান করো? সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা এরূপ করে তাদের একমাত্র প্রতিফল পার্থিব জীবনে হীনতা ও কিয়ামতের দিন তারা কঠিনতম শাস্তির দিকে নিক্ষিপ্ত হবে।[৬]

উপরোক্ত আয়াতে মহান আল্লাহ স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন যে, ইসলামী আইনের অংশবিশেষ অনুসরণ করে এবং অংশবিশেষ ত্যাগ করে কোনভাবে মুক্তি অর্জন করা যাবে না; বরং তাতেও রয়েছে পার্থিব লাঞ্ছনা ও আখিরাতের কঠোর শাস্তিভোগ। সুতরাং আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তাঁর রাসূল (সা.) মানবজাতির জন্য যা নিয়ে এসেছেন আমাদেরকে কেবল তাই অনুসরণ করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "রাসূল তোমাদেরকে যা দেন তা তোমরা গ্রহণ করো এবং যা থেকে তোমাদের নিষেধ করেনে তা থেকে বিরত থাকো।"[৭]

এ প্রসঙ্গে কুরআন মাজীদে আরো উল্লেখ আছে,

فَلَا وَ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا

"কিন্তু না, আপনার প্রতিপালকের শপথ! তারা মু'মিন হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের পারস্পরিক বিবাদের বিচারভার আপনার উপর অর্পণ না করে, অতঃপর আপনার সিদ্ধান্ত সম্পর্কে তাদের মনে কোন দ্বিধা না থাকে এবং সর্বান্তকরণে তা মেনে নেয়।"[৮]

---

[১] আল কুরআন, ৫ : ৪৪
[২] আল কুরআন, ৫ : ৪৫
[৩] আল কুরআন, ৫ : ৪৭
[৪] আল কুরআন, ৭ : ৩
[৫] মোঃ ইকবল হোসেন ভূঁইয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৪
[৬] আল কুরআন, ২ : ৮৫
[7] আল কুরআন, ৫৯ : ৭
[৮] আল কুরআন, ৪ : ৬৫

এর পাশাপাশি ইসলামে অন্য কোন জাতিকে অনুসরণ করতেও মুসলিম জাতিকে নিষেধ করা হয়েছে। এবং বলে হয়েছে, কেউ ভিন্ন কোন জাতির অনুসরণ করলে সে দ্বীন থেকে, হিদায়েতের পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُوْدَ وَ النَّصٰرٰۤى اَوْلِيَآءَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ؕ وَ مَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَاِنَّهٗ مِنْهُمْ
اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ۝

“হে মু'মিনগণ! তোমরা ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, তারা পরস্পরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে কেউ তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করলে সে তাদেরই একজন হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ যালিম সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না।”[১]

মহানবীও (সা.) মুসলিম জাতিকে অমুসলিম সম্প্রদায়ের অনুসরণ করতে নিষেধ করেছেন। “হযরত জাবির (রা.) বলেন, উমর ইবনল খাত্তাব (রা.) তাওরাত কিতাবের একটি হস্ত লিখিত কপিসহ রাসূল (সা.) এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা.)! এটি তাওরাত কিতাবের পাণ্ডুলিপি। তিনি নীরব থাকলেন। উমর (রা.) তা পড়তে লাগলেন। ফলে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর মুখ মণ্ডল ক্রোধে বিবর্ণ হয়ে গেল। আবূ বকর (রা.) বলেন, তোমার সর্বনাশ হোক, তুমি কি রাসূলুল্লাহ (সা.) এর মুখ মণ্ডলের প্রতি লক্ষ্য করছ না? উমর (রা.) রাসূলুল্লাহ (সা.) এর মুখ মন্ডলের দিকে তাকিয়ে বলেন, আমি আল্লাহর অসন্তোষ ও তাঁর রাসূলের অসন্তোষ থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি। আমরা আল্লাহকে প্রভূ হিসেবে, ইসলামকে দ্বীন রূপে এবং মুহাম্মদ (সা.) কে নবী রূপে পেয়ে সন্তুষ্ট। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, সে সত্ত্বার শপথ, যার হাতে মুহাম্মদের প্রাণ! যদি মূসা (আ.) তোমাদের সামনে আবির্ভূত হতেন এবং তোমরা আমাকে ত্যাগ করে তাঁর অনুসরণ করতে, তবে তোমরা অবশ্যই সহজ সরল পথ হারিয়ে পথভ্রষ্টতায় পতিত হতে। তিনি যদি জীবিত থাকতেন এবং আমার নবুয়্যতের সন্ধান পেতেন তাহলে অবশ্যই তিনি আমার আনুগত্য করতেন।”[২]

ইসলামী আইনের উদ্দেশ্য

সমগ্র সৃষ্টির একমাত্র স্রষ্টা মহান আল্লাহ। মহান আল্লাহ তার অসংখ্য-অগণিত সৃষ্টির মধ্যে মানুষকে তার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির মর্যাদা দিয়েছেন। পৃথিবীকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার লক্ষ্যে মানুষকে পৃথিবীতে মহান আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন, “তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছেন।”[৩]

মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, “আমি সৃষ্টি করেছি জিন এবং মানুষকে এ জন্য যে, তারা আমারই ‘ইবাদত করবে।”[৪]

একজন মানুষ যখন নৈতিক গুণে গুণান্বিত হয় তখন সে শ্রেষ্ঠত্বের উচ্চ শিখরে আরোহণ করতে পারে। আবার কোনো মানুষের নৈতিক স্খলন ঘটলে সে জীব জন্তুর চেয়েও অধম হয়ে যায়। মহান আল্লাহ বলেন, “বরং তারা পশুর চেয়েও অধম।”[১]

---

[১] আল কুরআন, ৫ : ৫১

[২] ইমাম দারেমী, *সুনান*, মুকাদ্দামা, অনুচ্ছেদ: তা'জিলি উকুবাতি মান বালাগাহু আনিন নাবিয়্যা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম; মোঃ ইকবল হোসেন ভূঁইয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৬

[৩] আল কুরআন, ৩৫ : ৩৯

[৪] আল কুরআন, ৫১ : ৫৬

ইহকালীন ও পরকালীন মুক্তি ও সমৃদ্ধির জন্য মহান আল্লাহ মানুষকে উপহার দিয়েছেন এক পূর্ণাঙ্গ ও উন্নততর শরীয়াত বা জীবন ব্যবস্থা। এই জীবন ব্যবস্থার মৌলিক উৎস হচ্ছে কুরআন ও সুন্নাহ। মহান আল্লাহ মানবজাতিকে সত্য ও ন্যায়ের পথে পরিচালিত করতে কুরআন অবতীর্ণ করেছেন। পবিত্র কুরআনের মাধ্যমে মানুষ যেমন আল্লাহ পাককে জানতে ও চিনতে পারে, তেমনি ভাল মন্দ অবগত হয়ে নিজেদেরকে সতর্কও করতে পারে। মহান আল্লাহ বলেন, "এটা মানুষের জন্য এক বার্তা, যাতে এর দ্বারা তারা সতর্ক হয় এবং জানতে পারে যে, তিনি একমাত্র ইলাহ এবং যাতে বোধশক্তিসম্পন্নরা উপদেশ গ্রহণ করে।"[২]

হাদীস হচ্ছে ইসলামী জীবন দর্শনের দ্বিতীয় উৎস। এর মাধ্যমেই কুরআনের প্রতিটি বিষয় বিস্তারিত জানা যায়। কুরআনকে বৃক্ষের মূলের সাথে তুলনা করলে হাদীসকে তুলনা করা যায় তার শাখা প্রশাখার সাথে। জীবন থেকে সত্যিকার অর্থে উপকার লাভ করা, ইচ্ছা মত স্বাদ আস্বাদন করা আর সফল জীবন যাপন নিঃসন্দেহে মানুষের মৌলিক অধিকার। জীবন চলার পথে প্রতিটি ঈমানদার ব্যক্তিকে সতর্ক পদক্ষেপের মাধ্যমেই পৌঁছতে হবে তার মানযিলে মাকসুদে। পরিপূর্ণ মু'মিন হতে হলে দ্বীনকে রক্ষা করা যেমন প্রয়োজন, তেমনি বাস্তব জীবনে ইসলাম নির্দেশিত বিধানাবলী বা মাকাসেদুশ শরীয়াত বা শরীয়াতর উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়ন একান্ত জরুরী।[৩]

ইসলামী শরীয়াতের উদ্দেশ্য সম্পর্কে রশিদ রিজা বলেন, বিশ্বাসের স্তম্ভসমূহের পুনর্গঠন (reform of the pillars of faith), এই সচেতনার বিস্তার যে ইসলাম হলো বিশুদ্ধ প্রাকৃতিক প্রবণতা, যুক্তি, জ্ঞান, প্রজ্ঞা, পরীক্ষা ও স্বাধীনতার ধর্ম এবং সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পুনর্গঠন এবং নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা করা।[৪]

আত-তাহির ইবনে আশুর কুরআন-সুন্নাহ গবেষণা করে ইসলামী শরীয়াতের উদ্দেশ্য শনাক্ত করেছেন। তিনি শৃঙ্খলা (orderliness), সাম্য (equalitz), স্বাধীনতা (freedom) ও ফিতরাত বা খাঁটি স্বভাবধর্মের সংরক্ষণকে (preservation pure natural disposition) মাকাসিদের অন্তর্ভুক্ত করেন।[৫]

ইসলামী শরীয়াতের উদ্দেশ্য সম্পর্কে ইমাম গাযালি (রহ.) ও তার শিক্ষক আল জুওয়াইনি (রহ.) কর্তৃক চিহ্নিত দ্বীন, প্রাণ, জ্ঞান, বংশ ও সম্পদ সংরক্ষণ করাকে অধিকাংশ ফকিহ শরীয়াহর মৌলিক উদ্দেশ্য হিসেবে গ্রহণ করলেও তারা কেউ-ই গাযালির পরম্পরা অনুসরণ প্রয়োজনীয় মনে করেননি। এমনকি শাতিবি (রহ.)-ও সবসময় তা অনুসরণ করেননি।[৬] অবশ্য পরম্পরা সাজানোর বিষয়টি নির্ভর করে আলোচনার ধরন ও প্রকৃতির ওপর। ইমাম গাযালি (রহ.)-এর এক শতাব্দী পর প্রখ্যাত ইসলামী পণ্ডিত ফখরুদ্দিন আল-রাজি (রহ.) জীবন (নফস) সংরক্ষণকে শরীয়াহর উদ্দেশ্যাবলির প্রথমে স্থান দেন। তার বিন্যাসটি ছিল প্রাণ, সম্পদ, বংশ, দ্বীন ও জ্ঞান।[৭]

---

[১] আল কুরআন, ৭ : ১৭৯
[২] আল কুরআন, ১৪ : ৫২
[৩] মোঃ ইকবল হোসেন ভূঁইয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৫
[৪] Al-juwayny, Al-Burhan, vol. 2, p. 621;
[৫] মুহাম্মদ রহমাতুল্লাহ খন্দকর, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৫
[৬] মুহাম্মদ রহমাতুল্লাহ খন্দকর, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৫
[৭] ডক্টর মুহাম্মদ আব্দুল আতি মুহাম্মদ আলী, *আল মাকাসিদুশ শারীয়াহ ওয়া আসারুহা ফিল ফিকহিল ইসলামী*, দারুল হাদীস, কায়রো : ২০০৭, পৃ. ১৬৪

ড. ইউসুফ আল কারযাভি মানুষের বিশ্বাসের সংরক্ষণ, মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠা, ইবাদতের প্রতি আহ্বান, নৈতিক মূল্যবোধের সংরক্ষণ, ভালো পরিবার গঠন, নারীদের সাথে ভালো ব্যবহার, শক্তিশালী ইসলামী জাতি গঠন, সহযোগিতাপূর্ণ বিশ্বগঠন ইত্যাদিকে মাকাসিদ আশ শরীয়াহর অন্তর্ভুক্ত করেন।[১]

নিম্নে শরীয়াত আইনের উদ্দেশ্যের গুরুত্বপূর্ণ দিক উপস্থাপন করা হল[২]:

১. মানব জীবন রক্ষা করা
২. নারীর অধিকার ও মর্যাদা সংরক্ষণ
৩. সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা
৪. অন্যায় বন্ধ করা
৫. মানুষের মাঝে সাম্য ও সমতা প্রতিষ্ঠা
৬. বংশের পবিত্রতা রক্ষা করা
৭. আদল বা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা
৮. দ্বীন রক্ষা করা
৯. পরিবেশ সংরক্ষণ
১০. মানুষের মাঝে মূল্যবোধ জাগ্রত করা
১১. মানবভ্রাতৃত্ব ও বিশ্বাসের ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠ
১২. মানুষের মানবিক গুণাবলী বৃদ্ধি করা
১৩. মান সম্মান, ইজ্জত আব্রু রক্ষা করা
১৪. শান্তি ও স্থিতিশীলতা সংরক্ষণ
১৫. মানব জীবনকে দুর্বিষহ হওয়া থেকে রক্ষা করা
১৬. মানুষের পরস্পরের মাঝে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক রক্ষা করা
১৭. মানব জীবনকে গতিশীল করা
১৮. ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণ সাধন
১৯. ঝগড়া বিবাদ রোধ করা
২০. অকল্যাণের পথ বন্ধ করা

নিম্নে সংক্ষিপ্তভাবে ইসলামী শরীয়াতের গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্যসমূহ আলোচনা করা হলো।

(১) মানব জীবন রক্ষা করা

সকল সৃষ্টির স্রষ্টা মহান আল্লাহ মানুষকে কেন্দ্র করেই সকল মাখলুককে সৃষ্টি করেছেন। সকল মাখলুককে নেতৃত্ব দেওয়ার দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে মানুষেরই উপর। এই বিশাল ভূ-পৃষ্ঠকে মানুষের কর্মক্ষেত্র বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। মানুষের জন্য আবাসস্থল হিসেবে নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে ভূ-পৃষ্ঠকে। মহান আল্লাহ বলেন,

[১] এম. উমর চাপড়া, *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid Al-Sha'riah*, ২০০৭, পৃ. ৮
[২] মোঃ ইকবল হোসেন ভূঁইয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৫

“তিনিই তো আমাদের জন্য ভূমিকে সুগম করে দিয়েছেন; অতএব তোমরা তাঁর দিগদিগন্তে বিচরণ কর এবং তাঁর প্রদত্ত জীবনোপকরণ হতে আহার্য গ্রহণ কর; পুনরুত্থান তো তাঁরই নিকট।”[১]

এ পৃথিবীর পাহাড়ে-নদীতে, জলে-স্থলে যা কিছু আছে সবই মানুষকে উপলক্ষ করে সৃষ্টি করা হয়েছে। সকল সৃষ্টিকে মানুষের কল্যাণে মানুষের ইচ্ছাধীন করে দেওয়া হয়েছে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়াল বলেন, “আমি তো আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি; স্থলে ও সমুদ্রে তাদের চলাচলের বাহন দিয়েছি; তাদেরকে উত্তম রিযিক দান করেছি এবং আমি যাদেরকে সৃষ্টি করেছি তাদের অনেকের উপর তাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি।”[২]

মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন, “তোমরা কি দেখনা, আল্লাহর আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সমস্তই তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন এবং তোমাদের প্রতি তাঁর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করেছেন।”[৩]

মহান স্রষ্টার এতসব সুন্দর সৃষ্টির সার্থকতা তখনই কার্যকর হবে যখন মানুষ স্বীয় জীবন এবং অন্যের জীবন বাঁচাতে সক্ষম হবে। জীবন রক্ষা ব্যতীত মহান স্রষ্টা যে মহান উদ্দেশ্য নিয়ে এ পৃথিবীতে মানুষ সৃষ্টি করেছেন তা বাস্তবায়ন সম্ভব হবে না। কেননা ইসলাম মানব জীবনকে যেমন সর্বাধিক মূল্যবান ও সম্মানের বস্তু হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে, তেমনি তা রক্ষার জন্য জোর নির্দেশও দিয়েছে।[৪] তাই মহান আল্লাহ বলেন, “নর হত্যা অথবা পৃথিবীতে ধ্বংসাত্মক কার্য করা ব্যতীত কেউ কাউকে হত্যা করলে সে যেন পৃথিবীর সকল মানুষকেই হত্যা করল আর কেউ কারো প্রাণ রক্ষা করলে সে যেন সকল মানুষের প্রাণ রক্ষা করল।”[৫]

ইসলামের দৃষ্টিতে মানবহত্যা বড় অপরাধগুলোর মধ্যে অন্যতম। ইসলামী শরীয়াতে অবৈধ ভাবে মানব হত্যাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করার সাথে সাথে হত্যাকারীর শাস্তিও সুনির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে।

(২) সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা

মানুষের জীবন ব্যবস্থাপনায় এক অপরিহার্য দিক হচ্ছে অর্থনীতি। মানবজীবন নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত । জন্মের পর হতেই মানুষকে বিভিন্ন অভাবের সম্মুখীন হতে হয়। কিন্তু অভাব পূরণের উপকরণ সমূহ সীমাবদ্ধ। সীমাবদ্ধ উপকরণের সাহায্যে অগণিত অভাব পূরণ করতে গিয়ে প্রায়শই মানুষকে কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখী হতে হয়। তবে অনেক সময় পার্থিব লোভ, ধনলিপ্সা ও উচ্চাভিলাসী জীবনের মোহ-ই মানুষকে চরম অভাবের মুখোমুখী করে থাকে।

সম্পদ উৎপাদন, সংগ্রহ, বন্টন, ব্যয় ব্যবহার এবং অর্থ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত ইসলামের সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা ও বিধিমালা রয়েছে। সমাজ ও সমাজভুক্ত প্রতিটি মানুষের দৈনন্দিন জীবনের উপর অর্থের প্রভাব ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী। অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ও অন্যান্য জরুরী প্রয়োজন পূরণে সম্পদ বা অর্থ মানুষের জীবনে মুখ্য ভূমিকা রাখে। তাই ইসলাম বৈধ পন্থায় সম্পদ উপার্জন এবং ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় ব্যয় বৈধভাবে নিশ্চিতকরণে সুস্পষ্ট নির্দেশ প্রদান করেছে। ইসলামে সম্পদ অবৈধভাবে পুঞ্জিভূত করে রাখাকে শুধু

---

[১] আল কুরআন, ৬৭ : ১৫
[২] আল কুরআন, ১৭ : ৭০
[৩] আল কুরআন, ৩১ : ২০
[৪] মোঃ ইকবল হোসেন ভূঁইয়া, *প্রাগুক্ত*, ২০১৫, পৃ. ১৪৯
[৫] আল কুরআন, ৫ : ৩২

নিরুৎসাহিত-ই করা হয়নি, তা নিষিদ্ধও করা হয়েছে।[১] সম্পদ সঞ্চালনের নির্দেশ দিয়ে মহান আল্লাহ বলেন, "সম্পদ যেন শুধু তোমাদের ধনীদের মধ্যেই আবর্তিত না হয়।"[২]

বৈধ উপায়ে অর্জিত বৈধ ধন-সম্পদের মালিকানা হবে উপার্জনকারী ব্যক্তিই। কেউ যদি কঠোর পরিশ্রম দ্বারা যোগ্যতা ও দক্ষতা অর্জন করে এবং তার যথাযথ ব্যবহার করে হালাল পন্থায় অধিক উপার্জন করে, সে তার উপার্জিত সকল সম্পদের অধিকারী হবে। একের উপার্জিত ধন অন্যায়ভাবে অন্য কেউ নিতে পারবে না। আল্লাহ বলেন, "তোমরা একে অন্যের ধন বাতিল উপায়ে ভক্ষণ করো না।[৩]

(৩) অন্যায় বন্ধ করা

ইসলাম ন্যায়-নিষ্ঠার ধর্ম, সততার ধর্ম। ন্যায়ের বিপরীত শব্দ অন্যায়। অন্যায় বলতে বুঝায় এমন কর্ম চিন্তা বা অনুভূতি যা মানুষের অধিকার হরণ করে। অন্যভাবে বলতে গেলে অন্যায় হল এমন কর্মকাণ্ড যা বিবেক সমর্থন করে না। ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা হিসেবে জীবনের প্রত্যেকটি মৌলিক সমস্যার সমাধান দিয়েছে। ইসলাম সুস্পষ্টভাষায় সকল প্রকার অন্যায় অবিচার, সমাজবিরোধী কর্মকাণ্ড এবং মানবতাবিরোধী কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে।[৪] অন্যায়-অপকর্ম বন্ধে মহান আল্লাহ সম্মিলিত উদ্যোগ গ্রহণে উৎসাহ দিয়েছেন। আল্লাহ তায়াল বলেন, "তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানবজাতির জন্য তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে; তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দান কর, অসৎকাজের নিষেধ কর এবং আল্লাহে বিশ্বাস কর।"[৫]

(৪) মানুষের মাঝে সাম্য ও সমতা প্রতিষ্ঠা

ইসলাম সাম্য ও সমতার ধর্ম। পৃথিবীর ইতিহাসে ইসলামই সর্বপ্রথম মানুষে মানুষে ভেদাভেদ দূর করে সাম্য ও সমতা প্রতিষ্ঠা করেছে। ইসলাম মানুষকে পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদ, হিংসা-কোন্দল পরিহার করে সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হবার নির্দেশ দিয়েছে। আল্লাহ বলেন, "হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী হতে, পরে তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পার। আর তোমাদের মধ্যে সেই অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে অধিক মুত্তাকী।"[৬]

পবিত্র কুরআনের এ কথাটিই মহানবী (সা.)-এর ঐতিহাসিক বিদায় হাজ্জের ভাষণে ঘোষণা করা হয়েছে। মহানবী (সা.) সেদিন বলেছিলেন, "কোন অনারবের উপর কোন আরবের শ্রেষ্ঠত্ব নেই, আর না আছে কোন আরবের উপর অনারবের শ্রেষ্ঠত্ব। কোন কালোর উপর কোন সাদার শ্রেষ্ঠত্ব নেই, আর না কোন সাদার উপর কোন কালোর শ্রেষ্ঠত্ব, তবে তাকওয়া ছাড়া"।[৭] (অর্থাৎ শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি হচ্ছে তাকওয়া)। "সব মানুষই আদমের সন্তান এবং আদম মাটির সৃষ্টি। হে আদম সন্তান, আজকের এই দিন, এই মাস, এই নগরী যেমন তোমাদের নিকট মর্যাদাসম্পন্ন, ঠিক তেমনিভাবে তোমাদের রক্ত, তোমাদের ধনসম্পত্তিও মর্যাদা সম্পন্ন। মনে রেখো, আঁধার যুগের সকল নীতি, সকল আচরণ আজ আমি পদতলে দলিত করছি। অজ্ঞতার যুগের রক্তপাত

---

[১] মোঃ ইকবল হোসেন ভূঁইয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫১
[২] আল কুরআন, ৫৯ : ৭
[৩] আল কুরআন, ৪ : ২৯
[৪] মোঃ ইকবল হোসেন ভূঁইয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৩
[৫] আল কুরআন, ৩ : ১১০
[৬] আল কুরআন, ৪৯:১৩
[৭] ইমাম তাবারানী, *মু'জামুল কাবীর*, চতুর্থ অধ্যায়, শুয়ায়ব ইবন আমর থেকে বর্ণিত হা. নং-১৪৪৪৪

এবং তার প্রতিশোধের সকল ঘটনা আজ থেকে বিস্মৃত হয়ে যাও। সর্বপ্রথম আমি আমার পিতৃব্য ভ্রাতা ইবন রাবিআ ইবন হারিসের খুনের দাবি প্রত্যাহার করছি।"[১]

ইসলামের নীতি হচ্ছে, ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসকারী সকল নাগরিক আইনের চোখে সমান। সামগ্রিকভাবে মানুষের মধ্যে তাকওয়া ব্যতিরেকে শ্রেষ্ঠত্ব নিরূপণের আর কোন মানদণ্ড ইসলাম স্বীকার করে না। সকল মানুষ আদম (আ.) ও হাওয়া (আ.)-এর সন্তান। এই ভিত্তিতে ইসলাম সমগ্র মানব জাতিকে এক সূতার বন্ধনে আবদ্ধ করেছে। মুসলমানদেরকে পরস্পর ভাই ভাই হিসাবে স্বীকৃতি দিয়ে তাদের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করেছে। আল্লাহ ইরশাদ করেন, "নিশ্চয়ই মু'মিনগণ! পরস্পর ভাই ভাই।"[২]

(৫) বংশের পবিত্রতা রক্ষা করা

মানুষের জন্ম পিতা মাতার মাধ্যমে। বংশ পরিচয় হচ্ছে পিতা মাতার সাথে সন্তানের জন্মগত সম্পর্ক। বংশের পবিত্রতা রক্ষা করা প্রতিটি মানুষের নৈতিক দায়িত্ব। অবৈধ পন্থায় যৌনকার্য পরিহারের মাধ্যমে বংশ রক্ষা করা মানুষের মৌলিক প্রয়োজনের মধ্যে অন্যতম। কেননা অবৈধ পন্থায় যৌনকার্য সমাধা করা অত্যন্ত গর্হিত কাজ। বংশকে পুতঃ পবিত্র রাখার জন্য প্রত্যেক জাতি ও দেশে রাষ্ট্রীয় আইনে তথা ধর্মীয় বিধানে তার জন্য সুনির্দিষ্ট বিধি-বিধান ও আইন কানুন রয়েছে। মানবজাতির অস্তিত্ব ও স্থায়িত্বের জন্য সুসন্তান একান্তভাবে কাম্য। আর সন্তান জন্ম নেয় যৌনকার্য সম্পন্নের মাধ্যমে। ইসলামসহ অন্যান্য সকল ধর্মের জোর পূর্বক কিংবা অবৈধ পন্থায় যৌনকার্য সম্পাদনে কঠোর শাস্তির বিধান রয়েছে।[৩]

বর্তমান পৃথিবীর অনেকদেশে বিবাহ বহির্ভূত যৌন সম্পর্ককে স্বীকৃতি দিয়েছে। ফলে মানুষ ব্যাপক হারে অবৈধ যৌনাচারে উদ্বুদ্ধ হচ্ছে। এর মাধ্যমে নারী পুরুষ উভয়ই তার চরিত্র হারাচ্ছে। বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে নারী। স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় বিয়ে হলে পুরুষের উপর নারীর বিভিন্ন ধরনের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু বিবাহ বহির্ভূত যোন সম্পর্কের কারণে নারী সেসব অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। তাছাড়া অবৈধ যৌনকার্যের ফলে এইডস নামক মারাত্মক ব্যাধির জন্ম নিয়েছে। নারী অধিকার প্রতিষ্ঠা ও এইডস থেকে বিশ্বকে রক্ষা করতে অবাধ যৌনাচার এর মত ইসলাম নিষিদ্ধ কর্মকাণ্ড প্রতিরোধ একান্ত আবশ্যক।

(৬) দ্বীন রক্ষা করা

ধর্ম নতুন সৃষ্ট কোনো বিষয় নয়। সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকেই মানুষ ধর্ম পালন করে আসছে। মানব সভ্যতার আদি মানব হযরত আদম (আ.)-এর ধর্ম ছিল ইসলাম। এরপর পৃথিবীর বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে মানুষের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেতে থাকে। বৃদ্ধি পেতে থাকে ধর্ম ও মতবাদের সংখ্যাও। মানব জাতিকে আজকের এই আধুনিক সভ্যতা পর্যন্ত নিয়ে আসতে অসংখ্য জাতির অবদান রেখেছে। ইসলামের বাইরে হাজারও জাতির রয়েছে হাজারও ধর্ম। আর প্রতিটি দ্বীন বা ধর্মেরই মূলমন্ত্র হচ্ছে শান্তি। আদিকাল থেকেই ধর্ম পালন করে আসছে মানবসমাজ। শয়তানের প্ররোচনায় কিছু পথভ্রষ্ট লোক কর্তৃক অসংখ্য ঘাত প্রতিঘাতে দ্বীন বা ধর্ম জর্জরিত হলেও একে রক্ষার জন্য যুগে যুগে বহু মানুষ যথাসম্ভব চেষ্টা চালিয়েছে। এমনকি মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেছে

[১] মাওলনা মুহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, *ইসলামী আদর্শ ও বাস্তবায়ন*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৫, পৃ. ৪৫
[২] আল কুরআন, ৪৯:১০
[৩] মোঃ ইকবল হোসেন ভুঁইয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫০

নিঃসংকোচে। পৃথিবীর বুকে অসংখ্য ধর্মের অস্তিত্ব থাকলেও মহান আল্লাহর নিকট দ্বীন ইসলাম বা ইসলাম ধর্মই একমাত্র গ্রহণযোগ্য ধর্ম।[১] আল্লাহ তা'আলা বলেন, "নিঃসন্দেহে ইসলামই আল্লাহর নিকট একমাত্র দ্বীন ।"[২]

ধর্ম গ্রহণের ক্ষেত্রে মানুষকে অবশ্যই গভীর চিন্তাভাবনা করে জেনে বুঝে গ্রহণ করতে হবে। ইসলামকে ধর্ম হিসেবে গ্রহণ করার পর ইসলাম ত্যাগ করার অধিকার কারো কাউকে দেওয়া হয়নি। ইসলামী আইনের দৃষ্টিতে তা দণ্ডনীয় অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হবে। নিম্নে ধর্ম ত্যাগীদের পরিচয় ও পরিণতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হল।

ধর্ম ত্যাগের সংজ্ঞা

আরবি শব্দ 'রিদ্দা' এর শাব্দিক অর্থ প্রত্যাবর্তন করা, ফিরে যাওয়া। কুফরীতে ফিরে যাওয়ার ক্ষেত্রে শব্দটি বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয়।[৩] প্রত্যাবর্তন ও ফিরে যাওয়ার অর্থের সাক্ষ্য পবিত্র কুরআনে এসেছে। মহান আল্লাহ বলেন, "হে মু'মিনগণ! তোমাদের মধ্যে কেউ দ্বীন হতে ফিরে গেলে নিশ্চয়ই আল্লাহ এমন এক সম্প্রদায় আনবেন যাদেরকে তিনি ভালবাসবেন এবং যারা তাঁকে ভালবাসবে।"[৪]

আর ইসলাম থেকে কুফরিতে ফিরে যাওয়া ও প্রত্যাবর্তন করাকে রিদ্দা বলে।[৫] মহান আল্লাহ অন্যত্র বর্ণনা করেছেন, "আমরা আমাদের পায়ের গোড়ালিতে ফিরে যাব।"[৬]

পারিভাষিক অর্থ

স্বেচ্ছায় প্রাপ্তবয়স্ক বিবেকবুদ্ধি সম্পন্ন মুসলিম ব্যক্তির ঈমান ও ইসলাম থেকে কুফরিতে প্রত্যাবর্তনকে রিদ্দা বা ধর্ম ত্যাগ বলে।"[৭] আল্লামা আল কাসানী বলেন, "রিদ্দা হল ঈমান থেকে ফিরে আসা।"[৮] আল নাফরাভী বলেন, "ইসলামকে কেটে দেয়াই হল রিদ্দা।"[৯] ইবন কুদামা বলেন, "যে দ্বীন ইসলাম থেকে কুফরির প্রত্যাবর্তন করে তাঁকে মুরতাদ বা ধর্মত্যাগী বলে।"[১০] ইংরেজিতে ধর্মকে ঘৃণা, তুচ্ছ ও অবজ্ঞাভরে ছেড়ে দেয়াকে ধর্মত্যাগ বা Blasphemy বলা হয়।[১১]

(৭) মানুষের মাঝে মূল্যবোধ জাগ্রত করা

মহান আল্লাহ মানুষকে বিবেক এবং নৈতিকতা ও মূল্যবোধ দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। অন্যান্য সৃষ্টির সাথে মানুষের সবচেয়ে বড় পার্থক্য হল মানুষ এই বিবেক এবং নৈতিকতা ও মূল্যবোধের ধারক বাহক। মূল্যবোধ বলতে

---

[১] মোঃ ইকবল হোসেন ভূঁইয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৬
[২] আল কুরআন, ৩ : ১৯
[৩] আল সাইয়্যেদ মুরতাজা আল হুসাইনী আল জুবায়দী, *তাজ আল আরুস*, মিসর : আল খায়রিয়া প্রেস, ১৩০৬ হি., খ. ২, পৃ. ৩৫১
[৪] আল কুরআন, ৫ : ৫৪
[৫] আবূ যাকারিয়া শরফউদ্দীন ইয়াহইয়া ইবনে শরফ আল নব্বী, *আল মাজমু' শরহ আল মুহাজ্জাব*, বৈরূত : দার আল ফিকর, ১৪০৩ হি. খ. ১৯, পৃ. ২২৩
[৬] আল কুরআন, ৬ : ৭১
[৭] ড. ফকরী আহমদ ওকাজ, *ফালসাফাতু আল উকুবাত ফী আল শারীয়াহ আল ইসলামিয়াহ ওয়া আল কানূন*, রিয়াদ : মাকতুবাতু ওকাজ, ১৪০৩ হি., পৃ. ১৪৩
[৮] আল্লামা আল কাসানী, *বাদায়ে আল সানায়ে*, বৈরুত : দার আল কিতাব আল আরাবী, ১৪০২ হি. খ. ৭, পৃ. ১৩৪
[৯] আল নাফরাভী, *আল ফাওয়াকিহী আল দাওয়ানী আল রিসালাত ইবনে যায়েদ আল কায়রাওয়ানী*, বৈরুত : দার আল ফিকর, ১৪১২ হি., খ. ২, পৃ. ৩৮১
[১০] ইবনে কুদামা, আল মুগিন, মিসর : আলমানার প্রেস, ১৩৪৮ হি., খ. ৮, পৃ. ১২৩
[১১] মোঃ ইকবল হোসেন ভূঁইয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৮

বুঝায় এমন কিছু মৌলিক আদর্শ, বিশ্বাস, রীতি নীতি বা দৃষ্টিভঙ্গি যা মানুষকে কোন কাজ করতে নিয়োজিত বা উদ্বুদ্ধ করে। ইসলামে মানবিক মূল্যবোধের গুরুত্ব অত্যধিক। যুগে যুগে আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীতে অগণিত নবী রাসূল প্রেরণ করেছেন যারা মানুষের মাঝে মূল্যবোধ জাগ্রত করার কাজটি নিরলসভাবে করে গেছেন। মূল্যবোধহীন কোন সমাজ মানুষের সমাজ হতে পারে না। তাই মানুষের মাঝে মূল্যবোধ জাগ্রত করার কাজটি ইসলামে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আমল হিসাবে স্বীকৃত। ইসলামে মানবিক মূল্যবোধের মূলকথা হল ঈমান এবং আমলে সালেহ। ঈমান এবং আমলে সালেহ ব্যতীত মূল্যবোধ অর্জন সম্ভব নয়।[১] আল্লাহ বলেন, "মহাকালের শপথ! মানুষ অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্থ, কিন্তু তারা নয় যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে।"[২]

একজন প্রকৃত মু'মিনের পরিচয় ও বৈশিষ্ট্যের মধ্যেই মানবিক মূল্যবোধ বিদ্যমান আছে। পবিত্র কুরআন ও হাদীসের বিভিন্ন স্থানে একজন মু'মিনের যে পরিচয় উপস্থাপন করা হয়েছে তার সারাংশ হল, মু'মিন ব্যক্তি মানবিক মূল্যবোধে উজ্জীবিত একজন আদর্শ মানুষ। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, "মু'মিন তো ঐ ব্যক্তি যাকে তার ভালকাজ আনন্দ দেয় এবং তার মন্দকাজ কষ্ট দেয়।"[৩] এই হাদীস দ্বারা বুঝা যায়, সমাজ জীবনের সকল ভালকাজ আনন্দচিত্তে গ্রহণ এবং মন্দকাজ বর্জন করা ঈমানের বড় পরিচয়। মানুষের মনে এ মানসিকতা তৈরী করতে পারলে সমাজ হবে মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন সমাজ। আর একটি হাদীসে রাসূল (সা.) বলেন, "মুসলিম সেই ব্যক্তি যার হাত থেকে মানুষের জীবন ও সম্পদ নিরাপদ থাকে।[৪] ইসলামে মূল্যবোধের মূলনীতি হল- আল্লাহ বলেন, "সৎকর্ম ও তাকওয়ায় তোমরা পরস্পরকে সাহায্য করবে এবং পাপ ও সীমালঙ্ঘনে একে অন্যের সাহায্য করবে না।"[৫]

কারো মধ্যে আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা ও আনুগত্য, আল্লাহ ভীতি থাকে তাহলে সে কখনো অমানবিক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হতে পারে না। আর পাপাচার ও অশ্লীলতা বর্জনকারী মানুষ স্বাভাবিকভাবেই সৎ, আদর্শবান ও সুশীল হয়ে ওঠে। সেই মানুষের মধ্যে জন্ম নেয় মানবিক মূল্যবোধ। অনেক সময় ভাল মানুষের মধ্যেও মূল্যবোধের অবক্ষয় সৃষ্টি হতে পারে। সেক্ষেত্রে মহান আল্লাহর নির্দেশ হল, "মু'মিনগণ পরস্পর ভাই ভাই, সুতরাং তোমরা ভ্রাতৃগণের মধ্যে শান্তি স্থাপন কর।"[৬]

মূল্যবোধ জাগ্রত করার ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "এক মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই। সে তার উপর অন্যায় করতে পারে না এবং তাকে লজ্জায় ফেলতে পারে না।"[৭] 'এক মুসলমান অপর মুসলমানের প্রতি জুলুম করবে না এবং তাকে জালিমের হাতে সোপর্দ করবে না।'[৮] 'মুমিনকে গালি দেওয়া পাপের কাজ এবং মারামারিতে প্রবৃত্ত হওয়া কুফরী'।[৯]

---

[১] মোঃ ইকবল হোসেন ভূঁইয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৬
[২] আল কুরআন, ১০৩:১-৩
[৩] ইমাম আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন হাম্বল, *আল মুসনাদ*, কায়রো মাতবা'আ আশরাফিল ইসলামিয়া, ১৩১৩ হি. খ. ১, পৃ. ২৬
[৪] ইমাম নাসাঈ, *সুনানে নাসাঈ*, লাহোর: মাকতাবা' সালফিয়া ১৯৮২, কিতাবুল ঈমান, বাব নং-৮
[৫] আল কুরআন, ৫:২
[৬] আল কুরআন, ৪৯:১০
[৭] ইমাম মুসলিম, *সহীহ লি মুসলিম*, দিল্লী আল মাকতাবা' রশীদিয়া, ১৩৭৬ হি. কিতাবুল বির, হা. নং-৬০
[৮] ইমাম বুখারী, *সহীহ বুখারী শরীফ*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, হাদীস নং ২২৮০
[৯] ইমাম মুসলিম, *সহীহ মুসলিম শরীফ*, সম্পাদনা পরিষদের তত্ত্বাবধানে অনূদিত ও সম্পাদিত, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, খ. ১, পৃ. ১২৩, হা. নং ১২৫

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা ধারণা করা থেকে বিরত থাকো। কারো প্রতি ধারণা পোষণ করা সবচেয়ে বড় মিথ্যা ব্যাপার। তোমরা দোষ অন্বেষণ করো না, গোয়েন্দাগিরী করো না, পরস্পর হিংসা করো না একে অন্যের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করো না এবং পরস্পর বিরোধে লিপ্ত হয়ো না। বরং তোমরা সবাই আল্লাহর বান্দা ভাই ভাই হয়ে থেকো।[১]

উপরে উল্লিখিত মহানবী (সা.)-এর হাদীসসমূহে মানুষকে সর্বদা অসুন্দর, অমানবিক ও অকল্যাণকর কাজ পরিহারের নির্দেশদেওয় হয়েছে। যাতে মানুষ সুন্দরের দিকে, কল্যাণের দিকে আসার সুযোগ পায়। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইসলামের সামগ্রিক সৌন্দর্য তথা দয়া, মায়ামমতা, প্রেমভালবাসা, সততা, ন্যায়পরায়ণতা, আমানতদারী, পারস্পরিক সাহায্য সহযোগিতা ইত্যাদির মাধ্যমে মানুষের মধ্যে মূল্যবোধ উজ্জীবিত করার চেষ্টা করেছেন। ইসলাম প্রদত্ত উক্ত বিধান পরিত্যাগ করার কারণে আজ সমগ্র বিশ্বে চরম মানবিক বিপর্যয় নেমে এসেছে। অন্যায় অবিচার, অশ্লীলতা, হিংসা বিদ্বেষ, ঘৃণা, প্রতারণা ইত্যাদি অমানবিক কর্মকাণ্ড দ্বারা সুন্দর পৃথিবী অশান্তিময় হয়ে উঠেছে। মানুষের মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয় এর প্রধান কারণ। তাই পৃথিবীকে একটি সুখী, সুন্দর ও শান্তিময় আবাস হিসাবে গড়ে তোলার জন্য মানুষের মধ্যে মানবিক মূল্যবোধের জাগ্রত করা আজ সময়ের অপরিহার্য দাবি যা দিন দিন জোরদার হচ্ছে। এক্ষেত্রে ইসলাম প্রদত্ত মানবিক মূল্যবোধের প্রয়োগ অত্যন্ত প্রয়োজন, যার কোন বিকল্প নেই।[২]

(৮) মানুষের মানবিক গুণাবলী বৃদ্ধি করা

মহান আল্লাহ প্রদত্ত শ্রেষ্ঠতম জীবন বিধান হচ্ছে ইসলাম। নবী-রাসূল পৃথিবীতে মানুষের সামনে আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরার পাশাপাশি মানুষকে নৈতিকতা ও উন্নত চরিত্র গঠনের শিক্ষা দিয়েছেন। নৈতিক ও মানবিক গুণাবলী মানুষকে উন্নত করে, মহৎ করে এবং মানুয়েষর মর্যাদা বৃদ্ধি করে। তাই তো মহানবী (সা.) ঘোষণা করেছেন, "আমি উত্তম চরিত্র শিক্ষাদানের জন্য প্রেরিত হয়েছি।"[৩] কুরআন-হাদীসে মানুষের নৈতিক মানবিকগুণাবলী বলতে যেসব গুণকে চিহ্নিত করা হয়েছে তন্মধ্যে তাকওয়া, সততা, বিনয় নম্রতা, সহিষ্ণুতা, দানশীলতা, আমানতদারী, ন্যায়পরায়ণতা, কর্তব্যপরায়ণতা ইত্যাদি অন্যতম।

(৯) মান সম্মান, ইজ্জত আব্রু রক্ষা করা

মানুষ সর্বাধিক ভালোবাসে তার জীবন এরপর তার সম্পদ। বাস্তবতা হচ্ছে সম্পদের তুলনায় সম্মানের গুরুত্ব অনেক বেশী। কারণ সম্পদের ক্ষতি হলে তা পুষিয়ে নেয়া যায়, কিন্তু সম্মানের হানি ঘটলে তা কখনো পুষিয়ে নেয়া যায় না। তাই ইসলামী শরীয়াত মানুষের মান সম্মান, ইজ্জত আব্রুর নিরাপত্তা বিধানে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। মানুষ সামজিক জীব। ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ জীবনে যে সকল কর্মকাণ্ড মানুষের মান সম্মান ক্ষুণ্ন করে এবং সমাজে দ্বন্দ্ব, বিদ্বেষ ও অশান্তি সৃষ্টি করে, সে সকল কর্মকাণ্ড ইসলামী শরীয়াত নিষিদ্ধ করেছে। সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাস করতে গিয়ে মানুষ অনেক সময় নানা ভুল ভ্রান্তিতে জড়িয়ে পড়ে কিংবা অজ্ঞাতে অনেক

[১] ইমাম বুখারী, *সহীহ বুখারী শরীফ*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, হাদীস নং ৫৬৩৮
[২] মোঃ ইকবল হোসেন ভূঁইয়া, *প্রাগুক্ত*, ২০১৫, পৃ. ১৫৭
[৩] ইমাম মালিক ইবন আনাস, *মুয়াত্তা*, কায়রো: ১৩৭০ হি. কিতাবুল হুসনিল খুলক, হা. নং-৮

অন্যায় কাজ করে ফেলে। কোন অবস্থাতেই অন্যায়ভাবে কোন নাগরিকের মান সম্মান নষ্ট করা যাবে না কিংবা তাকে লাঞ্চিত করা যাবে না।[১]

এতদসংক্রান্ত মহান আল্লাহর নিষেধাজ্ঞা হল- "হে মু'মিনগণ! কোন পুরুষ যেন অপর পুরুষকে উপহাস না করে; কেননা যাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারী হতে উত্তম হতে পারে এবং কোন নারী অপর কোন নারীকেও যেন উপহাস না করে; কেননা যাকে উপহাস করা হয় যেস উপহাসকারিনী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে। তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করো না এবং তোমরা একে অপরকে মন্দ নামে ডেকো না। ঈমানের পর মন্দ নামে ডাকা গর্হিত কাজ। যারা এ ধরনের আচরণ থেকে নিবৃত্ত না হয় (তাওবা না করে) তারাই যালিম। হে মু'মিনগণ! তোমরা বহুবিধ অনুমান থেকে দূরে থাক। কারণ অনুমান কোন কোন ক্ষেত্রে পাপ এবং তোমরা একে অপরের গোপনীয় বিষয় অনুসন্ধান করোনা এবং একে অপরের পশ্চাতে নিন্দা করোনা। তোমাদের মধ্যে কি কেউ তার মৃত ভাইয়ের গোশত ভক্ষণ করতে চাইবে? বস্তুত তোমরা তো এটা ঘৃণ্যই মনে কর। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর; আল্লাহ তাওবা গ্রহণকারী, পরম দয়ালু।"[২]

(১০) মানব জীবনকে দুর্বিষহ হওয়া থেকে রক্ষা করা

মানুষের পার্থিব এবং পরকালীন জীবনের সামগ্রিক নিরাপত্তা ও শান্তির নিশ্চয়তা একমাত্র ইসলামেই দেওয়া হয়েছে। বিশ্বে প্রচলিত অসংখ্য ধর্মের মধ্যে একমাত্র ইসলামই পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসেবে মানুষের ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষা সংস্কৃতি, বিচার ব্যবস্থাসহ জীবনের সকল দিক ও বিভাগে উদ্ভূত সমস্যাদি সমাধানে যথাযথ ভূমিকা পালন করছে। সুন্দর এ বিশ্ব যখন মনুষ্যসৃষ্ট হাজারো সমস্যার তাপদাহে দগ্ধ হয়ে বসবাসের অনুপযোগী হয়ে পড়েছিল, মানবজীবন হয়ে পড়েছিল দুর্বিষহ তখনই শান্তির প্রস্রবণ বইয়ে দিতে ইসলামের সুমহান বার্তা নিয়ে আগমন করেছিলেন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)।[৩] সেই মহামানব সম্পর্কে কুরআনে এসেছে, "আমি (আল্লাহ) তো তোমাকে বিশ্ব জগতের প্রতি কেবল রহমত রূপেই প্রেরণ করেছি।[৪]

মহানবী (সা.) সকল মানুষের শান্তির লক্ষ্যেই তাঁর নিজ জীবনকে উৎসর্গ করে গেছেন। মহানবী (সা.) পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর বাণী তুলে ধরে মানব জীবনকে দুর্বিষহ অবস্থা হতে পরিত্রাণ দেওয়ার জন্যে সম্ভাব্য সকল সমাধান দিয়ে গেছেন । তথ্য-প্রযুক্তি, শিক্ষা-স্বাস্থ্যসহ অন্যান্য প্রায় সকল ক্ষেত্রে আজকের এ চরম উৎকর্ষতার যুগেও যথার্থ শাশ্বত দিক নির্দেশনারূপে কাজ করে যাচ্ছে মহানবী (সা.)-এর সুমহান আদর্শ ও শিক্ষা।

(১১) মানুষের পরস্পরের মাঝে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক রক্ষা করা

মহান আল্লাহ সকল মানুষের একমাত্র স্রষ্টা। এই পৃথিবীতেই সকল মানুষের বসবাস। মাঝখানে শুধু রাষ্ট্রীয় সীমারেখা দিয়ে পৃথিবীকে বিভক্ত করা হয়েছে। অথবা জাতি, ধর্ম বিশ্বাস, বর্ণ, গোত্র, সম্প্রদায় ইত্যাদি বিষয় দ্বারা মানুষের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করা হয়েছে। পারস্পরিক বিশ্বাস, চিন্তা ও মূল্যবোধের কারণেও মানুষের মধ্যে সুসম্পর্কের অবনতি ঘটতে পারে। উপরোক্ত সকল ক্ষেত্রে মানুষের মাঝে পারস্পরিক সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক রক্ষা করার জন্য ইসলামের রয়েছে বিশ্বজনীন নীতিমালা। যার আলোকে ইসলামের নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)

---

[১] মোঃ ইকবল হোসেন ভূঁইয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫২
[২] আল কুরআন, ৪৯ : ১১-১২
[৩] মোঃ ইকবল হোসেন ভূঁইয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৩
[৪] আল কুরআন, ২১: ১০৭

মদীনায় বিভিন্ন ধর্ম ও জাতি গোষ্ঠীর মানুষের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নিশ্চিত করে একটি গতিশীল রাষ্ট্র কাঠামো প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।[১]

(১২) মানব জীবনকে গতিশীল করা

আশরাফুল মাখলুকাত বা মহান আল্লাহর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হচ্ছে মানুষ। গোটা সৃষ্টি জগতের মধ্যে মানব জাতির অবস্থান একেবারেই ব্যতিক্রম। মানুষের দেহাবয়ব যেমন অনন্য, তেমনি তার বিবেক, বিচারশক্তিও অতুলনীয়। মানুষের এই প্রজ্ঞা ও বিবেকবোধের কারণে মানুষকে আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে মনোনীত করা হয়েছে। খিলাফাতের অর্পিত দায়িত্বের কারণেই মানুষকে তার সকল কর্মের জন্য জওয়াবদিহী করতে হবে। মানুষ কোনক্রমেই তা থেকে রেহাই পাবে না। কুরআন পাকে মহান আল্লাহ বলেন, "প্রত্যেকেই স্বীয় কৃতকর্মের জন্য দায়ী এবং কেউ অন্য কারো ভার বহন করবে না।"[২]

উপরে উল্লিখিত আয়াতে প্রত্যেক মানুষকেই নিজ নিজ দায়িত্বের ব্যাপারে সচেতন করা হয়েছে। কারণ সকল মানুষ নিজ দায়িত্ব পালনে সচেতন হলে স্বাভাবিকভাবেই তাদের জীবন গতিশীল হয়ে উঠবে। বাস্তবতা হচ্ছে মানব জীবনকে সচেতন ও গতিশীল করা ব্যতিরেকে কারো পক্ষেই ইহকালীন সাফল্য ও পরকালীন মুক্তি লাভ সম্ভব নয়।

(১৩) ঝগড়া বিবাদ রোধ করা

মানুষকে সৃষ্টির পিছনে মহান আল্লাহর রয়েছে সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনা। যেকারণে মানব জীবন অত্যন্ত মূল্যবান। গতিহীনতা বা বিলাসীতা অলসতা, কর্মবিমুখতা এর কোনটাই মানব জীবনে পূর্ণতা ও সফলতা আনতে পারে না। আল্লাহ তায়ালা মানবজাতিকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন,

اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنٰكُمْ عَبَثًا وَّ اَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُوْنَ

"তোমরা কি ভেবেছ আমি তোমাদের অযথা সৃষ্টি করেছি।"[৩]

তিনি আরও বলেছেন,

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنّٰتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا.خٰلِدِيْنَ فِيْهَا لَا يَبْغُوْنَ عَنْهَا حِوَلًا

"যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাদের আপ্যায়নের জন্য রয়েছে ফিরদাউসের উদ্যান, সেথায় তারা স্থায়ী হবে এবং সেখান থেকে স্থানান্তর কামনা করবে না।"[৪]

মহান আল্লাহ এ ঘোষণার মাধ্যমে মানবজাতিকে সচেতন থাকার ইঙ্গিত দিয়েছেন। সত্য, সাম্য ও ন্যায়ের ধর্ম ইসলাম ঝগড়া বিবাদ রোধের মাধ্যমে এ পৃথিবীর বুকে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একের প্রতি অপরের আচার আচরণ ও অধিকারে দিয়েছে সুশৃঙ্খল ও সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা। ইসলামের দৃষ্টিতে একটা অবিচ্ছিন্ন কর্তব্য বা দায়িত্ব পালনের নামই জীবন। আল্লাহর প্রতি, তাঁর রাসূলের প্রতি, নিজের প্রতি, পিতা মাতা ও আত্মীয়

[১] মোঃ ইকবল হোসেন ভূঁইয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৪
[২] আল কুরআন, ৪ : ১৬৪
[৩] আল কুরআন, ২৩ : ১১৫
[৪] আল কুরআন, ১৮ : ১০৭-১০৮

স্বজনের প্রতি, নিজ সমাজ তথা সমগ্র সৃষ্টির প্রতি প্রত্যেক মানুষের রয়েছে দায়িত্ব কর্তব্য। এ কর্তব্য পালনের নিষ্ঠাযুক্ত সংকল্প গ্রহণের মধ্যেই তা যথাযথ সম্পাদনের জন্য মানুষের প্রতি ইসলাম নির্দেশ দিয়েছে।[১]

ইসলাম প্রতিটি মানুষকে ঝগড়া বিবাদমুক্ত একটি আদর্শ সমাজ বিনির্মাণের প্রতি জোর দিয়েছে সর্বদা। ঝগড়া বিবাদের মাধ্যমে অশান্তি সৃষ্টির প্রচেষ্টাকারীকে কিংবা অত্যাচার নির্যাতনের বিরুদ্ধে বজ্রকণ্ঠে প্রতিবাদ করার পূর্ণ অধিকার দিয়েছে ইসলাম। ঝগড়া বিবাদকারীকে প্রশ্রয় না দেয়া, অত্যাচারীর সামনে মাথানত না করার এবং তার অত্যাচারকে ঠাণ্ডা মাথায় বরদাশত না করাই ইসলামের শিক্ষা। ঝগড়া বিবাদ মূলত অশ্লীল কথার ছড়াছড়ি। অশ্লীল কথাবার্তাই এর মূল উপজীবিকা। অশ্লীলভাষী আল্লাহর নিকট অপছন্দনীয় ব্যক্তি।[২]

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেন,

اِنَّ الَّذِیۡنَ یُحِبُّوۡنَ اَنۡ تَشِیۡعَ الۡفَاحِشَۃُ فِی الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا لَهُمۡ عَذَابٌ اَلِیۡمٌ ۙ فِی الدُّنۡیَا وَ الۡاٰخِرَۃِ ؕ وَ اللّٰهُ یَعۡلَمُ وَ اَنۡتُمۡ لَا تَعۡلَمُوۡنَ

"যারা মুমিনদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার কামনা করে তাদের জন্য আছে দুনিয়া ও আখিরাতে মর্মন্তুদ শাস্তি এবং আল্লাহ জানেন তোমরা জান না।"[৩]

মহানবী (সা.) বলেছেন, "চারটি বৈশিষ্ট্য যার মধ্যে থাকবে সে খাঁটি মুনাফিক। আর এর একটি বৈশিষ্ট্য যার মধ্যে থাকবে, তার মধ্যে মুনাফিকির একটি বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান, যতক্ষণ পর্যন্ত সে তা পরিত্যাগ না করে। উক্ত চারটি বৈশিষ্ট্য হল:

১. যখন তার নিকট কোন কিছু আমানত রাখা হয়, সে তার খিয়ানত করে,
২. সে যখন কথা বলে, মিথ্যা বলে,
৩. আর যখন প্রতিশ্রুতি দেয়, তা ভঙ্গ করে এবং
৪. যখন কারো সাথে ঝগড়া বিবাদ করে, তখন অশ্লীল ভাষায় গালি দেয়।"[৪]

অর্থাৎ অশ্লীলতা ও মন্দ কথা এক কথায় ঝগড়া বিবাদ অত্যন্ত গর্হিত কাজ। এ গর্হিত কাজটি সাধারণত মানুষ রাগের বশবর্তী হয়ে করে থাকে। প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার এক মোক্ষম সুযোগ নিয়ে ব্যক্তি একে অন্যের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ক্রোধের বশবর্তী হয়ে মূলতঃ এ কাজটি করা হয়। ক্রোধ সংবরণের নির্দেশ দিয়ে মহানবী (সা.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি লোককে কুস্তিতে হারায় সে বাহাদুর নয়; বরং প্রকৃত বাহাদুর সেই ব্যক্তি যে রাগের মুহূর্তে ধৈর্য্যের সাথে নিজেকে সামলাতে পারে।[৫] শারীরিক শক্তিমত্তাই মানুষের মূলশক্তি নয়। ব্যক্তি মল্লযুদ্ধে দৈহিক ক্ষমতা দিয়ে প্রতিপক্ষকে সহজেই পরাজিত করতে পারে। এ পারা তেমন কঠিন কাজ নয়। কেননা, কায়িক শক্তির প্রদর্শনী ছাড়া ব্যক্তিকে এখানে কিছুই করতে হয় না। আসল শক্তিমান সেই ব্যক্তি যে ঝগড়া বিবাদের বা ক্রোধের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। ক্রোধ একটি রিপু। এর ফলে ব্যক্তি উত্তেজিত হয়ে উঠে, যথাযথ আচরণ করতে পারে না। নিজের উপর ও নিজের কাজের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে ব্যর্থ হয়ে অন্যকে অশ্লীল ভাষায়

[১] মোঃ ইকবল হোসেন ভূঁইয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬০
[২] মোঃ ইকবল হোসেন ভূঁইয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬০
[৩] আল কুরআন, ২৪ : ১৯
[৪] আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল বুখারী, সহীহুল বুখারী, আল মযালিম ওয়াল গাসাব, অধ্যায়: হা. নং-২২৭৯
[৫] আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল বুখারী, সহীহ বুখারী, শিষ্টাচার, অধ্যায়: বাবু আল হাযরী মিনাল গাযাব, হা. নং-৫৬৪৯

গালাগাল করতে থাকে। প্রতিপক্ষও জড়িয়ে পড়ে ঝগড়া বিবাদে। কঠিন এ মুহূর্তে প্রবৃত্তির সাথে বিজয়ী হবার জন্যে দৈহিক শক্তি যথেষ্ট নয়। এ জন্য প্রয়োজন আত্মশুদ্ধির ও আত্মসংশোধনের। বস্তুত এটা অত্যন্ত কঠিন কাজ। মহানবী (সা.) একে 'জিহাদুল আকবর' বা বৃহত্তম জিহাদ বলে আখ্যায়িত করেছেন।[১]

(১৪) অকল্যাণের পথ বন্ধ করা

ইসলাম কল্যাণের ধর্ম। ইসলাম অকল্যাণের পথ বন্ধ করে মানব সমাজে পরস্পরের প্রতি দায়িত্ববোধ, মর্যাদাবোধ, নিষ্ঠা, সততা, সুবিচার, সহানুভূতি, কল্যাণ কামনা, দয়া মায়া এবং দরদ ভালোবাসার শিক্ষা দেয়। সেই সাথে দায়িত্বহীনতা, অশ্রদ্ধা, কপটতা, অন্যায় যুলম, নিপীড়ন, অবিচার, স্বার্থপরতা, অসততা, বিশ্বাসঘাতকতা ও নিষ্ঠুরতাকে পদদলিত করে অকল্যাণের পথ চিরতরে বন্ধ করে কল্যাণকর বিশ্ব উপহার দেয়াই ইসলামের মূল শিক্ষা।[২] কুরআন-হাদীসে এ সংক্রান্ত অসংখ্য বর্ণনা রয়েছে। যেমন- আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، وَلاَ تَحَسَّسُوا، وَلاَ تَجَسَّسُوا، وَلاَ تَحَاسَدُوا، وَلاَ تَدَابَرُوا، وَلاَ تَبَاغَضُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا

তোমরা ধারণা করা থেকে বিরত থাকো। কারো প্রতি ধারণা পোষণ করা সবচেয়ে বড় মিথ্যা ব্যাপার। তোমরা দোষ অন্বেষণ করো না, গোয়েন্দাগিরী করো না, পরস্পর হিংসা করো না একে অন্যের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করো না এবং পরস্পর বিরোধে লিপ্ত হয়ো না। বরং তোমরা সবাই আল্লাহর বান্দা ভাই ভাই হয়ে থেকো।[৩]

কল্যাণ কামনাই ইসলাম। এ সংক্রান্ত একাধিক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। যেমন-

عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى إِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ

জারীর ইবন আবদুল্লাহ আল বাজলী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাতে বায়আত গ্রহণ করেছি সালাত কায়েম করার, যাকাত দেওয়ার এবং সকল মুসলিমের কল্যাণ কামনা করার।[৪]

অন্ধকার যুগের ইতিহাসকে মুছে দিয়ে পৃথিবীর বুকে কল্যাণ, শান্তি ও নিরাপত্তার যে অধ্যায় প্রায় ১৫শ বছর আগে ইসলাম রচনা করেছে, আজকের পৃথিবীতে তার আবেদন এখনো ফুরিয়ে যায়নি। নিঃশেষ হয়নি তার বিমল আদর্শের প্রয়োজনীয়তা। কিয়ামত সংঘটিত হবার পূর্বে তা কখনও হবেনা। সে জন্যই ইসলাম স্বীকৃতি পেয়েছে একটি সর্বকালীন ও সার্বজনীন ধর্ম বা বিধান হিসাবে। ইসলামের প্রতি গভীরভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে সে সত্যই উজ্জল ও উদ্ভাসিত হয়ে উঠে। তাই সময়ের চাহিদা মিটাতে ও যুগ সমস্যার সমাধানের বিধান হিসাবে ইসলামের কোন বিকল্প নাই। ইসলামের মর্মবাণী হল অক্যাণের পথ বন্ধ করে শান্তি, সাম্য ও সহমর্মিতা প্রতিষ্ঠা। দেশে দেশে, জাতিতে জাতিতে এবং মানুষে মানুষে, শান্তি স্থাপন ইসলামের মূল লক্ষ্য। ইহজাগতিক শান্তির মধ্য দিয়ে পরকালীন শান্তি তথা মুক্তির লক্ষ্যে উপণীত হবার চেষ্টার মধ্যেই ইসলামের সুর ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত।[৫] মুসলমানদেরকে পরকালীন জীবনকে অধিক গুরুত্ব দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এসংক্রান্ত

[১] মোঃ ইকবল হোসেন ভূঁইয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬১
[২] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬২
[৩] ইমাম বুখারী, *সহীহ বুখারী শরীফ*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, হাদীস নং ৫৬৩৮
[৪] *প্রাগুক্ত*, হাদীস নং ৫৫
[৫] মোঃ ইকবল হোসেন ভূঁইয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬২

একাধিক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। যেমন- বানু ফিহরের মুস্তাওরিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَا الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إِلاَّ مِثْلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ فِي الْيَمِّ فَلْيَنْظُرْ بِمَاذَا يَرْجِعُ

আখিরাতের তুলনায় দুনিয়া হল এতটুকুর মতই যে, তোমাদের কেউ যেন সমুদ্রে তার আঙ্গুল ডুবিয়ে বের করে আনল। সে লক্ষ্য করে দেখুক যে, সে তার আঙ্গুল ভিজিয়ে সমুদ্রের কতটুকু পানি তুলে আনতে পারে?[১]

অপর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ "

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, দুনিয়া হল মু'মিনের জন্য কারাগার এবং কাফিরের জন্য জান্নাত।[২]

ইসলাম শব্দটি উদ্ভব হয়েছে 'সলম' থেকে। সে হিসাবে ইসলাম বলতে বুঝায় উচ্চতম আদর্শের কাছে আত্মসমর্পণ। শান্তি কথাটির বুঝতে হবে প্রচলিত অর্থের চেয়ে ব্যাপকতর অর্থে। শান্তি বলতে বুঝায় আদর্শের প্রতি পরিপূর্ণ অনুরাগ ও আনুগত্য। ব্যক্তি মানুষের বিভিন্ন বিরোধি প্রবণতার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান এবং এভাবে মানসিক শান্তি অর্জনই জীবনের লক্ষ্য। ব্যক্তিগত জীবনে শান্তি অর্জন ইসলামের একমাত্র লক্ষ্য নয়।[৩]

ব্যক্তি জীবনে শান্তি অর্জনের পাশাপাশি জনগণের সামাজিক ও বৈষয়িক জীবনে শান্তি প্রতিষ্ঠাই ইসলামের অভিষ্ট লক্ষ্য। ব্যক্তি জীবনের বিভিন্ন বিবদমান শক্তির মধ্যে সমন্বয় ও সামঞ্জস্য বিধানের মাধ্যমে এবং ব্যক্তি সত্ত্বাকে তার পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেয়ার সাহায্যে আত্মশৃঙ্খলা অর্জনই ইসলাম।[৪]

---

[১] ইমাম তিরমিযী, *সুনান তিরমিযী শরীফ*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, হাদীস নং ২৩২৬
[২] *প্রাগুক্ত*, হাদীস নং ২৩২৭
[৩] মোঃ ইকবল হোসেন ভূঁইয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬২
[৪] বিস্তারিত দ্রষ্টব্য: Syedur Rahman, An Introduction to Islamic Culture and Philosophy, (Dacca, 1963) p. 24

দ্বিতীয় অধ্যায়

অপরাধ ও শাস্তির পরিচয় এবং ইসলামের হুদুদ আইন

প্রথম পরিচ্ছেদ : অপরাধ ও শাস্তি পরিচিতি

অপরাধের পরিচয়

অপরাধ হচ্ছে আইন ও নৈতিকতা বিরোধী কাজ যা সম্পাদন করলে শাস্তি পেতে হয়। অপরাধের আরবী প্রতিশব্দ জিনায়াত (جناية), এর অর্থ দণ্ডযোগ্য অপকর্ম।[১] অপরাধের আরেকটি আরবী শব্দ 'জারিমাহ' (جريمة)। আবার (اثم) দ্বার পাপ বা অপরাধ বোঝানো হয়। ইংরেজীতে অপরাধের প্রতিশব্দ হচ্ছে, Crime, Offence ইত্যাদি।

অপরাধের সংজ্ঞায় B. Bhushan বলেছেন, Crime refers to any behaviour contrary to the groups of moral codes for which there are formalized group sanctions whether they are laws or not. It is anti-social behaviour harmful to individuals or groups.[২]

অর্থাৎ, অপরাধ বলতে বোঝায়, নৈতিকতা বিরোধী যে কোনও আচরণ, যার জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে, তা সেগুলি আইন হোক বা না হোক। এটা ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর জন্য ক্ষতিকর অসামাজিক আচরণ।

অপরাধ বিজ্ঞানী পারমিলি বলেন, অপরাধ হচ্ছে আইন দ্বারা নিষিদ্ধ ও শাস্তি যোগ্য এমন কোন কাজ, যা প্রায় সর্বদাই প্রচলিত নৈতিক মানদণ্ড অনুযায়ী গর্হিত বলে বিবেচিত হওয়ায় তা সমাজের জন্য বিশেষভাবে ক্ষতিকর এবং প্রচলিত সামাজিক ব্যবস্থা অক্ষুণ্ন রাখার জন্য শাস্তির মাধ্যমে নিরোধ করা হয়।[৩]

সাধারণত অপরাধের দু'টি দিক রয়েছে।

(ক) সামাজিক– অর্থাৎ সামাজিক মূল্যবোধ, রীতি-রেওয়াজ, বিধিবিধান বিবর্জিত কাজকে অপরাধ বলা হয়।

(খ) আইনগত– রাষ্ট্র নির্ধারিত আইনের পরিপন্থী আচরণই অপরাধ।

সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে অপরাধের সংজ্ঞায় গিলিন *Cultural Sociology* গ্রন্থে বলেছেন, Sociologically either a criminal or a juvenile delinquent is one who is guilty of an act believed by a group that has a power to enforce its belief to injurious to society and therefore prohibitive.[৪]

অর্থৎ, সমাজতাত্ত্বিকভাবে একজন অপরাধী বা কিশোর অপরাধী এমন একজন, যিনি এমন একটি কাজের জন্য দোষী, যা একটি গোষ্ঠী দ্বারা বিশ্বাস করা হয়েছে, যার বিশ্বাসকে সমাজের জন্য ক্ষতিকর এবং তা নিষিদ্ধ করার ক্ষমতা রয়েছে।

আইনগত দৃষ্টিকোণ অপরাধের সংজ্ঞায় সাদারল্যাণ্ড (E. H. Sutherland) তাঁর *Principles of Criminology* (1955) গ্রন্থে বলেছেন, Crime is a violation of law. If there were no laws there would be no

---

[১] মুহাম্মদ আর-রাযী, *মুখতারুস সিহাহ*, বৈরুত : মাকতাবাতু লুবনান, ১৯৯৫, খ. ১,পৃ. ১৪৪

[২] উদ্ধৃত; ড. মাহবুবা নাসরীন ও ড. খোন্দকার মোকাদ্দেম হোসেন সম্পাদিত, *সমাজবিজ্ঞান প্রথম পত্র*, গাজীপুর : বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৮, পৃ. ২১৮

[৩] অধ্যক্ষ এ.এ. এম মনিরুজ্জামান; মোহাম্মদ হায়দার আলী, *জুরিস্প্রুডেন্স এ্যান্ড লিগ্যাল থিওরী*, ঢাকা : ন্যাশনাল ল' পাবলিকেশন্স, ২০১২, পৃ. ২৯০

[৪] উদ্ধৃত; ড. মাহবুবা নাসরীন ও ড. খোন্দকার মোকাদ্দেম হোসেন সম্পাদিত, *প্রাগুক্ত*, পৃ.২১৮

crime. Whenever a law is passed and enforced acts that were no: crime, previously are made crimes.[১]

কোনো কোনো অপরাধ বিজ্ঞানীদের মতে অপরাধ হচ্ছে,

1. An act committed or omitted in violation of law forbidding or commanding it and for which punishment is imposed upon conviction.
2. Unlawful activity Statistics relating to violent crime.
3. A serious offence, especially one in violation of morality.
4. An unjust, senseless, or disgraceful act or condition. It's a crime :o squander our country's natural resources. অর্থাৎ
১. এমন কিছু করা যার জন্যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির উপর শাস্তি আরোপিত হয়;
২. বে-আইনী কাজ করা ;
৩. মারাত্মক দোষ বা পাপ, বিশেষত নৈতিক স্খলন ;
৪. অন্যায্য, বিবেক -বর্জিত বা অপ্রীতিকর কাজ বা অবস্থা।[২]

মাওয়ার্দী বলেন, "জারীমা (جريمة) হচ্ছে ঐ সব শরীয়াত নিষিদ্ধ কাজ যেগুলোর বিরুদ্ধে আল্লাহ তায়ালা হদ্দ বা তা'যীরের ভয় প্রদর্শন করেছেন।"[৩]

হানাফী ইমামগণের মতে, অপরাধ সেই নিষিদ্ধ কাজ যা ব্যক্তি বা তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিরুদ্ধে সংঘটিত হয়। শাফেয়ীদের মতে, প্রাণ নাশকারী বা অঙ্গহানিকর কাজই হচ্ছে অপরাধ। মালেকীদের মতে, হারবী শত্রু নয়, এমন কোন নির্দোষ ব্যক্তির প্রাণনাশ বা অঙ্গব্যবচ্ছেদ; চাই তা ইচ্ছাকৃতভাবে হোক আর অনিচ্ছাকৃতভাবেই হোক, যথার্থ কারণে আর নেহাৎ অপবাদের ভিত্তিতেই হোক। হাম্বলীদের মতে, সাধারণভাবে এমন সব কাজই অপরাধ পদবাচ্য যা মানবদেহের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয় এবং ফলে কিসাস বা ঐ জাতীয় দণ্ড অপরিহার্য হয়।[৪] মিশরীয় আইনে বলা হয়েছে- এমন সব অপরাধ যার জন্যে প্রাণদণ্ড, কঠোর দৈহিক শ্রমের দণ্ড বা কারাদণ্ড হয়ে থাকে সে সবই অপরাধ।[৫]

সারকথা হচ্ছে সমাজ ও রাষ্ট্রের শান্তি-শৃঙ্খলা, স্থিতি নষ্টকারী, নৈতিকতা বিরোধী সকল কর্মকাণ্ডই অপরাধ। যেকোনো প্রকার সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড যেমনিভাবে অপরাধ হিসেবে বিবেচিত, অনুরূপভাবে ঘুষ-দুর্নীতি বা এ জাতীয় অপরাধও অপরাধ। তাছাড়া রাষ্ট্রীয় নির্দেশনা বিরোধী কর্মকাণ্ডও রাষ্ট্রের নিকট অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে, যদিওবা এর দ্বারা ব্যক্তি, সমাজ কিংবা রাষ্ট্রের কোনো ক্ষতি হোক বা না হোক। তবে ক্ষতির মাত্রা বিবেচনায় অপরাধের শাস্তি ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে।

---

[১] উদ্ধৃত; *প্রাগুক্ত*
[২] Free online dictionary, Thesaurus and Encyclopedia of crime.
[৩] আবুল হাসান আলী আল-মাওয়াদী, *আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ*, বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, তাবি, পৃ. ১৯২
[৪] মুহাম্মদ আমীন ইবনু আবেদীন, *রাদ্দুল মুহতার*, বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, তাবি, খ. ১০, পৃ.
[৫] আবদুল কাদের আওদাহ,*আশ-তাশরীউল জিনাঈ আল-ইসলামী*, বৈরুত: ১৯৮৩, খ. ২, পৃ. ৫

অপরাধের বৈশিষ্ট্য

সমাজবিজ্ঞান ও অপরাধবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে অপরাধের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে[১]:

১। মানুষের সামাজিক আচরণের একটি অস্বাভাবিক রূপ হচ্ছে অপরাধ।
২। এটি সামাজিক, ব্যক্তিগত এবং আদর্শগতভাবে ক্ষতিকর।
৩। অপরাধ মূলত আপেক্ষিক; সময় ও সমাজভেদে এর রূপ ও মাত্রাগত পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।
৪। সামাজিক সংহতি ও স্থিতিশীলতার জন্য মারাত্মক হুমকি হচ্ছে অপরাধ।
৫। অপরাধ সমাজ কাঠামোর সাথে সম্পৃক্ত। যেমন শিল্প সমাজের অপরাধপ্রবণতা কৃষি সমাজ অপেক্ষা ভিন্নতর।
৬। অপরাধ সামাজিক মিথস্ক্রিয়া এবং সামাজিকীকরণের ফল।
৭। অপরাধ আইনগতভাবে শাস্তিযোগ্য।
৮। বয়স অনুযায়ী অপরাধের মাত্রা ও গুরুত্ব নিরূপণ করা হয়।
৯। অপরাধ নিন্দনীয় এবং বর্জনীয়।

১০। অনেক সময় মহান আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে কোনো কোনো মানুষ অপরাধে লিপ্ত হয়। যেমন: ক্ষুদিরাম, মাস্টারদা সূর্য সেন প্রমুখ মহান স্বাধীনতার আদর্শে নিবেদিত হয়ে রাষ্ট্রবিরোধী কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত হয়েছিলেন।[২]

১১। অপরাধ সমাজের অপরিহার্য এবং অবিচ্ছেদ্য বিষয়। এরিকসন (Erikson) বলেছেন, সন্ন্যাসীদের সমাজে বসবাসকারী সদস্যদের মধ্যেও অপরাধ প্রবণতা বিদ্যমান। ডুর্খেইম অপরাধকে সামাজিক দিক থেকে স্বাভাবিক কার্যকলাপ এবং সুস্থ সমাজের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ষড়যন্ত্র, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার জন্য উস্কানি, শর্তভঙ্গ, উন্মুক্ত অপরাধ সংঘটন ইত্যাদি সমাজের ক্ষতি সাধন করে। মাদকাসক্তি, ডাকাতি, আত্মহত্যা ইত্যাদি ব্যক্তিগত এবং বেশ্যাবৃত্তি, সমকামিতা, গর্ভপাত প্রভৃতি কোনো কোনো রক্ষণশীল সমাজের আদর্শগত ক্ষতি সাধন করে থাকে।[৩]

অপরাধের মৌলিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটি কখনোই কারো জন্য কল্যাণ বয়ে আনে না। মাত্রা ভেদে অপরাধ পৃথিবীর সকল দেশেই শাস্তিযোগ্য বলে বিবেচিত। ছোট-বড়, নৈতিক-বাহ্যিক সকল ধরণের অপরাধই নিন্দনীয় ও পরিত্যাজ্য। অন্যের অধিকারহানীকর অপরাধগুলো পৃথিবীর সর্বত্র অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হলেও সমাজ ও রাষ্ট্র ভেদে নৈতিকতা ও মূল্যবোধ ভিন্ন হওয়ায় কোনো সমাজে একটি বিষয় অনৈতিক হিসেবে বিবেচিত হলেও অন্য সমাজে তা না-ও হতে পারে।

অপরাধের ধরনসমূহ

সমাজবিজ্ঞানী ও অপরাধবিজ্ঞানীরা পাঁচ ধরনের অপরাধের উল্লেখ করেছেন। যথা[৪]- ক) কিশোর অপরাধ খ) আত্মবিনাশ অপরাধ গ) ভদ্রবেশী অপরাধ ঘ) সংগঠিত অপরাধ ঙ) ফৌজদারি অপরাধ

---

[১] ড. মাহবুবা নাসরীন ও ড. খোন্দকার মোকাদ্দেম হোসেন সম্পাদিত, *প্রাগুক্ত*, পৃ.২১৯
[২] *প্রাগুক্ত*
[৩] *প্রাগুক্ত*
[৪] *প্রাগুক্ত*

শাস্তির পরিচয়

আরবীতে শাস্তিকে (العقوبة) বলা হয় । বাংলায় শাস্তির প্রতিশব্দ নিগ্রহ, দণ্ড, সাজা।[১] ইংরেজি প্রতিশব্দ Punishmen: ।[২] শাব্দিক অর্থে 'শাস্তি' বলতে কৃত অপরাধের জন্য অপরাধীকে কষ্ট দেয়া বুঝায়। এ কষ্ট অবশ্য শারীরিক বা মানসিক বা উভয় প্রকার হতে পারে। সামাজিক শৃঙ্খলা ও মানুষের জান, মালের নিরাপত্তার জন্য রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে আইন-কানুন তৈরী করে অপরাধীকে কষ্ট দিয়ে শাস্তি নিশ্চিত করা হয়।[৩]

অপরাধ শব্দটি হল কারণ এবং উক্ত কারণের ফল হচ্ছে শাস্তি। অতএব শাস্তি হবে রাষ্ট্রের আদেশ নিষেধ অপ্রতিপালনের জন্য প্রতিশোধ স্বরূপ ব্যবস্থা। অন্যথায়, আভিধানিক অর্থে শাস্তি বলতে সংঘটিত অপরাধের জন্য অপরাধীকে কষ্ট দেয়া বোঝায়। এই অর্থে শাস্তি হল ক্লেশ। যারা দেশের আইন ভঙ্গ করেন তারাই এ ক্লেশ ভোগ করতে বাধ্য হন। সুতরাং কৃত অপরাধের জন্য অপরাধীকে যে শারীরিক ও মানসিক যাতনা বা পীড়ন করা হয় ইহার নামই শাস্তি।[৪]

শাস্তির সংজ্ঞা প্রদান করতে গিয়ে ইসলামী বিশেষজ্ঞগণ বলেন, "শরীয়াত প্রবর্তক (আল্লাহ ও তাঁর রাসূল) এর নির্দেশ অমান্য করার জন্য জনগণের কল্যাণে বিধিবদ্ধ প্রতিফল।"[৫] ইমাম তহাভী (রহ.) শাস্তির সংজ্ঞায় বলেন, অপরাধের কারণে মানুষ যে যাতনা ভোগ করে তাকে শাস্তি বলে।[৬] মুফতী মুহাম্মদ আমীমুল ইহসান (রহ.) বলেন, অপরাধ সংঘটনের পর অপরাধীকে প্রতিদান হিসেবে দুনিয়া বা আখিরাতে যে কষ্ট ভোগ করতে হবে তাকে শাস্তি বলে।[৭]

অপরাধীকে তার কৃত অপরাধের জন্য যে শারীরিক বা মানসিক যাতনা কিংবা পীড়ন করা হয় তার নাম "শাস্তি"। অপরাধের জন্য এ ধরনের যাতনা বা কষ্ট-ক্লেশ আরোপ করা সরকারের নৈতিক কর্তব্য। কারণ অপরাধীর প্রায়শ্চিত্য হওয়া বাঞ্ছনীয়। এটি তার সংশোধন ও নবজন্ম লাভের উপায়। সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় আইন ভঙ্গের জন্য আইনানুগ অপরাধী প্রমাণিত হলে, শাস্তির পরিমাণ যা-ই হোক না কেন, আসামীকে অবশ্যই শাস্তি দিতে হবে।[৮]

ইসলামী শাস্তি আইনের প্রকারভেদ

ইসলাম মানব জীবনকে দুটি ভাগ করেছে। একটা মৃত্যু পূর্ববর্তী পার্থিব জীবন। অপরটি মৃত্যু পরবর্তী পারলৌকিক জীবন। পার্থিব জীবন পরিচালনার জন্য মানুষকে বিবেক-বুদ্ধি দেওয়া হয়েছে। সত্য ও ন্যায়ের পথের সন্ধান দেওয়ার জন্য যুগে যুগে অসংখ্য নবী-রাসূল প্রেরণ করা হয়েছে, আসমানী কিতাব অবতীর্ণ করা হয়েছে। মহান আল্লাহর নির্দেশ অমান্যকারীর পরিণতির কথা এসব কিতাবে বারংবার উল্লেখ করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও যে বা যারা এসব নির্দেশের

---

[১] নরেন বিশ্বাস, *বাঙলা উচ্চারণ অভিধান*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা : ১৯৯৯, পৃ. ৪৩৩

[২] ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *বাংলা-ইংরেজী-আরবী ব্যবহারিক অভিধান*, রিয়াদ প্রকাশনী, ঢাকা : ২০০৪, পৃ. ৪৮১

[৩] অধ্যক্ষ এ.এ. এম মনিরুজ্জামান; মোহাম্মদ হায়দার আলী, *জুরিসপ্রুডেন্স এ্যান্ড লিগ্যাল থিওরী*, ন্যাশনাল ল' পাবলিকেশন্স, সংস্ক. ৬, ২০১২, পৃ. ২৯৩

[৪] অধ্যক্ষ মো: আলতাফ হোসেন, *জুরিসপ্রুডেন্স*, হিরা পাবলিকেশন্স, সংস্ক. ১, জুলাই ২০১১, পৃ. ২১৮

[৫] আবদুল কাদের আওদাহ, *আত-তাশরী আল-জিনাঈ*, লেবানন, মুআসসাতুর রিসালাহ, সংস্ক. ১৪, ১৪১৯ হি., খ. ১, পৃ. ১০৯

[৬] *আল-মাওসূআতুল ফিকহিয়্যাহ*, কুয়েত : ওয়াযাকাতুল আওয়াফ ওয়া আল-শুয়ূন আল ইসলামিয়্যাহ, ১৯৯৫, খ. ৩০, পৃ. ২৬৯

[৭] মুফতী মুহাম্মদ আমীমুল ইহসান, *কাওয়াইদুল ফিকহ*, ঢাকা : ইমদাদিয়া লাইব্রেরি, ১৯৬১, পৃ. ৩৮৩

[৮] জাকিয়া সুলতানা জলি; মো: শাহিনুর রহমান, *জুরিসপ্রুডেন্স এ্যান্ড লীগ্যাল থিওরী*, সম্পাদনায় : এম জগলুল কবির, পাইভ জুয়েল পাবলিকেশন্স, সংস্ক. ১, জানুয়ারী ২০১৩, পৃ. ৩৪৫

অবাধ্য হবে, ইসলামে তাদের শাস্তির ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। ইসলামের শাস্তিকে প্রথমত দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- প্রথমত- জাগতিক শাস্তি, দ্বিতীয়ত- পারলৌকিক শাস্তি।

জাগতিক শাস্তি

মানুষকে পৃথিবীতে প্রেরণ করা হয়েছে মহান আল্লাহর আনুগত্য, দাসত্ব ও ইবাদত করার জন্য। এর ব্যত্যয় যারা করবে, সমাজ ও রাষ্ট্রে যারা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে, ইসলাম পার্থিব জীবনেই তাদের শাস্তির ঘোষণা দিয়েছে। ইসলামের দৃষ্টিতে কিছু অপরাধ রয়েছে যা কেউ সংঘটিত করলে তাকে দুনিয়াতেই সাজা ভোগ করতে হবে। এ ধরনের সাজা ভোগ করতে হয় সাধারণত কারো দ্বারা মানুষের অধিকার নষ্ট হলে, কারো প্রতি জুলুম করা হলে, সমাজের শান্তি-শৃঙ্খলা নষ্টকারী কর্মকাণ্ডে যুক্ত হলে। যেমন চুরির শাস্তি সম্পর্কে বলা হয়েছে, আর যে পুরুষ চুরি করে এবং যে নারী চুরি করে, তোমরা তাদের কৃতকর্মের সাজা হিসাবে তাদের (ডান হাত) কেটে ফেল, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে শাস্তি, আর আল্লাহ অতিশয় ক্ষমতাবান, মহা প্রজ্ঞাময়।[১]

যে সব অপরাধের উপর ভিত্তি করে শাস্তি নির্ধারণ করা হয়, তার ভিত্তিতে শাস্তি চার প্রকার। ১. হুদুদ ২. তাযীর ৩. কিসাস ৪. দিয়াত

তবে ইমামগণের অধিকাংশই কিসাস ও দিয়াত উভয় প্রকার শাস্তিকেই কিসাসের অধীনে উল্লেখ করেছেন। সেক্ষেত্রে শাস্তির প্রকার দাঁড়ায় তিনটি। যথা- ১. হুদুদ ২. তাযীর ৩. কিসাস ও দিয়াত।[২]

পারলৌকিক শাস্তি

মানুষ মারা যাওয়ার পর তার নতুন জীবন শুরু হয়। যে জীবন মূলত মানুষের প্রতিদান পাওয়ার জীবন। দুনিয়ার জীবনে মানুষ যা করবে তার প্রতিদান স্বরূপ পুরস্কার কিংবা শাস্তি মৃত্যু পরবর্তী জীবনেই প্রদান করা হবে। সৎ কর্মশীলদের পুরস্কার প্রদান সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, এবং যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে ও সৎ কার্যাবলী সম্পাদন করে থাকে তাদেরকে সুসংবাদ প্রদান কর যে, তাদের জন্য এমন জান্নাত রয়েছে যার তলদেশ দিয়ে নদীসমূহ প্রবাহিত হচ্ছে; যখনই সেখানে তাদেরকে খাবার হিসাবে ফলপুঞ্জ প্রদান করা হবে তখনই তারা বলবে, আমাদেরতো এটা পূর্বেই প্রদত্ত হয়েছিল, বস্তুতঃ তাদেরকে একই সদৃশ ফল প্রদান করা হবে, এবং তাদের জন্য তন্মধ্যে পবিত্র সহধর্মিনীগণ রয়েছে, এবং তথায় তারা চিরকাল অবস্থান করবে।[৩]

অপরাধের শাস্তি প্রদান প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেন, তবে হাঁ, যারা পাপ কাজ করে এবং যাদের পাপরাশি তাদেরকে ঘিরে ফেলে তারাই জাহান্নামী, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।[৪]

---

[১] আল কুরআন, ৫ : ৩৮

[২] মাওলানা মুহাম্মদ মূসা ও মাওলানা মোঃ মোজাম্মেল হক সংকলিত, *বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা : ২০১৮, খ. ১, পৃ. ২৬০

[৩] আল কুরআন, ২ : ২৫

[৪] আল কুরআন, ২ : ৮১

হুদুদ

পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত শাস্তি বিধানকে হদ বলা হয়। হুদুদ (حدود) শব্দটি হদ্দ (حد) এর বহু বচন। হদ্দ-এর শাব্দিক অর্থ বাধা দান, নিবৃত করা, বারণ করা ইত্যাদি। তীব্রতা, শাস্তি, দণ্ড, সাজা ইত্যাদি অর্থেও হদ্দ শব্দ ব্যবহৃত হয়।[১] দুটি বস্তুর মধ্যস্থিত প্রতিবন্ধককে বা পৃথককারীকেও হদ্দ বলা হয়।[২] ব্যাপ্তি, সীমানা, পরিধি, প্রান্তভাগ, কিনারা প্রভৃতি অর্থেও হদ ব্যবহৃত হয়।[৩] সুতরাং প্রত্যেক জিনিস যা কোন কিছু থেকে মানুষকে বিরত রাখে তাকে হদ্দ বলা হয়। কোনো কোনো শাস্তিকে এজন্য হদ্দ বলা হয়েছে যেহেতু শরীয়াতের দণ্ড এসব অপরাধকে রোধ করে।[৪] আর 'হুদুদুল্লাহ' বলতে বুঝায় মহান আল্লাহ কর্তৃক নিষেধকৃত বস্তুকে।

পবিত্র কুরআনের একাধিক আয়াতে হুদুদ (حدود) শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন, এগুলি হচ্ছে আল্লাহর সীমাসমূহ। অতএব তা অতিক্রম করনা এবং যারা আল্লাহর সীমা অতিক্রম করে বস্তুতঃ তারাই অত্যাচারী। [৫]

কুরআন কারীমের অন্য আয়াতে ঘোষণা করা হচ্ছে, এটিই আল্লাহর সীমা। অতএব তোমরা উহার নিকটেও যাবে না; এভাবে আল্লাহ মানবমণ্ডলীর জন্য তাঁর নিদর্শনসমূহ বিবৃত করেন, যেন তারা সংযত হয়। [৬]

ইসলামি শরীয়তের পরিভাষায় 'হুদুদ' হল কুরআন ও সুন্নাতে বর্ণিত বিভিন্ন অপরাধের সুনির্ধারিত শাস্তিসমূহ।[৭] আল্লামা ইয্‌যুদ্দীন বালীক বলেন, হদ্দ বলা হয় আল্লাহ তায়ালার হকরূপে সুনির্দিষ্ট ও নির্ধারিত শাস্তিকে।[৮]

হানাফী ইমামগণের মতে, হদ্দ হল মহান আল্লাহর সাথে সংশ্লিষ্ট অধিকারসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আরোপিত শরী'য়াতের সুনির্ধারিত শাস্তি।[৯] শাফি'ঈদের মতে, হদ্দ হল যে সব অপরাধের জন্য আল্লাহর কিংবা কোন মানুষের অধিকার অথবা একসাথে আল্লাহ ও মানুষের অধিকার বিঘ্নিত হয়, সে সব অপরাধের সুনির্ধারিত শাস্তি।[১০]

হদ্দ-এর অন্তর্ভুক্ত শাস্তিসমূহের ক্ষেত্রে মাহান আল্লাহর অধিকার এবং ক্ষেত্র বিশেষ বান্দর অধিকারের সাথেও সম্পৃক্ত। তবে মাহান আল্লাহর অধিকার বাস্তবায়নের দিকটি প্রবল। মহানবী (সা.) হদ্দকে মহান আল্লাহর হক হিসেবে ঘোষণা করেছেন। হদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে,

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত যে, মাখযুমী গোত্রের যে মহিলাটি চুরি করেছিল তার বিষয়টি কুরায়শদের খুবই উদ্বিগ্ন করে তোলে। তারা নিজেদের মধ্যে বলল, এই বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে কথা বলবার মত কে আছে? কেউ কেউ বলল, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর একান্ত প্রিয় পাত্র উসামা ইবনু যায়দ ব্যতীত আর কেউ সাহস পাবে

---

[১] ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আরবী-বাংলা ব্যবহারিক অভিধান*, রিয়াদ প্রকাশনী, ঢাকা : ২০১৩, পৃ. ২৭৯

[২] সাইয়্যেদ সাবেক, *ফিকহুস সুন্নাহ*, আবদুস শহীদ নাসিম সম্পাদিত, শতাব্দী প্রকাশনী, ঢাকা : ২০১৫, খ. ২, পৃ. ২৮৮

[৩] ড. ইব্রাহীম, *আল-মু'জামুল ওয়াসীত*, দেওবন্দ, ইউ. পি : কুতুবখানা হুসাইনিয়্যাহ, তাবি, পৃ. ১৬০

[৪] ড. আবদুল আযীয আমের, *ইসলামী দণ্ডবিধি*, শহীদুল ইসলাম অনূদিত, ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার, ২০১২, খ. ১, পৃ. ১৮

[৫] আল কুরআন, ২ : ২২৯

[৬] আল কুরআন, ২ : ১৮৭

[৭] মোঃ মাহবুবুল আলম, *ইসলামে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির বিধান : অপরাধ ও দুর্নীতি দমনের অনন্য উপায়*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ. ডি ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত (অপ্রকাশিত) অভিসন্দর্ভ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি, ২০১৫, পৃ. পৃ. ১১

[৮] আল্লামা ইয্‌যুদ্দীন বালীক র., *মিনহাজুস সালেহীন*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা : ২০১৫, খ. ২, পৃ. ১২৪

[৯] আবু বকর মুহাম্মদ সারাখসী, *আল-মাবসূত*, দারুল মাআরিফাহ, তাবি, খ. ৯, পৃ. ৩৬

[১০] আল-জুমাল, *ফুতুহাতুল ওয়াহহাব*, দারুল ফিকর, তাবি, খ. ৫, পৃ. ১৩৬

না। তারপর উসামা এই বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সঙ্গে কথা বললেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, তুমি আমার কাছে আল্লাহ নির্ধরিত হদ্দসমূহের অন্যতম হদ্দ সম্পর্কে সুপারিশ করছ? এরপর তিনি দাঁড়ালেন এবং খুতবা দিয়ে বললেন, তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা এই জন্যই ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল যে, তাদের মধ্যে প্রতিপত্তিশালী ভদ্র ঘরের কেউ যদি চুরি করত তবে তারা তাকে ছেড়ে দিত আর দুর্বল কোন ব্যক্তি চুরি করলে তার উপর হদ্দ প্রয়োগ করত। আল্লাহর কসম, মুহাম্মদের মেয়ে ফাতিমাও যদি চুরি করত তবুও আমি অবশ্যই তার হাত কাটতাম।[১]

মাহান আল্লাহর অধিকারের দিকটি প্রধান্য পাওয়ার কারণে কিসাসকে হদ্দ হিসেবে গণ্য করা হয় না। কেননা কিসাসের ক্ষেত্রে আল্লাহর অধিকারের চাইতে বান্দাহর অধিকার বাস্তবায়নের দিকটি প্রবলভাবে বিদ্যমান থাকে। অনুরূপভাবে ইসলামী আইনবিদগণ তাযীরকেও হদ্দ হিসেবে গ্রহণ করেননি। কারণ তাযীর সুনির্ধারিত নয়। কারো কারো মতে, কিসাস হদ্দের অন্তর্ভূক্ত তাদের মতে, বিভিন্ন অপরাধের জন্য শরীয়াতের সুনির্ধারিত শস্তিসমূহই হল হুদুদ। চাই তা আল্লাহর হক প্রতিষ্ঠার জন্য ফরয করা হোক কিংবা বান্দাহর হক প্রতিষ্ঠার জন্য করা হোক।[২]

শরীয়াতের হদ্দগুলো হল- চুরি, ডাকাতি, ব্যভিচার, ব্যভিচারের অপবাদ ও মদ্যপানের শাস্তি। তবে কোন কোন ফকীহ ধর্মান্তর ও রাষ্ট্রদ্রোহিতার শাস্তিকে হদ্দ বলে উল্লেখ করেছেন।[৩]

ইসলামী শাস্তি আইনের ধরনসমূহ লক্ষ্য করলে আমরা দেখতে পাই যে হদ্দ-এর বিধান তুলনামূলক কঠোর ও কঠিন। বিচারকের দরবারে হদ্দ সংক্রান্ত বিষয়ে উত্থাপিত হলে সেখান থেকে আর পিছনে ফেরার সুযোগ নেই। কোন অবস্থাতেই হদ্দ-এর শাস্তি পরির্বতন বা লঘু করার সুযোগ নেই। কিন্তু সামগ্রিক ব্যাপারে সমতা বিধানের উদ্দেশ্যে অপরাধ এবং অপরাধ প্রমাণের শর্তাবলীও অত্যন্ত কঠোর করা হয়েছে। নির্ধারিত শর্তাবলীর মধ্য থেকে যদি কোন একটি শর্তও অনুপস্থিত থাকে, তবে হদ্দ কার্যকর করা যাবে না। তদুপরি অপরাধ প্রমাণে কিংবা অপরাধের শর্তাবলীর মধ্য কোন একটিতে সন্দেহ দেখা দিলেও হদ্দ অকার্যকর হয়ে যাবে।[৪] ইসলামের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে শান্তিপূর্ণ ও সুশৃঙ্খল সমাজ বিনির্মাণ করা। এ ক্ষেত্রে অপরাধ প্রবণতা বড় বাধা। যেকারণেই ইসলামে শাস্তির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

বিশেষ পরিস্থিতির কারণে অনেক সময় কিছু অপরাধী হদ্দ-এর দণ্ড থেকে মুক্তি পেয়ে যেতে পারেন। কোন সন্দেহ অথবা কোন শর্তের অনুপস্থিতির কারণে হদ্দ অপ্রযোজ্য হয়ে পড়ার অর্থ এ নয় যে, অপরাধী অবাধ ছাড়পত্র বা বেকসুর খালাস পেয়ে যাবে, যার ফলে তার অপরাধ প্রবণতা আরো বেড়ে যাবে; বরং বিচারক অবস্থার সাথে সঙ্গতি রেখে তাকে সাধারণ দণ্ড দেবেন। যেমন চুরি প্রমাণের জন্য নির্ধারিত শর্তসমূহে কোন ত্রুটি অথবা সন্দেহ দেখা দেয়ার কারণে চোরের হাত কেটে দেয়া যাবে না বটে; কিন্তু এমতাবস্থায় সে সম্পূর্ণ মুক্তও হয়ে যাবে না।[৫] এ ধরনের পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে বিচারক তাকে অবস্থানুযায়ী সাধারণ অন্য কোন দণ্ডে দণ্ডিত করবেন।

---

[১] আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা আত-তিরমিযী রহ., *তিরমিযী শরীফ*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা : হাদীস নং ১৪৩৬
[২] আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ৩৬
[৩] ড. আহমদ আলী, *ইসলামের শাস্তি আইন*, ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০০৯, পৃ. ২৭
[৪] মোঃ মাহবুবুল আলম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২
[৫] *প্রাগুক্ত*

তাযীর

আরবী تعزير শব্দটি عزر থেকে উদ্ভূত। 'তাযীর' শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো বাধা দেওয়া, নিষেধ করা, বারণ করা ও ফিরিয়ে রাখা।[১] তাযীর শব্দটি সম্মান ও সাহায্য করা অর্থেও ব্যবহার করা হয়ে থাকে। তাযীর মানুষকে শত্রুর অনিষ্টতা থেকে বাঁচতে সাহায্য করে। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেন,

لِّتُؤۡمِنُوۡا بِاللّٰهِ وَ رَسُوۡلِهٖ وَ تُعَزِّرُوۡهُ وَ تُوَقِّرُوۡهُ ؕ وَ تُسَبِّحُوۡهُ بُكۡرَةً وَّ اَصِیۡلًا

যেন (ওহে মানুষেরা) তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আন, রসূলকে শক্তি যোগাও আর তাকে সম্মান কর, আর সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর মহিমা ঘোষণা কর।[২]

ইসলামী শরীয়াতের পরিভাষায় তাযীর হল, "আল্লাহ বা মানুষের অধিকার সংশ্লিষ্ট যে সব অপরাধের জন্য শরীয়াত নির্দিষ্ট কোন শাস্তি কিংবা কাফ্ফারা নির্ধারণ করে দেয়নি সে সব অপরাধের শাস্তিকে তাযীর বলে।[৩]

ড. আবদুল আযীয আমের-এর মতে, শরীয়াতের পক্ষ থেকে যেসব অপরাধের শাস্তি নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়নি সেগুলোকে তাযীর নামে অভিহিত করা হয়।[৪]

সাইয়্যেদ সাবেক- এর মতে, কারো দ্বারা সংঘটিত অপরাধের কারণে তাকে সংশোধন ও সতর্ক করার উদ্দেশ্যে তাকে শাস্তি দেওয়া ও অপমান করাকে তাযীর বলে।[৫]

ইসলামী আইনবিদগণের মতে, তাযীরের শাস্তি বিধান স্থান, কাল ও পাত্র ভেদে জনস্বার্থকে গুরুত্ব দিয়ে বিচারক এ ধরনের অপরাধের শাস্তি নির্ধারণ করবেন। সুতরাং অপরাধ, অপরাধী, সময় ও পরিবেশের প্রতি লক্ষ্য রেখে বিচারক যতটুকু ও যেরূপ শাস্তি দান করা যৌক্তিক মনে করবেন, ততটুকুই দেবেন। ইসলামী সরকার যদি আলিম ও মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের পরামর্শক্রমে শরীয়াতের রীতি-নীতি বিবেচনা করে এ সব অপরাধের শাস্তির কোন পরিমাণ নির্ধারণ করে বিচারকদেরকে তা মেনে চলতে বাধ্য করে, তবে তাও জায়িয। যেমন আজকাল এসেম্বলীর মাধ্যমে দণ্ডবিধি নির্ধারণ করা হয় এবং বিচারক ও জনগণ নির্ধারিত দণ্ডবিধির অধীনে মামলা-মোকদ্দমায় রায় দেন।[৬]

হুদুদ ও কিসাস জাতীয় কয়েকটি অপরাধ ছাড়া অবশিষ্ট সব অপরাধই তাযীরী অপরাধ। যেমন- বেগানা মহিলাকে চুমু দেয়া, যিনা ব্যতিরেকে কাউকে অন্য কোন অপরাধের অপবাদ দেয়া, বিনা হেফাযতের মাল চুরি করা, খাদ্যে ভেজাল দেয়া, মাপে কম দেয়া, প্রতারণা করা, মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া ও ঘুষ খাওয়া প্রভৃতি। এ সব অপরাধের শাস্তির মধ্যে কোনটাতে আল্লাহর অধিকার বাস্তবায়নের লক্ষ্য প্রবল থাকে, আবার কোনটাতে বান্দাহর অধিকার বাস্তবায়নের লক্ষ্য প্রবল থাকে।[৭]

---

[১] ড. আবদুল আযীয আমের, *ইসলামী দণ্ডবিধি*, শহীদুল ইসলাম অনূদিত, বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার, ঢাকা : ২০১২, পৃ. ৬৯

[২] আল কুরআন, ৪৮ : ৯

[৩] ড. আহমদ আলী, *ইসলামরে শাস্তি আইন*, ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০০৯, পৃ. ২৯

[৪] ড. আবদুল আযীয আমের, *প্রাগুক্ত*

[৫] সাইয়্যেদ সাবেক, *ফিকহুস সুন্নাহ*, আবদুস শহীদ নাসিম সম্পাদিত, শতাব্দী প্রকাশনী, ঢাকা : ২০১৫, খ. ২, পৃ. ৪৭০

[৬] ড. আহমদ আলী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯

[৭] *প্রাগুক্ত*

তযীরের শরয়ী ভিত্তি

তাযীর ইসলাম অনুমোদিত একটি বিষয়। মহানবী (সা.) তাযীরের অনুমোদন দিয়েছেন। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ رضى الله عنه قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " لاَ يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرِ جَلَدَاتٍ إِلاَّ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ ".

আবূ বুরদা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সা.) বলতেন, আল্লাহর নির্ধারিত হদ্দ সমুহের কোন হদ্দ ব্যতীত অন্য ক্ষেত্রে দশ কশাঘাতের ঊর্ধ্বে দণ্ড প্রয়োগ করা যাবে না।[১]

দশ বছর হওয়ার পরেও কেউ সালাত আদায় না করলে তাকে শাস্তি দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আবূ দাউদ শরীফে বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " مُرُوا الصَّبِيَّ بِالصَّلاَةِ إِذَا بَلَغَ سَبْعَ سِنِينَ وَإِذَا بَلَغَ عَشْرَ سِنِينَ فَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا " .

আবদুল মালিক থেকে পর্যায়ক্রমে তাঁর পিতা এবং তাঁর দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমাদের সন্তানদের বয়স যখন সাত বছর হয়, তখন তাদেরকে নামায পড়ার নির্দেশ দাও এবং যখন তাদের বয়স দশ বছর হবে তখন নামায না পড়লে এজন্য তাদের শাস্তি দাও।[২]

ইমাম আবূ হানীফা (রহ.), ইমাম মালেক (রহ.), ইমাম আহমদ (রহ.)-এর মতে কেউ তাযীর যোগ্য অপরাধ করলে তাতে তাযীর ওয়াজিব হবে। ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর মতে ওয়াজিব নয়।[৩]

কিসাস

আরবী (قصاص) শব্দটি ক্বাস (قص) শব্দ থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে। যার অর্থ কর্তন করা, বিচ্ছিন্ন করা বা সমতা।[৪] পদাঙ্ক অনুসরণ করা, পিছনে পিছনে যাওয়া ইত্যাদি অর্থেও (قص) শব্দ ব্যবহৃত হয়।[৫] (قصاص) শব্দটির বাংলা প্রতিশব্দ শাস্তি, প্রতিশোধ।[৬] ইসলামী শরীয়াতের পরিভাষায় ব্যক্তির ক্ষত, অঙ্গহানী কিংবা মৃত্যুর কারণে অপরাধীকেও শাস্তি স্বরূপ অনুরূপ ক্ষত সৃষ্টি করা, অঙ্গহানি কিংবা হত্যা করা। অথবা, অপরাধী যে পদ্ধতিতে অপরাধ সংঘটিত করেছে, তদ্রুপ পদ্ধতিতে তাকে শাস্তি বিধান করার নাম কিসাস।[৭]

---

[১] আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল বুখারী আল জুফী (রহ.), *বুখারী শরীফ*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, হাদীস নং ৬৩৮৪
[২] আবু দাউদ সুলায়মান ইবনুল আশ'আছ আস সিজিস্তানি (রহ.), *আবূ দাউদ শরীফ*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, হাদীস নং ৪৯৪
[৩] সাইয়্যেদ সাবেক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৭১
[৪] ড. ইব্রাহীম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৪০
[৫] ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আরবী-বাংলা ব্যবহারিক অভিধান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮৫
[৬] *প্রাগুক্ত*
[৭] আব্দুল কাদের আওদাহ, *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ৬৬৩

কিসাসের ভিত্তি

আল্লাহ তায়ালা বলেন, হে মুমিনগণ! নিহতদের ব্যাপারে তোমাদের জন্য কিসাসের বিধান দেয়া হয়েছে। স্বাধীন ব্যক্তির বদলে স্বাধীন ব্যক্তি, ক্রীতদাসের বদলে ক্রীতদাস ও নারীর বদলে নারী। কিন্তু তার ভাইয়ের পক্ষ হতে কিছুটা ক্ষমা প্রদর্শন করা হলে যথাযথ বিধির অনুসরণ করা ও সততার সাথে তার দেয় আদায় বিধেয়। ইহা তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে ভার লাঘব ও অনুগ্রহ। এরপরও যে সীমালংঘন করে, তার জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি রয়েছে। হে বোধসম্পন্ন ব্যক্তিগণ! কিসাসের মধ্যে তোমাদের জন্য জীবন রয়েছে, যাতে তোমরা সাবধান হতে পার।[১]

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন, "আমি তাদের জন্য তাতে বিধান দিয়েছিলাম যে, প্রাণের বদলে প্রাণ, চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান, দাঁতের বদলে দাঁত এবং যখমের বদলে অনুরূপ যখম। অতঃপর কেউ তা ক্ষমা করলে তাতে তারই পাপ মোচন হবে। আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তদানুসারে যারা বিধান দেয় না, তারাই যালিম।"[২]

এ আয়াতটিতে বনী ইসরাঈলের অপরাধের কথা বিধৃত হলেও যেহেতু এ আয়াতটি মানসূখ হবার ব্যাপারে প্রমাণিত কোন দলীল নেই, সেহেতু আয়াতের বিধান মুসলমানদের জন্যও সমভাবে কার্যকর।[৩]

কুরআন কারীমের অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন,

وَ لَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللهُ اِلَّا بِالْحَقِّ ؕ وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوْمًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهٖ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفْ فِّي الْقَتْلِ ؕ اِنَّهٗ كَانَ مَنْصُوْرًا

আল্লাহ যার হত্যা নিষেধ করেছেন যথার্থ কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করনা; কেউ অন্যায়ভাবে নিহত হলে তার উত্তরাধিকারীকে আমি প্রতিশোধ গ্রহণের অধিকার দিয়েছি। কিন্তু হত্যার ব্যাপারে সে যেন বাড়াবাড়ি না করে; সে তো সাহায্যপ্রাপ্ত হয়েছেই।[৪]

ইসলামে জীবনের অধিকার

ইসলাম মানুষকে বেঁচে থাকার পূর্ণ অধিকার দিয়েছে। কোনো মানুষকে আঘাত করা কিংবা হত্যা করা নিষিদ্ধ করেছে। মানুষের জীবনের জন্য হুমকি এরকম সকল কাজ নিষিদ্ধ করেছে। মহান আল্লাহ বলেন,

وَ مَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهٗ جَهَنَّمُ خٰلِدًا فِيْهَا وَ غَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَ لَعَنَهٗ وَ اَعَدَّ لَهٗ عَذَابًا عَظِيْمًا

যে ব্যক্তি কোন মু'মিনকে ইচ্ছাপূর্বক হত্যা করে, তার শাস্তি জাহান্নাম। যাতে স্থায়ীভাবে থাকবে, তার উপর আল্লাহর ক্রোধ ও অভিসম্পাত। আল্লাহ তার জন্য মহাশাস্তি নির্দিষ্ট করে রেখেছেন।[৫]

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে,

---

[১] আল কুরআন, ২: ১৭৮-১৭৯
[২] কুরআন-আল, ৫ : ৪৫
[৩] আলা উদ্দীন আল-কাসানী, *আল-বদা'ইয়ুস সনা'ই*, বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, তাবি, খ. ৭, পৃ. ২৩৩
[৪] আল কুরআন, ১৭ : ৩৩
[৫] আল কুরআন, ৪ : ৩৩

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الدِّمَاءِ "

আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, কিয়ামতের দিন মানুষের (অপরাধের) মধ্যে সর্বপ্রথম নরহত্যার (অপরাধের) বিচার করা হবে।[১]

উপরে উল্লিখিত আয়াত এবং হাদীসে অত্যন্ত কঠোর ভাষায় মানব হত্যাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। যদি কোনো ব্যক্তি এ জঘন্য অপরাধে লিপ্ত হয় তবে তাকে জাহান্নামে ভয়াবহ শাস্তি ভোগ করতে হবে বলেও সতর্ক করা হয়াছে।

দিয়াত

দিয়াত হচ্ছে হত্যাকারীর উপর ধার্যকৃত ক্ষতিপূরণ, রক্তমূল্য।[২] ইসলামী শরীয়াতের পরিভাষায় দিয়াত বলা হয়, "মানুষের জীবন বা জীবনের আওতায় পড়ে এমন কিছুর বিরুদ্ধে কৃত অপরাধের জন্য আর্থিক দণ্ড।"[৩] সাইয়্যেদ সাবেক বলেন, অপরাধের কারণে অপরাধ দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে বা তার উত্তরাধিকারীকে যে সম্পদ দেওয়া বাধ্যতামূলক, তাকে দিয়াত বলে।[৪] *ফাতোয়ায়ে আলমগীরতে* বলা হয়েছে, মানুষের হত্যার ক্ষেত্রে আদালতের মাধ্যমে শরীয়াত মোতাবেক পক্ষবৃন্দের আপোস-রফার ভিত্তিতে যে অর্থ প্রদান করা হয় তাকে দিয়াত বলে।[৫]

দিয়াতের ভিত্তি

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা দিয়াত সম্পর্কে বলেন, "কোন মুমিনকে হত্যা করা কোন মুমিনের কাজ নয়, তবে ভুলবশত করলে তা স্বতন্ত্র এবং কেউ কোন মুমিনকে ভুলবশত হত্যা করলে এক মুমিন দাস মুক্ত করা এবং তার পরিবারবর্গের রক্তপণ অর্পণ করা বিধেয় যদি না তারা ক্ষমা করে।"[৬]

উপরে উল্লিখিত আয়াতটি শুধুমাত্র ভুলক্রমে হত্যার ব্যাপারে অবতীর্ণ হলেও তা সব ধরনের হত্যার বিচারের ক্ষেত্রে শর্তসাপেক্ষে প্রযোজ্য হতে পারে মর্মে ইসলামী আইন বিশেষজ্ঞদের ইজমা সংঘটিত হয়েছে।[৭]

ইসলামী আইনে কিছু কিছু হত্যার শাস্তি হিসেবে দিয়াতকে বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, কোন ব্যক্তি যদি কোন মু'মিন ব্যক্তিকে বিনা কারণে হত্যা করে আর তা প্রমাণিত হয়, তবে তার শাস্তি হলো মৃত্যুদণ্ড। তবে নিহত ব্যক্তির স্বজনরা যদি ক্ষমা করে, তবে দিয়াত। আর প্রাণের বিনিময়ে দিয়াতের পরিমাণ হল একশত উট...।[৮]

---

[১] আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনু ইয়াজিদ ইবনু আবদুল্লাহ ইবনু মাজাহ (রহ.), *ইবনে মাজাহ শরীফ*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, হাদীস নং ২৬১৫

[২] ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আরবী-বাংলা ব্যবহারিক অভিধান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪২

[৩] আলাউদ্দিন আল-হাসকাফী, *আদ-দুররুল মুখতার*, তাবি, খ. ৫, পৃ. ৪০৬

[৪] সাইয়্যেদ সাবেক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৪০

[৫] মাওলানা মুহাম্মদ মূসা ও মাওলানা মোঃ মোজাম্মেল হক, *বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা : ২০১৮, পৃ. ২৬৫

[৬] আল কুরআন, ৪ : ৯২

[৭] ওয়াহবাহ যুহাইলী, *আল-ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু*, দামেশ্ক: দারুল ফিকর, সংস্ক. ২, ২০০৯, খ. ৬, পৃ. ২৯৯

[৮] ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, মিশরঃ মুআসসাতু কুরতুবা, তা. বি, খ. ৩, পৃ. ৪১০

হাদীসের আলোকে দিয়াতের পরিমাণ

তিরমিযী শরীফে বর্ণিত হয়েছে, দিয়াতের পরিমাণ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন,

مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ وَهِيَ ثَلاَثُونَ حِقَّةً وَثَلاَثُونَ جَذَعَةً وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً وَمَا صَالَحُوا عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُمْ . وَذَلِكَ لِتَشْدِيدِ الْعَقْلِ.

যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় কাউকে হত্যা করবে তাকে নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদের হাওয়ালা করা হবে। তারা ইচ্ছা করলে তাকে হত্যা করতে পারবে আর ইচ্ছা করলে দিয়াত গ্রহণ করতে পারবে। দিয়াত হল, ত্রিশটি পূর্ণ তিন বছর বয়সের উট (হিককা), ত্রিশটি পূর্ণ চার বছর বয়সের উট (জাযআ) এবং গর্ভবতী উষ্ট্রী (খালিফা)। আর যার উপর তারা পরস্পর সমঝোতা করে নেয় তাতে তাদের অধিকার রয়েছে। দিয়াতের কঠোরতার উদ্দেশ্যে উল্লিখিত অবস্থা নির্ধারণ করা হয়েছে।[১]

ইসলামী আইনজ্ঞগণ এ ব্যাপারে মোটাদাগে একমত যে, দিয়াতের হদ্দ নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদ। সাধারণভাবে বলা হয়, এর পরিমাণ হল একশত উট। একশত উট হল পূর্ণ দিয়াত। আলোচনার ক্ষেত্রে কোথাও যদি শুধু দিয়াত শব্দ উল্লেখ করা হয়, তবে পূর্ণ দিয়াত বা (১০০) একশত উট বুঝায়।

ভুলবশত কাউকে হত্যা করা হলে এর দিয়াত সম্পর্কে হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, ‘আমর ইবনে শু‘আইব (রহঃ) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি ভুলবশত নিহত হলো তার দিয়াত ৩০টি বিনতে মাখায (এক বছরের উষ্ট্রী), ৩০টি বিনতে লাবূন (দু বছরের উষ্ট্রী), ৩০টি হিক্কা (চার বছরের উষ্ট্রী) এবং দশটি ইবনে লাবূন (দু বছরের উট)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গ্রামবাসীদের বেলায় এগুলোর মূল্য নির্ধারণ করেন চারশত দীনার অথবা তার সমতুল্য রৌপ্য মুদ্রা। তিনি দিয়াতের নগদ মূল্য নির্ধারণ করতেন উটের বাজার দর অনুসারে।

উটের বাজার দর বৃদ্ধি পেলে দিয়াতের পরিমাণও বেড়ে যেতো এবং উটের বাজার দর হ্রাস পেলে দিয়াতের পরিমানও হ্রাস পেতো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগে এর মূল্য চারশত দীনার থেকে আটশত দীনার পর্যন্ত অথবা এর সমমূল্যের (রৌপ্য) মুদ্রায় আট হাজার দিরহাম পর্যন্ত পৌঁছেছিল। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ সিদ্ধান্তও দিয়েছিলেন যে, গরুর মালিক গরুর দ্বারা তাদের দিয়াত পরিশোধ করতে চাইলে দুইশত গরু এবং বকরীর মালিক বকরী দ্বারা দিয়াত পরিশোধ করতে চাইলে দু’ হাজার বকরী দিতে হবে।[২]

---

[১] ইমাম তিরমিযী, *তিরমিযী শরীফ*, হাদীস নং ১৩৯১

[২] আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনু ইয়াজিদ ইবনু আবদুল্লাহ ইবনু মাজাহ (রহ.), *প্রাগুক্ত*, হাদীস নং ২৬৩০

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : ইসলামের হুদুদ আইন পরিচিতি

ইসলামের হুদুদ আইনসমূহ

প্রায় সকল ইমামের মতে যেসব অপরাধ করা হলে অপরাধীর উপর হদ্দ-এর বিধান কার্যকর হয় তার সংখ্যা সাতটি। নিম্ন সেগুলো সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো।

১. মদ্যপান

২. ব্যভিচার

৩. কাযাফ বা ব্যভিচারের অপবাদ

৪. রাষ্ট্রদ্রোহিতা

৫. ধর্মদ্রোহিতা

৬. চুরি

৭. ডাকাতি

কতিপয় ইমামের মতে হত্যাও হদ্দ ভুক্ত অপরাধ। তবে অধিকাংশ ইমাম হত্যাকে কিসাস-এর অন্তর্ভুক্ত হিসেবে মত প্রদান করেছেন। এবং এটাই অধিক গ্রহণযোগ্য মত।

মদ্যপান

ইসলামে নিষিদ্ধ কার্যাবলির মধ্যে মাদক গ্রহণ অন্যতম। কারণ মাদক থেকেই উৎপন্ন হয় পারিবারিক ও সামাজিক নানাবিধ অপরাধের। মানুষের বিভিন্ন রকম দৈহিক ও মানসিক রোগের ও রোগ সৃষ্টির অন্যতম কারণ এই মাদক। ইসলাম আজ থেকে প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বে মাদক নিষিদ্ধ করেছে। অথচ আজ আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানও ইসলামের সেই নিষেধাজ্ঞা সমর্থন করে এর ক্ষতিকর দিকগুলো তুলে ধরছে।

মহান আল্লাহ মানুষকে বিবেক-বুদ্ধি, বিবেচনা শক্তি দিয়েছেন। মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের অন্যতম কারণ তার এই বিবেক। মানুষের প্রতি আল্লাহ তায়ালার শ্রেষ্ঠত্ব ও বিশেষত্ব রয়েছে, মাদক সেবনের ফলে তা হারিয়ে যায়। এর সাথে সে হারিয়ে ফেলে মনুষ্যত্ববোধ ও মানবিক চেতনা। ভাল-মন্দ জ্ঞান ও সম্পূর্ণরূপে লোপ পায়। হারিয়ে ফেলে কর্তব্য ও দায়িত্বজ্ঞান। এ অবস্থায় আকৃতিতে মানুষ হলেও সে পশুর চেয়ে নিকৃষ্ট জীবে পরিণত হয়। তখন সে বড় বড় অপরাধ করে বসে। আপন-পরের পার্থক্য বোধও থাকে না।[১] হযরত ‘উছমান (রা.) এ দিকে লক্ষ্য রেখেই বলেছিলেন, “তোমরা মদ পরিহার কর। কেননা তা হচ্ছে সকল প্রকারের পাপকাজের উৎস।”[২]

---

[১] ড. আহমদ আলী, ইসলামের শাস্তি আইন, ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০০৯, পৃ. ১৭০

[২] আন্ নাসাঈ, *আস-সুনান আল-কুবরা*, প্রাগুক্ত, হা.নং. ৫১৭৬, ৫১৭৭; আল বায়হাকী, *আস-সুনান আল কুবরা*, হা.নং. ১৭১১৬

মানুষকে মাদকের সব ধরনের ক্ষতি থেকে রক্ষা করতেই ইসলাম সকল প্রকার মাদক দ্রব্যের উৎপাদন, ব্যবসা ও সেবন কঠোরভাবে হারাম ঘোষণা করেছে। মহানবী (সা.)-এর ঘোষণা অনুযায়ী একজন মুমিনের পক্ষে মদ গ্রহণ করা কখনোই সম্ভব নয়। কারণ মাদক ও ঈমান সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী দুটি বিষয়। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন "কোন মদ্যপায়ী ঈমানদার অবস্থায় মদপান করতে পারে না।"[১]

মাদককে আরবীতে খমর (خمر) বলা হয়। এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে, ঢেকে ফেলা, সমাচ্ছন্ন করা, মিশে যাওয়া। মদ সেবনের ফলে মানুষের বিবেক-বুদ্ধি সমাচ্ছন্ন হয়ে যায় বলে তাকে خمر বলা হয়।[২] ইসলামী শরীয়াতের দৃষ্টিতে যে সব দ্রব্য মাদকতা সৃষ্টি করে এবং এবং মানুষের বিবেক-বুদ্ধিকে মোহাচ্ছন্ন করে ফেলে তাকেই (خمر) মাদক বলা হয়।[৩]

সাইয়্যেদ সাবেক বলেন, মদ হচ্ছে সেসব সুপরিচিত তরল পানীয়, যা এমনভাবে তৈরী করা হয় যে, কোনো কোনো ফল বা শস্যকে মাদকে পরিণত করে এবং তাতে নেশা বা মাতলামির এমন উপাদান তৈরী করে যার দরুন বুদ্ধি লোপ পায়।[৪]

আসমা'ঈ বলেন, "যা বিবেকবুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে (অর্থাৎ নেশার উদ্রেককারী পানীয়) তাই হল خمر বা মাদক"।[৫]

ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর মতে, আঙ্গুরের রস দ্বারা তৈরি মাদক পানীয়ই خمر (খামর)। আঙ্গুরের রস দ্বারা তৈরি মদ সম্পর্কে হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, ইবনে উমর (রা.) বলেন, মদ হারাম হয়েছে এমতাবস্থায় যে মদীনায় আঙ্গুরের মদের তেমন কিছু অবশিষ্ট ছিল না।[৬]

আবূ হানীফা (রহ.)-এর মতে, তিন প্রকারের পানীয় খামার বা মাদকের অন্তর্ভুক্ত।

ক. তাজা আঙ্গুরের রস অব্যবহৃত অবস্থায় ফেলে রাখার পর তা গজিয়ে ফেনা ধারণ করলে।

খ. আঙ্গুরের রস আগুনের তাপ দেওয়ার পর তার দু-তৃতীয়াংশ শুকিয়ে গেলে।

গ. কিসমিস ও শুষ্ক খেজুরের রস আগুনের তাপ দিয়ে সিদ্ধ না করা সত্ত্বেও তাতে মাদকতা সৃষ্টি হল।

কিন্তু তাজা আঙ্গুরের রস কিংবা কিসমিস ও শুষ্ক খেজুরের রস আগুনে সিদ্ধ করার ফলে তার দু-তৃতীয়াংশ বাষ্প হয়ে ওড়ে না গেলে এবং বার্লি, গম, ভুট্টা ইত্যাদির রস তা আগুনে জ্বাল দেয়া হোক না হোক, নেশা উদ্রেককারী হলেও খামার বা মাদক নয়। এগুলো পান করে মাদকতা সৃষ্টি হলেই কেবল পানকারী শাস্তিযোগ্য হবে। অন্যথায় নয়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে হদ্দের শাস্তি প্রযোজ্য হবে না; বরং তাযীরের আওতায় শাস্তি হবে।[৭]

---

[১] মুহাম্মদ ইবনু ইসমাঈল, *সহীহ আল-বুখারী*, বৈরুতঃ দারু ইবনি কাছীর, ১৯৮৭ , কিতাবুল মাযালিম, হা.নং. ২৩৪৩; মুসলিম ইবনু হাজ্জাজ আল-কুশায়রী, *সহীহ আল-মুসলিম*, কিতাবুল ঈমান, হা.নং. ৫৭

[২] ইবনু মানযুর, *লিসানুল আরব*, বৈরুত:দারু সাদির, খ. ৪, পৃ. ২৫৪-৫

[৩] মাওলানা মুহাম্মদ মূসা ও মাওলানা মোঃ মোজাম্মেল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৭১

[৪] সাইয়্যেদ সাবেক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০৪

[৫] ইবনু মানযুর, *প্রাগুক্ত*, খ. ৪, পৃ. ২৫৪-৫

[৬] আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল বুখারী আল জুফী রহ., *বুখারী শরীফ*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা : হাদীস নং ৫১৭৯

[৭] আল-কাসানী, *বদা'ইয়ুস সনা'ই*, প্রাগুক্ত,খ. ৫, পৃ. ১১২; বাবরতী, *আল-ইনায়াহ*, প্রাগুক্ত, খ. ১০, পৃ. ৯০-৪

আবূ হানীফা (রহ.) (خمر) খামর ও নেশা উদ্রেককারী বস্তুসমূহের মধ্যে পার্থক্য করেন। তাঁর মতে, খামর সেবন শাস্তিযোগ্য অপরাধ, তাতে নেশার উদ্রেক হোক বা না হোক, কম হোক বা বেশি। কিন্তু নেশা উদ্রেককারী অন্যান্য বস্তুসমূহের ব্যবহার শাস্তিযোগ্য নয়, যে যাবত তা নেশা উদ্রেক না করে।[১] হদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর জন্য রাতের প্রথমভাগে নবীয (খেজুর ভেজানো পানি) তৈরি করা হতো। তিনি তা পান করতেন, সেদিন (রাত বিগত) সকালে, আগামী রাতে, পরবর্তী দিনে এরপরের রাতে এবং পরদিন আসর পর্যন্ত। এরপরও যদি কিছু অবশিষ্ট থেকে যেত তা তিনি তাঁর খাদিমকে পান করাতেন অথবা ফেলে দিতে আদেশ দিতেন।[২]

কিন্তু অধিকাংশ ইমামের মতে, আঙ্গুরের রস ও অন্যান্য বস্তুর মধ্যে পার্থক্য নেই; বরং যে সকল বস্তু মাদকতা সৃষ্টি করে তা যে বস্তুই হোক তা ‘খামার’ (মাদক) রূপে গণ্য হবে এবং তা যে কোন পরিমাণে অল্প হোক বা বেশি গ্রহণ করা হারাম।[৩] হদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন উমর (রা.) মিম্বরের উপর দাঁড়িয়ে বলেন (হামদ ও সালাতের পর জেনে রাখ) মদ হারাম হওয়ার আয়াত নাযিল হয়েছে। আর তা তৈরী হয় পাঁচ প্রকারের জিনিস থেকে আঙ্গুর, খেজুর মধু, গম, ও যব। আর মদ হল তাই, যা বিবেক-বুদ্ধিকে বিলোপ করে দেয়।[৪]

অপর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, আবূ বুরদা তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) আমাকে ও মু'আয (রা.) কে ইয়েমেনে পাঠালেন এবং বললেন, তোমরা মানুষকে (দ্বীনের) দাওয়াত দেবে, সুসংবাদ দেবে, কাউকে বিতৃষ্ণ করে দেবে না। সহজ করবে, কঠিন করবে না। তিনি বলেন, অতঃপর আমি বললাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ! ইয়েমেনে আমরা দুধরনের শরাব প্রস্তুত করি, আপনি সে সমন্ধে আমাদেরকে অবহিত করুন। এক, “আল-বিত” যা মধু পাকিয়ে গাঢ় করে তৈরি করা হয়; দুই, “আল-মিরয” যা ভুট্টা ও যব পাকিয়ে গাঢ় করে প্রস্তুত করা হয়। বর্ণনাকারী বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) কে অল্প শব্দ অথচ ব্যাপক অর্থবোধক ও পরিপূর্ণতার সাথে প্রকাশ করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। তিনি বলেন, আমি প্রত্যেক নেশা সৃষ্টিকারী বস্তু যা সালাত থেকে বিমুখ করে, তাই হারাম করছি।[৫]

মদের কয়েকটি প্রসিদ্ধ শ্রেণি

রাসুলুল্লাহ (সা.) আমাকে ও মু'আয (রা.) কে ইয়েমেনে পাঠালেন এবং বললেন, তোমরা মানুষকে (দ্বীনের) দাওয়াত দেবে, সুসংবাদ দেবে, কাউকে বিতৃষ্ণ করে দেবে না। সহজ করবে, কঠিন করবে না। তিনি বলেন, অতঃপর আমি বললাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ! ইয়েমেনে আমরা দুধরনের শরাব প্রস্তুত করি, আপনি সে সমন্ধে আমাদেরকে অবহিত করুন। এক, “আল-বিত” যা মধু পাকিয়ে গাঢ় করে তৈরি করা হয়; দুই, “আল-মিরয” যা ভুট্টা ও যব পাকিয়ে গাঢ় করে প্রস্তুত করা হয়। বর্ণনাকারী বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) কে অল্প শব্দ অথচ ব্যাপক অর্থবোধক ও পরিপূর্ণতার সাথে

[১] আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, খ.২৪, পৃ.২-৪; আল-কাসানী, *বদা'ইয়ুস সনা'ই* খ.৫, পৃ.১১২

[২] আবুল হুসায়ন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল কুশায়রী আন নিশাপুরি রহ., *মুসলিম শরীফ*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা : হাদীস নং ৫০৫৬

[৩] ইমাম মুহাম্মদ ইবনু ইদ্রিস শাফি'ঈ, *আল-উম্ম*, বৈরুত: দারুল মাআরিফাহ, খ. ৬, পৃ. ১৫৬, ১৯৩-৫; ইমাম মালিক, *আল-মুদাওয়ানাহ*, বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, খ. ৪, পৃ. ৫২৪

[৪] আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল বুখারী আল জুফী রহ., *বুখারী শরীফ*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা : হাদীস নং ৫১৮১

[৫] আবুল হুসায়ন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল কুশায়রী আন নিশাপুরি রহ., *প্রাগুক্ত*, হাদীস নং ৫০৪৬

প্রকাশ করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। তিনি বলেন, আমি প্রত্যেক নেশা সৃষ্টিকারী বস্তু যা সালাত থেকে বিমুখ করে, তাই হারাম করছি।[১]

বাজারে মাদক বিভিন্ন নামে বিক্রি হবে এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা.) ভবিষ্যৎ বাণী করেছিলেন। ইবনে মাজাহ শরীফে বর্ণিত হয়েছে, উবাদা ইবনুস সামিত (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, আমার উম্মাতের কতক লোক শরাবের ভিন্নতর নাম রেখে তা পান করবে।[২]

রস ও সংরক্ষিত নির্যাস পান

ঝাজ ও ফেনাযুক্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ফলের রস বা নির্যাস পান করা জায়েয। আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি জানতাম যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) অধিকাংশ সময় রোযা রাখতেন। সুতরাং তিনি যেদিন রোযা রাখেননি, আমি সেদিনের প্রতি খেয়াল রাখি এবং কদুর খোলে তৈরি পাত্রে নবীয নিয়ে তাঁর নিকট উপস্থিত হই, যা আমি আগে থেকেই তাঁর জন্য প্রস্তুত করে রাখি। হঠাৎ তা জোশ মেরে উঠে। তখন তিনি বলেন, তুমি একে দেওয়ালের দিকে নিক্ষেপ কর। কেননা, এতো ঐ সব লোকের শরাব, যারা আল্লাহ্ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে না।[৩]

মাদক দ্রব্যসমূহ

এ পর্যন্ত যা কিছু উল্লেখ করা হলো, তা ছিলো খামর বা মদ নামক পানীয় সম্পর্কে আল্লাহর বিধান। কিন্তু যে সকল বস্তু পানীয় নয়, অথচ মদের মতোই বুদ্ধির বিলুপ্তি ঘটায়, যেমন ভাং, গাঁজা, আফিম ইত্যাদি, সে সকল বস্তুও সম্পূর্ণরূপে হারাম। কেননা তা নেশাকর ও মাতালকারী।[৪] রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "সকল মাদকদ্রব্য মদ এবং সকল মদ হারাম।"[৫]

মাদকের ব্যবসা ইসলামে নিষিদ্ধ

ইসলামের একটি সাধারণ নীতিমালা হচ্ছে ইসলাম যে বিষয়কে বৈধতা দান করে তার সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়কেই ইসলামে বৈধতা দেওয়া হয়। আবার যে বিষয়কে ইসলামে অবৈধ করা হয়েছে তার সংশ্লিষ্ট সব কিছুই ইসলামে অবৈধ। যে কারণে ইসলামে শুধু মদ পানই হারাম নয়। বরং মদ্য উৎপাদন, পরিবহন, ক্রয়বিক্রয়, পরিবেশন ও উপঢৌকন এক কথায় মাদক সংশ্লিষ্ট সবকিছুকেই ইসলামে সম্পূর্ণ হারাম। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন "যে মহান সত্তা মদ্যপান নিষিদ্ধ করেছেন, তিনিই তার ব্যবসা এবং তা থেকে প্রাপ্ত মূল্য ভক্ষণ নিষিদ্ধ করেছেন।"[৬] তিনি আরো বলেছেন, "আল্লাহ তায়ালা অভিশাপ বর্ষণ করেছেন মদের ওপর, মদ্যপায়ীর ওপর, মদ্য পরিবেশনকারীর ওপর, তার ক্রয়-বিক্রয়কারীর ওপর, তার উৎপাদনকারী ও যে উৎপাদন করায় তাদের ওপর, তার বহনকারী ও যার নিকট বহন করে নিয়ে যাওয়া

---

[১] সাইয়্যেদ সাবেক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০৮-৩০৯

[২] আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনু ইয়াজিদ ইবনু আবদুল্লাহ ইবনু মাজাহ রহ., *ইবনে মাজাহ শরীফ*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা : হাদীস নং ৩৩৮৫

[৩] আবু দাউদ সুলায়মান ইবনুল আশ'আছ আস সিজিস্তানি রহ., *আবূ দাউদ শরীফ*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা : হাদীস নং ৩৬৭৪

[৪] সাইয়্যেদ সাবেক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১০

[৫] আবুল হুসায়ন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল কুশায়রী আন নিশাপুরি রহ., *প্রাগুক্ত*, হাদীস নং ৫০৪৪

[৬] মুসলিম ইবনু হাজ্জাজ, *সহীহ আল-মুসলিম*, কিতাবুল মুসাকাত, হা.নং. ১৫৭৯; মুহাম্মদ ইবনু হিব্বান, *আস-সহীহ*, হা.নং. ৪৯৪২

হয় তার ওপর।"[১] অপর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন সুদ সম্পর্কিত সূরা বাকারার শেষ আয়াতগুলো নাযিল হয়, তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) বাইরে বের হয়ে আসেন এবং শরাবের ব্যবসাও নিষিদ্ধ (হারাম) ঘোষণা করেন। [২]

সব ধরনের মাদক গ্রহণই শাস্তিযোগ্য অপরাধ

যে সকল বস্তু মানুষের মাঝে নেশার সৃষ্টি করে তা সেবন করা ইসলামী আইন অনুসারে অবৈধ। মাদকের ব্যাপারে ইমামগণের একটা বড় অংশ এ মত পোষণ করেছেন যে, যে সকল বস্তু অধিক পরিমাণ গ্রহণে নেশার উদ্রেক হয় তার সামান্য পরিমাণ গ্রহণ করাও ইসলামে হারাম। এ ধরনের বস্তু যত অল্প পরিমাণেই গ্রহণ করা হোক না কেন এমনকি তাতে নেশার উদ্রেক না হলেও তা সেবন করা হদ্দযোগ্য অপরাধ। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, "যে জিনিস অধিক পরিমাণ পান করলে নেশা সৃষ্টি করে, তার স্বল্প পরিমাণও হারাম।"[৩] অন্য হাদীসে তিনি বলেন, "প্রত্যেক নেশা উদ্রেককারী জিনিসই হারাম। আর যে জিনিস এক পাত্র পান করলে নেশা সৃষ্টি করে তার এক অঞ্জলি পরিমাণও হারাম।"[৪]

ইসলামী আইনে মাদক গ্রহণের শাস্তি

ইসলামী আইনে মাদক সেবন একটি দণ্ডনীয় অপরাধ হিসেবে বিবেচিত। মাদক সেবনের অপরাধে দণ্ড কার্যকর করা ইসলামী রাষ্ট্রের সরকারের একান্তই কর্তব্য। পবিত্র কুরআনে বিভিন্ন অপরাধের দণ্ডের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন- চুরি, হত্যা, ব্যভিচার ইত্যাদি।

মাদক সেবনের অপরাধের কোনো শাস্তির কথা কুরআনে উল্লেখ নেই। তবে রাসূলুল্লাহ (সা.) -এর কথা ও কাজ দ্বারা সুনির্দিষ্টভাবে এর শাস্তি দানের কথা অসংখ্য হাদীসে বর্ণিত রয়েছে। যে কারণে ইমাম শাওকানী, ইবন মুনযির ও আত্ তাবারী প্রমুখ ইমামগণ মনে করেন, মদ্যপানের শাস্তি হদ্দের পর্যায়ভুক্ত নয়; বরং তাযীরী শাস্তির আওতাভুক্ত। আদালত সুবিবেচনা অনুযায়ী যে কোন শাস্তি দিতে পারবে। ইমাম যুরকানীর মতে, চল্লিশ বেত্রাঘাত সুনির্ধারিত শাস্তি অর্থাৎ হদ্দ। আর এর অতিরিক্ত আশিটি বেত্রাঘাত হল তাযীরের আওতাভুক্ত, যা বিচারকের রায়ের ওপর নির্ভরশীল।[৫]

মাদকের ব্যাপারে প্রসিদ্ধ চার মাযহাবের রায় হচ্ছে, এটির শাস্তি হদ্দের পর্যায়ভুক্ত। কারণ অসংখ্য হাদীসে সাহাবীগণ মাদকের শাস্তির সাথে হদ্দ শব্দটি ব্যবহার করেছেন। হযরত আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "একসময় রাসূলুল্লাহ (সা.) এর নিকট এক মদ্যপায়ীকে উপস্থিত করা হল, তখন তিনি লোকদেরকে তাকে মারপিট করতে

---

[১] সুলাইমান আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল আশরিবাহ, হা.নং. ৩৬৭৪; আল-বায়হাকী, *আস-সুনান আল-কুবরা*, হা.নং. ১০৫৫৯

[২] আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনু ইয়াজিদ ইবনু আবদুল্লাহ ইবনু মাজাহ রহ., *প্রাগুক্ত*, হাদীস নং ৩৩৮২

[৩] মুহাম্মদ ইবনু ঈসা, *সুনান আত-তিরমিযী*, বৈরুত: দারু ইহয়াইত তুরাছিল আরবী, তা.বি., কিতাবুল আশরিবাহ, হা.নং ১৮৬৫; আবু ইবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনু মাজাহ, *আস-সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল আশরিবাহ, হা.নং. ৩৩৯১

[৪] সুলাইমান আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল আশরিবাহ, হা.নং. ৩৬৮৭; মুহাম্মদ ইবনু ঈসা আত- তিরমিযী, *আল- জামি'* , প্রাগুক্ত, কিতাবুল আশরিবাহ, হা.নং. ১৮৬৬

[৫] ড. আহমদ আলী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭৫

নির্দেশ দিলেন। আবূ হুরাইরা (রা.) বলেন, তখন আমাদের কেউ তাকে হাত দ্বারা আবার কেউ জুতা দ্বারা আবার কেউ পাকানো কাপড় দ্বারা তাকে প্রহার করেছিল।[১]

চার মাযহাবের প্রায় সকল ইমাম এ ব্যাপারে একমত যে, মাদক সেবনকারীকে শাস্তি দেওয়া ওয়াজিব।[২] মদ্যপায়ীর শাস্তি যে বেত্রাঘাত এ সম্পর্কেও কারো দ্বিমত নেই।[৩] বেত্রাঘাতের সংখ্যা নিয়ে ইমামগণের মাঝে মতপার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। হানাফী ও মালিকীগণের মতে, মদ্যপানের শাস্তি হল আশিটি বেত্রাঘাত।[৪] তাঁদের দলীল হচ্ছে, সাহাবা কিরামের ইজমা। হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ (সা.) মাদক দ্রব্য সেবনের অপরাধে খেজুরের দুটি ডাল দিয়ে চল্লিশটি আঘাত দিতেন। আবূ বকর (রা.) ও তাই করেছেন এবং উমার (রা.) মদ্যপায়ীদের শাস্তি নির্ধারণের জন্য সাহাবীগণের নিকট থেকে পরামর্শ চাইলেন। তখন হযরত আবদুর রহমান ইবন আওফ (রা.) বললেন, "তার শাস্তি হালকাতম হদ্দ আশিটি বেত্রাঘাই নির্ধারণ করুন।" তখন হযরত উমর (রা.) এ দণ্ডই কার্যকর করতে নির্দেশ দিলেন এবং সিরিয়ায় হযরত খালিদ ও আবূ "উবায়দাহ (রা.) কে লিখে এ নির্দেশ দিলেন।[৫]

অন্য একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত আলী (রা.) এ ব্যাপারে পরামর্শ দিতে গিয়ে বলেছিলেন, "আমাদের মত হল, আমরা তাকে আশিটি বেত্রাঘাত করব। কেননা যখন সে মদ সেবন করে তখন মাতাল হয়ে যায়। আর যখন মাতাল হয়, তখন অপলাপ করে। আর যখন সে অপলাপ করে তখন সে অপবাদ দেয়। আর অপবাদদানকারীর শাস্তি হল আশিটি বেত্রাঘাত।"[৬] এ সকল হাদীস প্রমাণ করছে যে, মাদক গ্রহণ কারীর শাস্তি আশিটি বেত্রাঘাতের ওপর সাহাবীগণের ইজমা' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

অপর দিকে শাফি'ঈ ও হাম্বলীগণের মতে, মদ্যপানের নির্ধারিত শাস্তি হল চল্লিশটি বেত্রাঘাত। তাদের মতে, বিচারক অপরাধীর অপরাধের ধরন প্রবণতা ইত্যাদি বিবেচনা করা আশি বেত্রাঘাতের নির্দেশও দিতে পারেন। এক্ষেত্রে চল্লিশ বেত্রাঘাত পর্যন্ত হদ্দ হিসেবে বিবেচিত হবে এবং এর অতিরিক্ত বেত্রাঘাতসমূহ তাযীরের আওতাভুক্ত। তদুপরি কাপড়, খেজুরের ডাল ও জুতা দ্বারাও যদি মারা হয়, তা হলে সেটাও শুদ্ধ হবে।[৭] তাঁদের দলীল হল, রাসূলুল্লাহ (সা.) চল্লিশটি বেত্রাঘাত করেছেন এবং হযরত আবূ বকর (রা.) ও তাই কার্যকর করেছেন। হযরত সা'ইব ইবন ইয়াযীদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.), হযরত আবূ বকর ও উমর (রা.) এর খিলাফতের শুরুতে মদ্যপায়ীকে আমরা ধরে আনতাম। আমরা তাকে আমাদের হাত দিয়ে, আমাদের জুতা দিয়ে ও আমাদের চাঁদর দিয়ে মারতাম। হযরত

---

[১] সুলাইমান আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল হুদূদ, হা.নং. ৪৪৭৭ কাতাদাহ বলেন, "রাসূলুল্লাহ (স.) লাঠি ও জুতা দ্বারা চল্লিশবার প্রহার করেছেন।"; সুলাইমান আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, কিতাবুল হুদূদ, হা.নং. ৪৪৮৯; আনাস (রা.) বলেন, "রাসূলুল্লাহ (স.) দুটি লাঠি একত্র করে চল্লিশবার প্রহার করেছেন।" মুসলিম ইবনু হাজ্জাজ, *সহীহ আল-মুসলিম*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল হুদূদ, হা.নং. ১৭০৬

[২] সাইয়্যেদ সাবেক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১৬

[৩] ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, বৈরুত : দারু ইহয়াইত তুরাছিল আরব, খ. ৯, পৃ. ১৩৭

[৪] আল-কাসানী, *বদা'ইয়ুস সনা'ই*, খ. ৫, পৃ. ১১৩; আল-বাজী, *আল-মুন্তকার*, খ. ৩, পৃ. ১৪২-৪

[৫] মুসলিম ইবনু হাজ্জাজ, *সহীহ আল-মুসলিম*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল হূদূদ, হা.নং. ১৭০৬; আল-বায়হাকী, *আস-সুনান আল-কুবরা*, প্রাগুক্ত, হা.নং. ১৭৩১০

[৬] আল-কাসানী, *বদা'ইয়ুস সনা'ই*, খ. ৫, পৃ. ১১৩

[৭] মুহাম্মদ ইবনু ইদ্রিস শাফি'ঈ, *আল-উম্ম*, তাবি, খ. ৮, পৃ. ৩৭৩; আল-মরদাভী, *আল-ইনসাফ*, তাবি, খ. ১০, পৃ. ২২৯-২৩০

উমর (রা.) এর খিলাফতের শেষ দিকেও চল্লিশটি বেত্রাঘাত করা হত। তবে যদি সীমালঙ্ঘণ বেড়ে যেত, তাহলে আশিটি বেত্রাঘাত করা হত।[১]

বর্তমান সময়ের আলেমদের কারো কারো মতে, মদ্যপানের হদ্দ অপরাধীর অবস্থা ও অপরাধের প্রকৃতি অনুযায়ী আদালতের সুবিবেচনায় শাস্তির পরিমাণে হ্রাস-বৃদ্ধি হতে পারে। তবে ৪০ এর কম এবং ৮০ এর অধিক বর্ধিত করা যাবে না। চতুর্থবার মাদক সেবনের অপরাধের মৃত্যুদণ্ডের যে কথা হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে তা নিরেট ভীতিপ্রদর্শন ও সতর্কীকরণের জন্য। বর্ণিত রয়েছে যে, মদ্যপানে অভ্যস্ত নয় এবং দৈহিকভাবে ক্ষীণ ব্যক্তিকে হযরত 'উমার (রা.) চল্লিশটি বেত্রাঘাত করতেন। আর হযরত 'উসমান (রা.) অপরাধীর অবস্থা ও অপরাধের মাত্রা বিবেচনা করে কখনো ৪০, আবার কখনো ৮০টি বেত্রাঘাত কার্যকর করতেন।[২] মদ্য উৎপাদন, পরিবহন, ক্রয়-বিক্রয়, পরিবেশন, উপঢৌকন এবং আমদানী-রপ্তানিও দণ্ডনীয় অপরাধ। তাযীরের আওতায় আদালত এ সব কাজের শাস্তি নির্ধারণ করবে।[৩]

মদ্য পানকারীর শাস্তির ক্ষেত্রে আরেকটি উল্লেখ্যযোগ্য বিষয় হচ্ছে মদ্যপ মাতাল অবস্থায় কোনো অপরাধ করলে তার বিধান। অধিকাংশ ইমামগণের মতে, কোন ব্যক্তি স্বেচ্ছায় ও সজ্ঞানে যে কোনভাবে মাদকদ্রব্য গ্রহণ করে মাতাল অবস্থায় কোন অপরাধ করলে সে শাস্তিযোগ্য হবে, কাজটি চাই সে ইচ্ছায় করুক কিংবা ভুলবশতই করুক। কারণ সে নিজেই তার বিবেক নষ্ট করেছে এবং তা এমন জিনিস দ্বারা করেছে যা গ্রহণ স্বয়ং একটি দণ্ডযোগ্য অপরাধ। অতএব, সতর্ক করার জন্য তাকে তার অপরাধের জন্য শাস্তি প্রদান করা একান্ত জরুরী। এরূপ অবস্থায় তাকে রেহাই দেয়া হলে দুষ্কৃতিকারীরা মদ্যপান করে অপরাধ কর্ম করতে দুঃসাহসী হয়ে ওঠবে।[৪]

মদ্যপানকারীর শারীরিক ও মানসিক অবস্থা বিবেচনা করে শাস্তি কার্যকর করা

ইসলামী আইনবিদগণের মতে, মদ্যপানকারীর ওপর শাস্তি কার্যকর করতে হলে অসুস্থ ও মানসিক ভারসাম্যহীন অবস্থায় হদ্দ কার্যকর করা উচিত নয়। মাদকের নেশা কেটে যাওয়ার পর এবং মাদক সেবনকারীর সুস্থ হবার পর হদ্দ কার্যকর করতে হবে। অন্যথায় শাস্তির উদ্দেশ্য ব্যাহত হবে। তদুপরি মাতাল অবস্থায় বিবেক-বুদ্ধি হারিয়ে ফেলার কারণে শাস্তির ব্যথাও তার কাছে কম অনুভূত হবে।[৫]

অধিকাংশ ইমামের মতে, জ্ঞান ফিরে আসার আগে হদ্দ প্রয়োগ করা হলে জ্ঞান ফিরে আসার পর পুনরায় হদ্দ কার্যকর করতে হবে। তবে কারো কারো মতে, পুনরায় হদ্দ প্রয়োগ করার প্রয়োজন নেই।[৬] তবে বিশুদ্ধতম অভিমত হল, যদি মনে করা হয় যে, বেত্রাঘাতের ফলে সে যর্থাথ শিক্ষাই পেয়েছে, তাহলে পুনরায় হদ্দ প্রয়োগ করার প্রয়োজন নেই। অন্যথায় পুনরায় হদ্দ প্রয়োগ করতে হবে।[৭]

---

[১] মুহাম্মদ ইবনু ইসমাঈল, *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুল হুদূদ, হা.নং. ৬৩৯৩, ৬৩৯৭

[২] ড. আহমদ আলী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭৭

[৩] *বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন*, *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ৩৩১

[৪] আবদুল কাদের আওদাহ, *আত-তাশরী'উল জিনা'ঈ আল-ইসলামী*, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ.৫৮৩

[৫] ড. আহমদ আলী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮২

[৬] এটা ইমাম শাফি'ঈ ও আহমদ রহ. প্রমুখের এক একটি মত হিসেবে বর্ণিত; মোঃ মাহবুবুল আলম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯৩

[৭] *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ*, কুয়েত :ওয়াযারাতুল আওকাফওয়া আল-শুয়ূনআল-ইসলামিয়্যাহ, ১৯৯৫, খ. ১০, পৃ. ১৭; আল-আনসারী, *আসনাল মাতালিব*, দারুল কিতাবিল ইসলাম, খ. ৪, পৃ. ১৬০

বারবার মদ্য পানকারীর শাস্তি

মাদক সেবনের স্বাভাবিক শাস্তি চল্লিশ থেকে আশি বেত্রাঘাত। কেউ যদি একবার মাদক সেবন করে তবে তার জন্য এ শাস্তি। এমনকি দ্বিতীয়, তৃতীয়বার মাদক সেবন করে ধরা পড়লে একই শাস্তি ভোগ করবে। তবে চতুর্থ বারও যদি একই অপরাধ প্রমাণিত হয় তাহলে তাকে মৃত্যুদণ্ড দিতে হবে বলে ইমামদের একটি দল মত প্রকাশ করেছেন। এর সপক্ষে তারা একটি হাদীস উল্লেখ করে থাকেন। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, মুআবিয়া ইবন আবূ সুফিয়ান (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যদি কেউ মদ পান করে, তবে তাকে কোড়া মারবে। সে যদি আবার মদ পান করে, তবে তাকে কোড়া মারবে। এরপরও যদি মদ পান করে, পুনরায় তাকে কোড়া মারবে। তারপরও যদি মদ খায় (চতুর্থবার), তবে তাকে হত্যা করবে।[১]

ইমামগণের একাংশ এ হাদীসের ভিত্তিতে বারংবার মদপানকারীর শাস্তি মৃত্যুদণ্ড হিসেবে মত প্রদান করেছেন। তবে অধিকাংশ ইমামগণের মতে বারংবার মদপানকারীকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া যাবে না। এ হাদীসের ব্যাখ্যায় তারা বলে থাকেন, মূলতঃ মদ পান থেকে বিরত রাখতে, মদপানকারীকে ভীতি প্রদর্শনের জন্যই এ হাদীসে মৃত্যুদণ্ডের কথা বলা হয়েছে, বস্তুতঃ মৃত্যুদণ্ড উদ্দেশ্য নয়।

ব্যভিচার

ইসলাম একটি পরিশীলিত, পরিছন্ন ও পবিত্র ধর্ম। এ ধর্মে মানব জাতিকে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে পবিত্র জীবন যাপনে। নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সচ্চরিত্র অনুশীলনের। গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে পারিবারিক বন্ধন, সামাজিক শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষায়। এ ধর্মে নিষেধ করা হয়েছে যাবতীয় অন্যায়, অশ্লীল কর্মকাণ্ডে যুক্ত হওয়া থেকে। নিষিদ্ধ করা হয়েছে বংশগত পবিত্রতা, পারিবারিক বন্ধন ও সামাজিক শান্তি শৃঙ্খলা বিনষ্টকারী সকল বিষয়কে। ইসলামের এ সকল বিধিনিষেধ প্রতিপালনের মধ্যেই রয়েছে মানব জাতির মুক্তি ও সাফল্য।

ইসলাম মানুষের চারিত্রিক পবিত্রতা রক্ষায় সকল অশ্লীলতাকে নিষিদ্ধ করেছে। পবিত্র কুরআন কারীমে মহান আল্লাহ বলেন, লোকদেরকে বলুন, তোমরা এসো! তোমাদের রাব্ব তোমাদের প্রতি কি কি বিধি-নিষেধ আরোপ করেছেন তা আমি তোমাদেরকে পাঠ করে শোনাই; তা এই যে, তোমরা তাঁর সাথে কাউকেই শরীক করবেনা, মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে, দরিদ্রতার ভয়ে নিজেদের সন্তানদেরকে হত্যা করবেনা। কেননা আমিই তোমাদেরকে ও তাদেরকে জীবিকা দিই; আর অশ্লীল কাজ ও কথার নিকটেও যেওনা, তা প্রকাশ্যই হোক কিংবা গোপনীয়ই হোক, আর আল্লাহ যার হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন - যথার্থ কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করনা। এসব বিষয় আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, যেন তোমরা অনুধাবন করতে পার।[২]

পৃথিবীতে প্রাচীন কাল থেকে চলে আসা অশ্লীল কর্মকাণ্ডসমূহের মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ অশ্লীলতার নাম যিনা বা ব্যভিচার। এটি একটি সমাজ ও নীতি-নৈতিকতা বিরোধী এবং অত্যন্ত জঘন্য ও কুৎসিত অপরাধ। ব্যভিচারের ফলে

---

[১] আবু দাউদ সুলায়মান ইবনুল আশ'আছ আস সিজিস্তানি রহ., *আবূ দাউদ শরীফ*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা : হাদীস নং ৪৪২৩

[২] আল কুরআন, ৬ : ১৫১

সমাজে সৃষ্টি হয় চরম নৈতিক বিপর্যয়, পারিবারিক বন্ধনের মতো পবিত্র ও প্রয়োজনীয় বন্ধনও ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়। এর প্রসার সমাজের মানুষকে বিবাহ পদ্ধতিতে জড়িত না হয়ে অনৈতিক ও অবৈধ যৌনাচারে উদ্বুদ্ধ করে।

ইসলামের আবির্ভাব ঘটেছে প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বে, আরব সমাজে। ব্যভিচারের মতো গর্হিত অপরাধকে তৎকালীন আরব সমাজে নিতান্ত ব্যক্তিগত রুচির ব্যাপার বিবেচনা করা হতো। এ কারণেই সেখানে পরিবার ও সমাজ ব্যবস্থা আজ চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন। তদুপরি এ অবৈধ যৌনকর্ম এইডস নামক মারাত্মক ঘাতক ব্যাধির জন্ম দিয়েছে। এর ফলেই আজ বিশ্বের সচেতন জনসমাজ যিনা পরিহার করে ধর্মীয় বিধান অনুযায়ী বিবাহের মাধ্যমে যৌনকর্ম সমাধার জন্য প্রতিনিয়ত আহবান জানাচ্ছে। সকল ধর্মেই অভিন্নভাবে যিনাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে; তবে ইসলামী আইনে এর বীভৎস কদর্যতাকে অত্যন্ত প্রকট করে তুলেছে এবং এর ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে হুশিয়ার করে দিয়েছে।[১]

কুরআন এবং হাদীসে অসংখ্য বার এই অনৈতিক এবং অবৈধ কাজ থেকে মানুষকে বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এমনকি পবিত্র কুরআনে এর নিকটে যেতেও কঠোর ভাষায় নিষেধে করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, "তোমরা যিনার কাছেও যেয়ো না। কেননা তা অত্যন্ত নির্লজ্জতা ও খুব বেশি খারাপ পথ।"[২]

একজন ঈমানদারের জন্য কখনোই ব্যভিচারের মতো ভয়াবহ জঘন্য পাপাচারে লিপ্ত হওয়ার সুযোগ নেই। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, কোন ব্যভিচারী ব্যভিচার করার সময় মু'মিন থাকে না। কোন শরাব পানকারী শরাব পান করার সময় মুমিন থাকে না। কোন চোর চুরি করার সময় মুমিন থাকে না এবং কোন ছিনতাইকারী এমনভাবে ছিনতাই করে যে, মানুষ তা দেখার জন্য তাদের চোখ সেদিকে উত্তোলিত করে; তখন সে মুমিন থাকে না।[৩]

ব্যভিচার কী

যিনা (زنا) বা ব্যভিচারের আভিধানিক অর্থ হল কদাচার, স্খলন, অন্যথাচরণ, পাপকর্ম করা। আরবীতে ব্যভিচারকে (عهارة)ও বলা হয়।[৪] যিনা (زنا) বা ব্যভিচারের ইংরেজী প্রতিশব্দ Adultery।[৫] সাধারণ অর্থে যিনা বলতে নারী-পুরুষের অবৈধ যৌন মিলনকে বোঝানো হয়।

ইসলামী শরীয়াতের পরিভাষায় বিশুদ্ধ বৈবাহিক বন্ধন কিংবা সন্দেহজনিত বৈবাহিক সম্পর্ক ছাড়া বালিগ ও সুস্থ বিবেকবুদ্ধি সম্পন্ন দুজন নারী-পুরুষের পারস্পরিক সম্মতিতে নারীর সামনের যৌনাঙ্গ দিয়ে পুরুষের সঙ্গমক্রিয়াকে যিনা বলা হয় হানাফী ইমামগণের অভিমত।[৬] বালেগা ও বুদ্ধিমান দুইজন নারী-পুরুষের বৈবাহিক বন্ধন ব্যতিরেকে স্বেচ্ছায় ও সজ্ঞানে একজনের যৌনাঙ্গ অপরজনের যৌনাঙ্গে প্রবিষ্ট করানোই যেনা।[৭]

---

[১] মোঃ মাহবুবুল আলম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫১
[২] আল কুরআন, ১৭ : ৩২
[৩] ইমাম আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, কিতাবুল সুন্নাহ, হা.নং. ৪৬৯০
[৪] ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমাহ, *বাংলা-ইংরেজী-আরবী ব্যবহারিক অভিধান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭৯
[৫] *প্রাগুক্ত*
[৬] আল-কাসানী, *বদাইউস সানা'ই*, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ৩৩-৪
[৭] মাওলানা মুহাম্মদ মূসা ও মাওলানা মোঃ মোজাম্মেল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৩০

শাফি'ঈগণের মতে, যিনা হল "স্বভাবগতভাবে যৌনকামনাময়ী নিষিদ্ধ কোন লজ্জাস্থানের মধ্যে কোন ধরনের সন্দেহ ছাড়াই পুরুষাঙ্গ কিংবা তার মাথা প্রবেশ করা।"[১] হাম্বলীগণের মতে, "সামনে কিংবা পেছনের দিকে অশ্লীল কাজ করাকে যিনা বলা হয়।"[২]

বাংলাদেশে ধর্ষণ-ব্যভিচার

বাংলাদেশের এক জরীপে দেখা যায় যে, ২০০৯ সাল থেকে ২০১৪ এর ১১ মার্চ পর্যন্ত কিশোরী, যুবতী, প্রতিবন্ধী, বিধবা সহ ৩,৫৭৭ জন ধর্ষণের শিকার হয়েছেন।[৩] বাংলাদেশের নারী নির্যাতনের চিত্র তুলে ধরে প্রতিবছরই প্রতিবেদন প্রকাশ করে থাকে আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক) আসকের হিসাবে বিদায়ী বছরের (২০১৯) প্রথম দশ মাসে ১ হাজার ২০০-এর মত ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। প্রকাশিত এসব ঘটনার প্রায় এক চতুর্থাংশ ছিল গণধর্ষণ। ধর্ষণচেষ্টার ঘটনা ঘটেছে আরো ২০০। অর্থাৎ গড়ে মাসে ঘটনা দাঁড়ায় ১৪৫টি। ২০১৮ সালে এই মাসিক হার ছিল ৭০টি।

আসকের এই প্রতিবেদনে বিদায়ী বছরে (২০১৯) প্রায় অর্ধেক ঘটনায় ভুক্তভোগীর বয়স দেয়া আছে। তাদের অর্ধেকের বেশি ১২ বছর বা তার কম বয়সী। এই বয়সী ভুক্তভোগীর সংখ্যা আশঙ্কাজনক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। আদতে ৮৫ শতাংকেরই বয়স ১৮ বছরের নিচে। দেখা যায়, ছয় বছরের কম বয়সী ১২৮টি শিশু ধর্ষণ বা ধর্ষণচেষ্টার শিকার হয়েছে। ধর্ষণ ও ধর্ষণচেষ্টার শিকার নারী শিশুদের মোট ৭৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। নিহত ব্যক্তিদের এক-পঞ্চমাংশ আত্মহত্যা করেছে। বাকিরা হত্যার শিকার।[৪]

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের বার্ষিক প্রতিবেদনে ২০১৬ সাল থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত দৈনিক গড়ে নারী নির্যাতনের একটা হিসাব তুলে ধরা হয়েছে। প্রতিবেদনটি নিম্নরূপ[৫]-

সাল	নারী নির্যাতন (দৈনিক গড়)	ধর্ষণ (দৈনিক গড়)
২০১৮	১১	৩
২০১৭	১৪	৩
২০১৬	১৩	২

সূত্র: *দৈনিক প্রথম আলো*, ৩০ ডিসেম্বর ২০১৯

[১] আল-আনসারী, *আসনাল মাতালিব*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১২৫১
[২] আল-বহুতী, দকা'ইক উলিন নুহা, আলামুল কুতুব, খ. ৩, পৃ. ৩৪৩
[৩] দৈনিক দিনকাল ১২ মার্চ ২০১৪, বুধবার, পৃ. ৮
[৪] মুসলিমা জাহান, বছর জুড়ে আলোচনায় নারী নির্যাতন, ঢাক : *দৈনিক প্রথম আলো*, ৩০ ডিসেম্বর ২০১৯, https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1631879/বছরজুড়ে আলোচনায়-যৌন-নির্যাতন
[৫] সেবিকা দেবনাথ, ২০১৮ সালের প্রতিদিন গড়ে ১১ নারী নির্যাতনের শিকার : বছরের শুরুর দিনেই গণধর্ষণের ঘটনায় নিন্দার ঝড়, ঢাকা : *দৈনিক ভোরের কাগজ*, ৩ জানুয়ারি ২০১৯, https://www. bhorerkagoj.com/print-edition/2019/01/03/229679.php

ইসলামী আইনে ব্যভিচারের শাস্তির ক্রম বিবর্তন

ইসলামের প্রাথমিক যুগে ব্যভিচারের শাস্তি বর্তমান সময়ের মতো ছিলোনা। বরং তখন ব্যভিচারকারীর ওপর তুলনামূলক হালকা শাস্তি প্রয়োগ করা হতো। তখন শাস্তি ছিল শুধুমাত্র তিরস্কার ও ভর্ৎসনা।[১] পবিত্র কুরআন কারীমে মহান আল্লাহ বলেন,

وَ الَّذٰنِ يَاْتِيٰنِهَا مِنْكُمْ فَاٰذُوْهُمَا ۚ فَاِنْ تَابَا وَ اَصْلَحَا فَاَعْرِضُوْا عَنْهُمَا ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا

আর তোমাদের মধ্য হতে যে কোন দুইজন এই নির্লজ্জতার কাজ করবে, তাদের উভয়কেই শাস্তি প্রদান কর; কিন্তু তারা যদি তাওবাহ করে এবং সদাচারী হয় তাহলে এতদুভয় হতে প্রত্যাবর্তিত হও। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাওবাহ গ্রহণকারী, করুণাময়।[২]

তবে শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রে তখনও ব্যভিচারকারীর বৈবাহিক অবস্থা বিবেচনা করা হতো। বিবাহিতদের জন্য ছিল গৃহবন্দির বিধান এবং অবিবাহিতদের জন্য ছিলো শারীরিক এবং মানসিক কষ্টদানের বিধান।

ইসলামে ব্যভিচারের শাস্তি

ইসলাম একটি অত্যন্ত যৌক্তিক ধর্ম। ইসলামের বিধিবিধান, আইন কানুনও সব যৌক্তিক এবং মানব জাতির জন্য অত্যন্ত কল্যাণকর। ব্যভিচার একটি সমাজ ও নীতি-নৈতিকতা বিরোধী জঘন্য অপরাধ হওয়ায়ে তা রোধ কল্পে ইসলাম অত্যন্ত কঠোর আইন প্রয়োগ করেছে। তবে ইসলামে সকল ব্যক্তির জন্য একই শাস্তি বিধান নির্ধারণ করা হয়নি। এ ক্ষেত্রে অপরাধীর বৈবাহিক অবস্থা বিবেচনায় দুই ধরনের শাস্তি ঘোষিত হয়েছে। যথা-

১. বিবাহিতের ব্যভিচারের শাস্তি

২. অবিবাহিতের ব্যভিচারের শাস্তি

১. বিবাহিতের ব্যভিচারের শাস্তি

আরবী (محصن) 'মুহসান' শব্দের অর্থ বিবাহিত, বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ।[৩] যে বালেগ ও বুদ্ধিমান মুসলিম পুরুষ ও নারী পরস্পর সহীহ বিবাহ অনুষ্ঠানের পর সঙ্গমস্বাদ লাভ করেছে তাকে মুহসানা বলে।[৪] মুহসান বা বিবাহিত ব্যভিচারী পুরুষ কিংবা নারী যা হোক না কেন ব্যভিচার করলে তাকে 'রজম' বা প্রস্তর নিক্ষেপ করে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হবে।[৫] ব্যভিচারীর জন্য রজমের শাস্তির বিধান রাসূলুল্লাহ (সা.) -এর কথা ও কাজ উভয় দিক থেকে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত। মুসলিম খলিফাগণও বিবাহিত ব্যভিচারীর ক্ষেত্রে রজম প্রয়োগ করেছেন। এ সংক্রান্ত অসংখ্য হাদীস বর্ণিত হয়েছে। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, ইয়াযীদ ইবন নুআয়েম ইবন হুযাল (রহ.) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, মা'ইয ইবন মালিক ইয়াতীম ছিলেন এবং তিনি আমার পিতার নিকট লালিত-পালিত হন। একদা তিনি

---

[১] সাইয়্যেদ সাবেক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩২৩
[২] আল কুরআন, ৪ : ১৬
[৩] ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আরবী-বাংলা ব্যবহারিক অভিধান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬৯
[৪] মাওলানা মুহাম্মদ মূসা ও মাওলানা মোঃ মোজাম্মেল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৩২
[৫] ড. আবদুল আযীয আমের, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮

মহল্লার একটি মেয়ের সাথে ব্যভিচার করেন। তখন আমার পিতা তাকে বলেন, তুমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট যাও এবং অবস্থা সম্পর্কে তাঁকে অবহিত কর। সম্ভবতঃ তিনি তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবেন-তোমার অপকর্মের জন্য। আর তার এরূপ বলার উদ্দেশ্য এই ছিল যে, যাতে মা'ইযের নাজাতের কোন ব্যবস্থা হয়ে যায়।

এরপর মা'ইয (রা.) তাঁর নিকট যান এবং বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি যিনা করেছি, আপনি আমার উপর আল্লাহ্র কিতাবের হুকুম কার্যকরী করুন। একথা শুনে নবী (সা.) তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন। তিনি দ্বিতীয়বার বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি যিনা করেছি, আপনি আমার উপর আল্লাহ্র কিতাবের হুকুম কার্যকরী করুন। এ ভাবে তিনি চারবার তার ত্রুটির কথা স্বীকার করেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, তুমি তো চারবার তোমার দোষের কথা স্বীকার করেছ। এখন বলঃ তুমি কার সাথে যিনা করেছ? তখন তিনি বলেন, অমুক মেয়ের সাথে।

তখন নবী (সা.) জিজ্ঞাসা করেনঃ তুমি কি তার সাথে শয়ন করেছিলে? মা'ইয বলেন, হ্যাঁ। নবী (সা.) বলেন, তুমি কি তার সাথে মিলিত হয়েছিলে? মা'ইয বলেন, হ্যাঁ। এরপর নবী (সা.) জিজ্ঞাসা করেনঃ তুমি কি তার সাথে সংগম করেছিলে? মা'ইয বলেন, হ্যাঁ। এ সব শুনে নবী (সা.) তাকে রজম বা পাথর মেরে হত্যার নির্দেশ দেন।

তাকে হাররা নামক স্থানে নেওয়া হয় এবং পাথর মারা শুরু হলে ভয়ে অস্থির হয়ে তিনি পালাতে থাকেন। এ সময় আবদুল্লাহ ইবন উনায়স তাকে কাবু করে ফেলেন। তাঁর সঙ্গী ক্লান্ত হয়ে পড়ায়, তিনি উটের খুর দিয়ে তাকে আঘাত করে হত্যা করেন। এরপর তিনি নবী (সা.)-এর নিকট এসে এ ঘটনা বর্ণনা করলে, তিনি বলেন, তোমরা তাকে কেন ছেড়ে দিলে না? সে হয়তো খালিস তাওবা করতো এবং আল্লাহ্ তাকে মাফ করে দিত।[১]

উপরে উল্লিখিত হাদীসে দেখা যাচ্ছে মহানবী (সা.)-এর নির্দেশক্রমে সাহাবীগণ এক ব্যভিচারকারীকে রজম করেছেন অর্থাৎ প্রস্তর নিক্ষেপ করে হত্যা করেছেন। মুসলিম খলিফাগণ ব্যভিচারসহ অন্যান্য ইসলামের শাস্তি বিধান কার্যকর করতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। তারা কখনো শাস্তি প্রয়োগে কারো প্রতি বিশেষ দয়া দেখাতেন না। বরং মহানবী (সা.)-এর পদ্ধতি অবলম্বন করেই শাস্তি প্রয়োগ করতেন। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে,

আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা উমার ইবন খাত্তাব (রা.) খুতবা দেওয়ার সময় বলেন যে, মহান আল্লাহ্ মুহাম্মদ (সা.) কে সত্য নবী হিসাবে প্রেরণ করেন এবং তাঁর উপর কিতাবও নাযিল করেন, যাতে রজমের নির্দেশ আছে। আমরা তা তিলাওয়াত করে ভালভাবে মুখস্থ করেছি। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা.) রজম করেছেন এবং তাঁর পরে আমরাও রজম করেছি। এখন আমার সন্দেহ হচ্ছে যে, দীর্ঘদিন অতিবাহিত হওয়ার কারণে হয়তো কেউ এরূপ বলবে, আমরা আল্লাহ্র কিতাবে রজম সম্পর্কে কোন নির্দেশ পাই না। ফলে তারা আল্লাহ্র একটি ফরয নির্দেশ পরিত্যাগ করার কারণে গুমরাহ হয়ে যাবে। এরপর তিনি বলেন, যে সব নর-নারী যিনায় লিপ্ত হয়, তাদের জন্য রজমের নির্দেশ আছে; যদি সে বিবাহিত হয়, যদি সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া যায়, অথবা গর্ভবতী হয়, অথবা সে নিজে তা স্বীকার করে। আল্লাহর শপথ! যদি লোকেরা এরূপ বলাবলি না করতো যে, উমার আল্লাহ্র কিতাবে অতিরিক্ত যোগ করেছে, তবে আমি রজমের আয়াত লিখে দিতাম।[২]

---

[১] আবু দাউদ সুলায়মান ইবনুল আশ'আছ আস সিজিস্তানি রহ., *আবূ দাউদ শরীফ*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা : হাদীস নং ৪৩৬৬
[২] *প্রাগুক্ত*, হাদীস নং ৪৩৬৫

হযরত 'উবাদাহ ইবনস সামিত (রা.) কর্তৃক বর্ণিত এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, তোমরা আমার কাছ থেকে গ্রহণ কর, তোমরা আমার কাছ থেকে গ্রহণ কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা মহিলাদের জন্য একটি পথ বের করে দিয়েছেন। অবিবাহিত অবিবাহিতার সাথে ব্যভিচার করে একশ বেত্রাঘাত কর এবং এক বছরের জন্য নির্বাসন দাও। আর বিবাহিত বিবাহিতা মহিলার সঙ্গে ব্যভিচার করেলে একশ বেত্রাঘাত এবং পাথর নিক্ষেপ (করে হত্যা করবে)।[১]

সর্বশেষ উল্লিখিত হাদীসে ব্যভিচারীকে রজম করার পূর্বে একশ বেত্রাঘাত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু রজমের পূর্বে ব্যভিচারীকে বেত্রাঘাত করতে হবে কি না- তা নিয়ে ইমামগণের মধ্যে কিছুটা মতভেদ রয়েছে।[২] তবে চার মাযহাবের ইমামগণের সর্বস্বীকৃত মত হল- বিবাহিতদেরকে শুধু রজমই করতে হবে; বেত্রাঘাত নয়।[৩] নবীজি (সা.) এবং খলিফাগনের শাসনামলে বিবাহিতদের ব্যভিচারের কিছু সংখ্যক ঘটনার বিবরণ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। কোনো হাদীসেই রাসূলুল্লাহ (সা.) ও খুলাফা রাশিদূন রজমের পূর্বে বেত্রাঘাতের নির্দেশ প্রদান করেছিলেন, এ ধরনের কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না। সুতরাং এ কথা বলাই যায় যে, বিবাহিতদের শাস্তি রজমের ওপর ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

বিবাহিতের ব্যভিচারের শাস্তির ব্যাপারে ভিন্নমত

বিবাহিতের ব্যভিচারের শাস্তির ব্যাপারে ভিন্নমতও রয়েছে। কিছু সংখ্যক আলিমের মতে, বিবাহিতদের যিনার শাস্তি রজম নয়; বেত্রাঘাই।[৪] তাদের বক্তব্য হল, পবিত্র কুরআনে রজমের কথা নেই। তদুপরি তা খুবই কঠোর ও নির্মম শাস্তি। তা যদি বাস্তবিকই শরীয়াতের বিধান হতো, তাহলে তার উল্লেখ কুরআনে অবশ্যই থাকতো। তাদের কারো কারো মতে, 'রজম' তাযীরী শাস্তির আওতাভুক্ত, হদ্দ নয়। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাযীরী শাস্তি হিসেবেই বিভিন্ন ঘটনায় রজমের দণ্ড দিয়েছিলেন।[৫]

এ আপত্তির জবাব আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামআতের ইমামগণ বলে থাকেন যে, তাদের এ বক্তব্য গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা কুরআনে কোন বিষয়ে স্পষ্ট ভাষায় কিছু উল্লেখ না থাকলেই যে তা শরীয়াতের দলীল হতে পারবে না, তা ঠিক নয়। কারণ, কুরআনের মতো সুন্নাতও শরীয়াতের একটি প্রধান উৎস। সুন্নাতে স্পষ্টভাবে রজমের কথা উল্লেখ রয়েছে। তাছাড়া খুলাফায়ে রাশিদীনও এ বিধান কার্যকর করেছেন। 'রজম হদ্দ নয়; তাযীরী শাস্তি তাদের এ কথাও ঠিক নয়। কেননা বিভিন্ন ঘটনা প্রমাণ করে যে, যিনার হদ্দ প্রমাণ করতে সাক্ষ্যের নিসাব পূরণের প্রয়োজন পড়ে। অথচ তাযীর প্রমাণ করতে চার জন সাক্ষ্যের প্রয়োজন পড়ে না।[৬]

হযরত উমার (রা.)-এর এ প্রসঙ্গে প্রদত্ত একটি বক্তব্য বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি বলেছিলেন, "আল্লাহ তায়ালা হযরত মুহাম্মদ (সা.) কে সত্য সহকারে পাঠিয়েছেন। তাঁর প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। সে

[১] মুসলিম ইবনু হাজ্জাজ আল-কুশায়রী, *সহীহ আল-মুসলিম*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল হূদূদ, হা.নং ১৬৯০; সুলাইমান আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, কিতাবুল হূদূদ, হ.নং ৪৪১৫

[২] যাহিরী ও যায়দিয়্যা শি'য়া ইমামগণ ইতঃপূর্বে বর্ণিত হযরত 'উবাহাদ ইবনুস সামিত (রা.) এর হাদীসের ভিত্তিতে বলেন যে, রজমের আগে বেত্রাঘাত করাও জরুরী। ইমাম আহমাদ (রহ.) থেকেও এক ধরনের একটি মত বর্ণিত রয়েছে। ইবনু মুফলিহ, *আল-ফুরু*, আলমুল কুতুব, খ. ৬, পৃ. ৬৭

[৩] মুহাম্মদ ইবনু ইদ্রিস *আশ-শাফি'ঈ*, *আল-উম্ম*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ১৬৭

[৪] এটা খারিজীদের অভিমত। (আস-সারাখসী, মাবসূত, খ.৯, পৃ.৩৬-৭) বর্তমানে পাশ্চাত্য চিন্তার অনুসারী মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের কেউ কেউও এ কথা বলে থাকে।

[৫] ড. আহমদ আলী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৭

[৬] *প্রাগুক্ত*

অবতীর্ণ বিষয়াবলীর মধ্যে রজমের আয়াতও ছিল। আমরা তা পড়েছি এবং তা সংরক্ষণ করেছি। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা.) রজমের দণ্ড দিয়েছিলেন। পরে আমরাও তা করিয়েছি। আমার আশঙ্কা হচ্ছে, সময়ের ব্যবধানে লোকেরা হয়ত বলবে, আল্লাহর কিতাবে আমরা রজমের আয়াত পাচ্ছি না। এভাবে তারা আল্লাহর নির্ধারিত ফরয ত্যাগ করে পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে। মনে রেখো, রজম আল্লাহর কিতাবেরই বিধান। বিবাহিত নারী-পুরুষ যিনা করলেই এবং তা সন্দেহাতীভাবে প্রমাণিত হলেই, অথবা গর্ভ হয়ে গেলে কিংবা কেউ স্বীকার করলেই তা কার্যকর হবে।"[১] তিনি আরো বলেন, আল্লাহর শপথ! 'উমর (রা.) আল্লাহর কিতাবে বৃদ্ধি করেছে লোকেরা এ কথা বলে বেড়াবে। এ আশঙ্কা না হলে আমি অবশ্যই কুরআনে আয়াতটি লিখে দিতাম।"[২]

আলিমদের কেউ কেউ মনে করেন যে, সূরা আন নূরের যিনা সংক্রান্ত আয়াত নাযিল হবার পর রজমের বিধান রহিত হয়ে গেছে। এ কথাও ঠিক নয়। কেননা এ কথা ঐতিহাসিকভাবে সত্য যে, সূরা আন নূর নাযিল হবার পরও রাসূলুল্লাহ (সা.) স্বয়ং রজমের দণ্ড কার্যকর করেছেন। সূরা আন নূরে বর্ণিত বেত্রাঘাতের হুকম থেকে রজমের বিধানকে খাস করা হয়েছে। অধিকাংশ ইমামের মতে, খবরে ওয়াহিদ দ্বারা এরূপ খাস করা জায়িয। হানাফীগণের মতে, মাশহুর ও মুতাওয়াতির হাদীস দ্বারা আয়াতকে খাস করা বৈধ। যেহেতু রজমের হাদীসসমূহ অর্থগত দিক থেকে মুতাওয়াতির হাদীসের পর্যায়ভুক্ত, তাই বেত্রাঘাতের বিধান থেকে রজমের বিধানকে খাস করা অধিকাংশ ইমামের মতে সঠিক হয়েছে।[৩]

মুহসান-এর শর্তাবলি

মুহসান হওয়ার জন্য ব্যক্তির মধ্যে ছয়টি শর্ত বিদ্যমান থাকা আবশ্যক। যথা[৪]- বালেগ, বুদ্ধিমান, স্বাধীন, মুসলিম, সহীহ বিবাহিত, স্বামী-স্ত্রীর সাথে সঙ্গমকৃত

২. অবিবাহিতের ব্যভিচারের শাস্তি

ব্যভিচারকারী অবিবাহিত (غير محصن) হয় এবং হদ্দ কার্যকর করার সকল শর্ত পূরণ করে তবে তাকে শাস্তি ভোগ করতে হবে। (غير محصن) বলা হয়, যার মধ্যে (محصن) হওয়ার যেকোনো একটি শর্ত অনুপস্থিত থাকে।[৫]

(غير محصن)-এর ব্যভিচারের শাস্তি হল একশতটি বেত্রাঘাত।[৬] আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, "ব্যভিচারী পুরুষ ও ব্যভিচারিণী নারী- তাদের প্রত্যেককে একশটি করে বেত্রাঘাত কর।"[৭] রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন,"অবিবাহিত নারী-পুরুষ যিনা করলে একশত বেত্রাঘাত।"[৮]

---

[১] মুসলিম ইবনু হাজ্জাজ, *সহীহ আল- মুসলিম*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল হুদূদ, হা.নং. ১৬৯১; সুলাইমান আবূ দাউদ, আস সুনান, প্রাগুক্ত, কিতাবুল হুদূদ, হা.নং. ৪৪১৮

[২] সুলাইমান আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল হুদূদ, হা.নং. ৪৪১৮

[৩] আল-জাসসাস, *আহকামূল কুরআন*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৩৮৮-৯

[৪] মাওলানা মুহাম্মদ মূসা ও মাওলানা মোঃ মোজাম্মেল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৩২

[৫] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৩৪

[৬] ড. আবদুল আযীয আমের, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬

[৭] আল কুরআন, ২৪ : ২

[৮] মুসলিম ইবনু হাজ্জাজ আল-কুশায়রী, *সহীহ আল- মুসলিম*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল হুদূদ, হা.নং. ১৬৯০, সুনান আবি দাউদ, প্রাগুক্ত, কিতাবুল হুদূদ, হা.নং. ৪৪১৫

নির্বাসন দণ্ড

অবিবাহিত ব্যভিচারকারীকে একশ বেত্রাঘাত করতে হবে এ ব্যাপারে সকল ইমাম একমত। তবে শাস্তির অংশ হিসেবে বেত্রাঘাত করার পরও এক বছরের জন্য নির্বাসিত করতে হবে কি না এ ব্যাপারে ইমামগণের মতানৈক্য রয়েছে।[১]

ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) বলেছেন, দণ্ডপ্রাপ্ত অপরাধী নারী হোক বা পুরুষ এক বছরের নির্বাসন দেওয়া আবশ্যক নয়। তবে সমাজ ও রাষ্ট্রের শান্তি-শৃঙ্খলার স্বার্থে বিচারক তাযীরী শাস্তির আওতায় এক বছরের জন্য নির্বাসন দিতে পারেন।[২]

হানাফী ইমামগণের যুক্তি হচ্ছে, পবিত্র কুরআনে তাদের শাস্তি হিসেবে কেবল বেত্রাঘাতের কথাই উল্লেখ করা হয়েছে। এমতাবস্থায় খবরে ওয়াহিদের ভিত্তিতে এক বছরের নির্বাসন দণ্ড দেয়ার মানে হল কুর'আনের অকাট্য দলীলের ওপর অতিরিক্ত বৃদ্ধি সাধন, যা যুক্তিযুক্ত নয়।[৩]

ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদের মতে, ব্যভিচারী- পুরুষ হোক বা নারী তাকে এক বছরের জন্য অবশ্যই নির্বাসিত করতে হবে।[৪] কেননা বুখারী এবং মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে, যায়িদ ইবন খালিদ জুহানী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী (সা.) কে নির্দেশ দিতে শুনেছি ঐ ব্যাক্তি সম্বন্ধে একশ কশাঘাত করার ও এক বছরের জন্য নির্বাসনের, যে অবিবাহিত অবস্থায় যিনা করেছে।[৫]

ইমাম আওয়ায়ী এবং মালিকী ইমামগণের মতে, কেবল ব্যভিচারী পুরুষকেই এক বছরের জন্য নির্বাসনের দণ্ড দেয়া ওয়াজিব। মহিলাদের জন্য নির্বাসনের দণ্ড প্রযোজ্য নয়।[৬] তাঁদের বক্তব্য হলো, মহিলাদেরকে দূরে নির্বাসন দেয়া হলে সে সম্পূর্ণরূপে অরক্ষিত হয়ে যাবে। সে কোথায় থাকবে, কিভাবে দিন কাটাবে, তা একটি কঠিন সমস্যা হয়ে দেখা দেবে। তদুপরি তাকে একাকী অবস্থায়ও পাঠানো সম্ভব নয়। কোন অমুহরামের সাথে নির্বাসনে পাঠানো হলে, তাকে চরম ব্যভিচারের পথে ঠেলা দেয়া হবে। আর কোন মুহরামকে তার সাথে নির্বাসিত করা হলে, তা হবে যে অপরাধী নয় তাকে শাস্তি দান করা।[৭]

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায়, বিচারক প্রয়োজন ও কল্যাণকর মনে করলে এক বছরের জন্য নির্বাসন দণ্ড দিতে পারবে- এতে কারো কোন দ্বিমত নেই। তবে বর্তমানে বিভিন্ন দেশের যে পরিবেশ- তাতে তাদেরকে এক দেশ থেকে অন্য দেশে নির্বাসনে পাঠানো হলে সংশোধনের পরিবর্তে তাদের আরো অপরাধপ্রবণ হয়ে ওঠার আশঙ্কা রয়েছে বেশি। যদি একান্ত প্রয়োজনই হয়, তাহলে তাদেরকে নির্বাসনের পরিবর্তে এক বছরের জন্য কারাগারে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় আটক রাখা যেতে পারে। এতে নির্বাসনের উদ্দেশ্যও অর্জিত হবে।[৮] সম্ভবত এ ধরনের অবস্থা বিবেচনা করেই হযরত আলী

---

[১] ড. আবদুল আযীয আমের, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬
[২] সাইয়্যেদ সাবেক, *প্রাগুক্ত*, ৩২৬
[৩] আল-কাসানী, *বদা'ইয়ুস সনা'ই*, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ৩৯; আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ৪৪
[৪] ইমাম মুহাম্মদ ইবনু ইদ্রিস শাফি'ঈ, *আল-উম্ম*, প্রাগুক্ত, খ.৭, পৃ. ১৭১; আল-আনসারী, *আসনাল মাতালিব*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১২৯
[৫] বুখারী, ৬৩৭১
[৬] সাইয়্যেদ সাবেক, *প্রাগুক্ত*, ৩২৬
[৭] ইমাম মালিক, *আল-মুদাওয়ানাহ*, প্রাগুক্ত, খ. ১০, পৃ. ৫০৪
[৮] ড. আহমদ আলী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৩

(রা.) দু'জন অবিবাহিত নারী-পুরুষ যখন যিনা করল, তখন রায় দিলেন যে, তাদেরকে বেত্রাঘাত করতে হবে, নির্বাসন দেয়া যাবে না। কেননা তাতে ফিতনার আশঙ্কা রয়েছে।[১]

বিবাহিতের সাথে অবিবাহিতের ব্যভিচার

ব্যভিচারকারীর একজন যদি বিবাহিত হয় এবং একজন যদি অবিবাহিত হয় তাহলে দুই জনের জন্য দু'ধরণের শাস্তি প্রয়োগ করা হবে। বিবাহিত ব্যক্তির ওপর রজমের হদ্দ প্রয়োগ করে হত্যা করতে হবে। এবং অবিবাহিত ব্যক্তিকে একশ বেত্রাঘাত করতে হবে। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, উবাদা ইবন সামিত (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর ওপর যখন ওহী অবতীর্ণ হতো, তখন তাঁকে ক্লান্ত মনে হতো এবং তার মুখমণ্ডলে ক্লান্তির চিহ্ন পরিস্ফুটিত হত। বর্ণনাকারী বলেন, একদা যখন তাঁর ওপর ওহী অবতীর্ণ হলো তখন তাঁর অবস্থা ঐরূপ হল। এরপর যখন তার কষ্টকর অবস্থা কেটে গেল (ওহী বন্ধ হয়ে গেল) তখন তিনি বললেন, তোমরা আমার কাছে হতে গ্রহণ কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা তাদের (মহিলাদের) জন্য একটি পথ বের করে দিয়েছেন। বিবাহিত পুরুষ ও বিবাহিতা মহিলার সাথে এবং অবিবাহিত অবিবাহিতা মেয়ের সাথে ব্যভিচার করে, তবে বিবাহিত ব্যক্তিকে একশ বেত্রাঘাত এরপর পাথর নিক্ষেপ (করে হত্যা করবে)। আর অবিবাহিতকে একশ বেত্রাঘাত করবে, এরপর এক বছরের জন্য নির্বাসন দেবে।

বেত্রাঘাতের ফলে অপরাধী মারা গেলে

বেত্রাঘাত প্রাপ্ত অপরাধী (প্রহার সহ্য করতে না পেরে) মারা গেলে তার জন্য কোনো দিয়ত বা রক্তমূল্য দেওয়া লাগবে না। সহীহ মুসলিমের ব্যাখ্যায় ইমাম নববী (রহ.) বলেন, আলেমগণ এ ব্যাপারে একমত, যার উপর হদ্দ ওয়াজিব হয়েছে, অতপর শাসক বা তার নিযুক্ত প্রতিনিধি তার উপর শরয়ি 'হদ্দ কার্যকর করার দরুন মারা গেলো, তার জন্য শাসক বা প্রতিনিধির উপর কোনো দিয়াত আরোপিত হবেনা। বায়তুল মাল থেকেও দিয়াত দেওয়া লাগবেনা।[২]

ধর্ষণের শাস্তি

ধর্ষণ একটি গর্হিত, জঘন্য এবং অমানবিক অপরাধ। পুরুষ যদি জোরপূর্বক ভাবে কোনো রমণীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হয় তাকে ধর্ষণ বলে। জোরকারী বা ধর্ষণকারী শাস্তির মুখোমুখি হবেন। তার ওপর হদ্দের শাস্তি বিধান কার্যকর করা হবে। অপর দিকে যার ওপর জোর করা হবে তাকে বেখসুর খালাস দেওয়া হবে।

আলকামা ইবন ওয়াইল কিন্দী তার পিতা ওয়াইল কিন্দী (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সময়ে জনৈক মহিলা সালাতের উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হয়েছিল। পথে তাকে এক ব্যক্তি স্বীয় কাপড় দিয়ে ঢেকে ফেলে এবং তার প্রয়োজন পূরণ করে। মহিলাটি চিৎকার করলে লোকটি চলে যায়। এই সময় মহিলাটির পাশ দিয়ে আরেক ব্যক্তি যাচ্ছিল। মহিলাটি বলতে লাগল এই পুরুষটাই তার সাথে এমন এমন করেছে। তখন একদল মুহাজির সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন। মহিলাটি বলল, এই লোকটই আমার সঙ্গে এমন এমন করেছে। তখন তারা এই লোকটিকে নিয়ে এলে মহিলাটি বলল, এ-ই সেই লোক। তখন তারা এই লোকটিকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে এলেন। তিনি তাকে

---

[১] আল-জাসসাস, *আহকামূল কুরআন*, দারুল ফিকর, তা. বি., খ. ৫, পৃ. ৯৫
[২] সাইয়্যেদ সাবেক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৪০

'রজম' এর নির্দেশ দিলেন। এই সময় যে লোকটি প্রকৃত পক্ষে উপগত হয়েছিল সেই লোকটি উঠে দাঁড়াল। বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আসলে আমি অপরাধী। রাসূলুল্লাহ (সা.) মহিলাটিকে বললেন, যাও, আল্লাহ তোমাকে মাফ করে দিয়েছেন। ধৃত পুরুষটি সম্পর্কে ভাল মন্তব্য করলেন। আর প্রকৃত পক্ষে যে লোকটি উপগত হয়েছিল তাকে রজম-এর নির্দেশ দিলেন এবং বললেন, সে এমন তওবা করেছে যে, সমগ্র মদীনাবাসী যদি তা করে তবে তাদের তওবাও কবুল হয়ে যাবে।[১]

কোন পুরুষকেও জোর জবরদস্তি করে যিনা করতে বাধ্য করা হলে তার ওপর হদ্দ কায়িম করা যাবে না, সে বেকসুর খালাস পাবে। এটা অধিকাংশ ইমামের অভিমত। হাম্বলী ও অধিকাংশ মালিকীর মতে, তার ওপরও হদ্দ কায়েম করতে হবে। তাদের কথা হল, যদিও তাকে যিনা করতে বাধ্য করা হচ্ছে; কিন্তু ক্রিয়াটি যেহেতু সম্পূর্ণ নিজের ইচ্ছা ছাড়া সুসম্পন্ন হতে পারে না, তাই শান্ত ভাবে যিনা করার অর্থ দাঁড়ায় যে, সে ইচ্ছাকৃতভাবেই যিনা করেছে। ইমাম শাফি'ঈ এবং হানাফীগণের মধ্যে সাহেবাইনের মতে, রাষ্ট্রপ্রধান, সরকার বা তার প্রতিনিধি কোন পুরুষকে জোরপূর্বক যিনা করতে বাধ্য করলে যিনাকারীর শাস্তি হবে না। তবে বলপ্রয়োগকারী রাষ্ট্র প্রধান বা তার প্রতিনিধি ব্যতীত অন্য কেউ হলে সে আদালতের সুবিবেচনা অনুযায়ী তাযীর (সাধারণ দণ্ড) ভোগ করবে। কোন কারণে শাস্তি মওকুফ হলে ধর্ষণকারী কর্তৃক ধর্ষিতাকে যথোপযুক্ত মোহর পরিমান অর্থ প্রদান করতে হবে।[২]

ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম মালেক (রহ.)-এর মতে ধর্ষিতাকে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ মোহর দিতে হবে। অপর দিকে ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর মতে, ধর্ষিতা কোনো মহর পাবে না।[৩]

ব্যভিচার প্রমাণ প্রক্রিয়া

১. অপরাধীর স্বীকারোক্তি

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জীবদ্দশায় একাধিক ব্যক্তি তার ব্যভিচারের ব্যাপারে নিজ থেকে এসে স্বীকারোক্তি প্রদান করেছিলেন।

২. সাক্ষ্য

ব্যভিচার প্রমাণিত হওয়ার জন্য চারজন পুরুষ সাক্ষীর সাক্ষ্য আবশ্যক। মহান আল্লাহ বলেন, তোমাদের যে সব নারী ব্যভিচার করবে, তোমরা তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের চারজনের সাক্ষ্য গ্রহণ কর। যদি তারা সাক্ষ্য দেয়, তবে তোমরা তাদেরকে সে সময় পর্যন্ত গৃহে আবদ্ধ করে রাখবে যে পর্যন্ত না তাদের মৃত্যু হয় কিংবা আল্লাহ তাদের জন্য কোন পৃথক পথ বের করেন।[৪]

বিচারকের নিজের জ্ঞাত তথ্য মোতাবেক রায় দেওয়ার বিধান

যাহেরি মাযহাব মতে রক্তপাত, কিসাস, ব্যভিচার, হুদুদ ইত্যাদি বিষয়ে বিচারকের আবশ্যক কর্তব্য নিজের জ্ঞাত তথ্যানুসারে বিচার বাস্তবায়িত করা। তবে অধিকংশ ইমামের মতে এটা বৈধ নয়। কারণ বিচারক একা কারো ব্যাপারে

---

[১] আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা আত-তিরমিযী রহ., *তিরমিযী শরীফ*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা : হাদীস নং ১৪৬০

[২] মুহাম্মদ ইবনু ইদ্রিস শাফি'ঈ, *আল-উম্ম*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ১৬৮; আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ৫৯, খ. ২৪, পৃ. ৮৯-৯০

[৩] সাইয়্যেদ সাবেক, *প্রাগুক্ত*, ৩৪৮

[৪] আল কুরআন, ৪ : ১৫

ব্যভিচারের অভিযোগ উত্থাপন করলে সেটা বৈধ হবে না যতক্ষণ না সে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করতে পারবে। চারজন সাক্ষী উপস্থিত না করতে পারলে তাকে অপবাদের শাস্তি ভোগ করতে হবে।[১]

গর্ভ দ্বারা ব্যভিচারের প্রমাণ

অধিকাংশ ইমামের মতে শুধু গর্ভবতী হওয়া দ্বারা ব্যভিচারের হদ্দ কার্যকর করা বৈধ হবে না। ইমাম মালেক (রহ.)-এর মতে, যে মহিলার স্বামী নেই, ধর্ষিতা হওয়ার কোনো প্রমাণ নাই এমন নারীর ক্ষেত্রে গর্ভধারণের ঘটনা ঘটলে তাকে শাস্তি প্রদান করা হবে।

স্ত্রী ভেবে অন্য রমণীর সাথে সহবাস

স্ত্রী মনে করে অন্য কোনো রমণীর সাথে ভুলবশত সহবাস করে ফেললে তার ওপর হদ্দ কার্যকর হবে না। যেমন- কেউ যদি বাসর রাতে নিজের শয্যায় শায়িত কোন মেয়েকে দেখতে পেল এবং বাড়ির লোকজনও তাকে বলল যে, সে তার স্ত্রী। এমতাবস্থায় সে নিজের স্ত্রী মনে করে যদি তার সাথে সহবাস করে, তার ওপর হদ্দ জারি করা যাবে না। অনুরূপভাবে কেউ যদি রাত্রে অন্ধকারের মধ্যে নিজের বিছানায় শায়িত কোন ঘুমন্ত মেয়ে দেখতে পেয়ে তাকে স্ত্রী মনে করেই সহবাস করে, তাহলে তার ওপরও হদ্দ জারি করা যাবে না। তবে এরূপ অবস্থা ছাড়া অন্য অবস্থায় কেউ যদি কোন মহিলার সাথে ব্যভিচার করে দাবী করে যে, সে তাকে স্ত্রী মনে করেই সঙ্গম করেছে, তা হলে তার কথা ধর্তব্য হবে না।[২]

শরীয়াতের শর্ত না মেনে বিয়ে করলে

কেউ যদি শরীয়াতের শর্ত না মেনে বিয়ে করে সহবাস করে, তাহলেও তার ওপর হদ্দ কায়িম করা যাবে না। এ বিষয়ে ইমামগণের কারো দ্বিমত নেই।[৩]

হারাম অবস্থায় স্ত্রীর সাথে সহবাস করলে

যে সব অবস্থায় নিজের স্ত্রীর সাথে সহবাস করা হারাম (যেমন-হায়েয কিংবা রোযা বা ইহরামরত অবস্থা), কেউ যদি এ সব অবস্থায় তার সাথে সঙ্গম করে তার ওপরও হদ্দ জারি করা যাবে না।[৪]

ব্যভিচারের অপরাধ একজন স্বীকার করলে এবং অন্যজন অস্বীকার করলে

ব্যভিচারের অপরাধ একজন স্বীকার করলে এবং অন্য জন অস্বীকার করলে যিনি স্বীকারোক্তি দিবেন তার ওপর হদ্দ কার্যকর করা হবে। এতে করে তার গুনাহের কাফফারা হয়ে যাবে বলে একাধিক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। অপর দিকে যিনি ব্যভিচারের অপরাধ অস্বীকার করবেন বিচারক তাকে খালাস দিয়ে দিবেন। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, সাহল ইবন সা'আদ (রা.) নবী করীম (সা.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, এক ব্যক্তি নবী (সা.)-এর কাছে এসে স্বীকার করে যে, সে অমুক মহিলার সাথে যিনা করেছে, সে তার নামও উল্লেখ করে। তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) সে মহিলাকে এনে

---

[১] সাইয়্যেদ সাবেক, *প্রাগুক্ত*, ৩৩৬
[২] আল-কাসানী, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ৩৭; আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ৮৭
[৩] ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ৫৫
[৪] আল-কাসানী, *বদা'ইয়ুস সনা'ই*, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ৩৫

সে ব্যাপারে তাকে জিজ্ঞাসা করলে, সে তা অস্বীকার করে। তখন নবী (সা.) সে ব্যক্তিকে বেত্রাঘাত করার নির্দেশ দেন এবং সে মহিলাকে ছেড়ে দেন।[১]

পাগল মেয়ে, নাবালিগা, নেশাগ্রস্ত ব্যক্তির সাথে যিনার বিধান

বাংলাদেশের সংবিধানে নারী ও শিশু আইনে নারী ও শিশুর অধিকার সংরক্ষণ করেছে এবং আঠার বছর বয়সের কম সবাইকে শিশু হিসেবে অভিহিত করেছে। এজন্য যদি কোন প্রাপ্ত বয়স্ক ও সুস্থ মস্তিষ্ক সম্পন্ন পুরুষ সঙ্গমের উপযোগী কোন ছোট মেয়ের সাথে সঙ্গম করে তাহলে তার ওপর যিনার হদ্দ কার্যকর করা হবে। যদি মেয়ে এতই ছোট হয় যে, সে স্বাভাবিকভাবে সঙ্গমের উপযোগী নয়, তাহলে যিনাকারীর ওপর হদ্দ কার্যকর করা যাবে না। তেমনিভাবে মেয়েটির ওপরও হদ্দ কার্যকর করা যাবে না।[২] যদি কোন প্রাপ্ত বয়স্ক ও সুস্থ মস্তিষ্ক সম্পন্ন পুরুষ কোন পাগল মেয়ের সাথে সঙ্গম করে, তার ওপর হদ্দ কার্যকর করা হবে। তবে মেয়েটির ওপর হদ্দ কার্যকর করা যাবে না।[৩] নেশাগ্রস্ত ও মাতাল অবস্থায় কোন ব্যক্তি কোন নারীর সাথে সঙ্গম করলে তা যিনার আওতায় পড়বে এবং অপরাধীর ওপর যিনার হদ্দ কার্যকর করতে হবে।[৪] হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, একদা উমার (রা.) এর নিকট একজন পাগলীকে উপস্থিত করা হয়, যে যিনা করেছিল। তিনি সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করে, তাকে পাথর মেরে হত্যার নির্দেশ দেন। এ সময় আলী (রা.) সেখানে উপস্থিত হয়ে সে মহিলা সম্পর্কে জানতে চান। তখন তাকে বলা হয়ঃ সে অমুক গোত্রের একজন পাগল মাহিলা। সে যিনা করায়, তাকে পাথর মেরে হত্যার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তখন আলী (রা.) বলেন, তাকে ফিরিয়ে আনো। উক্ত মহিলাকে ফিরিয়ে আনা হলে, আলী (রা.) উমার (রা.) এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলেন, হে আমীরুল মুমিনিন! আপনি কি অবগত নন যে, তিন ধরনের ব্যক্তি হতে কলম উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে? তারা হলোঃ

(১) পাগল যতক্ষণ না সে সুস্থ হয়
(২) নিদ্রিত ব্যক্তি যতক্ষণ না সে জাগ্রত হয় এবং
(৩) নাবালেগ ছেলে মেয়ে যতক্ষণ না তারা বালেগ হয়।

তখন উমার (রা.) বলেন, হ্যাঁ। আলী (রা.) জানতে চান, তবে কেন এই পাগলীকে পাথর মেরে হত্যা করা হচ্ছে? তখন উমার (রা.) বলেন, এখন আর এরূপ করা হবে না। আলী (রা.) বলেন, আপনি তাকে ছেড়ে দিন। তখন উমার (রা.) তাকে ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ প্রদান করেন এবং তাকবীর পাঠ করতে থাকেন।[৫]

ঘুমন্ত মহিলাদের সাথে যিনার বিধান

ঘুমন্ত মহিলাদের সাথে কেউ যিনা করলে তাতে তার ওপর হদ্দ কার্যকর হবে না।[৬] হযরত সা'ঈদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, স্বামীহীনা জনৈকা গর্ভবর্তী মহিলাকে হযরত 'উমার (রা.) এর দরবারে হাযির করা হল। মহিলাটি হযরত 'উমার (রা.) কে বলল, তার খুব গভীর ঘুম হত। একদিন এ অবস্থায় একজন লোক রাতে তার ঘরে প্রবেশ করে

---

[১] আবু দাউদ সুলায়মান ইবনুল আশ'আছ আস সিজিস্তানি রহ., *আবূ দাউদ শরীফ*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা : হাদীস নং ৪৪০৭
[২] আল-মরদাভী, *আল-ইনসাফ*, প্রাগুক্ত, খ. ১০, পৃ. ১৭২, ১৮৭; আল-কাসানী, *বদা'ইয়ুস সনা'ই*, প্রাগুক্ত, খ.৭, পৃ. ৩৪
[৩] আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ৫৪৪
[৪] ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, খ.৪, পৃ.২৮৯; যায়ল'ঈ, *তাবয়ীন*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ১৯৮
[৫] আবু দাউদ সুলায়মান ইবনুল আশ'আছ আস সিজিস্তানি রহ., *প্রাগুক্ত*, ৪৩৪৭
[৬] ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ৬২

ঘুমন্ত অবস্থায় তার সাথে সঙ্গম শুরু করে। সে জেগে দেখতে পায় যে, লোকটি কাজ সেরে চলে গেছে। হযরত ‘উমার (রা.) মহিলাটির কথা গ্রহণ করে তাকে ছেড়ে দিয়েছিলেন।[১]

পুরুষদের সমকামিতার শাস্তির বিধান

সমকামিতাকে ইংরেজীতে বলা হয় ‘Homosexuality’। একই লিঙ্গের দু’জন যদি যৌনতায় লিপ্ত হয় তবে তাকে সমকামিতা বলা হয়। হানাফীগণের মতে, দু’জন পুরুষ পরস্পর সমকামিতায় লিপ্তহলে তাদের ওপর হদ্দ কার্যকর করা হবে না; তবে তাদেরকে তাযীর করা হবে এবং বন্দী করা হবে, যতক্ষণ না তারা তাওবা করে স্বাভাবিক সুস্থ জীবন ধারায় ফিরে আসে কিংবা মৃত্যুবরণ করে। ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর মতে, সমকামি দুজনকেই তাযীর হিসেবে শাসক প্রয়োজন মনে করলে জ্বালিয়ে মেরে ফেলতে পারবে। ইবনল কাইয়িমও এ মত পোষণ করেন এবং ইবন হাবীব আল-মালিককীর মতে, তাদেরকে জ্বালিয়ে মারা ওয়াজিব।[২]

তবে অধিকাংশ ইমামের মতে, যেহেতু দুনিয়ায় কোন মানুষকে আগুনে পুড়িয়ে শাস্তি দেয়া জায়িয নেই, তাই সমকামিদেরকেও আগুনে পুড়িয়ে মেরে ফেলা জায়িয নয়।[৩] যদি কেউ সমকামিতায় অভ্যস্ত হয়ে পড়ে, তাহলে বিচারক রাষ্ট্রের স্বার্থ বিবেচনা করে তাকে মৃত্যুদণ্ড দিতে পারবে, চাই সে বিবাহিত হোক কিংবা অবিবাহিত। তবে যেহেতু এ সমকামিতা যিনার সংজ্ঞার আওতায় পড়ে না, তাই এ প্রকার অপরাধীর জন্য যিনার হদ্দ প্রযোজ্য হবে না।[৪]

ইমাম আবূ ইউসূফ ও ইমাম মুহাম্মদ এবং হাম্বলীগণের মতে, সমকামি দুজনের ওপর যিনার হদ্দ কার্যকর করা হবে। যদি তারা অবিবাহিত হয়, তাহলে তাদেরকে বেত্রাঘাত করা হবে। আর যদি বিবাহিত হয়, তাহলে প্রস্তর নিক্ষেপ করে হত্যা করা হবে।[৫] মালিকীগণের মতে, তারা বিবাহিত হোক কিংবা অবিবাহিত সর্বাবস্থায় তাদেরকে প্রস্তর নিক্ষেপ করে হত্যা করা হবে। তাঁদের কথার দলীল হল, হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, “যদি তোমরা কাউকে হযরত লূত (আ.) এর সম্প্রদায়ের গর্হিত অপকর্ম করতে দেখ, তা হলে কর্তা ও যার সাথে এ কর্ম সম্পাদিত হয়-দুজনকেই হত্যা কর।” [৬]শাফি’ঈগণের মতে, সমকামি কর্তার ওপর যিনার হদ্দ কার্যকর করা হবে আর অপরজনকে বেত্রাঘাত করা হবে এবং নির্বাসন দণ্ড দেয়া হবে, বিবাহিত হোক কিংবা অবিবাহিত।[৭]

মহিলাদের সমকামিতার শাস্তির বিধান

ইসলামী শরীয়াতের পরিভাষায় মহিলাদের সমকামিতাকে ‘সিহাক’ বলা হয়, ইংরেজিতে বলা হয় ‘Lesbian’। অর্থাৎ দু’জন নারী মিলে পরস্পর নারী-পুরুষের মিলনের মতো আচরণ করা। মহিলাদের সমকামিতাও একটি গর্হিত কাজ।

---

[১] ইবনু হাজর আল-আসকালানী, *ফাতহুল বারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১২, পৃ. ১৫৪
[২] ড. আহমদ আলী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৮
[৩] *আল-মাওসূ’আতুল ফিকহিয়্যাহ*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১২১
[৪] ইব্নু আবিদীন, *রাদ্দুল মুহতার*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২৭; আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ৭৭
[৫] ইবনু মুফলিহ, *আল-ফুরূ*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৭০; আল-মরদাভী, *আল-ইনসাফ*, প্রাগুক্ত, খ. ১০, পৃ. ১৭৬
[৬] আল-বাজী, *আল-মুন্তকা*, প্রাগুক্ত, খ.৭, পৃ.১৪১; সুলাইমান আবূ দাউদ, *আস-সুনান* , কিতাবুল হুদূদ, হা.নং. ৪৪৬২; আল-হাকিম, আল-মুস্তাদরাক, হা.নং. ৮০৪৭, ৮০৪৮, ৮০৪৯
[৭] ইমাম মুহাম্মদ ইবনু ইদ্রিস শাফি’ঈ, *আল-উম্ম*, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ১৯৩

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "মহিলাদের সমকামিতাও যিনাবিশেষ।"[১] ইবন হাজর আল আসকালানী (রহ.) এ কাজকে কবীরা গুনাহ হিসেবে গণ্য করেন। তবে এ বিষয়ে ইমামগণ একমত যে, এ কাজ যেহেতু যিনা নয়, তাই এ কাজের জন্য যিনার হদ্দ প্রযোজ্য হবে না। তবে তা একটি গুনাহের কাজ হওয়ায় এর জন্য তাযীর করা ওয়াজিব হবে।[২]

মুহরিম রমণীর সাথে ব্যভিচারের শাস্তি বিধান

মুহরিম বা মাহরাম বলা হয়, যাদেরকে বিবাহ করা হারাম বা অবৈধ এবং দেখা করা বা দেখা দেওয়া জায়েয বা বৈধ। মুহরিম রমণীর সাথে কোনো পুরুষ ব্যভিচারে লিপ্ত হলে ঐ পুরুষকে শিরশ্ছেদ করা হচ্ছে ইসলামরে বিধান। এর সাথে সাথে তার সকল সম্পদ রাষ্ট্র বাজেয়াপ্ত ঘোষণা করবে। আর ঐ রমণী যদি স্বেচ্ছায় মুহরিম পুরুষের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হয় তাহলে তার ওপর হদ্দের শাস্তি কার্যকর করা হবে। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে,

বারা ইবন আযিব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার চাচার সাথে সাক্ষাৎ করি, যার হাতে একটি পতাকা ছিল। তখন আমি তাকে জিজ্ঞাসা করি, আপনি কোথায় যাচ্ছেন? তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাকে এমন এক ব্যক্তির কাছে পাঠাচ্ছেন, যে তার সৎ-মাকে বিয়ে করেছে। তিনি আমাকে তার শিরশ্েছদ করতে এবং তার ধন-সম্পদ নিয়ে নিতে নির্দেশ দিয়েছেন।[৩]

পশুর সাথে সঙ্গমের বিধান

মানুষ ব্যতীত অন্য কোনো প্রণির সাথে সঙ্গম করা অত্যন্ত বিকৃত রুচির কাজ। সুস্থ রুচিসম্পন্ন কারো পক্ষে এ ধরনের হীন কাজ করা সম্ভব নয়। অধিকাংশ ইমামের মতে, কেউ কোন পশুর সাথে ব্যভিচার করলে তার ওপর যিনার হদ্দ আরোপ করা যাবে না; তবে তাযীর করা হবে। হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "যে কেউ কোন জানোয়ারের সাথে সঙ্গম করবে, তার ওপর কোন হদ্দ নেই।"[৪] তাই হদ্দ প্রয়োগের মাধ্যমে এ কাজ থেকে লোকদেরকে বিরত রাখার প্রয়োজন পড়ে না।[৫]

সঙ্গমকৃত পশুটিকে নিয়ে কী করা হবে এ ব্যাপারে ইমামগণের মাঝে মতভেদ রয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) ও মালিকী ইমামগণের মতে, পশুটিকে হত্যা করার দরকার নেই। যদি জন্তুটি যবেহ করা হয়, তাহলে তার মাংস খেতে কোন অসুবিধা নেই, যদি তা খাবারযোগ্য প্রাণি হয়। তবে ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) প্রমুখ মাংস খেতে নিষেধ করেছেন। তাঁদের মতে, জন্তুটিকে যবেহ করে আগুনে পুড়িয়ে ফেলা হবে, যাতে পরবর্তীতে কেউ এ জন্তু দেখে ঘটনাটিকে নতুনভাবে চাঙ্গা করতে না পারে।[৬] রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, "যে কোন পশুর সাথে সঙ্গম করল, তাকে ও পশুটিকে হত্যা করো।"[৭]

---

[১] *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ*, প্রাগুক্ত, খ. ২৪, পৃ. ২৫২

[২] আল-বাজী, *আল-মুন্তকা*, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ১৪২; আল-আসনারী, *আসনাল মাতালিব*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১২৬

[৩] আবু দাউদ সুলায়মান ইবনুল আশ'আছ আস সিজিস্তানি রহ., *আবূ দাউদ শরীফ*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা : হাদীস নং ৪৩৯৮

[৪] আল-হাকিম, *আল-মুস্তাদরাক*, হা.নং : ৮০৫১

[৫] আল-কাসানী, *বদা'ইয়ুস সনা'ই*, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ৩৪; ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৫৯। শাফি'ঈগণের এক মতানুযায়ী তার ওপর যিনা হদ্দ কার্যকর করা হবে। আর অন্য মতানুসারে তাকে হত্যা করা হবে। চাই সে বিবাহিত হোক কিংবা অবিবাহিত। আল-হায়তমী, *তুহফাতুল মুহতাজ*, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ১০৬

[৬] মোঃ মাহবুবুল আলম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭২

[৭] আল বায়হাকী, *আস-সুনান* আল-কুবরা, প্রাগুক্ত, হা.নং; ১৬৮১৪; দারু কুতনী, *আস-সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল হূদূদ, হা.নং: ১৪৩

শাফি'ঈগণের অন্য একটি মতানুসারে, যদি পশুটি খাবারযোগ্য প্রাণি হয়, তাহলে যবেহ করতে হবে, তবে তার গোশ্ত খাওয়া হারাম। উল্লেখ্য যে, পশুর সাথে সঙ্গম যিনা না হলেও তা একটি ঘৃণিত অপরাধ। তাই আদালত তাযীরের আওতায় তাকে যে কোন উপযোগী শাস্তি দিতে পারবে। রাসূলুল্লাহ (সা.) উপর্যুক্ত হাদীসটিতে কঠোরভাবে সর্তক করার জন্য হত্যার কথা বলেছেন।[1]

পশ্চাদ্বারে সংগম

ইমামদের উল্লেখযোগ্য অংশের মতে, নিজ স্ত্রী ব্যতীত কোনো নারীর পশ্চাদ্বারে সংগম করলে তা ব্যভিচারের আওতায় শাস্তিযোগ্য হবে না। তবে তা অবশ্যই তাযীরের শাস্তির কারণ।

সঙ্গম ব্যতীত অন্যান্য অপরাধ করলে

কোনো পুরুষ যদি কোনো রমণীর সাথে সঙ্গমের পূর্বে স্পর্শ, চুম্বন ইত্যাদি করে এবং সঙ্গম না করেই স্বেচ্ছায় উঠে যায় তবে তার উপর হদ্দের শাস্তি কার্যকর করা যাবে না। এটাই অধিকংশ মত। তবে কতিপয় ইমামের মতে বিচারক চাইলে তার ওপর তাযীরি শাস্তি কার্যকর করতে পারবেন। আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

এক ব্যক্তি নবী করীম (সা.)-এর নিকট এসে বলে যে, মদীনার পার্শ্ববর্তী এলাকায় আমার সাথে একজন মহিলার দেখা হলে আমি তার সাথে সঙ্গম ব্যতীত আর সবই করেছি। এখন আমি আপনার কাছে উপস্থিত আপনি যা ইচ্ছা করেন, সে শাস্তি আমাকে দেন। তখন উমর (রা.) বলেন, আল্লাহ্ তোমার ব্যাপারটি গোপন রেখেছিলেন, যদি তুমি তা গোপন রাখতে! নবী করীম (সা.)-এর কোন উত্তর দেননি।

এরপর লোকটি চলে গেলে নবী (সা.) তাকে ডেকে আনার জন্য এক ব্যক্তিকে পাঠান। তাকে ডেকে আনার পর নবী (সা.) এ আয়াত তিলাওয়াত করে শোনানঃ তুমি দিনের দু'অংশে (ফজর, জোহর ও আসর) এবং রাতের আঁধারে (মাগরিব ও ঈশার) সালাত আদায় করবে। কেননা, ভাল কাজ মন্দ কাজকে বিনষ্ট করে দেয়। তখন উপস্থিত লোকদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করেঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ নির্দেশ কি এ ব্যক্তির জন্য খাস, না সকলের জন্য? তিনি বলেন, বরং এ নির্দেশ সর্বকালের সব লোকের জন্য।[2]

ইসলাম মানুষের চারিত্রিক পরিশুদ্ধতার ব্যাপপরে অত্যন্ত গুরুত্বারোপ করেছে। চরিত্র নষ্টকারী সকল উপকরণ ইসলামে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। যৌন অপরাধ মানুষের চরিত্র বিধ্বংসী বিষয়গুলোর মধ্যে অন্যতম। যে কারণে ইসলাম অত্যন্ত কঠোর ভাষায় সকল প্রকার যৌন অপরাধ অত্যন্ত কঠোর ভাষায় নিষিদ্ধ করেছে। যৌন অপরাধে লিপ্ত ব্যক্তির জন্য কঠোর শাস্তির ঘোষণা দেওয়া হয়েছে।

ব্যভিচারের অপবাদ

মিথ্যা একটি ভয়াবহ জঘন্য পাপের কাজ। এর কারণে সমাজে সৃষ্টি হয় পারস্পরিক অনাস্থা ও অবিশ্বাস। যার শেষ পরিণতি হচ্ছে হিংসা-বিদ্বেষ, সামাজিক শান্তি, শৃঙ্খলা ও সংহতি বিনষ্ট হওয়া। যে কারণে ইসলামে সব ধরনের মিথ্যা

---

[1] ইবনুল হুমাম, *ফাতহুল কাদীর*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২৬৫-৫; ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ৫৯-৬০

[2] আবু দাউদ সুলায়মান ইবনুল আশ'আছ আস সিজিস্তানি রহ., *আবূ দাউদ শরীফ*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা : হাদীস নং ৪৪০৯

কথা, কাজকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। মহানবী (সা.) মিথ্যাকে সকল পাপের জননী হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। মিথ্যাবাদীর শেষ পরিণতি হচ্ছে জাহান্নামের ভয়াবহ শাস্তি। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে,

ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, তোমরা অবশ্যই সত্যকে অবলম্বন করবে। কেননা সত্য সৎ কর্মের দিকে ধাবিত করে আর সৎকর্ম ধাবিত করে জান্নাতের দিকে। কোন ব্যক্তি যদি সত্য বলতে থাকে এবং সত্যের প্রতি সদা মনযোগ রাখতে থাকে শেষ পর্যন্ত আল্লাহর কাছেও সিদ্দীক হিসাবে তার কথা লিপিবদ্ধ হয়। তোমরা মিথ্যার থেকে বেঁচে থাকবে, কেননা মিথ্যা অন্যায়ের দিকে নিয়ে যায়, আর অন্যায় নিয়ে যায় জাহান্নামের দিকে। কোন বান্দা যখন মিথ্যা বলতে থাকে এবং মিথ্যার প্রতিই তার খেয়াল থাকে এমন কি শেষ পর্যন্ত আল্লাহর কাছেও কাযযাব (অতি মিথ্যাবাদী) বলে তার নাম লিপিবদ্ধ হয়।[১]

কারো বিরুদ্ধে যিনার অসত্য অভিযোগ তোলা মিথ্যার থেকেও জঘন্য অপরাধ। মুসলিম সমাজে কোন চরিত্রবান পুরুষ বা নারীকে যিনার অপবাদ দেয়া মারাত্মক দুঃখজনক ব্যাপার। অভিযুক্ত ব্যক্তির ওপর এবং সাথে সাথে গোটা সমাজের ওপর এর প্রচণ্ড খারপ প্রতিক্রিয়া প্রতিফলিত হয়ে থাকে। অভিযুক্ত ব্যক্তির লজ্জা ও লাঞ্ছনার কোন সীমা থাকে না। জনগণের আস্থা থেকে সে চিরদিনের তরে বঞ্চিত হয়ে যায়। এই অবস্থা আরো মর্মান্তিক হয়ে দেখা দেয়, যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি কোন মেয়ে হয়। এ কলঙ্ক শুধু তাকেই ক্ষত-বিক্ষত করে না, তার পিতৃ পুরুষ ও তার গর্ভজাতদের মুখকেও কালিমা লিপ্ত করে। আর অবিবাহিতা হলে তো তার পক্ষে বিবাহিতা হওয়ার আশা চিরতরে খতম হয়ে যায়।[২]

ব্যভিচারের মিথ্যা অভিযোগের ফলে ভুক্তভোগীর ওপর জনসমাজে জঘন্য ও কুৎসিত চরিত্রের কালো ছায়াপাত ঘটে। যা তার জন্য সীমাহীন দুঃখ-দুর্দশার কারণ। হযরত আয়েশা (রা.)-এর ওপর অপবাদের কালিমা লেপন করা হলে তিনিও চরম ব্যথিত হয়েছিলেন। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, আয়েশা (রা.) এর মা উম্মে রুমান (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন আয়েশা (রা.) এর উপর মিথ্যা অপবাদ দেওয়া হল তখন তিনি বেহুঁশ হয়ে পড়লেন।[৩]

অপবাদ আরোপ হারাম

মানুষের জীবন, সম্পদ, সম্ভ্রম সব কিছুই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মানুষের এই তিনটি বিষয় সংরক্ষণ ইসলামের একটা অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। জীবন ও সম্পদ যেমনিভাবে গুরুত্বপূর্ণ, সম্ভ্রমও মানুষের জন্য তেমনি গুরুত্বপূর্ণ। মহানবী (সা.) তাঁর বিদায় হজ্জের ভাষণে জীবন ও সম্পদের পাশাপাশি সম্ভ্রমের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ব্যাপারে কঠোর ভাষায় নির্দেশ দিয়েছেন।

মানুষের সুনাম ও সম্মান সংরক্ষণ ইসলামের দৃষ্টিতে অতীব জরুরি। এ উদ্দেশ্যেই ইসলাম কুৎসা রটনাকারীদের জিহ্বাকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করে এবং নিরপরাধ লোকদের দোষ অন্বেষণের পথ রোধ করে। অসংযত লোকেরা যাতে মানুষের আবেগ ও অনুভূতিকে আহত করতে ও তাদের মান সম্মানের হানি ঘটাতে না পারে, সেজন্য ইসলাম গ্রহণ করেছে কঠোর প্রতিরোধ ব্যবস্থা। সর্বাধিক কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছে মুমিনদের মধ্যে অশ্লীলতা বেহায়াপনা ও ব্যভিচারে বিস্তার ঘটানোকে; যাতে সমাজ জীবন এই ঘৃণ্য পাপাচার থেকে পবিত্র ও মুক্ত থাকে। এই উদ্দেশ্যেই ইসলাম

---

[১] আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা আত-তিরমিযী রহ., *তিরমিযী শরীফ*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা : হাদীস নং ১৯৭৭

[২] ড. আহমদ আলী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫২

[৩] আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল বুখারী আল জুফী রহ., *বুখারী শরীফ*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা : হাদীস নং ৪৩৯২

ব্যভিচারের অপবাদ আরোপকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছে। এটিকে একটি কবীরা গুনাহ ও জঘন্য অশ্লীলতা বলে আখ্যায়িত করেছে।[১] হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, আবূ হুরায়রা (রা.) সূত্রে নবী (সা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সাতটি ধ্বংসকারী বিষয় থেকে তোমরা বিরত থাকবে। সাহাবীগন বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সেগুলো কি? তিনি বললেন, (১) আল্লাহর সঙ্গে শরীক করা। (২) যাদু (৩) আল্লাহ তায়ালা যাকে হত্যা করা হারাম করেছেন, শরীয়ত সম্মত কারণ ব্যতিরেকে তাকে হত্যা করা (৪) সুদ খাওয়া (৫) ইয়াতীমের মাল গ্রাস করা (৬) রণক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যাওয়া এবং (৭) সরল প্রকৃতির সতী মুমিন নারীদের অপবাদ দেওয়া।[২]

কাযাফ

'কাযফ' (قذف) এর আভিধানিক অর্থ হল নিক্ষেপ করা, দুর্নাম করা উৎক্ষেপন করা।[৩] কাউকে গালি দেয়া, দোষারোপ করার অর্থেও শব্দটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে।[৪] কোনো বালেগ ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি অপর কোনো বালেগ ও বুদ্ধিমান ব্যক্তির বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অভিযোগ উত্থাপন করে চারজন পুরুষ বালেগ ও বুদ্ধিমান সাক্ষী দ্বারা প্রমাণ করতে ব্যর্থ হলে উক্ত অভিযোগই কাযাফ।[৫] ইসলামী শরীয়াতের পরিভাষায়, কোন পুরুষ বা নারীর বিরুদ্ধে স্পষ্টভাবে কিংবা ইঙ্গিতে যিনার অপবাদে আরোপ করাকে 'কাযফ' বলা হয়।[৬] অনুরূপভাবে কোন পুরুষের বিরুদ্ধে সমকামিতা বা পশুর সাথে সঙ্গম কিংবা কোন মহিলার সাথে পশ্চাদ্দার দিয়ে সঙ্গমক্রিয়ার অভিযোগ আরোপও 'কাযাফ' এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে।[৭]

অপবাদের শাস্তি

কারো বিরুদ্ধে অপবাদ দেওয়া হলে তা প্রমাণের নির্ধারিত পদ্ধতি ইসলামী আইনে বর্ণিত আছে। মূলত অপবাদ প্রমাণের শরীয়াত গ্রহণযোগ্য একমাত্র মাধ্যম হচ্ছে সাক্ষ্য আইন। যে কোন ব্যক্তি অপর কোন পুরুষ বা নারীর বিরুদ্ধে যিনা বা সমকামিতার অভিযোগ উত্থাপন করে তা চারজন উপযুক্ত সাক্ষী দ্বারা প্রমাণ করতে না পারলে উক্ত অভিযোগ অপবাদ হিসেবে গণ্য হবে।[৮] এবং অভিযোগকারীকে আশিটি বেত্রাঘাতের দণ্ড দেয়া হবে এবং চিরদিনের জন্য তাদের কোন সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে না।[৯] আল্লাহ তায়ালা বলেন, "যারা সতী-সাধ্বী নারীর প্রতি যিনার অভিযোগ আরোপ করে, পরে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করে না, তাদেরকে আশিটি কোড়া মার। উপরন্তু, তাদের সাক্ষ্য কখনোই গ্রহণ করবে না। তারা ফাসিক। তবে যারা এরপর তাওবা করবে এবং নিজেদের সংশোধন করে নেবে, নিশ্চয়ই আল্লাহ (তাদের জন্য) ক্ষমাশীল, অতীব দয়াবান।"[১০]

---

[১] সাইয়্যেদ সাবেক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫১

[২] আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল বুখারী আল জুফী রহ., *বুখারী শরীফ*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা : হাদীস নং ২৫৭৮

[৩] ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আরবী-বাংলা ব্যবহারিক অভিধান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮০

[৪] ইবনু মানযূর, *লিসানুল আরব*, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ২৭৭

[৫] মাওলানা মুহাম্মদ মূসা ও মাওলানা মোঃ মোজাম্মেল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৪৬

[৬] ইবনু নুজায়ম, *আল-বাহরুর রা'ইক*, প্রাগুক্ত, ক. ৫, পৃ. ৩২; আল-বাবরতী, *আল-ইনায়াহ*, খ. ৫, পৃ. ৩১৭ । মালিকীগণের মতে 'কাযফ' হলকোন বালিগ ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি অপর কোন বালিগ ও বুদ্ধিমান মুসলমানকে যিনার অপবাদ দেয়া কিংবা কারো পিতৃ পরিচয় অস্বীকার করা; আল-খারাশী, *শারহু মুখতাছারি খলীল*, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৮৬; আল-মাওয়াক, *আত-তাজ ওয়াল ইকলীল*, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৪০১-২

[৭] ইবনু আবী শায়বাহ, *আল-মুছান্নাফ*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৪৯৬, ৫৮১; ইমাম মালিক, *আল-মুদাওয়ানাহ*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৪৮৬, ৫০১

[৮] মাওলানা মুহাম্মদ মূসা ও মাওলানা মোঃ মোজাম্মেল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৪৭

[৯] ড. আহমদ আলী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৬

[১০] আল কুরআন, ২৪ : ৪-৫

উপরে উল্লিখিত আয়াতে শুধুমাত্র মহিলাদের প্রতি ব্যভিচারের অভিযোগের কথা বলা হয়েছে। তবে সকল ইমাম একমত যে, পুরুষদের প্রতি ব্যভিচারের অভিযোগ করা হলেও একই হুকুম প্রযোজ্য হবে।

উপরে উল্লিখিত কুরআন কারীমের আয়াত থেকে থেকে দুনিয়াতে 'কায্ফ' এর তিন প্রকারের শাস্তির কথা জানা যায়।

১. একটি হল ৮০টি বেত্রাঘাত।
২. অপর শাস্তি হল-সাক্ষ্য প্রত্যাখান।
৩. তারা সমাজে ফাসিক হিসেবে পরিচিত হবে।

সমকামিতার অপবাদের শাস্তি

অধিকাংশ ইমামের মতে, ব্যভিচারের শাস্তিই সমকামিতার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। যেহেতু উভয় অপরাধের ধরন প্রায় এক এবং উভয় অপরাধই যৌনতার সাথে সম্পর্কিত। তবে ইমামগণের একটি দল মনে করেন যে, ব্যভিচারের ক্ষেত্রে হদ্দ-এর শাস্তি কার্যকর করা হলেও সমকামিতার ক্ষেত্রে তাযীর শাস্তি প্রয়োগ করা হয়। মূল অপরাধের ক্ষেত্রে যেহেতু শাস্তির ভিন্নতা রয়েছে, অতএব অপরাধের ক্ষেত্রেও শাস্তির ভিন্নতা গ্রহণযোগ্য হবে। তাদের মতে সমকামিতার অপবাদদানকারীকে বিশটি বেত্রাঘাত করতে হবে। যেহেতু হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী (সা.) বলেন, কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে "হে মুখান্নাস" (নপুংসক) বললে তাকে বিশটি বেত্রাঘাত করো এবং কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে "হে লূতী" (সমকামি) বললে তাকেও বিশটি বেত্রাঘাত করো।[১]

অপবাদ আরোপকারীর সাক্ষ্য প্রসঙ্গ

চার মাযহাবের প্রায় সকল ইমামই এ বিষয়ে একমত যে, তাওবা ব্যতীত অপবাদ আরোপকারীর কোন সাক্ষ্যই কখনো গ্রহণযোগ্য হবে না। মুসলিম সমাজে সারা জীবন ফাসিক হিসেবেই সে পরিচিত থাকবে। আর যদি অপবাদদানকারী ব্যক্তি তাওবা করে তাহলেও কি সে সারা জীবন ফাসিক হিসেবেই পরিচিত থাকবে কিনা এবং তার কোন সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে কিনা- এ ব্যাপারে ইমামগণের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে।

ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)সহ অধিকাংশ হানাফী ইমামগণের মতে, ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদ আরোপকারী তাওবা করলের তার থেকে ফাসিকের কলঙ্ক মুছে যাবে। তবে কখনোই তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না।[২] যেহেতু মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে (ابدا) চিরদিনের জন্য শব্দের ব্যবহার করেছেন। সুতরাং তাদের সাক্ষ্য চিরদিনের জন্য গ্রহণযোগ্য হবে না, যদিও সে তাওবা করে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "অপবাদের দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তি ছাড়া মুসলিমরা একে অপরের জন্য ন্যায়পরায়ণ।"[৩] অপবাদ আরোপকারীর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না এ হাদীস থেকেও স্পষ্ট তা বলে দেওয়া হয়েছে। হানাফী ইমামগণের পাশাপশি আওযায়ি, সাওরী, হাসান, সাইদ ইবনে মুসাইয়্যেব, ইবরাহীম নাখয়ী প্রমুখ ইমামগণও এই মতই পোষণ করেছেন।[৪]

---

[১] আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনু ইয়াজিদ ইবনু আবদুল্লাহ ইবনু মাজাহ রহ., *ইবনে মাজাহ শরীফ*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা : হাদীস নং ২৫৬৮

[২] জাসসাস, *আহকামূল কুরআন*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৩৯৯-৪০১

[৩] বাইহাকী, *আস-সুনান* আল-কুবরা, প্রাগুক্ত, হা.নং. ১৬৯২৪; দারু কুতনী, *আস-সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল আকদিয়্যাহ, হা.নং. ১৫, ১৬

[৪] সাইয়্যেদ সাবেক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫৬

ইমাম শাফেয়ী (রহ.)সহ অন্যান্য ইমামগণের মতে, তাওবার পর ফাসিকের কলঙ্ক মুছে যাবার সাথে তাদের সাক্ষ্যও গ্রহণযোগ্য হবে। তাদের দলীল হল, তাওবাহ করার কারণে যাবতীয় পাপ মুছে যায়।[১] রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, “পাপকর্ম থেকে তাওবাকারী এমন ব্যক্তির মতো হয়ে যায়, যার কোন পাপ নেই।”[২]

এ হাদীসের বক্তব্যের প্রেক্ষিতে তাঁরা বলেন, কুফরী অপবাদ থেকেও বড় অপরাধ। কাফির তাওবা করে মুসলিম হলে যদি তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হয়, তাহলে মুসলিম তাওবা করলে তার সাক্ষ্যও গ্রহণযোগ্য হবে। তাদের সাক্ষ্য গ্রহণেও কোন আপত্তি থাকবে না। এ প্রসঙ্গে হানাফীগণের মতটিই অধিকতর বিশুদ্ধ ও যুক্তিযুক্ত মনে হয়। কেননা খালিস তাওবার ব্যাপারটি আল্লাহ ছাড়া কারো পক্ষে নিশ্চিতভাবে জানা সম্ভব নয়। যদি তারা খালিস তাওবাই করে থাকে তাহলে তারা পরকালে অবশ্যই নাজাত পাবে।[৩] লায়েস, আতা, শাবি, যুহরী প্রমুখ ইমাম এই মত সমর্থন করেছেন।

কাযাফ প্রমাণ পদ্ধতি

কাযাফ তিনটি উপায় প্রমাণিত হতে পারে। যথা- (১) অপবাদকারীর স্বীকারোক্তির দ্বারা (২) দু'জন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির সাক্ষ্য দ্বারা (৩) শপথ করতে অস্বীকার করা হলে

ব্যভিচারের সাক্ষ্য প্রত্যাহার করলে

ইসলামী আইনে ব্যভিচার প্রমাণিত হয় চারজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির সাক্ষ্য দ্বারা। এক্ষেত্রে সাক্ষ্যদানের পর রায় কার্যকর করার পূর্বে বা পরে কোনো একজন সাক্ষ্য তার সাক্ষী প্রত্যাহার করলে অথবা কোনো সাক্ষীর অযোগ্যতা প্রমাণিত হলে সকল সাক্ষী কাযাফের শাস্তি ভোগ করবে। রায় কার্যকর করার পর সাক্ষীর ত্রুটি ধরা পড়লে ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষকে বায়তুল মালের পক্ষ থেকে ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে হবে।[৪]

স্ত্রীর প্রতি যিনার অপবাদ আরোপের শাস্তি

স্বামী স্ত্রীর বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অভিযোগ আরোপ করলে প্রথমত ব্যভিচার প্রমাণের যে সাধারণ পদ্ধতি অর্থাৎ চারজন সাক্ষীর সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণ করতে হবে। সাক্ষী পাওয়া না গেলে ভিন্ন উপায় এর বিচার সম্পন্ন হবে। স্বামী স্ত্রী উভয়ই তাদের দাবীর পক্ষে মহান আল্লাহর নামে শপথ বাক্য পাঠ করবে। এই প্রক্রিয়াকেই লি'আন বলে।

লি'আন

লি'আন (لعان) শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ হচ্ছে, শাপ, অভিশাপ, অভিসম্পাত, অনিষ্ট কামনা, লানত।[৫] ইসলামী শরীয়াতের পরিভাষায়, কোন স্বামী যদি তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে যিনার অভিযোগ উত্থাপন করে এবং তার কথার স্বপক্ষে

---

[১] ইবনুল আরবী, *আহকামূল কুরআন*, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, খ. ৩, পৃ. ৩৪৫-৬

[২] আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনু মাজাহ, আস সুনান, প্রাগুক্ত, বাব: যিকরুত তাওবাহ, হা.নং. ৪২৫০; বায়হাকী, *আস সুনান আল-কুবরা*, প্রাগুক্ত, হা.নং. ২০৩৪৮, ২০৩৪৯; আবুর কাশিম তাবারানী, *আল-মু'জামূল কাবীর*, হা.নং. ১০২৮১

[৩] ইবনুল আরবী, *আহকামুল কুরআন*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৩৪৫-৬

[৪] মাওলানা মুহাম্মদ মূসা ও মাওলানা মোঃ মোজাম্মেল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫৪-৩৫৫

[৫] ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আরবী-বাংলা ব্যবহারিক অভিধান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩০

প্রয়োজনীয় সংখ্যক সাক্ষী উপস্থাপন করতে না পারে অথবা সে যদি স্ত্রীর গর্ভস্থ সন্তান তার ঔরসজাত নয় বলে দাবী করে, তাহলে প্রত্যেককে নিজ নিজ অবস্থান ও বক্তব্যের পক্ষে বিশেষ পন্থায় আদালতের সামনে শপথ করতে হবে।[১]

লি'আন শুরুর প্রেক্ষাপট

মহানবী (সা.)-এর জীবদ্দশায়ই একাধিক লিআনের ঘটনা ঘটেছে। একাধিক হাদীসে সেসব ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। লিআনের প্রেক্ষপট নিয়েও একাধিক হাদীস রয়েছে। যেমন-হাদীস শরীফে বর্নিত হয়েছে, ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। হিলাল ইবন উমাইয়া রাসুলুল্লাহ এর কাছে শারিক ইবন সাহমার সাথে তার স্ত্রীর ব্যভিচারের অভিযোগ করল। নবী (সা.) বললেন, সাক্ষী (হাযির কর) নতুবা শাস্তি তোমার পিঠে পরবে। হিলাল বলল, ইয়া রাসুলাল্লাহ! যখন আমাদের মধ্যে কেউ তার স্ত্রীর উপর অন্য কাউকে দেখে তখন সে কি সাক্ষী তালাশ করতে যাবে? তখন নবী (সা.) বলতে লাগলেন, সাক্ষী নতুবা শাস্তি তোমার পিঠে। হিলাল বললেন, শপথ সে সত্তার, যিনি আপনাকে সত্য নবী (সা.) হিসেবে পাঠিয়েছেন, নিশ্চয়ই আমি সত্যবাদী। অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা এমন বিধান অবতীর্ণ করবেন, যা আমার পিঠকে শাস্তি থেকে মুক্ত করে দিবেন। তারপর জিবরীল (আলাইহিস সালাম) এলেন এবং রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর উপর নাযিল করা হল, "যারা নিজেদের স্ত্রীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে" থেকে নবী (সা.) পাঠ করলেন, "যদি সে সত্যবাদী হয়ে থাকে" পর্যন্ত।

তারপর নবী (সা.) ফিরলেন এবং তার স্ত্রীকে ডেকে আনার জন্য লোক পাঠালেন।। হিলাল এসে সাক্ষী দিলেন আর রাসুলুল্লাহ (সা.) বলছিলেন, আল্লাহ তায়ালা তো জানেন যে তোমাদের দুজনের মধ্যে অবশ্যই একজন মিথ্যাবাদী। তবে কি তোমাদের মধ্যে কেউ তওবা করবে? স্ত্রী লোকটি দাঁড়িয়ে সাক্ষ্য দিল। সে যখন পঞ্চম বারের কাছে পৌঁছল, তখন লোকেরা তাকে বাঁধা দিল এবং বলল, নিশ্চয়ই এটি তোমার উপর অবশ্যম্ভাবী। ইবন আব্বাস (রা.) বললেন, একথা শুনে সে দ্বিধাগ্রস্ত হল এবং ইতস্তত করতে লাগল। এমনকি আমরা মনে করতে লাগলাম যে, সে নিশ্চয়ই প্রত্যাবর্তন করবে। পরে সে বলে উঠল, আমি চিরকালের জন্য আমার বংশকে কলুষিত করব না। সে তার সাক্ষ্য পূর্ণ করল। নবী (সা.) বললেন, এর প্রতি দৃষ্টি রেখ। যদি সে কালো, ডাগর চক্ষু, বড় পাছা ও মোটা নলা বিশিষ্ট সন্তান প্রসব করে তবে ঐ সন্তান শারিক ইবন সাহমার। পরে সে অনুরূপ সন্তান জন্ম দিল। তখন নবী (সা.) বললেন, যদি এ বিষয়ে আল্লাহর কিতাব কার্যকর না হত, তাহলে অবশ্যই আমার ও তার মধ্যে কি ব্যপার যে ঘটত।[২]

লি'আন করার পদ্ধতি

লি'আনের নিয়ম হল প্রথমে স্বামী এই বলে চারবার শপথ করবে- "আমি আল্লাহর নামে শপথ করে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি এ নারীর বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উত্থাপন করেছি, সে ব্যাপারে আমি নিশ্চয়ই সত্যবাদী।" পঞ্চমবারে অভিযুক্তার প্রতি ইঙ্গিত করে বলবে, আমি এ নারীর বিরুদ্ধে যিনার যে অভিযোগ উত্থাপন করেছি, সে ক্ষেত্রে আমি মিথ্যাবাদী হলে আমার ওপর আল্লাহর লা'নত পতিত হোক"। অতঃপর স্ত্রী এ বলে চারবার শপথ করবে, "আমি আল্লাহর নামে শপথ করে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, এ ব্যক্তি আমার প্রতি যিনার যে অভিযোগ আরোপ করেছে সে ব্যাপারে সে নিশ্চয়ই মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত।" পঞ্চমবারে বলবে, "এই ব্যক্তি আমার প্রতি যিনার যে অভিযোগ আরোপ করেছে সে ক্ষেত্রে সে সত্যবাদী হলে আমার ওপর আল্লাহর লা'নত পতিত হোক।"

---

[১] মোঃ মাহবুবুল আলম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭৯

[২] আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল বুখারী আল জুফী রহ., *বুখারী শরীফ*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা : হাদীস নং ৪৩৮৮

আল্লাহ তায়ালা বলেন, "যারা নিজেদের স্ত্রীদের বিরুদ্ধে যিনার অভিযোগ আরোপ করে, অথচ নিজেরা ছাড়া তাদের সাক্ষী নেই, তাদের প্রত্যেকের সাক্ষ্য এই হবে যে, সে আল্লাহর নামে চারবার শপথ করে বলবে যে, সে অবশ্যই সত্যবাদী এবং পঞ্চমবারে বলবে, সে মিথ্যাবাদী হলে তার নিজের ওপর আল্লাহর অভিশাপ পড়বে। তবে স্ত্রীর শাস্তি রহিত হবে যদি সে আল্লাহর নামে চারবার শপথ করে সাক্ষ্য দেয় যে, তার স্বামী মিথ্যাবাদী এবং পঞ্চমবারে বলবে, তার স্বামী সত্যবাদী হলে তার নিজের ওপর আল্লাহর অভিশাপ পড়বে।"[১]

কখন লি'আন করা আবশ্যক

ইসলামী শরীয়াতে দু'অবস্থায় লি'আন করা আবশ্যক করা হয়েছ। যথা- ১. স্বামী স্ত্রীর বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অভিযোগ দায়ের করবে, অথচ এর পক্ষে চারজন সাক্ষী অনুপস্থিত। ২. স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান স্বামীর নিজের ঔরসজাত বলে অস্বীকার করলে।

স্বামী শপথ করতে অস্বীকার করলে

স্ত্রীর প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ আরোপের পর স্বামী চারজন সাক্ষী উপস্থাপন করতে ব্যর্থ হলে তাকে অবশ্যই শপথ করতে হবে। আর স্বামী শপথ করতে অস্বীকার করলে ইসলামী আইনের বিধান হচ্ছে তাকে কারাগারে আটক রাখা হবে, যতক্ষণ না সে শপথ করে অথবা তার উত্থাপিত অভিযোগ মিথ্যা বলে স্বীকার করে। অভিযোগ মিথ্যা বলে স্বীকার করার ক্ষেত্রে তার ওপর কাযাফের হদ্দ কার্যকর করা হবে। স্ত্রী শপথ করতে অস্বীকার করলে তাকেও কারাগারে আটক করে রাখা হবে, যে যাবত না সে শপথ করে অথবা তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সত্য বলে স্বীকার করে।[২]

লি'আন পরবর্তী স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক

প্রত্যেকে লি'আন করার পরে তাদের বিয়ে বাতিল বলে গণ্য হবে এবং তারা আর কখনো বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে না। তবে স্বামী তার অভিযোগ মিথ্যা বলে স্বীকার করলে শাস্তি ভোগের পর তারা পুনরায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে।[৩] হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত। এক ব্যাক্তি রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর যুগে তার স্ত্রীর উপর (যেনার) অভিযোগ আনে এবং সে তার স্ত্রী সন্তানের অস্বীকার করে। রাসূল (সা.) উভয়কে লি'আন করতে আদেশ দেন। আল্লাহ তায়ালা যেভাবে বলেছেন, সেভাবে সে লি'আন করে। তারপর রাসুলুল্লাহ (সা.) এ সিদ্ধান্ত দিলেন যে, সন্তানটি স্ত্রীর আর তিনি লি'আনকারী দুজনকে পৃথক করে দিলেন।[৪]

জন্ম গ্রহণকারী সন্তন প্রসঙ্গ

লি'আনের সন্তান মাতার সাথে যুক্ত হব।[৫] এ ব্যাপারে হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, সালাহ ইবন সা'দ (রা.) থেকে বর্ণিত। উয়াইমির (রা.) আসিম ইবন আদির নিকট আসলেন। তিনি আজলান গোত্রের সর্দার। উয়াইমির তাকে বললেন, তোমরা ঐ ব্যাক্তি সম্পর্কে কি বল, যে তার স্ত্রীর সাথে অন্য পুরুষ দেখতে পায়। সেকি তাকে হত্যা করবে? এরপর তো তোমরা তাকেই হত্যা করবে অথবা সে কি করবে? তুমি আমার তরফ থেকে এ বিষয়ে রাসুলুল্লাহ (সা.)-

---

[১] আল কুরআন, ২৪ : ৬-৯
[২] ড. আহমদ আলী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৩
[৩] ইবনুল হুমাম, *ফাতহুল কাদীর*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২৮৬; ইবনু কুদামাহ *আল-মুগনী*, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৫২-৫৩
[৪] আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল বুখারী আল জুফী রহ., *বুখারী শরীফ*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা : হাদীস নং ৪৩৮৬
[৫] ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৫৬; ইবনুল হুমাম, *ফাতহুল কাদীর*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২৮৯-২৯০

এর নিকট জিজ্ঞেস কর। তারপর আসিম নবী (সা.)-এর নিকট এসে বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! ...... রাসুলুল্লাহ (সা.) এ ধরনের প্রশ্ন অপছন্দ করলেন। তারপর উয়াইমির (রা.) তাকে প্রশ্ন করলেন। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) এ ধরনের প্রশ্ন না-পছন্দ করেছেন ও দূষণীয় মনে করেছেন। তখন উয়াইমির বললেন, আল্লাহর শপথ! আমি এ বিষয়টি রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট জিজ্ঞেস না করা পর্যন্ত বিরত হবনা।

তারপর তিনি বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! কোন ব্যাক্তি তার স্ত্রীর সাথে অন্য একটি পুরুষকে দেখতে পেলে সেকি তাকে হত্যা করবে? তখন তো আপনারা তাকে (কিসাস স্বরূপ) হত্যা করে ফেলবেন। অথবা সে কি করবে? তখন রাসুলুল্লাহ (সা.) বললেন, তোমার ও তোমার স্ত্রী সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা কুরআন অবতীর্ণ করেছেন। রাসুলুল্লাহ (সা.) স্বামী স্ত্রী দুজনকে 'লি'আন' করার নির্দেশ দিলেন, যেভাবে আল্লাহ তায়ালা তার কিতাবে উল্লেখ করেছেন।

তারপর উয়াইমির তার স্ত্রীর সাথে লি'আন করলেন। এরপর বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! (এরপরও) যদি আমি তাকে রাখি তবে তার প্রতি আমি জালিম হব। তারপর তিনি তাকে তালাক দিয়ে দিলেন। অতএব, তাদের পরবর্তী লোকদের জন্য, যারা পরস্পর 'লি'আন' করে, এটই সুন্নতে পরিনত হল। এরপর রাসুলুল্লাহ (সা.) বললেন, লক্ষ্য কর, যদি মহিলাটি একটি কালো ডাগর চক্ষু, বড় পাছা ও বড় পা বিশিষ্ট সন্তান জন্ম দেয়, তবে আমি মনে করব, উয়াইমিরই তার সম্পর্কে সত্য বলেছে। এবং যদি সে লাল গিরগিটির মত একটি লাল বর্ণের সন্তান প্রসব করে তবে আমি মনে করব, উয়াইমির তার সম্পর্কে মিথ্যা বলেছে। এরপর সে এমন একটি সন্তান প্রসব করল, যার গুনাবলি রাসুলুল্লাহ (সা.) উয়াইমির সত্যবাদী হওয়ার পক্ষে বলেছিলেন। তারপর সন্তানটিকে মায়ের দিকে সম্পৃক্ত করে পরিচয় দেওয়া হত।[১]

জন্ম গ্রহণকারী সন্তানের মিরাস

মাতা ও সন্তান পরস্পরের ওয়ারিস হবে।[২] এ বিষয়ে হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে,

সাহল ইবন সা'দ (রা.) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে বলল, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আপনি আমাকে বলুন তো, একজন তার স্ত্রীর সাথে এক ব্যক্তিকে দেখতে পেল। সেকি তাকে হত্যা করবে? পরিনামে আপনারা তাকে হত্যা করবেন। অথবা সে আর কি করতে পারে? তারপর আল্লাহ তায়ালা এ দুজন সম্পর্কে আয়াত নাযিল করেন, যা কুরআন শরিফে পরস্পর লানত করা সম্পর্কে বর্ণিত। তখন তাকে রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, তোমার ও তোমার স্ত্রীর সম্পর্কে ফয়সালা হয়ে গেছে। বর্ণনাকারী বলেন, তারা উভয়ে পরস্পর 'লি'আন' করল। তখন আমি রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। তারপর সে তার স্ত্রীকে পৃথক করে দিল। এরপর তা নিয়মে পরিনত হল যে, লি'আনকারী উভয়কে পৃথক করে দেওয়া হবে। মহিলাটি গর্ভবতী ছিল। তার স্বামী তার গর্ভ অস্বীকার করল। সুতরাং সন্তানটিকে তার মায়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে ডাকা হত। তারপর উত্তরাধিকার স্বত্বে এ নিয়ম চালু হল যে, সন্তান মায়ের 'মিরাস' পাবে। আর মাতাও সন্তানের মিরাস পাবে, যা আল্লাহ তায়ালা তার ব্যপারে নির্ধারণ করে দিয়েছেন।[৩]

---

[১] আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল বুখারী আল জুফী রহ., *বুখারী শরীফ*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা : হাদীস নং ৪৩৮৬

[২] ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৫৬; ইবনুল হুমাম, *ফাতহুল কাদীর*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২৮৯-২৯০

[৩] আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল বুখারী আল জুফী রহ., *বুখারী শরীফ*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা : হাদীস নং ৪৩৮৭

জন্ম গ্রহণকারী সন্তানের মর্যাদা

স্ত্রীর প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ আরোপের পর স্বামী এবং স্ত্রী উভয়ই লি'আন করবে। ইসলামী শরীয়াত অনুসারে লি'আনকারী মহিলার সন্তানকে জারজ সন্তান বলে অভিহিত করা জায়িয নয়। অধিকাংশ ইমামের মতে, যে এরূপ করবে, তার ওপর কাযাফের হদ্দ প্রয়োগ করা হবে।[১] এ ধরনের মহিলা ও তার সন্তান প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "তার ও তার সন্তানের প্রতি যিনার অভিযোগ উত্থাপন করা যাবে না। যে ব্যক্তি তার প্রতি কিংবা তার সন্তানের প্রতি যিনার অভিযোগ তুলবে, তার ওপর হদ্দের শাস্তি বর্তাবে।"[২]

তবে হানাফীগণের মতে, লি'আনের মহিলার যদি পিতৃপরিচয়হীন সন্তান না থাকে, তবেই এ হুকুম প্রযোজ্য হবে। পিতৃপরিচয়হীন সন্তান থাকলে এবং তা যিনার একটি প্রমাণ হবার কারণে অভিযোগ আরোপকারীর জন্য কাযাফের শাস্তি প্রযোজ্য হবে না। তবে তাযীরের আওতায় সে শাস্তিযোগ্য হবে।[৩]

মহানবী (সা.) কর্তৃক অপবাদের হদ্দ প্রয়োগ

মহানবী (সা.) ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদ আরোপের অপরাধে হদ্দ কার্যকর করেছিলেন। হযরত আয়েশা (রা.) কে অপবাদ দেওয়ার ঘটনা কুরআন কারীম এবং হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। যারা অপবাদ রটিয়েছিলো তাদের শাস্তিও নবীজি (সা.) কুরআনের নির্দেশ মোতাবেক প্রদান করেছিলেন। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার উযর নাযিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) মিম্বরে দাঁড়ালেন, এই কথার উল্লেখ করলেন এবং কুরআন তিলাওয়াত করলেন। আয়াত নাযিল হওয়ার পর দুইজন পুরুষ, একজন মহিলাকে (অপবাদ রটনার জন্য) হদ্দ প্রয়োগের নির্দেশ দিলেন। তারপর তাদের হদ্দ মারা হয়।[৪]

অপবাদদাতা দুনিয়াতেই শাস্তি ভোগ করে থাকে

কেউ কোনো সচ্চরিত্রবান ব্যক্তির ওপর ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদ আরোপ করলে অপবাদদাতা হদ্দের শাস্তির পাশাপাশি মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে অন্য শাস্তিও ভোগ করবে। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, মাসরুক (রহ.) আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, হাসান ইবন সাবিত এসে (তাঁর ঘরে প্রবেশের) অনুমতি চাইলেন। আমি বললাম, এ লোকটিকে কি আপনি অনুমতি দিবেন? তিনি [আয়েশা (রা.)] বললেন, তাঁর উপরে কি কঠিন শাস্তি আপতিত হয়নি? সুফিয়ান (রা.) বলেন, এর দ্বারা আয়েশা (রা.) তাঁর দৃষ্টি শক্তি চলে যাওয়ার কথা উদ্দেশ্য করেছেন। হাসান ইবন সাবিত আয়েশা (রা.) এর প্রশংসায় নিম্নের ছন্দ দুটি পাঠ করলেন, (আমার প্রিয়তমা) একজন, পবিত্র ও জ্ঞানী মহিলা যার চরিত্রে কোন সন্দেহ করা হয়না। সতীধর্মী মহিলাদের গোশত ভক্ষন থেকে মুক্ত অবস্থায় ভোরে ওঠে। (অর্থাৎ তিনি কারও গীবত করেন না) আয়েশা (রা.) বললেন, কিন্তু তুমি (এ চরিত্রের নও)।[৫]

ইফকের ঐতিহাসিক ঘটনা

ষষ্ঠ হিজরী সনে হযরত আয়েশা (রা.)-এর বিরুদ্ধে অপবাদের কালিমা লেপন করা হয়। মূলত আয়েশা (রা.) ছিলেন সম্পূর্ণ নির্দোষ। মুনাফিক নেতা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই চক্রান্ত করে আয়েশা (রা.)-এর পূত পবিত্র চরিত্রে কালিমা

---

[১] শাফি'ঈ ও মালিকীগণের মতে, লি'আনকারী মহিলার প্রতি যদি স্বামী ও তার অভিযুক্ত যিনা ছাড়া অন্য কোন যিনার মিথ্যা অভিযোগ আরোপ করে, তার ওপরও কাযাফের হদ্দ প্রযোজ্য হবে। তবে অভিযুক্ত যিনার ক্ষেত্রে সে শাস্তি যোগ্য হবে না। তবে শাফি'ঈগণের মতে, লি'আনের পরে যদি সে মিথ্যা অভিযোগ উত্থাপন করে, তাকে তা'যীরের আওতায় শাস্তি দেয়া হবে; *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ*, প্রাগুক্ত, খ. ৩৩, পৃ. ১৯-২০

[২] সুলাইমান আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, প্রাগুক্ত, বাব: আল-লি'আন, হা.নং. ২২৫৬

[৩] ইবনু নুজায়ম, *আল-বাহরুর রা'ইক*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৪১-৪২; ইবনুল হুমাম, *ফাতহুল কাদীর*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৩৩৪-৫

[৪] আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা আত-তিরমিযী রহ., *তিরমিযী শরীফ*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা : হাদীস নং ৩১৮১

[৫] আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল বুখারী আল জুফী রহ., *বুখারী শরীফ*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা : হাদীস নং ৪৩৯৬

লেপনের চেষ্টা করে। তার চক্রান্তে কিছু সরল মুসলমানও আয়েশা (রা.)-এর সমালোচনায় সামিল হয়। মুসলমান পুরুষদের মধ্যে হযরত হাস্‌সান বিন সাবিত, মিস্‌তাহ এবং নারীদের মধ্যে হামনাহা ছিলেন এ শ্রেণিভুক্ত। নিম্নে হাদীসের আলোকে পুরো ঘটনা তুলে ধরা হলো।

ইবন শিহাব (রহ.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন উরওয়া ইবন যুবায়র, সাইদ ইবন মূসাইয়িব, আলকামা ইবন ওয়াক্কাস, উবায়দুল্লাহ ইবন আবদুল্লাহ ইবন উতবা ইবন মাসুদ (রহ.) নবী (সা.)-এর সহধর্মিণী আয়েশা (রা.) এর ঘটনা সম্পর্কে বলেন, যখন অপবাদকারীরা তার প্রতি অপবাদ এনেছিল এবং আল্লাহ তায়ালা তাঁকে তাদের অভিযোগ থেকে নির্দোষ থাকার বর্ণনা দেন। তাদের প্রত্যেকেই ঘটনার অংশবিশেষ আমাকে অবহিত করেন। অবশ্য তাদের পরস্পর পরস্পরের বর্ণনা সমর্থন করে, যদিও তাদের মধ্যে কেউ অন্যের তুলনায় এ ঘটনাটি বেশি সংরক্ষণ করেছে। তবে উরওয়া আয়েশা (রা.) থেকে এরুপ বলেছিলেন যে, নবী (সা.)-এর সহধর্মিণী আয়েশা (রা.) বলেছেন যে, রাসুলুল্লাহ (সা.) যখন কোথাও সফরে বের হতেন, তখন তিনি তার স্ত্রীগনের মধ্যে লটারি দিতেন। এতে যার নাম উঠত, তাঁকে সঙ্গে নিয়ে রাসুলুল্লাহ (সা.) বের হতেন।

আয়েশা (রা.) বলেন, অতএব, কোন এক যুদ্ধে যাওয়ার সময় আমাদের মধ্যে লটারি দিলেন। তাতে আমার নাম উঠল। আমি রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সঙ্গে বের হলাম, পর্দার আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পরে। আমাকে হাওদায় করে উঠান হত এবং তাতে করে নামান হত। এ ভাবেই আমরা চললাম। যখন রাসুলুল্লাহ (সা.) যুদ্ধ শেষ করে ফিরলেন এবং ফেরার পথে আমরা মদিনার নিকটবর্তী হলাম। একদা (মনজিল থেকে) রওয়ানা দেওয়ার জন্য রাত থাকতেই ঘোষণা দিলেন। এ ঘোষণা দিলে আমি উটে চড়ে সৈন্যদের অবস্থানস্থল থেকে কিছু দূরে চলে গেলাম। আমার প্রাকৃতিক প্রয়োজন সেরে যখন সওয়ারীর কাছে এলাম, তখন দেখতে পেলাম যে, জাফারের দানা খচিত আমার হারটি ছিঁড়ে কোথাও পড়ে গেছে। আমি তা খোঁজ করতে লাগলাম। খোঁজ করতে আমার একটু দেরি হয়ে গেল। ইতিমধ্যে এ সকল লোক যারা আমাকে সওয়ার করাতো, তারা, আমি আমার হাওদার ভিতরে আছি মনে করে, আমার হাওদা উটের পিঠে রেখে দিল। কেননা এ সময় শরীরের গোশত আমাকে (হালকা পাতলা ছিলাম) ভারী করেনি। আমরা তো খুব অল্প খাদ্য গ্রহণ করতাম। আমি ছিলাম অল্পবয়স্কা এক বালিকা। সুতরাং হাওদা উঠাবার সময় তা যে খুব হালকা, তা তারা বুঝতে পারেনি এবং তারা উট হাঁকিয়ে রওয়ানা দিল।

সেনাদল চলে যাওয়ার পর আমি আমার হার পেয়ে গেলাম এবং যেখানে তারা ছিল সেখানে ফিরে এলাম। তখন সেখানে এমন কেউ ছিলনা যে ডাকবে বা ডাকে সাড়া দিবে। আমি যেখানে ছিলাম সে স্থানেই থেকে গেলাম। এ ধারনায় বসে থাকলাম যে যখন কিছুদূর গিয়ে আমাকে দেখতে পাবেনা, তখন এ স্থানে অবশ্যই খুঁজতে আসবে। সেখানে বসা অবস্থায় আমার চোখে ঘুম এসে গেল, আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। আর সৈন্যবাহিনীর পিছনে সাফওয়ান ইবন মুয়াত্তাল সুলামি যাকওয়ানি ছিলেন। তিনি শেষ রাতে রওয়ানা দিয়ে ভোর বেলা আমার এ স্থানে এসে পৌঁছলেন। তিনি একজন মানুষের আকৃতি নিদ্রাবস্থায় দেখতে পেলেন। তিনি আমার কাছে এসে আমাকে দেখে চিনতে পারলেন। কেননা, পর্দার হুকুম নাযিল হওয়ার আগে আমাকে দেখেছিলেন। কাজেই আমাকে চেনার পর উচ্চকণ্ঠে “ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন” পড়লেন। পড়ার আওয়াজে আমি উঠে গেলাম এবং আমি আমার চাঁদর দিয়ে চেহারা

ঢেকে নিলাম। আল্লাহর কসম তিনি আমার সঙ্গে কোন কথাই বলেননি এবং তার মুখ হতে "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন" আর কোন কথা আমি শুনিনি।

এরপর তিনি তার উট বসালেন এবং সামনের দুই পা নিজ পায়ে দাবিয়ে রাখলেন। আর আমি তাতে আরোহণ করলাম। তখন সাফওয়ান উটের লাগাম ধরে চললেন। শেষ পর্যন্ত আমরা সৈন্যবাহিনীর নিকট এমন সময় গিয়ে পৌঁছলাম, যখন তারা দুপুরের প্রচণ্ড উত্তাপের সময় অবতরণ করে। (এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে) যারা ধ্বংস হওয়ার তারা ধ্বংস হল। আর যে ব্যক্তি এ অপবাদের নেতৃত্ব দেয়, সে ছিল (মুনাফিক সর্দার) আবদুল্লাহ ইবন উবায় ইবন সলুল। তারপর আমি মদিনায় এসে পৌঁছলাম এবং পৌঁছার পর আমি দীর্ঘ একমাস পর্যন্ত অসুস্থ ছিলাম। আর অপবাদকারীদের কথা নিয়ে লোকেরা রটনা করছিল। আমি এসব কিছুই বুঝতে পারিনি। তবে এতে আমাকে সন্দেহে ফেলেছিল যে, আমার অসুস্থ অবস্থায় স্বাভাবিকভাবে রাসুলুল্লাহ (সা.) যে রকম স্নেহ ভালবাসা দেখাতেন, এবারে তেমনি ভালবাসা দেখাচ্ছেন না। শুধু এতটুকুই ছিল যে, রাসুলুল্লাহ (সা.) আমার কাছে আসতেন এবং সালাম দিয়ে জিজ্ঞেস করতেন, তোমার অবস্থা কি? তারপর তিনি ফিরে যেতেন। এই আচরণই আমাকে সন্দেহে ফেলেছিল। অথচ আমি এই অপপ্রচার সম্বন্ধে জানতেই পারিনি।

অবশেষে একটু সুস্থ হওয়ার পর মিসতাহের মায়ের সঙ্গে মানাসের দিকে বের হলাম। সে জায়গাটই ছিল আমাদের প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণের স্থান। আর আমরা কেবল রাতের পর রাতেই বাইরে যেতাম। এ ছিল সে সময়ের কথা যখন আমাদের ঘর সংলগ্ন পায়খানা নির্মিত হয়নি। আমাদের অবস্থা ছিল অনেকটা প্রাচীন আরবদের মত নিচু ময়দানের দিকে বের হয়ে প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণ। কেননা, ঘর সংলগ্ন পায়খানা নির্মাণ আমরা কষ্টকর মনে করতাম। কাজেই আমি ও মিসতাহের মা বাইরে গেলাম। তিনি ছিলেন আবূ রুহম ইবন আবদ মানাফের কন্যা এবং মিসতাহের মায়ের মা ছিলেন সাখর ইবন আমিরের কন্যা, যিনি আবূ বকর (রা.) এর খালা ছিলেন। আর তার পুত্র ছিলেন মিসতাহ ইবন উসাসাহ।

আমি ও উম্মে মিসতাহ আমাদের প্রয়োজন সেরে ঘরের দিকে ফিরলাম। তখন মিসতাহের মা তার চাঁদরে হোঁচট খেয়ে বললেন, মিসতাহ ধ্বংস হোক। আমি তাঁকে বললাম, তুমি খুব খারাপ কথা বলছ, তুমি কি এমন এক ব্যাক্তিকে মন্দ বলছ, যে বদরের যুদ্ধে হাজির ছিল। তিনি বললেন, হে আত্মভোলা! তুমি কি শোননি সে কি বলেছে? আমি বললাম, সে কি বলেছে? তিনি বললেন, এমন এমন। এ বলে তিনি অপবাদকারীদের অপবাদ সম্পর্কে আমাকে বিস্তারিত খবর দিলেন। এতে আমার অসুখের মাত্রা বৃদ্ধি পেল। যখন আমি ঘরে ফিরে আসলাম এবং রাসুলুল্লাহ (সা.) আমার ঘরে প্রবেশ করে বললেন, তুমি কেমন আছ? তখন আমি বললাম, আপনি কি আমাকে আমার আব্বা আম্মার নিকট যেতে অনুমতি দিবেন? তিনি বললেন, তখন আমার উদ্দেশ্য ছিল যে, আমি তাদের কাছে গিয়ে তাদের থেকে আমার এ ঘটনা সম্পর্কে নিশ্চিত ভাবে জেনে নেই।

রাসুলুল্লাহ (সা.) আমাকে আসার জন্য অনুমতি দিলেন। আমি আব্বা আম্মার কাছে চলে গেলাম এবং আমার আম্মাকে বললাম, ও গো আম্মা! লোকেরা কি বলাবলি করছে? তিনি বললেন, বৎস! তুমি তোমার মন হালকা রাখ। আল্লাহর কসম! এমন কমই দেখা যায় যে, কোন পুরুষের কাছে এমন সুন্দরী রূপবতী স্ত্রী আছে, যাকে সে ভালবাসে এবং তার সতীনও আছে, অথচ তার ত্রুটি বের করা হয়না। রাবি বলেন, আমি বললাম, সুবহানাল্লাহ। সত্যি কি লোকেরা এ

ব্যপারে বলাবলি করছে? তিনি বললেন, আমি সে রাত কেঁদে কাটালাম। এমনকি ভোর হয়ে গেল তথাপি আমার কান্না থামল না। এবং আমি ঘুমাতেও পারলাম না। আমি কাঁদতে কাঁদতেই ভোর করলাম।

যখন ওহী আসতে দেরি হল, তখন রাসুলুল্লাহ (সা.) আলী ইবন আবূ তালিব (রা.) ও উসামা ইবন যায়িদ (রা.) কে তার স্ত্রীর বিচ্ছেদের ব্যপারে তাদের পরামর্শের জন্য ডাকলেন। তিনি বলেন, উসামা ইবন যায়েদ তার সহধর্মিণী [আয়েশা (রা.)] এর পবিত্রতা এবং তার অন্তরে তাদের প্রতি তার ভালবাসা সম্পর্কে যা জানেন তার আলোকে তাঁকে পরামর্শ দিতে গিয়ে বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আপনার পরিবার সম্পর্কে আমরা ভাল ধারনাই পোষণ করি। আর আলী ইবন আবূ তালিব (রা.) বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আল্লাহ আপনার উপর কোন সংকীর্ণতা আরোপ করেন নি এবং তিনি ছাড়া বহু মহিলা রয়েছেন। আর আপনি যদি দাসীকে জিজ্ঞেস করেন, সে আপনার কাছে সত্য ঘটনা বলবে। তিনি [আয়েশা (রা.)] বলেন, তারপর রাসুলুল্লাহ (সা.) বারিরাকে ডাকলেন এবং বললেন, হে বারিরা! তুমি কি তার কাছ থেকে সন্দেহজনক কিছু দেখেছ? বারিরা বলল, যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরন করেছেন, তাঁর কসম! আমি এমন কোন কিছু তাঁর মধ্যে দেখতে পাইনি, যা আমি গোপন করতে পারি। তবে তাঁর মধ্যে সবচাইতে বেশি যা দেখেছি, তা হল তিনি একজন অল্প বয়স্ক বালিকা। তিনি কখনও তাঁর পরিবারের আটার খামির রেখে ঘুমিয়ে পড়তেন। আর বকরীর বাচ্চা এসে তা খেয়ে ফেলত।

এরপরে রাসুলুল্লাহ (সা.) (মিম্বরে) দাঁড়ালেন। আবদুল্লাহ ইবন উবায় ইবন সলুলের বিরুদ্ধে তিনি সমর্থন চাইলেন। আয়েশা (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) মিম্বরের উপর থেকে বললেন, হে মুসলিম সম্প্রদায়! তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে, ঐ ব্যাক্তির মিথ্যা অপবাদ থেকে আমাকে সাহায্য করতে পারে, যে আমার স্ত্রীর ব্যপারে আমাকে কষ্ট দিয়েছে। আল্লাহর কসম! আমি আমার স্ত্রী সম্পর্কে ভালই জানতে পেরেছি। এবং তারা এমন এক পুরুষ সম্পর্কে অভিযোগ এনেছে, যার সম্পর্কে আমি ভাল ছাড়া কিছুই জানিনা। সে কখনও আমাকে ছাড়া আমার ঘরে আসেনি।

এ কথা শুনে সা'দ ইবন মু'য়াজ আনসারি (রা.) দাঁড়িয়ে বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! তাঁর বিরুদ্ধে আমি আপনাকে সাহায্য করব, যদি সে আউস গোত্রের হয় তবে আমি তাঁর গর্দান মেরে দিব। আর যদি আমাদের ভাই খাযরাজ গোত্রের লোক হয়, তবে আপনি নির্দেশ দিলে আমি আপনার নির্দেশ কার্যকর করব। আয়েশা (রা.) বললেন, এরপর সা'দ ইবন উবাদা দাঁড়ালেন। তিনি খাযরাজ গোত্রের সর্দার। তিনি পূর্বে একজন নেককার লোক ছিলেন কিন্তু এ সময় স্বগোত্রের পক্ষপাতিত্ব তাকে উত্তেজিত করে তোলে। কাজেই তিনি সা'দ কে বললেন, চিরঞ্জীব আল্লাহর কসম! তুমি মিথ্যা বলেছ। তুমি তাকে হত্যা করতে পারবে না। এবং তাকে হত্যা করার ক্ষমতা তুমি রাখ না। তারপর উসায়দ ইবন হুদায়র দাঁড়ালেন, যিনি সা'দের চাচাতো ভাই। তিনি সা'দ ইবন উবায়দা কে বললেন, চিরঞ্জীব আল্লাহর কসম! তুমি মিথ্যা বলেছ। আমরা অবশ্যই তাকে হত্যা করব। তুমি নিজেও মুনাফিক এবং মুনাফিকের পক্ষে প্রতিবাদ করছ। এতে আউস এবং খাযরাজ উভয় গোত্রের লোকেরা উত্তেজিত হয়ে উঠল। এমনকি তারা পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার উপক্রম হল। তখন রাসুলুল্লাহ (সা.) মিম্বরে দাঁড়ানো ছিলেন। রাসুলুল্লাহ (সা.) তাদের থামাতে লাগলেন। অবশেষে তারা থামল।

নবী (সা.)ও নিরব হলেন। আয়েশা (রা.) বলেন, আমি সেদিন এমনভাবে কাটালাম যে, আমার চোখের অশ্রুও থামেনি এবং চোখে ঘুমও আসেনি। আয়েশা (রা.) বলেন, সকাল বেলা আমার কাছে আমার আব্বা আম্মা আসলেন, আর

আমি দু' রাত এবং একদিন (একাধারে) কাঁদছিলাম। এর মধ্যে না আমার ঘুম হয় না আমার চোখের পানি বন্ধ হয়। তারা ধারনা করছিলেন যে এ ক্রন্দনে আমার কলিজা ফেটে যাবে। আয়েশা (রা.) বলেন, এর পূর্বে তারা যখন আমার কাছে বসা ছিলেন এবং আমি কাঁদছিলাম, ইত্যবসরে জনৈক আনসারি মহিলা আমার কাছে আসার জন্য অনুমতি চাইলেন। আমি তাকে অনুমতি দিলাম। সে বসে আমার সাথে কাঁদতে লাগল। আমাদের এ অবস্থার মধ্যেই রাসুলুল্লাহ (সা.) আমাদের কাছে প্রবেশ করলেন এবং সালাম দিয়ে বসলেন।

আয়েশা (রা.) বলেন, এর পূর্বে যখন থেকে এ কথা রটনা চলেছে, তিনি আমার কাছে বসেন নি। এ অবস্থায় তিনি এক মাস অপেক্ষা করেছেন। আমার সম্পর্কে ওহী আসেনি। আয়েশা (রা.) বলেন, এরপর রাসুলুল্লাহ (সা.) তাশাহুদ পাঠ করলেন। তারপর বললেন, হে আয়েশা! তোমার সম্পর্কে এরুপ এরুপ কথা আমার কাছে পৌঁছেছে। তুমি যদি নির্দোষ হয়ে থাক, তবে অচিরেই আল্লাহ তায়ালা তোমার পবিত্রতা ব্যক্ত করে দিবেন। আর যদি তুমি কোন পাপে লিপ্ত হয়ে থাক, তবে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও এবং তাঁর কাছে তওবা কর। কেননা, বান্দা যখন তার পাপ স্বীকার করে নেয় এবং আল্লাহর কাছে তওবা করে তখন আল্লাহ তাঁর তওবা কবুল করেন।

আয়েশা (রা.) বলেন, যখন রাসুলুল্লাহ (সা.) তাঁর কথা শেষ করলেন, তখন আমার চোখের পানি এমনভাবে শুকিয়ে গেল যে, এক ফোঁটা পানিও অনুভব করছিলাম না। আমি আমার পিতাকে বললাম, আপনি রাসুলুল্লাহ (সা.) কে (তিনি যা কিছু বলেছেন তার) জবাব দিন। তিনি বললেন। আল্লাহর কসম! আমি রাসুলুল্লাহ (সা.) কে কি জবাব দিব তা আমার বুঝে আসছেনা। তারপর আমার আম্মাকে বললাম, আপনি রাসুলুল্লাহ (সা.) কে জবাব দিন। তিনি বললেন, আমি বুঝতে পারছিনা রাসুলুল্লাহ (সা.) কে কি জবাব দিব। আয়েশা (রা.) বলেন, তখন আমি নিজেই জবাব দিলাম। অথচ আমি একজন অল্প বয়স্কা বালিকা। কুরআন খুব বেশি পড়িনি। আল্লাহর কসম আমি জানি আপনারা এ ঘটনা শুনেছেন, এমনকি তা আপনাদের অন্তরে বসে গেছে এবং সত্য বলে বিশ্বাস করে নিয়েছেন। এখন যদি আমি বলি যে আমি নির্দোষ এবং আল্লাহ ভালভাবেই জানেন যে, আমি নির্দোষ; তবে আপনারা তা বিশ্বাস করবেন না। আর আমি যদি আপনাদের কাছে এ বিষয় স্বীকার করে নেই, অথচ আল্লাহ জানেন , আমি তা থেকে নির্দোষ; তবে আপনারা আমার এই উক্তি বিশ্বাস করে নিবেন। আল্লাহর কসম! এ ক্ষেত্রে আমি আপনাদের জন্য ইউসুফ (আলাইহিস সালাম) এর পিতার উক্তি ব্যতীত আর কোন দৃষ্টান্ত পাচ্ছিনা। তিনি বলেছিলেন, فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ "পূর্ণ ধৈর্যই শ্রেয় তোমরা যা বলছ; সে বিষয়ে একমাত্র আল্লাহর কাছেই সাহায্য চাওয়া যায়"।

তিনি বলেন, এরপর আমি আমার চেহারা ঘুরিয়ে নিলাম এবং কাত হয়ে আমার বিছানায় শুয়ে পড়লাম। তিনি বলেন, এ সময় আমার বিশ্বাস ছিল যে আমি নির্দোষ এবং আল্লাহ তায়ালা আমার নির্দোষিতা প্রকাশ করে দিবেন। কিন্তু আল্লাহর কসম! আমি তখন এ ধারনা করতে পারিনি যে, আল্লাহ আমার সম্পর্কে এমন ওহী অবতীর্ণ করবেন যা তিলাওয়াত করা হবে। আমার দৃষ্টিতে আমার মর্যাদা এর চাইতে অনেক নিচে ছিল। বরং আমি আশা করেছিলাম যে, হয়ত রাসুলুল্লাহ (সা.) নিদ্রায় কোন স্বপ্ন দেখবেন যাতে আল্লাহ তায়ালা আমার নির্দোষিতা জানিয়ে দিবেন। আয়েশা (রা.) বলেন, আল্লাহর কসম! রাসুলুল্লাহ (সা.) দাঁড়ান নি এবং ঘরের কেউ বের হন নি। এমন সময় রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি ওহী নাযিল হতে লাগল এবং তাঁর শরীর ঘামতে লাগল। এমনকি যদিও শীতের দিন ছিল তবুও তাঁর উপর যে ওহী অবতীর্ণ হচ্ছিল এর বোঝার ফলে মুক্তার মত তাঁর ঘাম ঝরছিল। যখন ওহী শেষ হল, তখন রাসুলুল্লাহ (সা.) হাসছিলেন। তখন তিনি প্রথম যে বাক্যটি বলেছিলেন তা হল: হে আয়েশা! আল্লাহ তোমার নির্দোষিতা প্রকাশ করেছেন।

এ সময় আমার মা আমাকে বললেন, তুমি উঠে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। আমি বললাম, আল্লাহর কসম! আমি তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করব না, আল্লাহ ছাড়া আর কারও প্রশংসা করবনা। আল্লাহ তায়ালা অবতীর্ণ করলেন পূর্ণ দশ আয়াত পর্যন্ত। إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالإِفْكِ عُصْبَةٌ যারা এ অপবাদ রচনা করেছে, তারা তোমাদেরই একটি দল। যখন আল্লাহ তায়ালা আমার নির্দোষিতার আয়াত অবতীর্ণ করলেন, তখন আবূ বকর সিদ্দিক (রা.) যিনি মিসতাহ ইবন উসাসাকে নিকটবর্তী আত্মীয়তা এবং দারিদ্র্যের কারনে আর্থিক সাহায্য করতেন, তিনি বললেন, আল্লাহর কসম! মিসতাহ আয়েশা সম্পর্কে যা বলেছে, এরপর আমি তাকে কখনওই কিছুই দান করবনা।

তারপর আল্লাহ তায়ালা আয়াত অবতীর্ণ করেলন, "তোমাদের মধ্যে যারা ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্যের অধিকারী তারা যেন শপথ গ্রহণ না করে যে তার আত্মীয় স্বজন ও অভাবগ্রস্থকে এবং আল্লাহর রাস্তায় যারা গৃহত্যাগ করেছে তাদের কিছুই দেবে না। তারা যেন তাদের ক্ষমা করে এবং তাদের দোষত্রুটি উপেক্ষা করে। তোমরা কি চাওনা যে আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করেন? এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।

আবূ বকর (রা.) এ সময় বললেন, আল্লাহর কসম! আমি অবশ্যই পছন্দ করি যে আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করেন। তারপর তিনি মিসতাহের সাহায্য আগের মত দিতে লাগলেন এবং বললেন, আল্লাহর কসম! আমি এ সাহায্য কখনও বন্ধ করবনা। রাসুলুল্লাহ (সা.) জয়নব বিনতে জাহশকেও আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, হে জয়নব! (আয়েশা সম্পর্কে) কি জানো আর কি দেখেছ? তিনি বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমি আমার কান ও চোখকে বাচিয়ে রাখতে চাই। আমি তার সম্পর্কে ভাল ছাড়া অন্য কিছু জানি না। আয়েশা (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সহধর্মিণীদের মধ্যে তিনি আমার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতেন। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তার পরহেযগারির কারনে রক্ষা করেন। আর তার বোন হামনা তার পক্ষাবলম্বন করে মুকাবিলা করে এবং অপবাদ আনয়নকারী যারা ধ্বংস হয়েছিল তাদের মধ্যে সেও ধ্বংস হল।[১]

৪. রাষ্ট্রদ্রোহিতা

প্রচলিত অর্থে রাষ্ট্র বলতে সেই জনসমষ্টিকে বোঝায়, যারা কোনো নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমানায় বসবাস করে, যাদের একটি সরকার আছে সর্বোপরি যারা বহিঃশক্তির নিয়ন্ত্রণ হতে সর্বোতভাবে মুক্ত থাকে। রাষ্ট্র গঠনের ইতিহাস ও প্রচলন বেশ পুরোনো। ইসলামেও রাষ্ট্রের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়েছে। ইসলামী রাষ্ট্রের মূল উদ্দেশ্য ইসলামের নীতি ও আদর্শকে সমুন্নত রাখা। ইসলাম নির্দেশিত পন্থায় জনকল্যাণ সাধন করা।

জনগণের কল্যাণ সাধনই ইসলামী রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। এ লক্ষ্যে কার্যত পৌঁছতে হলে দেশের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও সামাজিক নিরাপত্তার প্রয়োজন অনস্বীকার্য। পক্ষান্তরে রাজনৈতিক গোলযোগ এবং আঞ্চলিক বিদ্রোহ একটি কল্যাণকর উন্নত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পথে বড় অন্তরায়। তাই ইসলাম এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও সামাজিক নিরাপত্তা বজায় রাখার স্বার্থে সরকারদ্রোহিতার জন্য কঠোর শাস্তির বিধান দিয়েছে।[২]

---

[১] আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল বুখারী আল জুফী রহ., *বুখারী শরীফ*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা : হাদীস নং ৪৩৯১
[২] মোঃ মাহবুবুল আলম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০৯

রাষ্ট্রদ্রোহিতার পরিচয়

প্রকাশ্যভাবে রাষ্ট্র বা সরকারের বিরুদ্ধাচারণ করাই রাষ্ট্রদ্রোহিতা। রাষ্ট্র বা সরকারদ্রোহিতাকে আরবীতে বাগী (بغي) বলা হয়। (بغي)-এর শাব্দিক অর্থ অন্যায় করা, সীমা লঙ্ঘণ করা।[১] রাষ্ট্রদ্রোহিতার ইংরেজি প্রতিশব্দ হচ্ছে, Lese majeste, Sedition ইত্যাদি। Sedition -এর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, Conduct or speech inciting people to rebel against the authority of a state or monarch ।

ইসলামী শরীয়াতের পরিভাষায় সাধারণত بغي বলতে বৈধ সরকারের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রের নাগরিকদের একটি অংশ কর্তৃক দলবদ্ধভাবে সরকারের আনুগত্য থেকে বেরিয়ে বিকল্প নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা এবং সরকার উৎখাতের জন্য অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করাকে بغي বলা হয়। আর যে মুসলিম এভাবে সরকারের আনুগত্য থেকে বেরিয়ে প্রকাশ্যে প্রতিরোধ গড়ে তোলে তাকে (باغي) সরকারদ্রোহী বলা হয়।[২]

আল-আহকামুল সুলতানিয়া গ্রন্থে রাষ্ট্রদ্রোহিতার সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, এমনসব লোক যারা শাসকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে, মুসলমানদের বিরোধিতা করে অথবা তৈরি কোনো অনৈসলামিক মতাদর্শ গ্রহণ করে। তারা এসব করার পক্ষে দলীল-প্রমাণও পেশ করে। সেই সাথে মুসলিম শাসকের বিরুদ্ধাচরণ করার মতো শক্তি সামর্থও অর্জন করে।[৩]

ইসলামী আইনে সরকারদ্রোহীতা হিসেবে বিবেচ্য হওয়ার শর্ত

ইসলামী আইন অনুসারে সরকার বিরোধী সকল কর্মকাণ্ডই রাষ্ট্রদ্রোহিতা হিসেবে বিবেচ্য হয় না। সরকারদ্রোহীতার জন্য নিম্নের ছয়টি শর্ত পাওয়া গেলেই সরকারের বিরোধিতাকে সরকারদ্রোহিতা রূপে গণ্য করা হবে। যথা[৪]:-

ক. বিদ্রোহকারীদের মুসলিম হওয়া খ. প্রাপ্ত বয়স্ক ও সুস্থ মস্তিষ্কের অধিকারী হওয়া; ইসলামী ও যে কোনো আইন মানার বাধ্যবাধকতার জন্য এ দুটি শর্ত অপরিহার্য।[৫] গ. অস্ত্রশস্ত্রের অধিকারী হওয়া; রাষ্ট্রদ্রোহিতা শাস্তিযোগ্য হওয়ার জন্য তাদের কাছে অস্ত্র থাকা শর্ত।[৬] ঘ. সরকারের বিরোধিতার পক্ষে কোন যুক্তি থাকা, যদিও তা সঠিক নয় ঙ. সরকারের বিরুদ্ধে বিকল্প নেতৃত্ব গড়ে তোলা চ. সরকার পতনের জন্য প্রকাশ্যে হত্যা ও বিভিন্ন অপরাধ সৃষ্টি করা ছ. সরকারের আনুগত্য অস্বীকার করা

যেসব কাজ রাষ্ট্রদ্রোহিতা নয়

উপরে উল্লিখিত ছয়টি বিষয়ের কোনো একটি অনুপস্থিত থাকলে তাকে রাষ্ট্রদ্রোহিতা বলা যাবে না। অনেক সময় দেখা যায় সরকারের যেকোনো বিরোধীতাকেই রাষ্ট্রদ্রোহিতা বলে আখ্যা দেওয়া হয়। ইসলামী আইন অনুসারে যা একেবারেই ঠিক নয়।

---

[১] যেমন বলা হয়, সে অমুকের প্রতি অন্যায় করল কিংবা সীমালঙ্ঘন করল; আর-রাযী, মুখতারুস সিহাহ, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৪; ইবনু মানযুর বলেন, এক মুল অর্থ হল: হিংসা। তবে এটি অন্যায়-অবিচার অর্থেই বহুল ব্যবহৃত। কেননা হিংসুটে ব্যক্তি প্রায়শ হিংসাকৃত ব্যক্তির সাথে অন্যায় আচরণ করে থাকে। তাছাড়া শব্দটি খোঁজ করা, অনুসন্ধান করা অর্থেও ব্যবহার করা হয়; ইবনু মানযুর, *লিসানুল আরব*, প্রাগুক্ত, খ. ১৪, পৃ. ৭৯

[২] আল-আনসারী, *আসনাল মাতালিব*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১১১-২; ইবনু নুজায়ম, *আল-বাহরুর রা'ইক*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ১৫১

[৩] ড. আবদুল আযীয আমের, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪০

[৪] মোঃ মাহবুবুল আলম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১০

[৫] সাইয়্যেদ সাবেক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৭২

[৬] *প্রাগুক্ত*

অমুসলিদের ইসলামী রাষ্ট্রের সরকারের আনুগত্য অস্বীকার

অমুসলিমরা ইসলামী রাষ্ট্রের সরকারের আনুগত্য অস্বীকার করলে বা বিদ্রোহ করে বসলে তাদেরকে রাষ্ট্রদ্রোহী আখ্যা দেওয়া যাবে না। বরং তারা হবে হারাবী। তাদের জন্য হারাবীদের শাস্তি প্রযোজ্য হবে।

যৌক্তিক কারণ ছাড়া সরকারের ক্ষমতা দখলের চেষ্টা

রাষ্ট্রের মুসলিম নাগরিকদের মধ্য থেকে কোন দল যদি কোন যৌক্তিক কারণ প্রদর্শন করা ছাড়া এবং সরকারের ক্ষমতা দখল করার অভিপ্রায় ব্যতীত সরকারের আনুগত্য থেকে বেরিয়ে পড়ে তারাও সরকারদ্রোহী হবে না। তারা হবে সন্ত্রাসী। তাদের জন্য সন্ত্রাসীদের শাস্তি প্রযোজ্য হবে।[১]

সরকারের বিরুদ্ধে প্রচারণা চালালে

রাষ্ট্রের মুসলিম নাগরিকদের মধ্য থেকে কেউ কোন অজুহাতে নিয়মানুগ সরকারের আনুগত্য অস্বীকার করলে কিংবা সরকারের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করলে, সরকারের বিরুদ্ধে প্রচারণা চালালে সে সরকারদ্রোহী রূপে গণ্য হবে না।[২] আল্লামা সানআনী বলেন, "কেউ যদি জমা'আত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়; কিন্তু সমাজে কোন ধরনের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি না করে এবং লড়াইয়ে অবতীর্ণ না হয়, তা হলে তার পথকে বাধাগ্রস্ত করা যাবে না। কেননা নিছক সরকারের বিরোধিতার কারণে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করা সমীচীন নয়।"[৩]

সরকারের সমালোচনাই রাষ্ট্রদ্রোহিতা নয়

শাফি'ঈগণের মতে, সরকারের বিরোধিতা করা অন্যায় কিছু নয়; কেননা বিরোধিতাকারীরা তাদের ধারণা অনুযায়ী কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নিয়েই বিরুদ্ধাচরণ করে থাকে, যদিও তারা তাদের ব্যাখ্যায় হয় তো সঠিক নয়। তাই তাদেরকে এ ক্ষেত্রে সমস্যাগ্রস্থ মনে করতে হবে।"[৪] উপরন্তু, ইসলামের দৃষ্টিতে সরকারের অন্যায় কাজের সমালোচনা করা শুধু জায়িযই নয়; বরং সর্বোত্তম জিহাদ। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "অত্যাচারী শাসকের সামনে সত্য/ন্যায় কথা বলাই সর্বোত্তম জিহাদ।"[৫]

পাপকাজ ছাড়া শাসকদের আনুগত্য আবশ্যক

ইসলামে বর্ণিত পাপকাজ করা সকলের জন্যই নিষিদ্ধ। ইসলাম নাগরিকদের নির্দেশ দেয় শাসক ও রাষ্ট্রের নাগরিকদের আনুগত্য করার। তবে কোনো শাসক যদি কোনো পাপকাজ করতে নাগরিকদের নির্দেশ দেয় তাহলে সেই নির্দেশ পালন করার সুযোগ নাই। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, আবূ হুরায়রা (রা.) এর সুত্রে নবী (সা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করলো, সে আল্লাহর আনুগত্য করলো আর যে আমার অবাধ্যতা করলো সে আল্লাহর

---

[১] মোঃ মাহবুবুল আলম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১০

[২] আল-বুজায়রমী, তুহফাতুল হাবীব, বৈরুতঃ দারুল ফিকর, খ. ৪, পৃ. ২৩৩; ইবনু নুজায়ম, *আল-বাহরুর রা'ইক*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ১৫১

[৩] *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ*, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ১৩১

[৪] আর-রামালী, *নিহায়তুল মুহতাজ*, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ৪০৬; হায়তমী, *তুহফাতুল মুহতাজ*, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ৬৬

[৫] সুলাইমান আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, প্রাগুক্ত, বাবঃ আল-আমর ওয়ান নাহই, হা.নং. ৪৩৪৪; আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবনু ঈসা আত- তিরমিযী, *আল-জামি*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ফিতান, হা.নং. ২১৭৪; আবুল কাশিম তাবারানী, *আল-মু'জামূল কবীর*, প্রাগুক্ত, হা.নং. ৮০৮১

অবাধ্যতা করলো। যে ব্যক্তি আমীরের (শাসকের) আনুগত্য করে সে আমারই আনুগত্য করলো আর যে ব্যক্তি আমীরের অবাধ্যতা করলো সে আমারই অবাধ্যতা করলো।[১]

অন্যায়ের প্রতিবাদ করা ওয়াজিব

সরকার কোনো অন্যায় কাজ করলে এর প্রতিবাদ জানানো সকল নাগরিকের আবশ্যক কর্তব্য। প্রতিবাদ মানেই বিদ্রোহ নয়। বরং প্রতিবাদ হলো শাসক গোষ্ঠীকে অন্যায় আচরণ থেকে ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টা। মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে, উম্মে সালাম (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, অচিরেই এমন কতক আমীরদের (শাসক) উদ্ভব ঘটবে, তোমরা তাদের (কিছু) কাজ পছন্দ করবে এবং (কিছু) কাজ অপছন্দ করবে। যেজন তাদের স্বরূপ চিনল সে মুক্তি পেল এবং যেজন তাদের অপছন্দ (প্রতিবাদ) করল সে নিরাপদ হল। কিন্তু যেজন তাদের পছন্দ করল এবং অনুরসরণ করল (সে ক্ষতিগ্রস্ত হল)। লোকেরা জানতে চাইল আমরা কি তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করব না? তিনি [রাসুলুল্লাহ (সা.)] বললেন, না, যতক্ষন তারা সালাত আদায়কারী থাকবে।[২]

রাষ্ট্রদ্রোহিতার শাস্তি

ইসলামে রাষ্ট্রদ্রোহিতার জন্য সুনির্দিষ্ট কোনো শাস্তি নেই। এ অপরাধের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত হতে পারে। পৃথিবীর প্রায় সকল রাষ্ট্রের আইনে রাষ্ট্রদ্রোহিতার শাস্তি ইসলাম নির্দেশিত শাস্তির মতোই। ইসলামী রাষ্ট্র একটি কল্যাণকর রাষ্ট্র। এই রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা বা বিদ্যমান সরকারকে উচ্ছেদ একটি বড় অপরাধ। সুতরাং তার জন্য নির্ধারিত এ শাস্তি সঠিক ও যথাযথ।

ইমামগণের কেউ কেউ বিদ্রোহীদের শাস্তি হিসেবে ডাকাতির শাস্তিকে নির্ধারণ করেছেন। ইবনে হাযম, সাইয়্যেদ সাবেকসহ ইমামগণের একদল এ মত পোষণ করেছে।[৩] তাদের যুক্তি হচ্ছে, ডাকাত এবং বিদ্রোহী উভয়ের উদ্দেশ্য প্রায় এক এবং অভিন্ন। উভয় দলই চায় সমাজে ত্রাসের রাজত্ব ও নৈরাজ্য সৃষ্টি করতে, সমাজের স্বাভাবিক শান্তি-শঙ্খলা নষ্ট করতে। ডাকাতির শাস্তি প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ কুরআন কারীমে বলেন,

যারা আল্লাহর বিরুদ্ধে ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে, আর ভূ-পৃষ্ঠে অশান্তি সৃষ্টি করে বেড়ায়, তাদের শাস্তি এটাই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা শুলে চড়ান হবে, অথবা এক দিকের হাত ও অপর দিকের পা কেটে ফেলা হবে, অথবা তাদের দেশ থেকে নির্বাসিত করা হবে; এটাতো দুনিয়ায় তাদের জন্য ভীষণ অপমান, আর আখিরাতেও তাদের জন্য ভীষণ শাস্তি রয়েছে। কিন্তু হ্যাঁ, তোমরা তাদেরকে গ্রেফতার করার পূর্বে যারা তাওবাহ করে, তাহলে জেনে রেখ যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।[৪]

মহানবী (সা.)ও মুসলিমদের ঐক্য নষ্টকারী, বিদ্রোহীদের মুত্যুদণ্ড প্রদানের নির্দেশ দিয়েছেন। সহীহ মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে, আরফাজা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) কে আমি বলতে শুনেছি, অচিরেই নানা

---

[১] আবুল হুসায়ন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল কুশায়রী আন নিশাপুরি রহ., *মুসলিম শরীফ*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা : হাদীস নং ৪৫৯৫

[২] *প্রাগুক্ত*, হাদীস নং ৪৬৪৭

[৩] সাইয়্যেদ সাবেক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৭৪

[৪] আল কুরআর, ৫ : ৩৩-৩৪

প্রকার ফিৎনা-ফাসাদের উদ্ভব হবে। যে ব্যাক্তি উম্মাতের এ সংঘবদ্ধ অবস্থার মধ্যে বিশৃংখলা সৃষ্টির প্রয়াস পাবে, তরবারী দিয়ে তার গর্দান উড়িয়ে দেবে, চাই সে যে কেউ হোক না কেন।[১]

ধর্মদ্রোহিতা বা ধর্ম ত্যাগ

মহান আল্লাহর সকল সৃষ্টির মধ্যে বিশেষ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত সৃষ্টি হচ্ছে মানুষ। মানুষকে আল্লাহর পক্ষ থেকে দানকৃত বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্যে তার চিন্তাশক্তি, স্বাধীন বিচার-বিশ্লেষণ ক্ষমতা, বিবেক-বুদ্ধি অন্যতম। মানুষকে এই বিশেষ বৈশিষ্ট্যেমণ্ডিত করা হচ্ছে এই লক্ষ্যে, যাতে মানুষ তার মেধা ও প্রজ্ঞাকে কাজে লাগিয়ে সত্য-মিথ্যা, ন্যায় অন্যায়ের পার্থক্য নির্ণয় করতে সক্ষম হয়। সত্য ও ন্যায়ের গুরুত্ব উপলব্ধি করে সৎ পথে অটল থাকতে পারে। পৃথিবীর সকল পথ, মত ও ধর্ম থেকে যৌক্তিক ও কল্যাণকর ধর্ম গ্রহণ করতে পারে। যে কারণে ইসলাম ধর্ম গ্রহণের ব্যাপারে কারো স্বাধীনতার ওপর হস্তক্ষেপ করে না। মানুষ তার জ্ঞান-বুদ্ধিকে প্রয়োগ করে যেকোনো ধর্ম গ্রহণ করতে পারে। মহনবী (সা.)-এর মদীনা রাষ্ট্রে মুসলমাদের বাইরে বিভিন্ন ধর্ম ও গোত্রের মানুষের বসবাস ছিল। পরবর্তীতে খলিফাদের শাসনামলে মুসলিম সাম্রাজ্য ব্যাপক ভাবে বৃদ্ধি পায়। মুসলিম সাম্রাজ্যে ছিলো ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের বসবাসের নিরাপদ অধিকার। তবে ইসলামকে ধর্ম হিসেবে গ্রহণের পর এ ধর্ম ত্যাগ করার অনুমতি কোনো মুসলমানের জন্যই নেই।

কোনো প্রাপ্তবয়স্ক মুসলিম যদি ইসলামের প্রতি বিশ্বাস থেকে সরে আসার ঘোষণা দেয়, তাহলে সেটি বুঝাতে ইসলামী আইনশাস্ত্রে তাকে মুরতাদ বলে। ইসলামের দৃষ্টিতে ধর্ম ত্যাগ জঘণ্যতম অপরাধ। অনেক স্বার্থান্বেষী লোক ইসলামের প্রকৃত সৌন্দর্যে আকৃষ্ট না হয়ে কিংবা না জেনে-বুঝে সুনির্দিষ্ট স্বার্থ হাসিলের জন্য ইসলামে অনুপ্রবেশ করতে পারে আর স্বার্থ সিদ্ধির পর কুফরীতে ফিরে যেতে পারে। অনুরূপভাবে কপট ধর্মব্যবসায়ীরা ধর্মের নামে নানা অধর্ম ইসলামে প্রবেশ করিয়ে ইসলামের মারাত্মক ক্ষতি সাধন করতে পারে, তার সৌন্দর্যগুলোকে ম্লান করে দিতে পারে। এ কারণে সত্যিকার দ্বীনকে রক্ষা এবং তার গতিশীলতা বৃদ্ধির প্রয়োজনে ইসলাম ধর্মান্তরের জন্য কঠোর শাস্তির বিধান দিয়েছে।[২] মহান আল্লাহ বলেন, পবিত্র মাসে লড়াই করা সম্বন্ধে তোমাকে তারা জিজ্ঞেস করছে। বল, এতে যুদ্ধ করা ভয়ঙ্কর গুনাহ। পক্ষান্তরে আল্লাহর পথ হতে বাধা দান, আল্লাহর সঙ্গে কুফুরী, কা'বা গৃহে যেতে বাধা দেয়া এবং তাথেকে তার বাসিন্দাদেরকে বের করে দেয়া আল্লাহর নিকট তার চেয়ে অধিক অন্যায়। ফিতনা হত্যা হতেও গুরুতর অন্যায়। যদি তাদের সাধ্যে কুলায় তারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেই থাকবে, যে পর্যন্ত না তারা তোমাদেরকে তোমাদের দ্বীন হতে ফিরিয়ে না দেয় এবং তোমাদের যে কেউ নিজের দ্বীন হতে ফিরে যায়, অতঃপর সেই ব্যক্তি কাফির অবস্থায় মারা যায়, তবে এমন লোকের কর্ম দুনিয়াতে এবং আখেরাতে ব্যর্থ হয়ে যাবে। আর এরা অগ্নিবাসী, চিরকালই তাতে থাকবে।[৩]

---

[১] আবুল হুসায়ন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল কুশায়রী আন নিশাপুরি (রহ.), *প্রাগুক্ত*, হাদীস নং ৪৬৪৩
[২] মোঃ মাহবুবুল আলম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯৩
[৩] আল কুরআন, ২ : ২১৭

সংজ্ঞা

রিদ্দা একটি আরবী পরিভাষা, যার শাব্দিক অর্থ দল বা ধর্ম ত্যাগ করা, অথবা পূর্বের অবস্থায় ফিরে যাওয়া।[১] ইসলামী শরীয়াতের পরিভাষায় বালিগ ও সুস্থ মস্তিষ্ক সম্পন্ন মুসলিমের স্বেচ্ছায় ইসলাম থেকে কুফরীর দিকে প্রত্যাবর্তন করাকে রিদ্দা বলা হয়।[২] সাইয়্যেদ সাবেক বলেন, ধর্ম ত্যাগ বলতে বোঝায়, সুস্থ মস্তিস্কে প্রাপ্ত বয়স্ক মুসলমানের স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে ও কোনো প্রকার বল প্রয়োগ ব্যতিরেকে ইসলাম থেকে কুফুরীর দিকে প্রত্যাবর্তন করা।[৩] ড. আবদুল আযীয আমের বলেন, ইসলাম গ্রহণের পর পুনরায় বেইমান হয়ে যাওয়াকে বলা হয় ইরতিদাদ।[৪]

আর যে ব্যক্তি দ্বীন ইসলাম থেকে কুফরীতে ফিরে যায় তাকে মুরদাদ বলে। এর উদ্দেশ্য মুসলমান বালেগ পুরুষ অথবা নারী স্বেচ্ছায় ইসলাম থেকে কুফরীতে ফিরে গেলে তাকে মুরতাদ বলে।[৫] ইসলাম থেকে পূর্ববর্তী ধর্মে প্রত্যাবর্তন কিংবা নতুন কোনো ধর্ম গ্রহণ সুস্পষ্ট ঘোষণাও দিয়ে হতে পারে। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে যে বক্তব্য উচ্চারণের মাধ্যমে কুফরী কুফরী প্রকাশ পায় এবং কোনো কুফরী কাজ সম্পাদন করার মাধ্যমেও হতে পারে।

মুরতাদের উপর শাস্তি প্রয়োগের শর্ত

ধর্মান্তরের এবং ইসলাম ধর্ম ত্যাগকারীর উপর শাস্তি প্রয়োগ করতে চাইলে কিছু শর্তাবলী রয়েছে। তা নিম্নরূপ[৬]:-

মুকাল্লফ হওয়া

মুরতাদকে প্রাপ্ত বয়স্ক ও সুস্থ মস্তিষ্ক সম্পন্ন হতে হবে। কোন অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক কিংবা পাগল[৭] কোন সুস্পষ্ট কুফরী বাক্য উচ্চারণ করলে বা কাজ করলে তাকে ধর্মত্যাগী বলা যাবে না। অনুরূপভাবে ঘুমের নেশায় আচ্ছন্ন ও বেহুঁশ লোকদেরকে তাদের কোন কথা বা কাজের জন্যও ধর্মত্যাগী বলা যাবে না।[৮]

স্বেচ্ছায় কুফরী করা

কেউ স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে ধর্ম ত্যাগ করলেই তাকে মুরতাদ বলা যাবে। কারো প্রবল চাপ ছাড়াই স্বেচ্ছায় সুস্পষ্ট কুফরীতে লিপ্ত হলেই তা ধর্মত্যাগ বলে ধর্তব্য হবে। অতএব কেউ প্রবল চাপের মুখে একান্ত বাধ্য হয়ে কোন কুফরী বাক্য উচ্চারণ করলে কিংবা কুফরী কাজ করলেই ধর্মত্যাগী হয়ে যাবে না, যে যাবত তার অন্তঃকরণে পূর্ণ ঈমান বিদ্যমান থাকবে।[৯] আল্লাহ তায়ালা বলেন, "তবে সে ব্যক্তি ছাড়া যাকে জোর প্রয়োগ করা হয়েছে; কিন্তু তার অন্তর ঈমানে পরিপূর্ণ থাকে।"[১০]

---

[১] রুহী বায়ালবাকী, *আল-মাওরিদ: অ্যা মডার্ন অ্যারাবিক-ইংলিশ ডিকশনারি*, দারুল ইলম লিল-মালায়ীন, বৈরুত, পঞ্চদশ সংস্করণ, ২০০১, পৃ. ৫৮২

[২] ইবনু নুজায়ম, *আল-বাহারুর রাই'ক*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ১২৯; ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ১৬

[৩] সাইয়্যেদ সাবেক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫৮

[৪] ড. আবদুল আযীয আমের, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৭

[৫] শাওকানী, নাইলুল আওতার, বৈরূত : দারূল ফিকর, ১৯৭৩, খন্ড ৭ পৃ. ২৯০

[৬] মোঃ মাহবুবুল আলম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯৩

[৭] তবে যে ব্যক্তি কখনো পাগল হয়, আবার কখনো সুস্থ হয়ে ওঠে, তাহলে হুঁশ অবস্থায় তার কুফরীকে ধর্মত্যাগ রূপে গণ্য করা হবে আর পাগল অবস্থায় কুফরীকে ধর্মত্যাগ রূপ গণ্য করা হবে না; আল-কাসানী, *বদা'ইয়ুস সনা'ই*, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ১৩৪

[৮] আর-রুহায়বানী, *মতালিব*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ২৮৯; আল-বহুতী, *আল-কাশশাফ*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ১৭৫

[৯] ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ৩০; আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, প্রাগুক্ত, খ. ১০, পৃ. ১২৩; খ. ২৪, পৃ. ৪৫-৬, ১২৯-৩০

[১০] আল কুরআন, ১৬ : ১০৬

মুরতাদ ব্যক্তি অতীতে মুসলমান ছিলো-এ প্রমাণ থাকা

ইসলাম ধর্ম ত্যাগের অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তি সত্যিকার অর্থে মুসলমান ছিলেন এ প্রমাণ থাকা জরুরি। ভয়ে বা একান্তে চাপে পড়ে কিংবা আর্থিক সংকটে পড়ে কেউ মুসলিম হয়ে পরবর্তীতে ইসলাম ত্যাগ করে কুফরীতে চলে গেলে তাকে ধর্মত্যাগ করেছে বলে আখ্যা দেয়া যাবে না এবং এ জন্য শাস্তিস্বরূপ তাকে হত্যা করা যাবে না, যদি তার কথার প্রমাণ পাওয়া যায়।[১]

অনুরূপভাবে যে বংশীয় কিংবা দেশীয় সূত্র ধরে মুসলিম নামে পরিচিতি লাভ করেছে, সে যদি বালিগ হওয়ার পর প্রকৃত অর্থেই ইসলামের বিধি-বিধান মেনে নিয়েছে-তার প্রমাণ পাওয়া না যায়, তা হলেও তাকে কুফরীর জন্য হত্যা করা যাবে না; বরং বন্দী করে রাখা হবে, যে যাবত না সে প্রকৃত ইসলামে ফিরে আসে।[২]

ধর্মান্তরের নিদর্শন

ইসলামী আইনবিদগণের মতে, ধর্মান্তরের প্রধান রুকন হল ঈমান ও ইসলামের পর স্পষ্ট কুফরী বাক্য উচ্চারণ করা কিংবা এমন কথা বলা বা কাজ করা যা স্পষ্টরূপে কুফরী বোঝায়।[৩]

ধর্মান্তর প্রমাণের শরয়ী পদ্ধতি

ধর্মান্তর বা ধর্ম ত্যাগ প্রমাণের শরীয়াত সম্মত পদ্ধতি প্রধানত দুটি। চার মাযহাবের প্রায় সকল ইমাম এ ব্যাপারে একমত। ধর্মন্তর প্রমাণের শরয়ী পদ্ধতি নিম্নরূপ[৪]:-

স্বীকারোক্তি

চার মাযহাবের প্রায় সকল ইমাম একমত যে, ইসলাম ধর্ম ত্যাগকারী ব্যক্তি নিজেই যদি তার ধর্ম ত্যাগের ব্যাপারে স্বীকারোক্তি প্রদান করে যে, সে ধর্ম ত্যাগ করেছে, তাহলে তার স্বীকারোক্তির দ্বার ধর্মান্তর প্রমাণ করা যাবে।

সাক্ষ্য

ইসলামী আইন অনুসারে, দুজন ন্যায়পরায়ণ[৫] ব্যক্তির সাক্ষ্য-প্রমাণ দ্বারা ও ধর্মান্তর প্রমাণ করা যাবে। যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি সাক্ষীদের বক্তব্য অস্বীকার করে, তা হলে তার এ অস্বীকার তাওবা হিসেবে এবং নিজের অবস্থান থেকে প্রত্যাবর্তন রূপে গণ্য হবে। আর এ জন্য তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া যাবে না। এটা হানাফীগণের অভিমত।[৬] তবে অন্যান্য অধিকাংশ ইমামের মতে, এ ক্ষেত্রে সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে ফায়সালা করা হবে। তার অস্বীকার আমলে নেয়া যাবে না; বরং তাওবা করে একজন সত্যিকার মুসলিমরূপে জীবনাচার শুরু করলেই সে মৃত্যুদণ্ড থেকে রেহাই পেতে পারে।[৭]

---

[১] তবে মালিকী স্কুলের আশহাব ও ইবনু হাবীব (রহ.) প্রমুখ ইমামের দৃষ্টিতে এ ধরনের ব্যক্তির জন্যও ধর্মত্যাগের বিধান প্রযোজ্য হবে। তবে ইমাম আসবগ আল-মালিকীর মতে, তাকে পুনরায় ইসলামে ফিরে আসতে বলা হবে। এজন্য তাকে একটি যৌক্তিক সময় পর্যন্ত কয়েদ করে রাখা হবে এবং প্রহার করা হবে। যদি সে ফিরে আসে তা হলে ভাল। অন্যথায় তাকে ছেড়ে দেয়া হবে; আল-বাজী, *আল-মুন্তকা*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২৮৩

[২] আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, প্রাগুক্ত, খ. ১০, পৃ. ১২৩

[৩] ইবনু নুজায়ম, *আল-বাহরুর রা'ইক*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ১২৯; আল-বুজায়রমী, আত-তাজরীদ, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২০৫-৬

[৪] ইসলামী শাস্তি আইন, ১৯৪

[৫] ইমাম হাসান ইবন যিয়াদের মতে, চারজন সাক্ষীর প্রয়োজন; ইবনু নুজায়ম, *আল-বাহরুর রা'ইক*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ১৩৬; ইবনুল হুমাম, *ফাতহুল কাদীর*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৯৮

[৬] ইবনুল হুমাম, *ফাতহুল কাদীর*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৯৮; ইবনু নুজায়ম, আর-বাহরুর রা'ইক, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ১৩৬

[৭] আর-রামালী, *নিহায়াতুল মুহতাজ*, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ৯৪-৫; ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ২৭-৮;

মুসলমান কখন মুরতাদ হিসেবে গণ্য হয়

কোনো মুসলমানকে ততক্ষণ পর্যন্ত ইসলামের আওতা বহির্ভূত ও মুরতাদ বলে রায় দেয়া যাবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তার হৃদয় কুফরীর জন্য উন্মুক্ত হয়ে না যায়, তার মনমস্তিষ্ক প্রশান্তি লাভ না করে এবং কার্যত কুফরিতে প্রবেশ না করে। মানুষ মন দিয়ে যা স্থির করে, তাই পায়। যেহেতু মানুষের মনে যা থাকে, তা গায়েবী বিষয় এবং আল্লাহ ছাড়া আর কেউ তা জানেন, তাই তার মন যে কুফরিতে লিপ্ত হয়েছে, এমন অকাট্য প্রমাণ প্রকাশ পাওয়া অপরিহার্য, যার কোনো ব্যাখ্যার অবকাশ থাকবে না। এমনকি ইমাম মালেক বলেছেন, যে ব্যক্তি এমন কিছু বলে বা করে, যা নিরানব্বইটি ব্যাখ্যায় কুফরি সাব্যস্ত হয় এবং মাত্র একটি ব্যাখ্যায় ঈমান সাব্যস্ত হয়, তার ঐ কাজ বা কথাকে ঈমান সাব্যস্ত করা হবে।[১]

মুরতাদ হওয়ার আলামত

ইসলামী আইন শাস্ত্রে একজন মুসলমান কখন মুরতাদ হিসেবে বিবেচিত হবেন তা বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। ইমামগণ কাফির ও মুরতাদ হবার বিষয় গুলোকে চার শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। যথা[২]:- ১. বিশ্বাসগত বিষয় ২. মৌখিক স্বীকৃতি ৩. কর্ম সংশ্লিষ্ট বিষয় ৪. সর্বসম্মতভাবে ফরয ইবাদাত অস্বীকার

১. বিশ্বাসগত বিষয়

কোনো মুসলিম যদি এমন কোন বিশ্বাস পোষণ করে যা ইসলামী আক্বীদা পরিপন্থী যেমন- মহান আল্লাহর একাত্ববাদ অস্বীকার, মহানবী (সা.)-এর রিসালাত অস্বীকার ইত্যদি তাহলে ঐ ব্যক্তি আর মুসলমান থাকবে না। বরং মুরতাদ হিসেবে পরিগণিত হবে। কোনো মুসলমান কাফির ও মুরতাদ হবার ক্ষেত্রে বিশ্বাসগত বিষয়গুলোকে নিম্নে আলোচনা করা হলো।

মহান আল্লাহর অংশীদার স্থাপন করা

সে ব্যক্তিও কাফির ও মুরতাদ হয়ে যাবে যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবে অথবা তাঁকে অস্বীকার করবে অথবা তাঁর কোন সিফাতকে অস্বীকার করবে। অনুরূপভাবে কেউ বিশ্ব জগতের স্রষ্টা ও নিয়ন্ত্রণকারী হিসেবে আল্লাহকে বিশ্বাস না করলে কিংবা কেউ এ জগতকে সনাতন ও স্থায়ী বলে বিশ্বাস করলে অথবা এ বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করলে সেও কাফির ও মুরতাদ হবে।[৩] আল্লাহ তায়ালা বলেন, "আল্লাহ তায়ালা ছাড়া প্রত্যেকেই ধ্বংসশীল।"[৪]

মহান আল্লাহর মর্যাদা পরিপন্থী কোন বিশ্বাস করা

সে ব্যক্তি কাফির বা মুরতাদ হিসেবে গণ্য হবে যে মহান আল্লাহর মর্যাদা পরিপন্থী কোন বিষয়ে ওপর বিশ্বাস পোষণ করে। যেমন স্রষ্টা ও সৃষ্টিকে এক বলে বিশ্বাস করলে। এবং স্রষ্টা ছাড়া সৃষ্টির অস্তিত্বকে অস্বীকার করলে সেও কাফির হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে আল্লাহর স্ত্রী বা সন্তান-সন্ততি আছে বলে কেউ বিশ্বাস করলে সেও কাফির হয়ে যাবে।[৫]

---

[১] সাইয়্যেদ সাবেক, *প্রাগুক্ত*, ৩৬১
[২] মোঃ মাহবুবুল আলম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯৯
[৩] আল-আনসারী, *আসনাল মাতালিব*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১১৭; ইবনু নুজায়ম, *আল-বাহরুর রা'ইক*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ১২৯-৩০
[৪] আল কুরআন, ২৮ : ৮৮
[৫] আর-রু হায়বানী, *মাতালিব*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ২৮২; আল-বহুতী, *আশ-কাশশাফ*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ১৭০-১

আসমানী কিতারে প্রতি অবিশ্বাস পোষণ

পৃথিবীতে অবতীর্ণ সকল আসমানী কিতাবকে সত্য বলে বিশ্বাস করতে হবে। বিশেষত পবিত্র কুরআন, এর প্রতিটি হরফ, বিধিবিধান, অবিনশ্বরতা ইত্যাদি সত্য বলে স্বীকৃতি দিতে হবে। কুর'আনের একটি শব্দ বা একটি অক্ষরকেও কেউ অবিশ্বাস করলে, মিথ্যা বলে ধারণা করলে, সে কাফির হয়ে যাবে।[১]

দ্বীনের ফরয কোনো বিষয় অস্বীকার করা

দ্বীনের যে কোন অকাট্য ও সর্বজন পরিচিত বিধানকে (যেমন নামায, রোযা, যাকাত, হজ্জ, জিহাদ প্রভৃতি) কেউ মেনে না নিলে অথবা অস্বীকার করলে সে কাফির ও মুরতাদ হয়ে যাবে।[২] হযরত আবু বকর (রা.) ফরয বিধান অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন নবী (সা.)-এর ওফাত হল এবং আবূ বকর (রা.) খলীফা নিযুক্ত হলেন আর আরবের যারা কাফির হল, তখন উমর (রা.) বললেন, হে আবূ বকর! আপনি কিভাবে লোকদের সাথে যুদ্ধ করবেন? অথচ নবী (সা.) বলেছেন, আমাকে ততক্ষণ পর্যন্ত লোকদের সাথে যুদ্ধের নির্দেশ দেয়া হয়েছে যতক্ষণ না তারা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই) বলবে। আর যে কেউ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে যথার্থ কারণ না থাকলে সে তার জান ও মাল আমার হাত থেকে রক্ষা করে নেয়। আর তার হিসাব আল্লাহর দায়িত্বে।

আবূ বকর (রা.) বললেন, আল্লাহর কসম! যারা সালাত ও যাকাতের মধ্যে প্রভেদ করবে তাদের সাথে অবশ্যই আমি যুদ্ধ করব। কেননা যাকাত হল মালের হক। আল্লাহর কসম! যদি তারা একটি বকরির বাচ্চাও না দেয় তা তারা রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে দিত। তাহলে যা না দেওয়ার কারণে তাদের সাথে যুদ্ধ করব। উমর (রা.) বলেন, আল্লাহর কসম! আমি বুঝতে পারলাম যে, এটা আর কিছু নয় এবং আল্লাহ আবূ বকর (রা.) এর বক্ষ যুদ্ধের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। পরে আমি বুঝতে পারলাম যে, আবূ বকর (রা.) এর সিদ্ধান্তই হক।[৩]

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মর্যাদা পরিপন্থী কোন বিশ্বাস করা

মহানবী (সা.) আল্লাহ তায়ালা মনোনীত সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও রাসূল। মহান আল্লাহ বলেন, আপনি বলুন, হে মানুষ! নিশ্চয় আমি তোমাদের সকলের প্রতি আল্লাহ্‌র রাসূল। [৪] রাসূলুল্লাহ (সা.) কে কেউ ভণ্ড, কবি, গণক, প্রতারক, সন্ত্রাসী, মূর্খ ও মিথ্যাবাদী মনে করলে সেও কাফির হয়ে যাবে।[৫]

আল্লাহ তায়ালা বলেন, আমি কসম করছি তার, যা তোমরা দেখতে পাও এবং যা তোমরা দেখতে পাও না। নিশ্চয়ই এই কোরআন এক সম্মানিত রাসুলের বাহিত বার্তা। ইহা কোনো কবির রচনা নয়; তোমরা অল্পই বিশ্বাস করো, ইহা কোনো গণকের কথাও নয়, তোমরা অল্পই অনুধাবন করো। ইহা জগতের প্রতিপালকের কাছ থেকে অবতীর্ণ। সে যদি আমার নামে কোনো কথা রচনা করে চালাতে চেষ্টা করত, আমি অবশ্যই তার দক্ষিণহস্ত ধরে ফেলতাম এবং কেটে দিতাম তার জীবনধমনি, অতঃপর তোমাদের মধ্যে এমন কেউই নাই, যে তাকে রক্ষা করতে পারে। এই

---

[১] ইবনু নুজায়ম, *আল-বাহরুর রা'ইক*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ১৩১

[২] আল-আনসারী, *আসনাল মাতালিব*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১১৭

[৩] আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল বুখারী আল জুফী (রহ.), *বুখারী শরীফ*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা : হাদীস নং ৬৪৫৬

[৪] আল কুরআন, ৭ : ১৫৮

[৫] আল-আনসারী, আসনাল মাতালিব, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১১৭; আর-রামালী, *নিহায়াতুল মুহতাজ*, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ৪১৫

কোরআন মুত্তাকিদের জন্য অবশ্যই উপদেশ। অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, তারা এটাও বলে, 'এই সমস্ত অলীক কল্পনা, হয় সে উহা উদ্ভাবন করেছে, না হয় সে একজন কবি। মহান আল্লাহ আরও বলেন, তাদের আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই বলা হলে তারা অহংকার করত এবং বলত, আমরা কি এক উন্মাদ কবির কথায় আমাদের ইলাহগণকে বর্জন করব?[১]

কুরআন কারীমে আরও ঘোষণা হচ্ছে, অতএব আপনি উপদেশ দান করতে থাকুন, আপনার প্রতিপালকের অনুগ্রহে আপনি গণকও নন, উন্মাদও নন। তারা কি বলতে চায়, তিনি একজন কবি? তারা কি বলে, এই কোরআন তাঁর নিজের রচনা? বরং তারা অবিশ্বাসী। উহারা যদি সত্যবাদী হয়, তবে ইহার সদৃশ কোনো রচনা (বাণী) উপস্থিত করুক না।[২]

হারামকে হালাল মনে করা

শরীয়াতের দলিল-প্রমাণ দিয়ে অকাট্যভাবে প্রমাণিত হারাম বিষয়কে হালাল বলে বিশ্বাস করা, সর্বজন বিদিত হারাম যেমন-যিনা, মদ্যপান, যাদু, সুদ ইত্যদি কোন বিষয়কে কেউ হালাল বলে বিশ্বাস করলে সেও কাফির হয়ে যাবে।[৩]

আল্লাহ পবিত্র কুরআনে মুশরিকদের আচরণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা হারাম করেছেন তারা তাকে হারাম গণ্য করে না এবং সত্য দ্বীনকে তাদের দ্বীন হিসাবে গ্রহণ করে না।[৪]

অন্যত্র তিনি বলেন, আপনি বলুন, আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে যে রিযিক দান করেছেন, তন্মধ্যে তোমরা যে সেগুলির কতক হারাম ও কতক হালাল করে নিয়েছ, তা কি তোমরা ভেবে দেখেছ? আপনি বলুন, আল্লাহ কি তোমাদেরকে এতদ্বিষয়ে অনুমতি দিয়েছেন, নাকি তোমরা আল্লাহর নামে মনগড়া কথা বলছ।[৫]

হালালকে হারাম মনে করা

ইসলামী শরীয়ত যা হালাল করেছে তা হারাম মনে করাও কুফরী ও মুরতাদ হয়ে যাওয়ার কারণ।

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সুন্নাত ও আদর্শের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ

কেউ রাসূলুল্লাহ (সা.) কিংবা তাঁর প্রদর্শিত জীবন ব্যবস্থা বা কোন সর্বসম্মত বিধানের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করলে সেও কাফির হয়ে যাবে।[৬] মহানবী (সা.)-এর জীবনাদর্শ অনুসরণ করা প্রত্যেক মুসলমানের আবশ্যক কর্তব্য। কুরআনে এসেছে, 'এবং রাসূল তোমাদের জন্য যা নিয়ে এসেছেন তা তোমরা গ্রহণ কর, আর যা থেকে সে তোমাদের নিষেধ করে তা থেকে বিরত হও।[৭]

---

[১] আল কুরআন, ৩৭ : ৩৫-৩৬

[২] আল কুরআন, ৫২ : ২৯-৩৪

[৩] ইবনু তাইমিয়্যাহ, *আল-ফাতাওয়া আল-কুবরা*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৪৩৫; ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ২১-২

[৪] আল কুরআন, ৯ : ২৯

[৫] আল কুরআন, ১০ : ৫৯

[৬] ইবনুল হুমাম, *ফাতহুল কাদীর*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ১৩৬

[৭] আল কুরআন, ৫৯ : ৭

জীবনের সকল বিষয়ে তার আনুগত্য করতে হবে। অন্য আয়াতে এসেছে, অতএব তোমার রবের কসম, তারা মুমিন হবে না যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে বিচারক নির্ধারণ করে, তারপর তুমি যে ফয়সালা দেবে সে ব্যাপারে নিজদের অন্তরে কোন দ্বিধা অনুভব না করে এবং পূর্ণ সম্মতিতে মেনে নেয়।[১]

তাঁর আদেশ অমান্য করলে কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে । মহান আল্লাহ বলেন, অতএব যারা তাঁর নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করে তারা যেন তাদের ওপর বিপর্যয় নেমে আসা অথবা যন্ত্রণাদায়ক আযাব পৌঁছার ভয় করে।[২]

আল্লাহর ভালবাসা পাওয়ার জন্যও রাসূল (সা.) কে অনুসরণ করতে হবে। কুরআনের ঘোষণা, বল, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস, তাহলে আমার অনুসরণ কর, আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দেবেন। আর আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।[৩]

তাকে অনুসরণ করার মাধ্যমে আল্লাহর আনুগত্য করা হয়ে থাকে । সূরা আন নিসায়ে বলা হয়েছে, যে রাসূলের আনুগত্য করল, সে আল্লাহরই আনুগত্য করল। আর যে বিমুখ হল, তবে আমি তোমাকে তাদের উপর তত্ত্বাবধায়ক করে প্রেরণ করিনি।[৪]

যে ঈমান আনার ঘোষণা দেয়ার পরও তাকে অনুসরণ করে না সে তার দাবিতে মিথ্যাবাদী হিসাবে বিবেচিত হবে এবং তাকে জাহান্নামে যেতে হবে। সূরা আন নিসায় আরও বলা হয়েছে, আর যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানী করে এবং তাঁর সীমারেখা লঙ্ঘণ করে আল্লাহ তাকে আগুনে প্রবেশ করাবেন। সেখানে সে স্থায়ী হবে। আর তার জন্যই রয়েছে অপমানজনক আযাব।[৫]

সাহাবীগণের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা

সাহাবীগণের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা ঈমানের পরিপন্থী। কেউ যদি দ্বীনের কারণে (অর্থাৎ তাদের মাধ্যমে দ্বীনের শক্তি বৃদ্ধি পেয়েছিল, দ্বীন বিজয় লাভ করেছিল) তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে, তা হলে সে কাফির হয়ে যাবে। আর নিছক ব্যক্তিগত কারণেও তাঁদের প্রতি বিদ্বেষ রাখা সমীচীন নয়। এর জন্য গুনাহগার হতে হবে।[৬] হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, ইমরান ইবন হুসায়ন (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, উত্তম উম্মাত হলো তারা, যাদের কাছে আমি প্রেরিত হয়েছি। এরপর তারা শ্রেষ্ঠ-যারা তাদের নিকটবর্তী, এরপর তারা উত্তম-যারা তাদের পরবর্তী যুগের লোক। আল্লাহ্ ভাল জানেন, নবী (সা.) তৃতীয় যুগের লোকদের কথা বলেছিলেন কিনা? রাবী বলেন,

---

[১] আল কুরআন, ৪ : ৬৫

[২] আল কুরআন, ২৪ : ৬৩

[৩] আল কুরআন, ৩ : ৩১

[৪] আল কুরআন, ৪ : ৮০

[৫] আল কুরআন, ৪ : ১৪

[৬] আস-সুবকী, আল-ফাতাওয়া, দারুল মাআরিফ, খ. ২, পৃ. ৫৭৫-৬

এরপর এমন লোক হবে, যারা বিনা আহবানে সাক্ষ্য দেবে এবং মানত করে তা পূরা করবে না। তারা আমানতে খিয়ানত করবে এবং হারাম খাওয়ার ফলে মোটা-তাজা হবে।[১]

সাহাবীদের সমালোচানা করা, তাদের নিয়ে কটূক্তি করা থেকে হাদীসে বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, আবূ সাঈদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, তোমরা আমার সাহাবীদের সম্পর্কে কোনরূপ কটুক্তি করবে না। যার নিয়ন্ত্রণে আমার জীবন, যদি তোমাদের কেউ (তাদের পরে) উহুদ পাহাড় পরিমাণ সোনা (আল্লাহ্‌র রাস্তায়) খরচ করে; তবে তাঁরা দ্বীনের জন্য যে এক বা অর্ধ মুদ সম্পদ (যা খুবই নগণ্য) খরচ করেছে, তার সমান হবে না।[২]

সন্তুষ্টচিত্তে কুফরী গ্রহণ করা ও কুফরীর উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা

কেউ নিজের বা অপরের কুফরী ওপর সন্তুষ্ট থাকলে কিংবা কেউ অপর কারো কুফরীর ওপর অটল থাকা কামনা করলে সে কাফির হয়ে যাবে।[৩]

২. মৌখিক স্বীকৃতি

কোনো ব্যক্তির ইসলাম ধর্ম ত্যাগের একটি বড় প্রমাণ হচ্ছে তার মৌখিক স্বীকৃতি। মুখে ঘোষণার মাধ্যেমে ব্যক্তি নিজেকে কাফির প্রমাণ করতে পারে। অনুরূপভাবে মহান আল্লাহ, রাসূলুল্লাহ (সা.)সহ ইসলামের মৌলিক বিষয়ের ব্যাপারে এমন মন্তব্য করা যা কুফরীর পর্যায় পড়ে, তাহলে ঐ মন্তব্যকারীও মুরতাদ হিসেবে গণ্য হবে।

স্বঘোষিত কাফির

কোনো ব্যক্তি স্বেচ্ছায়, সজ্ঞানে নিজের ইসলাম ধর্ম ত্যাগের ঘোষণা দিলে কিংবা কুফরী হয় এমন কোনো বক্তব্য দিলে সে কাফির হিসেবে বিবেচিত হবে। এমনকি অজ্ঞতাবশত এমন কোনো বাক্য উচ্চারণ করলে যা উচ্চারণ করা কুফরী তহলেও সে কাফির হয়ে যাবে। এ ব্যাপারে অধিকাংশ ইমাম একমত। তবে কেউ যদি স্বেচ্ছায় না জেনে কোন কুফরী বাক্য উচ্চারণ করে, সেও সর্বসাধারণ আলিমের মতানুযায়ী কাফির হয়ে যাবে। তার জ্ঞান না থাকা ওযর হিসেবে বিবেচিত হবে না। কিন্তু অনেকের মতে, এ ধরনের ব্যক্তিকে কাফির বলা যাবে না। তার জ্ঞান না থাকা ওযর রূপে গণ্য হবে। এ মতটি অধিকতর অগ্রগণ্য।[৪]

কেননা ইমামগণের দৃষ্টিতে, কুফরীর ফাতওয়া দেবার বেলায় যথা সম্ভব সর্তক হওয়া উচিত। যদি উচ্চারিত কুফরী বাক্যের অন্য কোন ব্যাখ্যা দেয়া যায়, তা হলে সে ব্যাখ্যাটিই গ্রহণ করতে হবে। তদুপরি অজ্ঞতা যদি ওযর হিসেবে ধর্তব্য না হয়, তা হলে তো সকল মূর্খকেই কাফির বলতে হবে। তারা তো কোনটি কুফরী বাক্য, কোনটি কুফরী বাক্য নয়- তা জানে না।[৫]

---

[১] আবু দাউদ সুলায়মান ইবনুল আশ'আছ আস সিজিস্তানি (রহ.), *আবূ দাউদ শরীফ*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা : হাদীস নং ৪৫৮৫

[২] *প্রাগুক্ত*, হাদীস নং ৪৫৮৫

[৩] ইবনু ফারহুন, *তাবছিরাতুল হুক্কাম*, দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ, খ. ২, পৃ. ২৭৭; *আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যাহ*, খ. ২, পৃ. ২৫৭

[৪] শায়খী যাদাহ, *মাজমাউল আনহুর*, বৈরুতঃ দারু ইহয়াইত তুরাছিল আরবী, খ. ১, পৃ. ৬৮৮; ইবনু আবিদীন, *রাদ্দুল মুহতার*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২২৪

[৫] ড. আহমদ আলী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯৭-১৯৮

ইমাম মুহাম্মাদ (রহ.)-এর সময়ের একটি ঘটনা বর্ণিত আছে যে, জনৈকা মহিলাকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়, আল্লাহ তায়ালা ইয়াহুদী খ্রিস্টানদেরকে শাস্তি দেবেন। এটা শুনে মহিলাটি বলল, আল্লাহ তায়ালা এই রূপ করবেন না। কারণ, তারা তো আল্লাহর বান্দাহ। পরে ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) কে মহিলাটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হল। তিনি বললেন, "সে কাফির হবে না। কারণ সে তো একজন মূর্খ। তোমরা তাকে শিক্ষা দাও।"[১]

মহান আল্লাহকে গালমন্দ করা

আল্লাহকে গালমন্দ বলা বা তাঁর কোন বা গুণ নিয়ে উপহাস করা চরম কুফরী। আল্লাহকে গালমন্দ বা উপহাসকারীর তাওবা কবুল হবে কিনা- তা নিয়েও ইমামগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। অধিকাংশের মতে, তার তাওবা কবুল হবে। কিন্তু ইমাম আহমাদ (রহ.)-এর মতে, তার তাওবা কবুল হবে না। তাকে সর্বাবস্থায় হত্যা করতে হবে। কেননা সে আল্লাহকে গালি দিয়ে কিংবা উপহাস করে চরম মারাত্মক অপরাধ করেছে, যা অমার্জনীয়।[২] আল্লাহর প্রতি ধৃষ্টতামূলক কথা বলার মাধ্যমে আল্লাহর মর্যাদাকে খাটো করা হয়, আল্লাহকে কষ্ট দেওয়া হয়। কুরআনে এসেছে, নিশ্চয় যারা আল্লাহ ও তার রাসূলকে কষ্ট দেয়, আল্লাহ তাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে লানত করেন, এবং তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন অপমানজনক আযাব। আর যারা মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে তাদের কৃত কোনো অন্যায় ছাড়াই কষ্ট দেয়, নিশ্চয় তারা বহন করবে অপবাদ ও সুস্পষ্ট পাপ।[৩]

রাসূলুল্লাহ (সা.) কে গালমন্দ করা

রাসূলুল্লাহ (সা.) এবং তাঁর সাথে সংশ্লিষ্ট কোন বিষয় নিয়ে অমর্যাদাকর বক্তব্য দেওয়া স্পষ্টতই কুফরী। রাসূলুল্লাহ (সা.) কে গালমন্দ বা উপহাসকারীর তাওবা কবুল হবে কি না- তা নিয়েও ইমামগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। অধিকাংশের মতে, তার তাওবা কবুল হবে। ইমাম আবূ বাকর আল-ফারিসী (রহ.)-এর মতে তাকে হদ্দের আওতায় হত্যা করা হবে; তাওবার কারণে হদ্দ রহিত হবে না।[৪] যেহেতু হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, কোন এক অন্ধ ব্যক্তির একটি দাসী ছিল। সে নবী করীম (সা.)-এর শানে বেয়াদবিসূচক কথাবার্তা বলতো। সে অন্ধ ব্যক্তি তাকে এরূপ করতে নিষেধ করতো, কিন্তু সে তা মানতো না। সে ব্যক্তি তাকে ধমকাতো, তবু সে তা থেকে বিরত হতো না। এমতাবস্থায় এক রাতে যখন সে দাসী নবী (সা.)-এর শানে অমর্যাদাকর কথাবার্তা বলতে থাকে, তখন ঐ অন্ধ ব্যক্তি একটি ছোরা নিয়ে তার পেটে প্রচণ্ড আঘাত করে, যার ফলে সে দাসী মারা যায়। এ সময় তার এক ছেলে তার পায়ের উপর এসে পড়ে, আর সে যেখানে বসে ছিল, সে স্থানটি রক্তস্নাত হয়ে যায়।

পরদিন সকালে এ ব্যাপারে যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিকট আলোচনা হয়, তখন তিনি সকলকে একত্রিত করে বলেন, আমি আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে এ ঘটনার সত্যতা সম্পর্কে জানতে চাই এবং ইহা তার জন্য আমার হক স্বরূপ। তাই, যে ব্যক্তি তাকে হত্যা করেছে, সে যেন দাঁড়িয়ে যায়। সে সময় অন্ধ লোকটি লোকদের সারি ভেদ করে প্রকম্পিত অবস্থায় নবী করীম (সা.)-এর সামনে গিয়ে বসে পড়ে এবং বলে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি তার হন্তা।

---

[১] আল-হামতী, *হামযু উয়ূনিল বছা'ইর*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৩০৪

[২] ইবনু আবিদীন, *রাদ্দুল মুহতার*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২৩২; মূল্লা খসরু, দুরারুল হুক্কাম, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩০০

[৩] আল কুরআন, ৩৩ : ৫৭-৫৮

[৪] ড. আহমদ আলী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯৮

সে আপনার সম্পর্কে কটুক্তি ও গালি-গালাজ করতো। আমি তাকে এরূপ করতে নিষেধ করতাম ও ধমকাতাম। কিন্তু সে তার প্রতি কর্ণপাত করতো না। ঐ দাসী থেকে আমার দু'টি সন্তান আছে, যারা মনি-মুক্তা সদৃশ এবং সেও আমার প্রিয় ছিল। কিন্তু গত রাতে সে যখন পুনরায় আপনার সম্পর্কে কটুক্তি গাল-মন্দ করতে থাকে, তখন আমি আমার উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলি এবং ছোরা দিয়ে তার পেটে প্রচণ্ড আঘাত করে তাকে হত্যা করি। তখন নবী করীম (সা.) বলেন, তোমরা সাক্ষী থাক যে, ঐ দাসীর রক্ত ক্ষতিপূরণের অযোগ্য বা মূল্যহীন।[১]

কোনো কোনো ইমামের মতে, তাকে আশিটি বেত্রাঘাত করা হবে। মালিকীগণের মতে, কোন নবীকে কেউ গালি দিলে তাকে হত্যা করা হবে। তার তাওবা কবুল হবে না। যদি সে তাওবা করে তাহলে হদ্দের আওতায় তাকে হত্যা করা হবে। ইমাম আহমাদ (রহ.) থেকেও এ ধরনের একটি মত বর্ণিত রয়েছে।[২] আল্লাহ তায়ালা বলেন, যদি তোমরা তাদের জিজ্ঞেস কর, তাহলে তারা অবশ্যই বলবে যে, আমরা তো কেবল হাসি-ঠাট্টা ও খেল-তামাশাই করছি। আপনি তাদের বলুন, তাহলে তোমরা কি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল ও আয়াতগুলোকে নিয়েই উপহাস করছো? ছলনা কর না। এ কাজের মাধ্যমে তোমরা নিঃসন্দেহে ঈমান আনয়নের পর কুফরী করেছ।[৩]

কোনো নবীর ব্যপারে অপ্রীতিকর কথা বলা

কোন নবীকে গালি দেওয়া, কোন খারাপ উপাধিতে ভূষিত করা, কোন কাজের জন্য দোষারোপ করা, হেয় প্রতিপন্ন করা, ব্যঙ্গাত্মক কোন তুলনা দিয়ে ছবি তৈরি করা ইত্যাদি কুফরী। কোনো নবীর মিথ্যা দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করা, নবী সম্পর্কে এমন কথা বলা যা শুনলে তিনি কষ্ট পান, এরূপ কথাও ইসলামী আইন অনুযায়ী কুফরী।[৪] কুরআনে এসেছে, হে মু'মিনগণ! মূসাকে যারা ক্লেশ দিয়েছে তোমরা তাদের মত হয়োনা; তারা যা রটনা করেছিল আল্লাহ তা হতে তাকে নির্দোষ প্রমাণিত করেন; এবং আল্লাহর নিকট সে মর্যাদাবান। [৫]

চার মাযহাবের প্রায় সকল ইমাম এ ব্যাপারে একমত যে, কেউ কোন নবীকে লানত করলে বা বদ দুআ করলে অথবা তাঁর ক্ষতি কামনা করলে বা শানের পরিপন্থী কোন কিছু তাঁর প্রতি মিথ্যা আরোপ করলে কিংবা কোন কথা বা কাজের সাহায্যে তাঁকে নিয়ে উপহাস করলে কাফির হয়ে যাবে।[৬]

কোনো নবীকে গালমন্দ করা হারম, এবং কুফরী। ইসলামী আইনে এর শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। তবে হানাফী ইমামগণের মতে, তাকে হত্যা করা হবে না; তবে আদালত সুবিবেচনা অনুযায়ী তাকে যে কোন উপযুক্ত শাস্তি দিতে পারবে।[৭] ইশারা-ইঙ্গিতে নবীদের ব্যাপারে কটূক্তিমূলক বক্তব্য দেওয়াও কুফরী। কাজী 'ইয়াদ (রহ.) বলেন, সাহাবা কিরাম থেকে আজ পর্যন্ত সকল ইমামই এ বিষয়ে এক মত যে, ইশারা-ইঙ্গিত স্পষ্ট বক্তব্যের মতই।[৮]

---

[১] আবু দাউদ সুলায়মান ইবনুল আশ'আছ আস সিজিস্তানি (রহ.), *আবূ দাউদ শরীফ*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা : হাদীস নং ৪৩১০

[২] *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ*, প্রাগুক্ত, খ. ২২, পৃ. ১৯৩; ইবনু আবিদীন, *রাদ্দুল মুহতার*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২৩২

[৩] আল কুরআন, ৯ : ৬৫-৬

[৪] সাইয়্যেদ সাবেক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৬২

[৫] আল কুরআন, ৩৩ : ৬৯

[৬] শায়খী যাদাহ, *আল-মাজমা*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৬৯২; আল-আনসারী, *আসনাল মাতালিব*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১১৮, ১২২

[৭] মুল্লা খসরু, দুরারুল হুক্কাম, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৯৯; আল-বাবরতী, *আল-ইনায়াহ*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৬২-৩

[৮] *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ*, খ. ২৪, পৃ. ১৩৭; আল-খারাশী, *শারহু মুখতাছারি খলীল*, খ. ৮, পৃ. ৭০

আহলে বায়েতর প্রতি অমর্যাদাকর বক্তব্য দেওয়া

মহানবী (সা.)-এর পবিত্র পরিবারের সদস্যদের প্রতি উত্তম ধারণা পোষণ করা, তাদেরকে ভালোবাসা প্রতিটি মুমিন মুসলমানের আবশ্যক কর্তব্য। আহলে বায়েতের মর্যাদা, পবিত্রতা কুরআন এবং হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। ইয়াযিদ ইবনে হাইয়্যান (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি, হুসায়ন ইবন সাবুরা এবং উমার ইবন মুসলিম-- আমরা যায়দ ইবন আরকাম (রা.) এর নিকট গেলাম। আমরা যখন তার কাছে বসি, তখন হুসায়ন বললেন, হে যায়দ! আপনি তো বহু কল্যাণ প্রত্যক্ষ করেছেন, আল্লাহর রাসূল (সা.) কে দেখেছেন, তাঁর হাদীস শুনেছেন, তার পাশে থেকে যুদ্ধ করেছেন এবং তাঁর পেছনে সালাত আদায় করেছেন। আপনি বহু কল্যাণ লাভ করেছেন, হে যায়দ! আপনি রাসুলুল্লাহ (সা.) থেকে যা শুনেছেন, তা আমাদের বলুন না। যায়দ (রা.) বললেন, ভ্রাতুষ্পুত্র! আমার বয়স হয়েছে, আমি পুরানো যুগের মানুষ। সুতরাং রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর কাছ থেকে যা আমি সংরক্ষণ করোছিলাম, এর কিছু অংশ ভুলে গিয়েছি। তাই আমি যা বলি, তা কবুল কর আর আমি যা না বলি, সে ব্যাপারে আমাকে কষ্ট দিও না।

তারপর তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) একদিন মক্কা ও মদিনার মধ্যবর্তী “খুম্ম” নামক স্থানে দাঁড়িয়ে আমাদের সামনে ভাষণ দিলেন। আল্লাহর প্রশংসা ও সানা বর্ণনা শেষে ওয়ায-নসীহত করলেন। তারপর বললেন, সাবধান, হে লোক সকল! আমি একজন মানুষ, আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত ফিরিশতা আসবে, আর আমিও তাঁর ডাকে সাড়া দেব। আমি তোমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ দুটো জিনিস রেখে যাচ্ছি। এর প্রথমটি হলো আল্লাহর কিতাব। এতে হিদায়াত এবং নূর রয়েছে। সুতরাং তোমরা আল্লাহর কিতাবকে অবলম্বন কর, একে শক্ত করে ধরে রাখো। এরপর কুরআনের প্রতি আগ্রহ ও অনুপ্রেরণা দিলেন।

তারপর বললেন, আর হলো আমার আহলে বায়ত। আর আমি আহলে বায়তের ব্যাপারে তোমাদের আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, আহলে বায়তের ব্যাপারে তোমাদের আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, আহলে বায়তের ব্যাপারে তোমাদের আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। হুসায়ন বললেন, রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর আহলে বায়ত কারা, হে যায়দ? রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর বিবিগণ কি আহলে বায়তের অন্তভুক্ত নন?

যায়দ (রা.) বললেন, বিবিগণও আহলে বায়তের অন্তর্ভুক্ত; তবে আহলে বায়ত তাঁরাই, যাদের উপর যাকাত গ্রহণ হারাম। হুসায়ন বললেন, এ সব লোক কারা? যায়দ (রা.) বললেন, এরা আলী, আকীল, জাফের ও আব্বাস (রা.) এর পরিবার-পরিজন। হুসায়ন বললেন, এদের সবার জন্য যাকাত হারাম? যায়দ (রা.) বললেন, হ্যাঁ।[১]

হযরত আয়েশা (রা.) কে ষষ্ঠ হিজরী সনে ব্যভিচারের অপবাদ দেওয়া হয়েছিল। তার পবিত্রতার ঘোষণা স্বয়ং আল্লাহ পবিত্র কুরআনে দিয়েছেন। তাই তাঁর প্রতি কেউ ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করলে বা এ কারণে কেউ তাঁকে গালমন্দ করলে মুরতাদ হয়ে যাবে। ইমাম মালিক (রহ.) বলেছেন, “যে আবূ বকর (রা.) কে গালি দেবে তাকে বেত্রাঘাত করা হবে। আর যে হযরত আয়েশা (রা.)কে গালি দেবে তাকে হত্যা করা হবে।” এ কথা বলার পর তাঁকে এর কারণ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি উত্তর দিলে : “তাঁকে যে অপবাদ দেবে বস্তুত সে কুরআনের বক্তব্যকেই অস্বীকার করল”।[২]

---

[১] আবুল হুসায়ন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল কুশায়রী আন নিশাপুরি (রহ.), *মুসলিম শরীফ*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা : হাদীস নং ৬০০৭

[২] আল-বাজী, *আল-মুন্তকা*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ২০৬

তদুপরি তাঁকে কেউ অন্য কোন কারণে গালি দিলে কিংবা তাঁকে ছোট বা হেয় করে কথা বললে তাকে দীর্ঘ কারাবাস দণ্ড দিতে হবে এবং কঠোরভাবে প্রহার করতে হবে।[১]

অধিকাংশ ইমামের মতে, নবী পত্নীদের প্রতি অপবাদ আরোপকারীকে বন্দী করে তাওবা করার সুযোগ দেয়া হবে। যদি সে তাওবা করে ফিরে না আসে তাহলে তাকে হত্যা করা হবে।[২] কেউ রাসূলুল্লাহ (সা.) পরিবারের অন্য কাউকে গালি দিলে সে কাফির হবে না; তবে তাকে তাযীরের আওতায় প্রকাশ্যে জোরে প্রহার করা হবে এবং কারাদণ্ড দিতে হবে। কেননা নবী পরিবারের কাউকে গালি দেয়া নবী (সা.) এর শান ও মর্যাদার আঘাত করার শামিল।[৩]

কুরআনকে তুচ্ছ করে কথা বলা

কেউ কুর'আনকে তুচ্ছ করে কথা বললে বা তাকে নিয়ে উপহাস করলে কাফির হয়ে যাবে।[৪]

ফেরেশতাদের ব্যাপারে অনভিপ্রেত মন্তব্য

আল্লাহ তায়ালার অতি সম্মানিত ও নিষ্পাপ এক সৃষ্টি হচ্ছে ফেরেশতা। তাই অকাট্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত যে কোন ফেরেশতাকে [যেমন হযরত জিব্রাইল, মালাকুল মাওত ও জাহান্নামের রক্ষী মালিক (আ.) প্রমুখ] কিংবা সামগ্রিকভাবে সকলকে কেউ লানত করলে, গালি কিংবা উপহাস করলে কাফির ও মুরতাদ হয়ে যাবে।[৫]

সাহাবীদের গালমন্দ করা

ইসলামের বিকাশ ঘটেছে সাহাবীদের মাধ্যমে। কোন ব্যক্তি সকল সাহাবীকে গালমন্দ করলে সে মুরতাদ হয়ে যাবে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "তোমরা আমরা সাহাবীগণের ব্যাপারে সর্তক হও, আল্লাহকে ভয় করো। তোমরা আমার পরে তাঁদেরকে সমালোচনার পাত্রে পরিণত কর না।"[৬]

উম্মতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ উম্মত হচ্ছেন মহান সাহাবীগণ। তারা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সান্নিধ্য লাভ করে ধন্য হয়েছিলেন। তাদের জীবন, সম্পদ সবকিছুই ইসলাম ও রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জন্য উৎসর্গ করেছিলেন। ইসলামের দৃষ্টিতে সাহাবীদের গালি দেওয়া, তাদের দোষ চর্চা করা অত্যন্ত গর্হিত অপরাধ। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, আবদুল্লাহ ইবন মুগাফফাল (রা.) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, হুঁশিয়ার! আমার সাহাবীদের বিষয়ে আল্লাহ্ তায়ালাকে ভয় কর। আমার পরে তোমরা তাদেরকে (গালি ও বিদ্রুপের) লক্ষ্যবস্তু বানিও না। যেহেতু যে ব্যক্তি তাদের প্রতি ভালোবাসা পোষণ করল, সে আমার প্রতি ভালোবাসার খাতিরেই তাদেরকে ভালোবাসল। আর যে ব্যক্তি তাদের প্রতি শত্রুতা ও হিংসা পোষণ করল, সে আমার প্রতি শত্রুতা ও হিংসাবশেই তাদের প্রতি শত্রুতা ও

[১] আর-রু'আয়নী, মাওয়াহিবুল জলীল, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ২৮৬; ইবনু মুফলিহ, *আল-ফুরূ*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৯৪-৫
[২] ইবনু আবিদীন, *রাদ্দুল মুহতার*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২৩৬
[৩] আল-মওয়াক, *আত-তাজ ওয়াল ইকলীল*, বৈরুত:দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, খ. ৮, পৃ. ৩৮৫
[৪] শায়খী যাদাহ, *আল-মাজমা*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৬৯৩
[৫] আল-খারাশী, *শারহু মুখতাছারি খলীল*, দারুল ফিকর, খ. ৪, পৃ. ৩৫; খ. ৮, পৃ. ৭০; আদ-দাসূকী, আল-হাশিয়াতু, খ. ৪, পৃ. ৩০৯
[৬] আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবনু ঈসা আত-তিরমিযী, *আস-সুনান*, আবওয়াবুল মানাকিব, হা.নং. ৩৮৬২; ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বল, আল-মুসনাদ, হা.নং. ২০৫৬৭, ২০৫৬৮, ২০৫৬৯

হিংসা পোষণ করল। যে ব্যক্তি তাদেরকে কষ্ট দিল, সে আমাকেই কষ্ট দিল। যে আমাকে কষ্ট দিল, সে আল্লাহ তায়ালাকেই কষ্ট দিল। আর যে আল্লাহ তায়ালাকে কষ্ট দিল, শীঘ্রই আল্লাহ তায়ালা তাকে পাকড়াও করবেন।[১]

অপর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, ইবন উমার (রা.) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যারা আমার সাহাবীদের গালি দেয় তাদের দেখলে তোমরা বলবে, তোদের দুষ্কর্মের উপর আল্লাহ্ তায়ালার অভিসম্পাত।[২]

সকল সাহাবীকে নয়; বিশেষ একজন কিংবা কয়েকজন সাহাবীকে কেউ গালমন্দ করলে বা কাফির বললে হানাফী ও মালিকীগণের মতে, তাকে কাফির ও মুরতাদ বলা যাবে না; তবে সে শাস্তিযোগ্য হবে। তাকে এ জন্য সশ্রম বা বিনা শ্রমে কঠোর কারাদণ্ড দেয়া যাবে।[৩] তবে শাফি'ঈ ও হাম্বলীগণের মতে, সে কাফির হয়ে যাবে এবং তার জন্য মুরতাদের শাস্তি প্রযোজ্য হবে। আবার অনেকেই ব্যক্তিগত কারণে গালমন্দ করার মধ্যে পার্থক্য করেছেন। যদি গালমন্দের কারণ একান্ত ব্যক্তিগত হয়, তা হলে গালমন্দকারী কাফির হবে না। যদি সাহাবী হবার কারণেই গালি দেয়া হয়, তা হলেই কাফির হবে।[৪] আরবদেরকে কিংবা বনূ হাশিমকে কেউ গালি দিলে কিংবা লা'নত করলে তাকেও কারাদণ্ড দেয়া হবে এবং প্রহার করা হবে।[৫]

নবুয়াতের দাবি করা

মানব জাতির হেদায়েত ও মুক্তির লক্ষ্যে আল্লাহ তায়ালা যুগেযুগে অসংখ্য নবী রাসূল প্রেরণ করেছেন। তাঁদের মধ্যে সর্ব প্রথম আদম (আ.) আর সর্বশেষ হলেন হযরত মুহাম্মদ (সা.)। তাঁর পরে আর কোন নবী বা রাসূল আসবেন না। তাই কেউ যদি তা বিশ্বাস না করে নিজেকে নবী বলে দাবী করে কিংবা তাঁর পরে অন্য কাউকে কেউ নবী বলে বিশ্বাস করে, সে কাফির ও মুরতাদ হয়ে যাবে।[৬] মহানবী (সা.)-এর খতমে নবুয়াত সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে এসেছে, আজ আমি তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণতা দান করেছি, আর আমি তোমাদের জন্য আমার নেয়ামতকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছি এবং দ্বীন হিসেবে ইসলামকে তোমাদের জন্য মনোনীত করেছি। পবিত্র কুরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে, মুহাম্মদ তোমাদের মধ্যকার কোনো পুরুষের পিতা নন, তবে তিনি আল্লাহর রাসূল এবং সর্বশেষ নবী।[৭]

মুসলমানকে কাফির বলে গালি দেওয়া

হানাফীগণের মতে, কোন মুসলিমকে অপর কোনো মুসলিম কাফির বলে সম্বোধন করলে সে ফাসিক হবে, যদি সে বাস্তবিকই কাফির না হয়। এ জন্য বিচারক তাকে উপযুক্ত তাযীরী শাস্তি দেবেন।[৮] হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ "যে ব্যক্তি তার ভাইকে 'হে কাফির' বলে ডাকল, তাহলে তাদের যে কোন

---

[১] আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা আত-তিরমিযী (রহ.), আস সুনান, রিয়াদ : দারুস সালাম, ২০০৮, হাদীস নং ৩৮৬২
[২] *প্রাগুক্ত*, হাদীস নং ৩৮৬৬
[৩] এটা ইমাম আহমাদ (রহ) এর ও একটি অভিমত; মোঃ মাহবুবুল আলম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০৪
[৪] আল-আনসারী, *আসনাল মাতালিব*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১১৯; আল-মরদাভী, *আল-ইনসাফ*, প্রাগুক্ত, খ. ১০, পৃ. ৩২৩
[৫] *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ*, প্রাগুক্ত, খ. ১৬, পৃ. ৩০২
[৬] আল-আনসারী, *আসনাল মাতালিব*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১১৮; ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ৩৩
[৭] আল কুরআন, ৩৩ : ৪০
[৮] ইবনু আবিদীন, *রাদ্দুল মুহতার*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৬৯-৭০

একজন তার উপযোগিতা অর্জন করবে। যাকে কাফির ডাকা হলে সে যদি বাস্তবিকই কাফির হয়, তাহলে তো অসুবিধা নেই। যদি সে বাস্তবিকই কাফির না হয়, তা হলে কাফির সম্বোধনকারীর ওপর এর পরিণাম বর্তাবে।"[১]

শাফি'ঈ ইমামগণের মতে, যে ব্যক্তি কোন মুসলিমকে কাফির বলে অভিহিত করবে- চাই তা কোন পাপের কারণেও যদি হয়- সে নিজেই কাফির হয়ে যাবে, যদি সে নিয়ামতের কুফরী বা ইত্যাকার কোন ব্যাখ্যা ছাড়াই তা বলে থাকে। তবে এ ধরণের কোন ব্যাখ্যা পাওয়া গেলে এ জন্য তাকে কাফির বলা যাবে না।[২] তাঁদের দলীল হল, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি কাউকে কাফির কিংবা আল্লাহর দুশমন বলে ডাকল, সে যদি বাস্তবিকই তা না হয়, তা হলে তার এ কথা উল্টো তার দিকে ফিরে আসবে।"[৩]

৩. কর্ম সংশ্লিষ্ট বিষয়

কর্মের মাধ্যমেও মানুষের কুফরী প্রকাশ পেতে পারে। যেমন কেউ প্রকাশ্যে শিরক করলে, ইসলামের বিধান অস্বীকার করে তা পালন থেকে বিরত থাকলে ইত্যাদি। যে সকল কর্ম দ্বারা কুফরী প্রকাশ পায় সেসম্পর্কে নিম্নে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

আল্লাহর প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করা

মহান আল্লাহ সকল সৃষ্টির একমাত্র স্রষ্টা। ইসলাম তার মনোনীত একমাত্র ধর্ম। আল্লাহ ও তাঁর দ্বীনের প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শন বা অস্বীকার বোঝা যায়- এ ধরণের যে কোন কাজ কুফরী। যেমন- আল্লাহ তায়ালার কোন চিত্র আঁকা বা তাঁর মূর্তি তৈরি করা, চাঁদ-সুরুজের পূজা করা ইত্যদি। কোন ব্যক্তি এরূপ কোন কাজ করবে সে কাফির হয়ে যাবে, যদিও সে আল্লাহ কিংবা কুরআনের প্রতি বিশ্বাসী বলে নিজেকে দাবী করে। কারণ, তার এ অযাচিত কাজ আল্লাহ ও তাঁর কুরআনকে মিথ্যা প্রতিপন্নকরণ রূপে বিবেচিত হবে।[৪]

আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে সিজদা করা

পৃথিবীর সব কিছুই মহান আল্লাহর জন্য সিজদা করে। ইরশাদ হয়েছে, আর আল্লাহকে সিজদা করে যা কিছু আছে নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে এবং তাদের ছায়াসমূহও (সিজদা করে) সকালে ও সন্ধ্যায় ইচ্ছায় ও অনিচ্ছায়।[৫] অন্যত্র আল্লাহ আরো বলেন, তুমি কি দেখো না যে আল্লাহকে সিজদা করে যা কিছু আছে নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে, সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্ররাজি, পর্বতরাজি, বৃক্ষলতা, জীবজন্তু ও বহু মানুষ। আর বহু মানুষ (যারা সিজদা করতে অস্বীকার করেছে) তাদের ওপর শাস্তি অবধারিত হয়েছে। বস্তুত আল্লাহ যাকে লাঞ্ছিত করেন তাকে সম্মানদাতা কেউ নেই। নিশ্চয়ই

[১] মুহাম্মদ ইবনু ইসমাঈল, *সহীহ আল-বুখারী*, হা.নং. ৫৭৫৩; মুসলিম ইবনু হাজ্জাজ, *সহীহ আল-মুসলিম*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ঈমান, হা.নং. ৬০)

[২] আল-আনসারী, *আসনাল মাতালিব*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১১৮

[৩] মুসলিম ইবনু হাজ্জাজ, *সহীহ আল-মুসলিম*, কিতাবুল ঈমান, হা.নং. ৬০

[৪] নববী, আল-মাজমূ, *আল-মাজমূ' শারহুল মুহায্যাব*, আল-মাতবাআতুল মুনীরিয়্যাহ, খ. ২, পৃ. ১৯৬; আল-আনসারী, *আসনাল মাতালিব*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১১৭

[৫] আল কুরআন, ১৩ : ১৫

আল্লাহ যা চান তা-ই করেন।[১] অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন, সুতরাং তোমরা আল্লাহকে সিজদা কর এবং ইবাদাত কর।[২]

মহান আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে সিজদা করা শরীয়তের দৃষ্টিত বৈধ নয়। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, কায়স ইবন সা'দ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হিরা শহরে আগমন করে সেখানকার লোকদেরকে মারযুবানকে সিজদা করতে দেখি। আমি (মনে মনে) বলি, রাসূলুল্লাহ (সা.)ই তো সিজদার অধিকতর হকদার। তিনি বলেন, আমি নবী করীম (সা.)-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে বলি, আমি হিরাতে গমন করে সেখানকার লোকদেরকে মারযুবানকে সিজদা করতে দেখেছি। আর হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনিতো এর অধিক হকদার যে, আমরা আপনাকে সিজদা করি? তিনি বলেন, তুমি বল, যদি (আমার ইন্তেকালের পর) তুমি আমার কবরের পাশ দিয়ে গমন কর, তবে কি তুমি সেখানে সিজদা করবে? তিনি বলেন, আমি বললাম, না। তিনি বলেন, তোমরা সেরূপ করবে না। আর যদি আমি কাউকে সিজদা করতে বলতাম, তবে আমি স্ত্রীলোকদেরকে তাদের স্বামীদেরকে সিজদা করতে বলতাম। আর তা এইজন্য যে, আল্লাহ্ তায়ালা তাদেরকে (স্বামীকে) তাদের (স্ত্রীদের) উপর হক প্রদান করেছেন।[৩]

আল্লাহ ছাড়া কোন মূর্তিকে উদ্দেশ্য করে সিজদা করা, ইচ্ছাকৃতভাবে হোক কিংবা তামাসাচ্ছলে হোক চরম কুফরী। কেউ এরূপ করলে সে কাফির হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে কোন আলিম বা বুজর্গ কিংবা কোন প্রতাপশালী রাজা বাদশাহের সামনে মাটিতে সিজদা করা বা নুইয়ে পড়াও হারাম। যে তা করবে এবং যে তাতে সন্তুষ্ট থাকবে- দুজনেই বড় গুনাহগার হবে। এরূপ ব্যক্তি কাফির হবে কি না তা কিছুটা ব্যাখ্যার দাবী রাখে।[৪]

কোনো কোনো ইমাম বলেন, "সাক্ষাতের সময় রুকুর মত করে ঝুঁকে যাওয়া একটি চরম ভ্রান্তিমূলক বিদ'আত। যদি কেউ আল্লাহকে যেভাবে সম্মান প্রদর্শন করা হয়, সেভাবে কাউকে সম্মান করার উদ্দেশ্য ঝুঁকে যায়, তাহলে সে নিঃসন্দেহে মুরতাদ ও কাফির হয়ে যাবে।"[৫]

ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের ধর্মীয় পোশাক পরিধান

কোন মুসলিম অমুসলিমদের পরিচয়সূচক কোন পোশাক বা বেশভূষা (যেমন- ব্রাহ্মণদের পৈতা, বৌদ্ধদের গেরুয়া বর্ণের কাপড় ও খ্রিস্টানদের ক্রস প্রভৃতি) ধারণ করলে সে কাফির হয়ে যাবে, যদি সে তা কোন রূপ অনুরাগ বা আগ্রহ নিয়ে পরে থাকে। যদি সে তা খেলাচ্ছলে পরে থাকে, তা হলে এর জন্য তাকে কাফির বলা যাবে না; তবে এরূপ করাও হারাম।[৬] হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, ইবন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন কাওমের (সম্প্রদ্রয়ের) অনুসরণ-অনুকরণ করবে, সে তাদের দলভুক্ত হবে।[৭]

---

[১] আল কুরআন, ২২ : ১৮

[২] আল কুরআন, ৫৩ : ৬২

[৩] আবু দাউদ সুলায়মান ইবনুল আশ'আছ আস সিজিস্তানি (রহ.), *আবূ দাউদ শরীফ*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা : হাদীস নং ২১৩৭

[৪] ড. আহমদ আলী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০৬

[৫] *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ*, প্রাগুক্ত, খ. ২৩, পৃ. ১৩৫

[৬] এটা মালিকী ও হাম্বলীগণের অভিমত; ইবনু মুফলিহ, *আল-ফুরূ*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ১৬৮; ইবনু গুনায়ম, আল-ফাওয়াকিহ, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৮১

[৭] আবু দাউদ সুলায়মান ইবনুল আশ'আছ আস সিজিস্তানি (রহ.), *প্রাগুক্ত*, হাদীস নং ৩৯৮৯

ফরয ইবাদাত পরিত্যাগ করা

চার মাযহাবের প্রায় সকল ইমামের মতে, দ্বীনের যে কোন অকাট্য ও সর্বজন পরিচিত বিধানকে (যেমন নামায, রোযা, যাকাত, হজ্জ ও জিহাদ প্রভৃতি) কেউ অস্বীকার করে কিংবা উপহাস করে আমল করা ছেড়ে দিলে সে কাফির ও মুরতাদ হয়ে যাবে। তবে গাফলতি বা ইত্যাকার অন্য কোন কারণে তা কেউ আদায় না করলে সে কাফির হবে না বটে; তবে সে শাস্তিযোগ্য হবে।[১] নামায ত্যাগ করার অপরাধকে হাদীসে কুফরী হিসেবে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে, নবীজি (সা.) বলেন, বান্দা এবং শিরক-কুফরের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে নামায পরিত্যাগ করা।[২]

ইসলামী শরীয়াতের দৃষ্টিতে যাদু[৩] একটি মারাত্মক ঘৃণিত কাজ। এর শিক্ষা দান ও গ্রহণ দুটিই হারাম।[৪] হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা.) বলেছেন, সাতটি ধ্বংসকারী জিনিস থেকে দূরে থাকো। সাহাবীরা জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! সে জিনিসগুলো কি? তিনি বললেন, আল্লাহর সাথে কোনো কিছু শরীক করা, যাদু বিদ্যা শেখা ও তার চর্চা করা, যে জীবনকে হত্যা করা আল্লাহ নিষিদ্ধ করেছেন, তাকে অবৈধভাবে হত্যা করা, সূদী লেনদেন করা, ইয়াতীমের ধন আত্মসাৎ করা, যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যাওয়া, পবিত্র চরিত্রের অধিকারী মুমিন নারীর ওপর অপবাদ দেয়া।[৫]

৪. সর্বসম্মতভাবে স্বীকৃত ফরয ইবাদাত অস্বীকার

ইসলামের যে কোন অকাট্য ও সুস্পষ্ট বিধান, যা আমল করা সর্বসম্মতভাবে ফরয (যেমন নামায, রোজা, যাকাত ও হজ্জ প্রভৃতি) কেউ অস্বীকার করে তা আমল করা ছেড়ে দিলে সে কাফির ও মুরতাদ হয়ে যাবে।[৬]

ইসলামের স্পষ্ট কোনো নিদর্শনের কেউ যদি বিরোধিতা করে এবং তা বর্জন করে, তা হলে তাদেরকে তা পালন করতে বাধ্য করতে হবে। প্রয়োজন হলে তাঁদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে। কেননা সম্মিলিতভাবে ইসলামের কোন নিদর্শন ত্যাগ করা তাকে অবজ্ঞা করার নামান্তর। এটা অধিকাংশ ইমামে অভিমত। ইমাম আবূ ইউসূফ (রহ.)-এর মতে, তাদের সাথে সশস্ত্র লড়াই করা যাবে না। তবে তাদেরকে বন্দী করা হবে এবং প্রহার করা হবে।[৭]

মুরতাদের শাস্তি

ইসলামী আইনে মুরতাদের শাস্তি দুটি-

---

[১] নববী, *আল-মাজমু*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৩০৭; ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ২২

[২] আবুল হুসায়ন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল কুশায়রী আন নিশাপুরি (রহ.), *মুসলিম শরীফ*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা : হাদীস নং ১৫০

[৩] যাদু বলতে বিভিন্ন গোপন কৌশলের সাহায্যে নানা অদ্ভূত বা অস্বাভাবিক কর্মকান্ড ঘটানোর প্রক্রিয়াকে বোঝানো হয়। যাদুতে প্রায়শ কুফরী ও শিরকী উক্তির সাহায্যে শয়তান ও জিনের সাহায্য চাওয়া হয়। বিভিন্ন খারাপ মতলব ও উদ্দেশ্য (যেমন কাউকে ক্ষতি করা, মেরে ফেলা বা দুর্বল করা, পরস্পরের সম্পর্ক নষ্ট করা ও অবৈধ সম্পর্ক গড়ে তোলা প্রভৃতি) নিয়ে যাদু করা হয়; মোঃ মাহবুবুল আলম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০৬

[৪] অধিকাংশ ইমামের মতে, যাদু শিক্ষা ও চর্চা কুফরী নয়, যদি তা মুবাহ হিসেবে বিশ্বাস করা না হয় কিংবা তাতে কোন কুফরী বাক্য বা কাজের আশ্রয় না নেয়া হয়। তবে মালিকী ও হাম্বলীগণের মতে, যাদু কেউ হারাম বলে বিশ্বাস করুক কিংবা মুবাহ বলে বিশ্বাস করুক-সর্বাবস্থায় যাদু শিক্ষা ও চর্চা দুটিই কুফরী; ইবনুল হুমাম, *ফাতহুল কাদীর*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৯৮; আল-হায়তমী, *তুহফাতুল মুহতাজ*, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ৬২

[৫] মুহাম্মদ ইবনু ইনমাঈল বুখারী, *সহীহ আল-বুখারী*, প্রাগুক্ত, হা.নং. ২৬১৫; মুসলিম ইবনু হাজ্জাজ, *সহীহ আল-মুসলিম*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ঈমান, হা.নং. ৮৯

[৬] ইসলামী শাস্তি আইন, পৃ. ২০৯

[৭] *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ*, প্রাগুক্ত, খ. ২৬, পৃ. ৯৮-৯; ইবনু নুজায়ম, *আল-বাহরুর রা'ইক*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৬৯

১। আখিরাতের শাস্তি : কঠিন আযাব ও চিরস্থায়ী জাহান্নাম। মহান আল্লাহ বলেন, কোন ব্যক্তি তার ঈমান গ্রহণের পর আল্লাহকে অবিশ্বাস করলে এবং কুফরীর জন্য তার হৃদয় খুলে দিলে তার উপর আল্লাহর গযব পতিত হবে আর তার জন্য আছে মহা শাস্তি, তবে তার জন্য নয় যাকে (কুফরীর জন্য) বাধ্য করা হয় অথচ তার দিল ঈমানের উপর অবিচল থাকে।[১]

২। দুনিয়ার শাস্তি : তাকে হত্যা করা

ধর্মান্তর প্রমাণিত হবার পর যদি ধর্মান্তরকারী পুরুষ হোক বা নারী নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাওবাহ করে ঈমানের পথে ফিরে না আসে, তাহলে তার শাস্তি হল মৃত্যুদণ্ড।[২] এ ব্যাপারে সকলে একমত। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "যে তার ধর্মকে পরিবর্তন করল, তাকে তোমরা হত্যা কর।"[৩] সাহাবীগণ মুরতাদের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করেছিলেন এ মর্মে একাধিক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। আবূ বুর্‌দা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, আবূ মূসা আশআরী (রা.) বলেন, একদা আমি নবী (সা.)-এর নিকট আগমন করি, যখন আমার সাথে আশ্‌আর গোত্রের দুই ব্যক্তি ছিল। তাদের একজন আমার ডানদিকে এবং অপরজন বামদিকে ছিল। তারা উভয়ই কর্মচারী নিযুক্ত হতে চাইলে নবী (সা.) চুপ করে থাকেন। এরপর তিনি বলেন, হে আবূ মূসা, অথবা হে আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন কায়স! তুমি কি বল? তখন আমি বলি: ঐ জাত-পাকের কসম! যিনি আপনাকে সত্য নবী হিসাবে প্রেরণ করেছেন। এই দুই ব্যক্তি তাদের মনের গোপন ইচ্ছা আমাকে অবহিত করেনি এবং আমি জানতাম না যে, তারা চকরীর জন্য দরখাস্ত করবে।

আবূ মূসা (রা.) বলেন, সে সময় আমি নবী (সা.)-এর মিস্‌ওয়াকের দিকে তাকাচ্ছিলাম, যা তাঁর ঠোঁটের নীচে ছিল এবং এ কারণে তাঁর ঠোঁটের উপরের দিকে উঠানো ছিল। এরপর তিনি বলেন, যে ব্যক্তি নিজ শাসনভার পেতে চায়, আমি তাকে শাসক হিসাবে নিয়োগ করি না। কাজেই হে আবূ মূসা, অথবা হে আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন কায়স! তুমিই শাসনভার গ্রহণ কর। এরপর তিনি আমাকে ইয়ামনের গভর্নর নিয়োগ করে প্রেরণ করেন। পরে তিনি মুয়ায ইব্‌ন জাবাল (রা.)-কে ইয়ামনের শাসনকর্তা হিসাবে তার স্থলাভিষিক্ত করেন।

আবূ মূসা (রা.) বলেন, যখন মুয়ায (রা.) তার কাছে উপস্থিত হন, তখন তিনি তাকে বসার জন্য অনুরোধ করেন এবং তার জন্য একটি বালিশ রেখে দেন। এ সময় মা'আয (রা.) তার নিকট বন্ধনযুক্ত অবস্থায় এক-ব্যক্তিকে দেখতে পান। তিনি জিজ্ঞাসা করেন এ ব্যক্তি কে? তখন আবূ মূসা (রা.) বলেন, এই ব্যক্তি আগে ইয়াহূদী ছিল, পরে সে ইসলাম কবূল করে, এরপর সে ঐ খারাপ ধর্মে প্রত্যাবর্তন করেছে। তখন মুয়ায (রা.) বলেন, আমি ততক্ষণ বসবো

---

[১] আল কুরআন, ১৬ : ১০৬

[২] বর্তমানে অনেক অমুসলিম পণ্ডিত ও তাদের ভাবশিষ্য মুসলিম বুদ্ধিজীবীরাও ধর্মান্তরে এ শাস্তিকে মানুষের চিন্তার স্বাধীনতা, বাক স্বাধীনতা ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতার জন্য হুমকি মনে করে। তাদের মতে, বর্তমান সভ্য, সংস্কৃতিমনস্ক ও রুচিশীল সমাজে এ আইন চালু হতে পারে না। তাদের কথার উত্তরে সংক্ষেপে এতটুকু বলতে চাই যে, বর্তমানে সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, হংকং, বৃটেন, আমেরিকা ও ফ্রান্স প্রভৃতি উন্নত দেশেই তাদের নিজ নিজ ধর্মের সুরক্ষার জন্য সংবিধানে রাষ্ট্রীয়ভাবে ব্যবস্থা রয়েছে। যদি ধর্মান্তরে কিংবা ধর্মকে কটাক্ষ করার শাস্তি সভ্যতা বিরোধী হত, তা হলে তারা কেনইবা তাদের সংবিধানে এ আইন রচনা করেছে। বর্তমান সভ্য জগতে তারাই হল সভ্যতার ধ্বজাধারী। অধিকন্তু, এ শাস্তি স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের বিরোধী নয়; বরং সভ্যতাকে মহিমান্বিত করণ, মানুষের মৌলিক অধিকারসমূহ পূরণ এবং সুস্থ ও পবিত্র সমাজ বিনির্মাণের জন্য এর প্রয়োজন অপরিসীম; মোঃ মাহবুবুল আলম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯৪

[৩] মুহাম্মদ ইবনু ইসমাঈল, *সহীহ আল-বুখারী*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল জিহাদ, হা.নং. ২৪৫৪, কিতাবুল ইসতিতাবাতিল মুরতাদ্দীন, হা.নং. ৬৫২৪

না, যতক্ষণ না এই ব্যক্তিকে আল্লাহ্ ও রাসূলের নির্দেশ মত হত্যা করা হয়। তখন আবূ মূসা (রা.) বলেন, হ্যাঁ, এরূপই হবে। আপনি বসুন।

তখন মুয়ায (রা.) তিন বার এরূপ বলেন, আমি ততক্ষণ বসবো না, যতক্ষণ না এই ব্যক্তিকে আল্লাহ্ ও রাসূলের নির্দেশ মত হত্যা করা হয়। এরপর আবূ মূসা (রা.) তাকে হত্যার নির্দেশ দেন এবং তা কার্যকর হয়। পরে তাঁরা রাত্রি জাগরণ সম্পর্কে আলোচনা শুরু করেন। তখন তাঁদের একজন, সম্ভবতঃ মুয়ায ইব্ন জাবাল (রা.) বলেন, আমি রাতে ঘুমাই এবং উঠে সালাত ও আদায় করি; অথবা আমি রাতে উঠে সালাতও আদায় করি এবং ঘুমাইও। আর আমি দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করার জন্য যেরূপ ছাওয়াবের আশা করি, ঐরূপ ছাওয়াব আমি ঘুমিয়ে থাকাবস্থায়ও আশা করি।[1]

মুরতাদকে হত্যা করা পর তার চেহারাকে বিকৃত করা উচিত নয়। নবীজি (সা.) কারো চেহারা বিকৃত করতে নিষেধ করেছেন।[2] তবে মুরতাদ নারীর ব্যাপারে আলেমগণের মধ্যে মত পার্থক্য রয়েছে।

১. কোন কোন আলেমগণের মতে পুরুষের মত তাকেও হত্যা করতে হবে। কারণ হাদীসে পুরুষ নারীকে পৃথক করা হয়নি। উম্মে মারওয়ান নামে এক মহিলা মুরতাদ হলে রাসূলের নিকট এ সংবাদ পৌঁছানো হয়। তখন তিনি বললেন তাকে তাওবা করতে বল। তাওবা না করলে তাকে হত্যা কর।
২. কেউ কেউ বলেন, তাকে বন্দী করে রাখ, হত্যা করো না।
৩. হানাফী ইমামগণের নিকট তাকে হত্যা করা যাবে না তবে তাকে বন্দী করে ইসলামে ফিরে আসার আহবান করতে হবে। যদি অস্বীকার করে তাহলে বন্দী করে রাখতে হবে।[3]

ইসলাম থেকে বের হয়ে যাওয়ার অর্থ বিদ্রোহ করা। কোন ব্যক্তি রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলে রাষ্ট্র তাকে কখনও ক্ষমা করে না। সুতারাং মুসলমান নাম ব্যবহার করে কেউ বিদ্রোহ করলে সেও ক্ষমা পেতে পারে না। মুরতাদকে হত্যা করার পর তাকে গোসল দেওয়া যাবে না,তার নামাযে জানাযা পড়া হবে না এবং মুসলমানদের কবরস্থানে দাফনও করা যাবে না।[4]

বারবার ধর্মত্যাগের শাস্তি

শাফি'ঈ ও হানাফীগণের মতে, বারংবার ধর্মত্যাগ করে পুনঃ পুনঃ তাওবা করলে ও তা গ্রহণযোগ্য হবে। এই দুই মাযহাবের রায় হচ্ছে, তাওবা পাওয়া গেলে ধর্মত্যাগের জন্য যতবারই হোক মৃত্যুদণ্ড দেয়া যাবে না। কেননা আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, "কাফিরদেরকে বলুন, তারা যদি (শিরক থেকে) বিরত থাকে, তাহলে তাদের অতীতের সকল পাপই মোচন করে দেয়া হবে।"[5] তাঁরা এ কথাও বলেছেন, দ্বিতীয়বার ধর্মত্যাগের পর তাওবা করলে তাকে তাযীরের আওতায় প্রহার কিংবা কারাদণ্ড দেয়া হবে, হত্যা করা হবে না।[6]

ইবন আবিদীন বলেন, দ্বিতীয়বার ধর্মান্তর করার পর তাওবা করলে প্রহারের পর তাকে ছেড়ে দেয়া হবে। যদি ফিরে তৃতীয়বারও ধর্মত্যাগ করে তা হলে এবারে তাকে ভীষণ বেদনাদায়ক প্রহার করা হবে এবং বন্দী করে রাখা হবে, যে

---

[1] আবু দাউদ সুলায়মান ইবনুল আশ'আছ আস সিজিস্তানি (রহ.), *আবূ দাউদ শরীফ*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা : হাদীস নং ৪৩০৩
[2] *প্রাগুক্ত*, হাদীস নং ৪৩১৭
[3] সাইয়েদ সাবেক, *ফিকহুস সুন্নাহ*, বৈরূত : দারুল কিতাবুল আরাবী, খন্ড ২, পৃঃ ৪৫১
[4] *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ*, প্রাগুক্ত, খ. ২২, পৃ. ১৯৫; আল-হাদ্দাদী, আল-*জাওহারাহ*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৭৬
[5] আল কুরআন, ৮ : ৩৮
[6] আল-আনসারী, আল-গুরার..., প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৭৮; আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, প্রাগুক্ত, খ. ১০, পৃ. ৯৯-১০০

যাবত না তার খাঁটি তাওবার প্রমাণ পাওয়া যাবে। এভাবে যতবারই সে ধর্মত্যাগ করবে, ততবারই এরূপ আচরণ করা হবে।[১]

হাম্বলীগণের মতে, বারংবার ধর্মত্যাগকারীদের তাওবা গ্রহণযোগ্য হবে না। হানাফীগণের এ ধরনের একটি মত বিরোধ রয়েছে। তাছাড়া ইমাম মালিক (রহ.)-এর দিকেও এ মতের নিসবত করা হয়।[২] তাঁদের দলীল হল : আল্লাহ তায়ালা বলেন, "নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে, অতঃপর কুফরী করেছে, অতঃপর ঈমান এনেছে, অতঃপর কুফরীর মাত্রা বাড়িয়ে দিয়েছে। আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে ক্ষমাও করবেন না এবং তাদেরকে পথও দেখাবেন না।"[৩] তিনি আরো বলেছেন, "নিশ্চয়ই যারা ঈমান আনয়নের পর কুফরী করেছে, অতঃপর কুফরী আরো বাড়িয়ে দিয়েছে, তাদের তাওবা কখনোই গ্রহণ করা হবে না।"[৪] বর্ণিত আছে যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদ (রা.) এর কাছে জনৈক মুরতাদকে আনার পর তিনি বললেন , তোমাকে আরো এক বার আনা হয়েছিল। আমি তো মনে করেছিলাম, তুমি সত্যি সত্যিই তাওবা করেছিলে। এখন তো দেখি, তুমি ফিরে আবারো ধর্মত্যাগ করলে। এ বলে তিনি তাকে হত্যা করলেন।[৫]

ধর্মান্তরের শাস্তি কার্যকর করার শর্ত

মুরতাদের উপর হদ্দ কায়েমের পূর্বে কিছু শর্ত পূরণ হওয়া জরুরি। শর্তগুলো নিম্নরূপ-

পুরুষ হওয়া

হানাফীগণের মতে, ধর্মান্তরের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার জন্য ধর্মান্তরকারীকে পুরুষ হতে হবে। ধর্মান্তরের জন্য নারীকে হত্যা করা যাবে না; বরং তাকে বন্দী করে রাখা হবে, যে যাবত না সে তাওবা করে। তবে অন্যান্য মাযহাবের ইমামগণের মতে, পুরুষদের মত ধর্মত্যাগী নারীদের জন্যও একই বিধান প্রযোজ্য হবে।[৬] তাঁদের দলীল হল : রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "যে তার ধর্মকে পরিবর্তন করল, তাকে তোমরা হত্যা কর।"[৭]

এ হাদীসে পুরুষ ও নারীর মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয়নি। অতএব, ধর্মত্যাগ করার ক্ষেত্রে পুরুষদের জন্য যে বিধান প্রযোজ্য হবে, নারীদের সে একই বিধান প্রযোজ্য হবে। হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উম্মু রুমান (বা মারওয়ান) নাম্নী জনৈকা মহিলার ইসলাম ধর্মত্যাগ করার ঘটনায় রাসূলুল্লাহ (সা.) নির্দেশ দান করেন, প্রথমে তাকে ইসলামের প্রতি পুনরায় আহ্বান জানাতে হবে। যদি সে তাওবা করে ফিরে আসে, তা হলে তো ভালই। অন্যথায় তাকে হত্যা করা হবে।"[৮]

---

[১] ইবনু আবিদীন, *রাদ্দুল মুহতার*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২২৫-৬
[২] ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ১৮; যায়লা'ঈ, *আত-তাবয়ীন*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ২৭৪
[৩] আল কুরআন, ৩ : ৩৭
[৪] আল কুরআন, ৩ : ৯০
[৫] আল-বহুতী, *আল-কাশশাফ*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ১৭৭; ইবনু মুফলিহ, *আল-মুবদি*, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ১৭৯
[৬] ইমাম মুহাম্মদ ইবনু ইদ্রিস শাফি'ঈ, *আল-উম্ম*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৯৪; আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, প্রাগুক্ত, খ. ১০, পৃ. ১০৯
[৭] ইমাম মুহাম্মদ ইবনু ইদ্রিস শাফি'ঈ, *আল-উম্ম*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৯৪; আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, প্রাগুক্ত, খ. ১০, পৃ. ১০৯
[৮] আল বায়হাকী, *আস-সুনান* আল-কুবরা, প্রাগুক্ত, হা.নং.১৬৬৪৩; আলী দারুকুতনী, *আস-সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল হুদুদ, হা.নং.১২২

প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া

ধর্মান্তরের শাস্তি কার্যকর করার জন্য ধর্মান্তরকারীকে প্রাপ্তবয়স্ক হতে হবে। যে সব ইমাম অপ্রাপ্তবয়সের ধর্মান্তরকে হদ্দযোগ্য ধর্মত্যাগ রূপে গণ্য করেন, তাঁদের দৃষ্টিতেও এ শাস্তি কার্যকর করা যাবে না, যে যাবত না সে বালিগ হবে।[১] অপ্রাপ্তবয়স্ক মুরতাদকে পুনরায় ঈমানের পথে ফিরিয়ে আনার জন্য চেষ্টা করতে হবে।[২]

সুস্থ বিবেক সম্পন্ন হওয়া

ধর্মান্তরের শাস্তি কার্যকর করার জন্য ধর্মান্তরকারীকে সুস্থ বিবেকসম্পন্ন হতে হবে। মানষিক বিকারগ্রস্ত হলে শাস্তি প্রয়োগ করা যাবে না।

স্বেচ্ছায় ধর্ম ত্যাগ

এ শাস্তি কার্যকর করার জন্য ধর্মান্তরকারীকে কারো কোন জবরদস্তি ছাড়া স্বেচ্ছায় ধর্মত্যাগ করতে হবে।

তাওবার সুযোগ দেওয়া

ধর্মান্তরের শাস্তি কার্যকর করার জন্য ধর্মান্তরকারীকে তাওবার জন্য তিন দিন[৩] সুযোগ দিতে হবে। এটা মালিকী ও হাম্বলীগণের মতে ওয়াজিব। তাঁদের বক্তব্য হল, হয়ত তার কাছে ইসলামের কোন বিষয়ে সন্দেহ ছিল। তাই তা নিরসন করা প্রয়োজন। হানাফীগণের মতে, এটা মুস্তাহাব। কেননা ইসলামের দাওয়াত তো তার কাছে আগেই পৌঁছে গেছে এবং সে বুঝে শুনেই ইসলাম গ্রহণ করেছে কিংবা মেনে নিয়েছে।[৪] বর্ণিত আছে, জনৈক ধর্মত্যাগীকে তাওবার সুযোগ না দিয়ে হত্যা করার খবর শুনে হযরত ‘উমার (রা.) ভীষণ দুঃখিত হলেন এবং বললেন, “আমি অবশ্যই তাকে তাওবার জন্য তিন দিনের সুযোগ দিতাম। যদি সে তাওবা করত তা তো ভালই হত। তা না হলেই আমি তাকে হত্যা করতাম।”[৫]

তাছাড়া ইতঃপূর্বে বর্ণিত হযরত জাবির (রা.) এর হাদীস থেকেও জানা যায়, রাসূলুল্লাহ (সা.) উম্মু রুমান নাম্নী জনৈকা ধর্মত্যাগকারিণী মহিলাকে তাওবার সুযোগ দিতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। উল্লেখ্য যে, তাওবার সুযোগ না দিয়ে ধর্মত্যাগীকে হত্যা করা হলে হত্যাকারী অপরাধী সাব্যস্ত হবে। এ জন্য হত্যাকারীকে তা'যীরের আওতায় সাধারণ শাস্তি দেয়া যাবে; কিসাস বা বড় ধরনের শাস্তি দেয়া যাবে না।[৬] সাহাবীগণও মুরতাদদের ওপর শাস্তি কার্যকর করার পূর্বে তাদের ইসলামে ফিরে আসার, তাওবা করার দাওয়াত দিতেন। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, আবূ বুরদা (রহ.) এ ঘটনা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, একদা আবূ মূসা (রা.)-এর নিকট জনৈক মুরতাদ ব্যক্তিকে হাযির করা হয়। তিনি তাকে প্রায় বিশ দিন যাবৎ পুনরায় মুসলমান হওয়ার জন্য অনুরোধ করতেন। পরে মুয়ায (রা.)ও সেখানে উপস্থিত হয়ে তাকে দ্বীনের দাওয়াত দেন। কিন্তু সে তা অস্বীকার করলে তাকে হত্যা করা হয়।[৭]

---

[১] যায়ল'ঈ, আত-*তাবয়ীন*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ২৯২-৩; ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ২৪

[২] ইমাম মুহাম্মদ ইবনু ইদ্রিস শাফি'ঈ, *আল-উম্ম*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ১৭২

[৩] শাফি'ঈগণের মতে, তাওবার জন্য তাৎক্ষণিক সুযোগ দেয়া হবে। তিন দিনের ফুরসত দেয়া যাবে না। আর-রামালি, *নিহায়াতুল মুহতাজ*, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ৪১৯

[৪] ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ১৭-৮; আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, প্রাগুক্ত, খ. ১০, পৃ. ৯৮-৯

[৫] আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, প্রাগুক্ত, খ. ১০, পৃ. ৯৯

[৬] যায়ল'ঈ, আত-*তাবয়ীন*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ২৮৪

[৭] আবু দাউদ সুলায়মান ইবনুল আশ'আছ আস সিজিস্তানি (রহ.), *আবূ দাউদ শরীফ*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা : হাদীস নং ৪৩০৫

ভিন্ন ব্যাখ্যা দেওয়ার সম্ভাবনা না থাকা

ধর্মান্তরের শাস্তি কার্যকর করার জন্য ধর্মান্তরকারীর বক্তব্য বা কাজ এমন হতে হবে, যা সুস্পষ্ট রূপে কুফরী বোঝায়। যদি তার বক্তব্যে কিংবা কাজে ভিন্ন কোন ব্যাখ্যার সম্ভাবনা থাকে এবং সে নিজেও যদি তা বলে, তা হলে তাকে এ কথা বা কাজের জন্য ধর্মত্যাগ করেছে- বলা যাবে না এবং এর জন্য শাস্তিও দেয়া যাবে না। অনুরূপভাবে আবেগের আতিশয্যে কারো মুখ দিয়ে ভুলক্রমে বা অসতর্কতামূলভাবে হঠাৎ কোন কুফরী বাক্য উচ্চারিত হলে তাও ধর্মত্যাগ রূপে গণ্য হবে না।[১] যেমন-কেউ আল্লাহকে উদ্দেশ্য করে বলতে চাইল, "হে আল্লাহ! তুমি আমার রব, আর আমি তোমার গোলাম", কিন্তু তার মুখ দিয়ে অনিচ্ছাকৃতভাবে বের হয়ে গেল, "তুমি আমার গোলাম, আর আমি তোমার রব।"[২] মহানবী (সা.)-এর নিকট কারো ব্যাপারে ধর্মান্তরের অভিযোগ করা হলে তিনি অভিযুক্ত ব্যক্তির বক্তব্য ও ব্যাখ্যা না শুনে কোনো রায় দিতেন না । উমর ইবনে খত্তাব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উমর ইবন খাত্তাব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হিশাম ইবন হাকীম (রা.) কে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর জীবদ্দশায় সূরা ফুরকান পড়তে শুনেছি। আমি তার পড়ার প্রতি কর্ণপাত করলাম, (আমি লক্ষ্য করলাম) যে, তিনি এর অনেক গুলো অক্ষর এমন পদ্ধতিতে পড়ছেন, যে পদ্ধতিতে রাসুলুল্লাহ (সা.) আমাকে পড়ান নি। ফলে আমি তাকে সালাত এর মাঝেই আক্রমন করতে উদ্যত হলাম। কিন্তু সালাম ফিরানো পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম। সালাম ফিরানোর পর আমি তাকে তার চাঁদর দিয়ে অথবা বললেন, আমার চাঁদর দিয়ে জড়িয়ে নিলাম। আর বললাম, তোমাকে এ সূরা কে পড়িয়েছে? তিনি বললেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) আমাকে পড়িয়েছেন। আমি তাকে বললাম, তুমি মিথ্যা বলছ। আল্লাহর কসম! রাসুলুল্লাহ (সা.) আমাকে এ সূরা পড়িয়েছেন যা তোমাকে পড়তে শুনেছি।

তারপর আমি তাকে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট টেনে নিয়ে গেলাম। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি এ ব্যক্তিকে সূরা ফুরকান এরূপ অক্ষর দিয়ে পড়তে শুনেছি যা আপনি আমাকে পড়াননি। আর আপনি তো আমাকে সূরা ফুরকান পড়িয়েছেন। তিনি বলেন, তখন রাসুলুল্লাহ (সা.) বললেন, হে উমর! তাকে ছেড়ে দাও। (আর বললেন) হে হিশাম! তুমি পড় তো। হিশাম তার কাছে এভাবেই পড়লেন, যেভাবে তাকে তা পড়তে আমি শুনেছিলাম। রাসুলুল্লাহ (সা.) বললেন, এভাবেই নাযিল করা হয়েছে এরপর রাসুলুল্লাহ (সা.) বললেন, হে উমর! তুমিও পড়। আমি পড়লাম। তখন তিনি বললেন, এভাবেও নাযিল করা হয়েছে। অতঃপর তিনি বললেন, এ কুরআন সাত (রকমে কিরাআতের দিক দিয়ে) ভাষায় নাযিল করা হয়েছে। তাই যে পদ্ধতিতেই সহজ হবে সে পদ্ধতিতেই তোমরা তা পড়বে।[৩]

পাপী ব্যক্তি মাত্রই মুরতাদ বা কাফির নয়

যখন কোনো মুসলমানের মুখ দিয়ে এমন কোনো শব্দ উচ্চারিত হয়, যা কুফরির অর্থ ব্যক্ত করে, কিন্তু উচ্চারণকারী সেই অর্থটি ব্যক্ত করতে চায়নি, অথবা এমন কোনো কাজ তার দ্বারা সংঘটিত হয়, যা বাহ্যত তাকে কাফের বা অমুসলিম হিসেবে চিহ্নিত বা পরিচিত করে, অথচ এ কাজের কর্তা তা দ্বারা ইসলামকে ত্যাগ করতে ও কাফেরে

[১] ড. আহমদ আলী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯৩
[২] ইবনু আবিদীন, *রাদ্দুল মুহতার*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২২৯-৩০
[৩] আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল বুখারী আল জুফী (রহ.), *বুখারী শরীফ*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা : হাদীস নং ৬৪৬৭

পরিণত হতে চায়নি, তখন তাকে কাফের বলে রায় দেয়া যাবেনা।[১] মুসলমান যতই পাপ কাজে লিপ্ত হোক ও অপরাধ সংঘটিত করুক, সে মুসলমানই থাকবে, তাকে মুরতাদ বলা যাবেনা। বুখারিতে বর্ণিত হয়েছে, আনাস ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, যে ব্যক্তি আমাদের ন্যায় সালাত আদায় করে, আমাদের কিবলামুখী আর আমাদের যবেহ করা প্রাণী খায়, সে-ই মুসলিম, যার জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যিম্মাদার। সুতরাং তোমরা আল্লাহর যিম্মাদারীতে খিয়ানত করো না।[২]

জাদু ও জাদুকরের বিধান

ইসলামের দৃষ্টিতে জাদু একটা কবীরা গুনাহ। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, ধ্বংসকারী সাতটি কাজ থেকে তোমরা বেচে থেকে। আরয করা হল, হে আল্লাহর রাসূল! সেগুলো কি? তিনি বললেন, (১) আল্লাহর সাথে শরীক করা (২) যাদু করা (৩) আল্লাহ যার হত্যা নিষেধ করেছেন যথার্থ কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করা (৪) ইয়াতীমের মাল (অন্যায়ভাবে) খাওয়া (৫) সুদ খাওয়া (৬) যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করা এবং (৭) সধবা, সরলমনা ও ঈমানদার নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করা।[৩]

আবু হানিফা ও ইমাম মালেক বলেছেন, জাদু শেখা মাত্রই জাদুকর হত্যাযোগ্য হয়ে যায়। অতপর জাদু দ্বারা কাজ করলে তো সে হত্যাযাগ্য হবেই। তাকে তওবার আহ্বান জানানো শর্ত নয়। শাফেয়ি ও যাহেরি মাযহাবের মতে, যে কথা ও কাজ দ্বারা সে জাদু করে, তা যদি কুফরী কালাম ও কুফরী কাজ হয়, তাহলে জাদুকর মুরতাদ এবং তওবা না করলে তার উপর মুরতাদের যাবতীয় হুকুম কার্যকর হবে। আর তার কথা ও কাজ যদি কুফরী সূচক হয়, তবে তাকে হত্যা করা হবেনা। কেননা সে কাফের নয়। সে শুধু গুনাহগার।[৪]

চুরি

ধন সম্পদ মানব জীবনের চালিকাশক্তি। মানব জীবনে অর্থ সম্পদ থাকা অপরিহার্য। ইসলাম ধন সম্পদ অর্জন ও ব্যয়ের পূর্ণাঙ্গ বিধান পেশ করেছে। প্রত্যেক ব্যক্তির ধন সম্পদের মালিকানা অর্জনের অধিকার রয়েছে। কোন ব্যক্তি অন্যায়ভাবে অন্যের সম্পদ দখল করার অধিকার নেই। সেজন্য ইসলাম চুরি, ধোকা, প্রতারণা, সুদ, ভেজাল, ঘুষ, ওজনে কম-বেশি করে মালের মালিক হওয়া অন্যায় ও জুলুম মনে করে।

মৌলিক প্রয়োজন মেটানোর কোন ব্যবস্থাই না থাকলে মানুষ নিরুপায় হয়ে চুরি করতে পারে। কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্র প্রত্যেকটি নাগরিকের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বিধান করে থাকে, যাতে কেউ না খেয়ে বা অভাব-অনটনে আক্রান্ত হয়ে না পড়ে। এ সব মৌলিক প্রয়োজনগুলো পূরণ হলে ইসলামী রাষ্ট্রে চুরি করার প্রয়োজন পড়ে না। এরূপ সুব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও কেবল সে লোকই চুরি করতে পারে, যে অন্যায়ভাবে অধিক সম্পদ অর্জন করার অভিলাষী মনোভাব কিংবা যে

---

[১] সাইয়্যেদ সাবেক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৬০-৬১
[২] আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল বুখারী আল জুফী (রহ.), *বুখারী শরীফ*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা : হাদীস নং ৩৮৪
[৩] *প্রাগুক্ত*, হাদীস নং ১৬৪
[৪] সাইয়্যেদ সাবেক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৬৯

অপ্রয়োজনীয় বিলাসিতা বা অপব্যয় করতে অভিপ্রায়ী হয়। তাই সুস্থ সমাজ বিনির্মাণের পক্ষে এ ধরনের চুরি খুবই মারাত্মক ও বিপর্যয় সৃষ্টিকারী অপরাধ। এ কারণে ইসলাম চুরি নিষিদ্ধ করেছে, চুরির যাবতীয় পথ ও উপলক্ষ্যকে সর্বাত্নকভাবে বন্ধ করে দিয়েছে।[১]

আভিধানিক অর্থে চুরি

চুরি-এর আরবী প্রতিশব্দ (سرقة)। যার বাংলা অর্থ চুরি, তস্করবৃত্তি, তস্করতা, অপহরণ।[২] গোপনে ও ধোকা দিয়ে সম্পদ গ্রহণ করাও চুরি।[৩] চুরি বলতে সাধারণত অপরের মাল গোপনে করায়ত্ত করাকে বোঝানো হয়।[৪] এর ইংরেজী প্রতিশব্দ হচ্ছে, Theft, Stealing.

চুরির সংজ্ঞা

শরীয়াতের পরিভাষায় কোন মুকাল্লাফ (বালিগ ও সুস্থ বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তি) কর্তৃক অপরের মালিকানা বা দখলভূক্ত নিসাব পরিমাণ বা তার সমমূল্যের সম্পদ সংরক্ষিত স্থান থেকে গোপনে করায়ত্ত করাকে 'চুরি' বলে।[৫] কারো মতে, প্রাপ্ত বয়স্ক, বুদ্ধিমান ব্যক্তি কর্তৃক অন্যায়ভাবে গোপনে সুরিক্ষত স্থান থেকে নির্দিষ্ট পরিমান সম্পদ নেয়াকে চুরি বলা হয়।[৬] সাইয়্যেদ সাবেক বলেন, চুরি হচ্ছে গোপনে অন্যের সম্পদ হরণ করা। ড. আবদুল আযীয আমের বলেন, যখন কোনো বুদ্ধিমান , বালেগ, সুস্থ ব্যক্তি কোনো ধরনের সংশয় সন্দেহ ছাড়া সজ্ঞানে, স্বপ্রণোদিত হয়ে অপর কোনো ব্যক্তির এমন সম্পদ তার সম্পূর্ণ অজ্ঞাতে হাতিয়ে নেয় যা অস্থাবর মূল্যবান এবং সংরক্ষিত স্থানে রক্ষিত। উপরন্তু সম্পদটি মূল্যমানের দিক হতে কর্তনযোগ্য নেসাবের সমপরিমাণ। এ ধরনের পরধন হাতিয়ে নেওয়াকে চুরি বলে।[৭]

চুরি করা জঘন্য পাপের কাজ

ইসলামের দৃষ্টিতে চুরি জঘন্য পাপসমূহের একটি। এর দ্বারা সামাজিক শৃঙ্খলা, মানুষের সম্পদের নিরাপত্তা ও চোরের নৈতিক চরিত্রও নষ্ট হয়। যে কারণে ইসলামে চুরিকে জঘন্য পাপের কাজ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, আবূ হুরায়রা (রা.) সূত্রে রাসূলুল্লাহ (সা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন,

لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ثُمَّ التَّوْبَةُ مَعْرُوضَةٌ بَعْدُ

---

[১] মোঃ মাহবুবুল আলম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৮

[২] ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আরবী-বাংলা ব্যবহারিক অভিধান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০২

[৩] সাইয়েদ সাবেক, পূর্বোক্তি, খ. ২ পৃ. ৪৮৭

[৪] আবু বকর মুহাম্মদ আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত* , বৈরুত: দারুল মাআরিফাহ খ.৯, পৃ. ১৩৩

[৫] ইবনুল হুমাম, *শরহে ফাতহুল কাদির মাআ তাকমিলাতি নাতাইজিল অফকার ফী কাশফির রুমুযি ওয়াল হিদায়া*, মাতবাআ আমিরিয়্যাহ, সংস্ক. ১,, খ. ৫, পৃ.৩৫৫; আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যা, প্রাগুক্ত, খ. ২৪, পৃ. ২৯৩

[৬] আহম্মদ ফাতহী বাহানসী, *আসসিয়াসা জানাইয়া ফিস শরীয়া ইসলামিয়া*, বৈরূত : দারুল উরূবা, ১৯৬৫, পৃঃ ১১৫

[৭] ড. আবদুল আযীয আমের, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯

যখন ব্যভিচারী ব্যভিচার করে, তখন সে মুমিন অবস্থায় ব্যভিচার করে না, আর যখন চোর চুরি করে, তখন সে মুমিন অবস্থায় চুরি করে না, আর যখন মদ পান করে, তখন সে মুমিন অবস্থায় মদপান করে না। এরপরও তওবার সুযোগ রাখা হয়েছে।[১]

অপর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ

আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, সেই চোরের উপর আল্লাহর লানত, যে একটি ডিম চুরি করে, যার বিনিময়ে তার হাত কাটা যায় এবং একটি রশি চুরি করে, আর তার হাত কাটা হয়।[২]

শরীয়া আইনে চুরি প্রমাণের পদ্ধতি

ইসলামী আইন শাস্ত্রে চোরের চুরি প্রমাণ করার জন্য নির্দিষ্ট পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে। ইসলামী আইন অনুসারে যথাযথ সাক্ষ্য-প্রমাণ কিংবা চোরের স্বীকারোক্তি দ্বারা চুরি প্রমাণিত হবে। তবে কারো কারো মতে শপথের সাহায্যে এবং বিভিন্ন লক্ষণ দ্বারাও চুরি প্রমাণ করা যেতে পারে।[৩]

সাক্ষ্য

চার মাযহাবের অধিকাংশ ইমামের মতে, চুরি প্রমাণের জন্য দু'জন ন্যায়-পরায়ণ মুসলিম পুরুষের সাক্ষ্যের প্রয়োজন। সাক্ষী যদি দুজনের কম হয় অথবা একজন প্রত্যক্ষদর্শী এবং অপরজন শ্রোতা সাক্ষী হয়, অথবা একজন পুরুষ সাক্ষী ও দু'জন মহিলা সাক্ষী হয়, তাহলে সে ক্ষেত্রে অভিযুক্তের ওপর চুরির হদ্দ প্রয়োগ করা যাবে না।[৪]

চোরের স্বীকারোক্তি

চোরের অভিযোগ অভিযুক্ত সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন ব্যক্তি[৫] যদি স্বেচ্ছায় আদালতে বিচারকের সামনে চুরির সুস্পষ্ট স্বীকারোক্তি করে তাহলে চুরি প্রমাণিত হবে। অধিকাংশের মতে, মালিকের দাবীর প্রেক্ষিতেই যদি চোর স্বীকারোক্তি করে, তবেই তার স্বীকারোক্তি গ্রহণযোগ্য হবে। এ কারণেই অজ্ঞাত কিংবা অনুপস্থিত কোন লোকের মাল কেউ চুরি করলে তাতে হদ্দ কার্যকর করা যাবে না।[৬]

স্বীকারোক্তির সংখ্যা

তবে কতবার স্বীকারোক্তি দিতে হবে তা নিয়ে কিছুটা মতপার্থক্য রয়েছে। অধিকাংশদের মতে, একবার স্বীকারোক্তিই যথেষ্ট। তবে হাম্বলীগণ এবং হানাফীগণের ইমাম আবূ ইউসূফ (রহ.)-এর মতে, দু'এজলাসে দুবার স্বীকৃতি দ্বারা চুরি

---

[১] আবু আবদির রহমান ইবনে শোয়াইব আন নাসায়ী (রহ.), *নাসায়ী শরীফ*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা : হাদীস নং ৪৮৭১
[২] *প্রাগুক্ত*, হাদীস নং ৪৮৭৩
[৩] মোঃ মাহবুবুল আলম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৮
[৪] আলা উদ্দীন আল-কাসানী, বদা'ইয়ুস সনাই, , বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, খ. ৭, পৃ. ৮১
[৫] হানাফীগণের মতে স্বীকারোক্তিদানকারীকে বাকশক্তি সম্পন্ন হতে হবে। কোন বোবা ব্যক্তির স্বীকৃতিমূলক ইঙ্গিত দ্বারা কার্যকর করা যাবে না; *ইসলামী শাস্তি আইন*, পৃ. ১১৯
[৬] ড. আহমদ আলী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭২

প্রমাণিত হবে। যদি একবার স্বীকারোক্তি দেয়, তাহরে হদ্দ কার্যকর করা যাবে না। তাকে তা'যীরী শাস্তি দেয়া হবে এবং চুরিকৃত মাল কিংবা তার মূল্য ফিরিয়ে দিতে হবে।[১]

স্বীকারোক্তি আদায়ে বন্দি করা

কারো বিরুদ্ধে চুরির অভিযোগ দায়ের করার পর সে অস্বীকার করতে পারে। ইসলামী আইন এ ক্ষেত্রে বিচারককে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বন্দী করে স্বীকারোক্তি আদায়ের চেষ্টা করার অনুমতি দিয়েছে। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّهُ رَفَعَ إِلَيْهِ نَفَرٌ مِنْ الْكَلَاعِيِّينَ أَنَّ حَاكَةً سَرَقُوا مَتَاعًا فَحَبَسَهُمْ أَيَّامًا ثُمَّ خَلَّى سَبِيلَهُمْ فَأَتَوْهُ فَقَالُوا خَلَّيْتَ سَبِيلَ هَؤُلَاءِ بِلَا امْتِحَانٍ وَلَا ضَرْبٍ فَقَالَ النُّعْمَانُ مَا شِئْتُمْ إِنْ شِئْتُمْ أَضْرِبْهُمْ فَإِنْ أَخْرَجَ اللَّهُ مَتَاعَكُمْ فَذَاكَ وَإِلَّا أَخَذْتُ مِنْ ظُهُورِكُمْ مِثْلَهُ قَالُوا هَذَا حُكْمُكَ قَالَ هَذَا حُكْمُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

হযরত নুমান ইবন বাশীর (রা.) থেকে বর্ণিত। কয়েকজন কালায়ী গোত্রের লোক তার নিকট এসে বললো, কতিপয় তাঁতী আমাদের মালপত্র চুরি করেছে। তিনি কয়েকদিন তাদেরকে বন্দি করে রেখে ছেড়ে দেন। কালায়ী লোকেরা তাঁর নিকট এসে বললো, আপনি ঐ সকল লোককে কোন প্রকার শাস্তি বা পরীক্ষা না করে ছেড়ে দিলেন? নুমান (রা.) বললেন, তোমরা কী চাও? তোমরা চাইলে আমি তাদের মারব। তারপর যদি তোমাদের মাল তাদের নিকট পাওয়া যায়, তবে তোমরা ভাল, আর তা না হলে, আমি তোমাদের পিঠ থেকে তার প্রতিশোধ নেব! তারা বললো, এটা কি আপনার আদেশ? তিনি বললেন, এটা আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল এর হুকুম।[২]

আপর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَبَسَ نَاسًا فِي تُهْمَةٍ

বাহয ইবন হাকীম (রহ.) তার পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) অভিযোগের ভিত্তিতে কোন কোন লোককে বন্দী করেন।[৩]

শপথ বাক্য পাঠ

শপথ বাক্য পাঠের মাধ্যমেও চুরির প্রমাণ সাব্যস্ত করা যায়। যখন চুরিকৃত সম্পদের মালিকের দাবীর স্বপক্ষে কোন সাক্ষী উপস্থিত না থাকে, আর চোরও স্বীকার না করে, তখন চোরকে শপথ করতে বলা হবে। যদি সে শপথ করতে অস্বীকৃতি জানায়, তখন সম্পদের মালিককে শপথ করতে বলা হবে। যদি সে দাবীর পক্ষে শপথ করে বলে, তাহলে শাফি'ঈগণের বিশুদ্ধ মতানুযায়ী মালিকের এ শপথ দ্বারা চুরি প্রমাণিত হবে এবং চোরের হাতও কাটা যাবে। তবে হানাফী, মালিকী ও হাম্বলী ইমামগণের নিকট এরূপ অবস্থায় চোরের হাত কাটা যাবে না।[৪]

---

[১] শামসুদ্দীন আল-মাকদিসি ইবনু মুফলিহ, *আল-ফুরূ*, আলমুল কুতুব, খ. ৬, পৃ. ২২; মুয়াফ্‌ফাকুদ্দীন ইবনু কুদামা, *আল-মুগনী*, বৈরুত: দারুইহইয়াইত তুরাছিল আরবী, খ. ৯, পৃ.১১৮

[২] আবু আবদির রহমান ইবনে শোয়াইব আন নাসায়ী (রহ.), *নাসায়ী শরীফ*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা : হাদীস নং ৪৮৭৪

[৩] *প্রাগুক্ত*, হাদীস নং ৪৮৭৫

[৪] উসমান যায়ল'ঈ, *তাবয়ীনুল* হাকাইক শারহু কানযিদ দাকাইক, দারুল কিতাবিল ইসলামী খ.৪, পৃ.২৯৭; পৃ.১২২; যাকারিয়া আল-আনসারী, *আসনাল মাতালিব* দারুল কিতাবিল ইসলামী, খ. ৪, পৃ. ১৫০

চুরির লক্ষণ বিদ্যমান

ইমামগণের একাংশের মতে, কারো কারো মতে বিভিন্ন লক্ষণ দ্বারাও চুরি প্রমাণিত হবে, যদি তাতে সুস্পষ্টভাবে চুরির প্রমাণ পাওয়া যায়। ইবনল কাইয়িম বলেন, মুসলিম খলীফা ও শাসকগণ চুরির অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তির হাত কাটতে নির্দেশ দিতেন, যদি তার কাছে চুরিকৃত মাল পাওয়া যেত। কেননা সাক্ষ্য ও চোরের স্বীকারোক্তির চাইতে চুরি সাব্যস্ত করার জন্য সুস্পষ্ট লক্ষণ অধিকতর শক্তিশালী প্রমাণ। কারণ, সাক্ষ্য ও স্বীকারোক্তি যেহেতু এক প্রকার সংবাদ দান, তাই এগুলোর মধ্যে সত্য-মিথ্যার একটা অবকাশ সবসময় বিদ্যমান থাকে। পক্ষান্তরে চুরিকৃত মাল অভিযুক্ত ব্যক্তির কাছে পাওয়া গেলে তাতে চুরির ব্যাপারে আর কোন সন্দেহ থাকবার কথা নয়।[১]

তবে অধিকাংশ ইমামের মতে, সাক্ষ্য-প্রমাণ কিংবা স্বীকারোক্তি ছাড়া অন্য কোনভাবেই হদ্দযোগ্য চুরি প্রমাণ করা যাবে না।[২] কোন লোক চুরি করলেই তার হাত কাটা যাবে না। তবে কি পরিমাণ সম্পদ চুরি করলে চুরির হদ্দ কার্যকর করা ওয়াজিব হবে তা নিয়ে ইমামগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে।[৩]

চুরির নিসাব

চোরের হাত কর্তন করার ক্ষেত্রে চুরির পরিমান (নিসাব) নিয়ে ফকীহগণ মতভেদ করেছেন। নিম্নে চুরির নিসাব সম্পৃক্ত ইমামগণের মতামত ও এর স্বপক্ষের দলিল উপস্থাপন করা হলো।

দীনারের এক চতুর্থাংশ

শাফি'ঈগণের মতে, এক দিনারের[৪] এক চতুর্থাংশ।[৫] রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, এক দিনারের এক চতুর্থাংশ বা তার বেশি পরিমাণ মূল্যের সম্পদ চুরি করলে তার শাস্তিস্বরূপ হাত কাটা যাবে।[৬]

তিন দিরহাম

মালিকীগণের মতে, চুরির নিসাব তিন দিরহাম। তাঁদের দলীল হল, রাসূলুল্লাহ (সা.) এবং হযরত 'উসমান (রা.) দুজনেই তিন দিরহাম মূল্যের বর্ম চুরিতে হাত কেটেছেন। হযরত 'ইবন 'উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (সা.) তিন দিরহাম মূল্যের বর্মের চুরিতে হাত কেটেছেন।[৭]

পাঁচ দিরহাম

নাফে (রহ.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

---

[১] আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনুল কাইয়্যেম আল-জাওযিয়্যা, *'ইলামূল মু'আক্কি'ঈন*, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, খ. ২, পৃ. ৭৬-৭৭

[২] মুয়াফ্‌ফাকুদ্দীন ইবনুকুদামাহ, *আল-মুগনী*, বৈরুত: দারু ইহয়াইত্ তুরাছিল আরবী, খ. ৯, পৃ.১১৮

[৩] আলী আয-যাহিরী ইবনু হাযম, *আল-মুহাল্লা*, দারুল ফিকর, খ.১২, পৃ.৩৪৪-৫; আস-সারাখসী, আল-মাবসূসত, খ.৯, পৃ.১৩৬-৯; আল-কাসানী, বদা'ই, খ.৭, পৃ.৭৭-৯

[৪] দীনার : ২০ কীরাত ওযনের স্বর্ণের তৈরি মুদ্রা বিশেষ। বর্তমানে তা ৪.২৫ গ্রামের সমান; মোঃ মাহবুবুল আলম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২০

[৫] মুহাম্মদ ইবনু ইদ্রিস শাফি'ঈ, *আল-উম্ম*, বৈরুতঃ দারুল মায়ারিফাহ, খ.৬, পৃ.১৪০

[৬] মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ, *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল হূদূদ, হা.নং : ১৬৮৪

[৭] ইমাম মালিক ইবনু আনাছ, *আল-মুদাওয়ানাহ*, বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, খ.৪, পৃ. ৫২৬ ; মুহাম্মদ ইবনু ইসমাইল, *সহীহ আল-বুখারী* , কিতাবুল হূদূদ, হা.নং. ৬৪১১, ৬৪১২, ৬৪১৩

سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَطَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ كَذَا قَالَ

আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) একটি ঢালড় যার মূল্য ছিল পাঁচ দিরহাম, চুরি করায় চোরের হাত কাটার নির্দেশ দেন। [১]

একটি ঢালের সমমূল্য পরিমাণ সম্পদ

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে,

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَطَعَ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلاَثَةُ دَرَاهِمَ

ইবন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সা.) তিন দিরহাম মূল্যের ঢাল চুরি করার কারণে এক ব্যক্তির হাত কাটার নির্দেশ দেন। [২]

হযরত আয়েশা (রা.) কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, ঢাল বা বর্মের মূল্য কত? তিনি বললেন, এক দিনারের এক চতুর্থাংশ।[৩] তবে এক দিনারের এক চতুর্থাংশের পরিমাণ নিয়ে ইমামগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। ইমাম শাফি'ঈ (রহ.)-এর মতে তিন দিরহাম, ইবন আবী লায়লা (রহ.)-এর মতে পাঁচ দিরহাম।[৪]

রশি বা ডিম হলেও

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ "

আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, চোরের প্রতি আল্লাহর অভিসম্পাত, ডিম চুরি করার অপরাধে যার হাত কাটা যায় এবং রশি চুরি করার অপরাধে যার হাত কাটা যায়। [৫]

দশ দিরহাম

হানাফীগণের মতে, ন্যূনতম দশ দিরহাম[৬] বা তার সমমূল্যের কোন বস্তু চুরি করা হলে তবেই চুরির হদ্দ কার্যকর করা হবে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, "এক দিনার বা দশ দিরহামের কমে হাত কাটা যাবে না।"[৭] তাঁদের বক্তব্য হল মালিকী ও শাফি'ঈগণের বর্ণিত হাদীসমূহের সুনির্দিষ্ট পরিমাণের কথা উল্লেখ নেই। এগুলোতে বিভিন্ন ব্যাখ্যার অবকাশ

---

[১] আবু আবদির রহমান ইবনে শোয়াইব আন নাসায়ী (রহ.), *নাসায়ী শরীফ*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা : হাদীস নং ৪৯০৬

[২] আবু দাউদ সুলায়মান ইবনুল আশ'আছ আস সিজিস্তানি (রহ.), *আবূ দাউদ শরীফ*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা : হাদীস নং ৪৩৩৪

[৩] আল বায়হাকী, *আস-সুনান* আল-কুবরা, প্রাগুক্ত, কিতাবুল হুদূদ, হা.নং. ১৬৯৪৯; আহমদ নাসাঈ, *আস-সুনান* আল-কুবরা, প্রাগুক্ত (কিতাবুর হুদূদ, হা.নং.৭৪২২

[৪] দাউদ আয-যাহিরীর মতে, কম-বেশি যা চুরি করুক তার জন্য হাত কাটার শাস্তি প্রযোজ্য হবে। তাঁর বক্তব্য হল- যা তারা রোজগার করেছে তারই শাস্তি স্বরূপ-এ আয়াতে শব্দটি কম-বেশি সব পরিমাণের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে; ইবনু কুদামা, *আল-মুগনী*, খ.৯, পৃ.৯৪-৫

[৫] আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনু ইয়াজিদ ইবনু আবদুল্লাহ ইবনু মাজাহ (রহ.), *ইবনে মাজাহ শরীফ*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা : হাদীস নং ২৫৮৩

[৬] দিরহাম: রৌপ্যের তৈরি মুদ্রা বিশেষ। বর্তমানে তা হল ৯.৭৫ গ্রামের সমান; মোঃ মাহবুবুল আলম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২১

[৭] আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবনু ঈসা, *সুনান আত-তিরমিযী* , কিতাবুল হুদূদ, হা.নং. ১৪৪৬

রয়েছে। হযরত ইবন আব্বাস (রা.) থেকে তিন দিরহাম বর্ণিত রয়েছে। কেউ কেউ আবার চার দিরহাম এবং পাঁচ দিরহামের কথাও উল্লেখ করেছেন।[১]

অপর দিকে হযরত আয়েশা (রা.)এর মতে, এক দিনারের এক চতুর্থাংশ সমান দশ দিরহাম। হানাফীগণের মতে, যেহেতু বর্মটির মূল্য কত তা নিয়ে সাহাবীগণের মধ্যেও মতপার্থক্য রয়েছে, তাই এ ক্ষেত্রে অধিক পরিমাণের বর্ণনা সম্বলিত রেওয়ায়েতটি অধিকতর গ্রহণযোগ্য। কারণ তার চাইতে কম পরিমাণের মধ্যে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। আর সন্দেহযুক্ত অবস্থায় হদ্দ কার্যকর না করাই হল ইসলামী শাস্তি আইনের একটি বৈশিষ্ট্য[২] বর্তমানে দশ দিরহামের সমপরিমাণ প্রায় ২৯.৭৫ গ্রাম রৌপ্য বা তার সমমূল্যের কোন মাল চুরির নিসাব হিসেবে গণ্য হবে। এটা হানাফী ইমামগণের মতানুযায়ী নির্ধারণ করা হয়েছে। তাঁরা মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে রৌপ্যকে প্রাধান্য দেন।[৩]

পক্ষান্তরে শাফি'ঈগণ মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে স্বর্ণকে প্রাধান্য দেন। তাই তাঁদের মতানুযায়ী .২৫ দিনারের সমপরিমাণ প্রায় ১.০৬২৫ গ্রাম স্বর্ণ বা তার সমমূল্যের কোন মাল চুরির নিসাব হিসেবে গণ্য হবে। তদুপরি চুরি করার সময় চুরিকৃত বস্তুর যা দাম ছিল মূল্য নির্ধারনের ক্ষেত্রে তা-ই বিবেচ্য হবে। তবে হানাফীগণের মতে, হাত কাটার সময় চুরিকৃত বস্তুর মূল্য হ্রাস পেয়ে নিসাবের চাইতে কমে গেলে হদ্দ প্রয়োগ করা যাবে না।[৪] এর কম মূল্যের কোন বস্তু চুরি করলে তা হদ্দের আওতায় পড়বে না; তবে তাযীরের আওতায় শাস্তিযোগ্য হবে। যদি একসাথে একাধিক ব্যক্তি চুরি করে এবং চুরিকৃত মাল চুরিতে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে সমানভাবে বণ্টন করে দিলে প্রত্যেকের প্রাপ্য অংশ চুরির নিসাব পরিমাণ বা তার অধিক হয়, তা হলেই সকলের ওপর হদ্দ কার্যকর হবে। অন্যথায় তাযীরের আওতায় সাধারণ শাস্তি কার্যকর করা হবে।[৫]

চোরাই মালের মূল্য নির্ধারণ

মালেকি, শাফেয়ি ও হাম্বলি মাযহাব অনুসারে চোরাই মালের মূল্য নির্ধারণ করা হবে যেদিন চুরি হয়েছে সেই দিনের বাজার দর অনুসারে। [৬]

চুরির শাস্তি

চুরির দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হল হাত কাটা। পবিত্র কুরআনে এ বিষয়ে সুস্পষ্ট ঘোষণা এসেছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْٓا اَيْدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللّٰهِ ؕ وَ اللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

---

[১] ড. আহমদ আলী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৫
[২] আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ১৩৬-৯; আল-কাসানী, *বদা'ইয়ুস সনা'ই*, খ.৭, পৃ.৭৭-৯
[৩] ড. আহমদ আলী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৫
[৪] ইবনুল হুমাম, *ফাতহুল কাদীর*, খ.৫, পৃ.৪০৭; শায়খী যাদাহ, মাজমা'উল আনহুর..., খ. ১, পৃ. ৬২৬
[৫] ইবনু কুদামা, *আল-মুগনী*, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ১২০; আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ১৪৩
[৬] সাইয়্যেদ সাবেক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৯৭

পুরুষ চোর ও নারী চোর উভয়ের হাত কেটে দাও। এটা তারা যা উপার্জন করেছে তার প্রতিফল এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে দৃষ্টান্ত। আর আল্লাহ তায়ালা মহাপরাক্রমশালী ও বিজ্ঞানী।[১]

এ আয়াত থেকে জানা যায়, এ শাস্তি আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত। এ বিষয়ে সমগ্র মুসলিম উম্মাহ সম্পূর্ণ একমত।[২]

চোরের হাত কাটার পরিমাণ

আল্লাহর বাণী দ্বারা বুঝা যায় চুরির কারণে হাত কাটা ওয়াজিব। ফকীহগণ এ ব্যাপারে ঐক্যমত্য রয়েছে যে, প্রথমে ডান হাত কর্তন করতে হবে, তবে কোথা থেকে হাত কাটা হবে এ ব্যাপারে তাদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। মিশরীয় ফকীহগণ বলেন হাতের কব্জি থেকে কাটতে হবে কনুই ও কাঁধ থেকে নয়। খারেজীগণ বলেন কাঁধ পর্যন্ত কাটতে হবে। আবার কেউ বলেন শুধু হাতের আঙ্গুল-সমূহ কাটতে হবে।[৩] জমহুর ফকীহগণের দলিল রাসূল (সা.) চোরের হাত কব্জি থেকে কেটে দিয়েছেন। তেমনিভাবে আলী (রা.) ও উমর (রা.) থেকে বর্ণিত যে তাঁরা উভয়েই চোরের হাত কব্জি থেকে কেটে দিয়েছেন। এটাই নির্ভরযোগ্য।[৪]

বারবার চুরির শাস্তি

কোনো পেশাদার চোর যদি বারবার চুরি করতে থাকে তার ওপর ততবার হদ্দ কার্যকর হবে যতবার সে চুরি করবে। এ ব্যাপারে শরীয়াতের বিধান পরিবর্তনের কোনো সুযোগ নেই।

দ্বিতীয়বার চুরি

চোর দ্বিতীয়বার চুরি করলে ফকীহগণের ঐক্যমতে তার বাম পা কেটে দিতে হবে।[৫] এতে প্রসিদ্ধ ইমামগণের কারো দ্বিমত নেই। রাসূল (সা.) বলেন, চোর চুরি করলে তার হাত কেটে দাও। পুনরায় চুরি করলে তার বাম পা কেটে দাও। আলী ও উমর (রা.) প্রথমে চোরের হাত কেটে দিয়েছেন দ্বিতীয়বার ডান পা কেটে দিয়েছেন, আর এ কাজটি করা হয়েছিল সাহাবাদের উপস্থিতিতে। তাদের একাজ কেউ অস্বীকার করেননি। সুতারাং এটা ইজমায় রূপান্তরিত হয়েছে।[৬]

তৃতীয়বার চুরি

চোর তৃতীয়বার চুরি করলে তার তৃতীয় বারের চুরির শাস্তি হল কারাগারে আটক রাখা। কারণ তৃতীয়বারও যদি তার হাত পা কেটে ফেলা হয়, তাহলে জীবনে তার চলার ও বেঁচে থাকার আর কোন শক্তিই থাকবে না। এটা প্রকারান্তরে

---

[১] আল কুরআন, ৫ : ৩৮

[২] ইবনু কুদামা, *আল-মুগনী*, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ১০৫-৬

[৩] আল-কাসানী, *বাদায়েউস সানায়ে*, ১৯৮২, বৈরূত : দারুল কিতাবুল আরাবী, খন্ড ৭, পৃঃ ৯০

[৪] মুহাম্মদ আবু জাহরাহ, আল জরিমা অল অকুবাত ফি ফিকহুল ইসলামী, বৈরূত : দারুল ফিকর আরাবী ১৯৮৭, পৃঃ ১১৩

[৫] ইবনু কুদামা, *আল-মুগনী*, প্রাগুক্ত খ. ৯, পৃ. ১০৫-৬। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, "চোর চুরি করলে তার হাত কেটে দাও। এরপর ফিরে আবার চুরি করলে তার পা কেটে দাও।" আলী দারু কুতনী, আসসুনান , কিতাবুল হূদূদ, হা.নং : ২৯২

[৬] জুসাস, *আহকামূল কুরআন*, তা.বি, বৈরূত : দারুল কিতাবুল আবারী, খন্ড ২, বাব হুদুদ হারাবা, পৃঃ ৬

তাকে ধ্বংস করারই নামান্তর। হদ্দের উদ্দেশ্য কাউকে ধবংশ করা নয়; বরং অপরাধের প্রতি ভীতি তৈরি করাই হল হদ্দের একান্ত উদ্দেশ্য। এটা হানাফী ও কতিপয় হাম্বলী ইমামের মত।[১]

অপর দিকে মালিকী ও শাফি'ঈ ইমামগণের মতে, তৃতীয়বার চুরি করলে বাম হাত, আর চতুর্থবার চুরি করলে ডান পা কেটে ফেলতে হবে। তারপরও যদি চুরি করে, তবেই তাকে তাযীরের আওতায় কারাগারে বন্দী করে রাখা হবে।[২] তাঁদের দলীল হল- রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "যখন চোর চুরি করে, তার হাত কেটে দাও। যদি পুনরায় চুরি করে তার পা কেটে দাও। যদি আবার চুরি করে, তাহলে তার হাত কেটে দাও। ফিরে আবারো চুরি করলে তার পা কেটে দাও।"[৩]

হানাফী ইমামগণের পক্ষ থেকে এ হাদীসের জবাবে বলা হয় যে, মুসলিম খলীফাদের অনেকেই এ হাদীসের ওপর আমল করেন নি; তাঁরা কেউ তৃতীয়বার চুরি করলে তাকে কারাগারে বন্দী করে রাখতেন। সম্ভবত বর্ণনায় বিভিন্নতার কারণে তাঁরা হাদীসটি গ্রহণ করেন নি।[৪]

অধিকাংশ ইমামের মতে দুইবার চুরির শাস্তি ভোগ করার পর পুনরায় চুরি করলে তার ওপর হদ্দের শাস্তি কার্যকর হবে না। বরং বিচারক তাযীরী শাস্তি হিসেবে প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে তাকে প্রদান করবেন। বর্ণিত আছে যে, একসময় হযরত আলী (রা.) এর দরবারে হাত-পা কাটা এক চোরকে আনা হল। তখন হযরত আলী (রা.) উপস্থিত লোকদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, এ ব্যক্তি সম্পর্কে তোমাদের মতামত কী? তাঁরা বললেন, তাঁর অঙ্গ কর্তন করুন, হে আমীরুল মুমিনীন! উত্তরে আলী' (রা.) বললেন, তা করলে তো তাকে ধ্বংসই করে ফেললাম। সে কি দিয়ে আহার করবে, কিভাবে নামাযের ওযু করবে, কিভাবে অপবিত্রতা থেকে পবিত্রতা হাসিল করবে? তাকে কয়েকদিন কারাগারে রেখে দাও। এর কিছু দিন পর তাকে কারাগার থেকে বের করে পুনরায় তিনি সাহাবীগণের সাথে পরার্মশ করলে তাঁরা প্রথমবারের মতোই জবাব দিলেন। অতঃপর আলী' (রা.) তাকে কঠিনভাবে বেত্রাঘাত করলেন। অতঃপর তাকে ছেড়ে দিলেন।[৫]

চোরের হাত কাটার পরিমাণ

হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদ (রা.) এ فاقطعوا ايديهما এর পরিবর্তে فاقطعوا ايمانهما প্রসিদ্ধ কিরা'আত[৬] দ্বারা জানা যায় যে, চোরের ডান হাতই কাটতে হবে। রাসূলুল্লাহ (সা.) নিজেও ডান হাত কাটার নির্দেশ দিয়েছেন।তাছাড়া খুলাফায়ে রাশিদীনের আমল ও বর্ণনা দ্বারা জানা যায়, কব্জি থেকে হাত কাটতে হবে। পরবর্তীকালের মুসলিম শাসকগণও কব্জি থেকে কেটেছেন। কারো কারো মতে, শুধু আঙ্গুলগুলোই কাটতে হবে। কেননা ধরা, নেওয়া ইত্যাদি কাজ আঙ্গুল দ্বারাই সম্পন্ন হয়। এতে হাত কাটার উদ্দেশ্যও অর্জিত হয়।[৭]

---

[১] আল-কাসানী, *বদা'ইয়ুস সনাই*, প্রাগুক্ত, খ.৭, পৃ. ৮৬-৭; আল-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ.১৪০-১

[২] ইমাম মালিক ইবনু আনাছ, *আল-মুদাওয়ানাহ*, প্রাগুক্ত, খ.৪, পৃ.৫৩৯; মুহাম্মদ ইদ্রিস শাফি'ঈ, *আল-উম্ম*, প্রাগুক্ত, খ.৮, পৃ.৩৭১; আল-মাওয়াক, *আত-তাজ ওয়াল ইকলীল*, খ.৮, পৃ. ৪১৪;

[৩] দার কুতনী, *আস-সুনান*, বৈরুতঃ দারুল মাআরিফাহ, ১৯৬৬, কিতাবুল হূদূদ, হা.নংঃ ২৯২

[৪] মোঃ মাহবুবুল আলম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২২

[৫] আস-সরাখসী, *আল-মাবসূত*, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ.১৪০-১; আল-কাসানী, বদা'ই, প্রাগুক্ত, খ.৭, পৃ.৮৬-৮৭

[৬] মুহাম্মদ ইবনু জরীর আত-তাবারী, *জামিউল বয়ান আত-তাবিলিল আল কুরআন*, বৈরুতঃ দারুল ফিকর, ১৪০৫ হি., খ. ৬, পৃ. ২২৮

[৭] ড. আহমদ আলী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭০

খারিজীদের মতে, ডান হাতের কাঁধের জোড়া থেকে কাটা হবে। কেননা হাত বলতে সবটারই নাম। আবার কারো মতে, হাতের মধ্যখান থেকে কাটতে হবে। তবে এ মতগুলোর পক্ষে কোন দলীল নেই। অধিকন্তু, সাহাবা কিরামের আমল দ্বারা তা প্রমাণিত নয়।[১] দ্বিতীয়বার চুরির ক্ষেত্রে বাম পা গোড়ালি থেকে কাটা হবে। তবে কারো কারো মতে, পায়ের গোড়ালি বরাবর ঠিক রেখে বাকী অংশ কেটে ফেলতে হবে, যাতে সে পায়ের ওপর ভর করে চলাফেরা করতে পারে।[২]

হাত-পা কাটার পর সাথে সাথে ব্যাণ্ডেজ করে দিতে হবে, যাতে রক্ত প্রবাহ বন্ধ হয়ে যায়। প্রচণ্ড শীত বা গরমের সময় কর্তন করা সমীচীন নয়। তদুপরি যতটুকু সম্ভব অতি দ্রুত ও সহজভাবে কাটার কাজ সেরে ফেলতে হবে।[৩]

ক্ষতিপূরণ এবং হদ্দ উভয়টির প্রয়োজনীয়তা

চোরাই মাল যখন অক্ষত থাকে তবে তা তার মালিকের নিকট ফেরত দিতে হবে। কেননা রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, চোর যা চুরি করেছে, তাকে তা ফেরত দিতে হবে। এটা শাফেয়ী ও ইসহাকের মত। চোরের কাছ থেকে যখন চুরি করা মাল নষ্ট হয় বা খোয়া যায়, তখন তাকে তার বদলা দিতে হবে এবং হাতও কাটা হবে। এ ব্যাপারে একজন অপরজনকে বাধা দিতে পারবেনা। কেননা ক্ষতিপূরণ মানুষের হক। আর হাত কাটা আল্লাহর হক। তাই কেউ কাউকে বাধা দিতে পারেনা যেমন বাধা দিতে পারেনা দিয়ত ও কাফফারা দিতে। আবু হানিফার মতে, চোরাই মাল খোয়া গেলে চোরকে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য করা হবেনা। শুধু হাত কাটা হবে। ইমাম মালেকের মতে, চোর সচ্ছল হলে ক্ষতিপূরণ দেবে, নচেৎ শুধু হাত কাটা হবে।[৪]

অপ্রাপ্তবয়স্ক, পাগল চুরি করলে

পাগল চুরি করলে তার ওপর হদ্দ কার্যকর হবে না। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ عَائِشَةَ، رضى الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَكْبَرَ "

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, তিন ব্যক্তি হতে কলম উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে (অর্থাৎ যাদের ভাল-মন্দ আমল লেখা হয় না)। এরা হলো- (১) নিদ্রিত ব্যক্তি- যতক্ষণ না সে জাগরিত হয়। (২) পাগল ব্যক্তি- যতক্ষণ না সুস্থ হয় এবং (৩) নাবালক ছেলে মেয়ে- যতক্ষণ না তারা বয়ঃপ্রাপ্ত হয়।[৫]

---

[১] যায়ল'ঈ, *তাবয়ীন*, খ.৩, পৃ.২২৪-২২৫; ইবনু কুদামা, *আল-মুগনী*, খ. ৯, পৃ. ১০৬

[২] আবু বকর আল-হাদ্দাদী, *আল-জাওহারাতুন নাইরিয়্যাহ*, আল-মাতবা'তুল খায়রিয়্যাহ, খ. ৩, পৃ. ১৭০; ইবনু কুদামা, *আল-মুগনী*, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ১০৬

[৩] হানাফীগণের নিকট এটা ওয়াজিব। তাঁদের বক্তব্য হলঃ যদি রক্ত বন্ধ করা না হয় তাহলে এতে অন্য অঙ্গহানির সম্ভাবনা থাকে। শাফি'ঈ ও হাম্বলীদের নিকট বেন্ডিজ করা ওয়াজিব নয়; তবে মুস্তাহাব। আল-হাদ্দাদী, *আল-জাওহারাতুন নাইরিয়্যাহ*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ.১৭০; ইবনু কুদামা, *আল-মুগনী*, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ.১০৬

[৪] সাইয়্যেদ সাবেক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪০৩

[৫] আবু দাউদ সুলায়মান ইবনুল আশ'আছ আস সিজিস্তানি (রহ.), *আবূ দাউদ শরীফ*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা : হাদীস নং ৪৩৪৬

অভাবী লোকের চুরি

চরম অভাবগ্রস্ত, নিস্বঃ ব্যক্তি, ক্ষুধার তাড়নায় পীড়িত ব্যক্তি, নিজের এবং পরিবার পরিজনের ক্ষুধা নিবারণে অক্ষম ব্যক্তি চুরি করলে তার ওপর হদ্দ কার্যকর করা যাবে না। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে-

عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ فَقَالَ " مَنْ أَصَابَ بِفِيهِ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً فَلاَ شَىْءَ عَلَيْهِ وَمَنْ خَرَجَ بِشَىْءٍ مِنْهُ فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَالْعُقُوبَةُ وَمَنْ سَرَقَ مِنْهُ شَيْئًا بَعْدَ أَنْ يُئْوِيَهُ الْجَرِينُ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সা.) কে বৃক্ষের ফল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, যদি কোন অভাবি লোক তার প্রয়োজন অনুপাতে তা খায় এবং কাপড় ভরে না নেয় তবে এতে দোষের কিছু নেই। আর যদি কেউ কাপড় ভরে নেয়, তবে তার থেকে এর বিনিময় আদায় করতে হবে, বা তাকে সতর্ক করার জন্য কিছু শাস্তিও দিতে হবে। আর কোন ব্যক্তি যদি ফল খাওয়ার পরিবর্তে তা গাছ থেকে ছিঁড়ে জমা করে (চুরির উদ্দেশ্যে), যার মূল্য একটি ঢালের মূল্যের সমান হয়, তবে এ জন্য অবশ্যই হাত কাটা যাবে।[১]

ক্রীতদাস চুরি করলে

ক্রীতদাস চুরি করলে তার ওপরও হদ্দ কার্যকর হবে না। ক্রীতদাস চুরি করলে তাকে নামমাত্র মূল্যে হলেও রাসূলুল্লাহ (সা.) বিক্রি করে দিতে বলেছেন। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ عَبْدًا، مِنْ رَقِيقِ الْخُمُسِ سَرَقَ مِنَ الْخُمُسِ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يَقْطَعْهُ وَقَالَ " مَالُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ سَرَقَ بَعْضُهُ بَعْضًا " .

ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। যুদ্ধলব্ধ মাল (গানীমাত) থেকে প্রাপ্ত একটি যুদ্ধবন্দী দাস যুদ্ধলব্ধ মালের রাষ্ট্রের প্রাপ্য অংশ থেকে চুরি করলে তাকে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট পেশ করা হলো। কিন্তু তিনি তার হাত কর্তনের নির্দেশ দেননি। তিনি বলেন, মহামহিম আল্লাহর সম্পদের একাংশ অপরাংশ চুরি করেছে।[২] অপর হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) কোনো ক্রীতদাস চুরি করলে তাকে বিশ দিরহামের বিনিময় হলেও বিক্রির নির্দেশ দিয়েছেন।[৩]

দুর্ভিক্ষ কালে চুরি করা হলে

দুর্ভিক্ষের সময় নিজের এবং পরিবার পরিজনের ক্ষুধা নিবারণের কারণে চুরি করে তাহলে শাস্তি প্রযোজ্য হবে না। উমর (রা.) বলেন, দুর্ভিক্ষের সময় হাত কর্তন করা যাবে না।[৪]

চুরিকৃত সম্পদের বিধান

আর তা হল, চুরিকৃত মাল যদি মজুদ থাকে, তা হলে চোর অবস্থাসম্পন্ন হোক কিংবা দারিদ্র ক্লিষ্ট, চাই চোরের হাত কাটা হোক না হোক, চাই চুরিকৃত মাল চোরের কাছে থাকুক বা অন্যের কাছে সর্বাবস্থায় মাল মালিকের কাছে ফিরিয়ে

---

[১] *প্রাগুক্ত*, হাদীস নং ৪৩৩৯

[২] আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনু ইয়াজিদ ইবনু আবদুল্লাহ ইবনু মাজাহ (রহ.), *ইবনে মাজাহ শরীফ*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা : হাদীস নং ২৫৯০

[৩] *প্রাগুক্ত*, হাদীস নং ২৫৮৯

[৪] ইবনে কুদামা, *মুগনী*, রিয়াদ : মকতবা হাদীসাহ, তা.বি খন্ড ১০ পৃঃ ২৮৪

দিতে হবে। এ বিষয়ে ইমামগণ সকলেই একমত।[১] বর্ণিত রয়েছে, হযরত সাফওয়ান (রা.) এর চাদর চুরির ঘটনায় রাসূলুল্লাহ (সা.) চোরের হাত কাটার পর চাঁদর তাকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন।[২]

তদুপরি চুরি প্রমাণিত হবার পর কোন কারণে যদি চোরের হাত কাটা সম্ভব না হয় এবং চুরিকৃত মাল নষ্ট বা খরচ হয়ে যায়, তাহলে চুরিকৃত মালের মূল্য কিংবা তার সমতুল্য মাল মালিককে পরিশোধ করে দিতে হবে। তবে চুরির শাস্তি হিসেবে যদি চোরের হাত কাটা হয়, তাহলে চুরিকৃত মাল নষ্ট হয়ে গেলে কিংবা খরচ হয়ে গেলে তার মূল্য কিংবা তার সমতুল্য মাল পরিশোধ করতে হবে না। আল-কুরআনের আয়াতে শুধু হাত কাটার শাস্তির কথাই উল্লেখ করা হয়েছে অর্থাৎ সে যে অপরাধ করেছে তার সবটুকুর শাস্তি হল হাত কাটা। অতএব, এর সাথে আর কোন শাস্তি যুক্ত করা যাবে না। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, "চোরের হাত কাটা হলে তাকে কোন প্রকার আর্থিক ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না।"[৩] এ হাদীস থেকে জানা যায় যে, চোরের হাত কাটা ও চুরিকৃত মালের ক্ষতিপূরণ দেয়ার শাস্তি একসাথে দেওয়া যাবে না। এটা হানাফীগণের প্রসিদ্ধ অভিমত।

মালিকীগণের মতে, চোর যদি চুরি করার সময় থেকে হাত কাটা পর্যন্ত সময় অবস্থাসম্পন্ন থাকে, তাহলে নষ্ট বা ব্যয় হয়ে যাওয়া মালের জন্য ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। শাফি'ঈ ও হাম্বলীগণের মতে চুরি প্রমাণিত হলে চোরকে সর্বাবস্থায় চুরিকৃত মাল কিংবা তার মূল্য মালিকের নিকট ফেরত দিতে হবে এবং চোরের হাত ও কাটতে হবে। তাঁদের যুক্তি হল, হাত কাটার বিধান প্রযোজ্য হবে আল্লাহর হুকুম লঙ্ঘন করার কারণে আর ক্ষতিপূরণ বান্দাহর হক নষ্ট করার কারণে।[৪]

সফর অবস্থায় চুরি করা হলে

সফর বা ভ্রমণ অবস্থায় ইসলামের অনেক বিধান পালনের পদ্ধতিই পরিবর্তিত হয়ে যায়। যেমন- চার রাকাআত ফরয নামায দুই রাকাত পরা যায়, রোযা পরবর্তীতে কাযা করা যায় ইত্যাদি। সফর অবস্থায় চুরি করলে ঐ চোরের ওপর হদ্দ কার্যকর করার অনুমতি ইসলামী শরীয়াতে দেওয়া হয়নি। বুরসা ইবন আতা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تُقْطَعُ الْأَيْدِي فِي السَّفَرِ

আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে বলতে শুনেছি, সফরে হাত কাটা যাবে না।[৫]

যুদ্ধের সময়ে চুরি করা হলে

ইসলামী শরীয়াতে যুদ্ধের সময় চুরি করলে ঐ চোরের ওপর হদ্দ কার্যকর করার অনুমতি দেওয়া হয়নি। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, জুনাদা ইবন আবূ উমাইমা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা বুসর ইবন আরতাত (রা.) এর সাথে সমুদ্রের সফরে ছিলাম। তখন তাঁর নিকট 'মিসদার' নামক একজন চোরকে হাযির করা হয়, যে উষ্ট্রী চুরি

---

[১] আবু মুহাম্মদ গানিম, মাজমা'উদ দিয়ানাত , দারুল কিতাবিল ইসলামী, পৃ. ২০৩; আল-কাসানী, বদা'ইয়ুস সনা'ই, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ৮৯-৯০

[২] আহমদ আন-নাসাঈ, *আস-সুনান* , কিতাবুল কত'ইস সারিক, হা.নং. ৭৩৬৯

[৩] আবু বাকর জসসাস, *আহকামূল কুরআন*, দারুল ফিকর, তা. বি., খ. ৪, পৃ. ৮৪; ইউচুপ ইবনু আবদিল বারর, আত-তামহীদ (আল-মাগরিব, ওয়াযারাতুল আওকাফ, ১৩৮৭ হি.) খ.১৪, পৃ. ৩৮৩;

[৪] আবু মুহাম্মদ গানিম, *মাজমা'উদ দিয়ানাত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৩; আলা উদ্দীন আল-মারদাভী, *আল-ইনসাফ* ফি মা'য়ারিফাতির রাজিহ, বৈরুত: দারু ইহইয়াইত তুরাছিল আরবী, খ. ১০, পৃ. ২৮৯

[৫] আবু আবদির রহমান ইবনে শোয়াইব আন নাসায়ী (রহ.), *নাসায়ী শরীফ*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা : হাদীস নং ৪৯৭৮

করেছিল। তখন তিনি বলেন আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) কে বলতে শুনেছি, তোমরা সফরে থাকাবস্থায় কোন চোরের হাত কাটবে না। যদি অবস্থা এরূপ না হতো, তাহলে অবশ্যই আমি তার হাত কেটে দিতাম।[১]

কাফনের কাপড় চোরের শাস্তি বিধান

ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম শাফি'ঈও ইমাম মুহাম্মদ (রহ) প্রমুখের মতে, কোন ব্যক্তি কবর থেকে কাফন চুরি করলে তাকেও চুরির শাস্তি দেয়া যাবে না। কেননা সংরক্ষিত মাল চুরি না করলে তা চুরি বলে গণ্য হবে না। কাফন নিরাপদে হিফাযতে রাখা মাল নয়। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, আবূ যার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাকে বলেন, হে আবূ যার! তখন আমি বলি, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি হাযির এবং আপনার নির্দেশের অপেক্ষা করছি। তিনি বলেন, তুমি সে সময় কি করবে, যখন ব্যাপকহারে লোকজন মারা যাবে এবং একটি গোলামের বিনিময়ে কবরের স্থান পাওয়া যাবে? তখন আমি বলি, এ ব্যাপারে আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল সমধিক অবহিত। তিনি বলেন, এ সময় তুমি সবর করবে, অথবা সবর করা উচিত! ইমাম আবূ দাউদ (রহ.) বলেন, রাবী হাম্মাদ ইবন সুলায়মান (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কাফন চোরেরও হাত কাটা যাবে; কেননা সে মৃতের আবাসগৃহে-প্রবেশ করে চুরি করে।[২]

মালিকী ও হাম্বলী এবং হানাফীগণের মধ্যে ইমাম আবূ ইউসূফ (রহ.) প্রমুখ ইমামগণের মতে, কাফন চোরদের হাত কাটা হবে, যদি তার মূল্য নিসাব পরিমাণ হয়।[৩]

আত্মসাতকারী ও খিয়ানতকারী চোর নয়

ইসলামী আইনে আত্মসাতকারী ও খিয়ানতকারী চোর নয়। তারা নিসাব পরিমাণ সম্পদের অধিক আত্মসাত করলেও তাদের ওপর চুরির হদ্দ কার্যকর করা যাবে না। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ وَلاَ مُنْتَهِبٍ وَلاَ مُخْتَلِسٍ قَطْعٌ " .

জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, নাবী (সা.) বলেছেন, খিয়ানতকারী, লুন্ঠনকারী এবং ছিনতাইকারীর উপর হাত কর্তন প্রযোজ্য নয়। [৪]

দলগত চুরি

যখন এক দল চোর এতটা সম্পদ চুরি করে যে, তা দলের সকল সদস্যের মধ্যে বন্টন করলে প্রত্যেকের অংশে যা পড়ে, তাতে হাত কাটা অনিবার্য হয়ে পড়ে, তখন ফকিহদের সর্বসম্মত মতানুসারে সকলের হাত কাটা হবে। কিন্তু যদি চোরাই মালের পরিমাণ এমন হয় যে, তা একত্রে হাত কাটার নেসাবের সমান হয়, কিন্তু বন্টন করে দিলে নেসাবের সমান হয়না, তখন ফকিহদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। অধিকাংশ ফকিহর মতানুসারে সকলের হাত কাটা হবে। আবু হানিফা বলেন, প্রত্যেকের অংশ নেসাব পরিমাণ না হলে হাত কাটা হবেনা।[৫]

---

[১] আবু দাউদ সুলায়মান ইবনুল আশ'আছ আস সিজিস্তানি (রহ.), *আবূ দাউদ শরীফ*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা : হাদীস নং ৪৩৫৬

[২] *প্রগুক্ত*, হাদীস নং ৪৩৫৭

[৩] আল-বহুতী, *দকা'ইক উলিন নুহা*, আলামুল কুতুব, খ. ৩, পৃ. ৩৭৪; রুহায়বানী, *মাতলিব*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ২৩৯

[৪] আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা আত-তিরমিযী (রহ.), *তিরমিযী শরীফ*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা : হাদীস নং ১৪৫৪

[৫] সাইয়্যেদ সাবেক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৮৭

কর্য গ্রহীতা কর্য পরিশোধ না করলে

কর্য গ্রহীতা কর্যকৃত মাল ফেরত দিতে অস্বীকার করলে যার কাছ থেকে কর্য নেয়া হয়েছিল তিনি আদালতে নালিশ করবেন। বিচারক ঘটনার সত্যতা যাচাই করে দেখবেন। ঘটনা সত্য প্রমাণিত হলে এবং কর্যকৃত সম্পদের পরিমাণ চুরির নিসাব পরিমাণ হলে কর্য গ্রহীতার হাত কাটার নির্দেশ দিতে পারেন বিচারক। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَتْ امْرَأَةٌ مَخْزُومِيَّةٌ تَسْتَعِيرُ مَتَاعًا عَلَى أَلْسِنَةِ جَارَاتِهَا وَتَجْحَدُهُ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَطْعِ يَدِهَا

ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মাখযূম গোত্রের এক মহিলা তার পড়শী মহিলাদের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে জিনিসপত্র ধার নিত। পরে সে তা অস্বীকার করতো। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এ কারণে তার হাত কাটার আদেশ দেন।[১]

পকেটমার

পকেটমার সম্পর্কে ফকিহদের মতভেদ রয়েছে। একদল বলেন, পকেটমারের হাত কাটা হবে। চাই পকেটে হাত দিয়ে পকেটে যা আছে তুলে নিক অথবা পকেট কেটে যা আছে তা পড়ে যাওয়ার পর তুলে নিক। এটা ইমাম মালেক, আবু সাওর, ইয়াকুব, হাসান ও ইবনল মুনযিরের মত । কিন্তু ইমাম আবু হানিফা, মুহাম্মদ ও ইসহাকের মতে, পকেটে থাকা টাকা যদি বাহির থেকে দেখা যায় এবং তা কেটে চুরি করে, তবে হাত কাটা হবেনা। আর যদি পকেটের ভেতরে অদৃশ্য থাকে এবং তার ভেতরে হাত ঢুকিয়ে বের করে নেয়, তাহলে হাত কাটা হবে।[২]

চুরির শাস্তি রহিত হওয়ার প্রেক্ষাপট

বিভিন্ন কারণে ও পেক্ষাপটে চুরির শাস্তি রহিত হয়ে যায়। নিম্নে চুরির শাস্তি রহিত হয়ে যাওয়ার কারণ ও প্রেক্ষাপট সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো।

ক্ষমা

আদালতে নালিশ দায়েরের পূর্বেই পেশাদার নয় এমন চোরকে ক্ষমা করে দেওয়া উত্তম। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, তোমরা পরস্পর এক অপরকে হদ্দ ক্ষমা করে দাও। তবে যে মাত্র আমার কাছে হদ্দের নালিশ আসবে, তখন হদ্দের কার্যকারিতা বাধ্যতামূলক হয়ে পড়বে।[৩]

সুপারিশ

অপেশাদার চোরের জন্য আদালতে নালিশ দায়েরের পূর্বে সুপারিশ করা বৈধ।[৪] তবে মামলা দায়েরের পর এ ধরণের সুপারিশ অবৈধ। আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। হযরত উসামা (রা.) যখন মাখযুম গোত্রের জনৈকা মহিলা চোরের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর কাছে সুপারিশ নিয়ে গিয়েছিলেন, তখন তিনি রাগত স্বরে বলেছিলেন, “তুমি কি

---

[১] আবু আবদির রহমান ইবনে শোয়াইব আন নাসায়ী (রহ.), *নাসায়ী শরীফ*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা : হাদীস নং ৪৮৮৮

[২] সাইয়্যেদ সাবেক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪০০

[৩] ইবনু আবদিল বারর, আত-তামহীদ, আল-মাগরিবঃ ওয়াযারাতুল আওকাফ, ১৩২৭, খ. ১১, পৃ. ২২৪

[৪] ইমাম মালিক, *আল-মুদাওয়ানাহ*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৫৩১; আল-বাজী, *আল-মুন্তকা*, প্রাগুক্ত, খ.৭, পৃ. ১৩৬

আল্লাহর একটি হদ্দের প্রসঙ্গে আমাকে সুপারিশ করছ?"[১] এ হাদীস থেকে জানা যায়, বিচারকের নিকট দাবী উত্থাপিত হবার পর হদ্দের ব্যাপারে সুপারিশ করা জায়িয নয়।

সাহাবীগণও বিচারকের নিকট দাবী উত্থাপিত হবার আগে হদ্দের ব্যাপারে সুপারিশ করতেন। বর্ণিত আছে, একবার হযরত যুবায়র ইবনল আওয়াম (রা.) জনৈক ব্যক্তিকে দেখতে পেলেন, সে একজন চোরকে ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন। হযরত যুবায়র (রা.) তাকে ক্ষমা করে দেয়ার জন্য সুপারিশ করলেন। কিন্তু লোকটি বললেন: না, আমি তাকে খলীফার কাছে নিয়ে যাব। তখন হযরত যুবায়র (রা) বললেন, যদি খলীফার কাছে বিষয়টি পৌঁছে যায়, তা হলে সুপারিশকারী ও সুপারিশ গ্রহণকারী দুজনের ওপরই আল্লাহর লানত হবে।[২]

স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার

চোরের স্বীকারোক্তি মাধ্যমে চুরি প্রমাণিত হবার পর হাত কাটার আগে সে যদি নিজের স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করে নেয়, তাহলে হদ্দ কার্যকর হবে না। এটা অধিকাংশ ইমামের অভিমত। তবে কারো কারো মতে, চোর স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না এবং হদ্দও রহিত হবে না।[৩]

তাওবাহ্ ও চুরিকৃত সম্পদ ফিরিয়ে দেওয়া

শাফি'ঈ ও হাম্বলী মতাবলম্বী কারো কারো মতে, চোর যদি তাওবাহ করে চুরিকৃত মাল মালিককে ফেরত দেয় এবং নিজেকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে সমর্পন করে, তা হলে হদ্দ কার্যকর করা যাবে না।[৪] আর অধিকাংশ ইমামের অভিমত হচ্ছে, চোর যদি তাওবাহ করে চুরিকৃত মাল মালিককে ফেরত দেয় এবং নিজেকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে সমর্পণ করে, তা হলেও হদ্দ রহিত হবে না।[৫] বর্ণিত আছে, হযরত আমর ইবন সামূরা (রা.) উষ্ট্র চুরির ঘটনায় তাওবা করে পবিত্র হবার উদ্দেশ্য রাসূলুল্লাহ (সা.) এর নিকট আসলে তিনি তার হাত কেটে দেন।[৬]

মালিকানা লাভ

অধিকাংশ ইমামের মতে, হদ্দের রায় ঘোষণা দেবার আগেই যদি যে কোন উপায়ে চুরিকৃত বস্তুর মালিক বনে যায় যেমন- চোর চুরিকৃত বস্তুটি মালিক থেকে কিনে নিল কিংবা মালিক বস্তুটি তাকে দান করে দিল, তা হলেও চোরের হাত কাটা যাবে না।[৭]

দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়া

অধিকাংশ হানাফী ইমামের অভিমত হচ্ছে, চুরির রায় দেবার পর দীর্ঘদিন অতিক্রান্ত হয়ে গেলে তামাদি দোষে বারিত হয়ে হাত কাটার বিধান রহিত হয়ে যাবে। তবে অন্যান্য সকল ইমামের মতে, চুরির রায় দেবার পর যত দীর্ঘ সময়

---

[১] মুসলিম ইবনু হাজ্জাজ, *সহীহ আল-মুসলিম*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল হূদূদ, হা.নং. ৪৩৮৬, ৪৩৮৭; মুহাম্মদ ইবনু ইসমাঈল, *সহীহ আল-বুখারী*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল আম্বিয়া, হা.নং. ৩২৮৮

[২] আল-বাজী, *আল-মুন্তাকা*, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ১৬৩

[৩] আল-বাজী, আল-মুন্তাকা, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ১৬৮; আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ১৪১

[৪] *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ*, প্রাগুক্ত, খ. ২৪, পৃ. ৩৪৩; আল-বাহুতী, কাশফুল কিনা, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ১৫৩-১৫৪;

[৫] ইবনু আবিদীন, *রাদ্দুল মুহতার*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১০৪; আস-সাভী, বুলগাতুস সালিক, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৪৮৯

[৬] ইবনু মাজাহ, *আস-সুনান*, বৈরুত: দারুল ফিকর, তা. বি., কিতাবুল হূদূদ, হাদীস নং:২৫৮৮

[৭] আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ৭৯, ১৮৬; আল-বাজী, *আল-মুন্তকা*, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ১৬৩

অতিক্রান্ত হোক না কেন হাত কাটার বিধান রহিত হবে না। কেননা এরূপ অবস্থায় হদ্দ রহিত হয়ে গেলে অপরাধীদের মধ্যে অপরাধ করার পর পালিয়ে হদ্দ থেকে রেহাই পাবার প্রবণতা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠবে।[১]

চোরকে তালকীন দেওয়া

আবূ উমাইয়্যা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট এক চোরকে উপস্থিত করা হলে সে তার অপরাধের স্বীকারোক্তি করলো। কিন্তু তার কাছে চুরিকৃত মাল পাওয়া গেলো না। রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, মনে হয় তুমি চুরি করোনি। সে বললো, হাঁ (চুরি করেছি)। তিনি আবার বললেন, মনে হয় তুমি চুরি করোনি। সে বললো, হ্যাঁ (চুরি করেছি)।

অতঃপর তিনি হুকুম দিলে তার হাত কেটে দেয়া হয়। নবী (সা.) (লোকটিকে) বললেন, তুমি বলো, আমি আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তাঁর কাছে তওবা করছি। সে বললো, 'আমি আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তাঁর কাছে তওবা করছি"। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, "হে আল্লাহ! তুমি তার তওবা কবুল করো"। তিনি ৩ বার এ কথা বলেন।[২]

ডাকাতি

ডাকাতি (হিরাবাহ) একটি অপরাধ। এর অর্থ পথিকের ওপর প্রকাশ্যে হামলা চালিয়ে জোরপূর্বক তার মালামাল লুট করা এবং এমন ত্রাস সৃষ্টি করা যার কারণে সে পথে লোক চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। এ কাজ একজনে করুক বা দলবদ্ধ হয়ে করুক, সংগে অস্ত্র থাকুক বা না থাকুক, শহরের মধ্যে হোক বা বাইরে, তাতে অপরাধের মধ্যে কোনো তারতম্য হবে না। সাধারণ আইন অনুসারে ডাকাতিকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে এভাবে যে, কোনো ব্যক্তি থেকে তার এখতিয়ারে থাকা সম্পত্তি নেওয়া বা কোনো ব্যক্তিকে ভয় বা বলপূর্বক সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করা নামই ডাকাতি। ইসলামের দৃষ্টিতে ডাকাতি জঘন্য পাপের কাজ। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, আবূ হুরায়রা (রা.) সূত্রে রাসূলুল্লাহ (সা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, যখন কোন ব্যভিচারী ব্যভিচার করে, তখন সে মুমিন অবস্থায় ব্যভিচার করে না, যখন চোর চুরি করে, তখন সে মুমিন অবস্থায় চুরি করে না, যখন কোন মদ্যপায়ী মদ পান করে, তখন সে মুমিন অবস্থায় মদপান করে না, আর যখন কোন ডাকাত লোকচক্ষুর সামনে ডাকাতি করে, তখনও সে মুমিন অবস্থায় ডাকাতি করে না।[৩]

ডাকাতির সংজ্ঞা

সশস্ত্র ডাকাতি ও লুণ্ঠনকে আরবীতে হিরাবাহ (حرابة) বলা হয়।[৪] এর আভিধানিক অর্থ হল যুদ্ধ কিংবা লুণ্ঠন ও অপহরণ।[৫] বাংলা ভাষায় ডাকাতি, ছিনতাই, রাহাজানিকে হরব বা মুহারেবা বলা হয়। আল্লামা ইয্যুদ্দীন বালীক

---

[১] আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ১৭৬; *আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যাহ*, খ. ২, পৃ. ১৮৩

[২] ইমাম ইবনু মাজাহ, সুনান ইবনু মাজাহ, (كتاب الحدود), ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, হাদীস নং ২৫৮৯

[৩] আবু আবদির রহমান ইবনে শোয়াইব আন নাসায়ী (রহ.), *নাসায়ী শরীফ*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা : হাদীস নং ৪৮৭০

[৪] আরবীতে غصب (লুটতরাজ) ও قطع الطريق (ডাকাতি) প্রভৃতি শব্দও এর সমার্থক হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

[৫] এটি حرب শব্দ থেকে উদ্ভূত। এর 'রা' বর্ণ সাকিন হলে শান্তির বিপরীত অর্থাৎ যুদ্ধ অর্থে । এবং 'রা' বর্ণ যবরযুক্ত হলে লুণ্ঠন ও অপহরণ অর্থে ব্যবহার করা হয়। (ইবনু মানযুর, *লিসানুল আরব*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩০৪)

(রহ.) বলেন, আরবী হিরাবাহ (حرابة) শব্দের অর্থ লড়াই করা এবং ব্যাপক অর্থে মানুষের জানমাল ইয্যাতের নিরাপত্তা ধ্বংসকারী যে কোনো কাজ- ডাকাতি, ছিনতাই, সন্ত্রাস, রাহাজানি এর সবই হিরাবাহ-এর অন্তর্ভুক্ত। এর আরেকটি নাম (قطع الطريق) যার শাব্দিক অর্থ পথ কর্তন। অর্থাৎ জনজীবনের স্বাভাবিক চলাচলের পথে নিরাপত্তা বিঘ্নিত করা।[১] ডাকাতিকে বড় চুরিও বলা হয়।

ডাকাতির সংজ্ঞায় সাইয়্যেদ সাবেক বলেন, বিদ্রোহ, সন্ত্রাস, ডাকাতি ও রাহাজানি দ্বারা এমন একটি সশস্ত্র গোষ্ঠীর তৎপরতাকে বুঝায়, যারা সমাজে অরাজকতা, রক্তপাত, ধনসম্পদ লুণ্ঠন, ছিনতাই, সম্ভ্রমহানি, ফসল ও গবাদি পশু বিনাশ প্রভৃতি অপরাধ সংঘটিত করে।[২] আল্লামা ইয্যুদ্দীন বালীক (রহ.) বলেন, ইসলামী রাষ্ট্রে কোনো সশস্ত্র সংঘবদ্ধ দলের অরাজকতা সৃষ্টি, আইন-শৃংখলা পদদলিত করা, খুন-খারাবী, ছিনতাই, ইয্যত আবরু হরণ (অপহরণ, ধর্ষণ), জনসম্পদ নষ্ট করা ইত্যাদি উদ্দেশ্যে শরীয়াতের প্রতি আনুগত্যকে, আইন-কানূন এবং নৈতিকতাকে চ্যালেঞ্জ করা।[৩]

ইমাম মালেকের মতে, মুহারেব (যুদ্ধকারী) হলো ঐ ব্যক্তি যে মানুষের উপর শহর অথবা মরুভূমিতে অস্ত্র নিয়ে ভয় দেখায়। ইমাম আবু হানিফা মতে, যে ব্যক্তি মরুভূমি অথবা কোন প্রান্তরে পথিকের উপর সশস্ত্র আক্রমণ করে। ইমাম শাফেয়ীর মতে, যে ব্যক্তি শহর, বাড়ি, মরুভূমি রাস্তায় অথবা গ্রামে ছিনতাই ও ডাকাতি করে তাকে মুহারেব বলে।[৪]

এখানে ডাকাতি, ছিনতাই ও সন্ত্রাসীদলকে ও মুহারিব বলা হয়। যেমন হত্যাকারীদল, মানুষ জিম্মিকারী, ডাকাতদল, ব্যাংক লুণ্ঠনকারী, নারী ও শিশু অপহরণকারী, রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিনষ্টকারী, সম্পদ, পশু, ফসল লুণ্ঠনকারী ও বিমান ছিনতাইকারী। এসবই ডাকাতি ছিনতাইকারীর কাজ।[৫]

হাম্বলীগণের মতে, কেবল সম্পদ হরণের উদ্দেশ্যে কারো ওপর সশস্ত্র চড়াও হওয়াকে 'হিরাবাহ' বলা হয়। তবে শাফি'ঈ ও মালিকী ইমামগণের মতে, সম্পদ হরণের উদ্দেশ্যকে শর্তারোপ করেননি; বরং কাউকে হত্যা করা কিংবা কারো ইজ্জত আব্রু নষ্ট করা অথবা পথ-ঘাট বন্ধ করে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে ত্রাস সৃষ্টি করা প্রভৃতি অপরাধও 'হিরাবাহ' এর পর্যায়ভুক্ত।[৬]

পরবর্তী কালের হানাফীগণও সম্পদ হরণের উদ্দেশ্যকে শর্তারোপ করেননি। অথবা ত্রাস সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য সশস্ত্র অবস্থায় প্রকাশ্যে দাপটের সাথে কারো ওপর চড়াও হওয়া[৭] অধিকাংশ ইমামের মতে, এরূপ আক্রমণ যেখানেই চাই তা শহর-নগর-গ্রাম-জনপদে কিংবা নির্জন পথে-ঘাটে কিংবা মাঠে-ময়দানে হোক তা ডাকাতি হিসেবে ধর্তব্য হবে। ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে, কেবল জনপদের বাইরে সংঘটিত সশস্ত্র ডাকাতিই হদ্দযোগ্য অপরাধ।[৮]

ডাকাতির প্রমাণ

দুটি উপায়ের মধ্যে যে কোন একটি পদ্ধতিতে ডাকাতি প্রমাণ করা যাবে।

---

[১] আল্লামা ইয্যুদ্দীন বালীক (র.) *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৯
[২] সাইয়্যেদ সাবেক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৭০
[৩] আল্লামা ইয্যুদ্দীন বালীক (র, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৯
[৪] *আহকামূল কুরআন*, জাসসা, খ. ১, পৃ. ৫৪৯
[৫] সাইয়েদ সাবেক পূর্বোক্ত খ. ২ পৃ. ৪৬৪
[৬] ড. আহমদ আলী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৯
[৭] আল-মরদাভী, *আল- ইনসাফ*, বৈরুত: দারু ইহয়াইত তুরাছিল আরবী, খ. ১০, পৃ. ২৯১; যাকারিয়া আল-আনসারী, *আল-গরর আল-বহিয়্যাহ*, খ.৫, পৃ. ১০১
[৮] ইবনু কুদামা, *আল-মুগনী*, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ১২৪; আল-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ২০১,২

১. স্বীকারোক্তি

২. সাক্ষ্য

১. স্বীকারোক্তি

এ ব্যাপারে কারো দ্বিমত নেই যে, চুরির মত ডাকাতির অভিযোগেও অভিযুক্ত সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন ব্যক্তি যদি স্বেচ্ছায় আদালতে উপস্থিত হয়ে বিচারকের সামনে ডাকাতির সুস্পষ্ট স্বীকারোক্তি দেয় তাহলে ডাকাতি প্রমাণিত হবে এবং তাকে ডাকাতির হদ্দ ভোগ করতে হবে। তবে কতবার স্বীকারোক্তি দিতে হবে-তা নিয়ে কিছুটা মতপার্থক্য রয়েছে। হাম্বলীগণ এবং হানাফীগণের মধ্যে ইমাম আবূ ইউসূফ (রহ.)-এর মতে, দু' এজলাসে দুবার স্বীকৃতি দ্বারা ডাকাতি প্রমাণিত হবে। অধিকাংশের মতে, একবার স্বীকারোক্তিই যথেষ্ট।[১]

২. সাক্ষ্য

দু'জন ন্যায়-পরায়ণ ব্যক্তির সাক্ষ্য দ্বারা ডাকাতি প্রমাণ করা যাবে। অনুরূপভাবে ডাকাতদের হাতে আক্রান্ত দলের দু' ব্যক্তির সাক্ষ্য দ্বারাও ডাকাতি প্রমাণিত হবে, যদি তারা নিজেদের ব্যাপারে আক্রান্ত হবার সাক্ষ্য না দেয়। অতএব যখন আক্রান্ত দলের দুজন ব্যক্তি দলের অন্যান্যদের আক্রান্ত হবার ব্যাপারে সাক্ষ্য দেবে, তখন তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে। বিচারকের জন্য এটা জানতে চাওয়ার প্রয়োজনও নেই যে, তারাও আক্রান্ত হয়েছিল কিনা। বিচারক জানতে চাইলে তাদের জবাব দেওয়ার প্রয়োজন নেই। যদি তারা বলে যে, ডাকাত দল আমাদের যোগাযোগের পথ বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে আমাদের মাল-সম্পদ ছিনিয়ে নিয়েছে, তা হলে তাদের সাক্ষ্য না তাদের বেলায় গ্রহণযোগ্য হবে, না অন্যদের বেলায়। কেননা এমতাবস্থায় তারা ডাকাতের প্রতিপক্ষে পরিণত হয়ে গেল।[২]

তবে ইমাম মালিকের মতে, এমতাবস্থায় তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে। এমন কি তাঁর দৃষ্টিতে, কারো থেকে শুনে ডাকাতির সাক্ষ্য দিলেও তাও গ্রহণযোগ্য হবে। যদি দুজন ব্যক্তি আদালতে বিচারকের সামনে এসে কোন কুখ্যাত ডাকাতের ব্যাপারে সাক্ষ্য দেয় যে, সে একজন ডাকাত, তাহলে তাঁর দৃষ্টিতে তাদের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে ডাকাতি প্রমান করা যাবে, যদিও তারা তাদেরকে ডাকাতি করেতে দেখেনি।[৩]

ডাকাতির শাস্তি

ইসলামী শরীয়াতে সশস্ত্র ডাকাত ও লুটেরাদের সুনির্দিষ্টভাবে শাস্তির কথা বলা হয়েছে। ডাকাতির শাস্তি প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ কুরআন কারীমে বলেন, যারা আল্লাহর বিরুদ্ধে ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে, আর ভূ-পৃষ্ঠে অশান্তি সৃষ্টি করে বেড়ায়, তাদের শাস্তি এটাই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা শুলে চড়ানো হবে, অথবা এক দিকের হাত ও অপর দিকের পা কেটে ফেলা হবে, অথবা তাদের দেশ থেকে নির্বাসিত করা হবে; এটাতো দুনিয়ায় তাদের

---

[১] ইবনুল হুমাম, *ফাতহুল কাদীর*, প্রাগুক্ত, খ.৫, পৃ. ৪৩১-২; ইবনু আবিদীন, *রাদ্দুল মুহতার*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১১৭
[২] ড. আহমদ আলী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৮
[৩] ইবনু মুফলিহ, *আল-ফুরূ*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ১৪০

জন্য ভীষণ অপমান, আর আখিরাতেও তাদের জন্য ভীষণ শাস্তি রয়েছে। কিন্তু হ্যাঁ, তোমরা তাদেরকে গ্রেফতার করার পূর্বে যারা তাওবাহ করে, তাহলে জেনে রেখ যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।[১]

এ আয়াতে আল্লাহ ও তার রসূলের (সা.) বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ও নৈরাজ্য সৃষ্টির দায়ে চারটি শাস্তির যে কোনো একটি প্রয়োগের আদেশ দেয়া হয়েছে : (১) মৃত্যুদণ্ড (২) শূলে চড়ানো (৩) বিপরীত দিক থেকে হাত ও পা কেটে দেয়া (৪) দেশ থেকে নির্বাসিত করা।

এই শাস্তিগুলো 'অথবা' (او) অব্যয় ব্যবহার করে উল্লেখ করা হয়েছে, যার অর্থ দাঁড়ায় শাসক এই শাস্তিগুলোর মধ্য থেকে যে কোনো একটি প্রয়োগ করার স্বাধীনতার অধিকারী। তিনি এর মধ্যে যেটি অধিকতর কল্যাণকর মনে করবেন, সেটাই প্রয়োগ করবেন, অপরাধের মাত্রা যাই হোক না কেন। তবে অধিকাংশ আলেমের মতে, এখানে 'অথবা' (او) বাছাই করার স্বাধীনতাবোধক নয়, বরং বৈচিত্রবোধক। অর্থাৎ অপরাধের গুরুত্বের মাত্রা অনুপাতে শাস্তির রকমফের হবে, যেটা ইচ্ছা প্রয়োগ করা যাবে তা নয়।[২]

প্রথম মত

প্রথমোক্ত দলটি বলেন, আয়াতের শাব্দিক অর্থ থেকে এটাই বুঝায়, আর আয়াতের ভাষাগত বিন্যাসও এর সমর্থক। ওদিকে হাদিস থেকে এর বিপরীত কিছু জানা যায়না। আয়াতের অর্থ দাঁড়াচ্ছে, আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনাকারী ও দেশে বিপর্যয় সৃষ্টিকারী যেই হোক না কেন, তার শাস্তি হয় হত্যা, নতুবা শূলে আরোহণ, নতুবা হাত পা বিপরীত দিক থেকে কর্তন 'অথবা' (او) দেশান্তরিত হওয়া। এর মধ্যে কার জন্য কোনটি প্রযোজ্য হবে, তা শাসক স্থির করবেন এবং এই শাস্তিগুলোর যে কোনো একটি কার্যকর করা হবে, চাই অপরাধী উল্লিখিত অপরাধগুলোর সবকটি করুক বা যে কোনো একটি করুক। আয়াতে শাসককে এমন ক্ষমতা দেয়া হয়নি যে, অপরাধীর উপর একাধিক শাস্তি কার্যকর করবেন কিংবা কোনোটাই করবেন না।[৩]

এ পক্ষের যুক্তি হচ্ছে, কুরআন কারীমের অন্য একাধিক আয়াতে 'অথবা' (او) দ্বারা যেকোনে একটি বেছে নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। ইহরামকারীর শিকার প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন,

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَ اَنْتُمْ حُرُمٌ ؕ وَ مَنْ قَتَلَهٗ مِنْكُمْ مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهٖ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدْيًا بٰلِغَ الْكَعْبَةِ اَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسٰكِيْنَ اَوْ عَدْلُ ذٰلِكَ صِيَامًا لِّيَذُوْقَ وَبَالَ اَمْرِهٖ ؕ عَفَا اللّٰهُ عَمَّا سَلَفَ ؕ وَ مَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللّٰهُ مِنْهُ ؕ وَ اللّٰهُ عَزِيْزٌ ذُو انْتِقَامٍ

ওহে বিশ্বাসীগণ! ইহরাম অবস্থায় তোমরা শিকার হত্যা করো না। জেনে বুঝে তোমাদের কেউ তা হত্যা করলে তার বিনিময় হচ্ছে অনুরূপ গৃহপালিত জন্তু। যে ব্যাপারে তোমাদের মধ্যের ন্যায়পরায়ণ দু'জন লোক ফায়সালা করে দেবে, তা কা'বাতে কুরবানীর জন্য পাঠাতে হবে। কিংবা তার কাফফারা হল কয়েকজন মিসকিনকে খাদ্য দান অথবা তদনুরূপ রোযা পালন, যেন সে স্বীয় কৃতকর্মের ফল ভোগ করে, পূর্বে যা হয়ে গেছে আল্লাহ তা ক্ষমা করেছেন; কেউ

[১] আল কুরআর, ৫ : ৩৩-৩৪
[২] সাইয়্যেদ সাবেক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৭৬
[৩] সাইয়্যেদ সাবেক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৭৬

(পাপকাজ) পুনরায় করলে আল্লাহ তার নিকট হতে প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন। আল্লাহ মহা পরাক্রমশালী, প্রতিশোধ গ্রহণে পূর্ণ সক্ষম।[১]

ফিদিয়ার ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন,

اَيَّامًا مَّعْدُوْدٰتٍ ؕ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ ؕ وَ عَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهٗ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ ؕ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهٗ ؕ وَ اَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

ওটা নির্দিষ্ট কয়েক দিন। কিন্তু তোমাদের মধ্যে যে কেউ পীড়িত কিংবা প্রবাসী হয় তার জন্য অপর কোন দিন হতে গণনা করবে, আর যারা ওতে অক্ষম তারা তৎপরিবর্তে একজন দরিদ্রকে আহার্য দান করবে। অতএব যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় সৎ কাজ করে তার জন্য কল্যাণ এবং তোমরা যদি বুঝে থাক তাহলে সিয়াম পালনই তোমাদের জন্য কল্যাণকর।[২]

কসমের কাফফারার ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন,

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِيْۤ اَيْمَانِكُمْ وَ لٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُّمُ الْاَيْمَانَ ۚ فَكَفَّارَتُهٗۤ اِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسٰكِيْنَ مِنْ اَوْسَطِ مَا تُطْعِمُوْنَ اَهْلِيْكُمْ اَوْ كِسْوَتُهُمْ اَوْ تَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ ؕ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ ؕ ذٰلِكَ كَفَّارَةُ اَيْمَانِكُمْ اِذَا حَلَفْتُمْ ؕ وَ احْفَظُوْۤا اَيْمَانَكُمْ ؕ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ

তোমাদের অর্থহীন শপথের জন্য আল্লাহ তোমাদেরকে পাকড়াও করবেন না, কিন্তু বুঝে সুঝে যে সব শপথ তোমরা কর তার জন্য তোমাদেরকে পাকড়াও করবেন। (এ পাকড়াও থেকে অব্যাহতির) কাফফারা হল দশ জন মিসকিনকে মধ্যম মানের খাদ্যদান যা তোমরা তোমাদের স্ত্রী পরিবারকে খাইয়ে থাক, অথবা তাদেরকে বস্ত্রদান অথবা একজন ক্রীতদাস মুক্তকরণ। আর এগুলো করার যার সামর্থ্য নেই তার জন্য তিন দিন রোযা পালন। এগুলো হল তোমাদের শপথের কাফফারা যখন তোমরা শপথ কর। তোমরা তোমাদের শপথ রক্ষা করবে। আল্লাহ তাঁর আয়াতসমূহ তোমাদের জন্য বিশদভাবে বর্ণনা করেন যাতে তোমরা শোকর আদায় কর।[৩]

দ্বিতীয় মত

দ্বিতীয় দলটি তাদের বক্তব্যের স্বপক্ষে সাহাবিদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় ভাষাবিদ ও কুরআন বিশারদ ইবনে আব্বাসের বর্ণিত একটি উক্তিকে প্রমাণ হিসেবে তুলে ধরেন, যা ইমাম শাফেয়ি স্বীয় মুসনাদে উদ্ধৃত করেছেন। সেটি হচ্ছে : "যখন অপরাধীরা হত্যাও করবে এবং সম্পদও লুণ্ঠন করবে তখন তাদেরকে শূলে চড়াতে হবে। আর যখন শুধু হত্যা করবে, সম্পদ লুণ্ঠন করবেনা, তখন তাদেরকে হত্যা করা হবে, শূলে চড়ানো হবে না। আর যখন শুধু সম্পদ লুণ্ঠন করবে, হত্যা করবেনা, তখন তাদের হাত ও পা বিপরীত দিক থেকে কাটা হবে। আর যখন শুধু পথিকদেরকে ভীতি

[১] আল কুরআন, ৫ : ৯৫
[২] আল কুরআন, ২ : ১৮৪
[৩] আল কুরআন, ৫ : ৮৯

প্রদর্শন করবে ও আতঙ্ক ছড়াবে এবং কোনো সম্পদ লুণ্ঠন করবেনা এবং হত্যাও করবেনা, তখন তাদেরকে নির্বাসনে পাঠানো হবে।"[১]

কারো কারো মতে, বিভিন্ন বিধিতে বাহ্যত স্বাধীনতাবোধক 'অথবা' (او) অব্যয় দ্বারা যে স্বাধীনতা প্রদান করা হয়েছে, সেটিকে বাহ্যিক অর্থে তখনই গ্রহণ করা হবে যখন সবকটির ওয়াজিব হওয়ার কারণ একই থাকে, যেমন কসমের কাফফারা ও শিকার হত্যার কাফফারার ক্ষেত্রে হয়েছে। কিন্তু যখন কারণটি বিভিন্ন হয়, তখন প্রত্যেক বিধিতে তা পৃথকভাবে ঐ বিধির বিবরণ অনুযায়ী অর্থ ব্যক্ত করবে। যেমন সূরা কাহফে বলা হয়েছে,

حَتّٰى اِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِىْ عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَّ وَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا ۬ؕ قُلْنَا يٰذَا الْقَرْنَيْنِ اِمَّاۤ اَنْ تُعَذِّبَ وَ اِمَّاۤ اَنْ تَتَّخِذَ فِيْهِمْ حُسْنًا

চলতে চলতে যখন সে সূর্যের অস্তগমন স্থানে পৌঁছল তখন সে সূর্যকে এক পংকিল পানিতে অস্ত যেতে দেখল এবং সে সেখানে এক সম্প্রদায়কে দেখতে পেল; আমি বললাম, হে যুলকারনাইন! তুমি তাদেরকে শাস্তি দিতে পার অথবা তাদেরকে সদয়ভাবে গ্রহণ করতে পার।[২]

পরবর্তী আয়াতে যুলকারনাইনের জবাবে বলা হয়েছে,

قَالَ اَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهٗ ثُمَّ يُرَدُّ اِلٰى رَبِّهٖ فَيُعَذِّبُهٗ عَذَابًا نُّكْرًا

সে বলল, 'যে ব্যক্তি যুলম করবে আমি তাকে অচিরেই শাস্তি দেব, অতঃপর তাকে তার প্রতিপালকের কাছে ফিরিয়ে আনা হবে, তখন তিনি তাকে কঠিন 'আযাব দেবেন।[৩]

কোন কোন আলেম বলেন, হত্যাকারী ও লুণ্ঠনকারীর উপর শাস্তি প্রয়োগ করা ইমামের ইচ্ছেধীন। তিনি আল্লাহ প্রদত্ত শাস্তি হত্যা, শুলেবিদ্ধ করা, হাত পা কর্তন করা ও দেশ থেকে নির্বাসন করার মধ্যে থেকে যে কোন একটি প্রয়োগ করবেন। কেননা আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। ইহা মুজাহিদ, দাহাক, নাখয়ী ও মালেকের মত। ইবনে আব্বাস বলেন, কুরআনে অথবা শব্দ দ্বারা যা কিছু বর্ণনা করা হয়েছে । তা সবই স্বেচ্ছামূলক।[৪]

একদল আলেম বলেন, আয়াতে অপরাধের মাত্রা অনুযায়ী শাস্তির বিধান ধারাবাহিকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। যে ব্যক্তি হত্যা করবে ও সম্পদ লুণ্ঠন করবে তাকে শুলেবিদ্ধ করে হত্যা করা হবে। আর যে শুধু সম্পদ লুণ্ঠন করেছে তার হাত, পা বিপরীত দিক থেকে কর্তন করতে হবে। যে ব্যক্তি শুধু রাস্তায় ত্রাস সৃষ্টি করেছে হত্যা করে নাই সম্পদ লুণ্ঠন করে নাই তাকে দেশ থেকে নির্বাসন দিতে হবে। ইহা ইমাম শাফেয়ী, আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদের মত।[৫]

---

[১] সাইয়্যেদ সাবেক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৭৭
[২] আল কুরআন, ১৮ : ৮৬
[৩] আল কুরআন, ১৮ : ৮৭
[৪] কুরতুবী, *আহকামূল কুরআন*, বৈরূত, মকতবা মালাইন ১৯৮০, খ. ৬ পৃ. ১৫২
[৫] জুসাস, *আহকামূল কুরআন*, তা.কি, বৈরূত : দারুল কিতাবুল আবারী, খ. ২, বাব হুদুদ হারাবা, পৃ. ৪১২

ইমাম আবু হানিফা বলেন আয়াতে বর্ণিত বিধান ইমামের ইচ্ছেধীন মনে করেন। তবে সকল মুহারিবের জন্য নয়। তা নির্দিষ্ট মুহারিবের জন্য যে ব্যক্তি কাউকে হত্যা করেছে এবং সম্পদ লুণ্ঠন করেছে তার ক্ষেত্রে ইমামের চার প্রকার সুযোগ রয়েছে।

১. ইমাম ইচ্ছে করলে বিপরীত দিক থেকে তার হাত, পা কেটে তারপর হত্যা করবে।
২. ইচ্ছে করলে বিপরীত দিক থেকে হাত, পা কেটে দিবে ও শুলবিদ্ধ করবে।
৩. ইচ্ছে করলে হাত, পা না কেটে শুধু শুলেবিদ্ধ করবে।
৪. ইচ্ছে করলে শুধু জনস্বার্থের কারণে হত্যা করবে।

তার মতে হত্যা অথবা শুলেবিদ্ধ করার সংগে অবশ্য হাতও কাটতে হবে। কেননা তার দুটি অপরাধ। হত্যা ও মাল লুণ্ঠন। সুতরাং হত্যা করার শাস্তি তাকে হত্যা করা। আর সম্পদ লুণ্ঠন করার শাস্তি হাত কর্তন করা। উভয় ক্ষেত্রে ভয়ভীতি ও আতংক সৃষ্টির ব্যাপার রয়েছে যে কারণে শুধু কর্তন করার মধ্যে শাস্তি সীমাবদ্ধ রাখা যুক্তিযুক্ত নয়। ইহা ইমাম আবু হানিফার মত।[১]

শাফি'ঈ ও হাম্বলী ইমামগণের মতে, অপরাধের প্রকৃতি ও মাত্রা অনুপাতে এ শাস্তি সমূহের কোন একটি প্রয়োগ করতে হবে। যেমন-

১. হত্যাকাণ্ডও ঘটাল, ধন-সম্পদও অপহরণ করল তাকে শূলে চড়িয়ে হত্যা করা হবে।[২]

২. আর যে হত্যা করল; ধন-মাল অপহরণ করল না, তাকে শুধু হত্যা করা হবে।[৩]

৩. আর যে ধন-মাল অপহরণ করল, হত্যাকাণ্ড ঘটাল না, তার ডান হাত ও বাম পা কেটে ফেলা হবে।[৪]

৪. আর যে লোক ত্রাস সৃষ্টি করল; হত্যা বা ধন-মাল অপহরণ কিছুই করল না, তাকে নির্বাসিত করা হবে।[৫]

শুলেবিদ্ধ করে শাস্তির ধরন

জমহুর ফকীহদের মতে তাকে জনসাধারণের চলার পথে একদিন অথবা তিনদিন জীবিত অবস্থায় শুলেবিদ্ধ করতে হবে। যাতে অন্য অপরাধীরা অপরাধ থেকে বিরত থাকে। অতঃপর তীর নিক্ষেপ করে হত্যা করতে হবে। উহা মালেক ও আবু হানিফার মত। একদল বলেন, হত্যার পূর্বে শুলবিদ্ধ করা উচিত হবেনা। বরং হত্যার পর তাকে শুলেবিদ্ধ করতে হবে। যাতে তার নামাজ ও খানাপিনার ব্যঘাত না ঘটে। তাকে হত্যা করে জানাযা পড়ে শুলেবিদ্ধ করতে হবে উহা ইমাম শাফেয়ীর মত।[৬]

ইমাম শাফেয়ী বলেন, আমি শুলেবিদ্ধ করে হত্যা করা পছন্দ করিনা। কারণ রাসূল (সা.) অঙ্গচ্ছেদ করতে নিষেধ করেছেন। আলুসী বলেন, হত্যা করার পূর্বে জীবিত অবস্থায় শুলেবিদ্ধ করতে হবে এবং বর্শা দিয়ে তার পেট ফেড়ে দিতে হবে। যাতে তার মৃত্যু হয়।[৭]

---

[১] আব্দুল কাদের আওদা, *ফি তাসরী আল জানায়ী আল ইসলাম*, মিশর ঃ দারুল মায়ারেফ, ১৯৮৩, পৃ. ১৯১
[২] সাইয়্যেদ সাবেক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৭৭
[৩] *প্রাগুক্ত*
[৪] *প্রাগুক্ত*
[৫] *প্রাগুক্ত*
[৬] আল আলুসী আল বাগদাদী, *রুহুল মায়ানী*, বৈরূত ঃ দারুল এহইয়া আত-তুরাসূল আরবী, ১৯৮৭ খ. ৬, পৃ. ১৯৯
[৭] হামিদ মসায়িদী, *মকদ্দমা ফি দিরাসা আল কানুন আদ দাওলী আল জানায়ী*, বৈরূত : দারুল ফিকরুল আরবী, ১৯৭৭, পৃ. ১৮৪

যেসব অপরাধ ডাকাতিরূপে গণ্য

যেসকল অপরাধ ডাকাতি হিসেবে বিবেচিত হয় তা নিম্নরূপ।

সশস্ত্র অবস্থায় দাপটের সাথে বের হওয়া

কারো সম্পদ ছিনতাই, কিংবা কাউকে হত্যা বা কারো ইজ্জত আব্রু নষ্ট করার উদ্দেশ্যে সশস্ত্র অবস্থায় দাপটের সাথে বের হওয়া। যদিও কারো সম্পদ ছিনিয়ে নিতে বা ইজ্জত আব্রু নষ্ট করতে কিংবা কাউকে হত্যা করতে সমর্থ হয়নি। লাঠি ও পাথর ব্যবহারকারী ডাকাত হিসেবে বিবেচিত হবে কিনা তা নিয়ে ইমামগণের মতভেদ রয়েছে। শাফেয়ী, মালেকী, আবূ ইউসুফ, আহমাদের মতে তারা ডাকাত হিসেবেই বিবেচিত হবে। ইমাম আবূ হানীফার মতে তারা ডাকাত হিসেবে বিবেচিত হবে না।[১]

দাপটের সাথে বের হয়ে হত্যা কিংবা মারধর করা

কারো সম্পদ ছিনিয়ে নেয়ার উদ্দেশ্যে সশস্ত্র অবস্থায় দাপটের সাথে বের হয়ে কাউকে হত্যা করেছে কিংবা মারধর করেছে; কিন্তু সম্পদ ছিনিয়ে নেয়নি।

দাপটের সাথে বের হয়ে সম্পদ ছিনিয়ে নেওয়া

এ ক্ষেত্রে ডাকাত বাহীনি সশস্ত্র অবস্থায় দাপটের সাথে বের হয়ে কারো সম্পদও ছিনিয়ে নিয়েছে এবং কাউকে হত্যা করেছে কিংবা মারধর করেছে।[২] 'হিরাবাহ' কে বড় চুরিও বলা হয়। চুরি এ জন্য বলা হয় যে, দেশের সর্বত্র নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করা সরকারের দায়িত্ব। কিন্তু ডাকাতি ও অপহরণকারীরা সরকারের অগোচরেই মানুষের সম্পদ নষ্ট করে। বড় চুরি বলার কারণ হল, এর অপকারিতা ব্যক্তি বিশেষের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না; বরং সর্বসাধারণ তাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।[৩]

প্রকাশ্যে সংঘটিত হওয়া

ডাকাতি ও সন্ত্রাসের ঘটনা শাস্তিযোগ্য হওয়ার জন্য প্রকাশ্যে সম্পদ হরণ শর্ত। গোপনে কোনো কিছু নিলে সে চোর সাব্যস্ত হবে (চোরের শাস্তি ডাকাতের থেকে ভিন্ন)। আর যদি লুণ্ঠন করে নিয়ে পালিয়ে যায় তবে সে লুণ্ঠনকারী বা লুটেরা। তার কোনো অঙ্গ কাটা হবেনা। অনুরূপ, যখন কোনো একজন বা দুজন কাফেলার শেষপ্রান্তে থাকে এবং লুটেরারা তাদের কাছ থেকে কিছু ছিনিয়ে নিয়ে যায়, তখন এই ছিনতাইকারীর কোনো অঙ্গ কর্তন করা হবেনা। কেননা তারা কোনো প্রবল বাধার সম্মুখীন হয়না। আর যদি স্বল্পসংখ্যক লোকের উপর চড়াও হয় এবং তাদেরকে পর্যুদস্ত করে, তাহলে আক্রমণকারীরা ডাকাত ও দস্যু গণ্য হবে। এটা হানাফি শাফেয়ি ও হাম্বলিদের মত। মালেকি ও যাহেরিরা এ মতের বিরোধী।[৪]

---

[১] সাইয়্যেদ সাবেক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৭২
[২] ইবনুল হুমাম, *ফাতহুল কাদীর*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, খ. ৪২৩-৪; আল-বাবরতী, *আল-ইনায়াহ*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৪২৪-৬
[৩] যায়লা'ঈ, *তাবয়ীন*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ২৩৫
[৪] সাইয়্যেদ সাবেক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৭৩

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : হুদুদ আইন সংশ্লিষ্ট বিধিবিধান

ইসলামী শাস্তি আইন পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা যৌক্তিক শাস্তি আইন। মানব সমাজকে যাবতীয় অন্যায় অপকর্ম থেকে রক্ষা করাই ইসলামী শাস্তি আইনের উদ্দেশ্য। ইসলামী শাস্তি আইন অনন্য বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। এ আইনী ব্যবস্থায় বাদী বিবাদী সবার স্বার্থকেই গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়েছে। বাদ যায়নি সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষার বিষয়ও। নিম্নে সংক্ষেপে ইসলামী শাস্তি আইনের বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা করা হলো।

১. দণ্ডিত ব্যক্তির অবস্থাগত পার্থক্যের মূল্যায়ন

২. ইসলামী রাষ্ট্রের জন্য প্রযোজ্য

৩. অপরাধের প্রেক্ষাপট মূল্যায়ন

৪. ইসলামী শাস্তি আইন সার্বজনীন

৫. কঠোরতা ও দয়ার সমন্বয়

৬. সমষ্টি ও ব্যষ্টি- উভয়ের স্বার্থ সংরক্ষণ

৭. জনস্বার্থ

৮. শিক্ষামূলক ও দৃষ্টান্তমূলক

১. দণ্ডিত ব্যক্তির অবস্থাগত পার্থক্যের মূল্যায়ন

ইসলামী আইন ব্যবস্থায় দণ্ডিত অপরাধীদের অবস্থার পার্থক্য স্বীকার করা হয়েছে। যেকারণে একই অপরাধে লিপ্ত ব্যক্তিদের সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থান গ্রহণ করা হয়েছে। উদাহরণস্বরুপ বলা যায়- ব্যভিচারের শাস্তি নির্ধারণে ইসলাম বিবাহিত ও অবিবাহিতের মধ্যে পার্থক্য করেছে এবং দুজনের অপরাধের শাস্তিও ভিন্ন ভিন্ন নির্ধারণ করেছে। বিবাহিতের জন্য প্রস্তর নিক্ষেপের ব্যবস্থা এবং অবিবাহিতের জন্য বেত্রাঘাতের ব্যবস্থা করেছে। অনুরূপভাবে মহিলাদেরকে ব্যভিচারের মিথ্যা অভিযোগ দেয়ার ক্ষেত্রে ইসলাম স্বামী ও অন্যদের মধ্যে পার্থক্য করেছে। অন্যান্যদের জন্য বেত্রাঘাতের ব্যবস্থা এবং স্বামীর জন্য 'লিআন'-এর ব্যবস্থা করেছে।[১]

২. ইসলামী রাষ্ট্রের জন্য প্রযোজ্য

ইসলামী শাস্তি আইন শুধুমাত্র ইসলামী রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে। ইসলামী শাস্তি আইন বাস্তবায়নের একমাত্র বৈধ অধিকারী রাষ্ট্র প্রধান কিংবা রাষ্ট্র প্রধান মনোনীত বিচারক। ব্যক্তি উদ্যোগে কোন অবস্থাতেই কাউকে শাস্তি দেওয়া যাবে না। রাষ্ট্রের পরিবর্তে ব্যক্তি উদ্যোগে শাস্তি প্রদানের প্রচলন ঘটলে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি আরও অবনতির সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। এজন্য কোনোভাবেই ব্যক্তি উদ্যোগে কাউকে শাস্তি দেওয়া যাবে না।

---

[১] ড. আহমদ আলী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০

৩. অপরাধের প্রেক্ষাপট মূল্যায়ন

ইসলামী আইনে অপরাধীর অপরাধে লিপ্ত হওয়ার পিছনের কারণ খুঁজতে বলা হয়েছে। অপরাধী কেন অপরাধ করল, কোন জিনিস তাকে এই কাজে উদ্বুদ্ধ বা বাধ্য করেছে, ইসলামী আইনে দণ্ডের ফায়সালা দেয়ার সময় তা অবশ্যই বিবেচনায় রাখতে হয়। বিস্তারিত ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে পর্যালোচনা করে যদি জানা যায় যে, তার অপরাধ সংঘটনে কোন বৈষয়িক কারণ ছিল, তা হলে অপরাধীকে অবশ্যই Benefit of doub, বা 'দ্বিধা-সুবিধা' দিতে হবে।

৪. ইসলামী শাস্তি আইন সার্বজনীন

ইসলামী শাস্তি আইন একটি সার্বজনীন আইন। ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসকারী সকল নাগরিক এই আইনের আওতাভূক্ত। অপরাধ যিনি করবেন তাকেই শাস্তি ভোগ করতে হবে। ব্যক্তিভেদে শাস্তি প্রদানে কোনো তারতম্য করা যাবে না। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি অপরাধ করলে যে শাস্তি সাধারণ কেউ অপরাধ করলেও একই শাস্তি ভোগ করবে। মহানবী (সা.)-এর নির্দেশনা এমনই। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে,

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত যে, মাখযুমী গোত্রের যে মহিলাটি চুরি করেছিল তার বিষয়টি কুরায়শদের খুবই উদ্বিগ্ন করে তোলে। তারা নিজেদের মধ্যে বলল, এই বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে কথা বলবার মত কে আছে? কেউ কেউ বলল, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর একান্ত প্রিয়পাত্র উসামা ইবন যায়দ ব্যতীত আর কেউ সাহস পাবে না। তারপর উসামা এই বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সঙ্গে কথা বললেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, তুমি আমার কাছে আল্লাহ নির্ধরিত হদ্দসমূহের অন্যতম হদ্দ সম্পর্কে সুপারিশ করছ? এরপর তিনি দাঁড়ালেন এবং খুতবা দিয়ে বললেন, তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা এই জন্যই ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল যে, তাদের মধ্যে প্রতিপত্তিশালী ভদ্র ঘরের কেউ যদি চুরি করত তবে তারা তাকে ছেড়ে দিত আর দুর্বল কোন ব্যক্তি চুরি করলে তার উপর হদ্দ প্রয়োগ করত। আল্লাহর কসম, মুহাম্মদের মেয়ে ফাতিমাও যদি চুরি করত তবুও আমি অবশ্যই তার হাত কাটতাম।[১]

৫. কঠোরতা ও দয়ার সমন্বয়

ইসলামী আইন পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, ইসলামের কোন কোন হদ্দের ক্ষেত্রে কঠোরতা অবলম্বন করা হয়েছে। কিন্তু এতে সমাজের প্রতি ইসলামের যে ব্যাপক দয়া বা দায়-দায়িত্ব বোধ প্রকাশ পেয়েছে, সে কথা কিছুতেই বিস্মৃত হওয়া চলে না। কতিপয়ের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করে সমষ্টির ক্ষতি সাধন করা কিছু মাত্র যৌক্তিক হতে পারে না। এ কথা বলাই বাহুল্য যে, শাস্তির কঠোরতা-নমনীয়তার সাথে অপরাধের সংখ্যা হ্রাস-বৃদ্ধির গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান। ইতিহাস এটা প্রমাণ করে যে, যখন সমাজে অপরাধের কঠোর শাস্তি প্রয়োগ করা হয়েছে, তখনই অপরাধের সংখ্যা দ্রুত শূণ্যের কোঠায় নেমে এসেছে। পাশাপাশি যখন শাস্তির কঠোরতার মাত্রা কম করা হয়েছে, অপরাধের সংখ্যা তখনই হু হু করে বৃদ্ধি পেতে থাকে। অপরদিকে এ-ও লক্ষ্যণীয় যে, ইসলাম হদ্দ জাতীয় শাস্তি প্রমাণের ক্ষেত্রে কল্পনাতীত কঠোরতার নীতি অবলম্বন করেছে। অপরাধ প্রমাণে কোন রূপ সন্দেহ দেখা দিলে হদ্দ কার্যকর হবে না।[২]

---

[১] আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা আত-তিরমিযী (রহ.), *তিরমিযী শরীফ*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা : হাদীস নং ১৪৩৬

[২] ড. আহমদ আলী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০-৩১

৬. সমষ্টি ও ব্যষ্টি- উভয়ের স্বার্থ সংরক্ষণ

প্রচলিত আইনে অপরাধের শাস্তিদানের ক্ষেত্রে সমাজের কল্যাণ সাধনকে অধিক গুরুত্বারোপ করা হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অপরাধী ব্যক্তির স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় উপেক্ষা করা হয়। এ ক্ষেত্রে ইসলামী আইনী প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। ইসলাম কাউকে দণ্ড দেওয়ার পূর্বে দণ্ডিত অপরাধীর অপরাধে লিপ্ত হবার প্রেক্ষাপটকে অত্যন্ত নিবিড় ভাবে মূল্যায়ন করে। এর পাশাপাশি অপরাধের সময় আর্থ-সামাজিক পরিবেশ, সাংস্কৃতিক অবস্থা ইত্যাদি বিষয়ের ওপরও ইসলামী আইনে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। সার্বিক পরিস্থিতি বিচার বিশ্লেষণ করে, অপরাধীর অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রেখে শাস্তি বিলম্বিত করার ব্যবস্থাও ইসলামে রয়েছে।

৭. জনস্বার্থ

ইসলামী শাস্তি আইনে জনস্বার্থকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়েছে। ইসলাম ও ইসলামী আইনের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্যই হচ্ছে জনস্বার্থ সংরক্ষণ করা। যেকারণে ইসলামী শাস্তি আইনে ভিন্ন ভিন্ন ধরণের শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় চুরির শাস্তি বিধানের কথা। চুরির শাস্তি বিধান সম্পর্কে কুরআন কারীমে বলা হয়েছে,

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللهِ، وَاللهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

তোমরা চোর ও চুন্নির (ডান) হাত কেটে দিবে তাদের কৃতকর্মের (চৌর্যবৃত্তি) দরুন আল্লাহ্ তায়ালার পক্ষ থেকে শাস্তি স্বরূপ। বস্তুত আল্লাহ্ তায়ালা অতিশয় ক্ষমতাবান মহান প্রজ্ঞাময়।

তবে কেউ পেশাদার চোর নয় কিন্তু বিশেষ পরিস্থিতির কারণে চুরি করেছে বা কেউ খুব স্বল্প মূল্যের কিছু চুরি করেছে এ ধরনের ক্ষেত্রে যে তার হাত কাটা হবে ব্যাপারটা এমন নয়। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা.) থেকে বর্ণিত, গাছে ঝুলানো ফল চুরির ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, যে ব্যক্তি প্রয়োজনের তাগিদে ফল নেয়, কিন্তু লুকিয়ে কাপড়ে বেঁধে না নেয়, তার কোন শাস্তি হবে না। যদি কেউ এরূপ ফল নিয়ে বের হয়, তবে তার দ্বিগুণ জরিমানা হবে এবং শাস্তি দেওয়া হবে। ফল উন্মুক্ত স্থানে রাখার পর যদি কেউ চুরি করে, আর তার মূল্য ঢালের মূল্যের পরিমাণ হয়, তবে তার হাত কাটা যাবে। যদি কোন ব্যক্তি ঢালের মূল্যের চেয়ে কম মূল্যের বস্তু চুরি করে, তবে তার দ্বিগুণ জরিমানা দিতে হবে, আর শাস্তিও হবে।[১]

অপর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

قَطَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ كَذَا قَالَ

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) একটি ঢালের যার মূল্য ছিল পাঁচ দিরহাম, চুরি করায় চোরের হাত কাটার নির্দেশ দেন।[২]

উপরে উল্লিখিত হাদীসদ্বয়ে চুরি করা সত্ত্বেও চোরের হাত না কাটার বিশেষ কিছু পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। লক্ষণীয় দিক হচ্ছে ক্ষেত্র বিশেষ চোরের হাত না কাটার অনুমতি প্রদানের মাধ্যমে মালিক এবং চোর উভয়ের স্বর্থকেই রক্ষা করার চেষ্টা করা হয়েছে। পাঁচ দিরহামের কম পরিমাণ সম্পদ চুরি করলে মালিকের খুব বেশি ক্ষতি হওয়ার

---

[১] আবু আবদির রহমান ইবনে শোয়াইব আন নাসায়ী (রহ.), *নাসায়ী শরীফ*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা : হাদীস নং ৪৯৫৭

[২] *প্রাগুক্ত*, হাদীস নং৪৯৬০

সম্ভাবনা নাই। আবার ক্ষুধার তাড়নায় গাছ থেকে ফল খাওয়ার অপরাধে একজন ব্যক্তিকে হাত কেটে কর্মহীন করে দেওয়াও ইসলাম সমর্থন করেনি। তবে কেউ যদি পেশাদার চোর হয় তবে বিচারক তার অপরাধ বিবেচনা করে, তার দ্বারা জনজীবন কতটুকু ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তা বিবেচনা করে রায় প্রদান করবেন।

৮. শিক্ষামূলক ও দৃষ্টান্তমূলক

ইসলামে বড় বড় অপরাধের শাস্তি শুধু কঠোরই নয়; শিক্ষামূলক ও দৃষ্টান্তমূলকও। আজ পর্যন্ত দুনিয়ায় এটাই দেখা গেছে যে, জনগণকে যে কাজ থেকে বিরত রাখা কাম্য, তা করার অপরাধের শাস্তি সাধারণত প্রকাশ্যেই কার্যকর করা হয়েছে। শাস্তি যতই শিক্ষামূলক ও দৃষ্টান্তমূলক হবে, অপরাধের প্রবণতা সমাজে ততই বাধাগ্রস্ত হবে। এ কারণেই ইসলামে বড় বড় অপরাধের শাস্তিসমূহ গোপনে নয়; প্রকাশ্যভাবে ও জনগণের উপস্থিতিতে কার্যকর করার ব্যবস্থা করেছে।[১]

এ ক্ষেত্রে তাযীরী অপরাধসমূহের ক্ষেত্রে অপরাধীর অবস্থা ও পরিবেশ বিবেচনা করে নিবর্তনমূলক শাস্তি দান অর্থাৎ প্রয়োজনে অপরাধীকে জনসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে কারাগারে কয়েদ করে রাখার ব্যবস্থাও ইসলামে রয়েছে। কিন্তু এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, বর্তমান কালে কারাগারগুলোর অবস্থা অত্যন্ত নৈরাশ্যজনক। বলতে গেলে এ যুগের কারাগারসমূহ অপরাধ বিজ্ঞানের সুদৃঢ় প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ের কোন অপরাধী কিছুকাল কারাজীবন লাভ করতে পারলে সে একজন অতীব দক্ষ ও পাকাপোক্ত এবং দুঃসাহসী অপরাধী হয়ে বের হয়ে আসে। তাই বিষয়টি এখন গভীরভাবে পুনর্বিবেচনার প্রয়োজন রয়েছে। অপরাধীকে অপরাধবিমুখ এবং সমাজকে অপরাধমুক্ত বানাতে হলে বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিতে কোন কোন তাযীরী অপরাধের জন্যও হুদূদের মতো নিবর্তনমূলক শাস্তির চাইতে দৃষ্টান্তমূলক দৈহিক শাস্তিদানের কথা বিবেচনা করা যেতে পারে।[২]

ইসলামী শাস্তি আইন বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ

ইসলামী আইন অনুযায়ী হদ্দ-এর শাস্তি বিধান কার্যকর করার জন্য একমাত্র দায়িত্বশীল হচ্ছেন সরকার প্রধান। ফকিহগণ একমত যে, শাসক বা তার প্রতিনিধিই হদ্দ কার্যকরি করার ক্ষমতা ও অধিকার রাখে। নাগরিকগণ নিজ নিজ ব্যক্তিগত উদ্যোগে এ কাজ করার অধিকার ও ক্ষমতা রাখে না। ইমাম তাহাবি মুসলিম বিন ইয়াসার থেকে বর্ণনা করেছেন, জনৈক সাহাবী বলতেন, "যাকাত, হুদুদ, কর খাজনা ও জুমার নামায শাসকের হাতে ন্যস্ত।" ইমাম তাহাবি বলেন, কোনো সাহাবী তার এই উক্তির বিরোধিতা করেছেন বলে আমাদের জানা নেই। তবে দাসদাসীর উপর ব্যভিচারের হদ্দ কার্যকর করার ক্ষমতা মনিবের রয়েছে।[৩] হাদীস শরীফে কর্ণিত হয়েছে,

عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَحُدَّهَا وَلاَ يُعَيِّرْهَا ثَلاَثَ مِرَارٍ فَإِنْ عَادَتْ فِي الرَّابِعَةِ فَلْيَجْلِدْهَا وَلْيَبِعْهَا بِضَفِيرٍ أَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعْرٍ " .

---

[১] ড. আহমদ আলী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১

[২] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩২

[৩] সাইয়্যেদ সাবেক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯৪

আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সা.) বলেছেন, যদি তোমাদের কারো দাসী যিনা করে, তবে তোমরা তাকে শাস্তি দেবে, কেবল ধমক দিয়ে ছেড়ে দেবে না এরূপ তিনবার করবে। আর যদি সে চতুর্থবার যিনা করে, তবে বেত্রাঘাত করার পর তাকে বিক্রি করে দেবে; যদিও তা সামান্য চুলের রশির বিনিময়েও হয়।[১]

কিন্তু ইমাম আবু হানিফার মতে, মনিব নিজে কার্যকরি করবেনা। বরং শাসকের নিকট অভিযোগ পৌছাবে।[২]

মহানবী (সা.) মক্কা থেকে মদীনায় হিযরত করে আসার পর বিচারকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর জীবদ্দশায় তিনিই ছিলেন মদীনা রাষ্ট্রের প্রধান বিচারক। নবীজি (সা.)-এর ওফাতের পর খোলাফায় রাশেদাগণের শাসনামলে তারাই রাজ্যের বিচার কার্য পরিচালনা করতেন। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, উমার ইবন খাত্তব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ‘রজম’-এর বিধান দিয়েছেন, আবূ বাকরও ‘রজম’-এর বিধান দিয়েছেন আর আমিও ‘রজম’-এর বিধান দিয়েছি। আল্লাহর কিতাবে অতিরিক্তকরণ যদি আমি হারাম মনে না করতাম তবে অবশ্যই আমি এই বিধানটি আল্লাহর কিতাবে লিখে দিতাম। কারণ আমি আশংকা করি (ভবিষ্যতে) একদল লোক হয়ত এমন আসবে তারা যখন “রজম”-এর বিধান আল্লাহর কিতাবে পাবে না তখন তা অস্বীকার করে বসবে।[৩]

তবে সরকার প্রধানের পক্ষে যেহেতু সব সময় সর্বত্র ব্যক্তিগতভাবে ও নিজ হাতে এ কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব নয়; তাই তিনি তাঁর প্রতিনিধির মাধ্যমে এ কাজ আঞ্জাম দেবেন। খোলাফায় রাশেদার যুগে মুসলিম সাম্রাজ্যের আয়তন দিন দিন বাড়তে থাকে। ফলে খলিফার একার পক্ষে সকল বিচার কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব ছিল না। যে কারণে তারা বিচারক নিয়োগ দিতেন। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَرَجَمَ أَبُو بَكْرٍ وَرَجَمْتُ وَلَوْلاَ أَنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَزِيدَ فِي كِتَابِ اللَّهِ لَكَتَبْتُهُ فِي الْمُصْحَفِ فَإِنِّي قَدْ خَشِيتُ أَنْ تَجِيءَ أَقْوَامٌ فَلاَ يَجِدُونَهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَيَكْفُرُونَ بِهِ .

আবদুল্লাহ ইবন মাওহিব (রহ.) থেকে বর্ণিত যে, উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু -কে বললেন, যাও, মানুষের মাঝে বিচার কার্য সম্পাদন কর। তিনি বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন, আপনি আমাকে এই বিষয়ে ক্ষমা করবেন? উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, তুমি এটা না পছন্দ করছ কেন? অথচ তোমার পিতা (উমার) তো বিচার করতেন।[৪]

উপরে উল্লিখিত হাদীসে দেখা যাচ্ছে যে হযরত উসমান (রা.) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) কে বিচার কার্য পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করার আহ্বান জানাচ্ছেন। ইসলামী শরীয়াতের বিধান হচ্ছে, নিয়োগপ্রাপ্ত বিচারকগণ প্রয়োজনে রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে ভাতাও গ্রহণ করতে পারবে।

আর সাধারণ শাস্তি অর্থাৎ তাযীরাত-এর ক্ষেত্রে কোন কোনটি সরকার প্রধানের অনুমতি ছাড়াও প্রাতিষ্ঠানিক প্রধান, সমাজপতি এবং আলিমগণও কার্যকর করতে পারেন। যেমন শিক্ষকগণ ছাত্রদেরকে পড়ালেখায় অবহেলা এবং অশিষ্ট

[১] আবু দাউদ সুলায়মান ইবনুল আশ'আছ আস সিজিস্তানি (রহ.), *আবূ দাউদ শরীফ*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা : হাদীস নং ৪৪১১

[২] সাইয়্যেদ সাবেক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯৪

[৩] আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা আত-তিরমিযী (রহ.), *তিরমিযী শরীফ*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা : হাদীস নং ১৪৩৭

[৪] *প্রাগুক্ত*, হাদীস নং ১৩২৫

আচরণের জন্য শাস্তি দিতে পারবেন। অনুরূপভাবে প্রাতিষ্ঠানিক প্রধানগণ তাদের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অশোভন আচরণের জন্য শাস্তিমূলক বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন।[১]

অপরাধীকে শাস্তি দেওয়ার শর্তসমূহ

ইসলামী আইন পূর্ণাঙ্গ আইন। ইসলামী আইনের উদ্দেশ্য মানুষকে অন্যায় আচরণ থেকে দূরে রাখা। মানুষের নৈতিক চরিত্র গঠনে কার্যকর ভূমিকা পালন করা। সমাজকে শান্তিপূর্ণ ও স্থিতিশীল রাখা। যেসকল কারণে সমাজের শান্তি ও স্থিতি নষ্ট হতে পারে, মানুষের নৈতিক স্খলন ঘটতে পারে সেসব কর্মকাণ্ড প্রতিহত করা। আর এ কারণেই প্রচলিত আইনের ন্যায় ইসলামী আইনেও অপরাধীর জন্য শাস্তির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। তবে অপরাধীকে শাস্তির মুখোমুখি করতে হলে অবশ্যই কিছু শর্ত পূরণ করতে হবে। নিম্নে অপরাধীকে শাস্তি দেওয়ার ক্ষেত্রে ইসলাম প্রণীত শর্তসমূহ সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো- ১. সুস্থ হওয়া ২. সুস্থ বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন হওয়া ৩. প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া ৪. অপরাধ ইসলামী রাষ্ট্রে সংঘটিত হওয়া ৫. অপরাধ সম্পর্কে অবগত থাকা ৬. আর্থ-সামাজিক পরিবেশ বিবেচনা করা হদ্দের ফায়সালা দান কালে ৭. স্বেচ্ছায় অপরাধে লিপ্ত হওয়া ৮. অপরাধ সম্পন্ন করা

১. সুস্থ হওয়া

দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে অবশ্যই সুস্থ হতে হবে। বেত্রাঘাতের দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তি যদি এমন কোন রোগে আক্রান্ত হয়, যে রোগ থেকে তার সুস্থ হবার আশা রয়েছে, তাহলে রোগাক্রান্ত অবস্থায় তার ওপর হদ্দ কায়িম করা উচিত নয়। তবে রোগ থেকে সুস্থ হবার আশা না থাকলে রোগাক্রান্ত অবস্থায় হদ্দ জারি করতে হবে। প্রস্তরনিক্ষেপে হত্যার দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে অসুস্থ অবস্থায় সাজা দেয়া যাবে।[২] হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ عَلِيٍّ، رضى الله عنه قَالَ فَجَرَتْ جَارِيَةٌ لآلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " يَا عَلِيُّ انْطَلِقْ فَأَقِمْ عَلَيْهَا الْحَدَّ " . فَانْطَلَقْتُ فَإِذَا بِهَا دَمٌ يَسِيلُ لَمْ يَنْقَطِعْ فَأَتَيْتُهُ فَقَالَ " يَا عَلِيُّ أَفَرَغْتَ " . قُلْتُ أَتَيْتُهَا وَدَمُهَا يَسِيلُ . فَقَالَ " دَعْهَا حَتَّى يَنْقَطِعَ دَمُهَا ثُمَّ أَقِمْ عَلَيْهَا الْحَدَّ وَأَقِيمُوا الْحُدُودَ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ " .

আলী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর পরিবারের মধ্যে হতে কারো একটি দাসী যিনা করলে, তিনি বলেন, হে আলী! তুমি তাকে নিয়ে যাও এবং তার উপর হদ্দ কায়েম কর। তখন আমি তার কাছে উপস্থিত হয়ে দেখতে পাই যে, তার রজঃস্রাব হচ্ছে এবং তা বন্ধ হচ্ছে না। তখন আমি নবী (সা.)-এর নিকট উপস্থিত হলে, তিনি জিজ্ঞাসা করেন, হে আলী! তুমি কি তাকে শাস্তি দিয়েছ? তখন আমি বল, আমি তার কাছে গিয়ে দেখতে পাই যে তার রজঃস্রাব হচ্ছে। তিনি বলেন, তুমি তার রক্ত বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা কর, এরপর তাকে শাস্তি দেবে। তিনি আরো বলেন, তোমরা তোমাদের দাসীদের উপর হদ্দ কায়েম করবে, (যদি তারা যিনা করে)।[৩]

---

[১] আবু দাউদ সুলায়মান ইবনুল আশ'আছ আস সিজিস্তানি (রহ.), *আবূ দাউদ শরীফ*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা : হাদীস নং ৪৭

[২] ইবনুল হুমাম, ফাতহুল কাদীর, খ. ৫, পৃ. ২৫৪

[৩] আবু দাউদ সুলায়মান ইবনুল আশ'আছ আস সিজিস্তানি (রহ.), *প্রাগুক্ত*, হাদীস নং ৪৪১৪

২. সুস্থ বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন হওয়া

অপরাধীর উপর হদ্দের শাস্তি কায়িম করতে হলে অপরাধীকে অবশ্যই সুস্থ বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন হতে হবে। ইসলামের বিধান হচ্ছে কোন ব্যক্তি অপরাধ করার পর পাগল হয়ে গেলে তার ওপরও হদ্দ কায়িম করা যাবে না। অনুরূপভাবে পাগল অবস্থায় কেউ কোন রূপ অপরাধে লিপ্ত হলে তার জন্যও তার ওপর হদ্দ কার্যকর করা যাবে না। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, একদা উমার (রা.) এর নিকট একজন পাগলীকে উপস্থিত করা হয়, যে যিনা করেছিল। তিনি সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করে, তাকে পাথর মেরে হত্যার নির্দেশ দেন। এ সময় আলী (রা.) সেখানে উপস্থিত হয়ে সে মহিলা সম্পর্কে জানতে চান। তখন তাকে বলা হয়, সে অমুক গোত্রের একজন পাগল মাহিলা। সে যিনা করায়, তাকে পাথর মেরে হত্যার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তখন আলী (রা.) বলেন, তাকে ফিরিয়ে আনো। উক্ত মহিলাকে ফিরিয়ে আনা হলে, আলী (রা.) উমার (রা.) এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলেন, হে আমীরুল মুমিনিন! আপনি কি অবগত নন যে, তিন ধরনের ব্যক্তি হতে কলম উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে? তারা হলো, (১) পাগল যতক্ষণ না সে সুস্থ হয় (২) নিদ্রিত ব্যক্তি যতক্ষণ না সে জাগ্রত হয় এবং (৩) নাবালেগ ছেলে মেয়ে যতক্ষণ না তারা বালেগ হয়। তখন উমার (রা.) বলেন, হ্যাঁ। আলী (রা.) জানতে চান, তবে কেন এই পাগলীকে পাথর মেরে হত্যা করা হচ্ছে? তখন উমার (রা.) বলেন, এখন আর এরূপ করা হবে না। আলী (রা.) বলেন, আপনি তাকে ছেড়ে দিন। তখন উমার (রা.) তাকে ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ প্রদান করেন এবং তাকবীর পাঠ করতে থাকেন।[১]

৩. প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া

দণ্ড প্রাপ্ত অপরাধীকে অবশ্যই প্রাপ্তবয়স্ক হতে হবে। ইসলামী আইনের বিধান হচ্ছে অপ্রাপ্তবয়স্ক কোন বালক বা বালিকা হুদূদ ভূক্ত কোন অপরাধে লিপ্ত হলে তার ওপর হদ্দ কায়িম করা যাবে না। কারণ অপ্রাপ্তবয়স্ক কারো উপর শরিয়তের কোনো বিধানই অর্পিত হয় না। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে,

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ عُرِضْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ أُحُدٍ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يُجِزْنِي وَعُرِضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَنِي . قَالَ نَافِعٌ فَحَدَّثْتُ بِهِ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي خِلاَفَتِهِ فَقَالَ هَذَا فَصْلُ مَا بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ .

ইবনে উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে উহুদের যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সামনে উপস্থিত করা হলো, তখন আমি চৌদ্দ বছরের তরুণ। তিনি আমাকে (জিহাদে শরীক হতে) অনুমতি দেননি। পরে খন্দকের যুদ্ধের দিন আমাকে তাঁর সামনে পেশ করা হয়। তখন আমি পনের বছরের তরুণ। তিনি আমাকে (যুদ্ধে যোগদানের) অনুমতি দেন। নাফে (রহ.) বলেন, আমি এ হাদীস উমার ইবনে আবদুল আযীয (রা.) এর খেলাফত আমলে তার নিকট বর্ণনা করলে তিনি বলেন, এটাই নাবালেগ ও বালেগের মধ্যে পার্থক্যবিন্দু।[২]

---

[১] *প্রাগুক্ত*, হাদীস নং ৪৩৪৭

[২] আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনু ইয়াজিদ ইবনু আবদুল্লাহ ইবনু মাজাহ (রহ.), *ইবনে মাজাহ শরীফ*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা : হাদীস নং ২৫৪৩

৪. অপরাধ ইসলামী রাষ্ট্রে সংঘটিত হওয়া

অপরাধ ইসলামী রাষ্ট্রে সংঘটিত হতে হবে। অমুসলিম রাষ্ট্রে কোন মুসলিম হদ্দযোগ্য কোন অপরাধ করলেও সে জন্য হদ্দ কার্যকর করা যাবে না। কারণ, ইসলামী শরী'আ আইনে হদ্দ কার্যকর করার একমাত্র বৈধ অধিকারী হলেন ইসলামী সরকার বা তার প্রতিনিধি। অমুসলিম রাষ্ট্রে যেহেতু ইসলামী সরকারই নেই, তাই সেখানে হদ্দ কায়েম করা যাবে না। তবে কোন অমুসলিম কিংবা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে যদি মুসলিমদের জন্য পৃথক শরী'আ আইন ও আদালত কার্যকর থাকে, তা হলে মুসলিম কাযীগণই হদ্দযোগ্য অপরাধের জন্য হদ্দ কার্যকর করার যাবতীয় শর্ত বিবেচনায় এনে অপরাধীদের ওপর হদ্দ প্রয়োগ করতে পারবে।[১]

৫. অপরাধ সম্পর্কে অবগত থাকা

অপরাধীকে অবশ্যই অপরাধ এবং এর শাস্তি বিধান সম্পর্কে অবগত থাকতে হবে। ভিন্ন ধর্মাবলম্বী বা ভিন দেশীয় কেউ যদি অজ্ঞতাবশত মানুষের হক সংশ্লিষ্ট নয় এমন অপরাধ করে যেমন মদ সেবন করে তাহলে তাকে মদপানের শাস্তি দেয়া যাবে না। তবে সে যদি মানুষের হক সংশ্লিষ্ট অপরাধ যেমন চুরি করে কিংবা যেনা করে এরূপ বলে, তা হলে তাকে শাস্তি দেওয়া যাবে।[২]

৬. হদ্দের ফায়সালা দানকালে আর্থ-সামাজিক পরিবেশ বিবেচনা করা

কারো উপর হদ্দ কায়িম করার পূর্বে আর্থ-সামাজিক পরিবেশ বিবেচনা করা আবশ্যক। অপরাধীর অপরাধ করার কারণ কী, অপরাধের শাস্তি বিধানের সময় অপরাধী ঠিক কি অবস্থা ও পরিবেশের মধ্যে পড়ে গিয়ে অপরাধটা করেছিল বা করতে বাধ্য হয়েছিল- রায় দানের পূর্বে বিচারক অবশ্যই এসব বিবেচনা করবেন। বর্ণিত রয়েছে, হযরত উমার (রা) দুর্ভিক্ষের সময় চোরের হাত কাটার বিধান মওকুফ করে দিয়েছিলেন।[৩] তার কারণ এই ছিল যে, দুর্ভিক্ষ ও প্রচণ্ড অভাবঅনটন কালে কে অভাবগ্রস্ততার দরুন, আর কে কোনরূপ প্রয়োজন ছাড়াই চুরির কাজ করেছে, তা নিরূপণ করা কিছুতেই সম্ভবপর হয় না। এরূপ সংশয়জনক অবস্থায় হাত কাটার নির্দেশ কার্যকর করা সম্ভব হতে পারে না।[৪]

৭. স্বেচ্ছায় অপরাধে লিপ্ত হওয়া

অপরাধীকে শাস্তি প্রদান করতে হলে দেখতে হবে অপরাধী স্বেচ্ছায় অপরাধে লিপ্ত হয়েছে কিনা। কোনো ব্যক্তি যদি কোনো ধরনের চাপের মুখে কোনো অপরাধ করে তবে তার ওপর হদ্দ কার্যকর করা যাবে না। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "আমার উম্মাত থেকে ভুল-ভ্রান্তি, বিস্মৃতি এবং যে কাজে তাদের জোরপূর্বক বাধ্য করা হবে, তা ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে।"[৫]

---

[১] ড. আহমদ আলী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৫

[২] আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত,* খ. ২৪, পৃ. ৩১

[৩] ইবনু কুদামা আল-মাকদিসী, *আল-কাফী ফী কিহহি ইবনি হাম্বল,* বৈরুত : আল-মাকতাবুল ইসলামী, খ. ৪, পৃ. ১৮১

[৪] ড. আহমদ আলী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৪

[৫] ইবনু হাজর আসকালানী, *আদ-দিরায়াহ ফী তাখরীজি আহাদীছিল হিদায়াহ,* বৈরূত: দারুল মাআরিফা, খ. ১, পৃ. ১৭৫

৮. অপরাধ সম্পন্ন করা

অপরাধী অপরাধ সম্পন্ন করলেই কেবল হদ্দ কার্যকর করা যাবে। উদাহরণস্বরুপ বলা যায় কেউ একজন চুরি করার উদ্দেশ্যে ঘরের দরজা ভেঙ্গে বা সিঁদ কেটে ঘরে ঢুকবার পূর্ণ ব্যবস্থা করার পর ঘরের লোকেরা টের পেয়ে যায় অথবা পাহারাদারের চোখে পড়েছে মনে করে চুরি করা থেকে ফিরে যায়, তাহলে তার ওপর হদ্দ জারি করা যাবে না। তবে তাযীর প্রয়োগ করা যাবে।[১]

হুদুদের ক্ষেত্রে সুপারিশের বিধান

হুদুদের ক্ষেত্রে সুপারিশ করা এবং তা আমলে নেয়া উভয়ই ইসলামী শরীয়তের আলোকে অবৈধ অর্থাৎ হারাম। হুদূদ জাতীয় কোন অপরাধের নালিশ যদি বিচারকের কাছে দায়ের হয় এবং তা প্রমাণিতও হয়, তাহলে কোনভাবেই এ অপরাধের শাস্তি ক্ষমা বা লঘু করার জন্য সুপারিশ করা কারো জন্য জায়েয নয়।[২]

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত যে, মাখযুমী গোত্রের যে মহিলাটি চুরি করেছিল তার বিষয়টি কুরায়শদের খুবই উদ্বিগ্ন করে তোলে। তারা নিজেদের মধ্যে বলল, এই বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে কথা বলবার মত কে আছে? কেউ কেউ বলল, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর একান্ত প্রিয় পাত্র উসামা ইবন যায়দ ব্যতীত আর কেউ সাহস পাবে না। তারপর উসামা এই বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সঙ্গে কথা বললেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, তুমি আমার কাছে আল্লাহ নির্ধারিত হদ্দসমূহের অন্যতম হদ্দ সম্পর্কে সুপারিশ করছ? এরপর তিনি দাঁড়ালেন এবং খুতবা দিয়ে বললেন, তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা এই জন্যই ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল যে, তাদের মধ্যে প্রতিপত্তিশালী ভদ্র ঘরের কেউ যদি চুরি করত তবে তারা তাকে ছেড়ে দিত আর দুর্বল কোন ব্যক্তি চুরি করলে তার উপর হদ্দ প্রয়োগ করত। আল্লাহর কসম, মুহাম্মদের মেয়ে ফাতিমাও যদি চুরি করত তবুও আমি অবশ্যই তার হাত কাটতাম।[৩]

হুদুদের ক্ষেত্রে যদি অপরাধের নালিশ বিচারক বা শাসকের কাছে দায়ের করার আগেই বাদীর কাছে অপরাধীকে ছেড়ে দেওয়ার বা মাফ করে দেওয়ার জন্য সুপারিশ করা হয় তবে তা দূষণীয় নয়।

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ نَامَ فِي الْمَسْجِدِ وَتَوَسَّدَ رِدَاءَهُ فَأُخِذَ مِنْ تَحْتِ رَأْسِهِ فَجَاءَ بِسَارِقِهِ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُقْطَعَ فَقَالَ صَفْوَانُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ أُرِدْ هَذَا رِدَائِي عَلَيْهِ صَدَقَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " فَهَلاَّ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ "

সাফওয়ান (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি নিজের চাদরকে বালিশবৎ বানিয়ে তা মাথার নিচে রেখে মসজিদে ঘুমিয়েছিলেন। চোর তার মাথার নিচ থেকে তা চুরি করলো। তিনি তাকে গ্রেপ্তার করে নবী (সা.)-এর নিকট নিয়ে এলেন। নবী (সা.) তার হাত কাটার নির্দেশ দিলেন। সাফওয়ান (রা.) বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি তো এটা চাইনি! আমার

---

[১] আবদুল কাদের আওদাহ, *আত-তাশরীউল জিনা'ঈ আল-ইসলামী,* বৈরূত : মুআসসাতুর রিসালাহ, ১৪০১ হি., খ. ১, পৃ. ৩০-১

[২] ইবনু আবিদীন, *রাদ্দুল মুহতার,* বৈরূত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, খ,৪, পৃ.৪; আল ফাওযান, ড, সালিহ ইবন ফাওযান, আল-মুলাখখাস আল-ফিকহী, রিয়াদঃ ইদারাতুল বুহুছ আল-ইলমিয়া ওয়লি ইফতা, ১৪২৩ হি, পৃ ৫২৪-৫২৫

[৩] আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা আত-তিরমিযী (রহ.), *তিরমিযী শরীফ*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা : হাদীস নং ১৪৩৬

চাদর আমি তাকে দান করলাম। রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, তাহলে তাকে আমার কাছে আনার আগে কেন তা করলে না?[১]

এ হাদীস থেকে বোঝা যায় যে কোনো মামলা বিচারকের দরবারে উত্থাপনের পূর্বেই যদি বাদী বিবাদীকে ক্ষমা করতে চায় তাহলে বিবাদী শাস্তি থেকে মুক্তি পাবে। তবে অপরাধ যদি অমার্জনীয় হয় এবং অপরাধীও বিপজ্জনক হয়, তাহলে তাকে ছেড়ে দেয়ার বা মাফ করে দেয়ার সুপারিশ করা উচিত নয়; বরং তার ওপর যথাযথভাবে হদ্দ কার্যকর করার ব্যবস্থায় সহযোগিতাই করাই উত্তম।[২]

একই সাথে হদ্দ ও তাযীর প্রয়োগের বিধান

একই সাথে একই অপরাধীর উপর হদ্দ ও তাযীরের বিধান প্রয়োগ বৈধ কিনা এ বিষয়ে চার মাযহাবের ইমামগণের মতভেদ রয়েছে। হানাফী মাযহাবের দৃষ্টিতে, অবিবাহিত ব্যভিচারীকে যিনার নির্ধারিত শাস্তি (হদ্দ) বেত্রাঘাত প্রদানের অতিরিক্ত দণ্ড প্রদান করা হলে তা তাযীর হিসেবে গণ্য হবে। তাঁর মতানুযায়ী হদ্দের সাথে নির্বাসন দণ্ডও যুক্ত হতে পারে।[৩] ইমাম মালিক (রহ)-এর মতে, মৃত্যুদণ্ড ব্যতীত হদ্দ ও কিসাসের আওতাভুক্ত অন্যান্য অপরাধের ক্ষেত্রে অপরাধীকে একই সাথে হদ্দ ও তাযীরের শাস্তি প্রদান করা যায়।[৪] ইমাম শাফিঈ (রহ)-এর মতেও উভয় ধরনের শাস্তি একত্রে প্রদান করা যেতে পারে। মালিকী ও শাফি'ঈ ইমামগণের মতে, যখমকারী থেকে কিসাস গ্রহণ করার পর তাযীর হিসেবে যদি অন্য কোন সাধারণ দণ্ড দেয়া হয়, তাতে কোন অসুবিধা নেই। মালিকী ইমামগণ আরো বলেন, নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীরা যদি হত্যাকারীর কিসাস মাফ করে দেয় কিংবা যে ক্ষেত্রে আইনত হত্যাকারীকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা যায় না (যেমন পিতা পুত্রকে হত্যা করলে হত্যাকারী পিতাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা যাবে না), সে সব অবস্থায়। হত্যাকারীকে অবশ্যই রক্তপণ দিতে হবে। অধিকন্তু তাকে তাযীর হিসেবে একশটি বেত্রাঘাত করতে হবে এবং এক বছর বন্দী করে রাখতে হবে। ইমাম শাফিঈ (রহ)-এর মতে, মদ্যপানের শাস্তি চল্লিশ বেত্রাঘাত, এর অতিরিক্ত বেত্রাঘাত করা হলে তা তাযীর হিসেবে গণ্য হবে।[৫]

অপরাধের পুনরাবৃত্তিতে হদ্দের কার্যকারিতা

একই অপরাধী মাঝেমাঝে একই অপরাধ একাধিবার করে থাকে আবার একই সাথে একাধিক অপরাধ করে থাকে। কেউ যদি একটা অপরাধ (যেমন যিনা বা ব্যভিচারের অপবাদ বা মদ্যপান বা চুরি) বারংবার করল, এমতাবস্থায় তার জন্য এক জাতীয় সব অপরাধের জন্য একটি মাত্র হদ্দ কার্যকর করা যাবে। কেননা যে সব শাস্তিতে আল্লাহর হকের প্রাবল্য রয়েছে, তাতে হদ্দের উদ্দেশ্য হল দুনিয়াকে বিপর্যয় থেকে মুক্ত করা এবং ভবিষ্যতে অপরাধে লিপ্ত ব্যক্তিকে অপরাধ থেকে বাঁচিয়ে রাখা। আর এ উদ্দেশ্য একটি মাত্র হদ্দ প্রয়োগ দ্বারা অর্জিত হতে পারে। তাই একটি অপরাধ

---

[১] আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনু ইয়াজিদ ইবনু আবদুল্লাহ ইবনু মাজাহ (রহ.), *ইবনে মাজাহ শরীফ*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা : হাদীস নং ২৫৯৫

[২] এটা ইমাম মালিকের অভিমত; আল-বাজী, সুলায়মান, আল-মুনতকা শারহুল মু'আত্তা, দারুল কিতাবিল ইসলামী, খ. ৭,পৃ. ১৬৩

[৩] আল-কাসানী, বদাই, খ. ৭, পৃ. ৩৯; ইবনুল হুমাম, *ফাতহুল কাদীর*, খ. ৪, পৃ. ১৩৬

[৪] আল-হাত্তাব, *মাওয়াহিবুল জলীল*, দারুল ফিকর, ৬. পৃ, ২৪৭, ২৬৮; *শরহুদ দুরায়দী*, খ. ৪, পৃ. ২২৪

[৫] আল-আনসারী, *আসলনা মাতালিব*, দরুল কিতাবিল ইসলামী, খ. ৪,পৃ. ১৬২

বারংবার করলেও সবগুলোর জন্য একটি হদ্দই যথেষ্ট হবে। তবে একটা অপরাধের শাস্তির হবার পর ফিরে যদি আবার সে একই অপরাধের পুনরাবৃত্তি করে, তাহলে দ্বিতীয়বারের অপরাধের জন্য নতুনভাবে হদ্দ প্রয়োগ করতে হবে।[১]

একসাথে কয়েকটি অপরাধের শাস্তি

একই সাথে একের অধিক অপরাধ সংঘটিত করে যেমন একসাথে যিনাও করল, অপরকে যিনার অপবাদও দিল, চুরিও করল এবং মদও সেবন করল, এমতাবস্থায় তাকে প্রত্যেকটি অপরাধের জন্য পৃথক পৃথক হদ্দ প্রয়োগ করতে হবে। কেননা প্রত্যেক অপরাধের শাস্তির পেছনে শরী'আতের ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্য রয়েছে। যেমন যিনার হদ্দের উদ্দেশ্য হল বংশের পবিত্রতা রক্ষা করা, অপবাদের হদ্দের উদ্দেশ্য হল মানুষের মান-মর্যাদা রক্ষা করা আর মদ্যপানের শাস্তির উদ্দেশ্য হল বিবেকের সুস্থতা রক্ষা করা, চুরির হদ্দের উদ্দেশ্য সমাজের সম্পদ রক্ষা করা। তদুপরি কোন কোন অপরাধের শাস্তির প্রকৃতিও ভিন্ন ভিন্ন।[২] সুতরাং কোন একটি অপরাধের হদ্দ কায়িম করা হলে অপর অপরাধের শাস্তির উদ্দেশ্য অর্জিত হবে না।[৩]

উল্লেখ্য যে, কারো ওপর একটা অপরাধের শাস্তি আংশিকভাবে কার্যকর করা হয়েছে, এমতাবস্থায় সে যদি পুনরায় ভিন্ন জায়গায় আবার সে অপরাধে লিপ্ত হয়, তাহলে তার ওপর দ্বিতীয় অপরাধের জন্য নতুনভাবে হদ্দ কার্যকর করা হবে। যেমন কোন ব্যভিচারী কিংবা মদ্যপায়ীকে আংশিকভাবে হদ্দ কার্যকর করার পর পালিয়ে গিয়ে সে যদি আবার ব্যভিচারে লিপ্ত হয় কিংবা মদ পান করে, তাহলে দ্বিতীয়বারের অপরাধের জন্য তাকে নতুনভাবে হদ্দ প্রয়োগ করা হবে। কিন্তু অপবাদের হদ্দ কার্যকর করার সময় যদি সে অপর কাউকে অপবাদ দেয় এবং তার শাস্তি থেকে এক ঘা ছাড়া সবকটি বেত্রাঘাত করা হয়, তাহলে তার প্রথম অপবাদের শাস্তিই পূর্ণ করা হবে। দ্বিতীয় অপবাদের জন্য নতুন কোন হদ্দ প্রয়োগ করা হবে না।[৪]

যার উপর হদ্দের দণ্ডবিধি আরোপিত হয় না

হদ্দের বিধানসমূহ মহান আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত। কুরআনের বিভিন্ন আয়তে এর বিধিবিধান বর্ণিত হয়েছে। হদ্দের বাস্তবায়ন শুরু হয় মহানবী (সা.)-এর মাধ্যমে। হদ্দের শাস্তি থেকে তিন ব্যক্তিকে অব্যহতি দেওয়ার কথা মহানবী (সা.) বলেছেন।

عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَشِبَّ وَعَنِ الْمَعْتُوهِ حَتَّى يَعْقِلَ " .

---

[১] আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, খ. ৯, পৃ. ১০১; ড. আহমদ আলী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৭

[২] মালিকীগণের মতে, যেহেতু অপবাদ ও মদ্যপানের শাস্তির পরিমাণ একই, তাই কেউ এ দুটি অপরাধে এক সাথে লিপ্ত হলে তার জন্য একটি হদ্দই যথেষ্ট হবে। অর্থাৎ যদি একটির শাস্তি দেয়া হয়, অন্যটির শাস্তি দেয়া লাগবে না; ড. আহমদ আলী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৭

[৩] আল-বাকরী, মুহাম্মাদ, আল-ইয়াহ শারহুল হিদায়াহ, দারুল ফিকর, খ,ঐ, পৃ. ৩৪১-২; ইবনু 'আবিদীন, *রাদ্দুল মুহতার*, খ. ৪, পৃ. ৫২

[৪] এটা হানাফীগণের অভিমত (ইবনু আবেদীন, রাদ্দুলল মুহতার, খ, পৃ.-৫২) ; ড. আহমদ আলী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৭

আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, তিন ব্যক্তির উপর থেকে দণ্ডবিধি রহিত করে দেওয়া হয়েছে, ঘুমন্ত ব্যক্তি যতক্ষণ না সে জাগ্রত হয়, শিশু যতক্ষন না সাবালক হয়, বেহুশ ব্যক্তি যতক্ষণ না তার হুশ ফিরে এসেছে।[১]

মিথ্যা সাক্ষ্য শিরকসম অপরাধ

ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অন্যতম বাধা মিথ্যা সাক্ষ্য। এর কারণে অনেক অপরাধী শাস্তি থেকে খালাস পেয়ে যায়। আবর অনেক নিরপরাধ মানুষ অন্যায়ভাবে শাস্তি ভোগ করে। প্রচলিত আইন এবং ইসলামী আইনে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া শাস্তিযোগ্য অপরাধ। ইসলামের দৃষ্টিতে সবচেয়ে বড় পাপের কাজ হচ্ছে মহান আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে বা কোনো বস্তুকে তুলনা করা বা তার সাথে অংশীদারিত্ব স্থাপন করা। এমনকি মহান আল্লাহর কোনো গুনাবলির সাথে অন্য কারো গুণাবলি তুলনা করা বা সমান মনে করাও জঘন্য গুনাহ। ইসলামী শরীয়াতের পরিভাষায় একে শিরক বলে।

আল্লাহ তায়ালা কুরআনুল কারিমের অনেক জায়গায় বারবার শিরক করা থেকে বিরত থাকতে বলেছেন। শিরককে বড় জুলুম বলে আখ্যায়িত করেছেন। আল্লাহ তায়ালার সঙ্গে কোনো ব্যক্তি বা বস্তুকে অংশীদার সাব্যস্ত করার ব্যাপারে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ বলেন- 'যখন লোকমান উপদেশস্বরূপ তার ছেলেকে বলল- হে ছেলে! আল্লাহর সাথে শরিক করো না। নিশ্চয় আল্লাহর সাথে শরিক করা মহা অন্যায়।'[২]

কুরআনে শিরকের যে গুনাহ ও শাস্তির কথা বলা হয়েছে, তাহলো- নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন না, যে লোক তাঁর সাথে শরিক তথা অংশীদার সাব্যস্ত করে। তিনি ক্ষমা করেন এর নিম্ন পর্যায়ের পাপ, যার জন্য তিনি ইচ্ছা করেন। আর যে লোক অংশীদার সাব্যস্ত করল আল্লাহর সাথে, সে যেন আল্লাহকে অপবাদ দিলো।'[৩]

তারা কাফের, যারা বলে যে, মরিময়-তনয় মসীহ (ঈসা)-ই আল্লাহ; অথচ মসীহ বলেন, হে বনি ইসরাঈল! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর, যিনি আমার পালনকর্তা এবং তোমাদেরও পালনকর্তা। নিশ্চয় যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেন এবং তার বাসস্থান হয় জাহান্নাম। আর অত্যাচারীদের কোনো সাহায্যকারী নেই।'[৪]

আহলে-কিতাব ও মুশরেকদের মধ্যে যারা আল্লাহকে অস্বীকারকারী, তারা জাহান্নামের আগুনে স্থায়ীভাবে থাকবে। সৃষ্টির মধ্যে তারাই নিকৃষ্ট।'[৫]

নবীজী (সা.) মিথ্যা সাক্ষ্য দানকে শিরকের মতো ভয়াবহ অপরাধের সাথে তুলনা করেছেন। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে,

---

[১] আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা আত-তিরমিযী (রহ.), *তিরমিযী শরীফ*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা : হাদীস নং ১৪২৮

[২] আল কুরআন, ৩১ : ১৩

[৩] আল কুরআন, ৪ : ৪৮

[৪] আল কুরআন, ৫ : ৭২

[৫] আল কুরআন, ৯৮ : ৬

عَنْ خُرَيْمِ بْنِ فَاتِكٍ، قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلاَةَ الصُّبْحِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَامَ قَائِمًا فَقَالَ " عُدِلَتْ شَهَادَةُ الزُّورِ بِالإِشْرَاكِ بِاللَّهِ " . ثَلاَثَ مِرَارٍ ثُمَّ قَرَأَ (فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ) .

খুরাইম ইবন ফাতিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সা.) ফজরের সালাত আদায় শেষে দাঁড়িয়ে তিনবার বলেন, মিথ্যা সাক্ষ্য আল্লাহ্‌র সঙ্গে শিরক সম অপরাধ।[১]

মুখে আঘাত করা নিষেধ

ইসলাম মানবতার ধর্ম। মানব মর্যাদা প্রতিষ্ঠার ধর্ম। মহান আল্লাহ তার সকল সৃষ্টির মধ্যে মানুষকে সর্বোচ্চ মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করেছেন। মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে মানব মর্যাদা সম্পর্কে বলেন, ‘তিনিই তোমাদের দুনিয়ায় প্রতিনিধি করেছেন এবং যা তিনি তোমাদের দিয়েছেন সে সম্বন্ধে পরীক্ষার উদ্দেশ্যে তোমাদের কতককে কতকের ওপর মর্যাদায় উন্নীত করেছেন। তোমার প্রতিপালক তো শাস্তি প্রদানে দ্রুত আর তিনি অবশ্যই ক্ষমাশীল, দয়াময়’।[২] আল্লাহ তায়ালা আরও বলেন, ‘আমি মানবজাতিকে সম্মানিত করেছি, তাকে কর্তৃত্ব দিয়েছি স্থলে ও জলে, তাদেরকে দিয়েছি উত্তম জীবিকা এবং তাদের শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি আমার সৃষ্টিজগতের অনেকের ওপর।’[৩]

মুখমণ্ডল মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে সর্বাধিক সম্মানিত। মুখ দিয়ে মানুষ ঈমানের স্বীকৃতি ঘোষণা দেয়, সত্য কথা বলে, তিলাওয়াত করে, দরুদ পড়ে। কপাল দিয়ে একমাত্র মহান আল্লাহকে সিজদা করে। আরও অসংখ্য ভালো কাজ সংগঠিত হয় মুখমণ্ডল দিয়ে। যেকারণেই মুখমণ্ডল সম্মানিত। তাই হদ্দের শাস্তি কার্যকর করার সময় মুখমণ্ডলে আঘাত করতে নিষেধ করা হয়েছে। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَّقِ الْوَجْهَ " .

আবূ হুরায়রা (রা.) নবী করীম (সা.) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, যখন তোমাদের কেউ অন্য কাউকে শাস্তি প্রদান করে, তখন সে যেন তার চেহারার উপর আঘাত না করে।[৪]

হদ্দ প্রতিহত করা প্রসঙ্গ

ইসলামী আইনে বিনা অপরাধে কাউকে শাস্তি দেওয়ার সুযোগ নেই। কারো অপরাধ যদি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত না হয় তাহলে তাকে শাস্তি প্রদন করা অন্যায়। ইসলাম এ অন্যায় থেকে বিচারকদের নির্দশ দিয়েছে।

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " ادْرَءُوا الْحُدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَخْرَجٌ فَخَلُّوا سَبِيلَهُ فَإِنَّ الإِمَامَ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعُقُوبَةِ " .

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, তোমরা যথা সম্ভব মুসলিমদের থেকে হদ্দ প্রতিহত করার চেষ্টা করবে। সম্ভব হলে, কোন উপায় থাকলে তাকে তার পথে ছেড়ে দিও। কারণ, ইমাম বা কর্তৃপক্ষের শাস্তি প্রদান করে ভুল করা অপেক্ষা ক্ষমা করে ভুল করা শ্রেয়।[৫]

---

[১] আবু দাউদ সুলায়মান ইবনুল আশ'আছ আস সিজিস্তানি (রহ.), *আবূ দাউদ শরীফ*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা : হাদীস নং ৩৫৬০
[২] আল কুরআন, ৬ : ১৬৫
[৩] আল কুরআন, ১৭ : ৭০
[৪] আবু দাউদ সুলায়মান ইবনুল আশ'আছ আস সিজিস্তানি (রহ.), *প্রাগুক্ত*,হাদীস নং ৪৪৩১
[৫] আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা আত-তিরমিযী (রহ.), *তিরমিযী শরীফ*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা : হাদীস নং ১৪২৯

মুসলমানের দোষ ঢেকে রাখা উত্তম

কোনো অপরাধী যদি পেশাদার অপরাধী না হয় বরং বিশেষ কোনো কারণে অপরাধে জড়িয়ে পড়ে এবং অপরাধ করার পর যদি অনুশোচনায় ভোগে তাহলে তাকে বিচারের মুখোমুখি না করাই উত্তম। এর মাধ্যমে ঐ ব্যক্তি সংশোধনের সুযোগ পাবে। আর এর মাধ্যমে মুসলিম ব্যক্তির দোষও গোপন রাখা হবে। এটি অত্যন্ত পূণ্যের কাজ। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, সালিম তার পিতা আবদুল্লাহ ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, এক মুসলিম আরেক মুসলিমের ভাই। সে তার উপর যুলুম করবে না, তাকে ধ্বংসের জন্য সমর্পণ করবে না। যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের প্রয়োজনে ব্যস্ত থাকে, আল্লাহ তার প্রয়োজন পূরণে ব্যস্ত থাকেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের দুঃখ দূর করে দেয়, আল্লাহ তায়ালা তার কিয়ামতের দিনের কষ্ট দূর করে দিবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষ গোপন রাখে আল্লাহ তায়ালা কিয়ামতের দিন তার দোষ ঢেকে রাখবেন।[১]

শাস্তি গুনাহের কাফ্ফারা স্বরূপ

অধিকাংশ আলেমের মতে, কোনো অপরাধীর উপর হুদুদ কার্যকর করা হলে তা তার কৃত অপরাধের জন্য কাফফারা হয়ে যাবে।[২] কোনো অপরাধী যদি বিচারকের নিকট নিজ অপরাধ স্বীকার এবং স্বীয় কৃত অপরাধের জন্য মহান আল্লাহর নিকট তাওবা করে তাহলে মহান আল্লাহ চাইলে তার গুনাহ মাফ করে দিতে পারেন বলে আলেমদের কেউ কেউ মত দিয়েছেন। তবে এ ক্ষেত্রে তার উপর অবশ্যই হদ্দ কার্যকর হতে হবে। হাদীসের নির্দেশনা এরূপ।

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي مَجْلِسٍ فَقَالَ " بَايِعُونِي عَلَى أَنْ لاَ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَلاَ تَسْرِقُوا، وَلاَ تَزْنُوا ". وَقَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ كُلَّهَا " فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ بِهِ، فَهْوَ كَفَّارَتُهُ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا، فَسَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ، وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ ".

উবাদা ইবন সামিত (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা একদা নাবী (সা.)-এর নিকট কোন এক মজলিসে ছিলাম। তখন তিনি বললেন, তোমরা আমার কাছে এ মর্মে বায়আত গ্রহন কর যে, আল্লাহ তায়ালার সঙ্গে কোন কিছু শরীক করবে না, চুরি করবে না এবং ব্যভিচার করবে না। এরপর তিনি এ আয়াত পুরা তিলাওয়াত করেন, "তোমাদের মাঝে যে ব্যক্তি (বায়আতের শর্তসমূহ) পুরা করে তার বিনিময় আল্লাহ তায়ালার কাছে। আর যে ব্যক্তি এর ভেতর থেকে কিছু করে বসে আর তার জন্য শাস্তি দেওয়া হয় তবে এটা তার জন্য কাফফারা হয়ে যায়। আর যদি এর ভেতর থেকে কিছু করে বসে আর আল্লাহ তা গোপন রাখেন তবে এটা তার ইখতিয়ার। তিনি ইচ্ছা করলে তাকে মাফ করতে পারেন, ইচ্ছা করলে শাস্তি দিতে পারেন।[৩]

---

[১] *প্রাগুক্ত*, হাদীস নং ১৪৩১

[২] সাইয়্যেদ সাবেক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯৬

[৩] আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল বুখারী আল জুফী (রহ.), *বুখারী শরীফ*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা : হাদীস নং ৬৩২৭

অপরাধ স্বীকারকারী স্বীকৃতি প্রত্যাহার করলে তার বিধান

অনেক সময় দেখা যায় অপরাধী তার অপরাধ স্বীকার করে পূনরায় তার স্বীকৃতি প্রত্যাহার করে নেয়। এ ক্ষেত্রে অপরাধী যদি পেশাদার অপরাধী হয় তাহলে অধিকাংশ ইমামের মতে তার উপর হদ্দের শাস্তি বাস্তবায়িত করতে হবে। আর অপরাধী যদি পেশাদার অপরাধী না হয় তাহলে তাকে শাস্তি থেকে রেহাই দেওয়া যেতে পারে। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ جَاءَ مَاعِزٌ الأَسْلَمِيُّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ زَنَى . فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ جَاءَ مِنْ شِقِّهِ الآخَرِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ قَدْ زَنَى . فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ جَاءَ مِنْ شِقِّهِ الآخَرِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ قَدْ زَنَى . فَأَمَرَ بِهِ فِي الرَّابِعَةِ فَأُخْرِجَ إِلَى الْحَرَّةِ فَرُجِمَ بِالْحِجَارَةِ فَلَمَّا وَجَدَ مَسَّ الْحِجَارَةِ فَرَّ يَشْتَدُّ حَتَّى مَرَّ بِرَجُلٍ مَعَهُ لَحْىُ جَمَلٍ فَضَرَبَهُ بِهِ وَضَرَبَهُ النَّاسُ حَتَّى مَاتَ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ فَرَّ حِينَ وَجَدَ مَسَّ الْحِجَارَةِ وَمَسَّ الْمَوْتِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " هَلاَّ تَرَكْتُمُوهُ " .

আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মাইয আসলামী রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে এলেন এবং বললেন যে, তিনি যিনা করে ফেলেছেন। নাবী (সা.) তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। তিনিও ঐ দিকে গিয়ে বললেন যে, তিনি যিনা করে ফেলেছেন। নাবী (সা.) মুখ ফিরিয়ে নিলেন। তিনিও সেই দিকে গিয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ তো যিনা করে বসেছে। চতুর্থবারে নাবী (সা.) তার সম্পর্কে নির্দেশ দিলেন। অনন্তর তাকে “হাররা”-এর দিকে বের করে নিয়ে যাওয়া হল এবং পাথর ছুড়ে রজম করা (শুরু) হল। পাথরের আঘাত যখন তাকে স্পর্শ করল তিনি দৌড়ে পালাতে শুরু করলেন। এক ব্যক্তির পাশ দিয়ে তিনি দৌড়ে যাচ্ছিলেন। ঐ ব্যক্তির হাতে ছিল একটি উটের চোয়াল। তা দিয়ে সে তাকে আঘাত করে এবং অজানা লোকেরাও তাকে আঘাত করেন। শেষে তিনি মারা যান। পরে লোকেরা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে এই কথার আলোচনা করেন যে, পাথরের আঘাত ও মৃত্যুর স্পর্শ পেয়ে মাইয পালাতে গিয়েছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, তাকে তোমরা কেন ছেড়ে দিলে না?[১]

যথাসম্ভব অপরাধ গোপন করা

কোনো অপরাধী যদি স্বীয় অপরাধের জন্য বিচারকের নিকট না গিয়ে মহান আল্লাহর নিকট তাওবা করে তবে তা-ই উত্তম হবে। অধিকাংশ ইমাম এ মতই পোষণ করেছেন। মহানবী (সা.)-এর নির্দেশনা হচ্ছে শাস্তির বিধান যথাসম্ভব গোপন করা।

عَنْ يَزِيدَ بْنِ نُعَيْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ مَاعِزًا، أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَقَرَّ عِنْدَهُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَأَمَرَ بِرَجْمِهِ وَقَالَ لِهَزَّالٍ " لَوْ سَتَرْتَهُ بِثَوْبِكَ كَانَ خَيْرًا لَكَ " .

ইয়াযিদ ইবনে নুয়াইম তার পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, মাইয (রা.) নরী করীম (সা.)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে চারবার যিনার কথা স্বীকার করেন। যার ফলে তিনি তাকে পাথর মেরে হত্যার নির্দেশ দেন এবং হুযালা (রা.)-কে

---

[১] আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা আত-তিরমিযী (রহ.), *তিরমিযী শরীফ*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা : হাদীস নং ১৪৩৪

বলেন, যদি তুমি এ কথা তোমার কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখতে (অর্থাৎ গোপন রাখতে), তবে তা তোমার জন্য উওম হতো।[১]

অপরাধীর শাস্তি থেকে রেহাই পাবার বিশেষ অবস্থাসমূহ

ইসলামী আইনে অপরাধী বেশ কিছু বিশেষ পরিস্থিতিতে শাস্তি থেকে রেহাই পেতে পারে। এর কিছু বিষয় বিবাদী সাথে সম্পৃক্ত, কিছু বিষয় বাদীর সাথে সম্পৃক্ত এবং কিছু বিষয় সাক্ষী ও অন্যান্য বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত। বিবাদীর শাস্তি থেকে রেহাই পাওয়ার বিশেষ অবস্থাসমূহ নিম্নে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

১. অপরাধীর মৃত্যু

২. বাদী বিবাদী সমঝোতা

৩. স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার

৪. সন্দেহ

৫. সাক্ষীদের মৃত্যু বা সাক্ষ্য ফিরিয়ে নেয়া

৬. অপরাধের পর দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়ে যাওয়া

৭. তাওবা

৮. মিথ্যা প্রতিপন্ন করা

৯. ক্ষমা

১. অপরাধীর মৃত্যু

ইসলামী আইন এবং প্রচলিত আইন অনুযায়ী যেকোনো অপরাধে অরাধীর শাস্তি প্রধানত দুই ধরনের হয়ে থাকে।

ক. শারিরীক শাস্তি

খ. আর্থিক শাস্তি।

ক. শারিরীক শাস্তি

অপরাধীর শাস্তি যদি শারিরীক হয় যেমন-মৃত্যুদণ্ড, কারাদণ্ড ও বেত্রাঘাত প্রভৃতি। এ ক্ষেত্রে অপরাধী মৃত্যু বরণ করলে তার শাস্তি রহিত হয়ে যাবে। কেননা এমতাবস্থায় শাস্তি প্রয়োগের কোনো সুযোগই নেই।

খ. আর্থিক শাস্তি

[১] আবু দাউদ সুলায়মান ইবনুল আশ'আছ আস সিজিস্তানি (রহ.), *আবূ দাউদ শরীফ*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা : হাদীস নং ৪৩২৬

আর অপরাধীর শাস্তি যদি তার দেহের সাথে সম্পর্কিত না হয়ে তার অর্থ-সম্পদের সাথে সম্পর্কিত হয়। যেমন অর্থদণ্ড ও সম্পদ বাজেয়াপ্তকরণ প্রভৃতি হলে বিচারের পর তার মৃত্যু হলেও শাস্তি রহিত হবে না। কেননা এমতাবস্থায় তার সম্পদের ওপর বিচারের রায় কার্যকর করা সম্ভব। ঋণের মতো তার পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে অর্থদণ্ডের পরিমাণ আদায় করা যাবে।[১]

২. বাদী বিবাদী সমঝোতা

ইসলামী আইন অনুযায়ী হদ্দ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সমঝোতার সুযোগ নেই। বাদীর পক্ষে বিবাদীর কাছ থেকে হদ্দের বিনিময় গ্রহণ করাও জায়েয নয়। এ কারণে কোন চোর, মদ্যপায়ী কিংবা ব্যভিচারীর সাথে কোন বিনিময় নিয়ে কিংবা কোন শর্তে সমঝোতা করে তাকে ছেড়ে দেয়া, বিচারকের কাছে নালিশ পেশ না করাও বিধিসম্মত নয়। কেননা হুদুদের বিষয়টি একান্তভাবে আল্লাহর হকের সাথে জড়িত। মহানবী (সা.) হদ্দকে আল্লাহর হক হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

عَنْ عَائِشَةَ ـ رضى الله عنها أَنَّ قُرَيْشًا، أَهَمَّتْهُمُ الْمَرْأَةُ الْمَخْزُومِيَّةُ الَّتِي سَرَقَتْ فَقَالُوا مَنْ يُكَلِّمُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلاَّ أُسَامَةُ حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. فَكَلَّمَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ ". ثُمَّ قَامَ فَخَطَبَ قَالَ " يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا ضَلَّ مَنْ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ الضَّعِيفُ فِيهِمْ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَايْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعَ مُحَمَّدٌ يَدَهَا ".

আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত। মাখযুমী সম্প্রদায়ের জনৈকা মহিলার ব্যাপারে কুরাইশ বংশের লোকদের খুব দুশ্চিন্তায় ফেলে দিয়েছিল যে কিনা চুরি করেছিল। সাহাবাগণ বললেন যে, রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সঙ্গে কে কথা বলতে পারবে? আর রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর প্রিয় পাত্র উসামা (রা.) ছাড়া কেউ এ সাহস পাবে না। তখন উসামা (রা.) রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সঙ্গে কথা বললেন। এতে তিনি বললেন, তুমি আল্লাহ তায়ালার দেওয়া শাস্তির বিধানের ক্ষেত্রে সুপারিশ করছ? এরপর তিনি দাঁড়িয়ে খুতবা প্রদান করলেন এবং বললেন, হে মানব মণ্ডলী! নিশ্চয়ই তোমাদের পূর্ববর্তী সম্প্রদায়ের লোকেরা পথভ্রষ্ট হয়ে গিয়েছে। কেননা কোন সম্মানিত লোক যখন চুরি করত তখন তারা তাকে রেহাই দিয়ে দিত। আর যখন কোন দুর্বল লোক চুরি করত তখন তার উপর শরীয়তের শাস্তি প্রয়োগ করত। আল্লাহর কসম! মুহাম্মাদ এর কন্যা ফাতিমাও যদি চুরি করে তবে অবশ্যই মুহাম্মাদ তাঁর হাত কেটে দেবে।[২]

সুতরাং এ ক্ষেত্রে বান্দাহর সমঝোতা করার কোনই অধিকার নেই। কেউ যদি এসব ক্ষেত্রে কোন বিনিময় নিয়েও থাকে, তা তাকে অবশ্যই ফিরিয়ে দিতে হবে। কেননা সে তা বিনা অধিকারেই গ্রহণ করেছে।[৩]

৩. স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার

---

[১] ড. আহমদ আলী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৬

[২] আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল বুখারী আল জুফী (রহ.), *বুখারী শরীফ*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা : হাদীস নং ৬৩৩১

[৩] ইবনু তাইমিয়া, আল-ফাতাওয়া আল-কুবরা, খ. ২৮, পৃ. ২৯৮-৩০৪

হদ্দের মধ্যে কিছু বিষয় আছে যেগুলোত আল্লাহর অধিকারের প্রাধান্য রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, চুরি ও মদ্যপানের শাস্তি। এসব অপরাধ যদি অপরাধীর স্বীকারোক্তির মাধ্যমে প্রমাণিত হয়, তবে সে ক্ষেত্রে অপরাধী যদি পরবর্তীতে নিজের স্বীকারোক্তি ফিরিয়ে নেয়, তাহলেও হদ্দ কার্যকর করা যাবে না। হাদীস শরীফে বর্ণিত রয়েছে,

عَنْ سُلَيْمَانَ، بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ جَاءَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ طَهِّرْنِي . فَقَالَ " وَيْحَكَ ارْجِعْ فَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَتُبْ إِلَيْهِ " . قَالَ فَرَجَعَ غَيْرَ بَعِيدٍ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ طَهِّرْنِي . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " وَيْحَكَ ارْجِعْ فَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَتُبْ إِلَيْهِ " . قَالَ فَرَجَعَ غَيْرَ بَعِيدٍ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ طَهِّرْنِي . فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَ ذَلِكَ حَتَّى إِذَا كَانَتِ الرَّابِعَةُ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " فِيمَ أُطَهِّرُكَ " . فَقَالَ مِنَ الزِّنَى . فَسَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَبِهِ جُنُونٌ " . فَأُخْبِرَ أَنَّهُ لَيْسَ بِمَجْنُونٍ . فَقَالَ " أَشَرِبَ خَمْرًا " . فَقَامَ رَجُلٌ فَاسْتَنْكَهَهُ فَلَمْ يَجِدْ مِنْهُ رِيحَ خَمْرٍ . قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَزَنَيْتَ " . فَقَالَ نَعَمْ . فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ فَكَانَ النَّاسُ فِيهِ فِرْقَتَيْنِ قَائِلٌ يَقُولُ لَقَدْ هَلَكَ لَقَدْ أَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ وَقَائِلٌ يَقُولُ مَا تَوْبَةٌ أَفْضَلَ مِنْ تَوْبَةِ مَاعِزٍ أَنَّهُ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَوَضَعَ يَدَهُ فِي يَدِهِ ثُمَّ قَالَ اقْتُلْنِي بِالْحِجَارَةِ - قَالَ - فَلَبِثُوا بِذَلِكَ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةً ثُمَّ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُمْ جُلُوسٌ فَسَلَّمَ ثُمَّ جَلَسَ فَقَالَ " اسْتَغْفِرُوا لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ " . قَالَ فَقَالُوا غَفَرَ اللَّهُ لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ . - قَالَ - فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ أُمَّةٍ لَوَسِعَتْهُمْ " . قَالَ ثُمَّ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ غَامِدٍ مِنَ الأَزْدِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ طَهِّرْنِي . فَقَالَ " وَيْحَكِ ارْجِعِي فَاسْتَغْفِرِي اللَّهَ وَتُوبِي إِلَيْهِ " . فَقَالَتْ أَرَاكَ تُرِيدُ أَنْ تُرَدِّدَنِي كَمَا رَدَّدْتَ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ . قَالَ " وَمَا ذَاكِ " . قَالَتْ إِنَّهَا حُبْلَى مِنَ الزِّنَا . فَقَالَ " آنْتِ " . قَالَتْ نَعَمْ . فَقَالَ لَهَا " حَتَّى تَضَعِي مَا فِي بَطْنِكِ " . قَالَ فَكَفَلَهَا رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ حَتَّى وَضَعَتْ قَالَ فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ قَدْ وَضَعَتِ الْغَامِدِيَّةُ . فَقَالَ " إِذًا لاَ نَرْجُمَهَا وَنَدَعَ وَلَدَهَا صَغِيرًا لَيْسَ لَهُ مَنْ يُرْضِعُهُ " . فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالَ إِلَىَّ رَضَاعُهُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ . قَالَ فَرَجَمَهَا

সুলায়মান ইবন বুরায়েদ (রহ.) তাঁর পিতা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মা'ইয ইবন মালিক নাবী (সা.)-এর নিকট এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে পবিত্র করুন। তখন রাসুলুল্লাহ (সা.) বললেন, দুর্ভাগা! ফিরে চলে যাও এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর ও তাওবা কর। বর্ণনাকারী বলেন যে, লোকটি অল্পদূর চলে গিয়ে আবার ফিরে এলো। এরপর বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে পবিত্র করুন। তখন নাবী (সা.) পূর্বের মতই কথা বললেন। চতুর্থবার রাসুলুল্লাহ (সা.) তাকে বললেন, কোন বিষয়ে আমি তোমাকে পবিত্র করবো? তখন সে বললো, ব্যভিচার হতে।

সুতরাং রাসুলুল্লাহ (সা.) তার (সঙ্গী সাথীদের নিকট) জিজ্ঞাসা করলেন, তার মধ্যে কি কোন পাগলামী আছে। তখন তাঁকে জানানো হল যে, সে পাগল নয়। এরপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, সে মদ্যপান করেছে। তখন এক ব্যক্তি দণ্ডায়মান হল এবং তার মুখ শুকে দেখল, সে তার মুখ থেকে মদের গন্ধ পেল না। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর রাসুলুল্লাহ (সা.) ঐ ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি ব্যভিচার করেছ? প্রতি উত্তরে সে বললো, জী হ্যাঁ। অতএব রাসুলুল্লাহ (সা.) তার প্রতি (ব্যভিচারের শস্তি প্রদানের) নির্দেশ দিলেন। এরপর তাকে পাথর নিক্ষেপ করা হল।

পরে এ ব্যাপারে জনগণ দু'দলে বিভক্ত হয়ে গেল। একদল বলতে লাগল, নিশ্চয়ই সে (মা'ইয) ধ্বংস হয়ে গেছে। নিশ্চয়ই তার পাপ তাকে ঘিরে ফেলেছে। দ্বিতীয় দল বলতে লাগল, মা'ইয এর তাওবার চেয়ে উত্তম (তাওবার অনুশোচনা) আর হয় না। সে প্রথমে নাবী (সা.)-এর কাছে আগমন করলো এবং নিজের হাত তার হাতের উপর রাখলো। এরপর বললো আমাকে পাথর দ্বারা হত্যা করুন। বর্ণনা কারী বলেন যে, দু'তিন দিন পর্যন্ত মাই'য এ অবস্থায় অতিবাহিত করল।

এরপর রাসুলুল্লাহ (সা.) আগমন করলেন তখন তারা (সাহাবীগণ) বসে ছিলেন। তিনি সালাম দিলেন, এরপর বসলেন এবং বললেন, তোমরা মা'ইয ইবন মালিক এর জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। তখন তারা বললেন, আল্লাহ মা'ইয ইবন মালিককে ক্ষমা করুন। এরপর রাসুলুল্লাহ (সা.) বললেন, সে এমন তাওবা করেছে, যদি তার এক উম্মাতের লোকদের মাঝে বন্টিত হয় তবে সকলের জন্যই তা যথেষ্ট হবে।

বর্ণনাকারী বলেন, এরপর তার নিকট আযদ গোত্রের শাখা গামিদ পরিবারের এক মহিলা আগমন করলো এবং বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে পবিত্র করুন। তখন বললেন, দুর্ভাগা! তুমি ফিরে যাও এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর ও তাওবা কর। তখন মহিলা বললো, আপনি কি ইচ্ছা করছেন যে, আমাকেও ফিরিয়ে দিবেন যেমনিভাবে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন মা'ইয ইবন মালিককে? তখন তিনি বললেন, তোমার কি হয়েছে। মহিলা বলল, আমি ব্যভিচারের কারণে গর্ভবতী। রাসুলুল্লাহ (সা.) জিজ্ঞাসা করলেন তুমিই? সে প্রতি উত্তরে বলল, জ্বী হ্যাঁ।

তখন তিনি তাকে বললেন, তোমার গর্ভের সন্তান প্রসব হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা কর। বর্ণনাকারী বলেন যে, এক আনসারী ব্যক্তি তার গর্ভের সন্তান প্রসবকাল পর্যন্ত তার দায়িত্ব গ্রহণ করল। বর্ণনাকারী বলেন, কিছুদিন পর ঐ ব্যক্তি নাবী (সা.)-এর নিকট এসে বলছেন, গামেদী মাহিলা তার সন্তান প্রসব করেছে। তখন তিনি বললেন, এমতাবস্থায় তার ছোট শিশু সন্তানকে রেখে আমি তাকে রজম করতে পারিনা। কেননা তার শিশু সন্তানাকে দুধ পান করানোর মত কেউ নেই। তখন এক আনসারী লোক দাড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি তার দুধ পান করানোর দায়িত্ব নিলাম। তখন তিনি আদেশ প্রদান করলেন এবং তাকে পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করলেন।[১]

এ হাদীসে দেখা যাচ্ছে হযরত মা'ইয ইবন মালিক (রা) যখন রাসূলুল্লাহ। (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট যিনার কথা স্বীকার করেছিলেন, তখন তিনি তাকে স্বীকারোক্তি থেকে ফিরে আসার জন্য বারংবার উৎসাহিত করেছিলেন।

এ থেকে জানা যায়, যদি স্বীকারোক্তি থেকে ফিরে আসার কারণে হদ্দ রহিত হয়ে না যায়, তাহলে তাঁর বারংবার উৎসাহ দেবার পেছনে কি উদ্দেশ্য থাকতে পারে। তদুপরি স্বীকারোক্তি থেকে ফিরে আসার কারণে অপরাধে লিপ্ত হবার ব্যাপারে সন্দেহ সৃষ্টি হয়ে থাকে। তবে যিনার অপবাদে যেহেতু আল্লাহর হকের সাথে বান্দাহর হকও জড়িত

[১] আবুল হুসায়ন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল কুশায়রী আন নিশাপুরি (রহ.), *মুসলিম শরীফ*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা : হাদীস নং ৪২৮২

রয়েছে, তাই কিসাসের মত এ ক্ষেত্রেও স্বীকারোক্তি ফিরিয়ে নিলে হদ্দের বিধান কার্যকর হবে। অনুরূপভাবে যে সব তাযীরাতের সাথে বান্দাহর হক জড়িত, তাতে স্বীকারোক্তি ফিরিয়ে নিলেও তাযীরের বিধান কার্যকর হবে।[১]

উল্লেখ্য যে, স্বীকারোক্তি থেকে প্রত্যাবর্তন স্পষ্ট ভাষায়ও হতে পারে, ইঙ্গিতাকারেও হতে পারে। এ কারণেই স্বেচ্ছায় স্বীকৃতিদানকারী ব্যভিচারীকে লোকেরা যদি প্রস্তর নিক্ষেপ করতে শুরু করে আর সে যদি পালিয়ে যায় এবং ফিরে না আসে, তা হলে তার পিছু গমন করা যাবে না। অনুরূপভাবে স্বেচ্ছায় স্বীকৃতিদানকারী অপরাধীকে বেত্রাঘাত শুরু করার পর পালিয়ে গেলে তারও পিছু গমন করা যাবেনা। কেননা এমতাবস্থায় পালিয়ে যাওয়ার একটি অর্থ এ হতে পারে যে, সে তার স্বীকারোক্তি থেকে ফিরে এসেছে।[২]

৪. সন্দেহ

ইসলামী শরীয়তের বিধান হচ্ছে, হদ্দ কার্যকর হবার জন্য অপরাধ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হতে হবে। যদি অপরাধ প্রমাণে কোন সন্দেহ দেখা দেয়, তাহলে হদ্দ অকার্যকর হয়ে যাবে।[৩]

উদাহরণস্বরূপ বলা যায় কোনো ব্যক্তি বিয়ের প্রথম রাত নিজ বিছানায় শায়িত কোন মহিলাকে নিজ স্ত্রী মনে করে। এবং অজ্ঞতাবশত তার সাথে সহবাসে লিপ্ত হয়। বাস্তবে দেখা গেল যে শায়িত মেয়েটি তার স্ত্রী নয়। এমতাবস্থায় ইসলামী শরীয়াতের বিধান হচ্ছে তার ওপর হদ্দ জারী করা চলবে না। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, সন্দেহের কারণে হদ্দ রহিত কর।[৪]

৫. সাক্ষীদের মৃত্যু বা সাক্ষ্য ফিরিয়ে নেওয়া

অপরাধের সাক্ষীরা বিচারকের নিকট সাক্ষ্য দেয়ার আগেই যদি মৃত্যুবরণ করে, তাহলেও হদ্দ কার্যকর করা যাবে না। তাছাড়া বিচারের পর শাস্তি কার্যকর করার আগেই যদি সাক্ষীরা সকলেই কিংবা প্রয়োজনীয় সংখ্যক সাক্ষী নিজেদের সাক্ষ্য ফিরিয়ে নেয়, তা হলেও হদ্দ কার্যকর করা যাবে না।[৫]

৬. অপরাধের পর দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়ে যাওয়া

অপরাধ সংঘটিত হওয়ার পর যদি বিচারিক প্রক্রিয়ার নানা জটিলতার কারনে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়ে যায় তাহলে ঐ বিচার সম্পন্ন করতে হবে কিনা এ ব্যাপারে ইমামদের মাঝে মতভেদ রয়েছে। ইমামদের একদলের মতে যিনা,

---

[১] আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত,* খ. ৯, পৃ. ৯২-৩; আল-বাজী, আল-*মুন্তকা,* খ. ৭, পৃ. ১৪৩; *আল মাওসু'আতুল ফিকহিয়্যাহ,* খ. ১৭, পৃ. ১৩৪-১৩৫

[২] *আল-মাওসুআতুল ফিকহিয়্যাহ,* খ. ১৭, পৃ. ১৩৪-১৩৫

[৩] ইবনু আবিদীন, *রাদ্দুল মুহতার,* খ. ৪, পৃ.১৭

[৪] আল- কুরতুবী, *আল-জামি' লি আহকামিল কুর'আন,* খ. ১৩, পৃ.২৯৮

[৫] ইবনু নুজায়ম, *আল-বাহরুর রাইক,* খ. ৫,পৃ.২৪-২৫; *আল-মাওসুআতুল ফিকহিয়্যাহ,* খ. ২২, পৃ. ১৫১

যিনার অপবাদ ও মদ্যপান প্রভৃতি অপরাধে যখনই উপযুক্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ পাওয়া যাবে, তখনি তা আমলে নিয়ে শাস্তি কার্যকর করা যাবে। কিন্তু হানাফীগণের মতে, আল্লাহর হক প্রবলভাবে জড়িত- এ জাতীয় হদ্দসমূহে (যেমন যিনা ও মদ্যপান) কোন গ্রহণযোগ্য কারণ ছাড়া (যেমন সাক্ষীদের দূর দেশে চলে যাওয়া বা দীর্ঘ দিন অসুস্থ হয়ে পড়ে থাকা প্রভৃতি) অপরাধ করার পর দীর্ঘ দিন অতিবাহিত হয়ে গেলে হদ্দ অকার্যকর হয়ে পড়বে।[১] সুতরাং দীর্ঘ দিন পর এ সব ক্ষেত্রে সাক্ষীদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। তবে যিনার অপবাদের বেলায় যেহেতু আল্লাহর হকের সাথে মানুষের হকের বিষয়টিও জড়িত রয়েছে, তাই এ ক্ষেত্রে দীর্ঘদিন পর সাক্ষীদের সাক্ষ্য গ্রহণ করতে কোন অসুবিধা নেই।[২]

৭. তাওবা

তাওবা একটি আরবী শব্দ। এর শাব্দিক অর্থ ফিরে আসা, প্রত্যাবর্তন করা। ইসলামের দৃষ্টিতে কোনো অপরাধী স্বীয় অন্যায়ের জন্য আন্তরিকতার সাথে তাওবা করে অপরাধ থেকে ফিরে আসে, তাহলে প্রবল আশা করা যায় যে, মহান আল্লাহ তার তাওবা কবুল করবেন। এই তাওবার ফলে আখিরাতে অপরাধীর গুনাহ মাফ হয়ে যাওয়ার এবং আযাব থেকে মুক্তি লাভ করতে পারে। তবে তাওবা দ্বারা অপরাধের ইহজাগতিক শাস্তি থেকে নিষ্কৃতি লাভের বিষয় নির্ভর করে অপরাধের ধরনের উপর।

ক. তাযীরাতের বেলায় তাওবার প্রভাব

অপরাধী ব্যক্তি তাওবা করলে এবং তাওবার বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া গেলে বিচারক তাযীরাত ক্ষমা করে দিতে পারেন। এক্ষেত্রে তাযীরাত বান্দাহর হক সংশ্লিষ্ট হলে যেমন কাউকে গালমন্দ ও মারধর করার শাস্তি ইত্যাদি তবে বান্দাহ নিজেই তা ক্ষমা করে দিতে পারে। আর আল্লাহর হক সংশ্লিষ্ট হলেযেমন নামায, রোযা ছেড়ে দেয়ার শাস্তি ইত্যাদি তাহলে অপরাধীর তাওবা বিবেচনায় এনে শাসক ইচ্ছা করলে তাকে শাস্তি থেকে রেহাই দিতে পারে।[৩]

খ. হুদূদ জাতীয় অপরাধসমূহের বেলায় তাওবা

অধিকাংশ ইমামদের মতে, অপরাধী তাওবা করলেও সাধারণত, হদ্দ জাতীয় অপরাধ মাফ হবে না।[৪] রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হযরত মা'ইয আসলামী ও গামিদিয়্যাহকে রজম করেছেন, আর চুরির স্বীকারোক্তির

---

[১] দীর্ঘসময় বলতে কতদিনকে বোঝানো হয়েছে তা নিয়ে হানাফী ইমামগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। ইমাম মুহাম্মদ (রা.)-এর মতে, তা হল সর্বোচ্চ ছয় মাস। ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) এর জন্য কোন সময় নির্ধারণ করে দেন নি; বরং তা বিচারক হাতে ন্যস্ত করেছেন। বিচারক সময় ও স্থান বিবেচনা করে তা নির্ধারন করবেন; ইবনুল হুমাম, ফাতহুল কাদীর, দারুল ফিকর, খ. ৫, পৃ. ২৮২-২৮৩; ড. আহমদ আলী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪০

[২] যায়ল'ই, *তাবয়ীনুল হাকা'ইক শারহু কানযিদ দাকা'ইক*, দারুল কিতাবিল ইসলামী, খ. ৩; ১৮৭; '৮; *আল-মাওসুআতুল ফিকহিয়্যাহ*, খ. ১৩, পৃ. ১২২

[৩] ইবনু নুজায়ম, *আল-বাহরুর রাইক*, দারুল কিতাবিল ইসলামী, খ. ৫, পৃ. ৪৯-৫০; আল মাওসুআতুল ফিকহিয়্যাহ, খ. ১২, পৃ. ২৮৬-৭; খ. ১৪, পৃ. ১৩২

[৪] এটাই অধিকাংশ ইসলামী আইনতত্ত্ববিদের অভিমত; ইবনু আবিদীন, *রাদ্দুল মুহতার*, খ. ৪, পৃ. ৪

জন্য কারো কারো হাতও কেটেছেন। তাঁরা সকলেই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দরবারে এসে তাওবা করেছিলেন।

তাঁরা নবীজি (সা.)-এর নিকট এসে তাওবা করলেও তিনি তাদেরকে হদ্দ থেকে রেহাই দেননি। এক্ষেত্রে ডাকাত ও সন্ত্রাসীদের শাস্তির বিধান ব্যতিক্রম। অকিাংশ ইমামদের মতে ডাকাত ও সন্ত্রাসী যদি গ্রেফতারীর পূর্বে তাওবা করে এবং তার আচার-আচরণ দ্বারা তাওবার বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া যায়, তবেই তাকে হদ্দ থেকে রেহাই দেয়া যাবে। তবে সাধারণ দণ্ড থেকে তাকে নিষ্কৃতি দেওয়া উচিত নয়। তার গ্রেফতার পরবর্তী তাওবা ধর্তব্য নয়। এ তাওবা আন্তরিকতার তাওবা হিসেবে বিবেচিত হবে না। তদ্রুপ ধর্মত্যাগী যদি তাওবা করে ইসলামে ফিরে আসে তাহলে তার তাওবা গ্রহণ করা হবে এবং তার জন্য ধর্মত্যাগের শাস্তি প্রযোজ্য হবে না। অন্যান্য হদ্দ তাওবা করলেও মাফ হবে না।[১] বিচারকের নিকট মামলা দায়েরের আগেও মাফ করা হবে না, পরেও মাফ করা হবে না। কেননা তাওবার মাধ্যমে যদি হদ্দ থেকে পরিত্রাণ পাবার সুযোগ থাকে, তাহলে একদিকে অপরাধীরা তাওবাকে শাস্তি থেকে পরিত্রাণ পাবার মাধ্যমে পরিণত করবে। অপরদিকে অপরাধীদেরকে তাওবার পর বিনা শাস্তিতে ছেড়ে দেয়ার প্রবণতা শুরু হবে।[২]

৮. মিথ্যা প্রতিপন্ন করা

ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় অন্যতম অন্তরায় মিথ্যা। মিথ্যা প্রতিপন্ন করার মাধ্যমেও অনেক সময় হদ্দের বিধান রহিত হয়ে পড়ে। যেমন- কোন পুরুষ যদি স্বেচ্ছায় কোন মহিলার সাথে যিনা করার কথা স্বীকার করে, কিন্তু তার ওপর হদ্দ জারি করার আগে মহিলাটি যদি তার কথাকে মিথ্যা বলে দাবী করে, তাহলেও হদ্দ কার্যকর করা যাবে না।[৩]

৯. ক্ষমা

ইসলামী আইনবিদদের মতে, ক্ষমা শাস্তি থেকে রেহাই লাভের কারণসমূহের মধ্যে অন্যতম। হুদূদের ক্ষেত্রে সাধারণত ক্ষমা করা জায়েয নয়। তবে যিনার অপবাদের শাস্তির মধ্যে যেহেতু আল্লাহর হকের সাথে বান্দাহর হকও জড়িত রয়েছে, তাই অপবাদ আরোপিত ব্যক্তি ইচ্ছে করলে অপবাদদানকারীকে ক্ষমা করে দিতে পারে বিচারকের দরবারে নালিশ পেশ করার আগে এবং পরেও।[৪] তদ্রুপ চুরির বেলায় যদিও আল্লাহর হক প্রবলভাবে ক্ষুণ্ন হয়; তবে মানুষের

---

[১] অনুরূপভাবে যারা নামায পরিত্যাগের শাস্তিকে হদ্দ হিসেবে বিবেচনা করে, তাদের দৃষ্টিতে তাওবা করলে নামায পরিত্যাগের শাস্তি মাফ হয়ে যাবে; ড. আহমদ আলী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৯

[২] ড. আহমদ আলী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৯

[৩] *আল-মাওসুআতুল ফিকহিয়্যাহ,* খ. ১৭, পৃ. ১৩৬

[৪] তবে হানাফী ইমামগণের মধ্যে কারো কারো মতে, নালিশ পেশ করার পরে অপবাদদানকারীকে ক্ষমা করা জায়িয নেই; শায়খী যাদাহ, মাজমাউল আনহুর, দারু ইয়ায়িত ছিল আরবী, খ. ১, পৃ. ৬০৭

অধিকারের বিষয়ও যেহেতু তার সাথে জড়িত রয়েছে, তাই বিচারকের দরবারে চুরির নালিশ পেশ করার আগে চোরকে ক্ষমা করে দেয়া দূষণীয় নয়, তবে নালিশ পেশ করার পর তাকে ক্ষমা করে দেয়া জায়েয হবে না। অনুরূপভাবে যিনার অপবাদের শাস্তির ক্ষেত্রে যেহেতু আল্লাহ ও মানুষের দুজনেরই হকের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে, এ কারণেই শাফিঈ ও হাম্বলী স্কুলের ইমামগণের মতে, তাতে বিচারকের কাছে নালিশ পেশ করার পরও তাকে ক্ষমা করে দেয়া জায়েয। তবে হানাফীগণের মতে জায়েয নয়। কিসাসের মধ্যে যেহেতু বান্দাহর হকের প্রাবল্য রয়েছে, তাই নিহত ব্যক্তির ওয়ারিসদের কিসাসের দাবী করার অধিকার কিংবা তার পরিবর্তে দিয়াত কিংবা বিনা বিনিময়ে ক্ষমা করার অধিকারও রয়েছে। তাযীরাত ক্ষমা করে দেয়া দুষণীয় নয়।[১]

হুদুদের ক্ষেত্রে অপরাধীকে আড়াল করার বৈধতা

অপরাধ ও পাপাচারে লিপ্তদের অপরাধমূলক কার্যকলাপ গোপন করা কখনো কখনো তাদের জন্য খুবই উপকারী চিকিৎসা সাব্যস্ত হয়ে থাকে। গোপন করার ফলে কখনো কখনো তারা অপরাধ করার পরও স্বউদ্যোগে খালেস তওবা করে এবং নতুন করে পরিপূর্ণ জীবন যাপন শুরু করে। এ কারণে ইসলাম অপরাধীদের আড়াল করা ও তাদের অপরাধের কথা ফাঁস করে দেয়ার জন্য তাড়াহুড়া না করার নির্দেশ দিয়েছে।[২] হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, সালিম তার পিতা আবদুল্লাহ ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يُسْلِمُهُ وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

এক মুসলিম আরেক মুসলিমের ভাই। সে তার উপর যুলুম করবে না, তাকে ধ্বংসের জন্য সমর্পণ করবে না। যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের প্রয়োজনে ব্যস্ত থাকে, আল্লাহ তার প্রয়োজন পূরণে ব্যস্ত থাকেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের দুঃখ দূর করে দেয়, আল্লাহ তায়ালা তার কিয়ামতের দিনের কষ্ট দূর করে দিবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষ গোপন রাখে আল্লাহ তায়ালা কিয়ামতের দিন তার দোষ ঢেকে রাখবেন।[৩]

বস্তুতঃ দোষ আড়াল করে রাখা যখন মুস্তাহাব, তখন সেই দোষ সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয়াটাও বাঞ্ছনীয় হওয়ার কথা নয়। এটা মাকরূহ তানযিহী। অবশ্য এই আড়াল করাটা সেই ব্যক্তির বেলায় প্রযোজ্য, যে ব্যভিচারে অভ্যস্ত নয় এবং নিজে

---

[১] রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, মানবিকগুণ সম্পন্ন লোকদের শাস্তির ব্যাপারে তোমরা কড়াকড়ি করো না। তবে কোন হদ্দ হলে ভিন্ন কথা; ইবনু আবিদীন, *রাদ্দুল মুহতার*, খ. ৪, পৃ.৮১; এ হাদীস থেকে জানা যায় যে, ব্যক্তির মর্যাদা ও অবস্থা অনুপাতে সাধারণ দণ্ড ক্ষমা করতে দোষ নেই; ড. আহমদ আলী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৬

[২] সাইয়্যেদ সাবেক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯৫

[৩] আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা আত-তিরমিযী (রহ.), *তিরমিযী শরীফ*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা : হাদীস নং ১৪৩১

তা প্রকাশ করেনা। কিন্তু পরিস্থিতি যখন এতদূর গড়ায় যে, সে নিজেই তার গোপনীয়তা রক্ষায় সচেষ্ট নয়, বরং তা প্রকাশ ও ফাঁস করে, তখন তার সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয়া না দেয়ার চেয়ে ভালো।[১]

দারুল হারবে হদ্দ বাস্তবায়ন

আলেমদের একটি গোষ্ঠীর মতে, হুদুদ যেমন দারুল ইসলামে (ইসলামী রাষ্ট্রে) বাস্তবায়ন করা যায়, তেমনি তা দারুল হারবেও (অমুসলিম শাসিত রাষ্ট্রেও) করা যাবে। কেননা হুদুদ বাস্তবায়নের নির্দেশ সর্বব্যাপী ও সর্বাত্মক, কোনো দেশ বিশেষের জন্য নির্দিষ্ট নয়। ইমাম মালেক ও লাইস বিন সা'দ এই মতের প্রবক্তা। পক্ষান্তরে আবু হানিফা প্রমুখ বলেন: "কোনো সেনাপতি যখন কোনো দারুল হারবে (অমুসলিম দেশে) আক্রমণ পরিচালনা করে, তখন তার সেনাবাহিনীর কোনো সদস্যের উপর হদ্দ প্রয়োগ করবেনা। তবে সে মিশর, সিরিয়া, ইরাক ও অনুরূপ দেশের (মুসলিম) সেনাপতি হলে তার সেনাবাহিনীতে হুদুদ কার্যকর করবে।" ইমাম আবু হানিফার যুক্তি হলো, দারুল হারবে হুদুদ কার্যকর করা হলে শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি কুফরির পথ অবলম্বনে প্ররোচিত হতে পার। এই মতটিই অগ্রগণ্য। কেননা আল্লাহর শাস্তি যুদ্ধ বিগ্রহের সময় কার্যকর করতে আল্লাহ নিজেই নিষেধ করেছেন। কেননা এর ফলে অধিকতর খারাপ ঘটনা ঘটতে পারে। আহমদ, ইসহাক ও আওযায়ি প্রমুখ ইমাম বলেছেন, শত্রুর ভূমিতে হুদদ কার্যকর করা হবেনা। এর উপর সাহাবীগণ একমত ছিলেন।[২]

---

[১] সাইয়্যেদ সাবেক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯৪
[২] সাইয়্যেদ সাবেক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯৬

তৃতীয় অধ্যায়

ইসলামী হুদুদ আইন প্রয়োগের ঐতিহাসিক ক্রমধারা

ইসলাম প্রবর্তিত শাস্তি ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকার হচ্ছে হুদুদ। তবে ইসলামের হুদুদ আইনের সকল বিধবিধান মহানবী (সা.) এর মাধ্যমেই সূচিত হয়নি। বরাং মহানবী (সা.) এর আবির্ভাবের পূর্বে হুদুদ আইনের আস্তিত্ব বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ, সমাজ ও সভ্যতায় পাওয়া যায়। তবে ইসলামে যেরূপ কাঠামোবদ্ধ ভাবে হুদুদ আইন আরোপ করা হয়েছে এর দৃষ্টান্ত অতীতে দেখা যায় না।

জাহেলী যুগে শাস্তি আইন

আইয়্যামে জাহিলিয়ার পরিচয়

আইয়্যাম' শব্দের অর্থ সময় বা যুগ এবং 'জাহেলিয়া' শব্দের অর্থ অজ্ঞতা বা তমসা। সুতরাং আইয়্যামে জাহেলিয়া' বলতে 'তমসা' বা 'অজ্ঞতার যুগ' বা 'Age of Ignorance' বুঝায়। পি. কে. হিট্টির মতে, প্রকৃত পক্ষে জাহেলিয়া বলতে সেই যুগকে বুঝায় যে যুগে আরবে কোন নিয়ম কানুন ছিল না, কোন নবীর আবির্ভাব ঘটে এবং কোন ঐশী কিতাব নাজিল হয় নাই।[১]

আইয়্যামে জাহিলিয়ার ব্যাপ্তি

ঐতিহাসিকগণ আইয়্যামে জাহেলিয়ার সময়কালের ব্যাপ্তি সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন মত দিয়েছেন। যেমন–

ক. ঐতিহাসিদের কারো কারো মতে, হযরত আদম (আ)-এর সৃষ্টিকাল হতে শুরু করে হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত এ দীর্ঘ সময়কে আইয়্যামে জাহেলিয়া বলা হয়। বস্তুত এ মতবাদ সত্যের বিপরীত এবং অগ্রহণযোগ্য।

খ. আরব ঐতিহাসিকের মতে- হযরত ঈসা (আ) কে আসমানে তুলে নেওয়ার পর থেকে ইসলামের আবির্ভাব পর্যন্ত কালকে আইয়্যামে জাহেলিয়ার' যুগ বলা হয়। এই অভিমত আংশিক গ্রহণযোগ্য।[২] কারণ জাহেলী যুগের যেসকল বৈশিষ্ট্য ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত তার সবগুলোই এ যুগে দেখা যায়। তবে জাহেলী যুগের অজ্ঞতা ও বর্বরতা চরমে পৌঁছে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর আবির্ভাব পূববর্তী শতাব্দীতে।

গ. ইংরেজ পি. কে. হিট্টি, ইসলামের আবির্ভাবের পূর্ববর্তী এক শতাব্দীকালকে আইয়্যামে জাহেলিয়া বলে উল্লেখ করেছেন।[৩]

তমসাযুগের ব্যপ্তিকাল সম্পর্কে এই অভিমত সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য। এ সময়েই আরব দেশে দুর্নীতি, কুসংস্কার প্রচলিত ছিল এবং এ যুগেই তাদের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় জীবন অধঃপতনের সর্বোচ্চ পর্যায়ে উপনীত হয়েছিল বলে একে অন্ধকার যুগ বলা হয়।[৪]

---

[১] উদ্ধৃত, প্রফেসর মোঃ মাহমুদুর রহমান, ডক্টর মুহাম্মাদ আবদুর রাহীম, *ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র*, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় গাজীপুর : পৃ. ২৩

[২] ড. মোঃ ইব্রাহীম খলিল, *আস-সীরাতুন নববীয়া*, মেরিট ফেয়ার প্রকাশন, ঢাকা : ২০১২, পৃ. ৬৬

[৩] *প্রাগুক্ত*

[৪] প্রফেসর মোঃ মাহমুদুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪

ইসলাম পূর্ব যুগে আরবের সামাজিক অবস্থা

মহানবী (সা.)-এর আবির্ভাবের পূর্বে আরবের সামগ্রিক পরিস্থিতি ছিলো অত্যন্ত নাজুক, সামাজিক অবস্থা ছিল শোচনীয়। পাপাচার, ব্যভিচার, কুসংস্কার, অরাজকতা, ধর্মের নামে অধর্ম, ন্যায়ের নামে অন্যায় ইত্যাদি অনৈতিক কর্মকাণ্ডে কলুষিত হয়ে পড়েছিল গোটা সমাজ ব্যবস্থা। পরিবার, সমাজ কোথাও ছিলো না শান্তি-সুখের, নিয়ম-শৃঙ্খলার লেশমাত্র।

মাদকাসক্তি

আরবে মদ পানের ব্যাপক প্রচলন ছিলো। ঘরে ঘরে মদের আড্ডা আয়োজন করা হতো। মদ পান না করাই ছিলো আরবে আশ্চর্য হওয়ার মতো ব্যাপার। ঐতিহাসিক খোদা বকসের ভাষায়, War, women and wine were there observing passions of the Arabs. অর্থাৎ 'যুদ্ধ, নারী ও মদ নিয়ে তারা সর্বদা লিপ্ত থাকতো।' মাদকাসক্ত আরবরা যে কোন গর্হিত কাজ করতে দ্বিধা করত না।[১]

নারীর অবস্থান

পৃথিবীতে যুগে যুগে নারী অবহেলিত ও নির্যাতিত হয়ে আসছে। তৎকালীন বিশ্বের যে কোন দেশের তুলনায় আরবের নারী জাতির অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। সে যুগে নারীরা ছিল ভোগের সামগ্রী। বাজারে পণ্যের মত হস্তান্তরযোগ্য ছিল নারী। পুরুষ কর্তৃক নারীরা সর্বত্র নিগৃহীত হত। সে যুগে কন্যা সন্তানকে অপমান ও অভিশাপ মনে করে ক্ষেত্র বিশেষে জীবন্ত কবর দিতেও তারা কুণ্ঠিত হত না। অবশ্য সে যুগে গোত্রীয় সমাজে শিশু হত্যার প্রথা বিশ্বের অন্যত্রও দেখা যেত। তবে মক্কায় নারীদের মর্যাদা কিছুটা ছিল। যেমন, খাদীজা ও আবুজাহলের মা সে যুগে মর্যাদার অধিকারী ছিলেন।[২] তাদের এতোটাই অধঃপতন হয়েছিল যে সৎমা, খালাকে বিয়ে করতেও তারা কুণ্ঠাবোধ করত না। যা ইসলাম এসে নিষিদ্ধ করেছে। মহান আল্লাহ বলেন,

وَ لَا تَنْكِحُوْا مَا نَكَحَ اٰبَآؤُكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ؕ اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً وَّ مَقْتًا ؕ وَ سَآءَ سَبِيْلًا

তোমাদের পিতৃগণ নারীকূলের মধ্যে যাদেরকে বিয়ে করেছে তোমরা তাদেরকে বিয়ে করনা, কিন্তু যা বিগত হয়েছে। নিশ্চয়ই এটি অশ্লীল, অরুচিকর এবং নিকৃষ্ট আচরণ।[৩]

কন্যা সন্তানকে জীবিত কবর

তৎকালীন আরব সমাজের নারী জাতির অবস্থা ছিল অত্যন্ত করুন। কন্যা সন্তান জন্মগ্রহন করলে তাকে জীবিত মাটির নীচে পুতে ফেলা হত। কন্যা সন্তানকে তারা সর্বদা অভিশাপ মনে করত। কুরআনুল কারীমে এ ব্যাপারে কিছু ইংগিত পাওয়া যায়। আল্লাহ পাক বলেন,

---

[১] প্রফেসর মোঃ মাহমুদুর রহমান, ডক্টর মুহাম্মাদ আবদুর রাহীম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০
[২] ড. মোঃ ইব্রাহীম খলিল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৭
[৩] আল কুরআন, ৪ : ২

وَ اِذَا بُشِّرَ اَحَدُہُمۡ بِالۡاُنۡثٰی ظَلَّ وَجۡہُہٗ مُسۡوَدًّا وَّ ہُوَ کَظِیۡمٌ۔ یَتَوَارٰی مِنَ الۡقَوۡمِ مِنۡ سُوۡٓءِ مَا بُشِّرَ بِہٖ
اَیُمۡسِکُہٗ عَلٰی ہُوۡنٍ اَمۡ یَدُسُّہٗ فِی التُّرَابِ ؕ اَلَا سَآءَ مَا یَحۡکُمُوۡنَ

তাদের কাউকে যখন কন্যা সন্তানের সুসংবাদ দেয়া হয় তখন তার মুখমন্ডল কালো হয়ে যায় এবং সে অসহনীয় মনোস্তাপে ক্লিষ্ট হয়। তাকে যে সুসংবাদ দেয়া হয়, তার গ্লানি হেতু সে নিজ সম্প্রদায় হতে আত্মগোপন করে; সে চিন্তা করে যে, হীনতা সত্ত্বেও সে তাকে রেখে দিবে, না মাটিতে পুঁতে দিবে। লক্ষ্য করো, সে কত নিকৃষ্ট সিদ্ধান্ত স্থির করেছিল।

শিশু হত্যা

নরীর পাশাপাশি শিশু অধিকারও ভূলন্ঠিত ছিলো জাহেলী যুগে। সে সময় আরব অঞ্চলের বেশকিছু লোকজন দরিদ্রতার ভয়ে নিজ শিশুসন্তানকে হত্যা করতে কুণ্ঠিত বোধ করত না। এ ব্যাপারে কুরআনে ইংগিত পাওয়া যায় যা হল,

وَ لَا تَقۡتُلُوۡۤا اَوۡلَادَکُمۡ خَشۡیَۃَ اِمۡلَاقٍ ؕ نَحۡنُ نَرۡزُقُہُمۡ وَ اِیَّاکُمۡ ؕ اِنَّ قَتۡلَہُمۡ کَانَ خِطۡاً کَبِیۡرًا

দরিদ্রতার ভয়ে তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করো না। আমিই তাদেরকে রিযক দেই আর তোমাদেরকেও, তাদের হত্যা মহাপাপ।[১]

বিবাহ

মানুষের নৈতিক জীবন গঠনে বিবাহ এবং পারিবারিক জীবনের ভূমিকা অনস্বীকার্য। জাহেলী যুগের বৈবাহিক প্রথায় কোন সুচিতা ছিল না। পুরুষগণ একাধিক স্ত্রী গ্রহণ, ইচ্ছেমত বর্জন, অবৈধ প্রণয় এবং বহু রক্ষিতা রাখতো। নারীগণও একই সঙ্গে একাধিক স্বামী বা বহুপতি গ্রহণ বা ব্যভিচারে লিপ্ত হত। ভাই-বোনে বিয়ে, বিমাতাকে বিয়ে করার কু-প্রথাও ছিল। তাদের বিয়ের কোনো সীমা ছিলো না। যার যতগুলো ইচ্ছে বিয়ে করত। স্ত্রীদের মাঝে সমতা রক্ষা করা হতো না, তাদের প্রতি যথাযথ ভাবে দায়িত্ব পালনও করত না আরবরা। বিয়ের সীমা নির্ধারণ করে মহান আল্লাহ বলেন,

وَ اِنۡ خِفۡتُمۡ اَلَّا تُقۡسِطُوۡا فِی الۡیَتٰمٰی فَانۡکِحُوۡا مَا طَابَ لَکُمۡ مِّنَ النِّسَآءِ مَثۡنٰی وَ ثُلٰثَ وَ رُبٰعَ ۚ فَاِنۡ خِفۡتُمۡ اَلَّا تَعۡدِلُوۡا فَوَاحِدَۃً
اَوۡ مَا مَلَکَتۡ اَیۡمَانُکُمۡ ؕ ذٰلِکَ اَدۡنٰۤی اَلَّا تَعُوۡلُوۡا

যদি তোমরা আশঙ্কা কর যে, (নারী) ইয়াতীমদের প্রতি সুবিচার করতে পারবে না, তবে নারীদের মধ্য হতে নিজেদের পছন্দমত দুই-দুই, তিন-তিন ও চার-চার জনকে বিবাহ কর, কিন্তু যদি তোমরা আশঙ্কা কর যে, তোমরা সুবিচার করতে পারবে না, তাহলে একজনকে কিংবা তোমাদের অধীনস্থ দাসীকে; এটাই হবে অবিচার না করার কাছাকাছি।[২]

---

[১] আল কুরআন, ৬ : ১৫২
[২] আল কুরআন, ৪ : ৩

দাস প্রথা

পৃথিবীর ইতিহাসে দাসত্ব প্রথার প্রচলন অতি প্রাচীন। জাহেলী যুগের আরব সমাজেও দাসত্ব প্রথা প্রচলিত ছিল। দাস-দাসীদের কোন সামাজিক মর্যাদা ও অধিকার ছিল না। পণ্য-দ্রব্যের মত হাটে-বাজারে কেনা-বেচা হত। দাস-দাসীকে নির্মমভাবে কাজে খাটাত ও নির্যাতন করত। দাসীকে উপপত্নী হিসেবে ব্যবহার করত। তাদের জীবন-মৃত্যু প্রভুর মর্জির উপর নির্ভর করত। বিয়ে-শাদীর অধিকারটুকুও ছিল না।[১]

কুসংস্কার

আরব সমাজের সিংহ ভাগ মানুষ ছিলো শিক্ষার আলো বঞ্চিত। যেকারণে আরবের জাহিলী সমাজ নানা কুসংস্কারে জর্জরিত ছিল। ভাগ্যনির্ধারক তীর, দেবমূর্তির সাথে অলীক পরামর্শ, মৃতের অজ্ঞাত যাত্রার ধারণা প্রভৃতি কুসংস্কার চালু ছিল। সামাজিক অনাচার-ব্যভিচার, পতিতাবৃত্তি, নৈতিক অধঃপতন, চরিত্রহীনতা, মদ্যপান, জুয়া, লুটতরাজ, নারী হরণ, প্রভৃতি নানা অনাচারে নিমজ্জিত ছিল গোটা আরব সমাজ।[২]

চরিত্র

চরিত্র মানুষের ভূষণ। আরবের তমসা যুগে সমাজে মানুষের মধ্যে আভিজাত্যের দম্ভ, অহঙ্কার, পরশ্রীকাতরতা, চরিত্রহীনতা, পরনিন্দা, পরচর্চা, হিংসা, অপরের কুৎসা রটনা ইত্যাদি অসৎ গুণাবলী মহামারীর রূপ ধারণ করেছিল। এগুলো জাহিলিয়া যুগে আরব চরিত্রকে ভীষণভাবে কলুষিত, কলঙ্কিত করে তুলেছিল। আরবের মত নৈতিক ও সামাজিক অধঃপতন সমকালীন বিশ্বের অন্য কোথাও দেখা যায়নি। প্রাচীন আরব সমাজ বহু নিষ্ঠুরতার ইতিহাসে ভরপুর। ভোগবাদী আরবরা দাস- দাসী এমনকি শত্রুগোত্রের লোকদের সাথে অবর্ণনীয় নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিত। বিত্তবানরা খেলাচ্ছলে দ্রুতগামী উট, ঘোড়ার সাথে হতভাগ্য নারী বা শিশুকে বেঁধে দিত। ফলে এদের অনেকেই মৃত্যু বরণ করত।[৩]

ব্যভিচারের প্রাদুর্ভাব

জাহেলী যুগে আরব দেশে ব্যভিচার-ধর্ষণের মতো জঘন্য পাপাচারের প্রাদুর্ভাব সমাজের প্রতিটি স্তরে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল। পতিতাবৃত্তি সমাজে স্বীকৃতি লাভ করে। অনেক ক্ষেত্রে দাসীকে বাধ্যতামূলক পতিতাবৃত্তিতে নিযুক্ত করে কেউ কেউ অর্থ উপার্জনও করতেন। ব্যভিচার সমাজ কোন নিন্দনীয় বিষয় ছিল না। যারা এসকল অন্যায়-অবৈধ কাজে নিজেদের যতবেশী সম্পৃক্ত রাখতে পারত সমাজে তাদের মর্যাদা সবচেয়ে বেশী ছিল। এভাবে করে তারা নীতিহীন এবং অসামাজিক কাজের মধ্যে নিজেদের নিমজ্জিত করেছিল।[৪]

---

[১] প্রফেসর মোঃ মাহমুদুর রহমান, ডক্টর মুহাম্মাদ আবদুর রাহীম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০
[২] ড. মোঃ ইব্রাহীম খলিল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৮
[৩] প্রফেসর মোঃ মাহমুদুর রহমান, ডক্টর মুহাম্মাদ আবদুর রাহীম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০-৩১
[৪] ড. মোঃ ইব্রাহীম খলিল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৭

গোত্রীয় দ্বন্দ্ব-কলহ

আরবে কাঠামোবদ্ধ সরকার ব্যবস্থা প্রচলিত ছিলো না। বরং তারা নিজ নিজ গোত্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হতেন। এ সময়ে কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা না থাকায় গোত্রে গোত্রে দ্বন্দ্ব-কলহ এক ভয়াবহ রূপ ধারণ করে। গোত্রের মান-সম্ভ্রম ও স্বার্থ রক্ষার জন্য সদস্যগণ জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দিত। এ গোত্র-কলহ ও বিসংবাদ কখনো বংশানুক্রমিকভাবে চলত। "খুনের বদলে খুন" (Blood for Blood) এ ধারায় রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ত বছরের পর বছর। গোত্রে গোত্রে যুদ্ধের ভয়াবহ দিনগুলোকে "আইয়ামুল আরব'' (Ayam al Arab) বলা হত।'' ঐতিহাসিক গীবনের মতে- "অন্ধকার যুগে আরবে গোত্রীয় দ্বন্দ্বের কারণে ১৭০০ যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। বুয়াসের যুদ্ধ, ফিজারের যুদ্ধ, বসুসের যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী ও রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্যে ছিল উল্লেখযোগ্য। উটকে পানি খাওয়ানোর সামান্য ঘটনা কেন্দ্র করে বনু বকর ও বনু তগলিব গোত্রের মধ্যে সুদীর্ঘ ৪০ বছর ব্যাপী যুদ্ধ চলেছিল।[১]

আরবের বিচারব্যবস্থা

ইসলামী শাস্তি আইনে সাতটি অপরাধ হদ্দ-এর অন্তর্ভুক্ত অপরাধ হিসেবে স্বীকৃত। যথা-

১. মদপান ২.ব্যভিচার

৩. ব্যভিচারের অপবাদ ৪. রাষ্ট্রদ্রোহিতা

৫. ধর্মদ্রোহিতা ৬. চুরি

৭. ডাকাতি

পৃথিবীর অধিকাংশ ধর্ম, সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থায় হদ্দ ভুক্ত অপরাধসমূহ প্রাচীনকাল থেকেই ঘৃণিত অপরাধ হিসেবে স্বীকৃত। আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায়ও এগুলো শাস্তিযোগ্য অপরাধ। তবে তৎকালীন আরব সমাজের অবস্থা ছিলো ভিন্ন। সে সমাজে অন্যায়কেই ন্যায় হিসেবে গ্রহণ করা হতো। মদপান, ব্যভিচার, ধর্ষণ, চুরি, ডাকাতি এসব ছিল তৎকালীন আরব সমাজের নৈমিত্তিক কাজ। ইতোপূর্বে আরব সমাজ ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করা হযেছে। যেখানে তাদের এসব অপরাধ করার দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হয়েছে।

আরবে যেহেতু স্বীকৃত রাষ্ট্র ব্যবস্থা ছিল না, তাই তাদের সুসংগঠিত আইনী প্রক্রিয়া, বিচারব্যবস্থাও ছিল না। তাদের সমাজে ছিলো গোত্র ভিত্তিক। তাদের বিচারব্যবস্থা বলতে যা ছিলো তা ঐ গোত্র ভিত্তিকই ছিল। গোত্রপতিগণই নিজ গোত্রের বিচার-সালিশ পরিচালনা করতেন। তবে তাদের বিচারকে বিচার না বলে অবিচার বলা অধিক যুক্তিযুক্ত। কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অবিচার করা হতো, বিশেষত দরিদ্র শ্রেণির সাথে।

আবার কখনো এক গোত্রের লোক অন্য গোত্রের কারো সাথে অন্যায় আচরণ করলে সেক্ষেত্রে ন্যায়-অন্যায়ের পরিবর্তে গোত্র প্রীতি বড় হয়ে উঠত। নিজ গোত্রের লোক অপরাধ করলেও তার অপরাধ তার গোত্রের লোকেরা স্বীকার করত না। এই গোত্র কেন্দ্রিকতার কারণে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অপরাধী পার পেয়ে যেত।

---

[১] প্রফেসর মোঃ মাহমুদুর রহমান, ডক্টর মুহাম্মাদ আবদুর রাহীম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩২

কিছু কিছু ক্ষেত্রে ন্যায় বিচারও করা হতো। এসব ক্ষেত্রে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর নীতি-আদর্শ অনুসরণ করা হতো। চুরির শাস্তি হিসেবে হাত কাটার বিধানও কোথাও কোথাও প্রচলিত ছিলো। তবে এসব ক্ষেত্রেও অপরাধীর সামাজিক ও আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করা হতো। অপরাধী সম্ভ্রান্ত হলে, ধনাঢ্য হলে তাকে শাস্তি থেকে রেহাই দেওয়া হতো। পক্ষান্তরে অপরাধী দরিদ্র শ্রেণিভুক্ত হলে তার ওপর শাস্তি বিধান কার্যকর করা হতো।

দিয়াতের প্রচলন

তৎকালীন আরব সমাজে দিয়াতের প্রচলন ছিলো। প্রথম যুগে হত্যার পরিবর্তে দিয়াতের পরিমাণ ছিলো ১০টি উট। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পিতা আব্দুল্লাহ-এর জীবন রক্ষার্থে ১০০ উট কুরবানি করা হয়। তখন থেকেই দিয়াতের পরিমাণ নির্ধারিত হয় ১০০ উট, যা ইসলামী যুগেও অব্যহত ছিলো।[১]

মহানবী (সা.)-এর যুগে শাস্তি আইন

শরীয়াহ আইন অর্থাৎ ইসলামী আইনের বাস্তব প্রয়োগ রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মাধ্যমে শুরু হয়। ইসলামী শরীয়াতের অনেক আইন সরাসরি মহান আল্লাহ নির্ধারিত ও ঘোষিত হয়েছে। আবার অনেক আইন আল্লাহর অনুমোদনক্রমে রাসূলুল্লাহ (সা.) কর্তৃক নির্ধারিত ও ঘোষিত হয়েছে। আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূলকে (সা.) শা'রে অর্থাৎ শরীয়াত প্রণেতা হিসেবে ক্ষমতা দান করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তাআলা বলেন,

وَ مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى ۰ اِنْ ہُوَ اِلَّا وَحۡیٌ یُّوۡحٰی

আর তিনি মনগড়া কথা বলেন না। এতো ওহী যা তার প্রতি প্রত্যাদেশ হয়।[২]

অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন, আল্লাহ এই জনপদবাসীদের নিকট হতে তাঁর রাসূলকে যা কিছু দিয়েছেন তা আল্লাহর, তাঁর রাসূলের, রাসূলের স্বজনগণের এবং ইয়াতীমদের, অভাবগ্রস্ত ও পথচারীদের যাতে তোমাদের মধ্যে যারা বিত্তবান শুধু তাদের মধ্যেই ঐশ্বর্য আবর্তন না করে। অতএব রাসূল তোমাদেরকে যা দেয় তা তোমরা গ্রহণ কর এবং যা হতে তোমাদেরকে নিষেধ করে তা হতে বিরত থাক। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, আল্লাহ শাস্তি দানে কঠোর।[৩]

৬২২ খ্রি.-এ রাসূলুল্লাহ (সা.) মদীনায় হিযরত করে মদীনা রাষ্ট্র গঠন করেন। গঠিত মদীনা রাষ্ট্রে রাসূলুল্লাহ (সা.) শরীয়া আইনের বাস্তব প্রয়োগ শুরু করেন এবং বিচার-ফয়সালা করতে শুরু করেন। হিযরতের পর প্রণীত মদীনা সনদের ২৩নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ (সা.) ছিলেন সকল বিরোধ বা বিবাদে একমাত্র ও চূড়ান্ত বিচারক।[৪] সনদের ৪২নং অনুচ্ছেদে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, যখন লোকদের মধ্যে কোন গোলযোগ বা ঝগড়া লাগে, যা থেকে বিপর্যয়কর কিছু ঘটার আশংকা থাকে, সেসব বিষয় আল্লাহ্ ও আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ (সা.)-এর কাছে পেশ

---

[১] বিস্তারিত দেখুন, আল্লামা ছফিউর রহমান মোবারকপুরী, *আর রহীকুল মাখতুম*, আল কোরআন একাডেমী লন্ডন, লন্ডন : ২০০৪, পৃ. ৬৬-৭০
[২] আল কুরআন, ৫৩ : ৩-৪
[৩] আল কুরআন, ৫৯ : ৭
[৪] ড. মুহাম্মদ ইয়াসীন মাযহার সিদ্দিকী, *রাসূলুল্লাহ মুহাম্মদ (সা.)-এর সরকার কাঠামো*, অনু. মুহাম্মদ ইবরাহীম ভুঁইয়া, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা : ২০০৪, পৃ. ২২-২৩

করতে হবে।[১] মদীনা জীবনে দীর্ঘ দশ বছর পর্যন্ত শরীয়াতের সকল আহকাম নাযিল হয়। এতে ফৌজদারি, দেওয়ানি, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, রাষ্ট্র ও পররাষ্ট্রনীতি বিষয়ক, ধর্মীয়, যুদ্ধনীতি, বিধিবিধান, নৈতিক বিধিবিধান, হালাল-হারাম, সামাজিক আচরণ, লেনদেন, উত্তরাধিকার, সম্পদ বণ্টনসহ মৌলিক বিষয়াবলির বিধান নাযিল হয়। রাসূলুল্লাহ (সা.) কুর'আনের আলোকে সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনা করেন।[২]
মদীনার মসজিদে বসে নিজে প্রধান বিচারপতি ও শাসনকর্তার কার্যাদি সম্পন্ন করতেন কুর'আনের বিধিবিধান, সুন্নাহ এবং জ্ঞানী সম্প্রদায়ের সম্মিলিত মতামত অনুযায়ী মদীনা রাষ্ট্র শাসন করতেন। ঐতিহাসিক বোসওয়ার্থের (Bosworth) মতে, যদি কেউ ঐশ্বরিক বিধান সম্মত শাসন বিধি প্রতিষ্ঠার গৌরব করতে পারেন তবে তিনি হযরত (সা.) ছাড়া আর কেউ নন।[৩] আল কুর'আনে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বিচারব্যবস্থার পূর্ণতা ঘোষণা করা হয়েছে। আজ আমি তোমাদের জন্য আমার দ্বীনকে পরিপূর্ণ করলাম, তোমাদের উপর আমার নিয়ামত পূর্ণ করলাম আর তোমাদের জন্য ইসলামকে দ্বীন (জীবন বিধান) হিসেবে মনোনীত করলাম।[৪]

১. রাসূলুল্লাহ (সা.) কর্তৃক মদ্যপানের হদ্দ প্রয়োগ

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّ رَجُلاً، عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَانَ اسْمُهُ عَبْدَ اللَّهِ، وَكَانَ يُلَقَّبُ حِمَارًا، وَكَانَ يُضْحِكُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَدْ جَلَدَهُ فِي الشَّرَابِ، فَأُتِيَ بِهِ يَوْمًا فَأَمَرَ بِهِ فَجُلِدَ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ اللَّهُمَّ الْعَنْهُ مَا أَكْثَرَ مَا يُؤْتَى بِهِ. فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " لاَ تَلْعَنُوهُ، فَوَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ أَنَّهُ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ".

উমর ইবন খাত্তাব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যমানায় এক ব্যক্তি যার নাম ছিল আবদুল্লাহ আর লকব ছিল হিমার। এ লোকটি রাসূল (সা.) কে হাসাত। রাসূল (সা.) শরাব পান করার অপরাধে তাকে বেত্রাঘাত করেছিলেন। একদিন তাকে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় আনা হল। তিনি তাকে বেত্রাঘাতের আদেশ দিলেন। তাকে বেত্রাঘাত করা হল। তখন দলের মাঝ থেকে এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ! তার উপর লানত বর্ষণ করুন। নেশাগ্রস্ত অবস্থায় তাকে কতবার আনা হল! তখন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

---

[১] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩
[২] মুহাম্মদ ছালাহ উদ্দিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮
[৩] হাসান আলী চৌধুরী, *ইসলামের ইতিহাস ও বাংলাদেশ ও পাক ভারতের মুসলমানদের ইতিহাস*, ঢাকা : আইডিয়াল লাইব্রেরী, বাংলাবাজার, ১৯৯৫, পৃ. ৬৫
[৪] আল কুরআন, ৫ : ৩

তোমরা তাকে লানত করো না। আল্লাহর কসম! আমি তাকে জানি যে, সে অবশ্যই আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলকে ভালবাসে।[১]

২. রাসূলুল্লাহ (সা.) কর্তৃক ব্যভিচারের হদ্দ প্রয়োগ

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَجُلاً، مِنْ أَسْلَمَ جَاءَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَاعْتَرَفَ بِالزِّنَا فَأَعْرَضَ عَنْهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حَتَّى شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ. قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " أَبِكَ جُنُونٌ ". قَالَ لاَ. قَالَ " آحْصَنْتَ ". قَالَ نَعَمْ. فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ بِالْمُصَلَّى، فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ فَرَّ، فَأُدْرِكَ فَرُجِمَ حَتَّى مَاتَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم خَيْرًا وَصَلَّى عَلَيْهِ.

জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আসলাম গোত্রের জনৈক ব্যক্তি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে হাযির হয়ে যিনার স্বীকারোক্তি করল। তখন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। এভাবে সে নিজের বিরুদ্ধে চারবার সাক্ষ্য প্রদান করল। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, তুমি কি পাগল? সে বলল, না। তিনি তার ব্যাপারে নির্দেশ দিলেন। তখন তাকে ঈদগাহে রজম করা হল। পাথর যখন তাকে অসহনীয় যন্ত্রণা দিচ্ছিল তখন সে পালাতে লাগল। তারপর তাকে ধরা হল ও রজম করা হল। অবশেষে সে মারা গেল। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সমন্ধে ভালো মন্তব্য করলেন ও তার সালাতে জানাযা আদায় করলেন।[২]

৩. রাসূলুল্লাহ (সা.) কর্তৃক কাযাফ বা অপবাদের হদ্দ প্রয়োগ

আইশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

لَمَّا نَزَلَ عُذْرِي قَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمِنْبَرِ فَذَكَرَ ذَاكَ وَتَلاَ تَعْنِي الْقُرْآنَ - فَلَمَّا نَزَلَ مِنَ الْمِنْبَرِ أَمَرَ بِالرَّجُلَيْنِ وَالْمَرْأَةِ فَضُرِبُوا حَدَّهُمْ.

যখন আমার পবিত্রতা সম্পর্কে কুরআনের আয়াত নাযিল হয়, তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বরের উপর উঠে, আমার পবিত্রতার কথা ঘোষণা করে, এ আয়াত তিলাওয়াত করেন, (যা অপবাদকারীদের সম্পর্কে নাযিল হয়)। এরপর তিনি মিম্বর থেকে নেমে দু'জন পুরুষ (মিসতাহ ও হাসসান ইবন ছাবিত) ও একজন

---

[১] আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল বুখারী আল জুফী (রহ.), *সহীহ বুখারী শরীফ*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা : হাদীস নং ৬৩২৩

[২] *প্রাগুক্ত*, হাদীস নং ৬৩৬৩

স্ত্রীলোক (হামনা বিনত জাহাশ) এর উপর হদের বিধান জারী করেন। তখন লোকেরা তাদের উপর তা কায়েম করে।[১]

৪. রাসূলুল্লাহ (সা.) কর্তৃক রাষ্ট্রদ্রোহিতার হদ্দ প্রয়োগ

আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

قَدِمَ رَهْطٌ مِنْ عُكْلٍ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَانُوا فِي الصُّفَّةِ، فَاجْتَوَوُا الْمَدِينَةَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَبْغِنَا رِسْلاً. فَقَالَ " مَا أَجِدُ لَكُمْ إِلاَّ أَنْ تَلْحَقُوا بِإِبِلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ". فَأَتَوْهَا فَشَرِبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا حَتَّى صَحُّوا وَسَمِنُوا، وَقَتَلُوا الرَّاعِيَ وَاسْتَاقُوا الذَّوْدَ، فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم الصَّرِيخُ، فَبَعَثَ الطَّلَبَ فِي آثَارِهِمْ، فَمَا تَرَجَّلَ النَّهَارُ حَتَّى أُتِيَ بِهِمْ، فَأَمَرَ بِمَسَامِيرَ فَأُحْمِيَتْ فَكَحَلَهُمْ وَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ، وَمَا حَسَمَهُمْ، ثُمَّ أُلْقُوا فِي الْحَرَّةِ يَسْتَسْقُونَ فَمَا سُقُوا حَتَّى مَاتُوا.

উকল গোত্রের একদল লোক নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট আসল। তারা সুফফায় অবস্থান করত। মদিনার আবহাওয়া তাদের অনুকুলে না হওয়ায় তারা বলল, হে আল্লাহর রাসুল! আমাদের জন্য দুধ তালাশ করুন। তিনি বললেন, আমি তোমাদের জন্য এ ছাড়া কিছু পাচ্ছি না যে, তোমরা (সা.) এর উট পালের কাছে যাবে। তারা সেগুলোর কাছে আসল। আর সেগুলোর দুধ ও পেশাব পান করল। ফলে তারা মোটা তাজা হয়ে উঠল ও রাখালকে হত্যা করে উটগুলো হাকিয়ে নিয়ে চলল। এরপর অনাস (রা.) বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে সংবাদ পৌছলে তাদের খোঁজে লোক পাঠালেন। রৌদ্র প্রখর হবার পূর্বেই তাদেরকে নিয়ে আসা হল। তখন লৌহ শলাকা আনার নির্দেশ দিলেন। তা গরম করে তদ্দ্বারা তাদের চক্ষু ফুড়ে দিলেন এবং তাদের হাত-পা কেটে দেয়া হল। অথচ লৌহ গরম করে দাগ লাগান নি। এরপর তাদেরকে উত্তপ্ত মরুভূমিতে ফেলে দেওয়া হল। তারা পানি পান করতে চাইল কিন্তু পান করানো হল না। অবশেষে তারা মারা গেল। আবূ কিলাবা (রহ.) বলেন, তারা চুরি করেছিল, হত্যাও করেছিল, আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল।[২]

৫. রাসূলুল্লাহ (সা.) কর্তৃক ধর্মদ্রোহিতার হদ্দ প্রয়োগ

আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উকল গোত্রের একদল লোক নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট উপস্থিত হয়ে ইসলাম গ্রহন করল। কিন্তু মদিনার আবহাওয়া তাদের অনুকুল হল না। তাই তিনি তাদেরকে

---

[১] আবু দাউদ সুলায়মান ইবনুল আশ'আছ আস সিজিস্তানি (রহ.), *আবূ দাউদ শরীফ*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা : হাদীস নং ৪৪১৫

[২] আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল বুখারী আল জুফী (রহ.), *প্রাগুক্ত*, হাদীস নং ৬৩৪৮

সাদাকার উট পালের কাছে গিয়ে সেগুলোর পেশাব ও দুগ্ধ পান করার আদেশ করেন। তারা তাই করল ফলে সুস্থ হয়ে গেল। এরপর আনাস (রা.) বলেন, অবশেষে তারা দ্বীন ত্যাগ করে উটপালের রাখালদেরকে হত্যা করে সেগুলো নিয়ে চলল। এদিকে তিনি (সা.) তাদের পিছনে লোক পাঠালেন। তাদেরকে (ধরে) আনা হল। আর তাদের হাত-পা কাটলেন ও লৌহাশলাকা দ্বারা তাদের চক্ষুগুলো ফুঁড়ে দিলেন। কিন্তু তাদের ক্ষতস্থানে লৌহ পুড়ে দাগ দিলেন না। অবশেষে তারা মারা গেল।[১]

৬. রাসূলুল্লাহ (সা.) কর্তৃক চুরির হদ্দ প্রয়োগ

এ সম্পর্কে হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে,

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَطَعَ سَارِقًا فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ ثَلاَثَةُ دَرَاهِمَ.

ইবন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত যে, (সা.) একটি ঢাল চুরির অপরাধে এক চোরের হাত কর্তন করেন। ঢালটির মূল্য ছিল তিন দিরহাম।[২]

৭. রাসূলুল্লাহ (সা.) কর্তৃক ডাকাতির হদ্দ প্রয়োগ

ইবনে মাজাহ শরীফের (كتاب الحدود)-এর 'যে ব্যক্তি রাহাজানি ও লুটতরাজ করে এবং জনজীবনে বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্য সৃষ্টি করে (بَاب مَنْ حَارَبَ وَسَعَى فِي الْأَرْضِ فَسَادًا)' পরিচ্ছেদে বর্ণিত, আনাস ইবনে মালেক (রা.) থেকে বর্ণিত। উরায়ানা গোত্রের কিছু সংখ্যক লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগে (মদীনায়) আগমন করে। কিন্তু মদীনার আবহাওয়া তাদের স্বাস্থ্যের অনুকূল হলো না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা যদি আমাদের উটের চারণভূমিতে যেতে এবং তার দুধ ও পেশাব পান করতে (তাহলে হয়তো নিরাময় লাভ করতে)। তারা তাই করলো (এবং রোগমুক্ত হলো)।

অতঃপর তারা দ্বীন ইসলাম ত্যাগ করলো (মুরতাদ হয়ে গেল), রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর রাখালকে হত্যা করলো এবং তাঁর উটের পাল লুট করে নিয়ে গেলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এদের পিছু ধাওয়া করতে লোক পাঠালেন। তাদেরকে গ্রেফতার করে নিয়ে আসা হলে তিনি তাদের হাত-পা কেটে এবং তাদের চোখে লৌহ শলাকা বিদ্ধ করে তাদেরকে উত্তপ্ত বালুর উপর ফেলে রাখলেন। অবশেষে তারা মারা গেলো।[৩]

---

[১] *প্রাগুক্ত*, হাদীস নং ৬৩৪৬

[২] আবুল হুসায়ন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল কুশায়রী আন নিশাপুরি (রহ.), *সহীহ মুসলিম শরীফ*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা : হাদীস নং ৪২৫৯

[৩] আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনু ইয়াজিদ ইবনু আবদুল্লাহ ইবনু মাজাহ (রহ.), *ইবনে মাজাহ শরীফ*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা : হাদীস নং ২৫৭৮

খোলাফায় রাশেদার যুগে শাস্তি আইন

খোলাফায়ে রাশেদীনের (৬৩২-৬৬১ খ্রি.) শাসন ব্যবস্থা ও বিচারনীতি সম্পূর্ণভাবে কুরআন ও হাদীসের নির্দেশানুযায়ী পরিচালিত হতো। আবু বকর (রা.) থেকে আলী (রা.) ইসলামী সাম্রাজ্যের প্রত্যেক খলিফাই রাসূলুল্লাহ (সা.) প্রদর্শিত ইসলামী শরীয়াহ মোতাবেক রাষ্ট্রের সকল কার্যক্রম পরিচালনা করতেন। রাষ্ট্রের সকল বিচর সম্পন্ন হতো কুরআন সুন্নাহ নির্দেশিত পথে।

ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর (রা.)-এর সময়ে বিচারব্যবস্থা একটি পূর্ণাঙ্গ রূপ পায়। তিনি বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ থেকে পৃথক করেন। তিনি সর্বপ্রথম মদীনা মসজিদের বাইরে স্বতন্ত্র দারুল কাজা বা বিচারালয় স্থাপন করেন। কাজিগণ কুরআন ও হাদীসের নির্দেশনা অনুযায়ী এবং ইজমা, কিয়াস বা শরীয়াত সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের অধিকাংশের মতামত গ্রহণ করে বিচারকার্য পরিচালনা করতেন। প্রাদেশিক কাজী বা বিচারক তিনিই সর্বপ্রথম প্রবর্তন করেন। উদাহরণ স্বরূপ মদীনায় তিনি আবু দারদা (রা.)-কে, কুফায় আবু মুসা আল আশআরিকে ও বসরায় শুরাইহকে কাজি নিযুক্ত করেন।[১]

আবূ মুসা আল আশআরীর প্রতি খলীফা উমরের বিখ্যাত উপদেশ বাণীতে বলা হয়েছে, 'তোমরা বিচারে ও বিচারালয়ে তাদের সবাইকে সমান দৃষ্টিতে দেখবে, অন্যথায় ক্ষমতাবানরা তোমার পক্ষপাতিত্ব আশা করবে এবং দুর্বলরা তোমার বিচারে নৈরাশ্য বোধ করবে।' নির্ভরযোগ্য হোক আর না হোক এসব বিধি প্রত্যেকটি আইন গ্রন্থে দেখা যায় এবং এগুলো ফৌজদারি ও দেওয়ানি আইনের ভিত্তি।[২]

১. হযরত আবূ বকর (রা.) কর্তৃক শরীয়াতের দণ্ডবিধি কার্যকর

হযরত আবূ বকর (রা.) শরীয়াতের নীতিমালা অনুসরণ করেই সকল রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম পরিচালনা করতেন। তার শাসনামলে মুসলিম সাম্রাজ্যের কিছু জায়গায় ধর্ম ত্যাগের ঘটনা ঘটে। ইসলামী শরীয়াতে ধর্ম ত্যাগীর শাস্তি মৃত্যুদণ্ড; যা তিনি বিদ্রোহী ধর্ম ত্যাগীদের ওপর প্রয়োগ করেন। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, আবূ হুরায়বা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

لَمَّا تُوُفِّيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَاسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ، وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ، قَالَ عُمَرُ يَا أَبَا بَكْرٍ، كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ. فَمَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ. عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ، إِلاَّ بِحَقِّهِ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ ". قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَاللَّهِ لأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ

[১] মুহাম্মদ ছালাহ উদ্দিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯

[২] স্যার টমাস আর্নল্ড ও আলফেড গিল্ম, *পাশ্চাত্য সভ্যতায় ইসলাম*, অনু. নুরুল ইসলাম পাটোয়ারী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা : ২০০৭, পৃ. ২৯৯

الصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ، وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا. قَالَ عُمَرُ فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلاَّ أَنْ رَأَيْتُ أَنْ قَدْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ.

যখন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ওফাত হল এবং আবূ বকর (রা.) খলীফা নিযুক্ত হলেন আর আরবের যারা কাফির হল, তখন উমর (রা.) বললেন, হে আবূ বকর! আপনি কিভাবে লোকদের সাথে যুদ্ধ করবেন? অথচ নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমাকে ততক্ষণ পর্যন্ত লোকদের সাথে যুদ্ধের নির্দেশ দেয়া হয়েছে যতক্ষণ না তারা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই) বলবে। আর যে কেউ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে যথার্থ কারণ না থাকলে সে তার জান ও মাল আমার হাত থেকে রক্ষা করে নেয়। আর তার হিসাব আল্লাহর দায়িত্বে।

আবূ বকর (রা.) বললেন, আল্লাহর কসম! যারা সালাত ও যাকাতের মধ্যে প্রভেদ করবে তাদের সাথে অবশ্যই আমি যুদ্ধ করব। কেননা যাকাত হল মালের হক। আল্লাহর কসম! যদি তারা একটি বকরির বাচ্চাও না দেয় তা রাসূল (সা.) এর কাছে দিত। তাহলে যা না দেওয়ার কারণে তাদের সাথে যুদ্ধ করব। উমর (রা.) বলেন, আল্লাহর কসম! আমি বুঝতে পারলাম যে, এটা আর কিছু নয় এবং আল্লাহ আবূ বকর (রা.) এর বক্ষ যুদ্ধের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। পরে আমি বুঝতে পারলাম যে, আবূ বকর (রা.) এর সিদ্ধান্তই হক।[১]

হযরত আবূ বকর (রা.) কর্তৃক মদপানের শাস্তি প্রয়োগ করা সম্পর্কে হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, হযরত আনাস ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শরাব পান করার ক্ষেত্রে বেত্রাঘাত এবং জুতা মেরেছেন। আর আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) চল্লিশটি করে বেত্রাঘাত করেছেন।[২]

২. হযরত উমর (রা.) কর্তৃক শরীয়াতের দণ্ডবিধি কার্যকর

ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা ইসলামী বিচারব্যবস্থাকে এগিয়ে নিতে অনবদ্য ভূমিকা পালন করেন। তার খেলাফত আমলেই ইসালামী রাষ্ট্রে খলিফা বা গভর্নরের বাইরে বিচারক পদে নিয়োগ দেওয়া শুরু হয়। বিচারকদের জন্য আলাদা দফতরের ব্যবস্থা করা হয়। তার খিলাফত আমলে হদ্দ বাস্তবায়নের একাধিক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رضى الله عنهما ـ قَالَ قَالَ عُمَرُ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يَطُولَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ حَتَّى يَقُولَ قَائِلٌ لاَ نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ. فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللَّهُ، أَلاَ وَإِنَّ الرَّجْمَ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى، وَقَدْ أَحْصَنَ، إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ، أَوْ كَانَ الْحَمْلُ أَوِ الاِعْتِرَافُ ـ قَالَ سُفْيَانُ كَذَا حَفِظْتُ ـ أَلاَ وَقَدْ رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ.

---

[১] *প্রাগুক্ত*, হাদীস নং ৬৪৫৬

[২] *প্রাগুক্ত*, হাদীস নং ৬৩১৬

ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমর (রা.) বলেছেন, আমার আশঙ্কা হচ্ছে যে, দীর্ঘ যুগ অতিক্রান্ত হবার পর কোন ব্যক্তি এ কথা বলে ফেলতে পারে যে, আমরা আল্লাহর কিতাবে রজমের বিধান পাচ্ছি না। ফলে এমন একটি ফরয পরিত্যাগ করার দরুন তারা পথভ্রষ্ট হবে যা আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন। সাবধান! যখন প্রমাণ পাওয়া যাবে অথবা গর্ভ বা স্বীকারোক্তি বিদ্যমান থাকবে তখন ব্যভিচারীর জন্য রজমের বিধান নিঃসন্দেহ অবধারিত। সুফিয়ান (রহ.) বলেন, অনুরূপই আমি স্মরণ রেখেছি। সাবধান! রাসূল (সা.) রজম করেছেন, আর আমরাও তারপরে রজম করেছি।[১]

হযরত উমর (রা.) কর্তৃক মদপানের শাস্তি বাস্তবায়ন সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে,

عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ كُنَّا نُؤْتَى بِالشَّارِبِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَإِمْرَةِ أَبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ خِلاَفَةِ عُمَرَ، فَنَقُومُ إِلَيْهِ بِأَيْدِينَا وَنِعَالِنَا وَأَرْدِيَتِنَا، حَتَّى كَانَ آخِرُ إِمْرَةِ عُمَرَ، فَجَلَدَ أَرْبَعِينَ، حَتَّى إِذَا عَتَوْا وَفَسَقُوا جَلَدَ ثَمَانِينَ.

হযরত সাইব ইবন ইয়াযীদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা.) এর যমানায় ও আবূ বকর (রা.) এর খিলাফত কালে এবং উমর (রা.) এর খিলাফতের প্রথম দিকে আমাদের কাছে যখন কোন মদ্যপায়ীকে আনা হল। তখন আমরা তাকে হাত দিয়ে জুতা দিয়ে এবং আমাদের চাদর দিয়ে তাদের প্রহার করতাম। এমনিভাবে যখন উমর (রা.) এর খিলাফতের শেষ সময় হল তখন তিনি চল্লিশটি করে বেত্রাঘাত করেছেন। আর এসব মদ্যপ যখন সীমালংঘন করেছে এবং অনাচার করা শুরু করে দিয়েছে তখন আশিটি করে বেত্রাঘাত করেছেন।[২]

৩. হযরত উসমান (রা.) কর্তৃক শরীয়াতের দণ্ডবিধি কার্যকর

ইসলামের তৃতীয় খলিফা হযরত উসমান (রা.) ছিলন অত্যন্ত লজ্জাশীল, দানশীল, বিনয়ী এবং নম্র স্বভাবের মানুষ। কিন্তু তার এই উন্নত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য কখনোই শরীয়া আইন বাস্তবায়নে তার জন্য বাধার কারণ হয়ে দাঁড়ায়নি। বরং তার কাছে যখন যে অপরাধের বিচার আসত, তিনি শরীয়াহ মোতাবেক সে বিচার সম্পন্ন করতেন। যেমন, বর্ণিত হয়েছে, হুসাইন ইবন মুনযির আবূ সাসান (রহ.) ... থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

شَهِدْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَأُتِيَ بِالْوَلِيدِ قَدْ صَلَّى الصُّبْحَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ أَزِيدُكُمْ فَشَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلاَنِ أَحَدُهُمَا حُمْرَانُ أَنَّهُ شَرِبَ الْخَمْرَ وَشَهِدَ آخَرُ أَنَّهُ رَآهُ يَتَقَيَّأُ فَقَالَ عُثْمَانُ إِنَّهُ لَمْ يَتَقَيَّأْ حَتَّى شَرِبَهَا فَقَالَ يَا عَلِيُّ قُمْ فَاجْلِدْهُ . فَقَالَ عَلِيٌّ قُمْ يَا حَسَنُ فَاجْلِدْهُ . فَقَالَ الْحَسَنُ وَلِّ حَارَّهَا مَنْ تَوَلَّى قَارَّهَا - فَكَأَنَّهُ وَجَدَ عَلَيْهِ - فَقَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ قُمْ فَاجْلِدْهُ . فَجَلَدَهُ وَعَلِيٌّ يَعُدُّ حَتَّى بَلَغَ أَرْبَعِينَ فَقَالَ أَمْسِكْ . ثُمَّ قَالَ جَلَدَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَرْبَعِينَ وَجَلَدَ أَبُو

---

[১] *প্রাগুক্ত*, হাদীস নং ৬৩৬৯
[২] *প্রাগুক্ত*, হাদীস নং ৬৩২২

بَكْرٍ أَرْبَعِينَ وَعُمَرُ ثَمَانِينَ وَكُلٌّ سُنَّةٌ وَهَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ . زَادَ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ فِي رِوَايَتِهِ قَالَ إِسْمَاعِيلُ وَقَدْ سَمِعْتُ حَدِيثَ الدَّانَاجِ مِنْهُ فَلَمْ أَحْفَظْهُ .

আমি উসমান ইবন আফফান (রা.) এর কাছে উপস্থিত ছিলাম। তখন ওয়ালীদকে তাঁর কাছে আনা হল। সে ফজরের দু'রাকাআত সালাত আদায় করে বলেছিল, আমি আরো অধিক রাকআত আদায় করবো? তখন দু'ব্যক্তি ওয়ালীদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিল। তন্মধ্যে একজনের নাম ছিল হুমরান। সে বলল, ঐ মদ খেয়েছেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি সাক্ষী দিল যে, সে তাকে বমি করতে দেখেছে।

তখন হযরত উসমান (রা.) বললেন, সে মদ খাওয়ার কারণেই বমি করেছে। অতএব তিনি বললেন, হে আলী (রা.) আপনি উঠুন এবং তাকে বেত্রাঘাত করুন। তখন আলী হাসান (রা.) কে বললেন; হে হাসান! তুমি উঠ এবং তাকে বেত্রাঘাত কর। হাসান (রা.) বললেন, যে ক্ষমতার স্বাদ ভোগ করেছে সেই তার তিক্ততা ভোগ করুক। (এতে যেন আলী (রা.) তার প্রতি ক্ষুব্ধ হলেন।)

অতঃপর তিনি বললেন, হে আবদুল্লাহ ইবন জা'ফর! তুমি উঠ এবং তাকে বেত্রাঘাত কর। তখন বললেন থামো! নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চল্লিশটি বেত্রাঘাত করেছেন। তিনি তাকে বেত্রাঘাত করলেন। আর আলী (রা.) তা গণনা করলেন। যখন চল্লিশটি বেত্রাঘাত করা হল- এবং আবূ বাকর (রা.) ও (তাঁর খিলাফতকালে) চল্লিশটি মেরেছেন। আর উমার (রা.) (তার খিলাফতকালে) আশিটি মেরেছেন। আর এর প্রতিটিই সুন্নাত। তবে এটি (চল্লিশটি) আমার নিকট অধিক পছন্দনীয়।[১]

৪. হযরত আলী (রা.)কর্তৃক শরীয়াতের দণ্ডবিধি কার্যকর

হযরত আলী (রা.) ছিলেন একজন চৌকস বিচারক। রাসূলুল্লাহ (সা.) তার জন্য এ মর্মে দোয়া করেছিলেন যাতে তিনি দক্ষ বিচারক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে পারেন। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দোয়ার প্রতিফলন রাসূলুল্লাহর জীবদ্দশায়ই ঘটেছিল। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর প্রতিনিধি হিসেবেও তাকে বিভিন্ন প্রয়োজনে প্রেরণ করতেন। যার ধারাবাহিকতা পরবর্তী খলিফাদের সময়ও বহাল ছিলো। খলিফার দায়িত্ব গ্রহণের পরও তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে বিচার কার্যক্রম চালিয়ে যেতে থাকেন।

শাবী (রহ.) থেকে বর্ণিত।

عَنْ عَلِيٍّ، رضى الله عنه حِينَ رَجَمَ الْمَرْأَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَقَالَ قَدْ رَجَمْتُهَا بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.

---

[১] আবুল হুসায়ন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল কুশায়রী আন নিশাপুরি (রহ.), *সহীহ মুসলিম শরীফ*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা : হাদীস নং ৪৩০৮

আলী (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, আলী (রা.) জুম'আর দিন জনৈকা মহিলাকে যখন রজম করেন তখন বলেন, আমি তাকে রাসূল (সা.) এর সুন্নাত অনুযায়ী রজম করলাম।[১]

হাদীস শরীফে আরও বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ أُتِيَ عَلِيٌّ ـ رضى الله عنه ـ بِزَنَادِقَةٍ فَأَحْرَقَهُمْ فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَوْ كُنْتُ أَنَا لَمْ أُحْرِقْهُمْ لِنَهْىِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلَقَتَلْتُهُمْ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ ".

ইকরামা (রহ.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী (রা.) এর নিকট একদল যিন্দীককে (নাস্তিক ও ধর্মদ্রোহী) আনা হল। তিনি তাদেরকে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিলেন। এ ঘটনা ইবন আব্বাস (রা.) এর কাছে পৌঁছলে তিনি বললেন, আমি হলে কিন্তু তাদেরকে পুড়িয়ে ফেলতাম না। কেননা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে যে, তোমরা আল্লাহর শাস্তি দ্বারা শাস্তি দিও না। বরং আমি তাদেরকে হত্যা করতাম। কেননা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নির্দেশ রয়েছে, যে কেউ তার দ্বীন বদলে ফেলে তাকে তোমরা হত্যা কর।[২]

আলী ইবন আবূ তালিব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

مَا كُنْتُ لأُقِيمَ حَدًّا عَلَى أَحَدٍ فَيَمُوتَ، فَأَجِدَ فِي نَفْسِي، إِلاَّ صَاحِبَ الْخَمْرِ، فَإِنَّهُ لَوْ مَاتَ وَدَيْتُهُ، وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَسُنَّهُ.

আমি যদি কোন অপরাধীকে শাস্তি প্রদান করি আর সে তাতে মরে যায় তবে মনে কোন দুঃধ আসে না কিন্তু শরাব পানকারী ব্যতীত। সে যদি মারা যায় তবে তার জন্য আমি দিয়াত দিয়ে থাকি। কেননা রাসূল (সা.) মদের শাস্তির ব্যাপারে কোন সীমা নির্ধারণ করেন নি।[৩]

---

[১] আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল বুখারী আল জুফী (রহ.), *সহীহ বুখারী শরীফ*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা : হাদীস নং ৬৩৫৬

[২] *প্রাগুক্ত*, হাদীস নং ৬৪৫৪

[৩] *প্রাগুক্ত*, হাদীস নং ৬৩২১

খোলাফায় রাশেদীন পরবর্তী খিলাফত ব্যবস্থায় শরীয়াহ আইন

মহানবী (সা.)-এর ওফাত পরবর্তী মুসলিম বিশ্বে খিলাফত (৬৩২-৬৬১ খ্রি.) ত্রিশ বছর স্থায়ী হয়। খিলাফত পরবর্তী সময়ে শুরু হয় বংশ কেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থা। ইসলামী বিশ্বে বংশ কেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থার সূচনা আমীরে মুয়াবিয়া (রা.) কর্তৃক উমাইয়া খিলাফত প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। পরবর্তীতে মুসলিম বিশ্ব আর বংশ কেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি। যদিও এই সময়ের অধিকাংশ শাসকই ইসলামের নীতি-আদর্শ অনুসরণ করেই রাজ্য শাসন করতেন। সুশাসক হিসেবে উমর ইবনে আব্দুল আজিজ (রহ.) সহ অনেকেই ব্যাপক পরিচিত ও জনপ্রিয়তা লাভ করেন। খিলাফত পরবর্তী উল্লেখযোগ্য রাজ বংশ হচ্ছে-

১. উমাইয়া খিলাফত (৬৬১-৭৫০ খ্রি.)

২. আব্বাসীয় খিলাফত (৭৫০-১২৫৮ খ্রি.)

৩. মিশরের ফাতেমীয় খিলাফত (৯০৯-১২৭১ খ্রি.)

৪. স্পেনের উমাইয়া খিলাফাত (৭১১-১৪৯২ খ্রি.) এবং

৫. উসমানীয়া অটোমান বা তুর্কি খিলাফত (১২৯৯-১৯২৪ খ্রি.)

উপরে উল্লিখিত খেলাফতের শাসন ব্যবস্থা ছিল রাজতন্ত্রের ভিত্তিতে। তা সত্ত্বেও মুসলিম জাহানের এ দীর্ঘ সময়ের রাজনৈতিক এ ব্যবস্থা ঐতিহাসিকভাবে খিলাফত ব্যবস্থা নামে স্বীকৃতি লাভ করেছে। এ দীর্ঘ সময়ে শরীয়া আইনের মাধ্যমে বিচারকার্য পরিচালিত হতো। কুরআন ও সুন্নাহর বাইরে এ সময়ের উসূল বা মৌলিক নীতিমালার সমন্বয়ে ফিকহ শাস্ত্রের উদ্ভব ঘটে।[১]

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জীবদ্দশায় কিয়াসের উদ্ভব ঘটে এবং চার খলিফার সময়ে ইজমার আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি লাভ হয়। ইসলামী ফিকহ শাস্ত্রের প্রধান চার ইমাম, ইমাম আবু হানিফা (রহ.), ইমাম শাফি'ঈ (রহ.), ইমাম মালেক (রহ.) এবং ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহ.) ফিকাহ ও উসূলে ফিকহের সমন্বয়ে আইনের নবতর উৎসের সৃষ্টি করেন। কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াসের বাহিরে ইস্তিহসান, আল্ মুসলিহাত, আয্ যারায়ে, আল ইসতিসহাব, আল ইসতিসলাহ, আল ইসতিদলাল, উরফ, আদাত, মাসাহিলুল মুরাসালাহ ও ফিকহি মাসায়েলের উদ্ভব ঘটে।[২]

ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর জন্ম উমাইয়া খিলাফতামলে। বিশুদ্ধ মতে ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) এর জন্ম ৮০ হি. ও মৃত্যু ১৫০ হিজরীতে।[৩] উমাইয়া শাসনের শেষ ও আব্বাসী শাসনের সূচনাকাল তিনি পেয়েছিলেন। তিনি উমাইয়া খলীফা আব্দুল মালিক ইবন মারওয়ান, ওয়ালীদ ইবন আব্দুল মালিক, সুলাইমান ইবন আব্দুল মালিক, উমার ইবন আব্দুল আযীয, হিশাম ইবন আব্দুল মালিক, ইয়াযীদ ইবন আব্দুল মালিক, ওয়ালীদ ইবন ইয়াযীদ, ইয়াযীদ ইবন ওয়ালীদ, ইব্রাহীম ইবন ওয়ালীদ, মারওয়ান ইবন মুহাম্মাদ এবং আব্বাসী খলীফা আবুল আব্বাস আস-সাফ্ফাহ ও আবূ জা'ফার আল-মানসূর প্রমুখের শাসন অবলোকন করেছিলেন।[৪]

---

[১] মুহাম্মদ ছালাহ উদ্দিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০

[২] *প্রাগুক্ত*

[৩] আবুল কাসিম 'আব্দুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ ইব্ন আবিল 'আওওয়াম আস-সা'দী, *ফাযাইলু আবী হানীফা ওয়া আখবারুহু ওয়া মানাক্বিবুহু*, ঢাকা : মাকতাবাতুল আযহার, ১৪৩১হি./২০১০, পৃ. ৩৮-৩৯

[৪] আবূ জা'ফার মুহাম্মাদ ইবন জারীর আত-ত্ববারী, *তারীখুল উমামি ওয়াল মুলূক*, বৈরুত : দারুল কুতুবিল 'ইল্মিয়া, ১৪০৭ হি., খ. ৩, পৃ. ৬১৬ এবং খ. ৪, পৃ. ৪৯৭

৮০ থেকে ১৫০ হিজরী সন পর্যন্ত তার জীবদ্দশায় ইসলামী আইনের প্রধান ভাষ্যকার ছিলেন ইমাম আবু হানিফা (৬৯৯-৭৬৬ খ্রি.)। ইসলামী আইনের ফিকহ ও উসূলে ফিকহের প্রবর্তক মনে করা হয় ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) কে। জনকল্যাণের নিমিত্তে ইসলামী আইনে ইস্তিহসান তারই উদ্ভাবন। ইসলামী আইনের বিভিন্ন উৎস সম্পর্কে তিনি যে সুশৃঙ্খল, কাঠামোবদ্ধ আলোচনা করেছেন তাকে বলা হয় ইলমুল উসূল। উসূলের মাধ্যমে যে অসংখ্য হানাফী আইনের সূত্র বিধিবদ্ধ করেছেন তাকে বলা হয় ইলমুল ফিকহ।[১]

ইমাম আ'যমের ইসলামী আইন তথা ফিক্‌হ চর্চা একক ছিল না, তা ছিল দলগত। তাঁর ছিল এক ফিক্‌হী মাজলিস বা ফিক্‌হী পরামর্শ পরিষদ। তাতে নামকরা সব মুহাদ্দিস, ফক্বীহ, সাহিত্যিক উপস্থিত থাকতেন। কোন একজন অনুপস্থিত থাকলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হতো না। সবার মতামত যাচাই-বাছাইয়ের পর যেটি সিদ্ধান্তরূপে গৃহীত হতো তা লিপিবদ্ধ করতে নির্দেশ দিতেন। এ পরামর্শ ভিত্তিক ফিক্‌হী মাযহাবই পৃথিবীর অধিকাংশ মুসলিম গ্রহণ করে নেয় সেই সূচনালগ্ন থেকে। অন্যান্য মাযহাব এরূপ নয় কেননা সেগুলো শুধু মাযহাবের ইমামের মতামত।[২]

আসাদ ইবন আমর বলেন, তারা কোন মাসআলার জওয়াবে ইমাম আবূ হানীফার মাজলিসে মতভেদ করতেন। বিভিন্ন রকম জওয়াব আসতো। সেগুলো তাঁর কাছে পেশ করা হতো। তিনি প্রায়ই সহমত পোষণ করতেন। কোন কোন মাসআলার সমাধানে তিন দিন পর্যন্ত অতিবাহিত হতো। অতঃপর সর্বসম্মতিতে সিদ্ধান্ত হলে তা লিপিবদ্ধ করা হতো।[৩]

ইমাম আবু হানীফা (রহ.) এর ফিক্‌হী মাজলিসের সভাসদবৃন্দ

ইমাম আ'যমের ফিক্‌হী মাজলিসের সভাসদবৃন্দের সংখ্যা সঠিকভাবে জানা যায় না। তবে তাঁর ফাতওয়া লিখতেন এমন সহচরের সংখ্যা ছিল ৪০ জন।[৪] বড় বড় মুহাদ্দিস-ফক্বীহ তাঁর সভাসদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। আল্লামা যফর আহমাদ 'উছমানী থানবী 'আবূ হানীফা ওয়া আসহাবুহুল মুহাদ্দিসূন" কিতাবে তাঁর অনেক মুহাদ্দিস শিষ্যের জীবনী উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে আব্দুল্লাহ ইবনল মুবারক, ওয়াক্বী' ইবনল জাররাহ, হাফস ইবন গিয়াছ, মিসআর ইবন কিদাম, মাক্কী ইবন ইবরাহীম, আবূ আসিম আন-নাবীল, ফাযল ইবন দুকাইন, ইবরাহীম ইবন তহমান, ইয়াযীদ ইবন হারূন, আলী ইবন মুসহির, ক্বাসিম ইবন মা'ন, হাম্মাদ ইবন যাইদ, লাইছ ইবন সা'দ, নযর ইবন শুমাইল, আব্দুর রায্‌যাক্ব ইবন হাম্মাম উল্লেখযোগ্য। মুগীরা ইবন হামযা বলেন, ইমাম আবূ হানীফার ফাতওয়া-মাসাইল লেখক সহচরের সংখ্যা ছিল ৪০ জন। তারা ছিলেন তৎকালীন বড় বড় আলিম।[৫]

আসাদ ইবনল ফুরাত বলেন, ইমাম আবূ হানীফার ৪০ জন বিশিষ্ট সহচর মাসআলাসমূহ লিপিবদ্ধ করতেন। তাদের প্রথম সারির দশ জনের কয়েক জন হলেন, আবূ ইউসুফ, যুফার ইবনল হুযাইল, দাউদ আত-তাঈ, আসাদ ইবন আমর, ইউসুফ ইবন খালিদ আস-সামতী, ইয়াহইয়া ইবন যাকারিয়া ইবন আবী যাইদা। শেষোক্ত ইয়াহইয়া সে ব্যক্তি যিনি সুদীর্ঘ ত্রিশ বৎসর পর্যন্ত ফিক্‌হ হানাফীর সমাধানকৃত মাসআলাসমূহ লিখেছেন। অর্থাৎ ইমাম আ'যমের 'ইলমী

---

[১] মোহাম্মদ আলী মনসুর, *বিচার বিভাগের স্বাধীনতার ইতিহাস*, ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার, ২০১০,পৃ. ১৮-১৯

[২] মো: বশির উদ্দিন, *ইমাম আবূ হানীফা(র.) ও হাদীসশাস্ত্র*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ.ডি ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি(অপ্রকাশিত), ২০১৫, পৃ. ১১৫

[৩] ইবন আবিল 'আওওয়াম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৪১-৩৪২

[৪] মোহাম্মদ আলী মনসুর, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮-১৯

[৫] ইবন আবিল 'আওওয়াম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৪২

মাজলিসের লেখক ছিলেন।[১] ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) এবং তার ফিক্হ বোর্ডের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলেই কাঠামোবদ্ধ ইসলামী আইন সুপ্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হয়েছে। তাদের দূরদর্শী চিন্তা ও গবেষেণার মাধ্যমে ভবিষ্যতে কী ধরনের সমস্যা হতে পারে, ইসলামী আইনে এসব সমস্যার সমাধান কী হবে তা-ও তারা আলোচনা করেছেন।

ঐতিহাসিক ফিলিপ কে. হিট্টির মতে, "রোমানদের পর মধ্যযুগের মানুষ হিসেবে আরবরাই বিজ্ঞানভিত্তিক বিচার শাস্ত্রের চর্চা করেছে এবং তার মধ্যদিয়ে সেখানে একটা স্বনির্ভর বিচারব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। তাদের এই বিচারব্যবস্থাকে আরবরা বলত ফিক্হ। কুরআন ও সুন্নাহর (হাদীস) উপর ভিত্তি করে এই ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল এবং উসূল (মূলভিত্তি, মৌলিক নীতিমালা) নিয়ে খ্যাত ছিল। এর উপর গ্রিক ও রোমান বিচারব্যবস্থার যথেষ্ট প্রভাব ছিল। ইসলামের অনুশাসন নীতি (শরীয়া) কুরআন উদ্ধৃত ও হাদীসে বিশদভাবে বিশ্লেষিত আল্লাহর উপদেশাবলি ফিকহের মাধ্যমে পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে প্রচার করা হয়েছিল। ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও উপাসনা (ইবাদত), সামাজিক ও আইনগত দায়দায়িত্ব (মুয়ামিলাত) এবং শাস্তিসমূহ (উকুবাত) ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কেই নির্দেশাবলি ছিল ওই সমস্ত উপদেশগুলোতে।[২]

ফিলিপ. কে. হিট্টি আরো বলেন, হযরত মুহাম্মদ (সা.) ইয়ামেনে তার নিযুক্ত কাজী মুআজ ইবন-জাবালের সঙ্গে কথোপকথনের ভিত্তিতে যে আলোচনা করেছিলেন, তাকে এক কথায় ইসলামী মৌলিক আইনের ম্যাগনাকার্টা (মহাসনদ) আখ্যা দেওয়া যায়।[৩]

মধ্যযুগে ইসলামী বিচারব্যবস্থা সারাবিশ্বকে এতো গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল যে, ইসলামের ইতিহাসে এক স্বর্ণোজ্জ্বল দীর্ঘ অধ্যায় সংযোজিত হয়েছিল তুরস্কের ওসমানী (Ottoman Empire) খিলাফতের আমলে। এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন গাজী ওসমান। পারস্য উপসাগর থেকে ভূ-মধ্যসাগর পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চল, সমগ্র মিশর, ইউরোপের কৃষ্ণ সাগরের পশ্চিম তীর থেকে শুরু করে অদ্রিয়েটিক সাগরের পূর্ব তীর পর্যন্ত সমগ্র ভূখণ্ড, এশিয়া মাইনর আনাতোলিয়া এবং ইউরোপের দক্ষিণ-পূর্ব অংশ, সমগ্র বলকান উপদ্বীপ, বুলগেরিয়া, আলবেনিয়া, বসনিয়াসহ বিশাল অঞ্চল ছিল ওসমানী খিলাফতের অন্তর্ভুক্ত।[৪]

রাসূলুল্লাহ (সা.) ও চার খলিফা মদীনায় এবং তাদের পর উমাইয়া খলিফাগণ দামেস্কে, তাঁদের পতনের পর আব্বাসীয় খলিফাগণ বাগদাদে ও তাঁদের পতনের পর অটোম্যান তুর্কি খলিফাগণ তুরস্কের কনস্ট্যান্টিনোপল রাজত্ব করতেন। শিয়া মতাবলম্বী ফাতেমীয় খলিফাগণ মিসরের কায়রোতে এবং আব্বাসীয়দের নিকট পরাজিত হওয়ার পর উমাইয়া বংশের একটি অংশ স্পেনে রাজত্ব করতেন। তাছাড়া খলিফাদের ক্ষমতা হ্রাস পেলে অনেক স্থানীয় মুসলমান শাসক স্বাধীন রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করে স্বাধীনভাবে দেশ শাসন করতেন। ওই সকল খলিফাদের এবং মুসলমান রাজা বাদশাহদের আমলে ইসলামী আইনের বিধানমতো বিচার করা হতো।[৫]

প্রথম চার খলীফার সময়ে খলিফাগণ ছিলেন সর্বোচ্চ বিচারপতি। এ সময় প্রত্যেক প্রদেশের জন্য একজন করে প্রধান বিচারপতি এবং প্রত্যেক জেলার জন্য একজন করে কাজী নিযুক্ত করা হতো। সততা, বংশ মর্যাদা, আইনে পারদর্শিতা ইত্যাদি বিবেচনা করে শূরার পরামর্শানুযায়ী কাজীগণ খলিফা কর্তৃক নিযুক্ত হতেন। তারা মোটা বেতন পেতেন। তাদের উপাধি ছিল হাকিম। উমাইয়া শাসনামলে বিচারব্যবস্থা অনেকটা পূর্বের মতোই ছিল। এ সময়ে কাজীগণ পূর্বের ন্যায় প্রভাবমুক্ত ছিলেন না। আব্বাসীয় খলিফাদের আমলে বিচারবিভাগকে দরুল আদল বলা হতো এবং প্রধান বিচারপতি ছিলেন দারুল আদলের প্রধান এবং তখন বিচারবিভাগ নির্বাহীবিভাগ থেকে আলাদা ও স্বাধীন ছিল।[৬]

---

[১] যাহিদ ইবনুল হাসান, আল-কাউছারী, *আন-নুকাতুত ত্বরীফা*, করাচী: ইদারাতুল কুরআন ওয়াল 'উলূমিল ইসলামিয়্যা, তা. বি., পৃ. ৬৮ ২৯৪

[২] ফিলিফ কে হিট্টি, *আরব জাতির ইতিহাস*, কলিকাতা : মল্লিক ব্রাদার্স, ১৯৯৯, পৃ. ৪৩৯

[৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩৯

[৪] মোহাম্মদ আলী মনসুর, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯

[৫] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২

[৬] মুহাম্মদ ছালাহ উদ্দিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩

ভারতবর্ষে শরীয়াহ আইন

হিজরী প্রথম বর্ষ থেকেই মুসলিম রাষ্ট্রগুলো ইসলামী আইন দ্বারা শাসিত হয়ে আসছে। দীর্ঘকাল ধরে এ ধারা অব্যাহত থাকে। ইউরোপীয় মুসলিম স্পেন ও বর্তমান পর্তুগালসহ অনেক দেশ দীর্ঘ আটশ বছর ইসলামী আইন দ্বারা শাসিত হয়েছে। গত শতকের প্রথম দিকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষে তুর্কী খিলাফতের অবসান হওয়া পর্যন্ত আফ্রিকার উত্তর, উত্তর-পূর্ব ও উত্তর-পশ্চিমসহ মধ্যপ্রাচ্যের বিস্তীর্ণ এলাকা ইসলামী আইন দ্বারা শাসিত হয়েছে। উপমহাদেশে ব্রিটিশ শাসনের পূর্ব পর্যন্ত (১৭৫৭ খ্রি.) ইসলামী আইন কার্যকর ছিল।[১]

ভারতবর্ষে শাস্তি আইন

ভারতবর্ষে হিন্দু যুগের ব্যাপ্তি প্রায় ১৫০০ বছর, খ্রি. পূ. ৪০০ শতাব্দী থেকে প্রায় ১১০০ শতাব্দী পর্যন্ত।[২] হিন্দু যুগে ভারতবর্ষ মূলত হিন্দু আইন দ্বারাই পরিচালিত হতো। মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরও হিন্দু পারিবারিক আইন হিন্দু ধর্মীয় রীতি-রেওয়াজ দ্বারা পরিচালিত হয়ে আসছিল। পরবর্তীতে ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর কিছু কিছু আইন পরিবর্তীত হয়। এক্ষেত্রে সতীদাহ প্রথা, বিধবা বিবহ না করা ইত্যাদি আইন উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে।

সতীদাহ প্রথা বাতিলে কার্যকর ভূমিকা পালন করেন লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক।[৩] তিনি সতীদাহ প্রথার বিলোপ সাধন করেন। বহু প্রাচীন কাল থেকে এদেশের হিন্দু সমাজে 'সহমরণ' (মৃত স্বামীর সাথে স্বেচ্ছায় একই চিতায় স্ত্রীর মৃত্যুবরণ করা) এবং 'অনুমরণ' (বিদেশে স্বামীর মৃত্যু হলে বিধবাকে একাকী চিতায় পুড়িয়ে মারা) প্রথার প্রচলন ছিল। এভাবে স্ত্রীগণ সতী হতেন। কোন কোন মুসলমান স্ত্রীও সতী হয়েছেন এমন প্রমাণও রয়েছে। অনেক সময় সামাজিকতা রক্ষার জন্য মৃত ব্যক্তির পরিবার পরিজন বিধবাকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও জোরপূর্বক চিতায় পুড়িয়ে মারতো। লর্ড কর্ণওয়ালিস ও তাঁর পরের অনেক গভর্নর জেনারেলই এ অমানবিক প্রথাকে উঠিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু এদেশীয় ভাবাদর্শে আঘাত লাগতে পারে বলে তাঁরা ততটা জোর দেননি। লর্ড বেন্টিঙ্ক কয়েকজন এদেশীয় উদারপন্থী সংস্কারক বিশেষ করে রাজা রামমোহন রায় ও প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের সমর্থন ও সহায়তা লাভ করেন। সদর নিজামত আদালতের জজদের সমর্থন নিয়ে ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দে এক আদেশ বলে এই অমানবিক প্রথা রহিত করেন। এ ছাড়া তৎকালীন হিন্দু রীতি অনুযায়ী দেবতাকে খুশী করার জন্য নিজের প্রথম সন্তানকে গঙ্গা নদীতে নিক্ষেপ ও বিবাহ দেয়ার অক্ষমতা হেতু নিজ শিশু কন্যাকে গলাটিপে হত্যা করার নিয়মও বেন্টিঙ্ক চিরতরে বন্ধ করে দেন।[৪]

মুসলমানদের ভারত জয়

মুহম্মদ বিন কাসিমের নেতৃত্বে ৭১২ খ্রিস্টাব্দে সিন্ধু জয় করেন। মুহম্মদ বিন-কাসিম প্রথমেই দেবল বন্দর জয় করেন। দেবল দখলের পর মুহম্মদ বিন-কাসিম সিন্ধু নদের তীর ধরে উত্তর দিকে এগিয়ে নীরুন, সিওয়ান, সিসাম, রাওয়ার দুর্গ ও মুলতান একের পর এক জয় করলেন। মুলতান দখলের মধ্য দিয়ে রাজা দাহিরের রাজ্যের পুরোটাই

---

১ *প্রাগুক্ত*

২ ড. মো: শফিকুর রহমান, *বাংলাদেশের আইন বিচার ব্যবস্থা এবং সাংবিধানিক ক্রমবিকাশ*, কামরুল বুক হাউস, ঢাকা-চট্টগ্রাম : ২০১৯, পৃ. ৫৩

৩ ড. মো: শফিকুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫৯

৪ ড. এ কে এম শাহনাওয়াজ ও অন্যান্য, *ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র*, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় গাজীপুর : ২০১৪, পৃ. ১১৬

মুসলমানদের অধিকারে চলে আসে।[১] তবে ৭১২ খিস্টাব্দে সিন্ধু বিজয়ের পর থেকে ৯৯১ খিস্টাব্দে সবুক্তগীনের ভারত অভিযান পর্যন্ত ভারতে মুসলিম শাসন ও বিচারব্যবস্থার কোন সুযোগ ঘটেনি।[২]

ক. সালতানাত যুগে শরীয়া আইন

ভারতবর্ষে মুসলিম বিজয়ের পূর্বে বৌদ্ধ ও হিন্দু শাসনামলকে ভারতীয় ইতিহাসে 'প্রাচীন যুগ' বলা হয়। ঐতিহাসিকরা মনে করেন, ভারতবর্ষে মুসলিম অভিযান ও আরবদের সিন্ধু বিজয় থেকে ভারতে 'মধ্যযুগের' সূচনাকাল শুরু এবং মুঘল শাসনের শেষ পর্যন্ত এ যুগের বিস্তৃতি। ভারতের মধ্যযুগের ইতিহাসে সুলতানি শাসন এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়।[৩] সুলতানি আমলের ফৌজদারি আইন ছিলো ইসলামী ফৌজদারী আইন। ইসলামী শরীয়াহর অনুসৃত নীতি ছিলো এ আইনের ভিত্তি।[৪] মোহাম্মদ ঘুরী ভারত জয় করে এদেশে স্থায়ী ইসলামী শাসনের ভিত্তি স্থাপন করেন। ভারতে মুসলিম শাসন আরম্ভ হলে বিভিন্ন দেশ থেকে মুসলিম জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিগণ এদেশে আসতে থাকেন। তাঁদের মধ্যে যাঁরা ধর্মশাস্ত্র ও আইনশাস্ত্রে অভিজ্ঞ ছিলেন তাঁদের মুসলমান সুলতানগণ বিভিন্ন সরকারি পদে বিশেষ করে বিচারকদের পদে নিযুক্ত করতেন। বাগদাদের আব্বাসীয় খলিফাদের, স্পেনের উমাইয়া খলিফাদের ও মিশরের ফাতেমী খলিফাদের শাসন ও বিচারব্যবস্থার অনুকরণে ভারতের মুসলিম সুলতানগণ এদেশে ইসলামী শাসন ও বিচারব্যবস্থা প্রবর্তন করেছিলেন।[৫] ১২০৬ সনে কুতুব উদ্দীন আইবেকের রাজত্বকাল থেকে ১৫২৬ সাল পর্যন্ত সময়কালকে সুলতানী আমল বলা হয়।[৬] সুলতানি আমলে রাজধানী দিল্লীতে বাদশাহ স্বয়ং আইন সম্পর্কে খুব জ্ঞানী ও খ্যাতিসম্পন্ন দু'জন মুফতির সাহায্যে আদি ও আপিল মামলা বিচার করতেন। দেওয়ান-ই-মুজালিম নামক আদালত ছিল রাজ্যের সর্বোচ্চ ফৌজদারি আপিল আদালত এবং দেওয়ান-ই-রিসালত ছিল রাজ্যের সর্বোচ্চ দেওয়ান-ই- আপিল আদালত। বাদশাহর পর কাজী-উল-কুজাত বা প্রধান বিচারপতির পদটি ছিল সর্বোচ্চ পদ।[৭] ১২০৬ সনে কাজী-উল-কুজাত বা প্রধান বিচারপতির পদটি সৃষ্টি করা হয়। এ আদালতে দেওয়ারি ও ফৌজদারি উভয় প্রকার মোকাদ্দমারই বিচার করা হতো। ১২৪৮ খ্রিস্টাব্দে সুলতান নাসির উদ্দিন বিচারপতির কার্যক্রমে অসন্তুষ্ট হয়ে কাজি-উল-কুজ্জাত এর পরিবর্তে সদর-ই-জাহানের পদ সৃষ্টি করেন। এবং কাজী মিনহাজ সিরাজকে এর বিচারক হিসেবে নিযুক্ত করেন।[৮]

সুলতানী আমলে বিচারপতিগণ বিশিষ্ট যোগ্যতাসম্পন্ন এবং ব্যাপক সম্মানের অধিকারী ছিলেন। তারা তাদের নিরপেক্ষতা, স্বাধীনচেতা মনোভাব এবং ন্যায়বিচারের জন্য সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন।[৯] তারা ইসলামী শরীয়াতের বিধিবিধান অনুসরণ করে তাদের বিচারকার্য পরিচালনা করতেন। কোনো বিষয় বিতর্ক সৃষ্টি হলে সেক্ষেত্রে সাধারণত হানাফী স্কুলের মতামত গ্রহণ করা হতো।

সালতানাতের সময়ে মুফতি (মুসলিম আইন বিশেষজ্ঞ), পণ্ডিত (হিন্দু আইন বিশেষজ্ঞ), মুহতাসিব (সরকার পক্ষে মামলা পরিচালনাকারী) ও দাদবাকের (আদালতের প্রশাসনিক কর্মকর্তা) সাহায্যে মামলা পরিচালনা করতেন।

---

[১] অধ্যাপক আবদুল বাছির সম্পাদিত, *ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি দ্বিতীয় পত্র*, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর : ২০১৯, পৃ. ৬-৭
[২] মুহাম্মদ ছালাহ উদ্দিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪
[৩] অধ্যাপক আবদুল বাছির, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১
[৪] ড. মো: শফিকুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৬
[৫] মুহাম্মদ ছালাহ উদ্দিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪
[৬] ড. মো: শফিকুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৪
[৭] মুহাম্মদ ছালাহ উদ্দিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪
[৮] ড. মো: শফিকুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৭
[৯] ড. মো: শফিকুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৭

বাদশাহ সিকান্দার লোদী কাজি-উল-কুজ্জাতের পদকে পরিবর্তন করে মীর-ই-আদিল করেছিলেন। এভাবে সুলতানী আমলে বাংলাদেশেও শরীয়াতি আইন প্রয়োগ করা হতো।[১]

সুলতানি যুগের বিচারব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল প্রশাসনিক বিভাগের উপর ভিত্তি করে। সালতানাতের রাজধানীতে একটি পর্যায়ক্রমিক বিচারব্যবস্থার প্রচলন করা হয়। সুলতানি আমলে বিদ্যমান আদালতসমূহ নিম্নরূপ[২]- ১. কেন্দ্রীয় রাজধানীর আদালত ২. প্রাদেশিক আদালত ৩. জেলা আদালত ৪. পরগনা আদালত ৫. গ্রাম আদালত। সব আদালতে সব ধরনের মোকাদ্দমার বিচার হতো না। কোন আদালতের কী ক্ষমতা, কী এখতিয়ার তা সুলতান কর্তৃক নির্দিষ্ট করা ছিলো।

খ. মোঘল আমলে শরীয়া আইন

১৫২৬ সনে থেকে ১৭৫৭ সনে ব্রিটিশ শাসন শুরুর পূর্ব পর্যন্ত সময়কে মোগল আমল বলা হয়। ভারতবর্ষে মুঘল রাজবংশের সূচনা ইতিহাসের এক যুগান্তকারী ও মোড় পরিবর্তনকারী ঘটনা। ১৫২৬ খ্রি. জহিরউদ্দিন মুহম্মদ বাবর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এই বংশ কয়েক শতাব্দি ধরে শাসন পরিচালনা করে। জানা যায় যে, মুঘল শব্দটি এসেছে 'মোঙ্গ' বা 'মোঙ্গল' শব্দ হতে। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা জহিরুদ্দিন মুহাম্মদ বাবর ছিলেন পিতার দিক থেকে চেঙ্গিস খান এবং মাতার দিক হতে তৈমুর লঙ এর বংশধর। মুঘল বংশ প্রাথমিকভাবে তার পূর্ণ নিয়ন্ত্রন ও শক্তি নিয়ে ১৫২৬-১৭০৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ভারতবর্ষে শাসন পরিচালনা করে। পরবর্তীতে ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজদের কাছে বাংলার স্বাধীনতা হারালে পরবর্তী ১০০ বছর ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মুঘল শাসকগণ নামমাত্র শাসক হিসেবে পরিণত হয়।[৩]

মোঘল সম্রাটদের শাসনামলে শরীয়ার অধিকাংশ ধারা কার্যকর ছিল। সম্রাট আকবর ছাড়া অন্য সম্রাটগণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে শরীয়া আইন দ্বারা বিচারকার্য পরিচালনা করতেন।[৪] মুঘল আমলের ফৌজদারি আইন ছিলো ইসলামী ফৌজদারী আইন। কোরআনে অনুসৃত নীতি ছিলো এ আইনের ভিত্তি। ইসলামী শরীয়াহ অনুসরণ করে কুরআনের সাথেসাথে হাদীস এবং প্রয়োজনে ইজমা, কিয়াস অনুসরণ করেও মুঘল আমলের ফৌজদারি আইন পরিচালিত হতো। শরীয়াহ আইন অনুসরণ করে কিসাস, দিয়াত, হুদুদ, তাযীরের ভিত্তিতে অপরাধকে ভাগ করা হতো এবং এর আলোকেই অপরাধীকে শাস্তি প্রদান করা হতো।[৫]

ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসে শূর বংশের রাজত্বকাল (১৫৪০-১৫৫৫ খ্রি.) স্বল্প সময়ের হলেও তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মুঘল বংশের দ্বিতীয় সম্রাট নাসির উদ্দিন মুহম্মদ হুমায়ুন ছিলেন অপেক্ষাকৃত দুর্বল চিত্তের শাসক। ১৫৩৯ খ্রিস্টাব্দে সংঘটিত চৌসার যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার পর হুমায়ুন ১৫৪০ খ্রিস্টাব্দের ১৭ মে ৩০,০০০ সৈন্য নিয়ে কনৌজের সন্নিকটে বিলগ্রাম নামক স্থানে শের শাহের মাত্র ১৫,০০০ সৈন্যের সম্মুখীন হন। কনৌজের যুদ্ধে হুমায়ুন শেরশাহের নিকট অত্যন্ত শোচনীয় ভাবে পরাজিত হন। ফলে জহিরউদ্দিন মুহম্মদ বাবর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ভারতবর্ষে মুঘল বংশের সাময়িক পতন ঘটে। শেরশাহ ভারতবর্ষে শূর শাসন প্রবর্তন করে পুনরায় আফগান আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন।[৬]

---

[১] মুহাম্মদ ছালাহ উদ্দিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪
[২] ড. মো: শফিকুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৬
[৩] অধ্যাপক আবদুল বাছির, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৫
[৪] মুহাম্মদ ছালাহ উদ্দিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫
[৫] ড. মো: শফিকুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৬
[৬] অধ্যাপক আবদুল বাছির, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৫

শেরশাহের সময়ে ধর্মীয় আদালতে বা কাজীর আদালতে ইসলাম ধর্মের নিয়ম-কানুন অনুযায়ী মুসলমানদের মধ্যে ব্যক্তি আইনসংক্রান্ত মামলার বিচার হতো। ধর্মীয় আইন কোন মুসলমান ভঙ্গ করলে কাজী তার বিচারও করতেন। কাজী মুফতিদের সহায়তায় ধর্মীয় আদালতে বিচার করতেন। সাধারণ আদালতে সকল ধর্মের প্রজাদের ইহজাগতিক বিষয়ে মামলা-মোকদ্দমার বিচার করা হতো। শের শাহ পূর্ণাঙ্গভাবে শরীয়া আইনে বিচার প্রতিষ্ঠিত করেননি।[১]

সম্রাট আওরঙ্গজেব (আলমগীর) ইসলামী আইন অনুসারে রাষ্ট্রের সামগ্রিক কর্যক্রম পরিচালনা করতে সচেষ্ট ছিলেন। তার বিচারব্যবস্থাও শরীয়াহ আইন অনুসৃত হতো। ঐতিহাসিক বিবরণে পাওয়া যায় যে, তার শাসনামলে রাজপথে ডাকাতি করা হলে ডাকতকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হতো। জুয়াড়ীকে কারাদণ্ড প্রদান করা হতো। মূদ্রা জালকারীকে তাযীরি শাস্তি প্রদান করা হতো। কেউ ক্ষেতের ফসল চুরি করলে প্রথমে তাকে কারাদণ্ড দেওয়া হতো এবং তিরস্কার করা হতো। বারংবার এই একই অপরাধ করলে তার হাত কেটে দেওয়া হতো। অন্যান্য অপরাধের ক্ষেত্রেও এই নীতি অনুসরণ করা হতো।[২]

১৭শ শতকে সর্বপ্রথম মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেব (আলমগীর) সিংহাসনে আরোহণের চার বছর পর একটি রাজকীয় ফরমানের সাহায্যে ইসলামী আইনের একটি পূর্ণাঙ্গ সংকলন প্রণয়নের নির্দেশ জারি করেন। এ কাজ সফলভাবে সমাধানের জন্য তৎকালীন প্রখ্যাত ভারতীয় ফকীহগণের সমন্বয়ে এবং স্বনামধন্য আলেম নিজামুদ্দীন বোরহানপুরীর সভাপতিত্বে একটি কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটি আইনের একটি সুবৃহৎ সংকলন প্রণয়ন করেন; এর নামকরণ করা হয় ফাতওয়া-ই-আলমগীরী। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় প্রণীত এটিই ইসলামী আইনের সর্বপ্রথম সংকলন। বিচারকার্যে কাজীগণ মুফতী এবং মীর আদিল কর্তৃক সাহায্য প্রাপ্ত হতেন। কুরআন, ফতোয়া-ই-আলমগীরী, সম্রাট জাহাঙ্গীরের প্রণীত দ্বাদশ আইন ইত্যাদি ছিল মোগল যুগের আইনের উৎস। সদর-উস-সুদূর ছিলেন ইসলাম ধর্মীয় ব্যাপারাদি এবং বিচার বিভাগের সর্বোচ্চ ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী।[৩]

ঐতিহাসিক ভি.ডি মহাজন বলেন– This office was filled by persons Who had a very lofty character. Sadar-us- sudur the connecting link between the King and the people. He was the guardian of Islamic law and the spokesman of Ulema. অর্থাৎ যাদের চরিত্র ছিল অত্যন্ত উন্নত তাদের দ্বারা এই পদ পূরণ করা হইত। সদর- উস-সুদুর সম্রাট এবং জনগণের মধ্যে ছিলেন সংযোগ সেতু। তিনি ছিলেন ইসলামী আইনের অভিভাবক এবং ওলামা শ্রেণির প্রবক্তা।[৪]

১৬৭২ খ্রিস্টব্দে আওরঙ্গজেব গুজরাটের গভর্নরের উদ্দেশ্যে একটি ফরমান জারি করেন। পরবর্তীতে ঐতিহাসিকগণ এটিকে আওরঙ্গজেবের দণ্ডবিধি বলে অভিহিত করেছেন। কোন অপরাধীকে কারাগারে প্রেরণের সময় এগুলো প্রযোজ্য হতো।[৫] আওরঙ্গজেবের দণ্ডবিধি প্রণিত হয়েছিলো ইসলামী শরীয়াহ আইনের অনুসরণ করে। ইসলামী শাস্তি আইনের কিসাস, দিয়াত, হুদুদ, তাযীর ছিলো প্রণীত দণ্ডবিধির ভিত্তি। অনেক তাযীরী অরাধের ক্ষেত্রে সম্রাট রাষ্ট্রীয় ভাবে শাস্তি নির্ধারণ করে দিয়েছিলন। এ ক্ষেত্রে প্রথমে হালকা শাস্তি প্রদান ও তিরস্কার করা হতো। কেউ যদি পেশাদার অপরাধীর ন্যায় একই অপরাধ বরংবার করতো তবে তাকে কঠোর শাস্তি দানের বিধান রাখা হয়েছিলো।

---

১ মুহাম্মদ ছালাহ উদ্দিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫
২ ড. মো: শফিকুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৮-৯৯
৩ মুহাম্মদ ছালাহ উদ্দিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪
৪ হাসান আলী চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬২
৫ ড. মো: শফিকুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৮

বাংলাদেশে শরীয়া আইনের ইতিবৃত্ত

বাংলায় মুসলমানদের আগমন কবে শুরু হয় এ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায় না। তবে অধিকাংশ ঐতিহাসিকদের মতে, হিজরী প্রথম শতকেই বাংলায় মুসলমানদের আগমন ঘটে। বাংলায় মুসলমানদের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা লাভ হয়েছিল হিজরী ৬০০ সাল মোতাবেক ১২০৪ খ্রি.। তৎকালীন ভারত সম্রাট কুতুবুদ্দিন আইবেকের (৬০২হি./১২০৬খ্রি.) সময় ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে বখতিয়ার খিলজী ১২০৪ খ্রি. বাংলায় অলৌকিকভাবে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠালাভ করেন।[১]

ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে বখতিয়ার খিলজী কর্তৃক ১২০৪ সনে বাংলা জয় করার পর থেকে ভারতের পশ্চিমাঞ্চল, আফগানিস্তান, ইরান, আরব, তুরস্ক থেকে অসংখ্য মুসলিম বাংলায় আগমন করেন। তখন বাংলার শাসক ছিলেন লক্ষণ সেন। মাত্র ১৭ বা ১৮ জন অশ্বারোহী নিয়ে ইখতিয়ার উদ্দীন মুহম্মদ ইবনে বখতিয়ার খিলজী নদীয়া জয় করেন।[২] এবং শতাব্দীকাল পর ১৩৩০ খ্রি. মুহাম্মদ তুঘলক শাহ পূর্বাঞ্চল জয় করেন এবং সাতগাঁও ও সোনারগাঁওয়ে যথাক্রমে রাজধানী স্থাপন করেন। ইখতিয়ার উদ্দীন মুহম্মদ ইবনে বখতিয়ার খিলজীর বাংলা বিজয়ের পর থেকে ২৩ জুন ১৭৫৭ খ্রি. পলাশী প্রান্তরে মুসলিম শাসনের পতন পর্যন্ত (১২০৩-১৭৫৭খ্রি.) ৫৫৪ বছরে ১০১ জন বা ততোধিক শাসক বাংলায় শাসনকার্য পরিচালনা করেন।[৩]

উপমহাদেশে মুসলিম শাসনের পতন এবং ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি পত্তন ঘটে ১৭৫৭ সনে।[৪] কোম্পানির রাজত্বের প্রথম দিকে কোম্পানির লক্ষ্য ছিলো বিদ্যমান মুসলিম ফৌজদারি আইন ও বিচারব্যবস্থায় যতদূর সম্ভব কম হস্তক্ষেপ করা। সেজন্য ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার পরও ভারতীয় আদালতসমূহে দীর্ঘকাল মুসলিম ফৌজদারি আইন বলবৎ থাকে।[৫] অতঃপর তাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে আইন প্রণয়নের পর ধীরে ধীরে প্রতিটি বিভাগ থেকে ইসলামী আইনের বিলুপ্তি ঘটতে থাকে।[৬] ওয়ারেন হেস্টিংস এবং লর্ড কর্নওয়ালিশ রেগুলেশনের মাধ্যমে মুসলিম ফৌজদারি আইনে বেশ কিছু পরিবর্তন সাধিত হয়। ১৮৬০ সনে দণ্ডবিধি প্রণীত হওয়ার পর মুসলিম ফৌজদারি আইন সম্পূর্ণ রহিত হয়। ১৮৬১ সনের ফৌজদারি কার্যবিধি এবং ১৮৭২ সনের সাক্ষ্য আইন প্রণয়ণের মাধ্যমে ফৌজদারি আইনের ক্ষেত্রে পুরোপুরি ইংরেজ আইনের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।[৭]

তবে আইন প্রণয়নে তারা ব্যাপকভাবে ইসলামী আইনের সহায়তা গ্রহণ করে। এ কারণেই তাদের প্রণীত আইনের মধ্যে ইসলামী আইনের উপাদান ব্যাপকভাবে লক্ষ্য করা যায়। মুসলিম পার্সোনাল ল’ আকারে ইসলামী আইনের কয়েকটি অধ্যায় তারা বলবৎ রাখে।[৮] তারা মুসলিম ব্যক্তিগত ও পারিবারিক আইন পরিবর্তন করার খুব একটা প্রয়োজন বোধ করেনি। যেকারণে ব্রিটিশ আমলেও খুব একটা পরিবর্তন সাধিত হয়নি। তা সত্ত্বেও তারা বিভিন্ন সময়ে এমন এমন কিছু আইন প্রণয়ন করে যা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ইসলামী আইন লংঘন করে।[৯]

---

[১] আব্বাস আলী খান, *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস*, ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১৯৯৪ খ্রি., পৃ. ২৪
[২] অধ্যাপক আবদুল বাছির, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৩
[৩] *প্রাগুক্ত*
[৪] ড. এ কে এম শাহনাওয়াজ ও অন্যান্য, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৭
[৫] ড. মো: শফিকুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪২৫
[৬] মুহাম্মদ ছালাহ উদ্দিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৫-১৩৬
[৭] ড. মো: শফিকুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪২৫
[৮] মুহাম্মদ ছালাহ উদ্দিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৫-১৩৬
[৯] ড. মো: শফিকুর রহমান, ৪২৫

পাকিস্তানি শাসনামলে শরীয়া আইনে বিচার

ভারত পাকিস্তান বিভক্তির অন্যতম প্রধান কারণ ধর্ম। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর দ্বিজাতি তত্ব প্রস্তাবের উপর ভিত্তি করে ১৯৪৭ সনের ১৪ আগস্ট এই উপমহাদেশে পাকিস্তান এবং ১৫ আগস্ট ভারত দুটি পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্র সৃষ্টি হয়। সংখ্যগরিষ্ট মুসলিমদের প্রদান করা হয় পাকিস্তান এবং সংখ্যাগরিষ্ট হিন্দুদের প্রদান করা হয় ভারত।

১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দের সংবিধান

পাকিস্তান শাসনামলে বিভিন্ন আইনে ইসলামী শরীয়াত অনুসরণ লক্ষ্য করা যায়। পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রথম সংবিধান প্রণয়ন করে ১৯৫৬ সনে। এ সংবিধানে পাকিস্তান রাষ্ট্রকে ইসলামী প্রজাতন্ত্র হিসেবে ঘোষণা করা হয়। পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর পরিপন্থী কোন আইন গৃহীত হবে না বলে উল্লেখ করা হয়।[১]

সংবিধানের প্রস্তাবনায় ইসলামে নির্দেশিত সাম্য, স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, সহনশীলতা ও সামাজিক সুবিচারের নীতি অনুসৃত হয়। পাকিস্তান একটি ইসলামিক সমাজ ব্যবস্থা গঠনের উদ্দেশ্যে ইসলামিক গবেষণাগার এবং ইসলামিক উপদেষ্টা কাউন্সিল গঠনের ব্যবস্থা করা হয়। পাকিস্তানের রাষ্ট্রপ্রধান একজন মুসলমান হবেন এবং ইসলামের বিশ্বভ্রাতৃত্ব মেনে চলা হবে বলেও সংবিধানে উল্লেখ করা হয়।[২]

১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দের সংবিধানে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচার বিভাগের প্রাধান্য স্বীকৃত হয়েছিল। আইন ও শাসন বিভাগ হতে বিচার বিভাগকে পৃথক রাখা হয় এবং এর উপর কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের বিরোধ মীমাংসা ও সংবিধানের ব্যাখ্যা প্রদান করার ক্ষমতা দেয়া হয়।[৩]

১৯৬২ সনে আইয়ুব খান নতুন সংবিধান প্রণয়ন করেন। এ সংবিধানেও পাকিস্তান রাষ্ট্রকে ইসলামী প্রজাতন্ত্র হিসেবে ঘোষণা করা হয়। পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর পরিপন্থী কোন আইন গৃহীত হবে না বলে উল্লেখ করা হয়। আইন প্রণয়ন করতে গিয়ে যাতে কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী কোনো আইন প্রণীত না হয় সে লক্ষ্যে এ সম্বন্ধে পরামর্শ দানের জন্য আলেম সমাজ নিয়ে একটি পরামর্শ সভা গঠনের বিধান করা হয়।[৪]

১৯৬২ সনে প্রণীত সংবিধানে শাসন বিভাগ থেকে বিচার বিভাগকে পৃথক করার বিধান করা হয়। নিম্ন আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপিল দায়েরের বিধান করা হয়। অধীনস্থ আদালতসমূহের তত্ত্বাবধানেও হাইকোর্টে আপিল দায়েরের বিধান করা হয়। অধীনস্থ আদালতসমূহের তত্ত্বাবধানেরও হাইকোর্টকে ক্ষমতা দেয়া হয়।[৫]

ব্রিটিশ শাসনাধীন উপমহাদেশে ব্রিটিশদের নিজস্ব ধ্যান-ধারণার আইন প্রবর্তিত হয়ে পাকিস্তান আমল, এমনকি স্বাধীন বাংলাদেশেও প্রায় অপরির্তিত আকারে প্রচলিত আছে। তবে ব্রিটিশ আইন প্রণেতাগণ ভারতীয় সংস্কৃতি, প্রথা তাদের

---

[১] ড. হারুন-অর-রশীদ, *বাংলাদেশ : রাজনীতি সরকার ও শাসনতান্ত্রিক উন্নয়ন ১৭৫৭-২০০০*, নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা : ২০১৪, পৃ. ২০৫

[২] মুহাম্মদ ছালাহ উদ্দিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৩

[৩] মুহাম্মদ ছালাহ উদ্দিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৩

[৪] অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, নাজমুল ইসলাম, *বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান*, রোদেলা প্রকাশনী, ঢাকা : ২০২০, পৃ. ১০৭

[৫] মুহাম্মদ ছালাহ উদ্দিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৩

শাসন ক্ষমতা লাভের পূর্বে ভারতবর্ষে প্রচলিত ইসলামী আইন-কানুন একেবারে বিসর্জন দিতে পারেনি; বরং ব্রিটিশদেও প্রবর্তিত আইনকেও তা প্রভাবিত করেছে এবং উপমহাদেশের ব্রিটিশ প্রবর্তিত আইন ইসলামী আইন-কানুনের ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে আছে।[১]

স্যার জর্জ ক্যামবেল তাঁর মডার্ন ইন্ডিয়া গ্রন্থে উল্লেখ করেন : "আমাদের ফৌজদারি আইনের ভিত্তি এখনো মোহামেডান কোড; তবে আমাদের রেগুলেশন দ্বারা এতে এতোটা পরিবর্তন ও সংযুক্তি ঘটেছে যা খুব কমক্ষেত্রে স্বীকার করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এর ব্যবহার, ক্রমাগত সংশোধন দ্বারা আমাদের নিজস্ব ধারা হিসেবে এর উত্থান ঘটেছে। এরুপ পরিবর্তনের ধারায় মূল মুসলিম আইন এবং মুসলমান আইনবিদদের পরামর্শ প্রকৃতপক্ষে খুবই কমক্ষেত্রে নেয়া হয়েছে। এখনো অদৃশ্যমান কাঠামোটি যার উপর পুরো অবকাঠামোটি নির্ভর করছে, তা মুসলিম আইন থেকে প্রত্যাহার করা হলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে উপযুক্ত সঙ্গ খুঁজে পাওয়া দুরুহ হবে অথবা অনেক সাধারণ অপরাধের শাস্তির নির্ভরযোগ্য ভিত্তি থাকবে না।[২]

স্বাধীন বাংলাদেশে শরীয়া আইন

১৯৭১ সনের ২৬ মার্চ স্বাধীনতা ঘোষিত হয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণাকে অনুমোদন ও কার্যকর করার লক্ষ্যে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে ১৯৭১ সনের ১১ এপ্রিল মুজিব নগর থেকে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র জারি করে ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ২৬ মার্চ থেকে সাবেক পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন ও সার্বভৌম গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ বলে ঘোষণা করা হয় এবং একই তারিখে ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে Laws Continuance Enforcement Order জারী করে বিধান করা হয় যে, ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ২৬ মার্চ পূর্ব পাকিস্তানে প্রচলিত সকল আইন চালু থাকবে।[৩]

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরও পাকিস্তান আমলের বিচারব্যবস্থা ১৯৭২ সন পর্যন্ত চালু থাকে। পরবর্তীতে দীর্ঘ ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন-সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের আবির্ভাব।[৪] বংলাদেশে প্রথম সংবিধান প্রণীত হয় ১৯৭২ সনে।[৫] এ সময়ে এসেও পূর্ব থেকে বলবৎ থাকা শরীয়া আইনের পাশাপাশি কতিপয় আইন প্রণয়ন ও পুরাতন আইনের সংশোধন করা হয়। এভাবে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশে শরীয়া আইনকে স্পর্শ করে নানা বিধান প্রবর্তিত হয়।[৬]

---

[১] মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান, *ইসলামিক জুরিসপ্রুডেন্স ও মুসলিম আইন*, ঢাকা : আমিন ল' বুক সেন্টার, ২০১০, পৃ. ২৪৮-২৫০

[২] এম পি জৈন, *আউটলাইন্স অব ইন্ডিয়ান লিগ্যাল হিস্টরী*, নিউ দিল্লী : মানোহার পাবলিশার্স, ১৯৯৩, পৃ. ৩৮৪

[৩] মুহাম্মদ ছালাহ উদ্দিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৪-১৪৫

[৪] *প্রাগুক্ত*

[৫] অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, নাজমুল ইসলাম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২২

[৬] মুহাম্মদ ছালাহ উদ্দিন, *প্রাগুক্ত*

চতুর্থ অধ্যায়

ইয়াহুদী ধর্ম ও ইয়াহুদী ধর্মের শাস্তি আইন

প্রথম পরিচ্ছেদ : ইয়াহুদী ধর্ম পরিচিতি

পৃথিবীর প্রাচীন ধর্মসমূহের একটি ইয়াহুদী ধর্ম। এটি প্রধান সেমিটিক ধর্মের একটি। মহান আল্লাহ তায়ালা হযরত মূসা (আ)-এর উপর ঐশীবাণীসহ যে কিতাব নাযিল করেছিলেন তার অনুসারীগণ ইয়াহুদী ধর্মের অনুসারী হিসেবে ইতিহাসে পরিচিত। গবেষকরা মনে করেন, বর্তমানে প্রচলিত ইয়াহুদী ধর্ম প্রকৃত ইয়াহুদী ধর্মের নীতি, আদর্শ, চেতনা ও বিশ্বাস থেকে সরে এসেছে। যুগে যুগে ইয়াহুদীগণ নানা পরিবর্তনের স্বীকার হয়ে বর্তমান অবস্থায়ে উপণীত হয়েছে। নিম্নে ইয়াহুদীদের ধর্মের পরিচয় ও উৎপত্তির ইতিহাস সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো।

ইয়াহুদী পরিচিতি

সংক্ষেপে প্রাচীন হিব্রু জাতির এবং এর উত্তর পুরুষদের অনুসৃত ধর্মচর্চা ও এক ঈশ্বরকেন্দ্রিক বিশ্বাসকে ইয়াহুদী ধর্ম বলা হয়।[১] 'ইয়াহুদ' শব্দ দ্বারা ইয়াহুদী জাতিকে বোঝানো হয়। মূলত তারা বনি ইসরাঈলের বংশধর। পবিত্র কুরআনের অন্তত নয় স্থানে ইয়াহুদী শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। ইয়াহুদী জাতির নামকরণ কেনো ইয়াহুদী করা হয়েছে এনিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে।

একদল মনে করেন, বনি ইসরাঈলের এক গোত্রের প্রধান ছিলো ইয়াহুদা নামে এক ব্যক্তি। ধারণা করা হয় তিনি হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর চতুর্থ পুত্র ছিলেন। হযরত ইউসূফ (আ.) কে কূয়ায় ফেলে হত্যা চেষ্টায় তার জোরালো ভূমিকা ছিলো বলে একাধিক বর্ণনায় পাওয়া যায়। 'ইয়াহুদা' ব্যক্তির নামনুসারেই ইয়াহুদী জাতির নামকরণ করা হয়েছে।[২]

অপর একদল মনে করেন, ইয়াহুদী ধর্মের অনুসারীগণ হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর বংশধর। বাইবেলে ইয়াকূব (আ.)-এর নাম উল্লেখ করা হয়েছে জ্যাকব। তার এক নাম ইসরাঈল। এজন্য ইয়াহুদী ধর্মের অনুসারীগণ ইসরাঈলী নামেও পরিচিত।[৩]

মহান আল্লাহ তায়ালা যুগে যুগে মানবজাতির হিদায়াতের জন্য তাঁর রাসূলগণের প্রতি আসমানি কিতাব নাযিল করেছেন। পূর্ববর্তী নবীদের উপর অবতীর্ণ আসমানী গ্রন্থের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা প্রত্যেক মুমিন-মুসলমানের আবশ্যক কর্তব্য। মহান আল্লাহ বলেন, আর যারা ঈমান আনে তাতে, যা আপনার এবং আপনার পূর্ববর্তীদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে।[৪]

হযরত মূসা (আ) মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে তাওরাত কিতাবপ্রাপ্ত হন। তিনি তার জাতিকে কিতাব অনুযায়ী জীবন পরিচালনার দাওয়াত দিয়ে তাদেরকে হিদায়াত করেছিলেন। তাই, তার অনুসারীদেরকে আহলে কিতাব বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। পরবর্তীতে হযরত মূসা (আ)-এর ইন্তিকালের পর তারা নিজেদেরকে "ইয়াহুদী" বলে দাবি করে।

---

[১] ড. মোঃ শাজাহান কবির, *বিশ্বের ধর্ম পরিচিতি*, ঢাকা: দিক দিগন্ত, ২০১৪, পৃ. ৩৯
[২] মুহাম্মদ আলী আস সাবুনী, *আল আম্বিয়া আন নাবুয়াহ*, মক্কা : ১৯৮০, পৃ. ২১৭
[৩] ড. মোঃ ইব্রাহীম খলিল, *বিশ্বের প্রধান প্রধান ধর্ম*, ঢাকা : মেরিট ফেয়ার প্রকাশনা, ২০১৯, পৃ. ১৭০
[৪] আল কুরআন, ২ : ৪

কোনো কোনো গবেষকের মতে, ৬০৮ খ্রিস্টপূর্বাব্দে ব্যাবিলন সম্রাট 'বখতে নসরের' হাতে যখন ইয়াহুদ ও ইসরাঈল রাষ্ট্রের পতন ঘটে এবং পরবর্তীতে সম্রাট কুরস ব্যাবিলন দখল করেন, তখন বনি ইসরাঈলীদেরকে ইয়াহুদী বলে ডাকতেন। তাদের ধর্ম-বিশ্বাসকে কুরস এক পর্যায়ে 'ইয়াহুদীবাদ' হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করেন।[১]

ইয়াহুদীদের ধর্মীয় বিশ্বাস

ইয়াহুদীদের আকিদা বা বিশ্বাস ইয়াহুদী ধর্ম প্রধান সেমিটিক ধর্মসমূহের অন্যতম। এর অনুসারীদেরকে ইয়াহুদী নামে অভিহিত করা হয়। নিজেদেরকে তারা মূসা (আ)-এর প্রচারিত ধর্মে বিশ্বাসী বলে দাবি করে। নিম্নে তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস সম্পর্কে আলোচনা তুলে ধরা হলো-

১. তারা নিজেদেরকে কিতাবের অনুসারী বলে বিশ্বাস করে থাকে।

২. কর্মবাদ

ইয়াহুদীরা কর্মবাদে বিশ্বাসী। তারা বিশ্বাস করে যে মানুষ তার কর্মের ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বাধীন ও দায়ী। অনেক ক্ষেত্রে তারা কর্মবাদকে ঈমানের উপরে স্থান দেয়।[২]

৩. ধর্ম প্রবর্তকে বিশ্বাসী

ইয়াহুদীরা ঈশ্বর কর্তৃক প্রেরিত মহাপুরুষদের আগমনে বিশ্বাসী। যুগে যুগে মানবজাতিকে সৎপথ দেখানোর জন্য ঈশ্বর যে সকল মহামানব প্রেরণ করেছেন তা এ ধর্ম বিশ্বাস করে।

৪. প্রত্যাদেশে বিশ্বাসী

ইয়াহুদী ধর্ম ঈশ্বর কর্তৃক প্রেরিত তত্ত্বে তথা নবীদের নিকট প্রেরিত প্রত্যাদেশে বিশ্বাসী। এ ধর্ম মনে করে যে প্রত্যাদেশ ইলাহ কর্তৃক প্রেরিত। Old Testament-এ বলা হয়েছে, 'প্রেরিত পুরুষগণ সত্য। তাদের বাণীও সত্য এবং অবশ্য পালনীয়। তারা সাধারণ মানুষ থেকে স্বতন্ত্র গুণাবলির অধিকারী।' প্রভুর আদেশ ও বাণী প্রচারের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে বাইবেলে। বাইবেলে বর্ণিত হয়েছে,

And these words, which I command thee this day, shall be in thine heart: And thou shalt teach them diligently unto thy children, and shalt talk of them when thou sittest in thine house, and when thou walkest by the way, and when thou liest down, and when thou risest up. And thou shalt bind them for a sign upon thine hand, and they shall be as frontlets between thine eyes.[৩]

আজ আমি তোমাদের যে আদেশগুলি দিলাম সেগুলো তোমরা সবসময় মনে রাখবে। তোমাদের সন্তানদেরও ঐগুলো শেখানোর ব্যাপারে নিশ্চিত থাকবে। যখন তোমরা বাড়ীতে বসে থাকো এবং যখন তোমরা রাস্তায় হাঁট সেই সময় তোমরা এই সকল

---

[১] ড. মো. আবুল কালাম পাটোয়ারী, *ইয়াহুদী জাতির অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ*, আব্দুল্লাহ সায়েম প্রকাশিত, কুষ্টিয়াঃ তাবি, পৃ. ৩

[২] ডঃ মাযহার উদ্দীন সিদ্দীকী, *ইসলাম ও অন্যান্য ধর্ম*, ঢাকা : ইফাবা, ১৯৯১, পৃ. ৫২

[৩] Deuteronomy 6 : 6-8

বিধিগুলো নিয়ে আলোচনা করবে। যখন তোমরা শুয়ে থাক এবং যখন তোমরা ঘুম থেকে ওঠো সেই সময় ঐগুলো নিয়ে আলোচনা করবে। এই আজ্ঞাগুলি মনে রাখার সুবিধার জন্য সেগুলিকে তোমাদের হাতে এবং কপালে বেঁধে রাখো।

৬. জান্নাত-জাহান্নামের বিশ্বাসী

ইয়াহুদীরা স্বর্গ-নরকে বিশ্বাস করে। এ ধর্ম মতে শেষ বিচারের দিন আত্মা পুনরায় জীবিত হবে এবং জগতের পাপ-পুণ্যের কর্মের ফলাফল অনুযায়ী স্বর্গ বা নরকে যেতে হবে বলে বিশ্বাস করে। বাইবেলে স্বর্গের মালিক ঈশ্বর বলে ঘোষণা করা হয়েছে। বাইবেলে বর্ণিত হয়েছে, To keep the commandments of the LORD, and his statutes, which I command thee this day for thy good? Behold, the heaven and the heaven of heavens is the LORD's thy God, the earth also, with all that therein is.[১]

সেই কারণে আমি আজ তোমাদের যেগুলো দিচ্ছি সেই বিধিসমূহ এবং আজ্ঞাসমুহ তোমরা মেনে চলো। তোমাদের ভালোর জন্যই এই নিয়মাবলী এবং আজ্ঞাসমুহ। “দেখ, সমস্ত কিছুই প্রভু তোমাদের ঈশ্বরের। স্বর্গ এবং উচ্চতম স্বর্গ, পৃথিবী এবং তার ওপরের সমস্ত কিছুই প্রভু তোমাদের ঈশ্বরের।

৭. মূর্তি পূজার বিরোধী

এ ধর্ম আল্লাহ বা ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসী তাই তারা মূর্তি পূজার বিরোধী। এ ধর্মে একক ঈশ্বরে বিশ্বাস করা হয়। বাইবেলে বর্ণিত হয়েছে, I am the LORD, and there is none else, there is no God beside me.[২] অর্থাৎ, আমিই প্রভু। আমিই একমাত্র ঈশ্বর। আর কোন ঈশ্বর নেই।

অন্যত্র বলা হয়েছে, And now, Israel, what doth the LORD thy God require of thee, but to fear the LORD thy God, to walk in all his ways, and to love him, and to serve the LORD thy God with all thy heart and with all thy soul.[৩]

“এখন হে ইস্রায়েলের লোকরা, শোনো! প্রভু, তোমাদের ঈশ্বর, প্রকৃতই তোমাদের কাছে থেকে কি আশা করেন? ঈশ্বর চান যে তোমরা তাঁকে শ্রদ্ধা করবে এবং তিনি যা বলেন সেটা করবে। ঈশ্বর চান যে তোমরা তাঁকে ভালোবাসবে এবং তোমাদের সমস্ত হৃদয় এবং সমস্ত আত্মা দিয়ে তাঁর সেবা করবে।

৮. কঠোরপন্থি

ইয়াহুদী ধর্ম অত্যন্ত কঠোর ও গোড়া ধর্ম। এই ধর্ম থেকে একবার কেউ ধর্মান্তরিত হলে পরবর্তীতে আর কেউ উক্ত ধর্মে প্রত্যাবর্তন করতে পারে না।

৯. নৈতিকতায় বিশ্বাসী

এ ধর্মে জীবন চলার পথের বহু দিক নিয়ে আলোচনা করে। তার মধ্যে নৈতিকতা অন্যতম।

---

[১] Deuteronomy 10 :13-14
[২] Isaiah 45 : 5
[৩] Deuteronomy 10 : 12

১০. ইয়াহুদী ধর্ম একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী

এ ধর্ম মতে ঈশ্বর এক। এ ধর্মে মহান সৃষ্টিকর্তা এক ও একক এই বিশ্বাস সুদৃঢ়ভাবে পোষণ করা হয়।[১] বাইবেলের "ইসাইয়াহ" অধ্যায়ে বলা হয়েছে, I am the LORD, and there is none else, there is no God beside me: I girded thee, though thou hast not known me: That they may know from the rising of the sun, and from the west, that there is none beside me. I am the LORD, and there is none else. I form the light, and create darkness: I make peace, and create evil: I the LORD do all these things.[২]

আমিই প্রভু। আমিই একমাত্র ঈশ্বর। আর কোন ঈশ্বর নেই। আমি তোমাকে কাপড় পরাব। কিন্তু এখনও তুমি আমাকে জানতে পারলে না! আমি এই সব করি, যাতে লোকে জানবে যে আমিই একমাত্র ঈশ্বর। পূর্ব থেকে পশ্চিম, সব লোকরা জানবে যে আমিই প্রভু। আর কোন ঈশ্বর নেই। আমি আলোর সৃষ্টিকর্তা, সৃষ্টিকর্তা অন্ধকারেরও। আমি শান্তি সৃষ্টি করি, আমি সংকটসমূহ তৈরী করি। আমিই প্রভু, আমি এই সব কিছু করি।

১১ জন্মগত পবিত্রতায় বিশ্বাসী

ইয়াহুদীদের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিশ্বাস, মহান সৃষ্টিকর্তা তাদের ক্ষমতা, ঐশ্বর্য ও সম্মানের জন্য সৃষ্টি করেছেন। বনী ইসরাঈলের সাথে তাদের বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে বলেও তারা বিশ্বাস করেন।[৩]

১২. সরল ধর্মে বিশ্বাসী

তাদের মতে, শুদ্ধ বিশ্বাসের চেয়ে মুগ্ধ চরিত্রই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তাদের ধর্মগ্রন্থ তালমুদে বলা হয়েছে, প্রত্যেক সৎ লোকেরই স্বর্গ সুনিশ্চিত। যারা নৈতিক আইন সমূহ মেনে চলে, তারা উচ্চ পুরোহিতের সমতুল্য। এই ধর্মে ভাব প্রবণতা নেই। এই ধর্মের ধর্মাবলম্বীরা মূসা (আ.) প্রবর্তিত বিধি-ব্যবস্থা মেনে চলে।

১৩. পুনরুত্থানে বিশ্বাসী

ইয়াহুদী ধর্ম দৈহিক পুনরুত্থানে বিশ্বাসী। তাদের মতে, শেষ বিচারের দিনে দৈহিক আত্মার বিচার হবে। তারা মনে প্রাণে বিশ্বাস করে যে, তারা ঈশ্বরের প্রিয়জন। যেহেতু ঈশ্বর বিশ্বাসীকে ভালোবাসেন। তদুপরি তিনি তাদের কর্মের ফলও দিয়ে থাকেন। মৃত্যুর পর সকল মানুষ বিচারের সম্মুখীন হবে বলে ইয়াহুদীদের দৃঢ় বিশ্বাস।[৪]

---

[১] ড. মোঃ ইব্রাহীম খলিল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭৭
[২] Isaiah 45 : 5-7
[৩] ডঃ মাযহার উদ্দীন সিদ্দীকী, *প্রাগুক্ত*
[৪] ড. মোঃ ইব্রাহীম খলিল, *প্রাগুক্ত*

ইয়াহুদী ধর্মের বৈশিষ্ট্যসমূহ

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, ইয়াহুদী ধর্ম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা এই ধর্মের মাধ্যমেই সর্বপ্রথম পৃথিবীতে আল্লাহর একত্ববাদ প্রচারিত হয়েছিল । হযরত ইব্রাহিম (আ) আল্লাহর একত্ববাদ সম্পর্কে যে মতবাদ প্রচার করে গিয়েছিলেন পরবর্তীতে ক্রমবিকাশের ধারায় তা হযরত মূসা (আ) প্রবর্তিত ধর্মই ইয়াহুদী ধর্ম নামে পরিচিত। এই ধর্মের মূলগ্রন্থ হচ্ছে তাওরাত। এই গ্রন্থ হযরত মূসা (আ)-এর উপর তুর পর্বতে দীর্ঘ ৪০ দিন ধরে অবতীর্ণ হয়েছিল।

এই ভূমণ্ডলে যত ধর্ম অবতীর্ণ হয়েছে প্রত্যেকটির স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়; ইয়াহুদী ধর্ম এর ব্যতিক্রম নয়। তারও নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও রীতিনীতি আছে। নিম্নে এ সম্পর্কে বর্ণিত হলো :

১. একত্ববাদে বিশ্বাস

ইয়াহুদী ধর্ম মূলত একত্ববাদে বিশ্বাস করে, তাই তা একেশ্বরবাদী ধর্মী ।[১] কেননা এটি প্রত্যাদিষ্ট ধর্ম। এ ধর্মের জীবন, সমাজ, রাষ্ট্র সবকিছুতেই আল্লাহর একাত্ববাদ স্বীকৃত। চারিত্রিক উৎকর্ষতা সাধনের জন্য এ ধর্মের দুটি পথ অনুকরণীয়। প্রথমত মানুষের মনে করতে হবে যে, সে আল্লাহর বান্দা এবং দ্বিতীয়ত তার উদ্দেশ্য থাকবে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন। একাত্ববাদ সম্পর্কে বাইবেলে বর্ণিত হয়েছে, Hear, O Israel: The LORD our God is one LORD: And thou shalt love the LORD thy God with all thine heart, and with all thy soul, and with all thy might.[২]

"ইস্রায়েলের লোকরা শোনো! প্রভু, আমাদের ঈশ্বর হলেন একমাত্র প্রভু! তোমরা নিশ্চয়ই প্রভু, তোমাদের ঈশ্বরকে তোমাদের সমস্ত হৃদয়, সমস্ত প্রাণ এবং তোমাদের সমস্ত শক্তি দিয়ে ভালোবাসবে।

২. ইচ্ছার স্বাধীনতা

ইচ্ছার স্বাধীনতা ইয়াহুদী ধর্মের মানুষের মধ্যে বিদ্যমান । কোনো কাজ করতে কাউকে বাধ্য করা হয় নি। ইচ্ছা করলে মানুষ সফলকাম বা বিপদগামী হতে পারে।[৩] এ সম্পর্কে তাওরাতে আছে- "আল্লাহ সমস্ত কার্যাবলি সম্পর্কে অবগত। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। আল্লাহ সৃষ্টির প্রতিটি বস্তুর সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জ্ঞাত।"

৩. পুনরুত্থান দিবসে বিশ্বাস

ইয়াহুদী ধর্মের মূল ধর্মীয় বিশ্বাসের একটি হলো পুনরুত্থান দিবসে বিশ্বাস। এ ধর্মানুসারীরা বিশ্বাস করে যে, মানুষ তার ইহকালের কৃতকর্মের ফল লাভের জন্য পুনরায় জীবন লাভ করবে।

৪. নবী ও রাসূল সম্পর্ক

ইয়াহুদী ধর্মে একথা স্বীকৃত যে, প্রত্যেক মহাপুরুষই আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত এবং তার আল্লাহর বাণী প্রচার করেন। সুতরাং তাদের আদেশ-নিষেধ অনুকরণীয় এবং তারা অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। তাওরাত সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, "প্রেরিত মহাপুরুষ তথা নবী-রাসূলগণ সত্য। তাদের প্রচারিত বাণী সত্য এবং অবশ্য পালনীয়। তাঁরা সাধারণ সৃষ্টি থেকে স্বতন্ত্র গুণাবলির

---

[১] ডঃ মাযহার উদ্দীন সিদ্দীকী, *প্রাগুক্ত*

[২] Deuteronomy 6: 4-5

[৩] ড. মোঃ ইব্রাহীম খলিল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭৮

অধিকারী। ইয়াহুদী ধর্ম গ্রন্থে ইবরাহীম (আ.), মূসা (আ.), দাউদ (আ.), সোলায়মান (আ.)-এর জীবনেতিহাস বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। ইব্রাহীম (আ.) সম্পর্কে বাইবেলে বর্ণিত হয়েছে,

And Abraham took Ishmael his son, and all that were born in his house, and all that were bought with his money, every male among the men of Abraham's house; and circumcised the flesh of their foreskin in the selfsame day, as God had said unto him.[১]

ঈশ্বর অব্রাহামকে পরিবারের সমস্ত পুরুষ ও বালকের সুন্নতের কথা বলেছিলেন। সুতরাং অব্রাহাম ইশ্মায়েল (Ishmael) এবং তাঁর গৃহে জন্ম হয়েছে এমন সমস্ত দাসদের একত্রে সমবেত করলেন। যাদের অর্থ দিয়ে ক্রয় করা হয়েছিল, সেই ক্রীতদাসদেরও তিনি সমবেত করলেন। অব্রাহামের বাড়ীর প্রত্যেক পুরুষ ও বালককে একত্র করা হল। এবং প্রত্যেককে সুন্নত করা হল। তাদের সকলকে একই দিনে সুন্নত করা হল।

৫. সুদপ্রথা

ইয়াহুদী ধর্মে সুদ সম্পূর্ণ অবৈধ। কিন্তু এ নিষেধাজ্ঞা শুধু ইয়াহুদীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ । অর্থাৎ এক ইয়াহুদী অন্য ইয়াহুদীর কাছ থেকে অন্য কোনো প্রকার সুদ গ্রহণ করতে পারবে না। কিন্তু অন্যান্য ধর্মাবলম্বীর কাছ থেকে পারবে।[২]

৬. সেবাধর্মী

ইয়াহুদী ধর্ম একটি সেবাধর্মী ধর্ম। এ ধর্মে সৃষ্টির সেবা, বিশেষত মানব সেবার প্রতি বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। ইয়াহুদীদের ধর্মগ্রন্থে এ বিষয়ক নির্দেশনা রয়েছে।

৭. ন্যায়বাদী ধর্ম

সকল মানুষকেই ন্যায়পরায়ণ হতে ইয়াহুদী ধর্মে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সততা, কর্তব্যপরায়ণতা, ন্যায়পরায়ণতা আবশ্যকীয় মানবীয় গুণাবলি হিসেবে ইয়াহুদী ধর্মে স্বীকৃত।

৮. সংসারবাদী ধর্ম

ইয়াহুদী ধর্মে বৈরাগ্যবাদকে স্বীকৃতি দেয় না। বরং সংসার ও এর সংশ্লিষ্ট সকল দায়িত্ব পালনের নির্দেশ এ ধর্মের ধর্মীয় গ্রন্থে প্রদান করা হয়েছে।

ইহুদী ধর্ম পৃথিবীর প্রাচীন ধর্মসমূহের একটি। ইসলাম ধর্মের অনেক মৌলিক বিষয়ের স্বীকৃতি এ ধর্মে রয়েছে। এ ধর্মের ধর্মীয়গ্রন্থ বাইবেল ওল্ড টেস্টামেন্ট বা তাওরাতে মহান আল্লাহকে এক ও অদ্বিতীয় খোদা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। নবী-রাসূল, মৃত্যু পরবর্তী জীবন ইত্যাদি বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন এ ধর্মের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

---

[১] Genesis 17:23
[২] ড. মোঃ ইব্রাহীম খলিল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭৮

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : ইয়াহুদী ধর্মের শাস্তি আইন

মদ্যপান

মদ্যপান মানুষের মানসিক এবং শারীরিক মারাত্মক ক্ষতির কারণ। মাদক গ্রহণের ফলে মানুষের মস্তিষ্ক ক্রমেই দুর্বল হয়ে পড়ে। শরীরে লিভার নষ্ট হওয়াসহ নানাবিধ রোগ বাসা বাধে। মাদক সেবন মানুষকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়। মানুষের স্বাভাবিক কর্মক্ষমতাও মাদক সেবনের ফলে নষ্ট হয়ে যায়। ইয়াহুদী ধর্মে বারংবার মাদক গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ইয়াহুদী ধর্মীয় গ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে মাদকের ক্ষতিকর দিক তুলে ধরা হয়েছে। মাদকাসক্ত ব্যক্তির সঙ্গ ত্যাগের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

মাদক যেমনিভাবে ব্যক্তির জীবনে খারাপ প্রভাব ফেলে, অনুরূপভাবে পারিবারিক জীবনে, সমাজ জীবনেও রয়েছে এর মারাত্মক ক্ষতিকর প্রভাব। মাদক মানুষের মস্তিষ্ককে অকেজো করে দেয়, অতিরিক্ত গ্রহণের ফলে মতিভ্রম ঘটে মানুষের। কোনটা ন্যায় আর কোনটা অন্যায় এ সম্পর্কে সাধারণ ধারণাও মানুষের থাকে না। ফলে মানুষ নিজের অজান্তেই নানা রকম অপরাধে জড়িয়ে পড়ে। ফলে সমাজে সৃষ্টি হয় দাঙ্গা-ফাসাদ, বিশৃঙ্খলা। এ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে,

Who has woe? Who has sorrow? Who has strife? Who has complaining? Who has wounds without cause? Who has redness of eyes? Those who tarry long over wine; those who go to try mixed wine. Do not look at wine when it is red, when it sparkles in the cup and goes down smoothly. In the end it bites like a serpent and stings like an adder. Your eyes will see strange things, and your heart utter perverse things. ...[১]

অর্থাৎ, যারা অতিরিক্ত দ্রাক্ষারস পান করে এবং জোরালো পানীয় গ্রহণ করে তাদের পক্ষে খুব খারাপ হবে। তারা যখন তখন মারদাঙ্গা এবং বিবাদে জড়িয়ে পড়ে; তাদের চোখ লাল হয়ে ওঠে, যেখানে সেখানে হোঁচট খায় এবং নিজেদের আঘাত করে। তারা এই সমস্যাগুলোকে এড়াতে পারে না! তারাই যারা সুরাপানে আসক্ত, যারা মিশ্রিত সুরা ভর্তি বাটির দিকে যায়। সুতরাং দ্রাক্ষারসের ব্যাপারে সতর্ক থেকো। লাল দ্রাক্ষারস হয়ত দেখতে প্রলুব্ধকর; সেটা পেয়ালার মধ্যে ঝকমক করে। তুমি যখন সেটা পান কর তখন তা সুন্দর ভাবে গলা দিয়ে নীচে নামে। কিন্তু শেষে তা সাপের মতো ছোবল মারে। দ্রাক্ষারস পান করলে তুমি চোখে অদ্ভুত সব জিনিস দেখবে। তোমার মস্তিষ্ক বিভ্রান্ত হয়ে পড়বে। যখন তুমি শুয়ে পড়বে তখন তোমার মনে হবে যেন তুমি উত্তাল সমুদ্রের ওপর শুয়ে আছো। মনে হবে জাহাজের ওপর শুয়ে রয়েছো। তুমি বলবে, তারা আমাকে আঘাত করেছে কিন্তু আমি অনুভব করি নি। তারা আমাকে মেরেছে কিন্তু আমি তা মনে রাখি নি। এখন আর আমি জেগে উঠতে পারব না। আমি আরো একটি পানীয় চাই।

---

[১] Proverbs 23 : 29-35

মাদকের অভ্যাস সাধারণত নিজ থেকে গড়ে ওঠে না। বরং সঙ্গীদের কাছ থেকেই মানুষ মাদক গ্রহণের অভ্যাসে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। যে কারণে ইয়াহুদী ধর্মে মদ্যপ ব্যক্তিকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতে বারণ করা হয়েছে। বাইবেলে বর্ণিত হয়েছে,

Be not among winebibbers; among riotous eaters of flesh.[১] অর্থাৎ, পেটুক এবং মদ্যপ ব্যক্তির সঙ্গে বন্ধুত্ব কোরো না।

অতিরিক্ত মদপান মানুষকে ক্রমেই অকর্মণ্য করে ফেলে। ফলে মানুষ কাজ করার ক্ষমতা হরিয়ে উপার্জন করা বন্ধ করে দেয়। সংসারে নেমে আসে দরিদ্রতা, নেমে আসে অশান্তি। এই অশান্তি ও দরিদ্রতা থেকে বাঁচতে ইয়াহুদী ধর্মে মাদক গ্রহণ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বাইবেলে বর্ণিত হয়েছে, For the drunkard and the glutton shall come to poverty: and drowsiness shall clothe a man with rags.[২]

অর্থাৎ, যে অতিরিক্ত খাবার খায় এবং দ্রাক্ষারস পান করে সে দরিদ্রে পরিণত হবে। তারা খায়-দায় আর ঘুমোয় এবং শীঘ্রই তাদের যাবতীয় কিছু খোয়া যায়।

সব ধর্মই মানুষকে পবিত্র খাবর গ্রহণের নির্দেশ দেয়, যদিও পবিত্রতার সংজ্ঞা সব ধর্মে এক নয়। ইয়াহুদী ধর্ম মতে মাদক হচ্ছে অশুচি অর্থাৎ অপবিত্র খাবারসমূহের একটি। এই অপবিত্র বস্তু গ্রহণ করা কোনো মানুষের পক্ষে কখনোই উচিত নয়। ইয়াহুদী ধর্মে আরও বলা হয়েছে, কেউ যদি ধর্মীয় পবিত্র স্থানে এসব অপবিত্র বস্তু গ্রহণ করা তাহলে সে অবশ্যই মারা পড়বে। বাইবেলে বর্ণিত হয়েছে, And the LORD speak unto Aaron, saying, Do not drink wine nor strong drink, thou, nor thy sons with thee, when ye go into the tabernacle of the congregation, lest ye die: it shall be a statute for ever throughout your generations: And that ye may put difference between holy and unholy, and between unclean and clean; And that ye may teach the children of Israel all the statutes which the LORD hath spoken unto them by the hand of Moses.[৩]

অর্থাৎ, তারপর প্রভু হারোণকে বললেন, যখন তোমরা সমাগম তাঁবুর মধ্যে আসবে তখন তুমি আর তোমার পুত্ররা অবশ্যই দ্রাক্ষারস পান করবে না। যদি তোমরা ঐসব জিনিস পান কর, তাহলে তোমরা মারা যাবে। এই বিধি তোমাদের বংশপরম্পরায় চিরকালের জন্য চলতে থাকবে। তোমাদের অবশ্যই পবিত্র ও অপবিত্র এবং শুচি ও অশুচি বিষয়ের মধ্যে পরিষ্কারভাবে পার্থক্য করেনিতে হবে। প্রভু মোশির মাধ্যমে লোকদের সেইসব বিধি জানিয়ে দিলেন, তুমি লোকদের ঐসব বিধি সম্পর্কে অবশ্যই অবহিত করবে।

রাষ্ট্রের নাগরিকদের নিরাপত্তা, উন্নতিসহ নানা দায়িত্ব অর্পিত থাকে রাষ্ট্রপ্রধান বা রাজার উপর। যেকারণে রাজাকে হতে হয় বিচক্ষণ, সুস্থ মস্তিস্কের অধিকারী। মাদক মানুষের মস্তিস্ককে বিকৃত করে দেয়। যেকারণে রাষ্ট্রপ্রধানকে ইয়াহুদী ধর্মে বিশেষভাবে মাদক সেবন থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ইয়াহুদী ধর্ম মতে, কোনো রাষ্ট্রের

[১] Proverbs 23 : 20
[২] Proverbs 23 : 21
[৩] Leviticus 10:8-11

রাষ্ট্রপ্রধান বা রাজা যদি মদপানে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে তাহলে সে অচিরেই তার রাষ্ট্র ক্ষমতা হারিয়ে ফেলবে। বাইবেলে বর্ণিত হয়েছে, Ah, the proud crown of the drunkards of Ephraim, and the fading flower of its glorious beauty, which is on the head of the rich valley of those overcome with wine! See, the Lord has one who is powerful and strong. Like a hailstorm and a destructive wind, like a driving rain and a flooding downpour, he will throw it forcefully to the ground.The proud crown of the drunkards of Ephraim will be trodden underfoot;[১]

অর্থাৎ, শমরিয়ার দিকে তাকাও! ইফ্রয়িমের মাতাল মানুষ সেই শহরের জন্য গর্বিত, যে শহর উর্বর উপত্যকা বেষ্টিত পাহাড়ের ওপর অবস্থিত। শমরিয়ার লোকরা মনে করে তাদের শহর ফুলের সুন্দর মুকুটের মত। কিন্তু তারা দ্রাক্ষারস পান করে মাতাল হয়ে রয়েছে। এবং এই সুন্দর মুকুট আসলে একটি মৃতপ্রায় গাছের মতো। দেখ, আমার প্রভুর একটি লোক আছে যে শক্তিশালী ও সাহসী। সেই লোকটি শিলাবৃষ্টির ঝড়ের মত দেশের ভেতরে আসবে। তিনি ঝড়ের মতো এদেশে আসবেন। তিনি হবেন বানভাসি দেশে জলে ভরা খরস্রোতা নদীর মতো। তিনি সেই মুকুটকে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দেবেন। ইফ্রয়িমের মাতাল মানুষরা তাদের সুন্দর মুকুটের জন্য গর্বিত। কিন্তু তাদের শহর পদদলিত হবে।

অনেক সময় দেখা যায় বিভিন্ন ভোজসভায় মাদক সরবরাহ করা হয়। ইয়াহুদী ধর্মে নিজে মাদক গ্রহণ না করার পাশাপাশি অন্য কাউকেও মদ পান করানো থেকে বিরত থাকের কঠোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কেউ অন্য কাউকে মদ পান করালে তার জন্য অপেক্ষা করছে ভয়াবহ শাস্তি। বাইবেলে বর্ণিত হয়েছে, Woe to him who makes his neighbors drink— you pour out your wrath and make them drunk, in order to gaze at their nakedness! Thou art filled with shame for glory: drink thou also, and let thy foreskin be uncovered: the cup of the LORD's right hand shall be turned unto thee, and shameful spewing shall be on thy glory.[২]

অর্থাৎ, তোমরা যারা সুরাপান করিয়ে তোমাদের প্রতিবেশীদের মাতাল করে দাও তাদের খুব খারাপ পরিণতি হবে। রাগের চোটে তোমাদের প্রতিবেশীদের মাতাল করতে তোমরা তোমাদের দ্রাক্ষারস ঢেলে দাও যাতে তোমরা তাদের উলঙ্গ অবস্থায় দেখতে পাও। কিন্তু সেই লোকটি প্রভুর ক্রোধ কাকে বলে তা জানতে পারবে। সেই ক্রোধ প্রভুর ডান হাতের এক কাপ বিষের মতো। সেই লোকটি সেই ক্রোধের স্বাদ নেবে এবং মাতাল লোকের মতোই মাটির ওপর পড়ে যাবে। অসৎ শাসক, তুমি সেই কাপ থেকে বিষ পান করবে। তুমি লজ্জা পাবে, সম্মান নয়।

ইয়াহুদী ধর্মে মাদকসেবীর ব্যাপারে অত্যন্ত কঠোরতা অবলম্বন করা হয়েছে। মাদক গ্রহণকারী যে ব্যক্তিই হোক না কেন তাকে অবশ্যই শাস্তি ভোগ করতে হবে। এমনকি যাজকগণ অর্থাৎ ধর্মীয় গুরুগণ মদ পান করলে সে-ও শাস্তি থেকে রেহাই পাবে না। এ ব্যাপারে কাউকেই ছাড় দেওয়া হয়নি। বাইবেলে বর্ণিত হয়েছে, They eat up the

---

[১] Isaiah 28:1-3
[২] Habakkuk 2:15 -16

sin of my people, and they set their heart on their iniquity. And there shall be, like people, like priest: and I will punish them for their ways, and reward them their doings. For they shall eat, and not have enough: they shall commit whoredom, and shall not increase: because they have left off to take heed to the LORD. Whoredom, wine, and new wine, which take away the understanding.[১]

অর্থাৎ, যাজকরা লোকদের পাপ কাজের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। তারা অনেক বেশী পরিমাণে ঐ পাপ কাজ করতে চেয়েছে। সেজন্য যাজকরা ঐ লোকদের চেয়ে কোন অংশে ভিন্ন নয়। তারা যেসব কাজ করেছে তার জন্য আমি তাদের শাস্তি দেব। তারা যে ভুল কাজ করেছে তার জন্য আমি প্রতিশোধ নেব। তারা খাবে, কিন্তু তারা তাতে তৃপ্ত হবে না! তারা যৌন পাপে লিপ্ত হবে, কিন্তু তাদের কোন সন্তান হবে না। কারণ তারা প্রভুকে ছেড়ে দিয়েছে এবং পতিতার মত থাকে। যৌনপাপ, তীব্র পানীয় এবং নতুন দ্রাক্ষারস একজন লোকের সোজাসুজিভাবে চিন্তা করার ক্ষমতা নষ্ট করবে।

ইয়াহুদী ধর্মে ক্ষেত্রবিশেষ মাদক গ্রহণের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। সমাজের উচ্চবিত্ত ও ধনী শ্রেণির মানুষকে মাদক গ্রহণে নিষেধ করা হলেও দরদ্রি শেণিকে ইয়াহুদী ধর্মে অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। এর পিছনে যুক্তি হিসেবে বলা হয়েছে, মাদক মানুষকে অতীত ভুলিয়ে দেয়। মাদক সেবনের ফলে দরিদ্ররা তাদের দুঃখ-কষ্ট ভুলে থাকতে পাবে। বাইবেলে বর্ণিত হয়েছে, It is not for kings, O Lemuel, it is not for kings to drink wine, or for rulers to take strong drink, lest they drink and forget what has been decreed and pervert the rights of all the afflicted. Give strong drink to the one who is perishing, and wine to those in bitter distress; let them drink and forget their poverty and remember their misery no more.[২]

অর্থাৎ, লমূয়েল, রাজাদের পক্ষে দ্রাক্ষারস পান করা বিজ্ঞজনোচিত নয়, শাসকের পক্ষে সুরা পান করা বিজ্ঞজনোচিত নয়। তারা দ্রাক্ষারস পান করে সমস্ত আইন ভুলে গিয়ে দরিদ্রদের ওপর অত্যাচার করতে পারে তাদের অধিকার কেড়ে নিতে পারে। যারা দরিদ্র, যারা সমস্যায় জর্জরিত তাদের দ্রাক্ষারস পান করতে দাও যাতে তারা তাদের দুঃখকষ্ট ভুলে য়েতে পারে। তারা পান করুক ও তাদের দরিদ্রতা ভুলে যাক ও তাদের দুর্দশা আর মনে না রাখুক।

ইয়াহুদী ধর্ম মানব কল্যাণের পক্ষে। মানুষের শরীর ও মস্তিষ্কের জন্য ক্ষতিকর, ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে অশান্তি সৃষ্টিকারী মাদককে এ ধর্মে নিষিদ্ধ বস্তু হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। মাদকের বহুবিধ ক্ষতিকর দিক তুলে ধরে এ ধর্মে মাদক গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

---

[১] Hosea 4: 8-11
[২] Proverbs 31: 4-7

ব্যভিচার

ব্যভিচার অর্থৎ বিবাহ বহির্ভুত যৌনতা ইয়াহুদী ধর্মে একটি লজ্জাজনক ও অপমানকর অপরাধ। এর ফলে সমাজে নানা ধরনের যৌন অপরাধের সৃষ্টি হয়। ইয়াহুদী ধর্মে বংশগত পবিত্রতা রক্ষার ব্যাপারে যথেষ্ট গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। ব্যভিচার মানবের বংশগত পবিত্রতা নষ্ট হওয়ার একমাত্র কারণ। বাইবেলে ব্যভিচারকে অত্যন্ত লজ্জাজনক অপরাধ হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। ব্যভিচার সম্পর্কে বাইবেলে বর্ণিত হয়েছে,

Can a man take fire in his bosom, and his clothes not be burned? Can one go upon hot coals, and his feet not be burned? So he that goeth in to his neighbour's wife; whosoever toucheth her shall not be innocent. Men do not despise a thief, if he steal to satisfy his soul when he is hungry; But if he be found, he shall restore sevenfold; he shall give all the substance of his house. But whoso committeth adultery with a woman lacketh understanding: he that doeth it destroyeth his own soul. A wound and dishonour shall he get; and his reproach shall not be wiped away.[১]

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আগুনের খুব কাছে যায় সে তার জামাকাপড় ঐ আগুনে পোড়ায়। জ্বলন্ত কয়লায় পা দিলে পা নিশ্চিত পুড়বে। যে ব্যক্তি পরস্ত্রীর সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপনে লিপ্ত হয় তার ক্ষেত্রেও একই কথা প্রয়োজ্য। ঐ ব্যক্তি শাস্তি ভোগ করবে। ক্ষুধার্ত ব্যক্তি খাদ্য চুরি করলে তাকে লোকে ঘৃণা করে না। চুরি করার সময় ধরা পড়লে, সে যা চুরি করেছে তার সাতগুণ মূল্য তাকে দিতে হবে! ঐ মূল্য দিতে গিয়ে হয়তো সে সর্বস্বান্ত হবে! কিন্তু যারা তার প্রকৃত অবস্থা বুঝে তারা তার প্রতি শ্রদ্ধা হারাবে না। কিন্তু যে ব্যক্তি ব্যভিচারে লিপ্ত হয় সে নির্বোধ। সে তার নিজের পতন ডেকে আনছে এবং নিজেকেই ধ্বংস করছে! মানুষ তার সম্পর্কে শ্রদ্ধা হারাবে। সে নিজে ওই লজ্জা থেকে কোন দিন পরিত্রাণ পাবে না।

প্রত্যেক মানুষকে এ অপরাধ থেকে বিরত থাকতে বাইবেলে কঠোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ অপরাধের ভয়াবহতা বিবেচনা করে বাইবেল ওল্ড টেস্টামেন্টের একাধিক স্থানে ব্যভিচার থেকে বেঁচে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যেমন, And you shall not commit adultery.[২] অর্থাৎ, এবং তোমার ব্যভিচার করা উচিত না।

অন্যত্র বলা হয়েছে, You shall not commit adultery.[৩] অর্থাৎ, ব্যভিচার করো না।

ইয়াহুদী ধর্মে ব্যভিচার একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ। ইয়াহুদী ধর্মে মারাত্মক অপরাধের জন্য সর্বোচ্চ শাস্তি নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে মৃত্যুদণ্ড। যেমন কোনো ব্যক্তিকে হত্যা করা হলে হত্যকারী ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে। আবার কোনো শিশুকে কোনো মূর্তির সামনে উৎসর্গ করা হলেও মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হতে হবে। ব্যভিচারও সেরকম একটি মারাত্মক অপরাধ। বাইবেলে ব্যভিচারের সর্বোচ্চ শাস্তি প্রাণদণ্ড ঘোষণা করা হয়েছে। বাইবেলে বর্ণিত হয়েছে,

---

[১] Proverbs 6: 27-33
[২] Deuteronomy 5:18
[৩] Exodus 20:14

The LORD spake unto Moses, saying, Again, thou shalt say to the children of Israel, Whosoever he be of the children of Israel, or of the strangers that sojourn in Israel, that giveth any of his seed unto Molech; he shall surely be put to death: the people of the land shall stone him with stones. And I will set my face against that man, and will cut him off from among his people; because he hath given of his seed unto Molech, to defile my sanctuary, and to profane my holy name. And if the people of the land do any ways hide their eyes from the man, when he giveth of his seed unto Molech, and kill him not: Then I will set my face against that man, and against his family, and will cut him off, and all that go a whoring after him, to commit whoredom with Molech, from among their people. And the soul that turneth after such as have familiar spirits, and after wizards, to go a whoring after them, I will even set my face against that soul, and will cut him off from among his people. Sanctify yourselves therefore, and be ye holy: for I am the LORD your God. And ye shall keep my statutes, and do them: I am the LORD which sanctify you. For every one that curseth his father or his mother shall be surely put to death: he hath cursed his father or his mother; his blood shall be upon him. And the man that committeth adultery with another man's wife, even he that committeth adultery with his neighbour's wife, the adulterer and the adulteress shall surely be put to death.[১]

সদাপ্রভু মোশিকে বললেন, ইস্রায়েলীদের বলো, ‘কোনো ইস্রায়েলী অথবা ইস্রায়েলে বাসকারী কোনো প্রবাসী যদি তার সন্তানদের মোলকের প্রতি উৎসর্গ করার উদ্দেশে দেয়, তাহলে অবশ্যই তার প্রাণদণ্ড হবে। সমাজের লোকেরা তাকে প্রস্তরাঘাত করবে। আমি তার বিরুদ্ধে বিমুখ হব ও তার পরিজনদের মধ্যে থেকে তাকে উচ্ছিন্ন করব; কারণ মোলকের তার সন্তান দিয়ে সে আমার পবিত্র ধর্মধাম কলুষিত করেছে ও আমার পবিত্র নাম কলঙ্কিত করেছে। যখন সে তার সন্তানদের মধ্য থেকে একটি সন্তান মোলককে উৎসর্গ করে, তখন যদি সমাজের লোকেরা তাদের চোখ বন্ধ রাখে ও তাকে মৃত্যুদণ্ড দিতে না পারে। তাহলে সেই ব্যক্তি ও তার পরিবারের বিপক্ষে আমি বিমুখ হব এবং তাকে ও তার অনুসারী মোলকের সঙ্গে ব্যভিচারী সকলকে তাদের পরিজনদের মধ্য থেকে উচ্ছিন্ন করব। সেই মানুষের বিপক্ষে আমি বিমুখ হব, যে ভূতপ্রেত ও গুণীদের অনুগমনে ব্যভিচার করার জন্য তাদের অভিমুখে যায় এবং তাকে তার আপনজনদের মধ্য থেকে আমি উচ্ছিন্ন করব। ‘তোমরা নিজেদের উৎসর্গ করো ও পবিত্র হও, কেননা আমি তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু। আমার বিধিবিধান পালন করবে, সেগুলির অনুগামী হবে। আমিই সদাপ্রভু, যিনি তোমাদের পবিত্র করেন। যদি কেউ তার বাবাকে বা মাকে অভিশাপ দেয়, তাকে মৃত্যুদণ্ড পেতে হবে। সে তার বাবাকে বা মাকে

[১] Leviticus 20:1-10

অভিশাপ দিয়েছে; সুতরাং তার রক্ত তার মস্তকে প্রযোজ্য হবে। যদি কোনো ব্যক্তি অন্যের স্ত্রীর সঙ্গে ব্যভিচার করে তার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সঙ্গে ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণী উভয়ের অবশ্যই প্রাণদণ্ড হবে।

বিবাহিত ব্যভিচারীর শাস্তি

জৈবিক চাহিদা পূরণের একমাত্র বৈধ উপায় হচ্ছে বিবাহ। এ ধর্মে ব্যভিচারীকে শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রে ব্যভিচারীর বৈবাহিক অবস্থা বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। বৈবাহিক অবস্থাভেদে শাস্তি বিধানের কথা বাইবেলে উল্লেখ করা হয়েছে। বাইবেলের বিধান হচ্ছে, বিবাহিত ব্যভিচারকারীকে রজম অর্থাৎ পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করা হবে। বাইবেলে বর্ণিত হয়েছে,

But if this thing be true, and the tokens of virginity be not found for the damsel: Then they shall bring out the damsel to the door of her father's house, and the men of her city shall stone her with stones that she die: because she hath wrought folly in Israel, to play the whore in her father's house: so shalt thou put evil away from among you. If a man be found lying with a woman married to an husband, then they shall both of them die, both the man that lay with the woman, and the woman: so shalt thou put away evil from Israel.[১]

অর্থাৎ, কিন্তু এ-ও হতে পারে যে মেয়েটির স্বামী তার সম্বন্ধে যা বলেছে তা সত্য। স্ত্রীলোকটির মাতা-পিতার কাছে তার কুমারীত্বের প্রমাণ নাও থাকতে পারে। যদি তাই ঘটে তবে নগরের প্রবীণরা সেই মেয়েটিকে নিয়ে তার পিতার বাড়ীর দরজায় আসবে। তারপর সেই নগরের লোকরা মেয়েটিকে পাথর মেরে হত্যা করবে। কারণ ইস্রায়েলের মধ্যে সে লজ্জাজনক কাজ করেছে। সে পিতার বাড়ীতে বেশ্যার মতো ব্যবহার করেছে। তুমি তোমার লোকদের মধ্যে থেকে এইভাবে দুষ্টাচার দূর করবে। যদি কোন পুরুষ অপরের স্ত্রীর সাথে যৌন সম্পর্কে লিপ্ত থাকাকালীন ধরা পড়ে তবে দুজনকেই অবশ্যই মরতে হবে - সেই স্ত্রীলোকটিকে এবং তার সঙ্গে যৌন সম্পর্কে লিপ্ত পুরুষটিকে হত্যা করে তোমরা অবশ্যই ইস্রায়েলের মধ্যে থেকে এই দুষ্টাচার দূর করবে।

মুহরিমের সাথে ব্যভিচারকারীর শাস্তি

মুহরিম অর্থাৎ যাদেরকে বিয়ে করা নিষিদ্ধ তাদের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত না হতে বিশেষ গুরুত্বের সাথে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কেউ এ অপরাধে লিপ্ত হলে তার শাস্তিও মৃত্যুদণ্ড। তাদের আগুন জ্বালিয়ে হত্যা করার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

বাইবেলে বর্ণিত হয়েছে,

And the man that lieth with his father's wife hath uncovered his father's nakedness: both of them shall surely be put to death; their blood shall be upon them. And if a

---

[১] Deuteronomy 22 : 20-22

man lie with his daughter in law, both of them shall surely be put to death: they have wrought confusion; their blood shall be upon them.[১]

অর্থাৎ, যদি কোন পুরুষের তার পিতার স্ত্রীর সঙ্গে যৌন সংসর্গ থাকে, তাহলে পুরুষ এবং রমণী দুজনকে অবশ্যই যেন মেরে ফেলা হয়। তারা নিজেরা তাদের মৃত্যুর জন্য দায়ী, কারণ এই কাজ দ্বারা তার পিতাকে অপমান করা হয়। যদি একজন পুরুষের তার পুত্রবধূর সঙ্গে যৌন সংসর্গ থাকে, তাহলে দুজনকে অবশ্যই যেন মেরে ফেলা হয়। এহল অনাচার, তারা তাদের নিজেদের মৃত্যুর জন্য দায়ী।

মুহরিম ব্যক্তির সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া ইয়াহুদী ধর্মে অত্যন্ত জঘন্য ও ঘৃণতম অপরাধ। যেকারণে বাইবেলে বারংবার এ ব্যাপারে সাবধান করা হয়েছে। বাইবেলের বিভিন্ন অংশে এর শাস্তির কথা বিবৃত হয়েছে। সেখান থেকে বেশ কিছু উদ্ধৃত নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

And if a man shall take his sister, his father's daughter, or his mother's daughter, and see her nakedness, and she see his nakedness; it is a wicked thing; and they shall be cut off in the sight of their people: he hath uncovered his sister's nakedness; he shall bear his iniquity.[২]

অর্থাৎ, যদি কেউ তার বোন, তার সৎ মাতা বা সৎ পিতার মেয়েকে বিবাহ করে এবং একে অপরের সঙ্গে যৌন সম্পর্কে লিপ্ত হয় তবে এটা লজ্জাজনক বিষয়। তারা অবশ্যই প্রকাশ্যে শাস্তি পাবে। তারা অবশ্যই তাদের লোকদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হবে। যে মানুষ তার বোনের সঙ্গে যৌন সম্পর্ক করে, সে অবশ্যই তার পাপের জন্য শাস্তি পাবে!

অন্যত্র বলা হয়েছে,

And if a man take a wife and her mother, it is wickedness: they shall be burnt with fire, both he and they; that there be no wickedness among you.[৩]

অর্থাৎ,কোন পুরুষের পক্ষে একই সাথে কোন স্ত্রীলোক এবং তার মাতাকে বিয়ে করা অত্যন্ত মন্দ কাজ। লোকেরা সেই মানুষটিকে অবশ্যই পোড়াবে এবং দুজন স্ত্রীলোককে আগুনে দেবে যেন এই ধরণের কুকর্ম আর কেউ না করে।

অন্যত্র বলা হয়েছে,

And thou shalt not uncover the nakedness of thy mother's sister, nor of thy father's sister: for he uncovereth his near kin: they shall bear their iniquity.[৪]

[১] Leviticus 20 : 11-12
[২] Leviticus 20 : 17
[৩] Leviticus 20 : 14
[৪] Leviticus 20 : 19

অর্থাৎ, তোমাদের মাতার বোন বা তোমাদের পিতার বোনের সঙ্গে অবশ্যই যৌন সম্পর্ক করবে না। সেটা হল গর্হিত আচার। তোমাদের পাপসমূহের জন্য তোমরা অবশ্যই শাস্তি পাবে।

গায়রে মুহরিম আত্মীয়র সাথে ব্যভিচারের শাস্তি

মুহরিম নয় কিন্তু আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ এরূপ ব্যক্তির সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়াও মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হওয়ার কারণ। যেমন কাকার স্ত্রী, ভাইয়ের স্ত্রী এদের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হলে এ শাস্তি প্রযোজ্য হবে। বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্টে বলা হয়েছে,

And if a man shall lie with his uncle's wife, he hath uncovered his uncle's nakedness: they shall bear their sin; they shall die childless.[১]

অর্থাৎ, একজন পুরুষ অবশ্যই তার কাকার স্ত্রীর সঙ্গে যৌন সম্পর্ক করবে না। এ কাজ তার কাকাকে অপমান করে। সেই পুরুষ এবং তার কাকার স্ত্রী তাদের পাপসমুহের জন্য শাস্তি পাবে। তারা সন্তানসন্ততিহীন থেকেই মারা যাবে।

সমকামিতার শাস্তি

সমকামিতা মানে সমজাতীয় ব্যক্তির সাথে অর্থৎ পুরুষ অন্য পুরুষের সাথে, নারী অন্য নারীর সাথে সঙ্গমে লিপ্ত হওয়া। এ ধরণের অপরাধ কেবলমাত্র মনুষ্য জাতির মধ্যেই দেখা যায়। অন্য কোনো প্রাণির মাঝে সমকামিতার প্রচলন নেই। ইয়াহুদী ধর্মে সমকামিতার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। বাইবেলে বর্ণিত হয়েছে, If a man also lie with mankind, as he lieth with a woman, both of them have committed an abomination: they shall surely be put to death; their blood shall be upon them.[২]

অর্থাৎ, যদি কোন পুরুষের অন্য এক পুরুষের সঙ্গে একজন স্ত্রীলোকের মত যৌন সম্পর্ক থাকে তবে এই দুজন পুরুষ এক ভয়ঙ্কর পাপ কার্যে লিপ্ত। তাদের অবশ্যই যেন মেরে ফেলা হয়। তারা তাদের নিজেদের মৃত্যুর জন্য দায়ী।

পশুর সাথে সঙ্গমের শাস্তি

চরম বিকৃত রুচির অনেক মানুষকে দেখা যায় পশুর সাথে এ অন্যায় আচরণে লিপ্ত হতে। স্বজাতি ভিন্ন অন্য প্রজাতির প্রাণির সাথে সঙ্গমে লিপ্ত হওয়ার প্রবণতাও মানুষ ভিন্ন অন্য কোনো প্রাণির মাঝে নেই। এ ধরণের অপকর্ম গোটা মানবজাতির জন্যই লজ্জাজনক। কোনো মানুষ চাই সে নারী বা নর হোক পশুর সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত হলে তাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করাই ইয়াহুদী আইনের বিধান। বাইবেলে বর্ণিত হয়েছে, And if a man lie with a beast, he shall surely be put to death: and ye shall slay the beast. And if a woman approach unto any beast, and lie down thereto, thou shalt kill the woman, and the beast: they shall surely be put to death; their blood shall be upon them.[৩]

---

[১] Leviticus 20 : 20
[২] Leviticus 20 : 13
[৩] Leviticus 20 : 15-15

অর্থাৎ, যদি একজন মানুষ কোন এক জন্তুর সঙ্গে যৌন সম্পর্কে লিপ্ত হয় তবে সেই মানুষটি অবশ্যই প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হবে এবং তোমরা অবশ্যই প্রাণীটিকেও হত্যা করবে। যদি একজন স্ত্রীলোকের কোন এক জন্তুর সঙ্গে যৌন সম্পর্ক থাকে, তাহলে তোমরা অবশ্যই স্ত্রীলোক ও প্রাণীটিকে হত্যা করবে। তারা অবশ্যই প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হবে। তারা তাদের নিজেদের মৃত্যুর জন্য দায়ী।

অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে, Whosoever lieth with a beast shall surely be put to death.[১]

অর্থাৎ, কোন মানুষ যদি কোন পশুর সঙ্গে যৌন সম্পর্ক করে তবে তাকে অবশ্যই হত্যা করবে।

অবিবাহিতের ব্যভিচারের শাস্তি

অবিবাহিত ব্যক্তি যৌনাচারে লিপ্ত হলে তাদেরকেও মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে। এ অপরাধে লিপ্ত অপরাধীর শাস্তি কার্যকর করা হবে নগরের দ্বারে সকলের সামনে নিয়ে এসে। তাদের হত্যা করা হবে পাথর নিক্ষেপ করে। এ অপরাধের শাস্তি প্রকাশ্যে প্রদান করা হবে, যাতে শাস্তির ভয়াবহতা উপলব্ধি করে অন্যরা এ অপরাধ থেকে নিজেদের দূরে রাখে। বাইবেলে বর্ণিত হয়েছে, If a damsel that is a virgin be betrothed unto an husband, and a man find her in the city, and lie with her; Then ye shall bring them both out unto the gate of that city, and ye shall stone them with stones that they die; the damsel, because she cried not, being in the city; and the man, because he hath humbled his neighbour's wife: so thou shalt put away evil from among you.[২]

অর্থাৎ, কোন লোক অপরের বাগদত্তা কোন কুমারীকে নগরের মধ্যে দেখতে পেয়ে তার সাথে যৌন সহবাসে লিপ্ত হতে পারে। এই রকম ঘটলে তুমি অবশ্যই তাদের দুজনকে নগরের দ্বারে সকলের সামনে নিয়ে এসে পাথর মেরে হত্যা করবে। লোকটিকে হত্যা করার কারণ সে অপরের স্ত্রীর সাথে যৌন পাপ করেছে; এবং মেয়েটিকে হত্যা করার কারণ সে নগরের মধ্যে থাকলেও সাহায্যের জন্য চিৎকার করেনি। তোমরা অবশ্যই এই ভাবে লোকদের মধ্য হতে এই দুষ্টাচার দূর করবে।

ধর্ষণের শাস্তি

কোনো রমনী ধর্ষণের শিকার হলে তার কোনো শাস্তি হবে না। ধর্ষিতা রমনী কারো বাগদত্তা হলে ধর্ষণকারীকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে। আর ধর্ষিতা রমনী কারো বাগদত্তা না হলো ধর্ষণকারী ধর্ষিতাকে বিয়ে করবে এবং ধর্ষিতার বাবাকে ২০ আউন্স স্বর্ণ জরিমানা দিবে। বাইবেলে বর্ণিত হয়েছে, But if a man find a betrothed damsel in the field, and the man force her, and lie with her: then the man only that lay with her shall die: But unto the damsel thou shalt do nothing; there is in the damsel no sin worthy of death: for as when a man riseth against his neighbour, and slayeth him, even so is this matter: For he found her in the field, and the betrothed damsel cried, and there was none to

---

[১] Exodus 22 : 19
[২] Deuteronomy 22 : 23-30

save her. If a man find a damsel that is a virgin, which is not betrothed, and lay hold on her, and lie with her, and they be found; Then the man that lay with her shall give unto the damsel's father fifty shekels of silver, and she shall be his wife; because he hath humbled her, he may not put her away all his days. A man shall not take his father's wife, nor discover his father's skirt.[১]

অর্থাৎ, কিন্তু কোন লোক যদি বাগদত্তা স্ত্রীলোককে ক্ষেতের মধ্যে পেয়ে জোরপূর্বক তার সাথে যৌন সম্পর্কে লিপ্ত হয় তবে কেবল লোকটিকেই মরতে হবে। তোমরা অবশ্যই সেই মেয়েটির প্রতি কিছু করবে না। সে মৃত্যুর যোগ্য এমন কোন অপরাধ করেনি। এই ঘটনা প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে উঠে তাকে হত্যা করার মতো। লোকটি ক্ষেতে সেই বাগদত্তা মেয়েটিকে দেখে তাকে আক্রমণ করল। হয়তো মেয়েটি সাহায্যের জন্যও চিৎকার করেছিল কিন্তু সাহায্যের জন্য কেউ ছিল না। সুতরাং তাকে যেন শাস্তি দেওয়া না হয়। একজন লোক হয়তো বাগদত্তা নয় এমন কোন কুমারীকে পেয়ে তার সাথে যৌন সম্পর্কে লিপ্ত হতে পারে। যদি অন্য লোকরা তা ঘটতে দেখে, তাহলে সে মেয়েটির পিতাকে ২০ আউন্স রূপো দেবে এবং সেই মেয়েটি লোকটির স্ত্রী হবে। যেহেতু সে যৌন পাপ করেছিল, তাই তার জীবনকালে সে তাকে ত্যাগ করতে পারবে না। কোন লোক যেন তার পিতার স্ত্রী অর্থাৎ সৎ মায়ের সাথে যৌন সম্পর্কে লিপ্ত হয়ে তার পিতাকে লজ্জায় না ফেলে।

মাসিক চলাকালীন সময়ে সঙ্গমের শাস্তি

ঋতুস্রাব নারীর এক প্রকার অসুস্থতা। এসময়ে তাদের দেহ-মন কোনোটাই স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে না। ইয়াহুদী ধর্মে ঋতুবতী নারীর ঋতুস্রাব চলাকালীন সময় তাকে অশুচি মনে করে। যেকারণে ইয়াহুদী ধর্মে মাসিক চলাকালীন সময় স্বামী-স্ত্রীর যৌন মিলন নিষিদ্ধ। এ নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে কোনো দম্পতি মিলনে লিপ্ত হলে তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যাবে। বাইবেলে বর্ণিত হয়েছে, And if a man shall lie with a woman having her sickness, and shall uncover her nakedness; he hath discovered her fountain, and she hath uncovered the fountain of her blood: and both of them shall be cut off from among their people.[২]

অর্থাৎ, মাসিক রক্তস্রাবের সময় কোন রমণীর সঙ্গে যদি কোন পুরুষের যৌন সংসর্গ হয়, তাহলে পুরুষ এবং রমনী দুজনই তাদের লোকদের থেকে অবশ্যই বিচ্ছিন্ন হবে। তারা পাপ করেছে কারণ সেই পুরুষ রক্তের উৎসকে প্রকাশ করেছে এবং সেই স্ত্রী তার রক্তের উৎসকে অনাবৃত করেছে।

মিথ্যা অপবাদ

মিথ্যা একটি ভয়াবহ অপরাধ। পৃথিবীর সকল ধর্মে, সকল সমাজ ব্যবস্থায় মিথ্যাকে মহাপাপ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ইয়াহুদী ধর্মেও মিথ্যা মহাপাপ হিসেবেই স্বীকৃত। স্বাভাবিক মিথ্যা কথার তুলনায় মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া আরও

---

[১] Deuteronomy 22 : 25-30
[২] Leviticus 20 : 18

ভয়াবহ পাপের কাজ। কারণ মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদানের মাধ্যমে এক ব্যক্তির জীবনকে হুমকির মুখে ঠেলে দেওয়া হয়। মিথ্যা সাক্ষ্যের কারণে বিনা অপরাধে অনেক সময় শাস্তি ভোগ করতে হয় নিরপরাধ মানুষকে। ইয়াহুদী ধর্মে মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করা নিষিদ্ধ। বাইবেলে বর্ণিত হয়েছে, মিথ্যা একটি ভয়াবহ অপরাধ। পৃথিবীর সকল ধর্মে, সকল সমাজ ব্যবস্থায় মিথ্যাকে মহাপাপ হিসেবে চিহ্নত করা হয়েছে। ইয়াহুদী ধর্মেও মিথ্যা মহাপাপ হিসেবেই স্বীকৃত। স্বাভাবিক মিথ্যা কথার তুলনায় মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া আরও ভয়াবহ পাপের কাজ। কারণ মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদানের মাধ্যমে এক ব্যক্তির জীবনকে হুমকির মুখে ঠেলে দেওয়া হয়। মিথ্যা সাক্ষ্যের কারনে বিনা অপরাধে অনেক সময় শাস্তি ভোগ করতে হয় নিরপরাধ মানুষকে। ইয়াহুদী ধর্মে মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করা নিষিদ্ধ। বাইবেলে বর্ণিত হয়েছে,

Honour thy father and thy mother, as the LORD thy God hath commanded thee; that thy days may be prolonged, and that it may go well with thee, in the land which the LORD thy God giveth thee. Thou shalt not kill. Neither shalt thou commit adultery. Neither shalt thou steal. Neither shalt thou bear false witness against thy neighbour. Neither shalt thou desire thy neighbour's wife, neither shalt thou covet thy neighbour's house, his field, or his manservant, or his maidservant, his ox, or his ass, or any thing that is thy neighbour's. These words the LORD spake unto all your assembly in the mount out of the midst of the fire, of the cloud, and of the thick darkness, with a great voice: and he added no more. And he wrote them in two tables of stone, and delivered them unto me.[১]

অর্থাৎ, ঈশ্বরের আজ্ঞা মত তোমরা অবশ্যই তোমাদের পিতামাতাকে সম্মান জানাবে। তোমরা এই আদেশ অনুসরণ করলে দীর্ঘজীবী হবে এবং প্রভু তোমাদের ঈশ্বর, তোমাদের যে দেশ দিয়েছেন সেই দেশে তোমাদের মঙ্গল হবে। তোমরা নরহত্যা করো না। তোমরা ব্যভিচার করো না। তোমরা চুরি করো না। তোমরা প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিও না। তোমরা অবশ্যই অন্য কোনো ব্যক্তির স্ত্রীতে লোভ করবে না। তোমরা অবশ্যই তার বাড়ী, তার শস্যক্ষেত্র, তার পুরুষ দাস অথবা স্ত্রী দাসীকে, তার গরু বা গাধা অর্থাৎ প্রতিবেশীর অধিকৃত কোনো দ্রব্যসামগ্রীতেই লোভ করবে না।

মিথ্যা রটানোর মাধ্যমে সামাজিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়, পারস্পরিক অবিশ্বাস, বিদ্বেষ ও শত্রুতা সৃষ্টি হয়। একটা সমাজ ধ্বংস হয়ে যাওয়ার জন্য ছোট একটা মিথ্যা গুজবই যথেষ্ট। মিথ্যা রাটানো ও মিথ্যা সাক্ষ্য নিষিদ্ধ করে আরও বর্ণিত হয়েছে,

Thou shalt not raise a false report: put not thine hand with the wicked to be an unrighteous witness. Thou shalt not follow a multitude to do evil; neither shalt thou speak in a cause to decline after many to wrest judgment: Neither shalt thou

[১] Deuteronomy 5 : 16-21

countenance a poor man in his cause. If thou meet thine enemy's ox or his ass going astray, thou shalt surely bring it back to him again. If thou see the ass of him that hateth thee lying under his burden, and wouldest forbear to help him, thou shalt surely help with him. Thou shalt not wrest the judgment of thy poor in his cause. Keep thee far from a false matter; and the innocent and righteous slay thou not: for I will not justify the wicked.[১]

অর্থাৎ, অন্যদের বিরুদ্ধে মিথ্যে অপবাদ রটিও না। যদি তুমি আদালতে সাক্ষী দিতে যাও তাহলে একজন খারাপ লোককে সাহায্যের জন্য মিথ্যা সাক্ষ্য দিও না। সবাই যা করছে তুমিও তাই করতে যেও না। যদি একটি গোষ্ঠীর মানুষ অন্যায় করে তাহলে তুমিও তাদের দলে গিয়ে ভিড়ে যেও না, বরং তুমি তাদের ইন্ধন না জুগিয়ে যা সঠিক এবং ন্যায্য তাই করো। কোন মামলা-মকদ্দমায় কোন দরিদ্র লোককে তোমার বিশেষ অনুগ্রহ করা অবশ্যই উচিৎ নয়। যদি কোনও ব্যক্তির বলদ অথবা গাধা হারিয়ে যায় আর তা যদি তুমি খুঁজে পাও তাহলে সঙ্গে সঙ্গে তুমি হারিযে যাওয়া বলদ বা গাধাটিকে তার মালিকের কাছে ফিরিয়ে দেবে। এমনকি সে যদি তোমার শত্রু হয় তাহলেও তুমি এটাই করবে। যদি কোন মালবাহী পশু মালের ভারে আর চলতে না পারার মতো অবস্থায় পৌঁছে যায় তাহলে তুমি সেই পশুটির ভার লাঘব করতে সচেষ্ট হবে। সেই পশুটি যদি তোমার শত্রুও হয় তাহলেও তুমি তা করবে। কোনও দরিদ্রের সঙ্গে কোনরকম অন্যায় হতে দিও না। সাধারণ মানুষদের মতোই একই বিধানে সেই দরিদ্রের বিচার হওয়া উচিত। কাউকে দোষী হিসেবে চিহ্নিত করার আগে সচেতন থেকো। কারুর বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ দিও না। কোনও নির্দোষ মানুষকে শাস্তি পেতে দেখলে তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে অন্যায়ের প্রতিবাদ জানাবে। যে একজন নির্দোষ মানুষকে হত্যা করে সে একজন পাপী এবং আমি কখনই তাকে ক্ষমা করব না।

ইয়াহুদী ধর্ম গ্রন্থসমূহে মিথ্যা রটানো ব্যক্তিকে নির্বোধ ও বোকা হিসেবে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। বাইবেলে বর্ণিত হয়েছে, He that hideth hatred with lying lips, and he that uttereth a slander, is a fool.[২] অর্থাৎ, যে ব্যক্তি তার ঘৃণা লুকিয়ে রাখে সে হয়ত একজন মিথ্যেবাদী। কিন্তু যারা মিথ্যে অপবাদ রটায় তারা বোকা।

কেউ যদি কারো বিরুদ্ধে ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদ রটায় তাহলে তাকে অবশ্যই শাস্তি ভোগ করতে হবে। তার শাস্তির ব্যাপারে বিচারকগণ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। অপরাধের মাত্রা বিবেচনা করে বিচারকগণ অপরাধীকে শাস্তি প্রদান করবেন। স্বামী তার স্ত্রীর প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ উত্থাপন করলে এবং স্ত্রীর ব্যভিচারের অপরাধ প্রমাণ ব্যর্থ হলে স্বামী ৪০ আউন্স রৌপ্য জরিমানা দিতে হবে। এবং আমৃত্যু ঐ স্ত্রীর সঙ্গেই সংসার করতে হবে। বাইবেলে বর্ণিত হয়েছে,

If any man take a wife, and go in unto her, and hate her, And give occasions of speech against her, and bring up an evil name upon her, and say, I took this woman, and when I came to her, I found her not a maid: Then shall the father of the damsel,

---

[১] Exodus 23 : 1-7
[২] Proverbs 10 : 18

and her mother, take and bring forth the tokens of the damsel's virginity unto the elders of the city in the gate: And the damsel's father shall say unto the elders, I gave my daughter unto this man to wife, and he hateth her; And, lo, he hath given occasions of speech against her, saying, I found not thy daughter a maid; and yet these are the tokens of my daughter's virginity. And they shall spread the cloth before the elders of the city. And the elders of that city shall take that man and chastise him; And they shall amerce him in an hundred shekels of silver, and give them unto the father of the damsel, because he hath brought up an evil name upon a virgin of Israel: and she shall be his wife; he may not put her away all his days.[১]

অর্থাৎ, একজন পুরুষ কোন স্ত্রীলোককে বিবাহ করে তার সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করার পরে মনস্থ করতে পারে সে তাকে আর চায় না। সেই জন্য সে মিথ্যাভাবে বলতে পারে, 'আমি এই স্ত্রীলোকটিকে বিবাহ করেছিলাম বটে কিন্তু যৌন সহবাসের সময় দেখলাম যে সে কুমারী নয়।' এই বলে সে সেই স্ত্রীলোকটির উপর দুর্নাম আনতে পারে। এই রকম ঘটলে মেয়েটির পিতা-মাতা সেই মেয়েটির কুমারীত্বের প্রমাণ নিয়ে নগরের প্রবীণদের সাথে নগরের সভাস্থলে উপস্থিত হবে। মেয়েটির পিতা প্রবীণদের বলবেন, 'আমি আমার মেয়েকে এই লোকটির হাতে তার স্ত্রী হিসাবে দিয়েছিলাম কিন্তু এখন সে তাকে পছন্দ করে না। এই লোকটি আমার মেয়ের নামে মিথ্যা বলেছে। সে বলেছে, তোমার মেয়ে কুমারী ছিল না। কিন্তু এই দেখুন আমার মেয়ে যে কুমারী তার প্রমাণ। এই বলে তারা কাপড়টি নগরের প্রবীণদের দেখাবে। তখন সেই নগরের প্রবীণরা অবশ্যই সেই লোকটিকে নিয়ে গিয়ে শাস্তি দেবে।

তারা অবশ্যই লোকটির জন্য ৪০ আউন্স রৌপ্য জরিমানা করবে। সেই টাকা যেন মেয়েটির পিতাকে দেওয়া হয়, কারণ মেয়েটির স্বামী একজন ইস্রায়েলীয় কুমারীর উপর দুর্নাম এনেছে। আর সেই মেয়েটি সেই লোকটির স্ত্রী হয়েই থাকবে। সেই লোকটি তার জীবনকালে তাকে বিবাহ বিচ্ছেদ দিতে পারবে না।

লিআনের বিধান

স্বামী কিংবা স্ত্রী পরস্পরের বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অভিযোগ উত্থাপন করলে ইসলামে লিআনের ব্যবস্থা রয়েছে।(লিআন বিষয়ে ইতোপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে) ইয়াহুদী ধর্মেও লিআনের ব্যবস্থা রয়েছে। তবে এর পদ্ধতি ইসলাম ধর্ম থেকে ভিন্ন। বাইবেলে বর্ণিত হয়েছে, And the LORD spake unto Moses, saying, Command the children of Israel, that they put out of the camp every leper, and every one that hath an issue, and whosoever is defiled by the dead: Both male and female shall ye put out, without the camp shall ye put them; that they defile not their camps, in the midst whereof I dwell. And the children of Israel did so, and put them out without the camp: as the LORD spake unto Moses, so did the children of Israel. And the

[১] Deuteronomy 22 : 13-19

LORD spake unto Moses, saying, Speak unto the children of Israel, When a man or woman shall commit any sin that men commit, to do a trespass against the LORD, and that person be guilty; Then they shall confess their sin which they have done: and he shall recompense his trespass with the principal thereof, and add unto it the fifth part thereof, and give it unto him against whom he hath trespassed. But if the man have no kinsman to recompense the trespass unto, let the trespass be recompensed unto the LORD, even to the priest; beside the ram of the atonement, whereby an atonement shall be made for him. And every offering of all the holy things of the children of Israel, which they bring unto the priest, shall be his. And every man's hallowed things shall be his: whatsoever any man giveth the priest, it shall be his. And the LORD spake unto Moses, saying, Speak unto the children of Israel, and say unto them, If any man's wife go aside, and commit a trespass against him, And a man lie with her carnally, and it be hid from the eyes of her husband, and be kept close, and she be defiled, and there be no witness against her, neither she be taken with the manner; And the spirit of jealousy come upon him, and he be jealous of his wife, and she be defiled: or if the spirit of jealousy come upon him, and he be jealous of his wife, and she be not defiled: Then shall the man bring his wife unto the priest, and he shall bring her offering for her, the tenth part of an ephah of barley meal; he shall pour no oil upon it, nor put frankincense thereon; for it is an offering of jealousy, an offering of memorial, bringing iniquity to remembrance. And the priest shall bring her near, and set her before the LORD: And the priest shall take holy water in an earthen vessel; and of the dust that is in the floor of the tabernacle the priest shall take, and put it into the water: And the priest shall set the woman before the LORD, and uncover the woman's head, and put the offering of memorial in her hands, which is the jealousy offering: and the priest shall have in his hand the bitter water that causeth the curse: And the priest shall charge her by an oath, and say unto the woman, If no man have lain with thee, and if thou hast not gone aside to uncleanness with another instead of thy husband, be thou free from this bitter water that causeth the curse: But if thou hast gone aside to another instead of thy husband, and if thou be defiled, and some man have lain with thee beside thine husband: Then the priest shall charge the woman with an oath of cursing, and the priest shall say unto the woman, The LORD make thee a curse and an oath among

thy people, when the LORD doth make thy thigh to rot, and thy belly to swell; And this water that causeth the curse shall go into thy bowels, to make thy belly to swell, and thy thigh to rot: And the woman shall say, Amen, amen. And the priest shall write these curses in a book, and he shall blot them out with the bitter water: And he shall cause the woman to drink the bitter water that causeth the curse: and the water that causeth the curse shall enter into her, and become bitter. Then the priest shall take the jealousy offering out of the woman's hand, and shall wave the offering before the LORD, and offer it upon the altar: And the priest shall take an handful of the offering, even the memorial thereof, and burn it upon the altar, and afterward shall cause the woman to drink the water. And when he hath made her to drink the water, then it shall come to pass, that, if she be defiled, and have done trespass against her husband, that the water that causeth the curse shall enter into her, and become bitter, and her belly shall swell, and her thigh shall rot: and the woman shall be a curse among her people. And if the woman be not defiled, but be clean; then she shall be free, and shall conceive seed. This is the law of jealousies, when a wife goeth aside to another instead of her husband, and is defiled; Or when the spirit of jealousy cometh upon him, and he be jealous over his wife, and shall set the woman before the LORD, and the priest shall execute upon her all this law. Then shall the man be guiltless from iniquity, and this woman shall bear her iniquity.[১]

অর্থাৎ, প্রভু মোশিকে বললেন, অসুস্থতা এবং রোগ থেকে তাদের শিবির মুক্ত রাখার জন্য আমি ইস্রায়েলের লোকদের আদেশ করছি। লোকদের বলো চর্মরোগ আছে এমন ব্যক্তিকে শিবির থেকে যেন বের করে দেওয়া হয়। যার শরীর থেকে কিছু বের হচ্ছে তাকে দূরে পাঠিয়ে দিতে বলো এবং তাদের বলে দাও মৃতদেহ স্পর্শ করেছে এমন যে কোনো ব্যক্তিকেও শিবির থেকে বের করে দিতে। সে পুরুষই হোক অথবা স্ত্রী হোক তাতে কিছু আসে যায় না, তাকে শিবির থেকে বের করে দাও যাতে তাদের যে শিবিরের মধ্যে আমি বাস করি সেখানে অসুস্থতা এবং অশুদ্ধতা ছড়িয়ে না পড়ে। ইস্রায়েলের লোকরা ঈশ্বরের আদেশ পালন করেছিল। তারা সেই সমস্ত লোকদের শিবিরের বাইরে পাঠিয়ে দিয়েছিল। প্রভু মোশিকে যা যা আদেশ দিয়েছিলেন তারা সেইগুলোই করেছিল। প্রভু মোশিকে বললেন, ইস্রায়েলের লোকদের এ কথা বলে দাও: একজন ব্যক্তি হয়তো আরেকজন ব্যক্তির ক্ষতি করতে পারে। যখন কেউ অন্যদের কিছু ক্ষতি করে তখন সে আসলে ঈশ্বরের বিরুদ্ধেই পাপ কাজ করে। সেই ব্যক্তিটি অপরাধী। সুতরাং সে তার নিজের পাপ স্বীকার করবে। সেই ব্যক্তিটি অবশ্যই তার ভুল কাজের জন্য পুরো খেসারত দিতে বাধ্য থাকবে। এছাড়াও সে তার খেসারতের এক পঞ্চমাংশ পরিমাণ মূল্য সেই ব্যক্তিকে দেবে, যার সে ক্ষতি করেছে। কিন্তু হয়তো এমনও হতে

---

[১] Number 5 : 1-30

পারে যে, সে যে ব্যক্তির ক্ষতি করেছে সে মারা গেছে এবং এমনও হতে পারে যে তার হয়ে খেসারতের মূল্য গ্রহণ করার মতো কোনো নিকট আত্মীয় নেই। সে ক্ষেত্রে যে ব্যক্তিটি খারাপ কাজ করেছিল, সে প্রভুকে সেই মূল্য দেবে। সেই মূল্যের পুরোটাই তাকে যাজককে দিতে হবে। যাজক সেই মানুষকে শুচি করার জন্য অবশ্যই একটি পুং মেষ বলি দেবে। যে ব্যক্তি অন্যায় কাজ করেছে, তার পাপকে ঢাকা দেওয়ার জন্যই এই মেষ বলি দেওয়া হবে। কিন্তু যাজক বাকী মূল্য রেখে দিতে পারে। যদি ইস্রায়েলের লোকদের মধ্যে কোনো একজন ঈশ্বরকে কোনো বিশেষ উপহার দেয়, তাহলে যিনি সেই উপহার গ্রহণ করেছেন, সেই যাজক সেটি রেখে দিতে পারেন, এটি তাঁর কোনো ব্যক্তির পক্ষে বিশেষ ধরণের উপহার দেওয়া বাধ্যতামূলক নয়। কিন্তু যদি সে কোনো উপহার দেয় তবে সেই উপহার যাজকের প্রাপ্য হবে। এরপর প্রভু মোশিকে বললেন, ইস্রায়েলের লোকদের একথা বলে দাও: একজন পুরুষের স্ত্রী তার কাছে বিশ্বস্ত নাও হতে পারে। অন্য কোনো পুরুষের সঙ্গে তার যৌন সম্পর্ক থাকতে পারে এবং এই ব্যাপারটি সে তার স্বামীর কাছে লুকোতে পারে। সে যে পাপ কাজ করছে সে সম্পর্কে তার স্বামীকে অবহিত করার জন্য সেখানে কেউ নাও থাকতে পারে। তার অন্যায় কাজকর্ম সম্পর্কে তার স্বামী কোনোদিনই কোনো কিছুই নাও জানতে পারে এবং সেই স্ত্রীলোক তার পাপকর্ম সম্পর্কে তার স্বামীকে অবহিত নাও করতে পারে। কিন্তু স্ত্রী যে পাপ কার্য করে সেই ব্যাপারে স্বামী সন্দেহ করতে শুরু করতে পারে। সে ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠতে পারে। তার মনে এই বিশ্বাস হতে পারে যে তার স্ত্রী তার কাছে আর পবিত্র এবং সৎ নেই। যদি তাই হয়, তাহলে সে অবশ্যই তার স্ত্রীকে যাজকের কাছে নিয়ে যাবে। সেই স্বামী অবশ্যই ৪ কাপ যবের ময়দা নৈবেদ্য হিসাবে প্রদান করবে। সে সেই যবের ময়দার মধ্যে কোনো তেল বা ধূপধূনা দেবে না। কারণ এটি এক ঈর্ষান্বিত স্বামীর আনা শস্য নৈবেদ্য। এই নৈবেদ্য প্রদান ঐ স্ত্রীলোকটিকে তার দোষ স্মরণ করাবার জন্য। যাজক সেই স্ত্রীকে প্রভুর সামনে নিয়ে যাবে এবং সেখানে দাঁড় করিয়ে রাখবে। এরপর যাজক পবিত্র জল নিয়ে আসবে এবং একটি মাটির পাত্রে তা রাখবে। যাজক পবিত্র তাঁবুর মেঝের থেকে কিছু ধুলো তুলে সেই জলে রাখবে। তারপর যাজক ঐ স্ত্রীলোককে প্রভুর সামনে দাঁড় করাবে। এরপর যাজক সেই স্ত্রীর চুল আলগা করে দেবে এবং তার হাতে সেই নৈবেদ্য রাখবে। এই নৈবেদ্যটি সেই যবের ময়দা যা তার স্বামী ঈর্ষান্বিত হয়েছিল বলে এনেছিল। এই একই সময়ে যাজকের হাতে সেই তিক্ত জল থাকবে যা অভিশাপ নিয়ে আসে। এরপর যাজক সেই স্ত্রীকে দিব্য করিয়ে বলবেন যে: 'যদি তুমি অন্য কোনো পুরুষের সঙ্গে না শুয়ে থাকো এবং তুমি যদি তোমার বিবাহিত জীবনের সময়ে স্বামীর বিরুদ্ধে কোনো পাপ না করে থাকো তাহলে অভিশাপ বহনকারী এই তিক্ত জল তোমার কোনো ক্ষতি করবে না। কিন্তু তুমি যদি তোমার স্বামী নয় এমন কোনোও পুরুষের সঙ্গে যৌন সম্পর্ক করে তোমার স্বামীর বিরুদ্ধে যৌন পাপ করে থাক, তাহলে তুমি শুচি নও। যদি তা সত্যি হয়, তাহলে এই বিশেষ জল পান করলে তোমাকে প্রচুর সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে। তুমি কোনো সন্তানের জন্ম দিতে পারবে না। এবং তুমি যদি এখন সন্তানসম্ভবা হয়ে থাকো, তাহলে তোমার সন্তান মারা যাবে। তাহলে তোমার লোকরা তোমাকে ত্যাগ করবে এবং তোমার সম্পর্কে কু-কথা কথা বলবে।'এরপর যাজক অবশ্যই সেই স্ত্রীকে প্রভুর কাছে এক বিশেষ প্রতিশ্রুতি করার জন্য বলবে। যদি স্ত্রী মিথ্যে কথা বলে তাহলে তার পক্ষে এই খারাপ ঘটনাগুলো যে ঘটবে সে ব্যাপারে তাকে অবশ্যই সম্মত হতে হবে। যাজক অবশ্যই বলবে, 'তুমি অবশ্যই এই জল পান করবে যা সমস্যার সৃষ্টি করে। যদি তুমি পাপ করে থাকো, তাহলে তুমি বন্ধ্যা হয়ে যাবে, আর যদি তুমি সন্তানসম্ভবা হও, তাহলে তোমার গর্ভের শিশু জন্মের আগেই মারা যাবে। এবং সেই স্ত্রী বলবে: 'তুমি যা বলবে আমি সেই মতো কাজ করতে সম্মত হলাম। যাজক

তখন সেই অভিশাপগুলো একটি গোটানো পুঁথিতে লিখে রাখবে। এরপরে সে জল দিয়ে সেই বাণীগুলো ধুয়ে ফেলবে। এরপর সেই স্ত্রীকে সেই জল পান করতে হবে যা সমস্যার সৃষ্টি করে। এই জল তার মধ্যে প্রবেশ করবে এবং যদি সে দোষী হয় তাহলে এটি তার পক্ষে খুবই যন্ত্রণাদায়ক হবে। এরপর যাজক সেই স্ত্রীর কাছ থেকে যে নৈবেদ্য দেওয়া হয়েছিল সেটি নেবে (ঈর্ষার জন্য নৈবেদ্য) এবং প্রভুর সম্মুখে উপস্থাপিত করবে। এরপর যাজক সেটিকে বেদীর উপরে নিয়ে যাবে। যাজক এক মুঠো শস্য নিয়ে সেটিকে বেদীর উপরে দগ্ধ করবে। এরপর সে সেই স্ত্রীকে জলপান করতে বলবে। যদি সেই স্ত্রী তার স্বামীর বিরুদ্ধে যৌন পাপ করে থাকে, তাহলে এই জল তাকে বিপদে ফেলবে। জল তার শরীরে প্রবেশ করে তাকে প্রচুর যন্ত্রণা ভোগ করাবে। কোনো সন্তান যদি তার মধ্যে থাকে, তাহলে জন্মের আগেই তার মৃত্যু হবে এবং স্ত্রীলোক আর কোনোদিনই কোনো সন্তানের জন্ম দিতে পারবে না। সকলেই তার বিরুদ্ধাচারণ করবে। কিন্তু সেই স্ত্রী যদি তার স্বামীর বিরুদ্ধে যৌন পাপ না করে থাকে এবং সে যদি শুচিই থেকে থাকে, সেক্ষেত্রে এই বিচার বলে দেবে যে সে দোষী নয়। তখনই সে স্বাভাবিক হবে এবং সন্তানের জন্ম দিতে পারবে। এটাই হল ঈর্ষা সংক্রান্ত বিধি যা নির্দেশ দেয় কি করা উচিৎ যখন বিশেষ করে কোনো স্ত্রী তার সাথে বিবাহে আবদ্ধ স্বামীর বিরুদ্ধে পাপকর্মে লিপ্ত হয়। অথবা একজন পুরুষের কি করা উচিৎ যদি সে তার স্ত্রীর প্রতি ঈর্ষান্বিত হয় এবং সন্দেহ করে যে তার স্ত্রী তার বিরুদ্ধে পাপকর্মে লিপ্ত হয়েছে। যাজক সেই স্ত্রীকে অবশ্যই প্রভুর সামনে দাঁড়ানোর জন্য বলবে। এরপরে যাজক ঐ সমস্ত কাজগুলি সম্পন্ন করবে। এটাই বিধি। তাহলে কোনো রকম অন্যায়ের জন্যে স্বামী দোষী হবে না। কিন্তু যদি স্ত্রী কোনো যৌন পাপ করে থাকে তাহলে তাকে কষ্টভোগ করতে হবে।

ধর্মত্যাগ

ইয়াহুদী ধর্মে ধর্ম ত্যাগ করা, ধর্মের কোনো বিধান অস্বীকার করা কিংবা প্রভুর অবমাননা হয় এমন কোনো কথা বলা বা কাজ করার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। ধর্ম ত্যাগকারীকে পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা এবং স্বাভাবিকভাবে হত্যা উভয় প্রকার হত্যার কথাই বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্টে বলা হয়েছে। ধর্ম ত্যাগকারীর শাস্তি সম্পর্কে বলা হয়েছে,

Thou shalt not sacrifice unto the LORD thy God any bullock, or sheep, wherein is blemish, or any evil favouredness: for that is an abomination unto the LORD thy God. If there be found among you, within any of thy gates which the LORD thy God giveth thee, man or woman, that hath wrought wickedness in the sight of the LORD thy God, in transgressing his covenant, And hath gone and served other gods, and worshipped them, either the sun, or moon, or any of the host of heaven, which I have not commanded; And it be told thee, and thou hast heard of it, and enquired diligently, and, behold, it be true, and the thing certain, that such abomination is wrought in Israel: Then shalt thou bring forth that man or that woman, which have

committed that wicked thing, unto thy gates, even that man or that woman, and shalt stone them with stones, till they die.[১]

অর্থাৎ, তোমরা তোমাদের প্রভু, ঈশ্বরের কাছে খুঁত আছে এমন কোনও গরু বা মেষ বলি দেবে না। কেন? কারণ তোমাদের প্রভু ঈশ্বর এটিকে ঘৃণা করেন! প্রভু, তোমাদের ঈশ্বর, তোমাদের যে দেশ দিচ্ছেন সেখানে তোমরা তোমাদের গোষ্ঠীর এমন কোন পুরুষ অথবা স্ত্রীলোককে পেতে পার যে প্রভুর বিরুদ্ধে পাপ করেছে বা প্রভুর নিয়ম ভঙ্গ করেছে, এবং অন্যান্য দেবতার পূজা করেছে, এ-ও হতে পারে যে তারা সূর্য, চন্দ্র অথবা নক্ষত্রের পূজা করেছে। এগুলো প্রভুর আজ্ঞার বিরুদ্ধে যা আমি তোমাদের দিয়েছিলাম। যদি তোমরা এই ধরণের কোনো খবর শোনো, তাহলে তোমরা অবশ্যই যত্ন সহকারে খোঁজ খবর নেবে। এই রকম সাংঘাতিক ঘটনা ইস্রায়েলে যদি সত্যিই ঘটে এবং যদি তার সত্যতা সম্পর্কে তোমরা নিশ্চিত হও, তাহলে যে ব্যক্তি সেই খারাপ কাজ করেছিল তাকে তোমরা অবশ্যই শাস্তি দেবে। শহরের দরজার কাছে কোনো প্রকাশ্য রাস্তার সেই পুরুষ অথবা স্ত্রীলোককে তোমরা অবশ্যই নিয়ে যাবে এবং তাদের পাথর দিয়ে হত্যা করবে।

ধর্ম ত্যাগকারী নারীর শাস্তি

নিজ ধর্ম ত্যাগ করে নতুন ধর্ম গ্রহণকারী কিংবা প্রভুকে অস্বীকারকারীর শাস্তি নির্ধারিত হয়েছে মৃত্যুদণ্ড। এ ক্ষেত্রে নারীরা বিশেষ কোনো ছাড় পাবে না। বরং নারী ধর্ম ত্যাগকারী হলে তাকেও মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে। বাইবেলে বর্ণিত হয়েছে,

But that whoever would not seek the LORD, the God of Israel, should be put to death, whether young or old, man or woman.[২]

অর্থাৎ, ঠিক হল যে ব্যক্তি প্রভু ঈশ্বরের সেবা করতে প্রতিবাদ করবে তা সে যতো গণ্যমান্য হোক বা সাধারণ কেউ হোক তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে। এমনকি মহিলা হলেও তাকে মার্জনা করা হবে না।

ধর্ম ত্যাগের প্রমাণ প্রক্রিয়া

ধর্ম ত্যাগ প্রমাণিত হবে সাক্ষ্য আইনের মাধ্যমে। এ ক্ষেত্রে অন্তত দুইজন বিশ্বস্ত ও প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তির সাক্ষ্য আবশ্যক। তিনজন ব্যক্তির সাক্ষ্য অধিক প্রামাণ্য। তবে একজন ব্যক্তির সাক্ষ্য দ্বারা অপরাধীর অপরাধ প্রমাণিত হবে না এবং অপরাধীকে মৃত্যুদণ্ডও দেওয়া যাবে না। বাইবেলে বর্ণিত হয়েছে,

At the mouth of two witnesses, or three witnesses, shall he that is worthy of death be put to death; but at the mouth of one witness he shall not be put to death. The

---

[১] Deuteronomy 17:1-5
[২] 2 Chronicles 15:13

hands of the witnesses shall be first upon him to put him to death, and afterward the hands of all the people. So thou shalt put the evil away from among you.[১]

অর্থাৎ, কিন্তু যদি মাত্র একজন সাক্ষী বলে যে সেই ব্যক্তি খারাপ কাজ করেছে, তাহলে সেই ব্যক্তিকে কখনই মৃত্যুদণ্ড দেওয়া উচিৎ নয়। কিন্তু যদি দুজন অথবা তিনজন সাক্ষী বলে যে এটি সত্যি, তাহলে সেই ব্যক্তিকে অবশ্যই হত্যা করা উচিত। সেই ব্যক্তিকে হত্যা করার জন্য সাক্ষীরা অবশ্যই প্রথমে পাথর ছুঁড়বে। এরপর হত্যার কাজ সম্পূর্ণ করার জন্য অন্যান্য ব্যক্তিরা পাথর ছুঁড়বে। এই ভাবে তোমরা সেই মন্দকে তোমাদের মধ্যে থেকে সরিয়ে দেবে।

ধর্ম ত্যাগে প্ররোচনাদানকারীর শাস্তি

কেউ যদি কারো প্ররোচনায় প্ররোচিত হয়ে ধর্ম ত্যাগ করে তাহলে প্ররোচনা দানকারী ব্যক্তিকেও মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে। বাইবেলে বর্ণিত হয়েছে,

"If your brother, the son of your mother, or your son or your daughter or the wife you embrace or your friend who is as your own soul entices you secretly, saying, 'Let us go and serve other gods,' which neither you nor your fathers have known, some of the gods of the peoples who are around you, whether near you or far off from you, from the one end of the earth to the other, you shall not yield to him or listen to him, nor shall your eye pity him, nor shall you spare him, nor shall you conceal him. But you shall kill him. Your hand shall be first against him to put him to death, and afterward the hand of all the people.[২]

অর্থাৎ, কোনো ভাববাদী বা স্বপ্নদর্শক, যে স্বপ্ন ব্যাখ্যা করে, তোমাদের কাছে এসে কোনো চিহ্ন বা অলৌকিক কিছু দেখাতে পারে। আর সে তোমাদের যে চিহ্ন বা অলৌকিক কিছুর কথা বলেছিল তা সফল হলে সে হয়তো তোমাদের বলতে পারে, 'এসো আমরা অন্যান্য দেবতাদের (যে সব দেবতাদের তোমরা জান না।) অনুসরণ করি এবং সেবা করি।' সেই স্বপ্নদর্শকের কথা শুনো না। কেন? কারণ প্রভু, তোমাদের ঈশ্বর, তোমাদের পরীক্ষা করছেন। প্রভু জানতে চাইছেন যে, তোমরা তাঁকে তোমাদের সমস্ত হৃদয় এবং তোমাদের সমস্ত প্রাণ দিয়ে ভালোবাস কিনা। তোমরা অবশ্যই তোমাদের প্রভু, ঈশ্বরকে, অনুসরণ করবে! তাঁকে শ্রদ্ধা করবে। প্রভুর আজ্ঞাগুলো মেনে চলবে এবং তিনি তোমাদের যা বলেন সেগুলো করবে। প্রভুর সেবা করো এবং তাঁকে কখনও পরিত্যাগ করো না। এছাড়াও তোমরা অবশ্যই সেই ভাববাদী অথবা স্বপ্নদর্শককে হত্যা করবে। কারণ সে তোমাদের সেই প্রভু ঈশ্বরের বিরুদ্ধাচারণ করতে বলেছিল যে প্রভু তোমাদের মিশর দেশ থেকে বের করেনিয়ে এসেছিলেন এবং দাসত্ব থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন। প্রভু, তোমাদের ঈশ্বর, তোমাদের যেভাবে জীবনযাপন করার জন্য আজ্ঞা করেছিলেন সেই লোকটি তোমাদের সেই জীবন থেকে সরিয়ে আনার চেষ্টা করেছিল। সুতরাং তোমাদের লোকদের মধ্য থেকে সেই মন্দকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য তোমরা

---

[১] Deuteronomy 17: 6-7

[২] Deuteronomy 13:1-10

অবশ্যই সেই ব্যক্তিকে হত্যা করবে। তোমাদের ঘনিষ্ঠ কেউ অন্য দেবতাদের পূজা করার জন্য তোমাদের গোপনে পরামর্শ দিতে পারে। সে তোমাদের ভাই হতে পারে, তোমাদের পুত্র হতে পারে, তোমাদের কন্যা হতে পারে, যাকে ভালোবাসো সেই স্ত্রী হতে পারে অথবা তোমাদের ঘনিষ্ঠতম বন্ধুও হতে পারে। সেই লোকটি বলতে পারে, 'এবার আমরা যাই এবং অন্যান্য দেবতাদের সেবা করি।' (এরাই হল সেই দেবতা যাদের তোমরা জানতে না এবং তোমাদের পূর্বপুরুষরাও কোন দিন জানত না। এরাই হল তোমাদের চারপাশের অন্যান্য দেশের বসবাসকারী লোকদের কারোর কাছের বা কারোর দূরের দেবতা।) তোমরা সেই ব্যক্তির সঙ্গে অবশ্যই একমত হবে না। তার কথা শুনবে না। তার জন্য দুঃখিত হবে না। তাকে ছেড়ে দিও না এবং তাকে রক্ষা করো না। না! তোমরা অবশ্যই সেই ব্যক্তিকে হত্যা করবে। তোমরা অবশ্যই তাকে পাথর মেরে হত্যা করবে। তুমিই হবে প্রথম ব্যক্তি যে পাথর তুলবে এবং তার দিকে ছুঁড়ে মারবে। এরপর সমস্ত লোকরা তাকে হত্যা করার জন্য অবশ্যই পাথর ছুঁড়বে। কারণ সেই ব্যক্তি তোমাদের প্রভু, ঈশ্বরের, কাছ থেকে তোমাদের দূরে সরিয়ে নিয়ে আসার চেষ্টা করেছিল; অথচ সেই মিশর দেশ থেকে প্রভুই তোমাদের দাসত্ব থেকে বের করেনিয়ে এসেছিলেন।

ধর্ম ত্যাগকারীর ধ্বংস অনিবার্য

ধর্ম ত্যাগকারী ব্যক্তি বা গোত্র কোনোক্রমেই শাস্তি থেকে মুক্তি পাবে না। দুনিয়াতেই তারা মহা ধ্বংসযজ্ঞের মুখোমুখি হবে। বাইবেলে বর্ণিত হয়েছে,

Come now, let us reason together, says the LORD: though your sins are like scarlet, they shall be as white as snow; though they are red like crimson, they shall become like wool. If ye be willing and obedient, ye shall eat the good of the land: But if ye refuse and rebel, ye shall be devoured with the sword: for the mouth of the LORD hath spoken it.[১]

অর্থাৎ, প্রভু বলেন, এসো, এইসব বিষয়গুলি নিয়ে বিচার বিবেচনা, আলাপ আলোচনা করা যাক। যদিও তোমাদের পাপগুলো উজ্জ্বল লাল রঙের কাপড়ের মত, ওগুলো ধুয়ে ফেলা যায় এবং তোমরা তুষারের মতো সাদা হয়ে যেতে পারো। যদিও তোমাদের পাপ রক্তের মত লাল, তোমরা পশমের মতো শুভ্র হয়ে উঠতে পারো। আমাকে মেনে চললে, আমার কথা শুনলে তোমরা এই দেশ থেকে অনেক ভালো ভালো জিনিস পাবে। কিন্তু আমার কথা না শুনলে তোমরা আমার বিরুদ্ধাচারী হবে এবং তোমাদের শত্রুরা তোমাদের ধ্বংস করবে।"প্রভু স্বয়ং ঐ কথাগুলি বলেছেন।

ইয়াহুদী ধর্মে ধর্মত্যাগ করা একটি গর্হিত অপরাধ। তারা মনে করে থাকে ধর্মত্যাগের মাধ্যমে প্রভূকে অস্বীকার ও অবমাননা করা হয়। আর কোনো সৃষ্টির জন্য প্রভূর অবমাননা করা বৈধ নয়। যে কারণে এ ধর্মে ধর্ম ত্যাগের শাস্তি এ ধর্মে মৃত্যুদণ্ড ঘোষিত হয়েছে। এমনকি কোনো ব্যক্তি অন্য ব্যক্তি কোনো কথা বা কাজের দ্বারা ধর্মত্যাগে উৎসাহ দিলে ঐ ব্যক্তিকেও মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

[১] Isaiah 1:18-20

চুরি

সমাজে অশান্তি সৃষ্টির একটি বড় কারণ চৌর্যবৃত্তি। এর কারণে মানুষ নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে, জনজীবনে নেমে আসে আতংক। প্রাচীনকাল থেকেই একদল অসাধু মানুষ চৌর্যবৃত্তির সাথে সম্পৃক্ত। সমাজ, ধর্ম, দেশভেদে এর শাস্তিও ভিন্ন। ইয়াহুদী ধর্মে চৌর্যবৃত্তি একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ। বাইবেলের একাধিক অংশ চৌর্যবৃত্তি থেকে নিবৃত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, এ অপরাধের শাস্তি বিধান ঘোষণা করা হয়েছে। নিম্নে ইয়াহুদী ধর্মের আলোকে চৌর্যবৃত্তির শাস্তি বিধান তুলে ধরা হলো।

ভয়াবহ পাপের অন্তর্ভুক্ত

নিঃসন্দেহে চৌর্যবৃত্তি একটি নিষিদ্ধ কর্ম। কোনো সমাজ, সভ্যতা এ অপকর্ম সমর্থন করে না। চোর্যবৃত্তি ইয়াহুদী ধর্ম মতে ভয়াবহ এবং বড় পাপগুলোর একটি। বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্ট-এ উল্লেখ করা হয়েছে,

The LORD spoke to Moses, saying, “If anyone sins and commits a breach of faith against the LORD by deceiving his neighbor in a matter of deposit or security, or through robbery, or if he has oppressed his neighbor or has found something lost and lied about it, swearing falsely—in any of all the things that people do and sin thereby— if he has sinned and has realized his guilt and will restore what he took by robbery or what he got by oppression or the deposit that was committed to him or the lost thing that he found or anything about which he has sworn falsely, he shall restore it in full and shall add a fifth to it, and give it to him to whom it belongs on the day he realizes his guilt.[১]

অর্থাৎ, প্রভু মোশিকে বললেন, একজন মানুষ হয়তো এইসব পাপের মধ্যে কোন একটা করে প্রভুর বিরুদ্ধাচরণ করতে পারে। কারোর কোন বিষয় দেখাশোনা করার সময় সে ব্যাপারে কি ঘটেছে সে সম্বন্ধে মিথ্যা কথা বলতে পারে, সে কিছু চুরি করতে পারে অথবা কাউকে ঠকাতে পারে। অন্যের হারিয়ে যাওয়া জিনিস পেয়ে মিথ্যা বলতে পারে, অথবা তার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কাজ নাও করতে পারে। অথবা কোন মানুষ অন্য কোন রকমের অন্যায় করতে পারে। কিন্তু সে এই ধরণের কোন কাজ করলে পাপের দোষে দোষী হবে, সুতরাং সে ইস্রায়েলে কিছু চুরি করেছিল, সে অন্যকে ঠকিয়ে ইস্রায়েলে কিছু নিয়েছিল তা সে অবশ্যই ফিরিয়ে দেবে। অথবা অন্য লোকরা তাকে ইস্রায়েলে কিছু তত্ত্বাবধান করার জন্য দিয়েছিল অথবা যেসব জিনিস সে পেয়েও মিথ্যা বলেছিল, সব কিছু সে অবশ্যই ফিরিয়ে দেবে। সে ইস্রায়েলে কিছু মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তার পুরো দাম দেবে এবং তারপর সে অতিরিক্ত জিনিসটির এক পঞ্চমাংশের মত দামও অবশ্যই ফেরত দেবে। সে প্রকৃত অধিকারীর কাছেই সেই অর্থ দেবে। যেদিন সে তার দোষার্থক বলি নিয়ে সেদিন সে এই কাজটি করবে।

---

[১] Leviticus 6:1-5

উপরে উল্লিখিত অংশে দুটো বিষয় লক্ষ্যনীয়-

১. মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেওয়া, কারো সাথে প্রতারণা করার মতো ভয়াবহ পাপের কাজের সাথে চোর্যবৃত্তিকেও উল্লেখ করা হয়েছে।

২. মিথ্যা প্রতিশ্রুতি, প্রতারণা কিংবা চোর্যবৃত্তির মাধ্যমে অর্জিত সম্পদ ফিরিয়ে দেওয়ার কঠোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

চোর অভিশপ্ত

ইয়াহুদী ধর্মের ধর্মীয় গ্রন্থের বিবরণ অনুযায়ী চোর অভিশপ্তদের অন্তর্ভুক্ত। স্বয়ং প্রভু চোর এবং মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দানকারীকে তাদের কৃত অপরাধের জন্য অভিশাপ দিয়ে থাকেন। বাইবেলে বর্ণিত হয়েছে,

Then said he unto me, This is the curse that goeth forth over the face of the whole earth: for every one that stealeth shall be cut off as on this side according to it; and every one that sweareth shall be cut off as on that side according to it.[১]

অর্থাৎ, তিনি আমায় বললেন, "এই গোটানো হাতে লেখা পুঁথিতে অভিশাপ লেখা রয়েছে। হাতে লেখা পুঁথির একপাশে চোরদের জন্য অভিশাপ লেখা এবং অন্য পাশে সেইসব লোকদের জন্য অভিশাপ লেখা যারা মিথ্যা প্রতিশ্রুতি করে।

চোর ধ্বংস প্রাপ্ত হবে

চোর তার অপরাধে জন্য অবশ্যই ধ্বংস প্রাপ্ত হবে। সে পার্থিব জীবনে এবং পরকালীন জীবনে উভয় জীবনেই শাস্তির মুখোমুখি হবে। বলা হয়েছে, I will send it out, declares the LORD of hosts, and it shall enter the house of the thief, and the house of him who swears falsely by my name. And it shall remain in his house and consume it, both timber and stones.[২]

অর্থাৎ, প্রভু সর্বশক্তিমান বলেছেন: "আমি চোরদের বাড়ী এবং যারা আমার নাম ব্যবহার করে মিথ্যা শপথ করে তাদের বাড়ী এই পুঁথি পাঠাব। এই পুঁথি সেই বাড়ীগুলিতে থাকবে এবং তাদের ধ্বংস করবে। এমনকি পাথর ও কাঠের পাত্রগুলিও এটি ধ্বংস করবে।"

ক্ষুধার্ত ব্যক্তির চুরির শাস্তি

ইয়াহুদী ধর্মের ধর্মীয় বিধান মতে ক্ষুধার্ত ব্যক্তি চুরি করলে তাকেও শাস্তির আওতায় আনা হবে। এক্ষেত্রে তার চুরিকৃত মালের সাত গুণ ক্ষতিপূরণ তাকে দিতে হবে। চুরির মতো অপরাধে লিপ্ত ব্যক্তিদের সাধারণত ইয়াহুদী সমাজ থেকে

---

[১] Zechariah 5 : 3
[২] Zechariah 5 : 4

সমাজচ্যুত করা হয় কিংবা একঘরে করে ফেলা হয়। এবং চোরকে প্রচণ্ড ঘৃণার চোখে দেখা হয়। তবে ক্ষুধার্ত ব্যক্তি চুরি করলে তাকে সমাজচ্যুত করা যাবে না, একঘরে করা যাবে না কিংবা ঘৃণার চোখেও দেখা যাবে না। যেহেতু সে পরিস্থিতির শিকার হয়ে চুরি করেছে। বাইবেলে বর্ণিত হয়েছে,

People do not despise a thief if he steals to satisfy his appetite when he is hungry, but if he is caught, he will pay sevenfold; he will give all the goods of his house.[১]

অর্থাৎ, ক্ষুধার্ত ব্যক্তি খাদ্য চুরি করতে পারে। লোকে তাকে ঘৃণা করে না। চুরি করার সময় ধরা পড়লে, সে যা চুরি করেছে তার সাতগুণ মূল্য তাকে দিতে হবে! ঐ মূল্য দিতে গিয়ে হয়তো সে সর্বস্বান্ত হবে! কিন্তু যারা তার প্রকৃত অবস্থা বোঝে তারা তার প্রতি শ্রদ্ধা হারাবে না।

গবাদি পশু চুরি

ইয়াহুদী ধর্মে সকল ধরনের গবাদি পশু চুরির জরিমানা কিংবা শাস্তি বিধান এক নয়। বরং ভিন্ন ভিন্ন পশুর জন্য ভিন্ন ভিন্ন জরিমানার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। বাইবেলে বর্ণিত হয়েছে,

"If a man steals an ox or a sheep, and kills it or sells it, he shall repay five oxen for an ox, and four sheep for a sheep. If a thief is found breaking in and is struck so that he dies, there shall be no bloodguilt for him, But if the sun has risen on him, there shall be bloodguilt for him. He shall surely pay. If he has nothing, then he shall be sold for his theft. If the stolen beast is found alive in his possession, whether it is an ox or a donkey or a sheep, he shall pay double.[২]

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি ষাঁড় বা মেষ চুরি করেছে তাকে কিভাবে শাস্তি দেবে? যদি সে প্রাণীটিকে হত্যা করে বা বিক্রি করে দেয় তবে সে সেটা ফেরৎ দিতে পারবে না, তাই তাকে একটা চুরি করা ষাঁড়ের বদলে পাঁচটা ষাঁড় কিনে দিতে হবে বা একটা মেষের বদলে চারটি মেষ দিতে হবে। তাকে চুরির জন্য জরিমানা দিতে হবে। যদি রাতের বেলায় সিঁধ কেটে চুরি করার সময় কোনও চোর মারা যায় তবে কেউই দোষী হবে না। কিন্তু যদি এটা দিনের বেলায় হয় তাহলে যে হত্যা করবে সে দায়ী হবে। যদি তার কাছে কিছু না থাকে তাহলে তাকে দাস হিসেবে বিক্রি করে দেওয়া হবে। যদি তুমি লোকটির কাছে জন্তুটিকে দেখতে পাও, তবে চোরকে অবশ্যই চুরি করা জন্তুটির মূল্যের দ্বিগুণ মূল্য দিতে হবে। প্রাণীটি ষাঁড় বা গাধা বা মেষ যাই হোক না কেন নিয়ম একই থাকবে।

---

[১] Proverbs 6:30-31
[২] Exodus 22:1-4

মানব সন্তান চুরি

ইয়াহুদী ধর্মে মানব সন্তান চুরিকে বড় ধরনের অপরাধ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এ ধর্মে যতগুলো অপরাধের কারণে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার বিধান রয়েছে তার মধ্যে মানব সন্তান চুরি একটি। বাইবেলে বর্ণিত হয়েছে, Whoever steals a man and sells him, and anyone found in possession of him, shall be put to death.[১]

অর্থাৎ, যদি কোনও ব্যক্তি কাউকে চুরি করে দাস হিসেবে বিক্রি করতে চায় বা নিজের দাস করে রাখতে চায় তাহলে তাকে হত্যা করা হবে।

চুরি মানুষের অর্থনৈতিক নিরাপত্তাহীনতা ও সামাজিক অস্থিতিশীলতার একটি বড় কারণ। ইয়াহুদী ধর্মে চুরি একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ। চুরির ব্যাপারে ইয়াহুদী ধর্মের আইনের বিশেষত্ব হচ্ছে, কোন ধরনের বস্তু বা বিষয় চুরি করলে কি শাস্তি ভোগ করতে হবে তা-ও উল্লেখ করা আছে।

ডাকাতি

চুরি হচ্ছে নিরস্ত্রভাবে কারো অজ্ঞাতসারে তার সম্পদ আত্মসাৎ করা। আর ডাকাতি হচ্ছে সশস্ত্র ভাবে, প্রকাশ্যে ত্রাস সৃষ্টি করে, ভয়ভীতি প্রদর্শন করে কারো সম্পদ আত্মসাৎ করা, কেউ সম্পদ প্রদানে অস্বীকার করলে শারীরিকভাবে আঘাত করা, ক্ষতিগ্রস্ত করা ইত্যাদি। ইয়াহুদী ধর্মে চুরি এবং ডাকাতি উভয়ই ভয়াবহ অপরাধ। বাইবেলে বর্ণিত হয়েছে,

Come, and let us return unto the LORD: for he hath torn, and he will heal us; he hath smitten, and he will bind us up. After two days will he revive us: in the third day he will raise us up, and we shall live in his sight. Then shall we know, if we follow on to know the LORD: his going forth is prepared as the morning; and he shall come unto us as the rain, as the latter and former rain unto the earth. O Ephraim, what shall I do unto thee? O Judah, what shall I do unto thee? for your goodness is as a morning cloud, and as the early dew it goeth away. Therefore have I hewed them by the prophets; I have slain them by the words of my mouth: and thy judgments are as the light that goeth forth. For I desired mercy, and not sacrifice; and the knowledge of God more than burnt offerings. But they like men have transgressed the covenant: there have they dealt treacherously against me. Gilead is a city of them that work iniquity, and is polluted with blood. And as troops of robbers wait for a man, so the company of priests murder in the way by consent: for they commit lewdness. I have seen an horrible thing in the house of Israel: there is the whoredom of

---

[১] Exodus 21:16

Ephraim, Israel is defiled. Also, O Judah, he hath set an harvest for thee, when I returned the captivity of my people.[১]

অর্থাৎ, এসো , চল আমরা প্রভুর কাছে ফিরে যাই। তিনি আমাদের আঘাত করেছেন, কিন্তু তিনিই আমাদের আরোগ্য করবেন। তিনি আমাদের আহত করেছিলেন, কিন্তু তিনি আমাদের (ক্ষতস্থানগুলিকে) পটি দিয়ে বেঁধে দেবেন। দুদিন বাদে তিনি আমাদের জীবন ফিরিয়ে দেবেন। তৃতীয় দিনে, তিনি আমাদের ওঠাবেন। তাহলে আমরা তাঁর সামনে বেঁচে থাকতে পারব। এসো, প্রভুর সম্বন্ধে আমরা জ্ঞান সঞ্চয় করি। প্রভুকে জানবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করি। যে রকম নিশ্চিত ভাবে আমরা জানি যে ভোর হতে চলেছে সে রকম ভাবেই আমরা নিশ্চিত যে তিনি আসছেন। প্রভু আমাদের কাছে বৃষ্টির মতো আসবেন, বসন্তের বৃষ্টির জল যেভাবে মাটিকে সিক্ত করে।" "ইফ্রয়িম, তোমার সঙ্গে আমি কি করব? যিহূদা, তোমার সঙ্গে আমি কি করব? তোমার বিশ্বস্ততা তো ভোরের কুয়াশার মতো, তোমার বিশ্বস্ততা তো শিশিরের মতো, যা সকালে মিলিয়ে যায়। তাই আমি তাদের ভাববাদীদের দ্বারা কেটে ফেলেছি। আমার আদেশেই তাদের হত্যা করা হয়েছে; যাতে ন্যায় তোমার কাছ থেকে আলোর মতো বেরিয়ে য়েতে পারে। কারণ, আমি বিশ্বাসপূর্ণ ভালোবাসা চাই, উৎসর্গ নয়। আমি চাই লোকে ঈশ্বরকে জানুক, হোমবলি উৎসর্গ নয়। কিন্তু লোকে চুক্তি ভেঙে ছিল, ঠিক আদম যে ভাবে ভেঙে ছিল। তাদের রাজ্যে তারা আমার প্রতি অবিশ্বস্ত। গিলিয়দ অধর্মচারীদের শহর। সেখানকার লোকরা চালাকি করে অন্যদের হত্যা করেছে। ডাকাতরা লুকিয়ে থাকে, পথে কাউকে আক্রমণ করার জন্য অপেক্ষা করে। একই ভাবে, যাজকরা শিখিমের রাস্তার ওপর অপেক্ষা করে এবং পথচারীদের আক্রমণ করে তারা অনেক অন্যায় করেছে। ইস্রায়েল জাতির মধ্যে একটি ভয়ঙ্কর জিনিস দেখেছি। ইফ্রয়িম ঈশ্বরের প্রতি অবিশ্বস্ত ছিল। পাপে ইস্রায়েল নোংরা হয়ে গেছে। যিহূদা, তোমার জন্য ফসল কাটারও একটা সময় আছে। যখন আমি আমার লোকদের বন্দী দশা থেকে ফিরিয়ে আনব, তখনই এটা ঘটবে।"

ইয়াহুদী ধর্মে সর্বাবস্থায় ডাকাতি প্রতিহত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এবং যিনি ডাকাত দ্বারা আক্রান্ত হবেন তাকে সাহয্য করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বাইবেলে বর্ণিত হয়েছে,

Thus saith the LORD; Go down to the house of the king of Judah, and speak there this word, And say, Hear the word of the LORD, O king of Judah, that sittest upon the throne of David, thou, and thy servants, and thy people that enter in by these gates: Thus saith the LORD; Execute ye judgment and righteousness, and deliver the spoiled out of the hand of the oppressor: and do no wrong, do no violence to the stranger, the fatherless, nor the widow, neither shed innocent blood in this place. For if ye do this thing indeed, then shall there enter in by the gates of this house kings sitting upon the throne of David, riding in chariots and on horses, he, and his servants, and his people. But if ye will not hear these words, I swear by myself, saith the LORD, that this house shall become a desolation. For thus saith the LORD unto

[১] Hosea 6 : 1-11

the king's house of Judah; Thou art Gilead unto me, and the head of Lebanon: yet surely I will make thee a wilderness, and cities which are not inhabited. And I will prepare destroyers against thee, every one with his weapons: and they shall cut down thy choice cedars, and cast them into the fire.[১]

অর্থাৎ, প্রভু বললেন: "যিরমিয়, রাজপ্রাসাদে যাও। যিহূদার রাজার কাছে গিয়ে এই ধর্মোপদেশ প্রচার করো: 'যিহূদার রাজা, প্রভুর বার্তা শোন। তুমি দায়ূদের সিংহাসন থেকে শাসন করছ, তাই শোন হে রাজা, তুমি এবং তোমার সভা পরিষদগণও শোন। জেরুশালেমের ফটক দিয়ে আসা তোমার লোকদেরও ঈশ্বরের বার্তা শুনতে হবে। প্রভু বললেন: যা ঠিক তাই করো। ডাকাতকে নয়, যার ডাকাতি হয়েছে তাকে রক্ষা করো। বিধবা মহিলাদের এবং অনাথ শিশুদের কোন ক্ষতি করো না। নিরীহ লোকদের মেরো না। যদি এই নির্দেশগুলো তোমরা মেনে চলো তাহলে এগুলি ঘটবে: দায়ূদের সিংহাসনে যে সব রাজারা অধিষ্ঠিত রয়েছে তারা জেরুশালেম শহরের ফটক দিয়ে আসা চালিয়ে যাবে। সঙ্গে থাকবে তাদের সভা পরিষদগণ। তারা সবাই রথে ঘোড়ায় চড়ে আসবে। কিন্তু যদি এই নির্দেশগুলি মানা না হয়, তাহলে প্রভু বলেছেন: আমি, প্রভু, প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি রাজার প্রাসাদ ধ্বংস হয়ে যাবে এবং সব কিছু জঞ্জালের স্তূপে পরিণত হবে।" যিহূদার রাজার রাজপ্রাসাদের সম্বন্ধে প্রভু যা বলেছেন তা হল:"এই প্রাসাদ হল গিলিয়দের অরণ্যের মতো উচ্চ। এই রাজপ্রাসাদ হল লিবানোনের পর্বতের মতো উচ্চ, কিন্তু এই প্রাসাদকে মরুভূমিতে পরিণত করব। এই প্রাসাদ নির্জন শহরের মতো একাকি দাঁড়িয়ে থাকবে। আমি ধ্বংসকারীদের এই প্রাসাদ ধ্বংস করতে পাঠাব। তারা প্রাসাদের সুদৃশ্য এরস কড়িকাঠগুলো কেটে ফেলবে এবং সেগুলোতে আগুন ধরিয়ে দেবে।

নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও কেউ ডাকাতির অপরাধ করলে তাকে সম্পদ অপহরণের দায় চুরির অনুরূপ শাস্তি ভোগ করতে হবে। ডাকাতি করার সময়ে কেউ নিহত হলে ডাকাতকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে। কারো হত্যার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড এ সম্পর্কে পরবর্তীতে আলোচনা করা হবে। ডাকাতি করার সময়ে কারো অঙ্গহানি ঘটলে যে অঙ্গ হানি হয়েছে ডাকাতেরও সে অঙ্গচ্ছেদ করা হবে। বাইবেলে বর্ণিত হয়েছে,

He that smiteth a man, so that he die, shall be surely put to death. And if a man lie not in wait, but God deliver him into his hand; then I will appoint thee a place whither he shall flee. But if a man come presumptuously upon his neighbour, to slay him with guile; thou shalt take him from mine altar, that he may die. And he that smiteth his father, or his mother, shall be surely put to death. And he that stealeth a man, and selleth him, or if he be found in his hand, he shall surely be put to death. And he that curseth his father, or his mother, shall surely be put to death. And if men strive

[১] Jeremiah 22 : 1-7

together, and one smite another with a stone, or with his fist, and he die not, but keepeth his bed: If he rise again, and walk abroad upon his staff, then shall he that smote him be quit: only he shall pay for the loss of his time, and shall cause him to be thoroughly healed. And if a man smite his servant, or his maid, with a rod, and he die under his hand; he shall be surely punished. Notwithstanding, if he continue a day or two, he shall not be punished: for he is his money. If men strive, and hurt a woman with child, so that her fruit depart from her, and yet no mischief follow: he shall be surely punished, according as the woman's husband will lay upon him; and he shall pay as the judges determine. And if any mischief follow, then thou shalt give life for life, Eye for eye, tooth for tooth, hand for hand, foot for foot, Burning for burning, wound for wound, stripe for stripe. And if a man smite the eye of his servant, or the eye of his maid, that it perish; he shall let him go free for his eye's sake. And if he smite out his manservant's tooth, or his maidservant's tooth; he shall let him go free for his tooth's sake. If an ox gore a man or a woman, that they die: then the ox shall be surely stoned, and his flesh shall not be eaten; but the owner of the ox shall be quit. But if the ox were wont to push with his horn in time past, and it hath been testified to his owner, and he hath not kept him in, but that he hath killed a man or a woman; the ox shall be stoned, and his owner also shall be put to death. If there be laid on him a sum of money, then he shall give for the ransom of his life whatsoever is laid upon him. Whether he have gored a son, or have gored a daughter, according to this judgment shall it be done unto him. If the ox shall push a manservant or a maidservant; he shall give unto their master thirty shekels of silver, and the ox shall be stoned. And if a man shall open a pit, or if a man shall dig a pit, and not cover it, and an ox or an ass fall therein; The owner of the pit shall make it good, and give money unto the owner of them; and the dead beast shall be his. And if one man's ox hurt another's, that he die; then they shall sell the live ox, and divide the money of it; and the dead ox also they shall divide. Or if it be known that the ox

hath used to push in time past, and his owner hath not kept him in; he shall surely pay ox for ox; and the dead shall be his own.[১]

অর্থাৎ, "যদি কোনও ব্যক্তি কাউকে আঘাত করে হত্যা করে তাহলে সেই ব্যক্তিকেও হত্যা করা হবে। কিন্তু যদি একটি দুর্ঘটনায় কোন ব্যক্তি মারা যায় তাহলে সেটা ঈশ্বরের অভিপ্রায় বলে ধরে নেওয়া হবে। আমি কতগুলি বিশেষ জায়গা বেছে দেব যেগুলি লোকরা নিরাপদ আশ্রয় হিসেবে ব্যবহার করবে। কিন্তু কোনও ব্যক্তি যদি ক্রোধ বা ঘৃণা থেকে কাউকে হত্যা করে তবে সে শাস্তি পাবে। তাকে আমার বেদী থেকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে হত্যা করা হবে। "যে ব্যক্তি পিতা বা মাতাকে আঘাত করবে তাকে হত্যা করা হবে। "যদি কোনও ব্যক্তি কাউকে চুরি করে দাস হিসেবে বিক্রি করতে চায় বা নিজের দাস করে রাখতে চায় তাহলে তাকে হত্যা করা হবে। "যে ব্যক্তি তার পিতা বা মাতাকে অভিশাপ দেয়, তাকে হত্যা করা হবে। "পরস্পর ঝগড়া করবার সময় যদি একজন অপর ব্যক্তিকে পাথর অথবা তার মুষ্টি দিয়ে আঘাত করে তাহলে তার শাস্তি পাওয়া উচিৎ। যে আহত সে যদি মারা না যায় তবে যে আঘাত করেছে তাকে হত্যা করা হবে না। আহত ব্যক্তি যদি কিছু সময়ের জন্য শয্যাশায়ী থাকে তাহলে যে আঘাত করেছে সে তার সময়ের ক্ষতিপূরণ দেবে, যতদিন না আহত ব্যক্তি সুস্থ হয়ে ওঠে। "কখনও কখনও মনিব তার পুরুষ বা স্ত্রী দাসদের প্রহার করে থাকে, যদি এই প্রহারে দাসটি মারা যায় তবে তার ঘাতক শাস্তি পাবে। কিন্তু যদি দাসটি মারা না গিয়ে কযেকদিন বাদে সেরে ওঠে তবে তার মনিবকে কিছু বলা হবে না কারণ সে তার দাসের জন্য অর্থ ব্যয় করে থাকে এবং সে দাসটি তার সম্পত্তি। "দুটি মানুষ ঝগড়া করার সময় যদি কোনও গর্ভবতী মহিলাকে আঘাত করে এবং এর ফলে যদি তার গর্ভপাত হয়ে যায় এবং অন্য কোন ক্ষতি না হয় তাহলে যে আঘাত করেছে সে শুধু তাকে জরিমানা দিয়ে ছাড়া পেয়ে যাবে। ঐ মহিলার স্বামী জরিমানার টাকার অংশ ঠিক করে দেবে। বিচারকরা এই ব্যাপারে তাকে সাহায্য করবে। কিন্তু যদি সেই মহিলার আঘাতের ফলে কোন ক্ষতি হয় তাহলে যে তাকে আঘাত করবে তাকে শাস্তি দেওয়া হবে, যে অন্যকে হত্যা করবে তাকেও মরতে হবে। একজনের জীবনের বদলে অন্যের জীবন নেওয়া হবে। তুমি চোখের বদলে চোখ নেবে, দাঁতের বদলে দাঁত, হাতের বদলে হাত, পায়ের বদলে পা নেবে। পোড়ার বদলে পোড়াবে, চোটের বদলে চোট দেবে, কাটার বদলে কাটবে। "যদি কোন ব্যক্তি তার দাসের চোখে আঘাত করে তাকে অন্ধ করে দেয় তাহলে সেই দাসকে মুক্তি দিয়ে দিতে হবে। তার চোখ হল তার মুক্তির মূল্য, স্ত্রী বা পুরুষ দাসের ক্ষেত্রে এই একই নিয়ম খাটবে। যদি কোনও মনিব তার দাসকে মুখে আঘাত করে তার দাঁত ফেলে দেয় তবে তাকে মুক্তি দিতে হবে, তার দাঁত হবে তার মুক্তির মূল্য, এই নিয়ম স্ত্রী ও পুরুষ উভয় দাসের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে। "যদি কোনও ব্যক্তির ষাঁড় কোন স্ত্রী বা পুরুষকে মেরে ফেলে তাহলে ঐ ষাঁড়কে পাথর দিয়ে মেরে হত্যা করতে হবে। ঐ ষাঁড়কে খাওয়াও যাবে না। কিন্তু ষাঁড়ের মালিক দোষী হবে না। কিন্তু যদি ষাঁড়টি ইতিপূর্বে কাউকে আঘাত করে

[১] Exodus 21 : 12-36

থাকে এবং তার মালিককে সতর্ক করে দেওয়া হয়ে থাকে, তাহলে সেই মালিককে দোষী সাব্যস্ত করা হবে। কেননা সে জানা সত্ত্বেও ষাঁড়টিকে যথাস্থানে বেঁধে বা আটকে রাখেনি। আর যদি এরকম ষাঁড়কে ছেড়ে রাখার ফলে কারো প্রাণ যায় তাহলে সেই ষাঁড় ও তার মালিক দুজনকেই পাথর দিয়ে আঘাত করে মেরে ফেলা হবে। কিন্তু মৃত ব্যক্তির পরিবার যদি অর্থ গ্রহণ করে তাহলে ষাঁড়ের মালিককে মারা হবে না। কিন্তু সে বিচারকদের নির্ধারিত টাকার অঙ্ক জরিমানা দেবে। "এই একই নিয়ম বলবৎ থাকবে যদি ষাঁড়টি কোনও লোকের পুত্র বা কন্যাকে হত্যা করে। কিন্তু ষাঁড়টি যদি কোনও দাসকে হত্যা করে তবে তার মালিককে ৩০ টুকরো রূপো দিতে হবে মূল্য হিসেবে এবং ষাঁড়টিকে পাথর দিয়ে মারা হবে। এই নিয়ম স্ত্রী ও পুরুষ দাসের ক্ষেত্রে একই হবে। "কোনও ব্যক্তি কুঁয়োর ওপরের ঢাকা সরিয়ে দিতে পারে বা গভীর গর্ত খুঁড়ে ঢাকা না দিয়ে রাখতে পারে। যদি কোন ব্যক্তির পোষা জন্তু এসে এই গর্তে পড়ে যায় তবে গর্তের মালিককে দায়ী করা হবে। গর্তের মালিককে জন্তুটির মূল্য দিতে হবে কিন্তু মূল্য দেওয়ার পর সে জন্তুটির দেহ নিজের কাছে রাখার অধিকার পাবে। "যদি এক ব্যক্তির ষাঁড় আরেক ব্যক্তির ষাঁড়কে হত্যা করে তখন জীবিত ষাঁড়টিকে বিক্রি করে দিতে হবে। উভয় ব্যক্তি সেই বিক্রয় মূল্যের অর্ধেক ভাগ পাবে এবং মৃত ষাঁড়টির দেহের অর্ধেক ভাগ পাবে। যদি কারো ষাঁড় অন্য কারো ব্যক্তির জন্তুদের গুঁতিয়ে মেরে ফেলার জন্য পরিচিত থাকে, তবে সেই ষাঁড়ের মালিককে তার জন্য দায়ী করা হবে। যদি ষাঁড়টি অন্য ষাঁড়কে মেরে ফেলে, তাহলে তার মালিককেই দায়ী করা হবে কারণ সে ষাঁড়টিকে ছেড়ে রেখেছে। তাকে অবশ্যই মৃত ষাঁড়ের মূল্য দিতে হবে কিন্তু মৃত ষাঁড়টি সে নিজের জন্য রাখতে পারে।

এ সম্পর্কে বাইবেলে আরও বর্ণিত হয়েছে,

And he that killeth any man shall surely be put to death. And he that killeth a beast shall make it good; beast for beast. And if a man cause a blemish in his neighbour; as he hath done, so shall it be done to him; Breach for breach, eye for eye, tooth for tooth: as he hath caused a blemish in a man, so shall it be done to him again. And he that killeth a beast, he shall restore it: and he that killeth a man, he shall be put to death. [১]

অর্থাৎ, "যদি কোন ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তিকে হত্যা করে তবে সে অবশ্যই মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হবে। কোন ব্যক্তি যদি কারো পশু হত্যা করে তবে সে তার জায়গায় আর একটি পশু দেবে। "কোন ব্যক্তি তার প্রতিবেশীকে আঘাত করলে ঠিক সেই ধরণের আঘাত দিয়ে লোকটিকে শাস্তি দিতে হবে। ভাঙ্গা হাড়ের বদলে ভাঙ্গা হাড়; চোখের বদলে চোখ এবং দাঁতের বদলে দাঁত। লোকে অন্যকে যে ধরণের আঘাত দেয়, ঠিক সেই ধরণের আঘাত দিয়ে তাকে শাস্তি দিতে

[১] Leviticus 24 : 17-22

হবে। সুতরাং যদি কোন ব্যক্তি এক প্রাণী হত্যা করে তাহলে ব্যক্তিকে অবশ্যই প্রাণীর জন্য ক্ষতিপূরণ দিতে হবে; কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে হত্যা করে, তাহলে সে অবশ্যই মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হবে।

চুরি-ডাকাতি উভয়ই ইয়াহুদী ধর্মে নিন্দনীয় এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ। সম্পদ হরণের অপরাধে ডাকাতকে প্রথমত চুরির শাস্তি প্রদানের কথা এ ধর্মেও আইনে বলা আছে। সেই সাথে ডাকাতি করার সময়ে কোনো ব্যক্তি হতাহত হলে এর জন্য নির্দিষ্ট ক্ষতিপূরণ প্রদানের কথা বলা হয়েছে।

হত্যা

পৃথিবীর সব ধর্মেই হত্যা নিষিদ্ধ। এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে হত্যার শাস্তি প্রাণদণ্ড। ইয়াহুদী ধর্মেও অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা নিষিদ্ধ। ইয়াহুদী ধর্ম গ্রন্থগুলোতে বারংবার মানব হত্যা করা থেকে বিরত থাকার কঠোর নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। যেমন-বর্ণিত হয়েছে,

You shall not murder.[১] অর্থাৎ, তুমি হত্যা করবে না।

ঘৃণাবশত ইচ্ছাকৃত হত্যা

কারো হত্যার বিচার করার ক্ষেত্রে প্রথমেই দেখতে হবে হত্যার প্রেক্ষাপট। পর্যালোচনা করতে হবে নিহত ব্যক্তির সাথে হত্যাকারীর পারস্পরিক সম্পর্ক। খুঁজে বের করতে হবে হত্যা করার কারণ। এসব বিষয় পূর্ণাঙ্গরূপে পরীক্ষা করার পর যদি বিচারকমণ্ডলী নিশ্চিত হন যে, হত্যাকারী ব্যক্তি নিহত ব্যক্তির ওপর ঘৃণাবশত, ইচ্ছাকৃত ভাবে হত্যা করেছে তাহলে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে। বাইবেলে বর্ণিত হয়েছে,

And if he smite him with an instrument of iron, so that he die, he is a murderer: the murderer shall surely be put to death. And if he smite him with throwing a stone, wherewith he may die, and he die, he is a murderer: the murderer shall surely be put to death. Or if he smite him with a hand weapon of wood, wherewith he may die, and he die, he is a murderer: the murderer shall surely be put to death. The revenger of blood himself shall slay the murderer: when he meeteth him, he shall slay him. But if he thrust him of hatred, or hurl at him by laying of wait, that he die; Or in enmity smite him with his hand, that he die: he that smote him shall surely be put to death; for he is a murderer: the revenger of blood shall slay the murderer, when he meeteth him.[২]

---

[১] Deuteronomy 5:17; Exodus 20:13
[২] Numbers 35 : 16-21

অর্থাৎ, যদি কোনো ব্যক্তি লোহার অস্ত্র ব্যবহার করে কাউকে এমন আঘাত করে যে সেই ব্যক্তি মারা যায়, তবে সেই ব্যক্তিকে অবশ্যই মরতে হবে। যদি কোনো ব্যক্তি এমন কোনো প্রস্তরখণ্ড নেয় এবং তা দিয়ে যদি সে কাউকে হত্যা করে, তাহলে সেই ব্যক্তিকে অবশ্যই মরতে হবে। (কিন্তু প্রস্তরখণ্ডটি যেন অবশ্যই সেই পরিমাপের হয় যেটিকে লোকদের হত্যা করার কাজে সাধারণভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।) যদি কোনো ব্যক্তি কাউকে হত্যা করার জন্য কোনো কাঠের টুকরো ব্যবহার করে, যা দিয়ে হত্যা করা যায়, তাহলে সেই ব্যক্তিকে অবশ্যই মরতে হবে। (কাঠের টুকরোটি যেন অবশ্যই একটি অস্ত্র হয় যেটিকে লোকরা সাধারণতঃ লোকদের হত্যা করার কাজে ব্যবহার করে।) মৃত ব্যক্তির পরিবারের একজন সদস্য সেই হত্যাকারীর পেছনে তাড়া করে তাকে হত্যা করতে পারে। কোন ব্যক্তি যদি তার হাত দিয়ে কাউকে এমন আঘাত করে যে তার মৃত্যু হয় অথবা যদি সে কাউকে ধাক্কা দিয়ে হত্যা করে, অথবা যদি কোনো কিছু ছুঁড়ে তাকে হত্যা করে এবং হত্যাকারী সেটি ঘৃণাবশতঃ করে তাহলে সে একজন খুনী। তাকে অবশ্যই হত্যা করা উচিৎ। মৃত ব্যক্তির পরিবারের যে কোনো একজন সদস্য সেই হত্যাকারীর পশ্চাদ্ধাবন করে তাকে হত্যা করতে পারে।

ভুলবশত অনিচ্ছাকৃত হত্যা

আদালতে কোনো হত্যা মামলা দায়ের করা হলে বিচারকগণ হত্যার কারণ নিশ্চিত হবেন। যদি প্রমাণিত হয় যে ঘৃণাবশত ইচ্ছাকৃত নয় বরং ভুলবশত অনিচ্ছাকৃত হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে তাহলে হত্যাকারীকে হত্যা করা কিংবা বিচার করা যাবে না। তবে হত্যাকারী ব্যক্তি শহরের সীমা ত্যাগ করে বাইরেও যেতে পারবে না। বাইরে গেলে নিহত ব্যক্তির স্বজনরা তাকে হত্যা করে ফেললে এর কোনো বিচার হবে না। বাইবেলে বর্ণিত হয়েছে, But if he thrust him suddenly without enmity, or have cast upon him any thing without laying of wait, Or with any stone, wherewith a man may die, seeing him not, and cast it upon him, that he die, and was not his enemy, neither sought his harm: Then the congregation shall judge between the slayer and the revenger of blood according to these judgments: And the congregation shall deliver the slayer out of the hand of the revenger of blood, and the congregation shall restore him to the city of his refuge, whither he was fled: and he shall abide in it unto the death of the high priest, which was anointed with the holy oil. But if the slayer shall at any time come without the border of the city of his refuge, whither he was fled; And the revenger of blood find him without the borders of the city of his refuge, and the revenger of blood kill the slayer; he shall not be guilty of blood: Because he should have remained in the city

of his refuge until the death of the high priest: but after the death of the high priest the slayer shall return into the land of his possession. So these things shall be for a statute of judgment unto you throughout your generations in all your dwellings.[১]

অর্থাৎ, কিন্তু একজন ব্যক্তি দুর্ভাগ্যবশতঃ অন্য কোনো ব্যক্তিকে হত্যা করতে পারে। সেই ব্যক্তি নিহত ব্যক্তিকে ঘৃণা করত না, এটি কেবলমাত্র একটি দুর্ঘটনা ছিল। অথবা, একজন ব্যক্তি কোনো কিছু ছুঁড়তে পারে এবং দুর্ঘটনাক্রমে অন্য কোনো ব্যক্তিকে হত্যা করতে পারে যদিও সে কাউকে হত্যা করার জন্য পরিকল্পনা করেনি। অথবা যার দ্বারা মারা যায় এমন কোন পাথর না দেখে কারোর উপরে ফেলে এবং সেই পাথরখণ্ডটির আঘাতে যদি ব্যক্তিটি খুন হয় অথচ সেই ব্যক্তি কাউকে হত্যা করার জন্য পরিকল্পনা করেনি। যদি সে রকম হয়, তাহলে বিচারক মণ্ডলীকে অবশ্যই স্থির করতে হবে কি করা উচিৎ। বিচারক মণ্ডলীর আদালত অবশ্যই সিদ্ধান্ত নেবে যে মৃত ব্যক্তির পরিবারের কোনো সদস্য সেই ব্যক্তিকে হত্যা করতে পারে কি না। মণ্ডলী যদি মৃত ব্যক্তির পরিবারের কাছ থেকে খুনীকে রক্ষা করার সিদ্ধান্ত নেয়, তাহলে বিচারক মণ্ডলী অবশ্যই তাকে তার সুরক্ষার শহরে ফিরিযে নিয়ে যাবে এবং পবিত্র তেলের দ্বারা অভিষিক্ত মহাযাজক মারা যাওয়া পর্যন্ত হত্যাকারী অবশ্যই সেখানে থাকবে। সেই ব্যক্তি তার শহরের সুরক্ষার সীমানার বাইরে অবশ্যই যাবে না। যদি সে সেই সীমানাগুলোর বাইরে যায়, এবং যদি মৃত ব্যক্তির পরিবারের কোনো সদস্য তাকে ধরতে পারে এবং তাকে হত্যা করে, তাহলে সেই সদস্য এই হত্যার জন্য দোষী হবে না। যে ব্যক্তি দুর্ঘটনাক্রমে কোনো একজনকে হত্যা করেছিল, সে মহাযাজক মারা যাওয়া পর্যন্ত অবশ্যই তার সুরক্ষার শহরে থাকবে। মহাযাজক মারা যাওয়ার পরে সে তার নিজের জায়গায় ফিরে যেতে পারে। তোমার লোকদের সমস্ত শহরে চিরকালের জন্য ঐগুলোই বিচার বিধি হবে।

হত্যা প্রমাণ প্রক্রিয়া

হত্যাকাণ্ড প্রমাণের একমাত্র উপায় হচ্ছে সাক্ষ্য। তবে হত্যকাণ্ড প্রমাণিত হওয়ার জন্য একজনের সাক্ষ্য কোনোক্রমেই গ্রহণযোগ্য নয়। একজনের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে কোনোভাবেই কাউকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া যাবে না। সেক্ষেত্রে একাধিক বিশ্বস্ত ব্যক্তির সাক্ষ্য প্রয়োজন হবে। বাইবেলে বর্ণিত হয়েছে, Whoso killeth any person, the murderer shall be put to death by the mouth of witnesses: but one witness shall not testify against any person to cause him to die.[২]

অর্থাৎ, যদি সেখানে কয়েকজন সাক্ষী থাকে তাহলেই একজন হত্যাকারীকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া উচিৎ। শুধুমাত্র একজন সাক্ষী থাকলে কোনো ব্যক্তিকেই মৃত্যুদণ্ড দেওয়া যাবে না।

---

[১] Numbers 35 : 22-29
[২] Numbers 35 : 30

রক্তপণ

ইয়াহুদী ধর্মে রক্তপণের কোনো বিধান রাখা হয়নি। বরং অপরাধীর অপরাধ প্রমাণিত হলে তাকে অবশ্যই মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে। কারণ রক্তপণ হত্যার সম্পূরক হতে পারে না। বাইবেলে বর্ণিত হয়েছে,

Moreover ye shall take no satisfaction for the life of a murderer, which is guilty of death: but he shall be surely put to death. And ye shall take no satisfaction for him that is fled to the city of his refuge, that he should come again to dwell in the land, until the death of the priest. So ye shall not pollute the land wherein ye are: for blood it defileth the land: and the land cannot be cleansed of the blood that is shed therein, but by the blood of him that shed it. Defile not therefore the land which ye shall inhabit, wherein I dwell: for I the LORD dwell among the children of Israel.[১]

অর্থাৎ, যদি কোনো ব্যক্তি খুনী হয়, তাহলে তাকে অবশ্যই মৃত্যুদণ্ড দেওয়া উচিৎ। অর্থ গ্রহণ করে তার শাস্তির কোনো প্রকার পরিবর্তন করো না। সেই খুনীকে অবশ্যই হত্যা করা উচিৎ। যদি কোনো ব্যক্তি কাউকে হত্যা করে সুরক্ষার শহরের কোনো একটিতে পালিয়ে যায়, তাহলে তাকে বাড়ীতে ফিরে যেতে দেওয়ার জন্য কোনো অর্থ গ্রহণ করো না। মহাযাজক মারা যাওয়া পর্যন্ত সেই ব্যক্তি অবশ্যই সেই শহরে থাকবে। নিরাপরাধের রক্তে তোমার দেশের সর্বনাশ হতে দিও না। যদি কোনো ব্যক্তি কাউকে হত্যা করে, তাহলে সেই অপরাধের একমাত্র শাস্তি হল সেই খুনীর মৃত্যুদণ্ড। অন্য কোনো প্রকার শাস্তিই দেশকে সেই অপরাধ থেকে মুক্ত করতে পারবে না। আমি প্রভু! আমি ইস্রায়েলের লোকদের সঙ্গে বাস করি। আমিও সেই দেশে থাকবো, সুতরাং নিরপরাধ লোকদের রক্তে এটিকে অপবিত্র করো না।

ইয়াহুদী ধর্মে হুদুদভুক্ত সকল অপরাধই অপরাধ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। এসব অপরধ থেকে বিরত থাকতে অত্যন্ত কঠোর ভাষায় নিষেধ করা হয়েছে। এসব অপরাধে লিপ্ত ব্যক্তির জন্য শাস্তিও ঘোষণা করা হয়েছে। যদিওবা সকল ক্ষেত্রেই দুনিয়ার জীবনে শাস্তি লাভের কথা বলা হয়নি। বরং কিছু কিছু ক্ষেত্র শুধু পরকালীন শাস্তির কথা বলা হয়েছে, কিছু কিছু ক্ষেত্রে পার্থিব এবং পরকালীন উভয় জগতের শাস্তির কথা বলা হয়েছে।

---

[১] Numbers 35 : 31-35

পঞ্চম অধ্যায়

খ্রিস্টধর্ম ও খ্রিস্টধর্মের শাস্তি আইন

প্রথম পরিচ্ছেদ : খ্রিস্টধর্ম পরিচিতি

খ্রিস্টধর্মের পরিচয়

বর্তমান পৃথিবীতে বিদ্যমান ধর্মগুলোর মধ্যে খ্রিস্ট[১] ধর্মের অনুসারী সর্বাধিক। হাস্টন স্মাইথ তার *The Religion of Man* গ্রন্থে বলেছেন, মানুষের ধর্মের মধ্যে খ্রিষ্টধর্মই সবচেয়ে সুদূর প্রসারী এবং এরাই সবচেয়ে অনুগামী।[২] হযরত ঈসা (আ.) (Jesus)-এর মাধ্যমে এ ধর্ম প্রচারিত হয়। ম্যাকডোনালের মতে, খ্রিস্ট ধর্ম হচ্ছে ইহুদী ধর্মমতের উপর ভিত্তি করে হযরত ঈসা (আ.) কর্তৃক প্রবর্তিত একেশ্বরবাদী ধর্ম। যে ধর্মে হযরত ঈসা (আ.) কে ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যস্থ বলে মনে করা হয়।[৩] এটি একটি মোক্ষবাদী, অমরত্ববাদী, প্রেমময় ঈশ্বরবাদী, স্বর্গীয় দূতে বিশ্বাসী, শেষ বিচারে বিশ্বাসী, শয়তান বা অশুভ শক্তিতে বিশ্বাসী, ঈশ্বরের পিতৃত্বে পূর্ণবিশ্বাসী, যীশুখ্রিস্টের ত্রাণতত্ত্বে বিশ্বাসী, কৃচ্ছতাবাদ বিরোধী, ত্রিত্ববাদী, বিশ্বজনীন ও প্রত্যাদিষ্ট ধর্ম।

খ্রিষ্ট বলতে কি বুঝায়

আরবীতে হযরত ঈসা (আ.) এর অনুসারীদের 'নাসারা' নামে অভিহিত করা হয়। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ তাদের 'আহলুল কিতাব' ও 'আহলুল ইঞ্জিল' নামে অভিহিত করেছেন। যেমন সূরা নিসায় খ্রিস্টান সম্প্রদায়কে উদ্দেশ্য করে মহান আল্লাহ বলেন,

قُلْ يَاَہْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰی كَلِمَۃٍ سَوَآءٍۣ بَیْنَنَا وَ بَیْنَكُمْ اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهَ وَ لَا نُشْرِکَ بِہٖ شَیْـًٔا وَّ لَا یَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُوْلُوا اشْہَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ

বল, 'হে আহলে কিতাব! এমন এক কথার দিকে আসো, যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে একই, তা এই যে, আমরা আল্লাহ ভিন্ন অন্য কারো 'ইবাদাত করব না এবং কোন কিছুকে তাঁর শরীক করব না এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে আমাদের মধ্যে কেউ কাউকে রব হিসেবে গ্রহণ করব না। তারপরও যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে বলে দাও, তোমরা এ বিষয়ে সাক্ষী থাক যে, আমরা আত্মসমর্পণকারী।[৪]

খ্রিস্টান সম্প্রদায়কে আহলুল ইঞ্জিল নামে অভিহিত করে মহান আল্লাহ বলেন,

وَ لْیَحْكُمْ اَہْلُ الْاِنْجِیْلِ بِمَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ فِیْہِ ؕ وَ مَنْ لَّمْ یَحْكُمْ بِمَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِکَ ہُمُ الْفٰسِقُوْنَ

ইঞ্জিলের অনুসারীগণ যেন আল্লাহ তাতে যে বিধান দিয়েছেন তদানুযায়ী বিচার ফয়সালা করে। আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তদানুযায়ী যারা বিচার ফায়সালা করে না তারাই ফাসিক। [৫]

---

[১] অভিসন্দর্ভের শিরোনামে 'খ্রিস্টন' শব্দটি ব্যবহার করা হলেও আলোচনার সুবিধার্থে অনেক স্থানে 'খ্রিস্টধর্ম' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে।

[২] Huston Smith, *The Religion of Man*, p. 266

[৩] A. A. Macdonell, *Lecture on Comparative Religion*, p. 1

[৪] আল কুরআন, ৩ : ৬৪

[৫] আল কুরআন, ৫ : ৪৭

পৃথিবীতে কল্যাণ ও মুক্তির লক্ষ্যে যুগে যুগে বহু মনীষীর আগমন ঘটেছে। তারা প্রত্যেকেই এক একটি ধর্মের প্রবর্তক ও প্রচারক ছিলেন। অনুরূপভাবে ঈসা (আ)ও ইঞ্জিল কিতাব নিয়ে আগমন করেছিলেন। তাই এই ধর্মের অনুসারীদের খ্রিষ্টান বলা হয়। নিম্নে খ্রিষ্ট শব্দের অর্থ আলোকপাত করা হলো।

খ্রিষ্ট শব্দের উৎপত্তি

ইংরেজি (Christ) (খ্রিষ্ট) শব্দটি গ্রীক শব্দ (Christus) হতে উদ্ভূত। হিব্রু ভাষায় যাকে মিসাইয়্যা নামে অভিহিত করা হয়। অনেকে তাঁকে যিশু নামে ডাকত। এই যিশুর ভক্তদেরকে প্রথম খ্রিষ্টান বলে অভিহিত করা হয়।

২. শাব্দিক অর্থে খ্রিষ্ট

খ্রিস্ট শব্দের আভিধানিক অর্থ স্বর্গীয় মহিমান্বিত ব্যক্তি বা ঈশ্বর প্রেরিত বা নির্বাচিত ইত্যাদি। আর এ ধর্মাবলম্বীদের খ্রিষ্টান বলা হয়।

৩. Hastle Smith-এর মতে- "খ্রিষ্টধর্ম মূলত একটি ঐতিহাসিক ধর্ম। এই ধর্ম কতকগুলো সার্বিক নীতি নয় বরং মূর্ত ঘটনা, বাস্তব ঐতিহাসিক ঘটনার উপরই এই ধর্মের ভিত্তি।"

৪. Maktolent বলেছেন- "এই ধর্ম ইহুদি ধর্মমতের উপর ভিত্তি করে খ্রিষ্টের নাম দ্বারা প্রবর্তিত একটি একেশ্বরবাদী ধর্ম।

পরিশেষে আমরা বলতে পারি খ্রিষ্ট শব্দ থেকে মূলত খ্রিষ্টান জাতি এসেছে। যারা মূলত আল্লাহর মনোনীত ইঞ্জিল কিতাবের অনুসারী ছিল এবং হযরত ঈসা (আ)কে নবী হিসেবে মেনে নিয়েছিল। কিন্তু কালক্রমে স্বার্থান্বেষী ধর্ম যাজকেরা তাতে মনগড়া রীতিনীতি প্রবেশ করিয়ে ভ্রান্ত করে ফেলেছে। তথাপি আজ সারা পৃথিবীতে অসংখ্য খ্রিষ্টান ধর্মের অনুসারী রয়েছে।

খ্রিস্টধর্মের প্রধান প্রধান ধর্মীয় বিশ্বাস

পৃথিবীতে আল্লাহ প্রদত্ত প্রতিটি ধর্মের জন্য আকীদা বা বিশ্বাস রয়েছে। যা প্রতিটি ধর্মের ভিত্তি বা foundation হিসেবে স্বীকৃত। তদ্রূপ খ্রিস্টীয় ধর্মের আকীদাও স্বকীয়তায় ভাস্কর। তাদের আকীদা ত্রিত্ববাদ ধর্মীয় যা পৃথিবীর অন্য ধর্মে নেই। সুতরাং খ্রিস্টধর্মীয় আকীদায় বিশ্বাসী একজন খ্রিস্টান পথভ্রষ্ট হিসেবে গণ্য।

খ্রিস্টধর্মের বিশ্বাস

খ্রিস্টধর্মের প্রধান প্রধান আকীদাগুলো তাদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির উপর গড়ে উঠেছে, যা নিম্নে উপস্থাপন করা হলো-

১. সকল খ্রিস্টানই গভীরভাবে বিশ্বাস করে যে, যিশুখ্রিস্টের মধ্য দিয়েই ঈশ্বরের প্রকাশ ঘটেছে।
২. খ্রিস্টানরা এ কথায় চরম বিশ্বাসী যে, তাদের ধর্ম মানুষের কাছে ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ।
৩. খ্রিস্টধর্মবাদীরা মাসীহর (যিশুর) উপদেশ পালনের উপর গুরুত্ব আরোপ করে।

৪. মানবজাতির ত্রাতা বা উদ্ধারকর্তা হিসেবে যার আবির্ভাবের প্রত্যাশা ইহুদিরা করেছিল । যিশুকেই সেই ত্রাতা হিসেবে গণ্য করে খ্রিস্ট উপাধিতে ভূষিত করে।

৫. নাজারাতে যিশুর ভক্তদেরই প্রথম খ্রিস্টান নামে অভিহিত করা হয়। ইহুদি ধর্মের সঙ্গে খ্রিস্টধর্মের গভীর সম্পর্ক থাকায় বর্তমান এবং প্রথম খ্রিস্টানরা সবাই ছিল আদি ইহুদি।

৬. খ্রিস্টধর্মে ঈশ্বরের যে স্বরূপ বর্ণনা করা হয়েছে তা হলো এই যে, ঈশ্বর অনন্ত ও অসীম । ঈশ্বর এক অসীম সত্ত্বা। ঈশ্বরের এই পদটি যে সত্ত্বাকে নির্দেশ করে, সে সত্ত্বা হলো সব সত্ত্বার উৎস এবং ভিত্তি।

৭. প্রত্যাদেশ

খ্রিস্টধর্মের অন্যতম বিশ্বাস হলো প্রত্যাদেশ। ঈশ্বর কর্তৃক প্রেরিত প্রত্যাদেশে খ্রিস্টানরা বিশ্বাসী। প্রত্যাদেশ বা ঈশ্বরের বাণী সম্পর্কে বাইবেলে বর্ণিত হয়েছে,

All scripture is given by inspiration of God, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness: That the man of God may be perfect, throughly furnished unto all good works.[১]

সমস্ত শাস্ত্রই ঈশ্বর দিয়েছেন এবং অনুযোগ, সংশোধন ও ন্যায়পরায়ণ জীবনযাপনের জন্য প্রতিটি বাক্যই সঠিক নির্দেশ দিতে পারে। যেন তার দ্বারা ঈশ্বরের লোক পরিপক্ক ও সমস্ত সৎ কর্মের জন্য সুসজ্জিত হয়।

৮. পুনরুত্থান বিশ্বাস

খ্রিস্টধর্ম পুনরুত্থানে বিশ্বাসী। এই ধর্ম বিশ্বাস করে যে, মৃত্যুর পরে জীবন আছে এবং সে জীবনে মানুষকে তার বর্তমানে জীবনের কর্মের পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব দিতে হবে। যেমন বাইবেলে বলা হয়েছে,

But as for the cowardly, the faithless, the detestable, as for murderers, the sexually immoral, sorcerers, idolaters, and all liars, their portion will be in the lake that burns with fire and sulfur, which is the second death.[২]

কিন্তু যাঁরা ভীরু, অবিশ্বাসী ঘৃণ্যলোক, নরঘাতক, যৌনপাপে পাপগ্রস্ত, মায়াবী, প্রতিমাপূজারী, যাঁরা মিথ্যাবাদী, এদের সকলের স্থান হবে সেই আগুন ও জ্বলন্ত গন্ধকের হ্রদে; এই হল দ্বিতীয় মৃত্যু।'

৯. পাপীদের উদ্ধারকারী

খ্রিস্ট মতবাদ অনুসারে, যিশু খ্রিস্ট (মাসীহ) পাপীদের উদ্ধারকারী। যিনি ইহকালীন জগতে অকল্যাণ ও মন্দ থেকে উদ্ধার করবেন।

১০. ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যস্থতাকারী যিশু

খ্রিস্টধর্মে মানুষ এবং ঈশ্বরের মাঝে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে যিশুর ভূমিকা অনস্বীকার্য। এই মধ্যস্থতার ব্যাপারে খ্রিস্টের আত্ম বলিদান বা জীবন উৎসর্গ একটি পূর্ণ বিষয়। কারণ তিনি যে কেবল শিক্ষক ছিলেন তা নয়; বরং তিনি তার মৃত্যুর দ্বারা মানুষকে পাপ থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন।

---

[১] 2 Timothy 3 : 16-17

[২] REVELATION, 21 : 8

ত্রিত্ববাদ : খ্রিস্টধর্মের বৈশিষ্ট্য

খ্রিস্টধর্মের মূলনীতির মধ্যে ত্রিত্ববাদ অন্যতম। খ্রিস্টানদের ধর্ম মতে ঈশ্বরের তিন রূপ পিতা ঈশ্বর (God the father) পুত্র ঈশ্বর (God the son) ও পবিত্র আত্মা (God the holy spirit)। এ ত্রিত্ব ঈশ্বরের সত্ত্বা বহিঃস্থত কোনো সত্ত্বা নয়। বরং ঈশ্বরের সত্ত্বায় অন্তর্ভূক্ত সত্ত্বা। অর্থাৎ একত্বের মধ্যে পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা।[১]

এ মতবাদ অনুসারে ঈশ্বর, পিতা, স্রষ্টা, সকল কিছুর আদি উৎস পুত্র হিসেবে তিনি যিশুর মধ্যে মূর্ত এবং পবিত্র আত্মা হিসেবে সমগ্র সৃষ্টিও আমাদের আত্মার মধ্যে বিরাজমান । আরো বলা হয় যে, তিনি ঈশ্বরের অবতার তিনি এক একে তিন । এটি কেবলমাত্র বাইবেলের আলোচনা। সেখানে ঈশ্বরকে এক ও অদ্বিতীয় বলে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে।

এছাড়া খ্রিস্টধর্মাবলম্বীরা এটা বিশ্বাস করে যে, একই ঈশ্বরের সমমর্যাদা সম্পন্ন ও সমশক্তি তিনটি রূপের মধ্য দিয়ে। প্রকাশ ঘটে পিতা-পুত্র এবং পবিত্র আত্মা। খ্রিস্টধর্মের দুইটি উল্লেখযোগ্য সপ্রদায় হলো ক্যাথলিক এবং প্রটেস্ট্যান্ট (Protestant) তারা উভয়ে একই মূলনীতিতে বিশ্বাসী হলেও দৃষ্টিভঙ্গি ও মতবাদের ক্ষেত্রে বৈপরীত্য লক্ষ্য করা যায়।

প্রটেস্ট্যান্টদের মতবাদ হলো মানুষ তার পথ চলার জন্য সব সময়ই শুধুমাত্র বাইবেলের উপর নির্ভর করবে। অন্যদিকে তাদের আরেকটি সম্প্রদায় অর্থোডক্স যারা কঠোরভাবে ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলার পক্ষে।

খ্রিস্টধর্মের বৈশিষ্ট্য

নিম্নে খ্রিস্টধর্মের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা হলো :

১. ত্রিত্ববাদ

খ্রিস্টধর্মের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে ত্রিত্ববাদ অন্যতম। এ ধর্মমতে, ঈশ্বরের রূপ তিনটি। যথা

ক. God the father তথা পিতারূপে ঈশ্বর,
খ. God The son তথা পুত্ররূপে ঈশ্বর এবং
গ. God the Holy spirit তথা পবিত্র আত্মারূপে ঈশ্বর।

এ সূত্র অনুসারে ঈশ্বর পিতা হিসেবে সকল কিছুর স্রষ্টা, সব সৃষ্টির আদি উৎস; পুত্র হিসেবে তিনি যিশুর মধ্যে মূর্ত এবং পবিত্র আত্মা হিসেবে তিনি সমস্ত সৃষ্টি ও মানুষের আত্মার মধ্যে বিরাজমান। ত্রিত্ববাদ খ্রিস্টধর্মের বৈশিষ্ট্য হলেও খ্রিস্টধর্ম ঈশ্বরের একত্বের কথাই বলে।

২. ফেরেশতার প্রতি বিশ্বাস

খ্রিস্টানরা ফেরেশতাদের বিশ্বাস করে। ইসলাম ধর্মে যেমন ফেরেশতাদেরকে নূর দিয়ে তৈরি করা মহান আল্লাহর এক বিশেষ প্রজাতির সৃষ্টি বলে মনে করা হয়, যাদেরকে তার প্রয়োজনে বিভিন্ন কর্মে নিয়োজিত রাখা হয়েছে। খ্রিস্টধর্মেও ফেরেশতাদের প্রতি তেমনি বিশ্বাস স্থাপনের কথা বলা হয়। বাইবেলে ফেরেশতা সম্পর্কে একাধিক বর্ণনা দেখা যায়। যেমন বলা হয়েছে, The Revelation of Jesus Christ, which God gave unto him, to shew

---

[১] ড. মোঃ ইব্রাহীম খলিল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০০

unto his servants things which must shortly come to pass; and he sent and signified it by his angel unto his servant John.[১]

এরপর আমি দেখলাম, পৃথিবীর চার কোনে চারজন স্বর্গদূত দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁরা পৃথিবীর চারটি বায়ুপ্রবাহকে আটকে রেখেছেন, যেন পৃথিবীর বা সমুদ্রের বা গাছের ওপর দিয়ে বাতাস না বয়।

৩. একেশ্বরবাদী ধর্ম

এক ও অদ্বিতীয় ঈশ্বরে বিশ্বাস এবং ঈশ্বরের কার্য-পদ্ধতিতে আস্থাই হল খ্রিস্টধর্মের মূল কথা। এ ধর্মে ঈশ্বরের প্রত্যাদেশের ওপর সবিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়। একেশ্বরবাদ মানলেও খ্রিস্টধর্মে সর্বেশ্বরবাদের স্থান নেই । ইহুদিদের মত খ্রিস্টানরাও বিশ্বাস করে, ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয় এবং তিনি সবকিছুর একমাত্র স্রষ্টা। সর্বশক্তির আধার হলেন তিনি।[২] বাইবেলে বর্ণিত হয়েছে, And Jesus answered him, The first of all the commandments is, Hear, O Israel; The Lord our God is one Lord: And thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind, and with all thy strength: this is the first commandment.[৩]

যীশু উত্তর দিলেন, 'এটাই প্রধান! 'শোন, হে ইস্রায়েল, আমাদের ঈশ্বর প্রভু একমাত্র প্রভু। তুমি তোমার সমস্ত হৃদয়, মন, প্রাণ ও সমস্ত শক্তি দিয়ে তোমার ঈশ্বর প্রভুকে ভালবাসবে।'

৪. শয়তান বা অশুভ শক্তিতে বিশ্বাস

পৃথিবীতে যে ঊারষ বা অশুভ শক্তি রয়েছে, খ্রিস্টধর্ম এতে বিশ্বাস করে। কারণ পৃথিবীতে যত অকল্যাণ ও পাপকাজ সাধিত হয় তার সবই হয় অশুভ শক্তির কুপ্রভাবে।

৫. ঈশ্বর ভালোবাসার প্রতীক

ঈশ্বর হচ্ছেন প্রেমময়। খ্রিস্টানদের মতে, ঈশ্বর হচ্ছেন Loving Father আর মানুষ হচ্ছে "Loving Child; ঈশ্বর হচ্ছেন 'Kind of God'. বাইবেলের নতুন নিয়মে মানব জাতির প্রতি ঈশ্বরের ভালোবাসার কথা বলা হয়েছে। এ ভালোবাসা ঈশ্বরের সত্ত্বাতেই বিধৃত। এ ভালবাসার জন্যই ধারণা করা হয় যে, ঈশ্বর মানুষের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ আনুগত্য দাবি করেন। বাইবেলে বর্ণিত হয়েছে,

And thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind, and with all thy strength: this is the first commandment.[৪]

তুমি তোমার সমস্ত হৃদয়, মন, প্রাণ ও সমস্ত শক্তি দিয়ে তোমার ঈশ্বর প্রভুকে ভালবাসবে।'

---

[১] Revelation 7:1
[২] ড. মোঃ ইব্রাহীম খলিল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯০
[৩] Mark 12 : 29-30
[৪] Mark 12 : 30

৬. অমরত্বে বিশ্বাস

খ্রিস্টানরা আত্মার অমরত্বে বিশ্বাস করে। তারা মনে করে, মানুষের মৃত্যু হলেও আত্মার মৃত্যু হয় না। আত্মা অবিনাশী, অমর।

৭. মোক্ষবাদী ধর্ম

খ্রিস্টানরা মনে করেন, যিশু ইচ্ছে করলে পাপীকে মুক্তি দিতে পারেন। এ ধর্মে মোক্ষ কথা হল, ঈশ্বর পুত্ররূপে পিতার ধারণার সাথে যুক্ত। কারণ তিনি নিষ্কলুষ প্রেমবশত সকলকে নিজের কাছে টেনে নেন। 'ক্রস' হল সেই ভালবাসার প্রতীক, যার দ্বারা তিনি মানুষের প্রায়শ্চিত্তকে কার্যকর করেছিলেন এবং চিরকালের জন্য সব পাপাকে ভালবাসার পথ অনুসরণ করে মোক্ষ লাভের নির্দেশ দিয়েছেন।[১]

৮. শেষ বিচারে বিশ্বাস

এ ধর্মের আরও একটি বৈশিষ্ট্য হল শেষ বিচারের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন। শেষ বিচারের দিনে মানুষকে আবার তাদের নিজ নিজ কর্মের হিসাব দেয়ার জন্য ডাকা হবে। মানুষ তার স্ব স্ব কর্মফল হিসেবে সেদিন পুরস্কার বা শাস্তি গ্রহণ করবে। যেমন পাপীর শাস্তি ভোগ সম্পর্কে বাইবেলে বর্ণিত হয়েছে,

But the fearful, and unbelieving, and the abominable, and murderers, and whoremongers, and sorcerers, and idolaters, and all liars, shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone: which is the second death.[২]

কিন্তু যাঁরা ভীরু, অবিশ্বাসী ঘৃন্যলোক, নরঘাতক, যৌনপাপে পাপগ্রস্ত, মায়াবী, প্রতিমাপূজারী, যাঁরা মিথ্যাবাদী, এদের সকলের স্থান হবে সেই আগুন ও জ্বলন্ত গন্ধকের হ্রদে; এই হল দ্বিতীয় মৃত্যু।'

৯. মূর্তিপূজার বিরোধী

খ্রিস্টধর্ম মূর্তিপূজার বিরোধী । তারা উপমা হিসেবে একমাত্র ঈশ্বরের অস্তিত্বকে স্বীকার করে। তারা কোনো দেব-দেবীর পূর্জা-অর্চনার ঘোর বিরোধী। এ ধর্মে একক ঈশ্বরের ইবাদত করতে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। বাইবেলে বর্ণিত হয়েছে,

But the hour cometh, and now is, when the true worshippers shall worship the Father in spirit and in truth: for the Father seeketh such to worship him. God is a Spirit: and they that worship him must worship him in spirit and in truth.[৩] সময় আসছে, বলতে কি তা এসে গেছে, যখন প্রকৃত উপাসনাকারীরা আত্মায় ও সত্যে পিতা ঈশ্বরের উপাসনা করবে। পিতা ঈশ্বরও এইরকম উপাসনাকারীদেরই চান। ঈশ্বর আত্মা, যাঁরা তাঁর উপাসনা করে তাদেরকে আত্মায় ও সত্যে উপাসনা করতে হবে।'

---

[১] ড. মোঃ ইব্রাহীম খলিল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯০
[২] Revelation 21:8
[৩] John 4 : 23-24

১০. প্রেমই খ্রিস্টধর্মের মূলমন্ত্র

সেবা, মায়ামমতা, স্নেহমর্মিতা, ভালোবাসা বা প্রেমই খ্রিস্টদর্শনের মূল বক্তব্য। বিশ্বের সকল মানুষের প্রতি ভালোবাসা এবং বিশ্ববাসীর সেবার কথা উক্ত ধর্মে বিধৃত হয়েছে। এ ব্যাপারে যিশু খ্রিস্ট বলেছেন-তোমার প্রতিবেশীর প্রতি ভালোবাসা ঈশ্বরকে ভালোবাসারই নামান্তর।

১১. কৃচ্ছ্রতাবাদের বিরোধী

খ্রিস্টধর্ম কৃচ্ছ্রতাবাদ সমর্থন করে না। নৈতিকতার দিক থেকে খ্রিস্ট মনোভাবকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে অনেকে মনে করেন যে, এটা জগতকে পরিত্যাগ করার শামিল এবং এটা অত্যন্ত কঠোর। যিশুর অনেক শিষ্য সংঘ ত্যাগ করেছিল তবুও কৃচ্ছতা তাদের উদ্দেশ্য ছিল না।

১২. পিতৃত্বে বিশ্বাসী

এই ধর্মের অন্যতম আকীদা হলো ঈশ্বরের পিতৃত্বে বিশ্বাস করা। তাদের দর্শন হলো সর্বশক্তিমান পিতার স্নেহদৃষ্টিতে সকল সন্তানই সমান। যিশু তার শিষ্যদের এই আশ্বাসই দিয়েছিলেন। যিশুখ্রিস্ট সকলকে সমানভাবে ভালোবাসতে উদ্বুদ্ধ করতেন।[১]

১৩. ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস, ভক্তি এবং তার ইচ্ছা অনুযায়ী কর্ম করাই এই ধর্মাবলম্বীদের ধার্মিকতা।

১৪. এই ধর্মে আহারের জন্য জীব হত্যা অনুমোদিত। কারণ ঈশ্বর সকল জীবকে উপর হতে নামিয়ে দিয়ে বলেছেনঃ তোমরা খাও।

১৫. মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতাকে ঈশ্বর সমর্থন করে এটা খ্রিস্টান দর্শন স্বীকার করে।

১৬. খ্রিস্টধর্ম সার্বজনীন ধর্ম। এ ধর্মে ধর্মান্তরিত হওয়া সম্ভব। কারণ এ ধর্মে ব্যক্তির স্বাধীনতা স্বীকৃত।

[১] ড. মোঃ ইব্রাহীম খলিল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯২

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : খ্রিস্টধর্মের শাস্তি আইন

মদ্যপান

মাদক গ্রহণ মানুষের মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর একটা বিষয়। খ্রিস্টধর্মে মাদক গ্রহণের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। ঈশ্বরের রাজ্যে অধার্মিক লোকদের কোন স্থান নেই। ব্যভিচার, প্রতিমা পূজা, লোভ-লালসা, সমকাম, পরনিন্দা ইত্যাদি অধার্মিক লোকদের কাজ। মদপানও অধর্ম বা ধর্ম বিরোধী কাজ, যা অধার্মিক লোকেরাই করে থাকে। মাদক সেবন করে অধর্ম চর্চা করার কারণে ঈশ্বরের রাজ্যে মাদক সেবনকারীর কোনো স্থান নেই। মাদক গ্রহণে নিরুৎসাহিত করে খ্রিস্টধর্মে বলা হয়েছে,

Or do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived: neither the sexually immoral, nor idolaters, nor adulterers, nor men who practice homosexuality, nor thieves, nor the greedy, nor drunkards, nor revilers, nor swindlers will inherit the kingdom of God. And such were some of you. But you were washed, you were sanctified, you were justified in the name of the Lord Jesus Christ and by the Spirit of our God. “All things are lawful for me,” but not all things are helpful. “All things are lawful for me,” but I will not be enslaved by anything.[১]

অর্থাৎ, তোমরা নিশ্চয় জান যে ঈশ্বরের রাজ্যে অধার্মিক লোকদের কোন স্থান নেই? নিজেদের ঠকিও না! যারা ব্যভিচারী, অনৈতিক যৌনচারী, যারা প্রতিমার পূজা করে, যারা পুংশ্চলী ও পুংসমকারী, ঈশ্বরের রাজ্যে এদের কোন অধিকার নেই। সেই রকম যারা চোর, লোভী, মাতাল, যারা পরনিন্দা করে ও যারা প্রতারক তারা ঈশ্বরের রাজ্যের অধিকারী হবে না। তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ এই ধরণের লোক ছিলে, কিন্তু তোমরা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নামে ও ঈশ্বরের আত্মায় নিজেদের ধৌত করেছ, পবিত্র হয়েছ, তোমরা ঈশ্বরের কাছে ধার্মিক প্রতিপন্ন হয়েছ। ‘সব কিছু করার অধিকার আমার আছে,’ কিন্তু সব কিছু করা যে হিতকর তা নয়। হ্যাঁ, ‘সব কিছু করার অধিকার আমার আছে,’ কিন্তু আমি কোন কিছুর দাস হব না।

বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে যে, কোনো ব্যক্তির মাদকাসক্ত হওয়ার পিছনে সবচেয়ে বড় কারণ মাদক সেবনকারীর সঙ্গী হওয়া। কেউ যাতে মাদকাসক্ত হয়ে না পড়ে সে কারণে মাদক সেবনকারীর সঙ্গ ত্যাগের কঠোর নির্দেশ খ্রিস্টধর্মে দেওয়া হয়েছে। এমনকি মাদক সেবনকারীদের সঙ্গে খাদ্য গ্রহণ করাও খ্রিস্টধর্মে নিষিদ্ধ। বর্ণিত হয়েছে,

But now I am writing to you not to associate with anyone who bears the name of brother if he is guilty of sexual immorality or greed, or is an idolater, reviler, drunkard, or swindler—not even to eat with such a one.[২]

---

[১] 1 Corinthians 6:9-12
[২] 1 Corinthians 5:11

অর্থাৎ, তবে আমি এখন লিখছি যে, যে কেউ নিজেকে বিশ্বাসী বলে পরিচয় দেয়, অথচ নষ্ট চরিত্রের লোক, লোভী, প্রতিমাপূজক, নিন্দুক, মাতাল বা ঠগবাজ এরকম লোকের সঙ্গে মেলামেশা করো না। এমন কি তার সঙ্গে খাওয়া দাওয়া করো না।

বাইবেলে বেশ কিছু বিষয়কে জঘন্য পাপ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। যেমন- ব্যভিচার, অশুচিতা, স্বেচ্ছাচারিতা, প্রতিমা পূজা, ডাইনিবিদ্যা, ঘৃণা, স্বার্থপরতা, হিংসা, ক্রোধ, নিজেদের মধ্যে বিতর্ক, মতভেদ, দলাদলি, ঈর্ষা ইত্যাদি। খ্রিস্টধর্ম ঘোষিত জঘন্য পাপসমূহের মধ্যে মাদক গ্রহণ এবং মাতলামি করাও অন্যতম বড় একটি পাপ। এসব পাপে যারা লিপ্ত হবে তাদের বিরুদ্ধে বাইবেলে বারংবার সাবধান করে দেওয়া হয়েছে, যারা এইসব কুকাজ করবে তাদের ঈশ্বরের রাজ্যে জায়গা হবে না। বর্ণিত হয়েছে,

And do not get drunk with wine, for that is debauchery, but be filled with the Spirit, Now the works of the flesh are evident: sexual immorality, impurity, sensuality, idolatry, sorcery, enmity, strife, jealousy, fits of anger, rivalries, dissensions, divisions, envy, drunkenness, orgies, and things like these. I warn you, as I warned you before, that those who do such things will not inherit the kingdom of God.[১]

অর্থাৎ, কিন্তু তোমরা যদি আত্মা দ্বারা পরিচালিত হও তবে তোমরা বিধি-ব্যবস্থার অধীনে নও। পাপ প্রবৃত্তির কাজগুলি স্পষ্ট; সেগুলি হল ব্যভিচার, অশুচিতা, স্বেচ্ছাচারিতা, প্রতিমা পূজা, ডাইনিবিদ্যা, ঘৃণা, স্বার্থপরতা, হিংসা, ক্রোধ, নিজেদের মধ্যে বিতর্ক, মতভেদ, দলাদলি, ঈর্ষা, মাতলামি, লাম্পট্য আর একই ধরণের অন্য অপরাধ। এর বিরুদ্ধে তোমাদের সাবধান করে দিচ্ছি যেমন এর আগেও করেছি, যারা এইসব কুকাজ করবে তাদের ঈশ্বরের রাজ্যে জায়গা হবে না।

ব্যভিচার

অশ্লীলতা, অবাধ যৌনাচার, ব্যভিচার ইত্যাদি অত্যন্ত গর্হিত ও লজ্জাজনক অপরাধ। এর মাধ্যমে মানুষের নৈতিক চরিত্র নষ্ট হয়, নষ্ট হয় বংশগত পবিত্রতা। মানুষকে যৌন অপরাধ থেকে বিরত রাখার একমাত্র স্বীকৃত মাধ্যম হচ্ছে বিবাহ। খ্রিস্টধর্মে বিবাহের প্রতি যথেষ্ট গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। যাতে করে মানুষ যৌন অপরাধ থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে রাখতে পারে। বর্ণিত হয়েছে,

Let marriage be held in honor among all, and let the marriage bed be undefiled, for God will judge the sexually immoral and adulterous.[২]

অর্থাৎ, বিবাহ বন্ধনকে তোমরা সবাই অবশ্য মর্যাদা দেবে, যাতে দুটি মানুষের মধ্যে পবিত্র সম্পর্ক রক্ষিত হয়, কারণ যারা ব্যভিচারী ও লম্পট, ঈশ্বর তাদের বিচার করবেন।

---

[১] Galatians 5:18-21
[২] Hebrews 13 : 4

খ্রিস্টধর্মে ব্যাভিচার হচ্ছে অপবিত্রতা। এ ধরণের অপবিত্রতা থেকে বেঁচে থেকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পবিত্র জীবন যাপনের নির্দেশ খ্রিস্টধর্মে দেওয়া হয়েছে। বর্ণিত হয়েছে,

For this is the will of God, your sanctification: that you abstain from sexual immorality; that each one of you know how to control his own body in holiness and honor, not in the passion of lust like the Gentiles who do not know God;[১] অর্থাৎ, ঈশ্বর চান যে তোমরা পবিত্র হও ও সবরকম যৌনপাপ থেকে দূরে থাক। ঈশ্বর চান তোমরা পুরুষরা প্রত্যেকে জানো কিভাবে পবিত্র ও সম্মানজনকভাবে নিজের স্ত্রীর সাথে বাস করতে হয়।

সব ধর্মেই কিছু বিষয় থাকে নিষিদ্ধ। যা মূলত পাপ কাজ হিসেবে পরিচিত। কারো দ্বারা পাপ কাজ সংঘটিত হলে তাকে শাস্তি পেতে হয়। খ্রিস্টধর্ম ঘোষিত বড় পাপসমূহের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে ব্যভিচার। ব্যভিচারের পাপ সম্পর্কে খ্রিস্টধর্মের ধর্ম গ্রন্থে বলা হয়েছে,

Now the works of the flesh are manifest, which are these; Adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness, Idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulations, wrath, strife, seditions, heresies, Envyings, murders, drunkenness, revellings, and such like: of the which I tell you before, as I have also told you in time past, that they which do such things shall not inherit the kingdom of God.[২]

অর্থাৎ, পাপ প্রবৃত্তির কাজগুলি স্পষ্ট; সেগুলি হল ব্যভিচার, অশুচিতা, স্বেচ্ছাচারিতা, প্রতিমা পূজা, ডাইনিবিদ্যা, ঘৃণা, স্বার্থপরতা, হিংসা, ক্রোধ, নিজেদের মধ্যে বিতর্ক, মতভেদ, দলাদলি, ঈর্ষা, মাতলামি, লাম্পট্য আর একই ধরণের অন্য অপরাধ। এর বিরুদ্ধে তোমাদের সাবধান করে দিচ্ছি যেমন এর আগেও করেছি, যারা এইসব কুকাজ করবে তাদের ঈশ্বরের রাজ্যে জায়গা হবে না।

খ্রিস্টধর্মে মন্দ বিষয় হিসেবে স্বীকৃত বিষয় সমূহের একটি ব্যভিচার। বর্ণিত হয়েছে, Put to death therefore what is earthly in you: sexual immorality, impurity, passion, evil desire, and covetousness, which is idolatry. For which things sake the wrath of God cometh on the children of disobedience:[৩]

অর্থাৎ, তাই তোমাদের জাগতিক স্বভাব থেকে সব মন্দ বিষয় দূর করে দাও। যেমন: যৌনপাপ, অপবিত্রতা, অশুচি চিন্তার বশবর্তী হওয়া, মন্দ বিষয়ের লালসা করা এবং লোভ এক প্রকার প্রতিমা পূজা। এইসবের জন্য ঈশ্বরের ক্রোধ হচ্ছে।

---

[১] 1 Thessalonians 4:3-5
[২] Galatians 5:19-21
[৩] Colossians 3:5-6

খ্রিস্টধর্মে সব ধরনের অশ্লীলতাই নিষিদ্ধ। ব্যভিচার হচ্ছে একটি অশ্লীল ও লজ্জাজনক অপরাধ। এ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে,

Be ye therefore followers of God, as dear children; And walk in love, as Christ also hath loved us, and hath given himself for us an offering and a sacrifice to God for a sweetsmelling savour. But fornication, and all uncleanness, or covetousness, let it not be once named among you, as becometh saints; Neither filthiness, nor foolish talking, nor jesting, which are not convenient: but rather giving of thanks. For this ye know, that no whoremonger, nor unclean person, nor covetous man, who is an idolater, hath any inheritance in the kingdom of Christ and of God.[১]

অর্থাৎ, তোমরা ঈশ্বরের সন্তান, তিনি তোমাদের ভালবাসেন; তাই ঈশ্বরের মতো হও। ভালবাসাপূর্ণ জীবনযাপন কর। খ্রীষ্ট আমাদের যেমন ভালবেসেছেন তেমনি করে অপরকে ভালবাস। খ্রীষ্ট আমাদের জন্য নিজেকে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে সৌরভযুক্ত বলিরূপে উৎসর্গ করলেন। তোমাদের মধ্যে যেন ব্যভিচার না থাকে। তোমাদের মধ্যে কোনরকম নৈতিক অশুদ্ধতা ও লোভ যেন না থাকে। কারণ ঈশ্বরের পবিত্র লোকদের মধ্যে এসব থাকা ঠিক নয়। লজ্জাজনক কোন কথাবার্তা তোমাদের মধ্যে যেন না হয়। বোকার মতো কথা বলো না, নোংরা রসিকতা করো না, এইসব তোমাদের উপযুক্ত নয়। তোমাদের উচিত ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেওয়া। একথা তোমাদের নিশ্চিতরূপে জানা ভাল; যারা যৌন পাপে লিপ্ত অথবা অপবিত্র জীবনযাপন করে অথবা লোভী, তারা খ্রীষ্টের ও ঈশ্বরের রাজ্যে কোন স্থান পাবে না, কারণ যে লোভী সে তো মূর্তি পূজারী।

ব্যভিচার থেকে বিরত থাকার নির্দেশ স্বয়ং ঈশ্বর প্রদান করেছেন। খ্রিস্টধর্মীয় গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, ঈশ্বর ব্যভিচার সম্পর্কে বলেন,

Flee from sexual immorality. Every other sin a person commits is outside the body,[২]

অর্থাৎ, যৌনপাপ থেকে দূরে থাক। যে ব্যক্তি পাপকার্য করে তা তার দেহের বাইরে করে, কিন্তু যে যৌনপাপ করে সে তার দেহের বিরুদ্ধেই পাপ করে।

ব্যভিচার থেকে বিরত থাকার নির্দেশ প্রদান করে অন্যত্র ঈশ্বর বলেন,

For the commandments, You shall not commit adultery, You shall not murder, You shall not steal, You shall not covet, and any other commandment, are summed up in this word: You shall love your neighbor as yourself.[৩]

[১] Ephesians 5: 1-5
[২] 1 Corinthians 6:18
[৩] Romans 13:9

অর্থাৎ, আমি একথা বলছি কারণ ঈশ্বরের এই আজ্ঞাগুলি অর্থাৎ, ব্যভিচার করবে না, নরহত্যা করবে না, চুরি করবে না, অপরের জিনিস আত্মসাৎ করবে না। আর অন্য যা কিছু আদেশ তিনি দিয়েছেন সে সবগুলি সংক্ষেপে এই একটি আদেশের মধ্যেই চলে আসে, নিজের মতো তোমার প্রতিবেশীকে ভালবাসো।

অন্যত্র বলা হয়েছে,

You know the commandments: Do not murder, Do not commit adultery, Do not steal, Do not bear false witness, Do not defraud, Honor your father and mother.[১]

অর্থাৎ, তুমি তো ঈশ্বরের সব আদেশ জানো, নরহত্যা কোরো না, ব্যভিচার কোরো না, চুরি কোরো না, বাবা-মাকে সম্মান কোরো।

খ্রিস্টধর্মীয় গ্রন্থে অতীতের জাতিসমূহের অনেক ঘটনা তুলে ধরা হয়েছে। যাতে করে এসব ঘটনা দেখে খ্রিস্টধর্মের অনুসারীরা শিক্ষা গ্রহণ করেন। অতীতের জাতিসমূহের মধ্যে এমন এক জাতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে যারা ব্যভিচারে লিপ্ত থাকত। তাদের এই অপরাধের জন্য তাদের ওপর নেমে এসেছিল ভয়াবহ শাস্তি। একদিনে তাদের তেইশ হাজার মানুষ মৃত্যু বরণ করেছিল। সেই ইতিহাস স্মরণ করিয়ে ব্যভিচারের ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে খ্রিস্টধর্মে। বর্ণিত হয়েছে,

We must not indulge in sexual immorality as some of them did, and twenty-three thousand fell in a single day.[২]

অর্থাৎ, তাদের মধ্যে যেমন কতক লোক যৌন পাপে পাপী হয়েছিল আর একদিনে তেইশ হাজার লোক তাদের পাপের জন্য মারা পড়েছিল, আমরা যেন তেমনি যৌনপাপ না করি।

ব্যভিচারকারীর জন্য মৃত্যু পরবর্তীকালীন জীবনে অপেক্ষা করছে ভয়াবহ শাস্তি। যে সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে,

But as for the cowardly, the faithless, the detestable, as for murderers, the sexually immoral, sorcerers, idolaters, and all liars, their portion will be in the lake that burns with fire and sulfur, which is the second death.[৩]

অর্থাৎ, কিন্তু যারা ভীরু, অবিশ্বাসী ঘৃন্যলোক, নরঘাতক, যৌনপাপে পাপগ্রস্ত, মায়াবী, প্রতিমাপূজারী, যারা মিথ্যাবাদী, এদের সকলের স্থান হবে সেই আগুন ও জ্বলন্ত গন্ধকের হ্রদে; এই হল দ্বিতীয় মৃত্যু।

ব্যভিচার নরকে যাওয়ার কারণসমূহের মধ্যে অন্যতম প্রধান একটি কারণ। বর্ণত হয়েছে,

Ye have heard that it was said by them of old time, Thou shalt not commit adultery: But I say unto you, That whosoever looketh on a woman to lust after her hath

---

[১] Mark 10:19
[২] 1 Corinthians 10:8
[৩] Revelation 21:8

committed adultery with her already in his heart. And if thy right eye offend thee, pluck it out, and cast it from thee: for it is profitable for thee that one of thy members should perish, and not that thy whole body should be cast into hell. And if thy right hand offend thee, cut it off, and cast it from thee: for it is profitable for thee that one of thy members should perish, and not that thy whole body should be cast into hell. It hath been said, Whosoever shall put away his wife, let him give her a writing of divorcement: But I say unto you, That whosoever shall put away his wife, saving for the cause of fornication, causeth her to commit adultery: and whosoever shall marry her that is divorced committeth adultery.[১]

অর্থাৎ, তোমরা শুনেছ, একথা বলা হয়েছেঃ যৌনপাপ করো না। কিন্তু আমি তোমাদের বলছি কেউ যদি কোন স্ত্রীলোকের দিকে লালসাপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকায় তবে সে মনে মনে তার সঙ্গে যৌনপাপ করল। সেই রকম তোমার ডান চোখ যদি পাপ করার জন্য তোমায় প্ররোচিত করে তবে তা উপড়ে ফেলে দাও। সমস্ত দেহ নিয়ে নরকে যাওয়ার চেয়ে বরং তার একটা অংশ হারানো তোমার পক্ষে ভালো। যদি তোমার ডান হাত পাপ করতে প্ররোচিত করে, তবে তা কেটে ফেলে দাও। তোমার সমস্ত শরীর নরকে যাওয়ার চেয়ে বরং তার একটা অঙ্গ নষ্ট হওয়া তোমার পক্ষে ভালো। আবার বলা হয়েছে, কেউ যদি তার স্ত্রীকে ত্যাগ করতে চায়, তবে তাকে ত্যাগপত্র দিতে হবে। কিন্তু আমি তোমাদের বলছি, একমাত্র যৌনপাপের দোষ ছাড়া অন্য কোন কারণে কেউ যদি তার স্ত্রীকে ত্যাগ করে, তবে সে তাকে ব্যাভিচারিণী হবার পথে নামিয়ে দেয়। আর যে কেউ সেই পরিত্যক্তা স্ত্রীকে বিয়ে করে সেও যৌনপাপ করে।

ঈশ্বরের রাজ্যে ব্যভিচারকারী কোনো স্থান পাবে না। বর্ণিত হয়েছে,

Or do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived: neither the sexually immoral, nor idolaters, nor adulterers, nor men who practice homosexuality, nor thieves, nor the greedy, nor drunkards, nor revilers, nor swindlers will inherit the kingdom of God.[২] অর্থাৎ,

তোমরা নিশ্চয় জান যে ঈশ্বরের রাজ্যে অধার্মিক লোকদের কোন স্থান নেই? নিজেদের ঠকিও না! যারা ব্যভিচারী, অনৈতিক যৌনচারী, যারা প্রতিমার পূজা করে, যারা পুংশ্চলী ও পুংসমকারী, ঈশ্বরের রাজ্যে এদের কোন অধিকার নেই। সেই রকম যারা চোর, লোভী, মাতাল, যারা পরনিন্দা করে ও যারা প্রতারক তারা ঈশ্বরের রাজ্যের অধিকারী হবে না।

ব্যভিচারকারীরা শুধু মৃত্যু পরবর্তী জীবনে সাজা ভোগ করবে ব্যাপরটা মোটেই এমন নয়। বরং এই দুনিয়াতেই ঈশ্বর তাদের ভয়াবহ শাস্তি প্রদান করবেন। তারা দুনিয়াতে দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হবে। বর্ণিত হয়েছে,

---

[১] Matthew 5: 27- 32
[২] 1 Corinthians 6:9-10

Behold, I will throw her onto a sickbed, and those who commit adultery with her I will throw into great tribulation, unless they repent of her works,[১]

অর্থাৎ, তাই আমি তাকে রোগশয্যায় ফেলব; আর যারা তার সঙ্গে ব্যভিচার করছে, তারা যদি তার সঙ্গে করা পাপ কাজের জন্য অনুতাপ না করে তবে তাদেরও মহাকষ্টের মধ্যে ফেলব।

খ্রিষ্ট ধর্মে যদি কোন মানুষ ব্যভিচার দোষ ছাড়া অন্য কোন কারণে স্ত্রীকে ছেড়ে দিয়ে অন্য কোন স্ত্রীলোককে বিয়ে করে তবে তা ব্যভিচারে অপরাধ হিসেবে স্বীকৃত। এ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে,

Or do you not know, brothers—for I am speaking to those who know the law—that the law is binding on a person only as long as he lives? For a married woman is bound by law to her husband while he lives, but if her husband dies she is released from the law of marriage. Accordingly, she will be called an adulteress if she lives with another man while her husband is alive. But if her husband dies, she is free from that law, and if she marries another man she is not an adulteress.[২]

অর্থাৎ, ভাই ও বোনেরা, তোমরা যখন মোশির বিধি ব্যবস্থা জান, তখন তোমরা নিশ্চয়ই জান যে মানুষ যতদিন বেঁচে থাকে ততদিনই সে বিধি-ব্যবস্থার অধীনে থাকে। তোমাদের কাছে একটা দৃষ্টান্ত দিই। একজন স্ত্রীলোক নিয়ম মত , যতদিন তার স্বামী বেঁচে থাকে ততদিন তার প্রতি দায়বদ্ধ থাকে। স্বামী মারা গেলে সে বিয়ের বিধি-ব্যবস্থা থেকে মুক্তি পায়। কিন্তু সেই স্ত্রীলোক, তার স্বামী বেঁচে থাকতে যদি অপর পুরুষকে বিবাহ করে, সে ব্যভিচার করে। তার স্বামী যদি মারা যায়, তাহলে সে বিয়ের বিধি-ব্যবস্থা থেকে মুক্ত হয়ে যায়; আর তখন সে যদি অন্য পুরুষকে বিয়ে করে তাহলে সে ব্যভিচারের দোষে দোষী হয় না।

অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে,

And I say to you: whoever divorces his wife, except for sexual immorality, and marries another, commits adultery.[৩]

অর্থাৎ, তাই আমি তোমাদের বলছি, যদি কোন মানুষ ব্যভিচার দোষ ছাড়া অন্য কোন কারণে স্ত্রীকে ছেড়ে দিয়ে অন্য কোন স্ত্রীলোককে বিয়ে করে তবে সে ব্যভিচার করে।

এ সম্পর্কে আরও বলা হয়েছে,

---

[১] Revelation 2:22
[২] Romans 7:1-3
[৩] Matthew 19:9

And he said to them, Whoever divorces his wife and marries another commits adultery against her, and if she divorces her husband and marries another, she commits adultery.[১]

অর্থাৎ, যীশু তাদের বললেন, কেউ যদি নিজের স্ত্রীকে ত্যাগ করে অন্য কাউকে বিয়ে করে তবে সে তার বিরুদ্ধে ব্যভিচার করে। যদি সেই স্ত্রীলোকটি নিজের স্বামীকে ত্যাগ করে আর একজনকে বিয়ে করে সেও ব্যভিচার করে।

খ্রিস্টধর্মে ব্যভিচারকারীকে ক্ষমা করে দেওয়ার দৃষ্টান্তও রয়েছে। তবে এক্ষেত্রে অপরাধীকে শপথ করতে হবে যে সে আর এ অপরাধে জড়িত হবে না। বর্ণিত হয়েছে,

Jesus went unto the mount of Olives. And early in the morning he came again into the temple, and all the people came unto him; and he sat down, and taught them. And the scribes and Pharisees brought unto him a woman taken in adultery; and when they had set her in the midst, They say unto him, Master, this woman was taken in adultery, in the very act. Now Moses in the law commanded us, that such should be stoned: but what sayest thou? This they said, tempting him, that they might have to accuse him. But Jesusstooped down, and with his finger wrote on the ground, as though he heard them not. So when they continued asking him, he lifted up himself, and said unto them,He that is without sin among you, let him first cast a stone at her. And again he stooped down, and wrote on the ground. And they which heard it, being convicted by their own conscience, went out one by one, beginning at the eldest, even unto the last: and Jesus was left alone, and the woman standing in the midst. When Jesus had lifted up himself, and saw none but the woman, he said unto her, Woman, where are those thine accusers? hath no man condemned thee? She said, No man, Lord. And Jesus said unto her, Neither do I condemn thee: go, and sin no more.[২]

অর্থাৎ, এরপর যীশু সেখান থেকে জৈতুন পর্বতমালায় চলে গেলেন। খুব ভোরে তিনি আবার মন্দিরে ফিরে গেলে লোকেরা আবার তাঁর কাছে এসে জড়ো হল, তখন তিনি সেখানে বসে তাদের কাছে শিক্ষা দিতে শুরু করলেন। সেই সময় ব্যবস্থার শিক্ষকরা ও ফরীশীরা, ব্যভিচার করতে গিয়ে ধরা পড়েছে এমন একজন স্ত্রীলোককে তাঁর কাছে নিয়ে এল। তারা সেই স্ত্রীলোককে তাদের মাঝখানে দাঁড় করিয়ে যীশুকে বলল, গুরু, এই স্ত্রীলোকটি ব্যভিচার করার সময় হাতে নাতেই ধরা পড়েছে। বিধি-ব্যবস্থার মধ্যে মোশি আমাদের বলছেন, এই ধরণের স্ত্রীলোককে যেন আমরা পাথর ছুঁড়ে মেরে ফেলি। এখন আপনি এবিষয়ে কি বলবেন? তাঁকে পরীক্ষা করার ছলেই তারা একথা বলছিল, যাতে তাঁর

---

[১] Mark 10:11-12
[২] John 8:1-11

বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ তারা খুঁজে পায়। কিন্তু যীশু হেঁট হয়ে মাটিতে আঙ্গুল দিয়ে লিখতে লাগলেন। ইহুদী নেতারা যখন বার বার তাঁকে জিজ্ঞেস করতে লাগল, তখন তিনি সোজা হয়ে বসলেন এবং বললেন, তোমাদের মধ্যে যে নিস্পাপ সেই প্রথম একে পাথর মারুক। এরপর তিনি আবার হেঁট হয়ে আঙ্গুল দিয়ে মাটিতে লিখতে লাগলেন। তারা ঐ কথা শোনার পর বুড়ো লোক থেকে শুরু করে সকলে এক এক করে সেখান থেকে চলে গেল। কেবল যীশু সেখানে একা থাকলেন আর সেই স্ত্রীলোকটি মাঝখানে দাঁড়িয়ে ছিল। তখন যীশু মাথা তুলে সেই স্ত্রীলোকটিকে বললেন, হে নারী, তারা সব কোথায়? কেউ কি তোমায় দোষী সাব্যস্ত করল না? স্ত্রীলোকটি উত্তর দিল, কেউ করে নি, মহাশয়। তখন যীশু বললেন, আমিও তোমায় দোষী করছি না, যাও এখন থেকে আর পাপ কোরো না।

মিথ্যা অপবাদ

খিস্ট্র ধর্মে মিথ্যা কথা বলা, কারো বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া, কারো নামে বদনাম ছড়ানো ইত্যাদি রটানো ইত্যাদি স্পষ্টতই পরিত্যাজ্য, নিষিদ্ধ এবং গুনাহের কাজ। কোনো পবিত্র চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তির বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অপবাদ দেওয়া, কেউ ব্যভিচারে লিপ্ত হয়নি, তা সত্ত্বেও তার বিরুদ্ধে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার সাক্ষ্য দেওয়া অত্যন্ত জঘন্য অপরাধ। নর হত্য, ব্যভিচার, চুরি ইত্যাদি যেমন খ্রিস্টধর্মে নিষিদ্ধ, অনুরূপভাবে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া, কারো বিরুদ্ধে অপবাদ দেওয়াও এ ধর্মে নিষিদ্ধ। এ সম্পর্কে খ্রিস্টধর্মের ধর্মীয় গ্রন্থে বলা হয়েছে,

He said to him, Which ones? And Jesus said, You shall not murder, You shall not commit adultery, You shall not steal, You shall not bear false witness,[১]

অর্থাৎ, সে বলল, কোন্ কোন্ আজ্ঞা পালন করব? যীশু তাকে বললেন, তুমি অবশ্যই নরহত্যা করবে না, ব্যভিচার করবে না, চুরি করবে না, মিথ্যা সাক্ষ্য দেবে না।

ভীরু, অবিশ্বাসী ঘৃন্যলোক, নরঘাতক, যৌনপাপে পাপগ্রস্ত, মায়াবী, প্রতিমাপূজারী এধরণের অপরাধে লিপ্ত ব্যক্তিকে মৃত্যু পরবর্তী জীবনে ভয়াবহ শাস্তি ভোগ করতে হবে। পরকালে মিথ্যাবাদী, মিথ্যা সাক্ষ্য দানকারীর জন্যও অপেক্ষা করছে একই মাত্রার নরকের ভয়াবহ শাস্তি। বর্ণিত হয়েছে,

But as for the cowardly, the faithless, the detestable, as for murderers, the sexually immoral, sorcerers, idolaters, and all liars, their portion will be in the lake that burns with fire and sulfur, which is the second death.[২]

অর্থাৎ, কিন্তু যারা ভীরু, অবিশ্বাসী ঘৃন্যলোক, নরঘাতক, যৌনপাপে পাপগ্রস্ত, মায়াবী, প্রতিমাপূজারী, যারা মিথ্যাবাদী, এদের সকলের স্থান হবে সেই আগুন ও জ্বলন্ত গন্ধকের হ্রদে; এই হল দ্বিতীয় মৃত্যু।

মিথ্যা অপবাদ রটানো সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে,

---

[১] Matthew 19:18
[২] Revelation 21:8

But speak thou the things which become sound doctrine: That the aged men be sober, grave, temperate, sound in faith, in charity, in patience. The aged women likewise, that they be in behaviour as becometh holiness, not false accusers, not given to much wine, teachers of good things; That they may teach the young women to be sober, to love their husbands, to love their children, To be discreet, chaste, keepers at home, good, obedient to their own husbands, that the word of God be not blasphemed. Young men likewise exhort to be sober minded. In all things shewing thyself a pattern of good works: in doctrine shewing uncorruptness, gravity, sincerity, Sound speech, that cannot be condemned; that he that is of the contrary part may be ashamed, having no evil thing to say of you. Exhort servants to be obedient unto their own masters, and to please them well in all things; not answering again; Not purloining, but shewing all good fidelity; that they may adorn the doctrine of God our Saviour in all things. For the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men, Teaching us that, denying ungodliness and worldly lusts, we should live soberly, righteously, and godly, in this present world; Looking for that blessed hope, and the glorious appearing of the great God and our Saviour Jesus Christ; Who gave himself for us, that he might redeem us from all iniquity, and purify unto himself a peculiar people, zealous of good works. These things speak, and exhort, and rebuke with all authority. Let no man despise thee.[১]

অর্থাৎ, সত্য শিক্ষা অনুসরণের জন্য তুমি অবশ্যই লোকেদের এইসব কাজ করতে বলবে। বৃদ্ধদের বল, যেন তাঁরা আত্মসংযমী, গম্ভীর ও বিজ্ঞ হন। তাঁরা যেন বিশ্বাসে, ভালোবাসায় ধৈর্যে দৃঢ় হন। সেইভাবে বৃদ্ধদের বল তাঁরা যেন আচরণে পবিত্র হন। তাঁরা যেন অপরের সম্বন্ধে মিথ্যা অপবাদ রটিয়ে না বেড়ান ও দ্রাক্ষারসপানে আসক্ত না হন। কিন্তু তাঁরা যেন সৎ শিক্ষা দিয়ে বেড়ান। এবং যুবতীদের শিক্ষা দেন যেন তারা তাদের স্বামীদের ও সন্তানদের ভালবাসে। তারা যেন বিচক্ষণ, পরিশুদ্ধ, গৃহকার্যে নিষ্ঠাবতী, দয়ামযী ও স্বামীর প্রতি অনুগত হয় তাহলে কেউ ঈশ্বরের বার্তা সম্বন্ধে বিরূপ মন্তব্য করতে পারবে না। সেইভাবে যুবকদের বল যেন তারা সব কিছুতেই আত্মসংযম বজায় রাখে; আর তুমি নিজে সব বিষয়ে তাদের সামনে সৎ কাজের আদর্শ হও। তুমি যখন শিক্ষা দেবে তখন সততা ও গাম্ভীর্যের সঙ্গে তা দিও। যখন কথা বলবে তখন সত্য বলো যেন যা তুমি বলছ কেউ তার সমালোচনা করতে না পারে। এর ফলে তোমার বিপক্ষরা লজ্জায় পড়বে, কারণ তোমার সম্পর্কে সে খারাপ কিছুই বলতে পারবে না। দাসদের তুমি এই শিক্ষা দাও; তারা যেন সবসময় নিজেদের মনিবদের আজ্ঞা পালন করে, তাদের সন্তুষ্ট রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করে, এবং মনিবদের কথার প্রতিবাদ না করে। তারা যেন মনিবদের কিছু চুরি না করে এবং তাদের মনিবদের

---

[১] Titus 2 : 1-15

বিশ্বাসভাজন হয়। এইভাবে তাদের সমস্ত, আচরণে প্রকাশ পাবে যে আমাদের ত্রাণকর্তা ঈশ্বরের শিক্ষা উত্তম। ঐভাবেই আমাদের চলা উচিত কারণ ঈশ্বরের অনুগ্রহ প্রকাশিত হয়েছে। সে অনুগ্রহ প্রত্যেক মানুষকে রক্ষা করতে পারে, সেই অনুগ্রহ আমাদের দেওয়া হয়েছে। সেই অনুগ্রহ আমাদের শিক্ষা দেয়, যেন আমরা ঈশ্বরবিহীন জীবনযাপন না করি ও জগতের কামনা বাসনা অগ্রাহ্য করে এই বর্তমান জগতে আত্মনিয়ন্ত্রিত, ন্যায়পরায়ণ এবং ধার্মিকভাবে জীবনযাপন করি। আমাদের মহান ঈশ্বর এবং ত্রাণকর্তা যীশু খ্রীষ্টের মহিমার আবির্ভাবের জন্য যখন অপেক্ষা করছি, তখন যেন আমরা সবাই এইভাবেই চলি। তিনিই আমাদের মহান প্রত্যাশা, যিনি মহিমা নিয়ে আসবেন। খ্রীষ্ট আমাদের জন্যে নিজেকে দিলেন, যাতে সমস্ত মন্দ থেকে আমাদের উদ্ধার করতে পারেন, যাতে আমরা সৎ কর্মে আগ্রহী ও পরিশুদ্ধ মানুষ হিসেবে কেবল তাঁর হই। এসব কথা বল এবং পূর্ণ কর্তৃত্বের সঙ্গে তাদের উৎসাহিত কর ও তিরস্কার কর। কেউ যেন তোমাকে তুচ্ছ করতে না পারে।

রাষ্ট্রদ্রোহিতা

রাষ্ট্রের আনুগত্য অস্বীকার করা, রাষ্ট্র ও এর নাগরিকদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয় এমন কাজ করা ইত্যাদি রাষ্ট্রদ্রোহিতমূলক কাজ। খ্রিস্টধর্মে রাষ্ট্র ও সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার অনুমতি দেয়নি। বরং পূর্ণ আনুগত্য করার নির্দেশ দিয়েছে। খ্রিস্টধর্ম মতে রাজ ক্ষমতা নির্ধারণ করে দেন স্বয়ং ঈশ্বর। তাই তাদের আনুগত্য করা, প্রশংসা করা প্রজাদের একান্ত কর্তব্য। এ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে,

Let every soul be subject unto the higher powers. For there is no power but of God: the powers that be are ordained of God. Whosoever therefore resisteth the power, resisteth the ordinance of God: and they that resist shall receive to themselves damnation. For rulers are not a terror to good works, but to the evil. Wilt thou then not be afraid of the power? do that which is good, and thou shalt have praise of the same: For he is the minister of God to thee for good. But if thou do that which is evil, be afraid; for he beareth not the sword in vain: for he is the minister of God, a revenger to execute wrath upon him that doeth evil. Wherefore ye must needs be subject, not only for wrath, but also for conscience sake. For for this cause pay ye tribute also: for they are God's ministers, attending continually upon this very thing. Render therefore to all their dues: tribute to whom tribute is due; custom to whom custom; fear to whom fear; honour to whom honour. Owe no man any thing, but to love one another: for he that loveth another hath fulfilled the law.[১]

অর্থাৎ, প্রত্যেক মানুষের উচিত দেশের শাসকদের অনুগত থাকা, কারণ দেশ শাসনের জন্য ঈশ্বরই তাদের ক্ষমতা দিয়েছেন। যারা এমন শাসন কার্য নিযুক্ত, ঈশ্বরই তাদের সেই কাজের ক্ষমতা দিয়েছেন। তাই তো কর্তৃপক্ষের

[১] Romans 13, 1-8

বিরোধিতা যে করে, সে ঈশ্বর যা স্থির করেছেন তারই বিরোধিতা করে। তেমন বিরোধিতা যারা করে তারা নিজেরাই নিজেদের শাস্তি ডেকে আনবে। তোমরা ভাল কাজ করো, শাসকবৃন্দ তোমাদের প্রশংসা করবে। ভয় পাবার কারণ থাকে তাদেরই যারা মন্দ কাজ করে; যদি তোমরা কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে ভয় পেতে না চাও, তবে যা ভাল তাই কর। শাসনকর্তারা আসলে তোমাদের ভালোর জন্য ঈশ্বর নিয়োজিত দাস; কিন্তু তোমরা যদি অন্যায় কর তাহলে ভীত হবার কারণ নিশ্চয় থাকে। শাস্তি দেবার মতো ক্ষমতা শাসকের ওপর ন্যস্ত আছে, তিনি তো ঈশ্বরের দাস; তাই যারা অন্যায় করে, তাদের তিনি ঈশ্বরের হয়ে শাস্তি দেন। তাই তোমরা শাসনকর্তাদের অনুগত থেকো। ঈশ্বরের ক্রোধের ভয়েই যে কেবল তাদের অধীনতা স্বীকার করবে তা নয়; কিন্তু তোমাদের বিবেক পরিষ্কার রাখার জন্যও করবে। এই জন্য পরস্পরকে তোমরা প্রাপ্য কর দাও, কারণ শাসনকার্য পরিচালনা করার জন্যই তারা ঈশ্বর দ্বারা নিযুক্ত আছেন; আর সেই কার্যে তাঁরা ব্যস্তভাবে সময় ব্যয় করেন। তোমাদের কাছে যার যা প্রাপ্য তাকে তা দিয়ে দাও। যে কর আদায় করে তাকে কর দাও; যাদের শ্রদ্ধা করা উচিত তাদের শ্রদ্ধা কর; যাদের সম্মান পাওয়া উচিত তাদের সম্মান কর। শুধু পরস্পরের প্রতি ভালবাসার ঋণ ছাড়া কারো কাছে ঋণী থেকো না, কারণ যারা প্রতিবেশীকে ভালবাসে, তারাই ঠিকভাবে বিধি-ব্যবস্থা মেনে চলছে।

ধর্মত্যাগ

পৃথিবীতে অসংখ্য ধর্ম রয়েছে, রয়েছে ধর্মের অনুসারী। সব ধর্মই মোটাদাগে মানুষকে সত্য ও ন্যায়ের পথে আহ্বান করে থাকে। যেকারণে সব ধর্মের প্রত্যাশা যেন মানুষ ঐ ধর্মেরই অনুসরণ করে এবং কখনো ঐ ধর্ম ত্যাগ না করে। একবার ধর্ম গ্রহণ করার পরে সে ধর্ম ত্যাগ করা কিংবা ধর্মের জন্য অবমাননাকর কিছু বলা বা করা সব ধর্মেই বড় অপরাধ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। খ্রিস্টধর্মেও ধর্ম ত্যাগ করে নতুন ধর্ম গ্রহণ করা থেকে নিষেধ করা হয়েছে।

খ্রিস্টধর্মে মানুষকে সাবধানতার সাথে ধর্ম গ্রহণের পরামর্শ দেয়। যাতে করে ভবিষ্যতে ধর্ম ত্যাগের কোনো প্রশ্ন না আসে। কেউ খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করার পর ছেড়ে দেওয়ার তুলনায় ধর্ম গ্রহণ না করাকেই খ্রিস্টধর্মের ধর্মীয় পুস্তকে উত্তম বলা হয়েছে।

For if, after they have escaped the defilements of the world through the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ, they are again entangled in them and overcome, the last state has become worse for them than the first. For it would have been better for them never to have known the way of righteousness than after knowing it to turn back from the holy commandment delivered to them. What the true proverb says has happened to them: The dog returns to its own vomit, and the sow, after washing herself, returns to wallow in the mire.[১]

অর্থাৎ, যারা আমাদের প্রভু ও ত্রাণকর্তা যীশু খ্রীষ্ট সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে সংসারের অশুচি বিষয়গুলি থেকে মুক্ত হয়েছিল, তারা যদি তাদের পুরানো পাপের জীবনে ফিরে যায় তবে তাদের পরের অবস্থা আগের অবস্থা থেকে আরো

[১] 2 Peter 2 : 20-22

খারাপ হবে। যে পবিত্র শিক্ষা তারা লাভ করেছিল, তারা যদি সেই পবিত্র শিক্ষা থেকে সরে যায় তবে তাদের পক্ষে সেই সত্য পথ না জানাই ভাল ছিল। একটি প্রবাদ আছে যা তাদের ক্ষেত্রে খাটে, কুকুর ফেরে নিজের বমির দিকে, এবং শুয়োরকে স্নান করালেও সে আবার যায় কাদায় গড়াগড়ি দিতে।

ইহুদী ধর্মে ধর্ম ত্যাগের শাস্তি ছিলো মৃত্যুদন্ড। খ্রিস্টধর্মে সে কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে মানুষকে ধর্ম ত্যগের ব্যাপারে সাবধান করা হয়েছে। যাতে করে মানুষ ধর্ম ত্যাগের অপরাধের ভয়াবহতা উপলদ্ধি করতে সক্ষম হয় এবং ধর্ম ত্যাগ করার অপরাধ থেকে নিজেদের ফিরিয়ে রাখে। বর্ণিত হয়েছে,

For if we go on sinning deliberately after receiving the knowledge of the truth, there no longer remains a sacrifice for sins, but a fearful expectation of judgment, and a fury of fire that will consume the adversaries. Anyone who has set aside the law of Moses dies without mercy on the evidence of two or three witnesses. How much worse punishment, do you think, will be deserved by the one who has spurned the Son of God, and has profaned the blood of the covenant by which he was sanctified, and has outraged the Spirit of grace? For we know him who said, Vengeance is mine; I will repay. And again, The Lord will judge his people. ...[১]

অর্থাৎ, সত্যের জ্ঞানলাভের পর যদি আমরা ইচ্ছাকৃতভাবে পাপ করে চলি, তবে সেই পাপের জন্য বলিদান উৎসর্গ করার মতো আর কিছু অবশিষ্ট থাকে না। আমরা যদি পাপ করেই চলি তবে বিচারের জন্য সেই ভয়ঙ্কর প্রতীক্ষা আর প্রচণ্ড ক্রোধাগ্নি সমস্ত ঈশ্বর বিরোধীকে গ্রাস করবে। কেউ যদি মোশির দেওয়া বিধি-ব্যবস্থা লঙ্ঘন করতো তবে দুজন কিংবা তিনজন সাক্ষীর সাক্ষ্য প্রমাণে নিষ্ঠুরভাবে তাকে হত্যা করা হত, তাকে ক্ষমা করা হত না। ভেবে দেখো, যে লোক ঈশ্বরের পুত্রকে ঘৃণা করেছে, চুক্তির যে রক্তের মাধ্যমে সে শুচি হয়েছিল তা তুচ্ছ করেছে, আর যিনি অনুগ্রহ করেন সেই অনুগ্রহের আত্মাকে অপমান করেছে - হ্যাঁ, নতুন চুক্তির রক্তকে যে অবমাননা করেছে সেই ব্যক্তির কতোই না ঘোরতর শাস্তি হওয়া উচিত। আমরা জানি, ঈশ্বর বলেন, যারা মন্দ কাজ করে, তাদের আমি শাস্তি দেব; তাদের প্রতিফল দেব। ঈশ্বর আবার বলেছেন, প্রভু তাঁর লোকদের বিচার করবেন। জীবন্ত ঈশ্বরের হাতে গড়া পাপী মানুষের পক্ষে কি ভয়ঙ্কর বিষয়।

খ্রিস্টধর্মের ধর্মীয় গ্রন্থে কিছু মানুষ যে ধর্ম ত্যাগ করে বিভ্রান্ত হবে এ ব্যাপারে ভবিষ্যৎ বাণী করা হয়েছে। যাতে করে অন্য মানুষেরা তাদের সঙ্গ ত্যাগ করে। বর্ণিত হয়েছে,

Now the Spirit expressly says that in later times some will depart from the faith by devoting themselves to deceitful spirits and teachings of demons, through the insincerity of liars whose consciences are seared, who forbid marriage and require

---

[১] Hebrews 10 : 26-31

abstinence from foods that God created to be received with thanksgiving by those who believe and know the truth.[১]

অর্থাৎ, পবিত্র আত্মা স্পষ্টই বলছেন, শেষের দিকে কিছু লোক বিশ্বাস থেকে সরে পড়বে। যে মন্দ আত্মা মিথ্যা বলে, তারা সেই মন্দ আত্মাকে আনুগত্য দেখাবে এবং ভূতদের শিক্ষায় মন দেবে। যারা মিথ্যা বলে ও লোকদের প্রতারণা করে, এসব ভ্রান্ত শিক্ষা তাদের কাছ থেকেই আসে। তারা ভাল ও মন্দের মধ্যে বিচার করতে পারে না। এরাই মানুষকে বিবাহ করতে নিষেধ করে ও কোন কোন খাদ্য খেতে নিষেধ করে। কিন্তু সেই খাদ্য সামগ্রী ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন এবং যারা বিশ্বাসী ও যারা সত্যকে জানে তারা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়ে এই খাবার খেতে পারে।

ধর্ম ত্যাগ করতে নিষেধাজ্ঞা জারির পাশাপাশি ঈশ্বরের জন্য অবমাননাকর কথা বা কাজ থেকেও বিরত থাকার নির্দেশ খিস্ট ধর্মে জারি করা হয়েছে। বর্ণিত হয়েছে,

Therefore I tell you, every sin and blasphemy will be forgiven people, but the blasphemy against the Spirit will not be forgiven. And whoever speaks a word against the Son of Man will be forgiven, but whoever speaks against the Holy Spirit will not be forgiven, either in this age or in the age to come.[২]

অর্থাৎ, তাই আমি তোমাদের বলছি, মানুষের সব পাপ এবং ঈশ্বর নিন্দার ক্ষমা হবে, কিন্তু পবিত্র আত্মার বিরুদ্ধে কোন অসম্মানজনক কথা-বার্তার ক্ষমা হবে না। মানবপুত্রের বিরুদ্ধে কেউ যদি কোন কথা বলে, তাকে ক্ষমা করা হবে, কিন্তু পবিত্র আত্মার বিরুদ্ধে কথা বললে তার ক্ষমা নেই , এযুগে বা আগামী যুগে কখনই না।

চুরি

চুরি একটি অন্যতম ঘৃণিত অর্থনৈতিক অপরাধ। এর মাধ্যেমে মানুষের আর্থিক ক্ষতির পাশাপাশি সমাজিক শান্তি-শৃঙ্খলাও বিনষ্ট হয়। খ্রিস্টধর্মে সামাজিক শান্তি-শৃঙ্খলা হানিকর এ ধরনের অপরাধ নিষিদ্ধ। খ্রিস্টধর্মে চুরির পরিবর্তে শারীরিক পরিশ্রম করে জীবন যাপন করতে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। যারা চুরি করতে অভ্যস্ত তাদেরকে চুরি ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বর্ণিত হয়েছে,

Neither give place to the devil. Let him that stole steal no more: but rather let him labour, working with his hands the thing which is good, that he may have to give to him that needeth.[৩]

অর্থাৎ, তোমাকে পরাস্ত করতে দিবালকে কোন রকম সুযোগ নিতে দিও না। যে এক সময় চুরি করত সে যেন আর কখনও চুরি না করে, বরং ভাল কিছু কাজ করতে নিজ হাতে পরিশ্রম করে। সে যেন সবরকম ভাল কাজ করে, তাহলে অভাবী লোকদের সঙ্গে ভাগ করে দেবার জন্যেও তার কিছু থাকবে।

---

[১] 1 Timothy 4:1-3
[২] Matthew 12:31-32
[৩] Ephesians 4 : 27-28

মানুষের উচিত তার বিবেক দ্বারা পরিচালিত হওয়া। অন্তর যা চায় তা করে বেড়ানো কখনোই মানুষের জন্য উচিত নয়। কারণ অন্তর মানুষকে পাপাচারের দিকে ধাবিত করে। লালসা, খুন, ব্যভিচার এই সমস্ত খারাপ বিষয় মানুষের ভেতর থেকে বের হয় ও মানুষকে কলুষিত করে। বর্ণিত হয়েছে,

And he said, That which cometh out of the man, that defileth the man. For from within, out of the heart of men, proceed evil thoughts, adulteries, fornications, murders, Thefts, covetousness, wickedness, deceit, lasciviousness, an evil eye, blasphemy, pride, foolishness: All these evil things come from within, and defile the man.[১]

অর্থাৎ, তিনি আরও বললেন, মানুষের অন্তর থেকে যা বের হয়, সেটাই মানুষকে কলুষিত করে। কারণ মানুষের ভেতর অর্থাৎ মন থেকে বের হয় কুৎসিত চিন্তা, লালসা, চুরি, খুন, যৌনপাপ, লোভ, দুষ্টামি, প্রতারণা, অশ্লীলতা, ঈর্ষা, নিন্দা, অভিমান ও অহঙ্কার। এই সমস্ত খারাপ বিষয় মানুষের ভেতর থেকে বের হয় ও মানুষকে কলুষিত করে।

খ্রিস্টধর্ম মতে, ঈশ্বর কর্তৃক নিষেধাজ্ঞা জারিকৃত বিষয়ের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে চুরি। বর্ণিত হয়েছে,

Thou knowest the commandments, Do not commit adultery, Do not kill, Do not steal, Do not bear false witness, Defraud not, Honour thy father and mother. And he answered and said unto him, Master, all these have I observed from my youth.[২]

অর্থাৎ, তুমি তো ঈশ্বরের সব আদেশ জানো, নরহত্যা কোরো না, ব্যভিচার কোরো না, চুরি কোরো না, বাবা-মাকে সম্মান কোরো। লোকটি তাঁকে বলল, হে গুরু, ছোটবেলা থেকে এগুলো আমি পালন করে আসছি।

আরও বর্ণিত হয়েছে,

For this, Thou shalt not commit adultery, Thou shalt not kill, Thou shalt not steal, Thou shalt not bear false witness, Thou shalt not covet; and if there be any other commandment, it is briefly comprehended in this saying, namely, Thou shalt love thy neighbour as thyself.[৩]

অর্থাৎ, আমি একথা বলছি কারণ ঈশ্বরের এই আজ্ঞাগুলি অর্থাৎ, ব্যভিচার করবে না, নরহত্যা করবে না, চুরি করবে না, অপরের জিনিস আত্মসাৎ করবে না। আর অন্য যা কিছু আদেশ তিনি দিয়েছেন সে সবগুলি সংক্ষেপে এই একটি আদেশের মধ্যেই চলে আসে, নিজের মতো তোমার প্রতিবেশীকে ভালবাসো।

হত্যা

---

[১] Mark 7 : 20-23
[২] Mark 7 : 19-20
[৩] Romans 13 : 9

পৃথিবীর ভয়াবহ ও জঘন্য অপরাধসমূহের একটি মানব হত্যা। কোনো সমাজ, কোনো সভ্যতা, কোনো ধর্মই মানব হত্যাকে সমর্থন করে না। কারণ মানব হত্যা মানব বংশ বিস্তারের জন্য হুমকি। আর মানুষের জীবন দিয়েছেন স্রষ্টা। জীবন কেড়ে নেওয়ার অধিকারও একমাত্র তারই। খ্রিস্টধর্ম অত্যন্ত কঠোর ভাষায় হত্যাকে নিষিদ্ধ হিসেবে ঘোষণা করেছে। বর্ণিত হয়েছে,

For the commandments, You shall not commit adultery, You shall not murder, You shall not steal, You shall not covet, and any other commandment, are summed up in this word: You shall love your neighbor as yourself.[১]

অর্থাৎ, আমি একথা বলছি কারণ ঈশ্বরের এই আজ্ঞাগুলি অর্থাৎ, ব্যভিচার করবে না, নরহত্যা করবে না, চুরি করবে না, অপরের জিনিস আত্মসাৎ করবে না। আর অন্য যা কিছু আদেশ তিনি দিয়েছেন সে সবগুলি সংক্ষেপে এই একটি আদেশের মধ্যেই চলে আসে, নিজের মতো তোমার প্রতিবেশীকে ভালবাসো।

অন্যত্র বলা হয়েছে,

He said to him, Which ones? And Jesus said, You shall not murder, You shall not commit adultery, You shall not steal, You shall not bear false witness,[২]

অর্থাৎ, সে বলল, কোন্ কোন্ আজ্ঞা পালন করব? যীশু তাকে বললেন, তুমি অবশ্যই নরহত্যা করবে না, ব্যভিচার করবে না, চুরি করবে না, মিথ্যা সাক্ষ্য দেবে না।

মানব হত্যাকারীর জন্য অপেক্ষা করছে নরকের ভয়াবহ শাস্তি। বর্ণিত হয়েছে,

But as for the cowardly, the faithless, the detestable, as for murderers, the sexually immoral, sorcerers, idolaters, and all liars, their portion will be in the lake that burns with fire and sulfur, which is the second death.[৩]

অর্থাৎ, কিন্তু যারা ভীরু, অবিশ্বাসী ঘৃন্যলোক, নরঘাতক, যৌনপাপে পাপগ্রস্ত, মায়াবী, প্রতিমাপূজারী, যারা মিথ্যাবাদী, এদের সকলের স্থান হবে সেই আগুন ও জ্বলন্ত গন্ধকের হ্রদে; এই হল দ্বিতীয় মৃত্যু।

খ্রিস্টধর্মে শাস্তি আইন

মহান আল্লাহ মানব মুক্তি ও কল্যাণের লক্ষ্যে যুগে যুগে অসংখ্য নবী রাসূল প্রেরণ করেছেন। সকল নবীর মৌলিক দায়িত্ব ছিলো মহান আল্লাহর একত্ববাদের প্রতি মানুষকে দাওয়াত দেওয়া। এবং তাঁর বিধিবিধান মানুষকে শিক্ষা দেওয়া ও তা পালনে উৎসাহ দেওয়া। সকল নবী-রাসূলের একটা সাধারণ বৈশিষ্ট্য হলো পূর্ববর্তী নবী এবং তার

[১] Romans 13:9
[২] Matthew 19:18
[৩] Revelation 21:8

শরীয়াতের সত্যায়ন করা। নবী-রাসূলদের নিকট অনেক সময় নতুন শরীয়াত অবতীর্ণ হতো। আবার অনেক নবীর উপর নতুন শরীয়াত অবতীর্ণ হতো না। এ ক্ষেত্রে সাধারণ বিধান ছিলো পূর্ববর্তী নবীর শরীয়াত অনুসরণ। যাদের উপর নতুন শরীয়াত অবতীর্ণ হতো না তারা তাদের উম্মতদেরকে পূর্ববর্তী নবীর শরীয়াতের প্রতি দাওয়াত দিতেন। কোনো কোনো নবীর উপর অপূর্ণাঙ্গ শরীয়াত অবতীর্ণ হতো। এক্ষেত্রেও যেসব বিষয় নতুন শরীয়াতে বর্ণিত হয়নি সেসব বিষয় পূর্ববর্তী নবীর শরীয়াতই অনুসরণীয় ছিলো।

হযরত ঈসা (আ.)-এর জন্ম হয়েছিলো ইহুদী অধ্যুষিত সমাজে।[১] তার দীনের দাওয়াত প্রদানের প্রধান ক্ষেত্রও ছিলে ইহুদী সম্প্রদায়। যেকারণে তাওরাতের যেসকল বিধান রহিত হয়নি সেগুলোকে ইঞ্জিলের বিধান হিসেবেও গণ্য করা হয়।[২] বাইবেলে এর স্বীকৃতিও রয়েছে। বাইবেলে ঈসা (আ.)-এর আগমণের উদ্দেশ্য হিসেবে বলা হয়েছে মূসা (আ.)-এর বিধি-ব্যবস্থাকে পূর্ণতা প্রদান করা, তাঁর শিক্ষা ও আদর্শের প্রচার করা, এসবের বিনাশ সাধান করা নয়। বর্ণিত হয়েছে,

And seeing the multitudes, he went up into a mountain: and when he was set, his disciples came unto him: And he opened his mouth, and taught them, saying, Blessed are the poor in spirit: for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are they that mourn: for they shall be comforted. Blessed are the meek: for they shall inherit the earth. Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness: for they shall be filled. Blessed are the merciful: for they shall obtain mercy. Blessed are the pure in heart: for they shall see God. Blessed are the peacemakers: for they shall be called the children of God. Blessed are they which are persecuted for righteousness' sake: for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are ye, when men shall revile you, and persecute you, and shall say all manner of evil against you falsely, for my sake. Rejoice, and be exceeding glad: for great is your reward in heaven: for so persecuted they the prophets which were before you. Ye are the salt of the earth: but if the salt have lost his savour, wherewith shall it be salted? it is thenceforth good for nothing, but to be cast out, and to be trodden under foot of men. Ye are the light of the world. A city that is set on an hill cannot be hid. Neither do men light a candle, and put it under a bushel, but on a candlestick; and it giveth light unto all that are in the house. Let your light so shine before men, that they may see your good works, and glorify your Father which is in heaven. Think not that I am come to destroy the law, or the prophets: I am not come to destroy, but to fulfil. For verily I say unto you, Till heaven

---

[১] ইসরাঈলের জুদিয়া (Judoea) রাজ্যের বেথেলহামে।

[২] ড. আহমদ আলী, *ইসলামের শাস্তি আইন*, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা : ২০০৯, পৃ. ১২০

and earth pass, one jot or one tittle shall in no wise pass from the law, till all be fulfilled. Whosoever therefore shall break one of these least commandments, and shall teach men so, he shall be called the least in the kingdom of heaven: but whosoever shall do and teach them, the same shall be called great in the kingdom of heaven. For I say unto you, That except your righteousness shall exceed the righteousness of the scribes and Pharisees, ye shall in no case enter into the kingdom of heaven. [১]

অর্থাৎ, যীশু অনেক লোকের ভীড় দেখে একটা পাহাড়ের ওপর উঠে গেলেন। তিনি সেখানে বসলে শিষ্যরা তাঁর কাছে এলেন। এরপর তিনি তাঁদের কাছে শিক্ষা দিতে শুরু করলেন, বললেন: ‘ধন্য সেই লোকেরা যারা আত্মায় নত-নম্র, কারণ স্বর্গরাজ্য তাদেরই। ধন্য সেইলোকেরা যারা শোক করে, কারণ তারা ঈশ্বরের কাছ থেকে সান্ত্বনা পাবে। বিনয়ী লোকেরা ধন্য। তারা ঈশ্বরের প্রতিশ্রুত দেশের অধিকার লাভ করবে।’ ধন্য সেইলোকেরা, যারা ন্যায়পরায়ণতার জন্য ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত কারণ তারা তৃপ্ত হবে। যারা দয়াবান তারা ধন্য, কারণ তারা দয়া পাবে। যাদের অন্তর পরিশুদ্ধ তারা ধন্য, কারণ তারা ঈশ্বরের দর্শন পাবে। ধন্য তারা যারা তাদের চিন্তায় পরিশুদ্ধ, কারণ তারা ঈশ্বরের সঙ্গে থাকবে। ধন্য তারা যারা শান্তি স্থাপনের জন্য কাজ করে, কারণ তারা ঈশ্বরের সন্তানরূপে পরিচিত হবে। ঈশ্বরের পথে চলতে গিয়ে যারা নির্যাতন ভোগ করছে তারা ধন্য, কারণ স্বর্গরাজ্য তাদেরই হবে। তোমরা আমার অনুসারী হয়েছ বলে যখন লোকে তোমাদের অপমান ও নির্যাতন করে আর তোমাদের নামে মিথ্যা কুৎসা রটায় তখন তোমরা ধন্য। তোমরা আনন্দ করো, খুশী হও, কারণ স্বর্গে তোমাদের জন্য মহাপুরস্কার সঞ্চিত আছে। তোমাদের আগে যে ভাববাদীরা ছিলেন লোকে তাঁদেরও এভাবেই নির্যাতন করেছে। ‘তোমরা পৃথিবীর লবন, কিন্তু লবন যদি তার নিজের স্বাদ হারায় তবে কেমন করে তা আবার নোন্তা করা যাবে? তখন তা আর কোন কাজে লাগে না। তা কেবল বাইরে ফেলে দেওয়া হয় আর লোকরা তা মাড়িয়ে যায়। ‘তোমরা জগতের আলো, পাহাড়ের ওপরে কোন শহর, যা কখনও লুকানো যায় না। বাতি জ্বেলে কেউ পাত্রের নীচে রাখে না, তা বাতিদানের ওপরেই রাখে আর তা ঘরের সকলকে আলো দেয়। তেমনি তোমাদের আলোও লোকদের সামনে উজ্জ্বল হোক, য়েন তারা তোমাদের সৎকাজ দেখে তোমাদের স্বর্গের পিতা ঈশ্বরের মহিমা কীর্তন করে। ভেবো না যে আমি মোশির বিধি-ব্যবস্থা ও ভাববাদীদের শিক্ষা ধ্বংস করতে এসেছি। আমি তা ধ্বংস করতে আসিনি বরং তা পূর্ণ করতেই এসেছি। আমি তোমাদের সত্যি বলছি আকাশ ও পৃথিবীর লোপ না হওয়া পর্যন্ত বিধি-ব্যবস্থার বিন্দু বিসর্গও লোপ হবে না, বিধি-ব্যবস্থার সবই পূর্ণ হবে। তাই কেউ যদি এইসব আদেশের মধ্যে অতি সামান্য আদেশও অমান্য করে আর অপরকে তা করতে শিক্ষা দেয়, তবে সে স্বর্গরাজ্যে সব থেকে তুচ্ছ বলে গন্য হবে। কিন্তু যারা বিধি-ব্যবস্থা পালন করে ও অপরকে তা পালন করতে শিক্ষা দেয়, তারা স্বর্গরাজ্যে মহান বলে গন্য হবে। আমি তোমাদের সত্যি বলছি ব্যবস্থার শিক্ষক ও ফরীশীদের থেকে তোমাদের ধার্মিকতা যদি উন্নত মানের না হয় তবে তোমরা স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করতে পারবে না।

---

[১] Matthew 5 : 1-20

পবিত্র কুরআন কারীমে হযরত ঈসা (আ.) কর্তৃক হযরত মূসা (আ.)-এর উপর অবতীর্ণ তাওরাত সত্যায়ন করার ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। এবং তাওরাতের বিধিবিধান সমর্থন করার কথাও কুরআন কারীমে আলোচিত হয়েছে। তবে ঈসা (আ.)-এর শরীয়াতে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে মূসা (আ.)-এর শরীয়াতের বাইরে নতুন কিছু বিধান আরোপ করা হয়েছিল বলেও উল্লেখ বর্ণিত হয়েছে। ঈসা (আ.)-এর উম্মতের উপর নির্দেশনা এরূপ ছিল যে,তারা নতুন শরীয়াতের অনুসরণ করবে। পাশাপাশি মূসা (আ.)-এর শরীয়াতের যেসব বিধান রহিত করা হয়নি ত-ও অনুসরণ করবে। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন, [ঈসা (আ.) বলেন] আর আমি এসেছি আমার সম্মুখে তাওরাতে যা রয়েছে তার সমর্থকস্বরূপ ও তোমাদের জন্য যা নিষিদ্ধ ছিলো তার কতকগুলোকে হালাল করতে। এবং আমি তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে তোমাদের নিকট নিদর্শন নিয়ে এসেছি। সুতরাং আল্লাহকে ভয় কর এবং আমাকে অনুসরণ কর।[১]

খ্রিস্ট ধর্মের স্বল্প সংখ্যক অনুসারীদের মতে বাইবেল নিউ টেস্টামেন্ট অর্থাৎ ইঞ্জিলে হুদূদ সংক্রান্ত অপরাধের ব্যাপারে স্পষ্ট শাস্তি বিধান বর্ণিত না হওয়ায় এ অপরাধের দরুন কারো প্রতি কোনোরূপ শাস্তি প্রয়োগ বৈধ হবে না। তবে সিংহভাগ পণ্ডিতদের মতে এ সকল অপরাধের ক্ষেত্রে বাইবেল নিউ টেস্টামেন্ট অর্থাৎ তাওরাতে বর্ণিত শাস্তি বিধান কার্যকর করতে হবে। দ্বিতীয় মতটি কুরআন এবং বাইবেলের সাথে অধিক সঙ্গতিপূর্ণ এবং যৌক্তিক। সারকথা হচ্ছে যেসব অপরাধের ইঞ্জিলে কোনো শাস্তি বিধান বর্ণনা করা হয়নি সেসব ক্ষেত্রে তাওরাতের শাস্তি বিধানই খ্রিস্ট ধর্মের শাস্তি বিধান হিসেবে গন্য হবে।

[১] আল কুরআন, ৩ : ৫০

ষষ্ঠ অধ্যায়

হিন্দু ধর্ম ও হিন্দু ধর্মের শাস্তি আইন

প্রথম পরিচ্ছেদ : হিন্দু ধর্ম পরিচিতি

হিন্দু ধর্মের পরিচয়

ভারতীয় উপমহাদেশের অন্যতম প্রসিদ্ধ ধর্ম হিন্দুধর্ম[১] বা 'সনাতন[২] ধর্ম'। সনাতন অর্থ চিরন্তন–যা ছিল, যা আছে এবং যা থাকবে। সনাতন ধর্মই 'হিন্দুধর্ম' নামে পরিচিত। 'হিন্দু' শব্দটি 'সিন্ধু' শব্দ থেকে এসেছে। প্রাচীনকালেই নানা মত ও পথের অনুসারীদের সমন্বয়ে সনাতন ধর্ম গড়ে উঠেছে। এদের মধ্যে রয়েছে ভারতবর্ষের বাইরে থেকে আসা আর্য এবং প্রাক্–আর্য দ্রাবিড়, অস্টিক প্রভৃতি নানা জাতি–উপজাতি। তবে আর্য ঋষিদের সৃষ্ট বেদ বা পবিত্র জ্ঞানই এই ধর্মের মূল ভিত্তি। বেদ–স্রষ্টা ঋষিরা থাকতেন সিন্ধু নদের তীরে। আফগান প্রভৃতি বিদেশীরা সিন্ধুকে হিন্দু (Hind) রুপে উচ্চারণ করত।[৩]

বেদবিশ্বাসী সনাতন ধর্মাবলম্বীদের তাঁরা বলত হিন্দু। আর হিন্দুর ধর্ম অর্থাৎ সনাতন ধর্মকে তাঁরা বলত হিন্দুধর্ম। এভাবেই সনাতন ধর্ম হিন্দুধর্ম নামে পরিচিত হয়েছে। হিন্দুধর্ম কখন কোথা থেকে এসেছে, কে তাঁর উদ্ভাবক বা কোন মহামানবের পথ ধরে এর পথ যাত্রা এ সংক্রান্ত কোন তথ্য খুজে পাওয়া যায়নি। তবে একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় হিন্দুধর্ম একটি প্রাচীন ধর্ম। অনেকের ধারণা বৌদ্ধ ধর্মেরও পূর্বে হিন্দুধর্মের প্রচলন হয়।[৪]

হিন্দু ধর্মের শব্দের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে সরকার শাস্ত্রী বলেন, হিন্দু নামটি সিন্ধু নদের নাম থেকে এসেছে। সিন্ধু নদের তীরবর্তী অঞ্চলেই হিন্দু আর্যরা প্রথম বসতি স্থাপন করেন। পারস্য ও পার্শ্ববর্তী লোকেরা সিন্ধু স্থানকে হিন্দু স্থান বলত এবং আস্তে আস্তে সমগ্র অবিভক্ত ভারতবর্ষ ঐ নামেই পরিচিত হয়। আবার কারো মতে যারা বেদ পুরাণে বর্ণিত ধর্ম প্রচার করে অথবা বেদ ও পুরাণের রীতি-নীতি অনুযায়ী দৈনন্দিন জীবন যাত্রা নির্বাহ ও সংসার ধর্ম পালন করে। তারাই হিন্দু।

ঐতিহাসিকদের মতে, হিন্দু শব্দটি প্রকৃত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছিল হিমালয় পর্বতের উত্তর-পশ্চিম দিক দিয়ে ভারতে আগমনকারীদের দ্বারা। মুসলমানদের আগমনের পূর্বে হিন্দু শব্দটি ভারত সাহিত্যের কিংবা হিন্দু ধর্মীয় গ্রন্থগুলোর কোথাও উল্লেখ ছিল না।

কেউ কেউ বলেন, হিন্দু ধর্ম প্রাচীন পারসিকদের ভাষায় 'স' অক্ষর থেকে বিকৃত হয়ে 'হ' রূপে উচ্চারিত হতো তাই তারা সিন্ধু নদের এই দেশকে হিন্দুস্থান বা হিন্দু দেশ বলত।

---

[১] ভারতের বেদাশ্রিত সনাতন জাতি বা ধর্ম; উক্ত জাতীয় বা ধর্মাবলম্বী ব্যক্তি। [ফা. হিন্দু < সং সিন্ধু] হিন্দুভাব, হিন্দুয়ানী, হিন্দু ধর্মাবলম্বী সম্প্রদায়। শৈলেন্দ্র বিশ্বাস, *সংসদ বাংলা অভিধান*, সাহিত্য সংসদ, কোলকাতা: ২০০৪, পৃ. ৬১৮

[২] সনাতন বিণ. নিত্য, চিরবর্তমান, শাশ্বত; বহুকাল প্রচলিত (সনাতন প্রথা)। ঈশ্বর; ব্রহ্মা; শিব; বিষ্ণু। স্বনামধন্য বৈষ্ণবচূড়ামণি সনাতন গোস্বামী। স্ত্রী লিঙ্গে- সনাতনী, ধর্ম- অপরিবর্তনীয় ও চিরস্থায়ী ধর্ম; প্রচলিত, প্রাচীন হিন্দুধর্ম। *প্রাগুক্ত*, পৃ.৫৬৭

[৩] মোঃ গোলাম কিবরিয়া, "*ইসলাম, হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান ধর্মে উত্তরাধিকার আইন ঃ একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা*", ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ.ডি ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি(অপ্রকাশিত), ২০১৩, পৃ. ৩৩

[৪] ড. দিলীপ কুমার ভট্টাচার্য্য, *হিন্দুধর্ম শিক্ষা*, ঢাকা: জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ২০০৮ ,পৃ. ১

বর্তমান বিশ্বে প্রচলিত এবং সমাদৃত ধর্মসমূহের মধ্যে হিন্দু ধর্ম অন্যতম প্রধান ধর্ম। ভারতবর্ষে এ ধর্মের উৎপত্তি, ভারতবর্ষেই এর পূর্ণাঙ্গ বিকাশ। বিশ্বে বসবাসকারী শতাধিক কোটি হিন্দুর মধ্যে ভারতবর্ষেই প্রায় শতকরা ৯৯ ভাগ হিন্দু ধর্মাবলম্বী বসবাস করেন।

হিন্দুদের ধর্মীয় বিশ্বাস বা মতবাদ

হিন্দু ধর্ম বিশ্বের অন্যতম প্রাচীন ধর্ম। তবে এ ধর্মের প্রভাব ভারত উপমহাদেশ ছাড়া অন্য কোনো অঞ্চলে তেমন পরিলক্ষিত হয় না। জন্মান্তরবাদ হিন্দু ধর্মের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। এ ধর্মের প্রবর্তক কোনো ব্যক্তি বিশেষ নয়। হিন্দু ধর্মের আরাধ্যের আধিক্য এত বেশি যে, যুগের বিবর্তনে এক এক ব্যক্তি স্থান কাল ভেদে অসংখ্য দেবদেবী উপাসনার তাগিদ দিতেন।

ক. হিন্দুধর্মে বহু ঈশ্বরবাদ

ধর্মের ঐতিহাসিক পটভূমি আলোচনা করলে দেখা যায়, আদিকালে মানুষ বহু ঈশ্বর বা দেব দেবীর অস্তিত্বে বিশ্বাস করত। প্রাচীন গ্রিস, মিশর, ব্যাবিলন ও ভারতবর্ষে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। এ সময় মানুষ প্রকৃতির সব বস্তুতে শক্তি বিদ্যমান বলে তাদের ভয়ে পূজা অর্চনা করত। এ প্রসঙ্গে হার্বাট স্পেন্সার বলেন, “পুরাকালে পূর্ব পুরুষদের প্রতি উপাসনা থেকেই বহু ঈশ্বরবাদের সৃষ্টি হয়”।

অগণিত ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করার নামই বহু ঈশ্বরবাদ। প্রাচীনকালে বর্বর লোকেরা বিশ্বাস করত যে, মৃত্যুর পর আত্মাগুলো বিভিন্ন গ্রহ, নক্ষত্র, নদী, সমুদ্র, পাহাড়, বৃক্ষ ইত্যাদিতে আশ্রয় নেয় এবং এগুলোকে পরিচালনা করে। ফলে এসব প্রাকৃতিক শক্তিকে দেবতা জ্ঞানে পূজা করতে শুরু করে। ফলে তাদের মাঝে বহু ঈশ্বরবাদের জন্ম হয়।

বৈদিক যুগের পরবর্তীকালে হিন্দু ধর্মের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু ধর্ম অসংখ্য দেবদেবীতে বিশ্বাস স্থাপন করল এবং দেবদেবীর সংখ্যা তেত্রিশ কোটিতে গিয়ে দাঁড়াল এবং বিভিন্নভাবে পূজা অর্চনা করতে লাগল। হিন্দুরা ব্রাহ্মণ, বিষ্ণু ও শিব এই তিন দেবতার উদ্দেশ্যে তাদের পূজা নিবেদন করেন।

১. ব্রাহ্মণ বা সৃষ্টিকারক

২. বিষ্ণু বা সংরক্ষক

৩. শিব বা সংহারক

হিন্দু ধর্মে বিশ্বাসীগণ মনে করে থাকেন যে ব্রাহ্মণ, বিষ্ণু এবং শিব এই তিন দেবতাকে তুষ্ট করতে পারলেই পৃথিবী টিকে থাকা সম্ভব হবে।

খ. জন্মান্তরবাদ

হিন্দু ধর্মের নিজস্ব মতবাদসমূহের মধ্যে জন্মান্তরবাদ অন্যতম। জন্মান্তরবাদের ধারনাটি হিন্দু ধর্মেই প্রবল। অন্য কোনো ধর্মে এ মতবাদের উপস্থিতি তেমন দেখা যায় না। শাব্দিক ভাবে বিশ্লেষণ করলে- অন্য জন্ম, জন্মান্তর। আর এই

জন্মান্তর সম্বন্ধে যে দার্শনিক চিন্তা ভাবনা তাঁকে বলে জন্মান্তরবাদ। এই প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় অর্জুনকে উদ্দেশ্য করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য– বহুনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জুন তান্যহং বেদ সর্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ। অর্থঃ হে অর্জুন, তোমার ও আমার বহুবার জন্ম হয়েছে। সে কথা তোমার মনে নেই, সবই আমার মনে আছে। এই বক্তব্যের মধ্য দিয়ে শ্রীকৃষ্ণ যে অর্জুনের সখা এবং তাঁর রথের সারথি এ সত্য অতিক্রম করে আর একটি পরম সত্য প্রকাশিত হয়েছে, তা হল তিনি সর্বজ্ঞ, পরমেশ্বর।[১]

তিনি শাশ্বত, অব্যয় পরমাত্মার প্রতীক।[২] আবার যখন বলা হল অর্জুনেরও বহুবার জন্ম হয়েছে, এ থেকে বোঝা যায় অর্জুনের মধ্যেও পরমাত্মার ন্যায় কোন শাশ্বত বস্তু রয়েছে যা বহু বার জন্ম–মৃত্যুর মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েও নষ্ট হয়ে যায় নি। শাস্ত্রের ভাষায় জীবদেহের ঐ শাশ্বত বস্তু হল জীবাত্মা, সংক্ষেপে আত্মা।[৩]

জীবাত্মা পরামাত্মার অংশ বিশেষ। অংশের মধ্যেও মূলবস্তুর গুণাগুণ বিদ্যমান। তাই পরমাত্মার ন্যায় জীবাত্মাও অব্যয়, জন্ম মৃত্যুহীন, শাশ্বতবস্তু। তবে কোন অনাদি অতীত পরমাত্মা থেকে বিযুক্ত হয়ে জীবাত্মা ঐ পরমাত্মায় পুনরায় পর্যন্ত জীবাত্মাকে বারবার নতুন দেহ ধারণ করে মোক্ষলাভ বা ঈশ্বর প্রাপ্তির জন্য যোগ্যতা অর্জন করতে হয়।[৪]

গ. সনাতন ধর্মে আত্মার স্বরূপ

সনাতন ধর্মমতে আত্মা অবিনশ্বর, অব্যয়, অক্ষয় ও শাশ্বত। এর জন্ম নেই মৃত্যু নেই। সকল জীব দেহে ঈশ্বরই আত্মারূপে অবস্থান করে। দেহের বিনাশ আছে কিন্তু আত্মার বিনাশ নেই। আত্মা অবিনাশী। অগ্নি একে দগ্ধ করতে পারে না, জল একে সিক্ত করতে পারে না, বাতাস একে শুষ্ক করতে পারে না, অস্ত্র একে ছিন্ন করতে পারে না।

ঘ. বেদান্তবাদে পরলোকের স্বরূপ

বেদান্তবাদীদের মতে, যখন এ শরীর পতন হয় তখন মানবের মনে লয় হয়। মন প্রাণে লয় হয় আর প্রাণ আত্মায় প্রবেশ করে। তখন সেই মানবাত্মা সূক্ষ্ম শরীর বসন পরিধান করে। এমতাবস্থায় আত্মার তিনটি অবস্থা হয়ে থাকে।

১. যারা অত্যন্ত ধার্মিক তাদের মৃত্যু হলে তারা সূর্যরশ্মি অনুসরণ করে সূর্যোলোকে উপনীত হন।

২. যারা সকামভাবে সকর্ম করেন তারা মৃত্যুর পর চন্দ্রালোকে গমন করেন।

৩. যারা অতিশয় দুর্বৃত্ত তারা মৃত্যুর পর ভূত বা দানব রূপ পরিগ্রহ করে চন্দ্রালোক বা পৃথিবীর মাঝামাঝি স্থানে বাস করে।

ঙ. সনাতন ধর্মে অবতারবাদ

হিন্দুধর্ম মতে, দেবতা এ পৃথিবীতে অবতার হিসেবে আবির্ভূত হন। অবতার বলতে এমন কাউকে বোঝায় যে অবতীর্ণ হয়। কখনো কখনো পথিবীতে খুবই খারাপ অবতার বিরাজ করে। অশুভ শক্তির কাছে শুভ শক্তি পরাজিত হয়।

---

[১] মোঃ গোলাম কিবরিয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৩
[২] শ্রী শিবশঙ্কর চক্রবর্তী, শ্রীমদ্ভগবতগীতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ঢাকা : ১৯৯৯, পৃ. ৭২, (৪ ঃ ৫)
[৩] স্বামী নির্বেদানন্দ, হিন্দু ধর্ম, রামকৃষ্ণ মিশন কলিকাতা স্টুডেন্টস হোম, কোলকাতাঃ ২০১১, পৃ. ১৪৮
[৪] স্বামী নির্বেদানন্দ, হিন্দু ধর্ম, প্রাগুক্ত, পৃ.১৪৬

মানুষ ধর্মকে ভুলে গিয়ে অধর্মের আশ্রয় নেয়। চারদিক দুঃখের আর্তনাদ শোনা যায়। এ অবস্থা দেখে ধার্মিক ব্যক্তিদের হৃদয় কেঁপে উঠে।

শ্রীমদ্ভাগবদগীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, পৃথিবীতে যখনই ধর্মে গ্লানি হয় ও অধর্ম বেড়ে যায় আমি নিজেকে সৃষ্টি করি । সাধুদের পরিত্রাণ, দুষ্কৃতিকারীদের বিনাশ এবং ধর্ম সংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই। পৃথিবীতে ঈশ্বরের এরূপ অবতরণকে বলে অবতার। এভাবেই ঈশ্বর অবতার রূপে এসে মানুষের ও জগতের মঙ্গল করেন।

দশ অবতারের পরিচয়

১. মৎস্য অবতার

হাজার হাজার বছর আগে সত্যবত নামে এক ধার্মিক রাজা ছিলেন। তার রাজত্বকালে হঠাৎ পৃথিবীতে নানারূপ অন্যায় অত্যাচার দেখা দেয়। রাজা তখন জগতের কল্যাণ এর জন্য ঈশ্বরের কল্যাণ কামনা করল। একদিন জলাশয়ে স্নানের সময় রাজা সত্যব্রতের নিকট একটি পুঁটিমাছ এসে প্রাণ ভিক্ষা চায়। রাজা মাছটিকে বাড়ি নিয়ে আসেন। মাছটির আকার ভীষণভাবে বাড়তে থাকে। তাকে পুকুর সরোবর যেখানেই রাখা হয় সেখানেই আর ধরে না। রাজা ভাবলেন তিনি নিশ্চয় নারায়ণ; নারায়ণ বিষ্ণুর আরেক নাম। রাজা তখন মাছটির স্তবস্তুতি করতে লাগলেন। তারপর মৎস্যরূপী নারায়ণ রাজাকে বললেন সাত দিনের মধ্যে জগতে প্রলয় হবে।

২. কুর্মা অবতার

পৃথিবী পুনরায় জলে প্লাবিত হলে শ্রীবিষ্ণু পৃথিবীকে রক্ষার জন্য কচ্ছপরূপ গ্রহণ করে নিজ পৃষ্ঠদেশে পৃথিবী ধারণ করেন।

৩. বরাহ অবতার

একবার পৃথিবী সাগরে ডুবে যেতে থাকে তখন শ্রীকৃষ্ণ রবাহরূপে আবির্ভূত হয়ে পৃথিবীকে উদ্ধার করল

৪. নৃসিংহ অবতার

শ্রীবিষ্ণুর ভক্ত প্রহল্লাদকে ধ্বংসের প্রয়াস চালায় দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু। শ্রীবিষ্ণু এবার মর্তে আগমন করেন সিংহরূপে নিজ ভক্তকে রক্ষার জন্য। তিনি দৈত্যরাজকে হত্যা করে ভক্তকে রক্ষা করেন।

৫. পরশুরাম অবতার

রাজাধিরাজ বলির অত্যাচার ও অহংকারে পৃথিবীতে মানবজীবন দুঃসহ হয়ে উঠেছিল । শ্রীবিষ্ণু মতে আগমন করেন বামনরূপে এবং কৌশলে বলির অহংকার চূর্ণ করে দেয়।

৬. রাম অবতার

ত্রেতা যুগের রাক্ষস রাজ খুব শক্তিশালী হয়ে উঠে। তিনি দেবতার উপর অত্যাচার করেন। পৃথিবীতে অশান্তির সৃষ্টি হয়। তখন শ্রীবিষ্ণু রাজা দশরথের পুত্র রাম নামে আবির্ভূত হন।

৭. কল্কি অবতার

কলির যুগে বা আধুনিক কালে বিদ্যমান অনৈতিক অরাজকতা, অধর্ম ও অসত্যের প্রভাব থেকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে রক্ষার জন্য শ্রীবিষ্ণু কল্কি অবতার হিসেবে আবির্ভূত হবেন। তাদের ধর্মের বিশ্বাস অনুসারে এখনো কল্কি অবতারের আবির্ভাব ঘটেনি।

৮. বলরাম অবতার

অশুভ শক্তির প্রভাবে যমুনার জল বিষময় হয়ে উঠে। প্রাণীকুলের প্রাণ রক্ষার পরিবর্তে তা প্রাণ হরণের কারণে পরিণত হয়। শ্রীবিষ্ণু এবার বলরামরূপে আবির্ভূত হন এবং যমুনার জলে হাল বা লাঙ্গল আকর্ষণ করে যমুনার হলাহলকে অমৃতে পরিণত করেন।

৯. বুদ্ধ অবতার

দৈবিক যুগে যজ্ঞের নামে অবাধে হত্যা করা হতো পশু। এ হত্যা পশুকুলের বংশগতি নির্বংশ হওয়ার উপক্রম করে। এর ফলে শ্রীবিষ্ণু মর্তে আগমন করেন বুদ্ধরূপে। তিনি এসে জীব হত্যা মহাপাপ ঘোষণা করে পশু রক্ষার ব্যবস্থা করেন।

১০. বামন অবতার

রাজাধিরাজ বলির অত্যাচার ও অহংকারে পৃথিবীতে মানবজীবন দুঃসহ হয়ে উঠেছিল। শ্রীবিষ্ণু মর্তে আগমন করেন বামনরূপে এবং কৌশলে বলির অহংকার চূর্ণ করে দেয়।

হিন্দু ধর্মের বৈশিষ্ট্য

হিন্দুধর্মের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা করার মাধ্যমে এর স্বরূপ সম্পর্কে জানা যেতে পারে। নিম্নে এর বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ করা হলো।

হিন্দু ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা

হিন্দুধর্মের বিশেষ বা নির্দিষ্ট কোনো প্রতিষ্ঠাতা নেই। আমরা পৃথিবীর প্রত্যেক ধর্মের জনক খুঁজে পাই। কিন্তু হিন্দুধর্ম বিভিন্ন উপনিষদ, মুনি, ঋষি, আচার্যের নৈতিক শিক্ষা, বিভিন্ন সুদৃঢ় অভিজ্ঞতা ও উপদেশের উপর প্রতিষ্ঠিত।

বৈদিক ও সনাতন ধর্ম

হিন্দুধর্মের অপর নাম বৈদিক ও সনাতন ধর্ম। এ ধর্ম মূলত বেদকেন্দ্রিক বলে একে বৈদিক ধর্ম বলা হয়। ধারনা করা হয় সৃষ্টির প্রাক্কাল থেকে বিদ্যমান বলে এটা সনাতন ধর্ম নামেও পরিচিত।

সংজ্ঞায়িত করা যায় না

হিন্দুধর্মকে সংজ্ঞায়িত করা যায় না। এর কারণ এই নয় যে, এ ধর্ম খুবই রহস্যময় ও অমূর্ত। এর পরিসর হলো সার্বভৌম। কোনো সুনির্দিষ্ট একটি মাত্র বিশেষ চিন্তাধারার পরিণতি হিন্দুধর্ম নয়।

সংস্কৃতিমনা

হিন্দুধর্মে ধর্মের চেয়ে সংস্কৃতির কথা বেশি আছে। তাই ধর্মের চেয়ে সংস্কৃতি নামে এটা বেশি পরিচিত।

তত্ত্ব ও সাধনা

হিন্দুধর্মের দুটো দিক তত্ত্ব ও সাধনা। হিন্দুধর্ম শুধু তত্ত্ব আলোচনা করেনি, তত্ত্বের ভিত্তিতে সাধনার দ্বারা তত্ত্বের উপলব্ধির উপরও গুরুত্বারোপ করেছে।

সামান্য ও বিশেষ

হিন্দুধর্ম দুই প্রকার-সামান্য ও বিশেষ। নীতিসম্মত যে সব আচরণ মানুষের করণীয় সেগুলো সামান্য ধর্ম। হিন্দুধর্ম মতে, এই সামান্য ধর্মে ১০টি সাধারণ লক্ষণ বিদ্যমান। এই লক্ষণগুলো সম্পাদনের মাধ্যমে মানুষের চিত্তের শুদ্ধি ঘটে। আর বিশেষ বিশেষ সময়ে বিশেষ বিশেষ মানুষের যে সকল আচরণ নৈতিকভাবে করণীয় সেগুলোই হলো বিশেষ ধর্ম।

প্রবৃত্তিমার্গ ও নিবৃত্তিমার্গ

হিন্দুধর্মের দুটো পথ-প্রবৃত্তিমার্গ ও নিবৃত্তিমার্গ । প্রথমটি ভোগের এবং দ্বিতীয়টি ত্যাগের পথ। মানব জীবনের লক্ষ্য সম্বন্ধে হিন্দুধর্মে প্রবৃত্তিমার্গে তিনটি লক্ষ্যের কথা বলা হয়েছে। যথা : ধর্ম, অর্থ, কাম, আর নিবৃত্তিমার্গে একটি লক্ষ্যের কথা বলা হয়েছে, তা হলো- মোক্ষলাভ নিরূপণ।

বেদ হিন্দুধর্মের মহাগ্রন্থ

বেদ হিন্দুধর্মে সিদ্ধশাস্ত্র । হিন্দুধর্মের বিভিন্ন গ্রন্থের মধ্যে বেদের স্থান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বেদ ৪ ভাগে বিভক্ত। যথা-

১. ঋকবেদ

২. সামবেদ

৩. যজুর্বেদ

৪. অথর্ববেদ

বেদের সর্বশেষ অংশকে বলা হয় উপনিষদ বা বেদান্ত।

হিন্দু সমাজের দূত হলো গীতা।

চতুর্বেদের সার উপনিষদ। আর উপনিষদের সার হলো গীতা । হিন্দুধর্মের গুরুত্ব গীতায় প্রকাশিত হয়েছে। গীতার শিক্ষা হলো ঈশ্বর পরমতত্ত্ব, পরমসত্তা ও পুরুষোত্তম। ঈশ্বর জগতের অধিকর্তা।

পুরাণ

এটি হিন্দুধর্মের অন্যতম ধর্মগ্রন্থ। যা পুরাতন তাই পুরাণ। বেদের পুরাতন দার্শনিক তত্ত্ব ও সাধনতত্ত্ব নানাবিধ উপাখ্যানের মাধ্যমে পুরাণে প্রচার করা হয়েছে। এ জন্যেও এর নাম পুরাণ হয়েছে। পুরাণের পাঁচটি লক্ষণ হলো :

১. স্বর্গ

২.প্রতিস্বর্গ

৩. বংশ

৪. মন্বন্তর

৫. বংশানুচরিত।

হিন্দুধর্ম বহুদেবতায় বিশ্বাসী

বহু দেবদেবীর অস্তিত্ব হিন্দুধর্মের একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য। দেবতা শব্দের ধাতুগত অর্থ হলো জ্যোতির্ময় জীব। স্বর্গলোকেই দেবতাদের আবাস। হিন্দু ধর্মগ্রন্থ বেদ ও পুরাণে অসংখ্য দেব-দেবীর পরিচয় পাওয়া যায়। বেদ ও পুরাণে উল্লেখ নেই এমন অনেক দেব-দেবীর পূজাও হিন্দু ধর্মাবলম্বীগণ করে থাকেন। হিন্দু ধর্মে তিন ধরনের দেব-দেবীর পরিচয় পাওয়া যায়-

১. বৈদিক দেব-দেবী; যেমন- অগ্নি, ইন্দ্র, ঊষা।

২. পৌরাণিক দেব-দেবী; যেমন- ব্রাহ্ম, বিষ্ণু, শিব।

৩. লৌকিক দেব-দেবী; দুর্গা, গনেশ, মনসা ইত্যাদি।

একেশ্বরবাদী ধর্ম

হিন্দুধর্মে বহুদেবদেবীর অস্তিত্ব থাকলেও এটা মূলত একেশ্বরবাদী ধর্ম। এ ধর্ম এক পরম আধ্যাত্ম সত্তায় বিশ্বাসী। এ ধর্ম মনে করে যে, এক পরম ঈশ্বর বহু ঈশ্বরের মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করেছে। কাজেই হিন্দুধর্ম এক বিশেষ ধরনের একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী। আবার হিন্দুধর্মকে সর্বেশ্বরবাদী বলে সর্বধরেশ্বরবাদীও বলা হয়।

চতুরাশ্রম

হিন্দুধর্মে চারটি আশ্রম রয়েছে। যথা-

১. ছাত্র জীবন, পারিবারিক জীবন, কর্ম থেকে অবসর প্রাপ্তি ও সন্ন্যাস জীবন। ১-২৫ বছর বয়স হলো ছাত্রজীবন।

২. ২৫-৫০ বছর বয়স পর্যন্ত পারিবারিক জীবন।

৩. ৫০-৭৫ বছর বয়স পর্যন্ত অবসর প্রাপ্তি, এ সময় মানুষ সংসারের মায়া ত্যাগ করে বনে বাস করে।

৪. ৭৫-১০০ বছর বয়স পর্যন্ত জাগতিক সকল প্রকার ভোগ এমনকি যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান থেকেও বিরত হয়ে কেবলমাত্র ঈশ্বরের ধ্যানে মগ্ন থাকে।

বর্ণ প্রথা

হিন্দু ধর্মে ব্যক্তির জন্মের দ্বারা তার বর্ণ নির্ধারিত হয়। সমগ্র হিন্দু সমাজ চারটি প্রধান বর্ণে বিভক্ত : ১. ব্রাহ্মণ ২. ক্ষত্রিয় ৩. বৈশ্য ৪. শূদ্র। প্রতিটি বর্ণেরই নিজস্ব রীতি-রেওয়াজ, বিধিবিধান রয়েছে। হিন্দু সমাজের সামাজিক কার্যাবলি নিজ নিজ বর্ণের বিধিবিধান অনুযায়ী পরিচালিত হয়। অতীতে বর্ণ প্রথা কঠোরভাবে পালন করা হলেও বর্তমানে অগ্রসর হিন্দু সমাজে এ ব্যাপারে শৈথিল্য লক্ষণীয়।

ব্রাহ্মণ

হিন্দু সমাজে সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী, রাষ্ট্র ও সমাজের রক্ষক হলেন ব্রাহ্মণগণ। ব্রাহ্মণগণ পূজা, অর্চনার পৌরহিত্য করার অধিকার রাখেন। পূজার সময় একমাত্র তাঁদেরই পুরোহিত দেবতা সন্নিধ্যানে থাকার অনুমতি রয়েছে। হিন্দু ধর্মের বিশ্বাস মতে, ব্রাহ্মণের জন্ম ব্রহ্মার মুখ থেকে। তাই তার মর্যাদা অপর সকল হিন্দু জাতের তুলনায় অধিক।

ক্ষত্রিয়

হিন্দু সমাজে মর্যাদা, অধিকার, ক্ষমতা বিবেচনায় ব্রাহ্মণের পরেই ক্ষত্রিয়গণের অবস্থান। ক্ষত্রিয়গণ হলেন যোদ্ধার জাত রাষ্ট্র ও সমাজের রক্ষক। তারা সেনাবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত হবেন এবং রাজ্যের শাসন দায়িত্বে থাকবেন। হিন্দু ধর্ম মতে, ব্রহ্মার বাহু থেকে ক্ষত্রিয়দের সৃষ্টি, যে কারণে তারা অন্যান্য বর্ণের তুলনায় অধিক শক্তিশালী ও যোদ্ধা।

বৈশ্য

হিন্দু সমাজে ক্ষত্রিয়দের পরে বৈশ্যদের অবস্থান। ব্যবসা, কৃষিসহ ধন-সম্পদের উৎপাদন করা বৈশ্যদের প্রদান কর্তব্য। হিন্দুধর্মের ধারনা মতে, বৈশ্য এর সৃষ্টি হচ্ছে, ব্রহ্মার উরু থেকে।

শূদ্র

বৈশ্যদের পরে হিন্দু সমাজে শূদ্রের অবস্থান। শূদ্রগণ হিন্দু সমাজে সবথেকে নিম্ন শ্রেণীর মানুষ। তাদের কাজ হচ্ছে, উপরিউক্ত তিনশ্রেণীর সেবা করা, তাদের চাকরগিরী করা। হিন্দুধর্মের বিশ্বাস মতে, ব্রহ্মার পা থেকে শুদ্রের সৃষ্টি।

অবতারবাদ

হিন্দুধর্ম অবতারবাদে বিশ্বাসী। অবতার অর্থ হলো নিচে নামা বা অবতরণ করা। অর্থাৎ মনুষ্যাদির মূর্তি পরিগ্রহ করে দেবতার পৃথিবীতে আগমন। হিন্দুধর্ম বিশ্বাস করে যে, শ্রী ভগবান সৃষ্টি মণ্ডলে উর্ধ্বস্থিত, সে তার অপ্রাকৃত ও নিত্য ধাম থেকে কখনো কখনো নিচের সৃষ্টিমণ্ডলে নেমে আসে।

পুনর্জন্ম

হিন্দুধর্ম পুনর্জন্মে বিশ্বাসী। এ ধর্ম বিশ্বাস করে যে, জীবেরা মৃত্যুর পর পুনরায় জন্মগ্রহণ করে। যদিও অনেক ধর্মে পুনর্জন্মের কথা বলা হয়েছে, কিন্তু শুধুমাত্র হিন্দুধর্মে এর দার্শনিক ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যায়। পুনর্জন্মের অর্থ হলো মৃত্যুর পর আত্মার পুনরায় নতুন দেহ পরিগ্রহ। গীতায় বলা হয়েছে, 'যেমন মানুষ জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করে নতুন বস্ত্র গ্রহণ করে, তেমনি আত্মা জীর্ণ শরীর পরিত্যাগ করে নতুন শরীর পরিগ্রহ করে।'

কর্মবাদ

হিন্দুধর্ম কর্মবাদে বিশ্বাসী। কর্মবাদ অনুসারে মানুষকে তার কৃতকর্মের ফল অবশ্যই ভোগ করতে হবে। জীব কর্ম অনুযায়ী ফল ভোগ করবে। যেমন- সৎর্মের ফল পুণ্য ও সুখ আর অসৎ কর্মের ফল পাপ ও দুঃখ। এছাড়া হিন্দুধর্ম মতে, স্বকাম কর্ম ও নিষ্কাম কর্ম নামে আরো দু'প্রকার কর্ম আছে।

হিন্দুধর্ম আশাবাদী

দুঃখ দিয়ে শুরু হলেও প্রতিটি মানুষ নিজের চেষ্টায় ও ঈশ্বরের কৃপায় মোক্ষ লাভ করে দুঃখ দূর করতে পারে। এটা হিন্দুধর্মের বিশ্বাস । সুতরাং এ ধর্ম আশাবাদী।

পরিবর্তনশীলতা

হিন্দুধর্ম প্রচারিত, শ্বাশত, সনাতন সত্যগুলোকে প্রয়োজনবোধে যুগোপযোগী করার জন্য। পরিবর্তন করতে পারে, যাতে সাধারণ মানুষ সেগুলো হৃদয়ঙ্গম করতে পারে।

আনুষ্ঠানিক ধর্ম

প্রত্যেক ধর্মেই কতগুলো বাহ্যিক কৃত্রিম অনুষ্ঠান পালন করতে হয়। হিন্দুধর্মেও কৃত্রিম অনুষ্ঠান পালনের নির্দেশ আছে। এই সব অনুষ্ঠানকে আনুষ্ঠানিক ধর্ম বলা হয়। ধর্ম কর্ম তিন প্রকার-

১. কায়িক

২. বাচিক ও

৩. মানসিক।

দেবতার উদ্দেশ্যে অর্ঘদান হলো কায়িক, দেবতার নাম জপা বাচিক, দেবতার উপাসনা হলো মানসিক।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : হিন্দু ধর্মের শাস্তি আইন

মদ্যপান

মদপান সম্পর্কে হিন্দু ধর্মীয় গ্রন্থে দুই ধরনের বক্তব্য পওয়া যায়। যেমন- মনুস্মৃতি গ্রন্থে সব ধরনের গোশত ভক্ষণের অনুমতি দেওয়া হয়েছে, মদপানের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। হিন্দু ধর্মীয় গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, There is no sin in the eating of meat, nor in wine, nor in sexual intercourse, Such is the natural way of living beings; but abstention is conducive to great rewards.[১]

বিষ্ণু স্মৃতি গ্রন্থে ব্রাহ্মণদেরকে মদপানের অনুমতি দেওয়া হয়নি। তবে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের অন্য তিনটি বর্ণকে মদপানের করার অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। বর্ণিত হয়েছে, The ten intoxicating drinks are unclean for a Brahmana; but a Kshatriya and a Vaishya commit no wrong in drinking them.[২]

হিন্দু ধর্মের অধিকাংশ গ্রন্থেই মাদক সেবন নিষিদ্ধ না করা হলেও এর নানান ক্ষতিকর দিক তুলে ধরা হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে- মদপানকারীরা বুদ্ধি হারিয়ে ফেলে, অসংলগ্ন কথা বলে, উলঙ্গ হয়ে একে অপরের সাথে লড়াই করে ইত্যাদি। বর্ণিত হয়েছে, Those who consume intoxicants lose their intellect, talk rubbish, get naked and fight with each other.[৩]

মদপান করা, মহিলাদের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া দুর্বল মনের পরিচয়ক। হিন্দু ধর্মে মতে মানুষের উচিত দুর্বল মনের পরিচয় না দিয়ে ঈশ্বরের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া। বর্ণিত হয়েছে, Weak minds are attracted towards meat, alcohol, sensuality and womanizing. But O non-violent mind, you focus your mind towards the world in same manner as a mother cares for her child.[৪]

হিন্দু ধর্ম মতে যে ব্রাহ্মণ অথবা ব্রাহ্মণী সুরাপান করে, কিংবা যে ক্ষত্রিয় কিংবা বৈশ্য ব্রতপরায়ণ হয়ে প্রমাদবশত সোমরস পান করে, যমদূতেরা তাদের 'অয়ঃপান' নরকে নিয়ে যায়। অয়ঃপান নরকে যমদূতেরা তাদের পা দিয়ে পাপীদের বক্ষঃস্থল চেপে ধরে তাদের মুখে অত্যন্ত উত্তপ্ত তরল লোহা ঢেলে দেয়।

ব্যভিচার

ধর্ষণ ও ব্যভিচারের নিন্দা

হিন্দু ধর্মে মানুষের কর্মের দুরকমের ফল প্রাপ্তির কথা বলা হয়েছেঃ ক. পাপ ও খ. পুণ্য। ধর্ষণ-ব্যভিচার হিন্দু ধর্ম ঘোষিত বড় পাপসমূহের মধ্যে অন্যতম। Rig Veda-এ বলা হয়েছে, Seven are the pathways which the wise have fashioned; to one of these may come the troubled mortal.[৫]

---

[১] Manusmriti : 5.56
[২] Vishnu Smrti : 22:84
[৩] Rigveda : 8.2.12
[৪] Atharvaveda : 6.70.1
[৫] Rig Veda : 10.5.6

অর্থাৎ, পণ্ডিতগণ সাতটি সীমা নির্ধারণ করেছেন। কেউ তার একটি করলে সে-ও পাপী।

হিন্দু শাস্ত্রবিদগণ উপরে উল্লিখিত শ্লোকের সাতটি অলংঘনীয় সীমা বা পাপের নাম চিহ্নিত করেছেন। সেগুলো হচ্ছে, ১. ব্রহ্মহত্যা ২. সুরাপান ৩. চৌর্য্য ৪. ব্যভিচার ৫. পুনঃপুনঃ পাপাচরণ ৬. পাপ করে তা অস্বীকার করা, গোপন করা বা অসততা ৭. সায়ণ।[১] হিন্দু ধর্মের বিভিন্ন শাস্ত্রে ব্যভিচারসহ উল্লিখিত সাতটি বিষয়কে মহাপাপ হিসেবে একাধিক শ্লোকে উল্লেখ করা হয়েছে।

খ. ব্যভিচার-ধর্ষণের শাস্তি বিধান

কয়েক দশক আগেও হিন্দু সমাজে বর্ণ[২] প্রথা অত্যন্ত কঠোরভাবে পালন করা হতো। ধর্মগ্রন্থসমূহে বর্ণ প্রথা পালনে বারংবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বর্ণ প্রথা লংঘনকারীর জন্য পার্থিব এবং মৃত্যু পরবর্তী জীবনে ভয়াবহ শাস্তির হুশিয়ারিও দেওয়া হয়েছে। ধর্ষণ-ব্যভিচারের মতো ভয়াবহ অপরাধের শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রেও বর্ণভেদে ভিন্ন ভিন্ন শাস্তি বিধান দেওয়া হয়েছে। ব্রহ্মণ যতো বড় অপরাধই করেন না কেন তাকে কোনোক্রমেই মৃত্যুদণ্ড দেওয়া যাবে না বলে Manusmriti তে উল্লেখ করা হয়েছে।[৩]

প্রাচীন হিন্দু সমাজে ব্যভিচারী পুরুষ বা ধর্ষক উচ্চ বর্ণের হলে নামমাত্র জরিমানা আরোপ করে ছেড়ে দেওয়া হতো। অপরদিকে অপরাধী মহিলা থেকে নিম্নবর্ণের হলে তাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হতো এবং মহিলা সম্মতিতে ব্যভিচারে লিপ্ত হলে মহিলার কান কেটে দেওয়া হতো।[৪] সমবর্ণের কুমারী রমণীর সাথে এরূপ করা হলে অপরাধীকে শুধু আর্থিক জরিমানা দেওয়ার কথা হিন্দু আইনে উল্লেখ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে বিচারের ভার রমণীর পিতার উপর অর্পিত হবে। জরিমানা গ্রহণ তার এখতিয়ারাধীন। তিনি চাইলে জরিমানা করতে পারেন, আবার চাইলে ক্ষমাও করে দিতে পারেন।[৫]

শূদ্রের শাস্তি

শ্রমজীবী সম্প্রদায়ভূক্ত ব্যক্তি হচ্ছেন শূদ্র। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যদের সেবাযত্ন করাই এ বর্ণের লোকদের দায়িত্ব। ধর্ষণ-ব্যভিচারের ক্ষেত্রে সবচেয়ে কঠোর শাস্তি ভোগ করতে হয় শূদ্র গোত্রভূক্ত কেউ এ অপরাধে লিপ্ত হলে। উচ্চ বর্ণের কোনো রমণীর সাথে অপরাধে লিপ্ত হলে তার সব সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার পাশাপাশি যৌনাঙ্গ কর্তন করার আইন রয়েছে, ক্ষেত্রবিশেষ মৃত্যুদণ্ড প্রদানের বিধানও রাখা হয়েছে।[৬]

---

[১] https://www.ebanglalibrary.com/23672/ঋগ্বেদ-১০।০০৫/

[২] হিন্দু ধর্মে ব্যক্তির জন্মের দ্বারা তার বর্ণ নির্ধারিত হয়। সমগ্র হিন্দু সমাজ চারটি প্রধান বর্ণে বিভক্ত : ১. ব্রাহ্মণ ২. ক্ষত্রিয় ৩. বৈশ্য ৪. শূদ্র। প্রতিটি বর্ণেরই নিজস্ব রীতি-রেওয়াজ, বিধিবিধান রয়েছে। হিন্দু সমাজের সামাজিক কার্যাবলি নিজ নিজ বর্ণের বিধিবিধান অনুযায়ী পরিচালিত হয়। অতীতে বর্ণ প্রথা কঠোরভাবে পালন করা হলেও বর্তমানে অগ্রসর হিন্দু সমাজে এ ব্যাপারে শৈথিল্য লক্ষণীয়।

[৩] Tonsure (of the head) is ordained for a Brahmana (instead of) capital punishment; but (men of) other castes shall suffer capital punishment. Let him never slay a Brahmana, though he have committed all (possible) crimes; let him banish such an (offender), leaving all his property (to him) and (his body) unhurt; Manusmriti, 8 : 379-380

[৪] ড. মোঃ শফিকুর রহমান, *বাংলাদেশের আইন বিচার ব্যবস্থা এবং সাংবিধানিক ক্রমবিকাশ*, কামরুল বুক হাউস, ঢাকা-চট্টগ্রাম : ২০১৯, পৃ. ৬৬-৬৭

[৫] A (man of) low (caste) who makes love to a maiden (of) the highest (caste) shall suffer corporal punishment; he who addresses a maiden (on) equal (caste) shall pay the nuptial fee, if her father desires it; Manusmriti, 8 : 366

[৬] A Sudra who has intercourse with a woman of a twice-born caste (varna), guarded or unguarded, (shall be punished in the following manner): if she was unguarded, he loses the part (offending) and all his property; if she was guarded, everything (even his life) ; Manusmriti, 8 : 374

ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের শাস্তি

চার বর্ণের মধ্যে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের অবস্থান যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয়। ক্ষত্রিয়গণ হলেন শাসক বর্ণের লোক। আর বৈশ্যরা মূলত ব্যবসাবাণিজ্য সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত থাকেন। ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য সমাজের কেউ সংরক্ষিত ব্রাহ্মণীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হলে বিচারক তাকে ব্রাহ্মণের সমপরিমাণ ১০০০ পণ জরিমানা করবেন। অতিরিক্ত শাস্তি হিসেবে বৈশ্যকে কারাদণ্ড প্রদান করা হবে এবং ক্ষত্রিয়কে চুল কামিয়ে নগ্ন মাথায় মূত্র ঢেলে অপমান করা হবে।[১] সংরক্ষিত (Guarded) ব্রাহ্মণী সম্ভ্রান্ত কারো স্ত্রী হলে অপরাধীকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হবে এবং তার সমস্ত সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হবে।[২]

বৈশ্য বর্ণের কেউ ক্ষত্রিয় বর্ণের রমণীর সাথে অবৈধ সঙ্গমে লিপ্ত হলে বৈশ্যের পাঁচশত পণ জরিমানা করা হবে। আর ক্ষত্রিয় বর্ণের পুরুষ বৈশ্য বর্ণের রমণীর সাথে ব্যভিচার করলে ক্ষত্রিয়কে সহস্র পণ জরিমানা করা হবে।[৩]

ব্রাহ্মণের শাস্তি

হিন্দু ধর্মে ব্রাহ্মণ হচ্ছেন উচ্চ বর্ণের লোক। এই বর্ণের মানুষরা জ্ঞানে, কর্মে, গুনে উন্নত বলে মনে করা হয়। পুরোহিতগণ এ বর্ণেরই হয়ে থাকেন। ব্রাহ্মণ নিজ বর্ণের কোনো সংরক্ষিত (Guarded) ব্রাহ্মণীর সাথে ব্রাহ্মণীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোরপূর্বক ব্যভিচারে লিপ্ত হলে বিচারক তাকে ১০০০ পণ জরিমানা করবেন। কিন্তু ব্রাহ্মণীর সম্মতিতে ব্যভিচার সংঘটিত হলে তাকে ৫০০ পণ জরিমানা প্রদান করতে হবে।[৪] ক্ষত্রিয় কিংবা বৈশ্য বর্ণের সংরক্ষিত রমণীর সাথে ব্রাহ্মণ ব্যভিচারে লিপ্ত হলে সেক্ষেত্রে তাকে একই পরিমাণে জরিমানা প্রদান করতে হবে।[৫]

ব্যভিচারের অপবাদ

হিন্দু ধর্মে ব্যভিচারের অপবাদের ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট কোনো বর্ণনা পাওয়া যায় না। তবে মিথ্যা সাক্ষ্যকে অপরাধ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। আর অপবাদ এবং মিথ্যা সাক্ষ্য পুরোপুরি একই বিষয় না হলেও উভয়ের মাঝে বেশ সামঞ্জস্যও রয়েছে। উভয় প্রকার অপরাধের উদ্দেশ্যই একই; কাউকে অন্যায়ভাবে শাস্তি দেওয়া। তাই এখানে মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদানের শাস্তি উল্লেখ করা হলো।

মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদানকারী মারা যাওয়ার পর নরকে কঠিন শাস্তি ভোগ করবে। যে ব্যক্তি ইহলোকে সাক্ষ্য প্রদান করার সময়, ক্রয়-বিক্রয় করার সময় এবং দান করার সময় কোন প্রকার মিথ্যা কথা বলে, পরলোকে যমদূতেরা তাকে শত

---

[১] For intercourse with a guarded Brahmana a Vaisya shall forfeit all his property after imprisonment for a year; a Kshatriya shall be fined one thousand (panas) and be shaved with the urine (of an ass); Manusmriti, 8 : 375

[২] But even these two, if they offend with a Brahmani (not only) guarded (but the wife of an eminent man), shall be punished like a Sudra or be burnt in a fire of dry grass. Manusmriti, 8 : 377

[৩] Manusmriti, 8 : 382-84

[৪] A Brahmana who carnally knows a guarded Brahmani against her will, shall be fined one thousand (panas); but he shall be made to pay five hundred, if he had connexion with a willing one; Manusmriti, 8 : 378

[৫] A Brahmana shall be compelled to pay a fine of one thousand (panas) if he has intercourse with guarded (females of) those two (castes); Manusmriti, 8 : 383

যোজন উন্নত পর্বত শিখর থেকে মাথা নিচের দিকে করে 'অবীচিমৎ'[১] নামক নরকে নিক্ষেপ করে। সেই নরকের কোন অবলম্বন স্থান নেই এবং প্রস্তর নির্মিত পৃষ্ঠস্থল জলের মতো প্রতীত হয়। কিন্তু সেখানে কোন জল নেই, তাই তাকে বলে অবীচিমৎ (জলহীন)। সেই পাপীদের বার বার পাহাড়ের উপর থেকে নিক্ষেপ করা হলেও এবং তাদের দেহ তিল তিল করে বিদীর্ণ হলেও, তাদের মৃত্যু হয় না এবং তারা নিরন্তর সেই যন্ত্রণা ভোগ করতে থাকে।

ধর্ম ত্যাগ

হিন্দু ধর্মে হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করে অন্য ধর্ম গ্রহণ করা নিষিদ্ধ। কেউ হিন্দু ধর্মের দীক্ষা গ্রহণ করার পরে ছেড়ে দিলে, অন্য ধর্ম গ্রহণ করলে, পাপাচারে লিপ্ত হলে তাকে অবশ্যই নরকে যেতে হবে। যে ব্যক্তি স্বীয় বেদমার্গ থেকে ভ্রষ্ট হয়ে পাষণ্ড ধর্ম অবলম্বন করে, যমদূতেরা তাকে 'অসিপত্রবন'[২] নামক নরকে নিক্ষেপ করে বেত্রাঘাত করবে। এছাড়াও যে সমস্ত রাজন্য বা রাজপুরুষ ক্ষত্রিয় আদি দায়িত্বশীল পরিবারে জন্মগ্রহণ করা সত্বেও ধর্মনীতির অবহেলা করে এবং তার ফলে অধঃপতিত হয়, তারা মৃত্যুর পর বৈতরণী নামক নরকের নদীতে পতিত হয়।

চুরি

যখন কোন ব্যক্তি কারো দখল ভুক্ত অস্থাবর সম্পত্তি মালিকের অনুমতি ব্যতিরেকে অসৎ উদ্দেশ্যে নিয়ে যায় বা স্থানান্তর করে তাকে চুরি বলে । চুরি মানুষের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও সামাজিক শৃঙ্খলার জন্য হুমকি স্বরূপ। হিন্দু ধর্ম কোনো ধরনের চৌর্যবৃত্তিকেই সমর্থন করে না।

হিন্দু ধর্মে অংঃবুধ ধারণা রয়েছে। 'Asteya' শব্দটি সংস্কৃত ভাষা থেকে উদ্ভূত যৌগিক শব্দ। যেখানে 'A' অর্থ 'নন' এবং 'Steya' দ্বারা বোঝায় 'চুরি করার অনুশীলন' বা 'চুরি করা যায় এমন কিছু'। সুতরাং, Asteya-এর পূর্ণাঙ্গ অর্থ দাঁড়ায় 'অ-চুরি করা' বা চুরি না করা।

Asteya-এর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, The abstinence, in one's deeds or words or thoughts, from unauthorized appropriation of things of value from another human being.

অন্য ব্যক্তির মূল্যবান জিনিস তার অনুমতি ব্যাতিরেকে গ্রহণ করা, গ্রহণ করার চিন্তা করা থেকে বিরত থাকা।

---

[১] A person who in this life bears false witness or lies while transacting business or giving charity is severely punished after death by the agents of Yamarāja. Such a sinful man is taken to the top of a mountain eight hundred miles high and thrown headfirst into the hell known as Avīcimat. This hell has no shelter and is made of strong stone resembling the waves of water. There is no water there, however, and thus it is called Avīcimat [waterless]. Although the sinful man is repeatedly thrown from the mountain and his body broken to tiny pieces, he still does not die but continuously suffers chastisement; Srimad Bhagavata, 5.26.28

[২] If a person deviates from the path of the Vedas in the absence of an emergency, the servants of Yamarāja put him into the hell called Asi-patravana, where they beat him with whips. When he runs hither and thither, fleeing from the extreme pain, on all sides he runs into palm trees with leaves like sharpened swords. Thus injured all over his body and fainting at every step, he cries out, "Oh, what shall I do now! How shall I be saved!" This is how one suffers who deviates from the accepted religious principles; Srimad Bhagavata, 5.26.15

The Yoga Sūtras-এ বলা হয়েছে, Asteya (non-stealing) is listed as the third Yamas or virtue of self-restraint, along with Ahimsa (non-violence), Satya (non-falsehoods, truthfulness), Brahmacharya (sexual chastity in one's feelings and actions) and Aparigraha (non-possessiveness, non-craving)[১]

অস্তেয়কে (অ-চুরি) অহিংসা, মিথ্যা, অবাধ যৌনাচার, অপরিগ্রহ থেকে আত্মরক্ষার তৃতীয় গুন হিসেবে তালিকাভূক্ত করা হয়।

জৈন ধর্মেও Asteya ধারণা রয়েছে। জৈন ধর্মে Asteya-এর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, Prompting a person to steal, or prompting him through another or approving of the theft, is the first transgression. The second is receiving stolen goods from a person, whose action has neither been prompted nor approved by the recipient. Receiving or buying goods otherwise than by lawful and just means is an irregularity or a transgression. An attempt to buy precious things very cheaply in a disordered state is the third transgression. Cheating others by the use of false weights and measures in order to ob,ain more from others and give less to others, is the fourth transgression. Deceiving others with artificial gold, synthetic diamonds and so on, is the fifth transgression. These five are the transgressions of the vow of non-stealing.[২]

একজন ব্যক্তিকে চুরি করতে প্ররোচিত করা বা অন্যের মাধ্যমে তাকে প্ররোচিত করা বা চুরির অনুমোদন দেওয়া প্রথম সীমালঙ্ঘন। দ্বিতীয়টি হল একজন ব্যক্তির কাছ থেকে চুরি করা পণ্য গ্রহণ করা, যার ক্রিয়াটি প্রাপকের দ্বারা অনুপ্রাণিত বা অনুমোদিত হয়নি। বৈধ ও ন্যায্য উপায় ব্যতীত অন্যভাবে পণ্য গ্রহণ করা বা ক্রয় করা একটি অনিয়ম বা সীমালঙ্ঘন। বিশৃঙ্খল অবস্থায় অতি সস্তায় মূল্যবান জিনিস কেনার চেষ্টা তৃতীয় সীমালংঘন। অন্যের কাছ থেকে বেশি লাভ এবং অন্যকে কম দেওয়ার জন্য মিথ্যা ওজন ও মাপকাঠি ব্যবহার করে অন্যকে প্রতারণা করা চতুর্থ সীমালংঘন। কৃত্রিম সোনা, কৃত্রিম হীরা ইত্যাদি দিয়ে অন্যকে প্রতারণা করা পঞ্চম সীমালংঘন। এই পাঁচটি হল অ-চুরি না করার ব্রতের সীমালংঘন।

হিন্দু ধর্মে যেসকল বিষয়কে পাপ বা অপরাধ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম প্রধান হচ্ছে চৌর্যবৃত্তি। এসব অপরাধ থেকে বেঁচে থাকা সকল মানুষের আবশ্যক কর্তব্য। বর্ণিত হয়েছে, One becomes sinful if he or she crosses even one of the 7 restraints. Yaskacharya defines these 7 sins in his Nirukta

---

[১] Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Achourya

[২] Sarvārthasiddhi : 7–27

as: Theft, Adultery, Murder of a noble person, Jealousy , Dishonesty, Repeating misdeeds and consumption of alcohol.[১]

৭টি সংযমের একটিও অতিক্রম করলে কেউ পাপী হিসেবে বিবেচিত হবে। এই ৭টি পাপের সংজ্ঞা নিম্নরূপ: চুরি, ব্যভিচার, একজন মহান ব্যক্তির হত্যা, ঈর্ষা, অসততা, দুষ্কর্মের পুনরাবৃত্তি এবং মদ্যপান।

চৌর্যবৃত্তি নরকে যাওয়ার অনত্যম একটা কারণ। হিন্দু ধর্ম বিশ্বাসানুসারে তামগ্রি নামক নরকে চোর শাস্তি প্রাপ্ত হবে।[২] যে ব্যক্তি অপরের ধন, স্ত্রী ও পুত্র অপহরণ করে, অত্যন্ত ভয়ঙ্কর যমদূতেরা তাকে কালপাশে বেঁধে বলপূর্বক তামিগ্র নরকে নিক্ষেপ করে। এই তামিগ্র নরক ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন; সেখানে যমদূতেরা পাপীকে ভীষণভাবে প্রহার, তাড়ন এবং তর্জন করে। সেখানে তাকে অনশনে রাখা হয় এবং জল পান করতে দেওয়া হয় না। এইভাবে ক্রুদ্ধ যমদূতদের দ্বারা নির্যাতিত হয়ে সে মূর্ছিত হয়।

অন্যান্য ধর্মের ন্যায় হিন্দু ধর্মেও চৌর্যবৃত্তি একটি মারাত্মক অর্থনৈতিক অপরাধ। হিন্দু ধর্মগ্রন্থ অনুসারে চৌর্যবৃত্তি একটি জঘন্য পাপের কাজ। হিন্দু ধর্মে চোরের জন্য মৃত্যু পরবর্তী জীবনে নরকের শাস্তি ভোগের ঘোষণাও প্রদান করা হয়েছে। যদিওবা হিন্দু শাস্ত্রে হিন্দু শাস্ত্রে পার্থিব জীবনে চোরের শাস্তি বিধানের উল্লেখ পাওয়া যায় না।

ডাকাতি

ইতোপূর্বে আমরা অংঃবুধ বা চুরি না করা প্রসঙ্গে আলোচনা করেছি। ডাকাতিও এক প্রকার চৌর্যবৃত্তি। কারণ চুরি এবং ডাকাতির উদ্দেশ্য একই; অপরের সম্পদ আত্মসাৎ করা। চুরি করা হয় গোপনে, মালিকের অগোচরে। আর ডাকাতি করা হয় প্রকাশ্যে, জোরপূর্বক। যেভাবেই অপরের অর্থ আত্মসাৎ করা হোক না কেন তা হিন্দু ধর্মে নিষিদ্ধ।

ডাকাতি পেশায় যুক্ত ব্যক্তিকে নরকের শাস্তি ভোগ করতে হবে। যে ব্যক্তি সঙ্কট উপস্থিত না হলেও ব্রাহ্মণ অথবা অন্য কোন ব্যক্তির স্বর্ণ-রত্ন ইত্যাদি ধন চৌর্যবৃত্তির দ্বারা অথবা বল প্রয়োগের দ্বারা অপহরণ করে, তাকে 'সন্দংশ'[৩] নামক নরকে নিক্ষেপ করা হয়। সেখানে লৌহময় অগ্নিপিণ্ড এবং সাঁড়াশির দ্বারা তার ত্বক ছিন্নভিন্ন করা হয়। এইভাবে তার সারা শরীর কেটে টুকরো টুকরো করা হয়।

---

[১] Rigveda : 10.5.6

[২] My dear King, a person who appropriates another's legitimate wife, children or money is arrested at the time of death by the fierce Yamadūtas, who bind him with the rope of time and forcibly throw him into the hellish planet known as Tāmisra. On this very dark planet, the sinful man is chastised by the Yamadūtas, who beat and rebuke him. He is starved, and he is given no water to drink. Thus the wrathful assistants of Yamarāja cause him severe suffering, and sometimes he faints from their chastisement; Srimad Bhagavata, 5.26.8 (আমার প্রিয় রাজা, যে ব্যক্তি অন্যের বৈধ স্ত্রী, সন্তান বা অর্থ চুরি করে তাকে মৃত্যুর পর উগ্র যমদূতদের দ্বারা গ্রেফতার করা হয়, যারা তাকে সময়ের দড়ি দিয়ে বেঁধে জোরপূর্বক তামিশ্র নামে পরিচিত নরক ফেলে দেয়। এই অন্ধকার নরকে, পাপী মানুষটিকে যমদূতরা শাস্তি দেয়, যারা তাকে প্রহার করে এবং তিরস্কার করে। সে ক্ষুধার্ত, তাকে পান করার জন্য পানি দেওয়া হয় না। এইভাবে যমরাজের ক্রুদ্ধ সহকারীরা তাকে মারাত্মক কষ্ট দেয় এবং কখনও কখনও সে তাদের শাস্তিতে অজ্ঞান হয়ে যায়।)

[৩] My dear King, a person who in the absence of an emergency robs a brāhmaṇa — or, indeed, anyone else— of his gems and gold is put into a hell known as Sandaṁśa. There his skin is torn and separated by red-hot iron balls and tongs. In this way, his entire body is cut to pieces' Srimad Bhagavata, 5.26.20 (আমার প্রিয় রাজা, একজন ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে অন্য কেউ - তার রত্ন এবং স্বর্ণ লুণ্ঠন করলে, তাকে সন্দেশ নামের নরকে নিক্ষেপ করা হয়। সেখানে তার চামড়া লাল-গরম লোহার বল ও চিমটা দিয়ে ছিঁড়ে আলাদা করা হয়। এভাবে তার সারা শরীর টুকরো টুকরো হয়ে যায়।)

এছাড়াও দস্যুবৃত্তি করে পরগৃহে অগ্নি দেয় অথবা বিষ প্রদান করা, অথবা যে সমস্ত রাজা বা রাজপুরুষ আয়কর আদায়ের নামে অথবা অন্যান্য উপায়ে বণিক সম্প্রদায়কে লুণ্ঠন করা ইত্যাদি অপরাধের শাস্তি স্বরূপ মৃত্যুর পর সেই সমস্ত ডাকাত বা দস্যুদের সারমেয়াদন নামক নরকে নিক্ষেপ করা হয়। সেখানে ৭২০টি বজ্রের মতো দন্ত সমন্বিত কুকুর রয়েছে। যমদূতের নির্দেশে সেই কুকুরগুলি অত্যন্ত তৃপ্তির সঙ্গে সেই সমস্ত পাপীদের ভক্ষণ করে।

হত্যা

অন্যান্য ধর্মের ন্যায় হিন্দু ধর্মও মানব হত্যা করা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। হিন্দু ধর্মে ঘোষিত পাপসমূহের একটি মানব হত্যা। বর্ণিত হয়েছে, One becomes sinful if he or she crosses even one of the 7 restraints. Yaskacharya defines these 7 sins in his Nirukta as:

1. Theft
2. Adultery
3. Murder of a noble person
4. Jealousy
5. Dishonesty
6. Repeating misdeeds and
7. Consumption of alcohol.[১]

এই পৃথিবীতে অনেক পুরুষ এবং স্ত্রী রয়েছে, যারা ভৈরব অথবা ভদ্রকালীর কাছে নরবলি দিয়ে তাদের মাংস খায়। যারা এই ধরনের যজ্ঞ করে, তাদের মৃত্যুর পর যমালয়ে নিয়ে যাওয়া হয় এবং তারা যাদের বলি দিয়েছিল, তারা রাক্ষস হয়ে সুতীক্ষ্ণ অস্ত্রের দ্বারা সেখানে তাদের খণ্ড খণ্ড করে কাটে। ইহলোকে যজ্ঞকারী ব্যক্তি যেভাবে নরবলি দিয়ে তার রক্ত পান করে আনন্দে নৃত্য-গীত করে, হিংসিত ব্যক্তিরাও তেমন পরলোকে যজ্ঞকারীর রক্ত পান করে আনন্দে নৃত্য-গীত করে। ব্রাহ্মণঘাতককে নিক্ষেপ করা হবে 'কালসূত্র' নামক নরকে।[২]

---

[1] Rigveda : 10.5.6

[২] The killer of a brāhmaṇa is put into the hell known as Kālasūtra, which has a circumference of eighty thousand miles and which is made entirely of copper. Heated from below by fire and from above by the scorching sun, the copper surface of this planet is extremely hot. Thus the murderer of a brāhmaṇa suffers from being burned both internally and externally. Internally he is burning with hunger and thirst, and externally he is burning from the scorching heat of the sun and the fire beneath the copper surface. Therefore he sometimes lies down, sometimes sits, sometimes stands up and sometimes runs here and there. He must suffer in this way for as many thousands of years as there are hairs on the body of an animal; Srimad Bhagavata, 5.26.14 (ব্রাহ্মণের হত্যাকারীকে কালসূত্র নামে পরিচিত নরকে রাখা হয়, যার পরিধি আশি হাজার মাইল এবং যা সম্পূর্ণ তামা দিয়ে তৈরি। নীচে থেকে আগুনে এবং উপরে থেকে জ্বলন্ত সূর্য দ্বারা উত্তপ্ত, এই গ্রহের তামার পৃষ্ঠটি অত্যন্ত উত্তপ্ত। এইভাবে একজন ব্রাহ্মণের হত্যাকারী অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিকভাবে দগ্ধ হওয়া ভোগ করে। অভ্যন্তরীণভাবে সে ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় জ্বলছে এবং বাহ্যিকভাবে সে সূর্যের প্রখর তাপ এবং তামার পৃষ্ঠের নীচে আগুনে জ্বলছে। তাই সে কখনো শুয়ে থাকে, কখনো বসে, কখনো উঠে দাঁড়ায় এবং কখনো এদিক ওদিক দৌড়ায়। পশুর শরীরে যত লোম আছে, হাজার হাজার বছর তাকে এভাবে কষ্ট ভোগ করতে হবে।)

সপ্তম অধ্যায়

বৌদ্ধ ধর্ম ও বৌদ্ধ ধর্মের শাস্তি আইন

প্রথম পরিচ্ছেদ : বৌদ্ধ ধর্ম পরিচিতি

বৌদ্ধ ধর্ম একটি চারিত্রিক ও নৈতিক মতবাদ। যা গৌতম বুদ্ধের কতকগুলো দার্শনিক মতবাদের সমন্বয়ে প্রতিষ্ঠিত। তার শিক্ষাগুলো মূলত কোনো ধর্মীয় শিক্ষা নয় বরং তা ধর্মীয় বলয়ে কিছু মত বিশ্বাসের সৃষ্টি। প্রাচীন ও বর্তমান বৌদ্ধ ধর্মের মাঝে কিছুটা পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। প্রাচীনটি ছিল চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। আর বর্তমানটি দার্শনিক মতবাদ, জীবনী ও জগত সম্পর্কিত ধারণার সমষ্টি।

বৌদ্ধ ধর্মের পরিচয়

স্মর্তব্য যে, বৌদ্ধ ধর্ম ঐশ্বরিক কোনো ধর্ম নয়। বৌদ্ধ ধর্ম একটা জাগতিক দর্শন। যা ভারতবর্ষে খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর পর হিন্দু ব্রাহ্মণবাদ থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে। প্রাথমিক যুগে এটি হিন্দু ব্রাহ্মণবাদের সাথে দ্বন্দ্বে লিপ্ত ছিল। এতে মানুষের নিজের প্রতি গুরুত্বারোপের আহবান জানানো হয়েছে। বৈরাগ্যবাদ, পার্থিব সম্ভোগ, পরিত্যাগ এবং কল্যাণকর কাজের প্রতি দৃষ্টিদানের প্রতিও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

মুক্ত বিশ্বকোষ Wikipedia-তে Buddhism- এর পরিচয় দিতে গিয়ে বলা হয়েছে,

Buddhism is an Indian religion based on a series of original teachings attributed to Gautama Buddha. It originated in ancient India as a Sramana tradition sometime between the 6th and 4th centuries BCE, spreading through much of Asia. It is the world's fourth-largest religion with over 520 million followers, or over 7% of the global population, known as Buddhists.[১]

বৌদ্ধধর্ম হল একটি ভারতীয় ধর্ম যা গৌতম বুদ্ধর শিক্ষাকে আবর্তন করে গড়ে উঠেছে। এটি প্রাচীন ভারতে একটি শ্রমন ঐতিহ্য হিসাবে উদ্ভূত হয়েছিল খ্রিস্টপূর্ব ৬ ষ্ঠ এবং ৪ র্থ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে, এশিয়ার বেশিরভাগ অংশে এটি ছড়িয়ে পড়ে। এটি বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম ধর্ম, যার ৫২০ মিলিয়নেরও বেশি অনুসারী, বা বিশ্ব জনসংখ্যার ৭% এরও বেশি, যা বৌদ্ধ নামে পরিচিত।

Encyclopædia Britannica-তে Buddhism- এর পরিচয় দিতে গিয়ে বলা হয়েছে,

Buddhism, religion and philosophy that developed from the teachings of the Buddha (Sanskrit: “Awakened One”), a teacher who lived in northern India between the mid-6th and mid-4th centuries BCE (before the Common Era). Spreading from India to Central and Southeast Asia, China, Korea, and Japan, Buddhism has played a central role in the spiritual, cultural, and social life of Asia, and, beginning in the 20th century, it spread to the West.[২]

---

[১] Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Buddhism
[২] Encyclopædia Britannica. https://www.britannica.com/topic/Buddhism

বৌদ্ধধর্ম, ধর্ম এবং দর্শন যা বুদ্ধের (সংস্কৃত: "জাগ্রত এক") শিক্ষা থেকে বিকশিত হয়েছে, একজন শিক্ষক যিনি উত্তর ভারতে ৬ষ্ঠ এবং মধ্য-৪র্থ শতাব্দী খ্রিস্টপূর্ব (সাধারণ যুগের আগে) মধ্যে বসবাস করতেন। ভারত থেকে মধ্য ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, চীন, কোরিয়া এবং জাপানে বিস্তৃত, বৌদ্ধধর্ম এশিয়ার আধ্যাত্মিক, সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক জীবনে একটি কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করেছে এবং ২০ শতকের শুরুতে এটি পশ্চিমে ছড়িয়ে পড়ে।

বৌদ্ধ ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা গৌতম বুদ্ধের মৃত্যুর পর এ ধর্মের মৌলিক চিত্র তাঁর অনুসারীদের দ্বারা কিছুটা পরিবর্তিত হয়েছে বলে লক্ষ্য করা যায়। পরিবর্তিত পরিস্থিতির আলোকে কালক্রমে বৌদ্ধ ধর্ম হিন্দু ধর্মের ন্যায় পৌত্তলিক ধর্মে পরিণত হয়েছে।

বৌদ্ধ ধর্ম গৌতম বুদ্ধ কর্তৃক প্রচারিত এক ধর্ম বিশ্বাস ও জীবন দর্শন হিসেবে গণ্য। আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীতে গৌতম বুদ্ধের জন্ম। বুদ্ধের পরিনির্মাণের পক্ষে ভারতীয় উপমহাদেশ সহ এশিয়া মহাদেশে বর্তমানে বৌদ্ধ ধর্ম দুটি মতবাদে বিভক্ত। প্রধান অংশ হলো হীনযান এবং দ্বিতীয় অংশ মহাযান নামে পরিচিত।

বৌদ্ধ ধর্মের প্রবর্তক গৌতম বুদ্ধ আজ থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছর পূর্বে খ্রি. পূর্ব ৬২৪ অব্দে তুষার শৃঙ্গ হিমালয়ের কোলে শাক্য রাজ্য কপিলাবস্তু নামক স্থানের লুম্বিনী নামক উদ্যানে পূর্ণিমার সমুজ্জ্বল রাত্রে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম শুদ্ধোধন শাল্য কুলের রাজা এবং মাতার নাম মায়াদেবী। তার পূর্ব নাম ছিল সিদ্ধার্থ।

সিদ্ধার্থ ছোটবেলা থেকে অন্য দশজন ছেলে থেকে ভিন্ন ছিল। তিনি সবসময় চিন্তামগ্ন থাকতেন। তাই পিতা শুদ্ধোধন তাকে সংসারে বাধার জন্য ১৮ বছর বয়সে এক পরমা সুন্দরীর সাথে বিবাহ দেন। কিন্তু তিনি সংসারের মায়া, পিতা-মাতা, স্ত্রী পুত্র ছেড়ে একদা গভীর রজনীতে বেরিয়ে পড়েন সত্যের সন্ধানে।

৬ বছর সন্ন্যাসী জীবন অতিবাহিত করে দেখলেন যে, আলোচনা ও কৃচ্ছ সাধনায় কোনো ফল নেই। তাই তিনি মধ্যম পন্থা গ্রহণ করে গয়ার নৈরাঞ্জনা নদীর তীরে অশ্বত্থ বৃক্ষতলে গভীর আত্মবিশ্বাস নিয়ে ধ্যান মগ্ন হলেন এবং প্রতিজ্ঞা করলেন যে, সিদ্ধি হাসিল না হওয়া পর্যন্ত ধ্যানাসন ত্যাগ করবেন না।

অবশেষে প্রায় পঞ্চাশ দিন, সুজাতা নামে সেনানী গ্রামের এক গৃহবধূ শ্রমণ গৌতমকে পায়সান্ন দিয়ে সেবা করেন। ৫২৮ খ্রি. পূর্বাব্দে ৩৫ বছর বয়সে বৈশাখী পূর্ণিমা তিথির শেষ রাতে তিনি বোধি বা চরম জ্ঞান লাভ করেন। বিশ্বের সকল রহস্য তার নিকট উন্মোচিত হয়। বুদ্ধত্ব বা সম্যক জ্ঞান লাভ করে তিনি বুদ্ধ নামে খ্যাত হন । এবং তারই প্রচারিত ধর্ম বৌদ্ধ ধর্মে নামে প্রচারিত ও প্রসারিত হয়। যা আজ বিশ্বব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টি করেছে।

বৌদ্ধ ধর্মের শীল পরিচিতি

বৌদ্ধধর্মে শীলের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। বৌদ্ধ ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা গৌতম বুদ্ধ মানব চরিত্র সুন্দর করার জন্য কতকগুলো নিয়ম-পদ্ধতি বেঁধে দিয়েছেন। যে নিয়মগুলো শীল নামে পরিচিত। শীল[১] শব্দের অর্থ চরিত্র বা স্বভাব। এছাড়া শীলের আরও অর্থ আছে। সেগুলো হল – আশ্রয়, সংযম, শৃঙ্খলা, প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি। যারা শীল পালন করে তাঁদেরকে বলা হয় শীলবান। শীল পালনের দ্বারা দেহ ও মনকে সংযত করা যায়। মানুষ সুন্দর সুন্দর অলংকার পরে। যেমন- সোনা, রুপা, মনি, মুক্তা ইত্যাদি। এসব অলংকার পরলে মানুষের দেহের সৌন্দর্য বাড়ে। এসবের চেয়ে বড় অলংকার হল শীল। অলংকারের দ্বারা দেহের সৌন্দর্য বাড়ে আর শীল পালনের দ্বারা মানুষের মনের সৌন্দর্য বাড়ে, মানুষ চরিত্রবান হয়। [২]

শীল হচ্ছে সমাধির ভিত্তি এবং সমাধি হল প্রজ্ঞার ভিত্তি। প্রজ্ঞা লাভ করতে হলে সমাধিস্থ হওয়া দরকার এবং সমাধি পরায়ণ হতে হলে শীলবান হতে হবে। তাই শীল-সমাধি প্রজ্ঞাই হল পরম শান্তি নির্বাণের সোপান স্বরুপ। শীল হচ্ছে প্রথম সোপান। তাইতো ভিক্ষুগণ বলেছেন "শীলবানেরা শীল পালনের দ্বারা স্বর্গে গমন করে, ভোগ সম্পত্তি লাভ করে এবং শীলের দ্বারা নির্বাণ লাভ করে। সে কারণে শীলাচার বিশুদ্ধ করা উচিত।[৩]

পঞ্চশীল

পঞ্চশীল গ্রহণের জন্য বিহারে গিয়ে ভিক্ষুর কাছে সূত্রের মাধ্যমে প্রার্থনা জানাতে হয়। হাঁটু ভেঙ্গে বসে দুই হাত জোড় করে প্রার্থনা করতে হয়। প্রার্থনা এরুপ-

ওকাস অহং ভন্তে , ত্রিশরণেন সহ পঞ্চসীলং

ধম্মং যাচামি, অনুগ্গহং কত্বা সীলং দেথ মে ভন্তে।

দুতিযম্পি...ততিযম্পি অহং ভন্তে, তিসরণেন সহ পঞ্চসীলং ধম্মং যাচামি, অনুগ্গহং কত্বা সীলং দেথ মে ভন্তে।[৪]

অনুবাদঃ ভন্তে অবকাশ দিন। আমি ত্রিশরণসহ পঞ্চশীল প্রার্থনা করছি। ভন্তে, অনুগ্রহ করে আমাকে শীল প্রদান করুন।[৫]

দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বারও ভন্তে, আমি ত্রিশরণসহ পঞ্চশীল প্রার্থনা করছি। ভন্তে, অনুগ্রহ করে আমাকে শীল প্রদান করুন।

ভিক্ষু– যমহং বদামি তং বদেথ। অর্থ ঃ আমি যা বলছি তা বলুন।

---

[১] শীল- বি. স্বভাব; চরিত্র; আদব কায়দা, (শীল যে যাহার অঙ্গ–ভূষণ অঙ্গদ যার বসে) বংশ-মর্যাদা; সম্ভ্রম; সৎস্বভাব। শিবপ্রসন্ন লাহিড়ী, ব্যবহারিক বাংলা অভিধান, প্রাগুক্ত,পৃ. ১০৮৩

[২] জীবনানন্দ বড়ুয়া, *বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা*, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা: ১৯৯৬, পৃ. ১৫; উদ্ধৃত, মোঃ গোলাম কিবরিয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৭

[৩] সুদর্শন বড়ুয়া, ত্রিপিটকপরিচিতি, লেখক কর্তৃক প্রকাশিত, উত্তরপাদুয়া, রাঙ্গুনীয়া, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ: ২০০৭, পৃ. ১৫৬; উদ্ধৃত, মোঃ গোলাম কিবরিয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৭

[৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৬

[৫] বিপ্রদাশ বড়ুয়া, *বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা*, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা: ১৯৯৬, পৃ. ১৫; উদ্ধৃত, মোঃ গোলাম কিবরিয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৭

শীল প্রার্থনাকারী – আম ভন্তে । অর্থ ঃ হ্যাঁ প্রভু বলছি।

এ সম্মতি প্রদানের পর ভিক্ষু প্রথমে ত্রিশরণ দেবেন। যা নিম্নরূপ-

বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি অর্থ বুদ্ধের শরণ গ্রহণ করছি

ধম্মং সরণং গচ্ছামি অর্থ ধর্মের শরণ গ্রহণ করছি

সঙ্ঘং সরণং গচ্ছামি অর্থ সঙ্ঘের শরণ গ্রহণ করছি

দুতিযম্পি ধম্মং সরণং গচ্ছামি অর্থ দ্বিতীয়বারও বুদ্ধের শরণ গ্রহণ করছি

দুতিযম্পি ধম্মং সরণং গচ্ছামি অর্থ দ্বিতীয়বারও ধর্মের শরণ গ্রহণ করছি

দুতিযম্পি সঙ্ঘং সরণং গচ্ছামি অর্থ দ্বিতীয়বারও সঙ্ঘের শরণ গ্রহণ করছি

ততিযম্পি ধম্মং সরণং গচ্ছামি অর্থ তৃতীয়বারও বুদ্ধের শরণ গ্রহণ করছি

ততিযম্পি ধম্মং সরণং গচ্ছামি অর্থ তৃতীয়বারও ধর্মের শরণ গ্রহণ করছি

ততিযম্পি সঙ্ঘং সরণং গচ্ছামি অর্থ তৃতীয়বারও সঙ্ঘের শরণ গ্রহণ করছি

ভিক্ষু সরণাগমনং সম্পূর্ণং অর্থ ভিক্ষু শরণ গ্রহণ সম্পূর্ণ হল শীল

প্রার্থনাকারী– আম ভন্তে শীল অর্থ প্রার্থনাকারী হ্যাঁ ভন্তে।[১] এরপর ভিক্ষু পঞ্চশীল দেবেন।

পঞ্চশীল

০১. প্রাণিহত্যা থেকে বিরত থাকব– এই শিক্ষা গ্রহণ করছি।

০২. অদত্ত বস্তু গ্রহণ থেকে বিরত থাকব– এই শিক্ষা গ্রহণ করছি।

০৩. ব্যভিচার থেকে বিরত থাকব – এই শিক্ষা গ্রহণ করছি।

০৪. মিথ্যা বাক্য বলা থেকে বিরত থাকব – এই শিক্ষা গ্রহণ করছি।

০৫. সুরাজাতীয় মাদক দ্রব্য সেবন থেকে বিরত থাকব- এই শিক্ষা গ্রহণ করছি।[২]

বৌদ্ধ ধর্মের মূলনীতি

এ কথা অনস্বীকার্য যে, প্রত্যেকটা ধর্ম বা বিশ্বাসে কতকগুলো Vain principle মূলনীতি থাকে। তদ্রুপ বৌদ্ধ ধর্মের কিছু গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি রয়েছে যার উপর উক্ত ধর্ম প্রতিষ্ঠিত। যেগুলো নিম্নে বর্ণনা করা হলো।

চতুরার্য সত্য

দুঃখ

---

[১] *প্রাগুক্ত*

[২] সুদর্শন বড়ুয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৬

দুঃখ সমুদয় দুঃখের কারণ

দুঃখ নিরোধ দুঃখ নিরোধের সত্য

দুঃখ নিরোধ মার্গ দুঃখ নিরোধের পথ।

ত্রিশের মন্ত্র

একথা স্বতঃসিদ্ধ যে, বৌদ্ধ দর্শনে আর্য সত্য এবং অষ্টাঙ্গিকমার্গ অষ্টাবিধ উপায় অবলম্বনের পরে বিশায়ন মন্ত্র গ্রহণ করতে হয় । এ মন্ত্রের তাৎপর্য,

১. বুদ্ধ শরণং গচ্ছামি ।

২. 'আমি বুদ্ধের শরণ নিলাম'। বোধিলাভ জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য, বুদ্ধের শাসন পূর্ণসত্য, পবিত্রতা, চরম আধ্যাত্মিক ভয়ান।

৩. ধম্মং শরণং গচ্ছামি। আমি ধর্মের শরণ নিলাম। সে সাধনা অভ্যাসদ্বারা সত্য লাভ হয়, আধ্যাত্মিকতার পূর্ণ বিকাশ হয়, তাই।

৪. সম্মং শরণং গচ্ছামি-আমি শরণ নিলাম সংঘের, যেখানে পূর্ণজ্ঞান লাভের জন্য ধর্মের সাধনা সম্যকভাবেই তাই সংঘ।

দুঃখ

বুদ্ধ দূঃখ কি, দুঃখের কারণ, দুঃখ দূর করার উপায় সম্পর্কে উপদেশ দিয়েছেন। তার মতে জীবন দুঃখপূর্ণ । দুঃখের হাত থেকে কারোর নিস্তার নেই। জন্ম জরা রোগ, মৃত্যু সবই দুঃখজনক। মানুষের কামনা বাসনা সবই দুঃখের মূল। মাঝে মাঝে যে সুখ আসে তাও দুঃখ মিশ্রিত এবং অস্থায়ী। অবিমিশ্র সুখ বলে কিছু নেই। নির্বাণ লাভে এই দুঃখের অবসান ঘটে। এতেই পূর্ণশান্তি অর্জিত হয়।

উল্লেখ্য যে, বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারীদের মাঝে একাধিক মতবাদ প্রচলিত আছে। তারা পরকাল, স্বর্গ-নরক, দুঃখ-দুর্দশা মন্ত্র ইত্যকার বিষয়ে বিভিন্ন মতবাদ বিশ্বাস করে। বুদ্ধের দর্শনের প্রধান কারণ হচ্ছে দুঃখের কারণ ও নিরসনের উপায়। বাসনা হলো সকল দুঃখের মূল।

বৌদ্ধ ধর্মের মতে সর্বপ্রকার বন্ধন থেকে মুক্তি হচ্ছে প্রধান লক্ষ্য। এটাকে নির্বাণ বলা হয়ে থাকে। মনসনির্বাণ শব্দের আক্ষরিক অর্থ নিভে যাওয়া, বিলুপ্তি, বিনয়, অবসান, কিন্তু বৌদ্ধ মতে নির্বাণ হলো সকল প্রকার দুঃখ হতে মুক্তি লাভ। এ সম্পর্কে বুদ্ধদেব চাতুরার্য ও অষ্টাঙ্গিক মার্গ উপায়ের মাধ্যমে মধ্যপন্থা অবলম্বনের উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন।

বৌদ্ধ ধর্ম বা গৌতম বুদ্ধের মৌলিক শিক্ষা

গৌতম বুদ্ধের প্রচারিত ধর্মের মধ্যে যে বিষয়গুলোর উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলো নিম্নে তুলে ধরা হলো :

১. মানব জীবনে ব্যথা বেদনা থেকে মুক্ত হওয়ার উপায় নির্দেশ দান যা অর্জনে মানুষ নির্বাণ লাভে সমর্থ হয়। এজন্যই বলা হয়, The first four nobels truth is the heart of the Buddhis teaching and it is the path leading to the realization of Nibbana.

২. মানুষের মৃত্যুকালে তার কর্মফলও ত্রিভূবনে অবস্থিত থাকে এবং সুযোগ-সুবিধা পেলে একজন পুরুষ ও নারীর আশ্রয়ে এ জগতে জন্মগ্রহণ করে।

৩. জন্মের প্রবাহ অনন্তকাল ধরে অব্যাহত থাকে। কাজেই মানুষের পক্ষে জন্মান্তরের এ শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হতে হলে অনুশীলনের দরকার ।

৪. অনুশীলনের মাধ্যমে মানুষের পক্ষে নির্বাণ লাভ সম্ভব হয়। অনেকে গৌতম বুদ্ধের এই শিক্ষাকে দুঃখবাদ আলে আখ্যায়িত করেন।

৬. জীবিত কালে এ অবস্থা হলে তাকে বলা হয় নির্বাণ। এবং মৃত্যুর সময়ে এ অবস্থা হলে তাকে বলা হয় মহাপরিনির্বাণ।

৬. এ নির্বাণ লাভের পূর্বে মানুষকে কতকগুলো বিষয় সম্বন্ধে অবহিত হতে হবে, তার মধ্যে প্রথম ৪টি বিষয় সম্বন্ধে তিনি যে বক্তব্য রেখেছেন তাকে বলা হয় আর্যসত্য।

৭. তার মতবাদ অনুসারে মানুষের জীবনে দুঃখ আছে, দুঃখের পরিসমাপ্তি আছে।

৮. মানুষকে দুঃখ জয় করার জন্য ও সত্যনিষ্ঠ নির্বাণ লাভ করার জন্য আটটি অমোঘ নির্দেশ পালন করতে হয়। যাকে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ বলে । যেমন-

১. সম্যক বাক্য

২. সম্যক কর্মাণ্ড

৩. সম্যক জীবন

৪. সম্যক স্মৃতি

৫. সম্যক সমাধি

৬. সম্যক দৃষ্টি

৭. সম্যক সংকল্প

৮. সম্যক চেষ্টা ।

গৌতম বুদ্ধের শিক্ষার মূল শিক্ষা ছিল-অহিংস, সম্প্রীতি, সহিষ্ণুতা ও ভালোবাসা।

বৌদ্ধ দর্শনের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যসমূহ

দর্শন প্রত্যেক ধর্মের একটি পাঞ্জেরি স্বরূপ। গৌতম বুদ্ধের বাণী ও উপদেশের উপর ভিত্তি করে জগৎ ও জীবন সম্পর্কে যে মতবাদ গড়ে উঠেছে সেটাই হলো বৌদ্ধ দর্শনের মূল চেতনা । মানব জাতির আধ্যাত্মিক চেতনার ইতিহাসে বুদ্ধদেব ছিলেন এক সমুন্নত চরিত্রের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

বৌদ্ধ দর্শনের বৈশিষ্ট্যসমূহ

বুদ্ধ দেবের বৌদ্ধ দর্শনে যে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলো দৃশ্যত ফুটে উঠেছিল তা বিশদভাবে নিম্নে আলোচনা করা হলো-

১. বৌদ্ধ দর্শন প্রকৃতিবাদী

বৌদ্ধ দর্শন মূলত প্রকৃতিবাদী, যেহেতু এ দর্শনের মূলমন্ত্র হলো এই দর্শন অনুসারে যা প্রত্যক্ষের বিষয় তাই সত্য। বৌদ্ধ দর্শন কোনো অতীন্দ্রিয় জগতে বিশ্বাস করে না।

২. বৌদ্ধ দর্শন দুঃখবাদী

বৌদ্ধ দর্শনে সংসার দুঃখময়। জন্ম দুঃখ, রোগদুঃখ, মরণদুঃখ, উদ্বেগ, আকাঙ্ক্ষা, দুঃখ, অপ্রিয় সংযোগ দুঃখ, প্রিয় বিচ্ছেদ দুঃখ, যা ইচ্ছা করে লাভ করা যায় না তাই দুঃখ। সংক্ষেপে বলা যায় যা আসক্তি প্রসূত তাই দুঃখময়। মৃত্যু অবধারিত, সকল বস্তুই ক্ষণস্থায়ী। তাই সংক্ষেপে বলা যায় এই সংসারে নিরবচ্ছিন্ন দুঃখ কোথাও নেই, কোথাও আনন্দ নেই।

৩. বুদ্ধদর্শন বুদ্ধদেবের চারটি আর্য সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত

দুঃখ এবং দুঃখ নিরোধে বুদ্ধদেব চারটি সত্যের কথা বলেছেন যা “চারটি আর্যসত্য” নামে পরিচিত। যথা :

১. দুঃখ বা জীবন দুঃখময়, ২. দুঃখের কারণ আছে ৩. দুঃখের নিবৃত্তি আছে ৪. দুঃখ নিরোধের উপায় আছে।

৪. অবিদ্যাই দুঃখের কারণ

বৌদ্ধ দর্শন মতে, দুঃখ হলো কার্য এবং এই কার্যের কারণ হলো অবিদ্যা । কারণ থেকে কার্যের দিকে অগ্রসর হলে কার্যকারণ সম্পর্কের পূর্ণ চিত্রটি প্রত্যক্ষ করা যায়। একারণে বৌদ্ধ ধর্মে ১২টি কারণকে দ্বাদশ নিদান বা ভবচক্র বলা হয়। ভবচক্র ছাড়াও একে মংসাকার চক্র, জন্ম মালন চক্র, ধর্ম চক্র, প্রতীত্য সমুৎপাদ চক্র বলা হয়ে থাকে। যেমন-

১. অবিদ্যা যা সত্যের জ্ঞানের জন্য

২. সংস্কারের উদ্ভব

৩. চৈতন্য বা বিজ্ঞানের সৃষ্টি করে যা থেকে

৪. নামরুপ

৫. ষড়ায়তন বা ছয়টি ইন্দ্রিয়ের উদ্ভব

৬. স্পর্শ বা সংযোগের কারণ

৭. বেদনী তার থেকে উদ্ভূত হয়

৮. তৃষ্ণা বা ভোগের কামনা যার থেকে উদ্ভব হয়

৯. উপাদান বা বিষয়ের প্রতি আসক্তি

১০. ভব বা পুনর্বার জন্ম গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করে

১১. এই ভব থেকে জাতি পুনর্জন্ম

১২. জন্মের ফলেই মানুষকে জরামরণের অধীনতা স্বীকার করে দুঃখ কষ্ট ভোগ করতে হয় ।

৫. অভিজ্ঞতাবাদী : বৌদ্ধ দর্শন অভিজ্ঞতাবাদী, যেহেতু বুদ্ধদেব অভিজ্ঞতাকেই জ্ঞানের উৎস বলে মনে করতেন।

৬. অবভাসবাদী

বৌদ্ধ দর্শনে অবভাসবাদী, যেহেতু এই দর্শনে জগতের পরিদৃশ্যমান ইন্দ্রিয়, গ্রাহ্য রুপকেই কেবল যথাযথভাবে জানা যায়।

৭. মানবতাবাদী

বৌদ্ধ দর্শনের আলোচনার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হলো মানুষ। বুদ্ধদেব মানব ধর্মের কথাই বলেছেন। এটা মূলত মানব ধর্ম। মনীষী বুদ্ধদেবের বাণী হচ্ছে মোহই বন্ধন, যুক্তিতেই মুক্তি।

৮. সকাম ও নিষ্কামকর্ম

বৌদ্ধ ধর্ম মতে কর্ম দই প্রকার : সকাম কর্ম ও নিষ্কাম কর্ম। সকাম কর্মই বন্ধন সৃষ্টি করে যার ফলে জীবের পনুর্জন্ম ঘটে পক্ষান্তরে নিষ্কাম কর্ম জগত ও জীবের প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কে অবহিত হয়ে যখন কম করা হয় তখন বিষয়ানুরাগের কোনো সম্ভাবনা থাকে না। ফলে পুনর্জন্মের কোনো সম্ভাবনা থাকে না।

৯. অষ্টাঙ্গিক মার্গ

বৌদ্ধ দর্শনে যে চারটি আর্য সত্য বিদ্যমান আছে তার মধ্যে চতুর্থটি হলো দুঃখ নিরোধের পথ। এই পথকে অষ্টাঙ্গিক মার্গ নামে অভিহিত করা হয়। যথা : ১. সম্যক দৃষ্টি, ২. সম্যক সংকল্প, ৩. সম্যক বাক্য, ৪. সম্যক কর্মান্ত, ৫. সম্যক ব্যায়াম, ৬. সম্যক আজীব, ৭. সম্যক স্মৃতি, ৮. সম্যক সমাধি।

১০. মধ্যপাঠ

বৌদ্ধ দর্শনে অষ্টাঙ্গিক মার্গের মাধ্যমে দুঃখ নিরোধ বা দূরীকরণ করাকে বলা হয় মধ্যপথ। কারণ পন্থাটি একাধারে অসংযুক্ত ভোগবিলাস ও অপরদিকে অনাবশ্যক শারীরিক কৃচ্ছতাসাধন এই দুই চরম পথের মধ্যম পথ।

১১. নির্বাণ

এই দর্শনে, দুঃখ থেকে মুক্তি পাওয়াকে বলা হয় নির্বাণ। নির্বাণের অর্থ হলো এক শাশ্বত আনন্দের ও পরম সুখের অবস্থা। নির্বাণ শুধু পরম আনন্দ নয় পরম শান্তিও বটে।

১২. দার্শনিক তত্ত্ব

বুদ্ধদেবের নৈতিক শিক্ষার মূলে ছিল চারটি দার্শনিক তত্ত্ব। যেমন-

১. প্রতীত্য সমুবাদ
২. কর্মবাদ
৩. সর্বব্যাপক পরিবর্তনবাদ ও অনিত্যবাদ
৪. অনাত্মবাদ।

১৩. নিরীশ্বরবাদ

এ দর্শনে ঈশ্বরের কোনো স্থান নেই। বৌদ্ধগণ ঈশ্বরবাদে বিশ্বাসী নন। তাদের মতে কার্যেরই কারণ আছে কিন্তু পরিণতির কারণ বলে কিছু নেই। সুতরাং পরিণতির কারণরূপে ঈশ্বরের অস্তিত্বের স্বীকার করার কোনো প্রয়োজন নেই। তাদের বিশ্বাস ঈশ্বরের অস্তিত্বের ধারণা মানুষকে নিষ্ক্রিয় ও দায়িত্বহীন করে তোলে।[১]

১৪. নীতিদর্শন

মানুষের নৈতিক অগ্রগতি সাধন করে জীবনকে দুঃখমুক্ত করাই ছিল বুদ্ধের নৈতিক উপদেশ ও শিক্ষার প্রধান লক্ষ। তার নৈতিক শিক্ষার সর্বোচ্চ দার্শনিক চিন্তা-ভাবনার বীজ সুপ্ত ছিল।

১৫. প্রয়োজনবাদী

প্রয়োজনবাদ অনুসারে সেই ধারনা চিন্তা-চেতনায় যুক্তিভাবনা সত্য যা আমাদের জীবনে প্রয়োজন মিটায়। বুদ্ধ মানুষের দুঃখবিমুখ করার ব্রতে আজীবন নৈতিক ও ধর্মীয় উপদেশ প্রচার করেন। তিনি মানুষের জীবনের বিভিন্ন দিকের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখেন। তিনি শান্তি মৈত্রী ও কল্যাণের বাণী প্রচার করেন।

১৬ অনাত্মবাদ/নিত্যবাদ

বৌদ্ধ ধর্ম অনিত্যবাদে বিশ্বাসী, এককথায় পৃথিবীর সবই পরিবর্তনশীল, ধ্বংসশীল ও অনিত্য। তিনি শাশ্বত স্থায়ী আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। আত্মা হলো চৈতন্যের অবিরাম প্রবাহ। নানা প্রকার শোক, দুঃখের চিন্তা, ইচ্ছা অনুভূতির মানসিক প্রবাহই আত্মা।

---

[১] ড. মোঃ ইব্রাহীম খলিল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩২

১৭ .জন্মান্তরবাদ

বৌদ্ধ দর্শন জন্মান্তরবাদে বিশ্বাস করে এই অর্থে যে, জন্মান্তর কোনো চিরন্তন আত্মার নতুন দেহ পরিগ্রহ করে না। জন্মান্তর অর্থ বর্তমান জীবন থেকে পরবর্তী জীবনের উদ্ভব ।

১৮. কর্মবাদ

এ দর্শন কর্মবাদ বিশ্বাসী। যেমন : As you sow, so you reap এই কর্মবিধি অলঙঘনীয়। বুদ্ধ এর কর্মবাদ এর কার্যকারণবাদ থেকে নিঃসৃত। তার মতে, কম ও তার ফলের মধ্যে কার্যকারণ সম্বন্ধ আছে। মানষ যেমন কর্ম করবে অবশ্যই তেমন ফল ভোগ করবে। প্রত্যেক জীবকে নিজ কর্মের ফল ভোগ করতে হবে।[১]

১৯. দুঃখবাদী হয়েও আশাবাদী

বৌদ্ধ দর্শন মুলতঃ দুঃখবাদী হলেও পরিণামে বৌদ্ধ আশাবাদ ব্যক্ত করে। কারণ তিনি শুধু দুঃখের ছবি একেই ক্ষান্ত হননি। তিনি তার আর্যসত্য চতুষ্ঠয় ও অষ্টমার্গে দঃখে কষ্টের হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভের দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন। কাজেই বেদ্ধি দর্শন ভূমিকায় দুঃখবাদী হলেও পরিণামে আশাবাদই ব্যক্ত করে।

বৌদ্ধ ধর্ম মূলতঃ গৌতম বুদ্ধের দর্শন ও শিক্ষার সমষ্টি। এ ধর্মে প্রধানতঃ মানুষের পার্থিব জীবনের সুখ-শান্তির জন্য দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। এ ধর্মে মানবতা, যুক্তি, ইত্যাদিকে প্রাধান্য প্রদান করা হয়েছে, যা এ ধর্মের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। এছাড়াও পার্থিব জীবনে কীভাবে দুঃখ থেকে মুক্তি পাওয়া যায় সে সম্পর্কেও ধারনা প্রদান করা হয়েছে।

[১] ড. মোঃ ইব্রাহীম খলিল, *প্রাগুক্ত*

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : বৌদ্ধ ধর্মের শাস্তি আইন

বৌদ্ধে ধর্মে কোনো অপরাধের ব্যাপারেই সুস্পষ্ট কোনো শাস্তির বিধান রাখা হয়নি। বরং যাবতীয় অপরাধ ও অপকর্ম থেকে বেঁচে থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ অধ্যায়ে হুদুদভুক্ত অপরাধসমূহের বিষয়ে বৌদ্ধ ধর্মের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরা হবে, যা এসব অপরাধ সম্পর্কে অবস্থান স্পষ্ট করবে। এ ক্ষেত্রে গৌতম বুদ্ধের উপদেশ এবং প্রয়োজনে সে সম্পর্কে বৌদ্ধ ধর্ম বিষয়ক পণ্ডিতগণের মতামত তুলে ধরা হবে।

বৌদ্ধ ধর্মের অনেক বিধি-বিধান, আইন-কানূন, নিয়ম-পদ্ধতি, দুঃখ নিরোধগামী পথ ইত্যাদি বিষয় আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গে তুলে ধরা হয়েছে। এই মার্গের ব্যাখ্যায় আট প্রকার নিয়মাবলি বা কার্যপদ্ধতির কথা বলা হয়েছে। বুদ্ধ এটাকে মধ্যপন্থা হিসেবে অভিহিত করেছেন। এই মধ্যপন্থার মাধ্যমে মুক্তিলাভের উপায় নির্দেশ করা হয়েছে। আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের মধ্যেই বুদ্ধের নীতিতত্ত্বকে প্রকাশ করা হয়েছে। এই মার্গ অনুযায়ী জীবনযাপন করতে পারলেই মানুষ ইহজীবনে দুঃখ থেকে মুক্তি লাভ করতে পারে।[১] অষ্টাঙ্গিক মার্গকে বিশেষ তিনভাগে বিভাজন করে দেখানো যায়। যেমন :

ক. প্রজ্ঞা

১. সম্যক দৃষ্টি

২. সম্যক সংকল্প

খ. শীল

সু-কর্মে নিয়োজিত থাকার নীতি অনুশীলনকেই শীল নামে অভিহিত করা হয়। সহজ বাংলা অভিধান এ বলা হয়েছেঃ শীল হলো বৌদ্ধদের অবশ্যপালনীয় নীতি।[২]

১. সম্যক বাক্য

২. সম্যক কর্ম

৩. সম্যক জীবিকা

গ. সমাধি

১. সম্যক ব্যায়াম বা প্রচেষ্টা

২. সম্যক স্মৃতি

৩. সম্যক সমাধি

---

[১] সুদর্শন বড়ুয়া, *ত্রিপিটক পরিচিতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৮

[২] মোহাম্মদ হারুন-উর-রশিদ সম্পাদিত, সহজ বাংলা অভিধান, বাংলা একাডেমি, পৃ. ৩৭৯

অষ্টাঙ্গিক মার্গের মধ্যে শীলের আলোচনা আমাদের জন্য অত্যন্ত জরুরি। কারণ শীলের মধ্যেই মদপান, ব্যভিচার, চুরি ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

শীল

'শীল' হলো সৎ আচরণ যা নৈতিক উৎকর্ষের ভিত্তি। বুদ্ধ শৃঙ্খলাপূর্ণ সৎ ও নৈতিক জীবনযাপনের জন্য কিছু পালনীয় নীতিমালা প্রবর্তন করেছিলেন যা শীল নামে পরিচিত। শীল[১] শব্দের অর্থ চরিত্র বা স্বভাব। এছাড়া শীলের আরও অর্থ আছে। সেগুলো হল – আশ্রয়, সংযম, শৃঙ্খলা, প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি। যারা শীল পালন করে তাঁদেরকে বলা হয় শীলবান। শীল পালনের দ্বারা দেহ ও মনকে সংযত করা যায়। মানুষ সুন্দর সুন্দর অলংকার পরে। যেমন- সোনা, রুপা, মনি, মুক্তা ইত্যাদি। এসব অলংকার পরলে মানুষের দেহের সৌন্দর্য বাড়ে। এসবের চেয়ে বড় অলংকার হল শীল। অলংকারের দ্বারা দেহের সৌন্দর্য বাড়ে আর শীল পালনের দ্বারা মানুষের মনের সৌন্দর্য বাড়ে, মানুষ চরিত্রবান হয়।[২]

মদ্যপান

বৌদ্ধ ধর্মে মাদক গ্রহণ বৈধ নয়। দশশীলের মধ্যে সে প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হয়েছে।

দশশীল

বুদ্ধের নির্দেশিত শ্রামণ বা প্রব্রজিতদের প্রত্যহ প্রতিপাল্য দশটি নিয়ম বা নীতিকে দশশীল বলা হয়। গৃহীরা সংসার ত্যাগ করে প্রব্রজিত হওয়ার সময় দশশীলে দীক্ষা নেন। কমপক্ষে সাত বছর বয়সের বালক মাতা-পিতার অনুমতি নিয়ে কোনো ভিক্ষুর নিকট প্রব্রজিত হন। বৌদ্ধধর্মীয় শিক্ষায় যথেষ্ট জ্ঞান অর্জনের পর বিশ বছরের পর ভিক্ষু বা উপসম্পদা লাভ করেন। ভিক্ষু হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তাঁরা শ্রমণ নামে পরিচিত হন। ভিক্ষু বা উপসম্পদা লাভ লাভের পূর্ব পর্যন্ত তাঁরা দশশীল নিয়মিত পালন করেন। দশশীল গ্রহণের জন্য শ্রামণকে ভিক্ষুর কাছে প্রার্থনা করতে হয়। দশশীল প্রার্থনার জন্য শ্রমণকে ভিক্ষুর সামনে সুন্দরভাবে উপবেশন করে দুহাত জোড় করে সংক্ষেপে ত্রিরত্ন বন্দনা, ভিক্ষু বন্দনা করার পর দশশীল প্রার্থনা করতে হয়। অতঃপর ভিক্ষু শ্রমণকে দশশীল প্রদান করেন। দশশীল প্রার্থনাও পালি ভাষায় করতে হয়।[৩]

দশশীল প্রার্থনা

ওকাস, অহং ভন্তে, তিসরণেন সদ্ধিং পব্বজ্জাদসসীলং ধম্মং যাচামি অনুগ্গহং কত্বা সীলং দেথ মে ভন্তে। দুতিযম্পি অহং ভন্তে, তিসরণেন সদ্ধিং পব্বজ্জাদসসীলং ধম্মং যাচামি অনুগ্গহং কত্বা সীলং দেথ মে ভন্তে। ততিযম্পি অহং ভন্তে, তিসরণেন সদ্ধিং পব্বজ্জাদসসীলং ধম্মং যাচামি অনুগ্গহং কত্বা সীলং দেথ মে ভন্তে।

---

[১] শীল- বি. স্বভাব; চরিত্র; আদব কায়দা, (শীল যে যাহার অঙ্গ–ভূষণ অঙ্গদ যার বসে) বংশ-মর্যাদা; সম্ভ্রম; সৎস্বভাব। শিবপ্রসন্ন লাহিড়ী, ব্যবহারিক বাংলা অভিধান, প্রাগুক্ত,পৃ.১০৮৩

[২] জীবনানন্দ বড়ুয়া, বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা: ১৯৯৬, পৃ. ১৫

[3] *পেশাগত শিক্ষা (তৃতীয় খণ্ড)* : তথ্যপুস্তক, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী (নেপ), ময়মনসিংহ : ডিসেম্বর ২০১৯, পৃ. ১২৭

বাংলা অনুবাদ

ভন্তে, অবকাশ প্রদান করুন। আমি ত্রিশরণসহ প্রব্রজ্যা দশশীল ধর্ম যাচনা করছি। ভন্তে, অনুগ্রহ করে আমাকে শীল প্রদান করুন। দ্বিতীয়বার, আমি ত্রিশরণসহ প্রব্রজ্যা দশশীল ধর্ম যাচনা করছি। ভন্তে, অনুগ্রহ করে আমাকে শীল প্রদান করুন। তৃতীয়বার, আমি ত্রিশরণসহ প্রব্রজ্যা দশশীল ধর্ম যাচনা করছি। ভন্তে, অনুগ্রহ করে আমাকে শীল প্রদান করুন।

দশশীল

১. পাণাতিপাতা বেরমণী সিক্‌খাপদং সমাদিযামি।

২. আদিন্নাদানা বেরমণী সিক্‌খাপদং সমাদিযামি।

৩. অব্রহ্মচরিয়া বেরমণী সিক্‌খাপদং সমাদিযামি।

৪. মুসাবাদা বেরমণী সিক্‌খাপদং সমাদিযামি।

৫. সুরামেরয-মজ্জ-পমাদট্‌ঠানা বেরমণী সিক্‌খাপদং সমাদিযামি।

৬. বিকাল ভোজন বেরমণী সিক্‌খাপদং সমাদিযামি।

৭. নচ্চ-গীত-বাদিত বিসুকদসসনা বেরমণী সিক্‌খাপদং সমাদিযামি।

৮. মালাগন্ধ বিলেপন ধারণ মণ্ডন বিভূসনট্‌ঠনা বেরমণী সিক্‌খাপদং সমাদিযামি।

৯. উচ্চসযনা মহাসযনা বেরমণী সিক্‌খাপদং সমাদিযামি।

১০. জাতরূপ- রজত পটিগগহনা বেরমণী সিক্‌খাপদং সমাদিযামি।

বাংলা অনুবাদ

১. প্রাণিহত্যা হতে বিরত থাকার শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।

২. অদত্ত বস্তু (চৌর্যবৃত্তিমূলক) গ্রহণ হতে বিরত থাকার শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।

৩. অব্রহ্মচর্য হতে বিরত থাকার শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।

৪. মিথ্যাবাক্য বলা হতে বিরত থাকার শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।

৫. সুরা-মাদক জাতীয় দ্রব্য সেবন হতে বিরত থাকার শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।

৬. বিকাল ভোজন হতে বিরত থাকার শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।

৭. নৃত্য গীত বাদ্য প্রভৃতি প্রমত্ত চিত্তে দর্শন হতে বিরত থাকার শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।

৮. মালাগন্ধ বিলেপন ধারণ-মনন ও বিভূষিত হওয়া থেকে বিরত থাকার শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।

৯. উচ্চশয্যা, মহাশয্যা হতে বিরত থাকার শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।

১০.সোনা - রূপা ইত্যাদি (অর্থাৎ যেই দেশে যেই প্রকারের টাকা-পয়সা নোট প্রভৃতি প্রচলিত আছে তা) গ্রহণ হতে বিরত থাকার শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।

মাদক সংশ্লিষ্ট ব্যবসা বাণিজ্যে জড়িত হওয়াও বৌদ্ধ ধর্মে নিষিদ্ধ। সম্যক জীবিকার মধ্যে এ প্রসঙ্গ উঠে এসেছে।

সম্যক জীবিকা:

সৎ, সুন্দর ও শুদ্ধ পবিত্র জীবনকে বলা হয় সম্যক জীবিকা। অন্যভাবে বলা যায়, যে জীবিকা অবলম্বন করলে নিজের এবং অন্যের কোনোরূপ ক্ষতি না হয় তা-ই সম্যক জীবিকা। এখন চিন্তা করতে হয় যে, মানুষকে আগে বাঁচতে হবে। বাঁচতে হলে জীবিকা প্রয়োজন। কর্মবহুল জীবনে মানুষের পেশার অন্ত নেই। সৎ ও সুন্দর জীবনযাপনের জন্য পেশা বা বৃত্তি শুদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। শুধু অর্থাগমে কিংবা সম্মান লাভে পেশা শুদ্ধ হয় না। যে পেশায় অপরকে প্রবঞ্চনা করতে হয় ; পীড়া দিতে হয় ; অপরের প্রাণবধ করতে হয়; সে পেশা শুদ্ধ হয় না। তাই বুদ্ধ পাঁচরকমের ব্যবসাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন।[১] এগুলো হলো :

ক. অস্ত্র ব্যবসা

খ. প্রাণি ব্যবসা

গ. মাংস ব্যবসা

ঘ. মাদক ও মাদকজাতীয় ব্যবসা এবং

ঙ. বিষ ব্যবসা।

ব্যভিচার

ব্যভিচার একটি ভয়াবহ যৌন অপরাধ। বৌদ্ধ ধর্ম তার অনুসারীদের ব্যভিচারে লিপ্ত না হওয়ার অঙ্গীকারে অঙ্গীকারাবদ্ধ করে।[২] বৌদ্ধ ধর্ম মনে করে, বিয়ের বাইরে যৌন সম্পর্কে লিপ্ত হওয়া, অন্য পুরুষের স্ত্রীর সাথে, যে মেয়ে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ, বা তার আত্মীয় (পিতা বা ভাই) দ্বারা সুরক্ষিত কোনও মেয়ে, বা পতিতাদের সাথে বিবাহ বহির্ভূত যৌনতা, পরিণামে অন্য মানুষের জন্য কষ্ট দেয় এবং নিজেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়।[৩]

বৌদ্ধ ধর্মের ‘সম্যক কর্মে’ ব্যভিচার থেকে আত্মরক্ষার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সম্যক কর্ম হলো পুত-পবিত্র কর্ম। সৎ ও পবিত্র সকর্ম সম্পাদন করলে মানুষ নৈতিক ও মানসিক শান্তি-প্রফুল্লতা লাভ করে। সম্যক কর্মে দুষ্কর্মকে পরিত্যাগ

---

[১] *পেশাগত শিক্ষা (তৃতীয় খণ্ড)* : তথ্যপুস্তক, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী (নেপ), ময়মনসিংহ : ডিসেম্বর ২০১৯, পৃ. ১১৮

[২] Peter Harvey (2000). An Introduction to Buddhist Ethics: Foundations, Values and Issues. Cambridge University Press. pp. 71–74. ISBN 978-0-521-55640-8. Archived from the original on 21 December 2019. Retrieved 22 June2018

[৩] Peter Harvey (2000). An Introduction to Buddhist Ethics: Foundations, Values and Issues. Cambridge University Press. pp. 71–74. ISBN 978-0-521-55640-8. Archived from the original on 21 December 2019. Retrieved 22 June2018

করে সুকর্মকে স্বাগত জানানো হয়। সহজ কথায় সম্যক কর্ম বলতে লোভ, দ্বেষ, মোহ, হিংসা, চুরি, ব্যভিচার রহিত কর্মকে বোঝায়।

পঞ্চশীলেও ব্যভিচারে জড়িত না হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, কামেসু মিচ্ছাচারা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামি।[১] অর্থাৎ, অবৈধ কামাচার বা ব্যভিচার হতে বিরত থাকার শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।

অপবাদ

ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদ রটানো একটি অত্যন্ত জঘন্য অপরাধ। ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদ রটানোর মাধ্যমে অনেকগুলো অপরাধ সংঘটিত হয়। যেমন- মিথ্যা কথা বলা, ন্যায় বিচার ভূলণ্ঠিত করা, মানহানি করা ইত্যাদি। এর কারণেই সংসার জীবনে পারস্পরিক ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়। এমনকি সংসার ভেঙ্গে পর্যন্ত যায়। এসব কারণে ইসলাম অপবাদকে হুদুদ ভূক্ত করেছে। তবে অন্যান্য অধিকাংশ ধর্মেই এর বিচার, বিচার প্রক্রিয়া ইত্যাদি বিষয়ে স্পষ্ট কোনো নির্দেশনা নেই। তবে সব ধর্মেই মিথ্যা বাক্য, মিথ্যা কর্ম নিষিদ্ধ। আর অপবাদও এক প্রকার মিথ্যাই বটে। সম্যক দৃষ্টিতে একাধিক বার মিথ্যা ভাষণ, কটূ কথা, ভ্রান্ত ধারণা ইত্যাদি ত্যাগের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

সম্যক দৃষ্টি

সত্য ও অভ্রান্ত ধারণা পোষণ করাই হচ্ছে সম্যক দৃষ্টি। অন্যভাবে বলা যায় ; সম্যক দৃষ্টি কায়িক, বাচনিক এবং মানসিক কুশল-অকুশল কর্মের সঠিক জ্ঞানই হলো সম্যক দৃষ্টি। সমাজজীবন পদ্ধতিতে কুশলকর্ম এবং অকুশলকর্ম দুই-ই রয়েছে। বুদ্ধ অকুশলকর্ম সর্বতোভাবে পরিবর্জন এবং কুশলকর্মকে আগ্রহ সহকারে গ্রহণের কথা বলেছেন। কুশলকর্ম এবং অকুশলকর্মের তুলনামূলক একটি চিত্র তুলনা তুলে ধরা হলো[২]-

কায়িক পথ

কুশল কর্ম :-

১. অহিংসা
২. চুরি না করা
৩. ব্যভিচার না করা

অকুশল কর্ম :-

১. হিংসা
২. চুরি করা
৩. ব্যভিচার করা

---

[১] Panchasila : 3
[২] *পেশাগত শিক্ষা (তৃতীয় খণ্ড)* : তথ্যপুস্তক, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী (নেপ), ময়মনসিংহ : ডিসেম্বর ২০১৯, পৃ. ১১৮

বাচনিক পথ

কুশল কর্ম :-

১. মিথ্যা ভাষণ না করা
২. কর্কশ বাক্য না বলা
৩. কটুবাক্য না বলা
৪. তুচ্ছ বা নিরর্থক বাক্য আলাপ না করা

অকুশল কর্ম :-

১. মিথ্যা ভাষণ করা
২. কর্কশ বাক্য বলা
৩. কটুবাক্য বলা
৪. তুচ্ছ বা নিরর্থক বাক্য আলাপ করা

মানসিক পথ

কুশল কর্ম :-

১. পরের সম্পত্তিতে লোভ না করা
২. পরের প্রতি হিংসা মনোভাব পোষণ না করা
৩. ভ্রান্ত ধারণা থেকে বিরত থাকা

অকুশল কর্ম :-

১. পরের সম্পত্তিতে লোভ করা,
২. পরের প্রতি হিংসা মনোভাব পোষণ করা,
৩. ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করা

কুশলকর্ম সম্পর্কে বুদ্ধ বলেন: 'সকল প্রকার পাপ কাজ থেকে বিরতি কুশল কর্ম সম্পাদন করা আপন চিত্তকে বিশুদ্ধ রাখাই হলো বুদ্ধের অনুশাসন'।[১]

চুরি-ডাকাতি

সমাজে প্রচলিত অর্থনৈতিক অপরাধসমূহের মধ্যে অন্যতম হলো চুরি-ডাকাতি। অষ্টশীলের মাধ্যমে চুরি-ডাকাতি থেকে বিরত থাকার শপথ বাক্য পাঠ করানো হয়।

[১] *পেশাগত শিক্ষা (তৃতীয় খণ্ড)* : তথ্যপুস্তক, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী (নেপ), ময়মনসিংহ : ডিসেম্বর ২০১৯, পৃ. ১১৯

অষ্টশীল

বুদ্ধ গৃহীদের প্রতি অমাবস্যা, পূর্ণিমা এবং অষ্টমী তিথিতে শ্রদ্ধার সঙ্গে আটটি নিয়ম বা নীতি পালনের নির্দেশ দিয়েছেন। আটটি নিয়ম বা নীতিকে অষ্টশীল বলা হয়। সাধারণত ধর্মময় উৎকৃষ্ট জীবনযাপনের জন্যই অষ্টশীল পালন করা হয়। গৃহী বৌদ্ধরা সচরাচর পঞ্চশীলপালনে সচেষ্ট থাকেন। কিন্তু এ তিথি বা দিন সমূহে তাঁরা আরো তিনটি শীল বেশি পালন করেন। অর্থাৎ, মোট আটটি শীল পালন করেন। এ সব তিথি ছাড়াও অষ্টশীল পালন করা যায়। পঞ্চশীল পালনকারীদের সাংসারিক যাবতীয় কাজ কর্ম করতে বাধা নেই। কিন্তু অষ্টশীল পালনকারীরা তা করতে পারেন না। অষ্টশীল পালনের মাধ্যমে ব্রহ্মচর্য পালন, বিকেল ভোজন হতে বিরত, নৃত্য গীতবাদ্য, উৎসবাদি দর্শন, মাল্যধারণ সুগন্ধি দ্রব্য লেপন মতি ও বিভূষিত হওয়া থেকে তাঁদের সম্পূর্ণ বিরত থাকতে হয়। সাংসারিক চিন্তাভাবনা ত্যাগ করে সর্বদা ধর্মচিন্তা সহকারে শীল পালন করতে হয়। এ কারণে পঞ্চশীলকে গৃহীশীল আর অষ্টশীলকে উপোসথ শীল বলে। বৌদ্ধ বিহারে কিংবা ঘরে ভিক্ষুর সামনে সুন্দরভাবে উপবেশন করে দুহাত জোড় করে পবিত্র মনে সংক্ষেপে ত্রিরত্ন বন্দনা, ভিক্ষুর বন্দনা করার পর তিনবার অষ্টশীল প্রার্থনা করতে হয়। অষ্টশীল প্রার্থনাও পালি ভাষায় করতে হয়।[১]

অষ্টশীল প্রার্থনা

ওকাস, অহং ভন্তে, তিসরণেন সদ্ধিং অট্ঠঙ্গ সমান্নাগতং উপোসথ সীলং ধম্মং যাচামি অনুগ্গহং কত্বা সীলং দেথ মে ভন্তে। দুতিযম্পি অহং ভন্তে, তিসরণেন সদ্ধিং অট্ঠঙ্গ সমান্নাগতং উপোসথ সীলং ধম্মং যাচামি অনুগ্গহং কত্বা সীলং দেথ মে ভন্তে। ততিযম্পি অহং ভন্তে, তিসরণেন সদ্ধিং অট্ঠঙ্গ সমান্নাগতং উপোসথ সীলং ধম্মং যাচামি অনুগ্গহং কত্বা সীলং দেথ মে ভন্তে।

বাংলা অনুবাদ

ভন্তে, অবকাশ প্রদান করুন। আমি ত্রিশরণসহ অষ্টাঙ্গ সমন্বিত উপোসথ শীল ধর্ম যাচনা করছি। ভন্তে, অনুগ্রহ করে আমাকে শীল প্রদান করুন। দ্বিতীয়বার, আমি ত্রিশরণসহ অষ্টাঙ্গ সমন্বিত উপোসথ শীল ধর্ম যাচনা করছি। ভন্তে, অনুগ্রহ করে আমাকে শীল প্রদান করুন। তৃতীয়বার, আমি ত্রিশরণসহ অষ্টাঙ্গ সমন্বিত উপোসথ শীল ধর্ম যাচনা করছি। ভন্তে, অনুগ্রহ করে আমাকে শীল প্রদান করুন।

অষ্টশীল

১. পাণাতিপাতা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামি।

২. আদিন্নাদানা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামি।

৩. অব্রহ্মচরিযা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামি।

৪. মুসাবাদা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামি।

৫. সুরামেরয-মজ্জ-পমাদট্ঠানা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামি।

[১] *পেশাগত শিক্ষা (তৃতীয় খণ্ড)* : তথ্যপুস্তক, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী (নেপ), ময়মনসিংহ : ডিসেম্বর ২০১৯, পৃ. ১২৪-১২৫

৬. বিকাল ভোজনা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামি।

৭. নচ্চ-গীত-বাদিত বিসুকদ্সন মালা-গন্ধ-বিলেপন- ধারণ- মণ্ডন বিভূসনট্ঠানা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামি।

৮. উচ্চসযনা মহাসযনা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামি।

বাংলা অনুবাদ

১. প্রাণিহত্যা হতে বিরত থাকার শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।

২. অদত্ত বস্তু (চৌর্যবৃত্তিমূলক) গ্রহণ হতে বিরত থাকার শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।

৩. অব্রহ্মচর্য হতে বিরত থাকার শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।

৪. মিথ্যাবাক্য বলা হতে বিরত থাকার শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।

৫. সুরা-মদ জাতীয় (নেশাজাতীয়) দ্রব্য সেবন ও প্রমাদ হতে বিরত থাকার শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।

৬. বিকাল ভোজন হতে বিরত থাকার শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।

৭. নৃত্য-গীতবাদ্য প্রভৃতি প্রমত্ত চিত্তে দর্শন, মালাগন্ধ বিলেপন ধারণ-মনন ও বিভূষিত হওয়া থেকে বিরত থাকার শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।

৮. উচ্চশয্যা, মহাশয্যা হতে বিরত থাকার শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।

অষ্টশীল পালনের সুফল

অষ্টশীল বা উপোসথ শীলপালন অত্যন্ত সুফলদায়ক। এতে উপোসথকারীর চিত্তবিশুদ্ধ হয়। ধর্মীয় চেতনায় অনাবিল আনন্দে তাঁদের অন্তর পরিশুদ্ধ হয়। তারা নানাবিধ সুফল ভোগ করেন। যেমন

১. মন পরিশুদ্ধ হয় ;

২. লোভ-দ্বেষ-মোহহীন হয়;

৩. আত্মসংযম বৃদ্ধি পায় ;

৪. তারা নানারকম আপদ-বিপদ থেকে রক্ষা হন;

৫. সকলের প্রিয়ভাজন হন এবং

৬. সর্বত্রে যশঃখ্যাতি বৃদ্ধি পায়।

হত্যা

বৌদ্ধ ধর্মে সকল ধরনের প্রাণি হত্যাই নিষিদ্ধ। আহারের জন্য মাছ, পশু-পাখি ইত্যাদি শিকার করা, হত্যা করাও নিষিদ্ধ। এ ধর্মে মানব হত্যা যে নিষিদ্ধ তা প্রাণি হত্যার নিষেধাজ্ঞার মাধ্যমে সহজেই অনুধাবন করা যায়। পঞ্চশীলে রয়েছে প্রাণি হত্যা না করার শপথ।

পঞ্চশীল

পঞ্চশীল প্রতিদিন পালন করতে হয় বলেই এগুলোকে নিত্যপালনীয় শীল বলা হয়। এগুলো পালনের জন্য নির্দিষ্ট কোনো কালাকাল নেই কিংবা স্থান নেই। সব সময় সর্বত্রে পালন করা যায়। পঞ্চশীল হলো পঞ্চবিধ সদাচার পদ্ধতি,

পঞ্চ নৈতিক শিক্ষা বা উপদেশ কিংবা পাঁচ প্রকার নৈতিক আচার-আচরণ। আদর্শ ও উন্নত জীবন তথা আদর্শসমাজ প্রতিষ্ঠায় পঞ্চশীল পালন করা একান্ত কাম্য।

বৌদ্ধ বিহারে কিংবা ঘরে ভিক্ষুর সামনে সুন্দরভাবে উপবেশন করে দুহাত জোড় করে পবিত্র মনে সংক্ষেপে ত্রিরত্ন বন্দনা, ভিক্ষুবন্দনা করার পর তিনবার পঞ্চশীল প্রার্থনা করতে হয়। পঞ্চশীল প্রার্থনা পালি ভাষায় করতে হয়। বুদ্ধের ধর্মোপদেশ যে ভাষায় রক্ষিত সে ভাষাকে পালি ভাষা বলা হয়। পঞ্চশীলের মাধ্যমে প্রাণি হত্যা না করার শপথ করানো হয়ে থাকে।[১]

পঞ্চশীল প্রার্থনা

ওকাস, অহং ভন্তে, তিসরণেন সদ্ধিং পঞ্চসীলং ধম্মং যাচামি অনুগ্গহং কত্বা সীলং দেথ মে ভন্তে। দুতিযম্পি অহং ভন্তে, তিসরণেন সদ্ধিং পঞ্চসীলং ধম্মং যাচামি অনুগ্গহং কত্বা সীলং দেথ মে ভন্তে। ততিযম্পি অহং ভন্তে, তিসরণেন সদ্ধিং পঞ্চসীলং ধম্মং যাচামি অনুগ্গহং কত্বা সীলং দেথ মে ভন্তে।[২]

বাংলা অনুবাদ

ভন্তে, অবকাশ প্রদান করুন। আমি ত্রিশরণসহ পঞ্চশীল যাচনা করছি। ভন্তে, অনুগ্রহ করে আমাকে শীল প্রদান করুন। দ্বিতীয়বার, আমি ত্রিশরণসহ পঞ্চশীল যাচনা করছি। ভন্তে, অনুগ্রহ করে আমাকে শীল প্রদান করুন। তৃতীয়বার, আমি ত্রিশরণসহ পঞ্চশীল যাচনা করছি। ভন্তে, অনুগ্রহ করে আমাকে শীল প্রদান করুন।[৩]

পঞ্চশীল

১. পাণাতিপাতা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামি।

২. আদিন্নাদানা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামি।

৩. কামেসু মিচ্ছাচারা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামি।

৪. মুসাবাদা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামি।

৫. সুরামেরয-মজ্জ-পমাদট্ঠানা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামি।

বাংলা অনুবাদ

১. প্রাণিহত্যা হতে বিরত থাকার শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।

২. অদত্ত বস্তু (চৌর্যবৃত্তিমূলক) গ্রহণ হতে বিরত থাকার শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।

৩. অবৈধ কামাচার বা ব্যভিচার হতে বিরত থাকার শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।

৪. মিথ্যাবাক্য বলা হতে বিরত থাকার শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।

৫. সুরা-মদ জাতীয় (নেশাজাতীয়) দ্রব্য সেবন হতে বিরত থাকার শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।[৪]

---

[১] *পেশাগত শিক্ষা (তৃতীয় খণ্ড)* : তথ্যপুস্তক, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী (নেপ), ময়মনসিংহ : ডিসেম্বর ২০১৯, পৃ. ১২৩

[২] সুদর্শন বড়ুয়া, ত্রিপিটক পরিচিতি, প্রকাশিকা, শ্রীমতী প্রভাবতী বড়ুয়া, চট্টগ্রাম,২০০৪, পৃ. ১৫৬

[৩] বপ্রদাশ বড়ুয়া, বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা, প্রাগুক্ত, পৃ.১৫

[৪] বিপ্রদাশ বড়ুয়া, বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭, সুদর্শন বড়ুয়া, ত্রিপিটক পরিচিতি, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৬

অষ্টম অধ্যায়

বাংলাদেশে ইসলামী হুদুদ আইন প্রয়োগে সমস্যা ও সম্ভাবনা

বাংলাদেশে ইসলামী হুদুদ আইন প্রয়োগে সমস্যা ও সম্ভাবনা

বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম মুসলিম প্রধান দেশ। এ দেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা প্রায় নব্বই ভাগই মুসলমান। ১২০৪ সালে ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজী কর্তৃক বঙ্গ বিজয়ের পর দীর্ঘদিন এ দেশ মোটাদাগে ইসলামী আইন দ্বারা পরিচালিত হয়ে আসছিল। ১৭৫৭ সালে পলাশীতে ব্রিটিশদের জয়ের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রীয় পর্যায় ইসলামী আইনের সংকোচন শুরু হয়। বর্তমানে প্রচলিত আইনে ইসলামী আইনের প্রয়োগ ব্যক্তি বা পরিবার পর্যায়ই সীমাবদ্ধ। তবে এ দেশের মানুষের মধ্যে ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা রয়েছে। দেশী-বিদেশী একাধিক জরিপে যা প্রমাণিত হয়েছে। সিংহভাগ মানুষ মনে করে ইসলামী আইন প্রচলনের মাধ্যমে এ দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা সম্ভব। দুর্নীতিসহ অন্যান্য অপরাধও ইসলামী আইনের মাধ্যমেই নিয়ন্ত্রণ সম্ভব। জনআকাঙ্ক্ষা থাকা সত্ত্বেও এ দেশে ইসলামী আইন নানা কারণে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হচ্ছে না।

ইসলামী আইন বাস্তবায়নের পথে মৌলিক প্রতিবন্ধকতা

এ দেশে ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞগণ বেশ কিছু প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিত করেছেন। শরী'আ আইন বাস্তবায়নের পথে মৌলিক প্রতিবন্ধকতাগুলো নিম্নে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো[১] :

ক. ঔপনিবেশিক শক্তির প্রভাব

মহানবী (সা.) এর ইন্তিকালের পরও প্রায় তেরোশ বছর পৃথিবীতে বিভিন্ন নামে ইসলামী খিলাফত প্রতিষ্ঠিত ছিল। মুসলিম চার খলিফার ইন্তিকালের পর উমাইয়্যা, আব্বাসীয়, ওসমানীয় সাম্রাজ্য খিলাফতের মূলনীতির আলোকেই পরিচালিত হয়েছে। ভারতীয় উপমহাদেশে মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেবও ইসলামের খিলাফতের নীতি অনুসরণ করে রাজ্য শাসন করেন। ১৯২৩ সালে ওসমানীয় সাম্রাজ্যের পতনের পর পৃথিবীতে দৃশ্যত খিলাফত ব্যবস্থার অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যায়। তবে সৌদি আরবসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে শরী'আ আইন এখন কার্যকর রয়েছে।

ইউরোপীয় শক্তির উত্থান এবং সাম্রাজ্য বিস্তারের পূর্বে মুসলিম দেশগুলোতে ইসলামী শরী'আতই ছিল আইন ও বিচার ব্যবস্থার একমাত্র উৎস। পশ্চিমা বিশ্ব প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ক্রমেই মুসলিম দেশগুলোতে নানাভাবে তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করে। রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে মুসলিম রাষ্ট্রে মানব রচিত আইন চাপিয়ে দেওয়া হয়। পশ্চিমা বিশ্ব তাদের অর্থ বল, সামরিক শক্তি প্রয়োগ করে খুব সহজেই মুসলিম দেশগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করে। মুসলিম দেশগুলো ক্রমান্বয়ে ইসলামী খিলাফত ও শরী'আ আইনের চেতনা থেকে দূরে সরে যেতে থাকে। বিখ্যাত মুসলিম সমাজবিজ্ঞানী ও ঐতিহাসিক ইবনে খালদুনের ভাষায়, اَلنَّاسُ عَلٰى دِيْنِ مُلُوْكِهِمْ "বিজিতরা বিজয়ীদের আনুগত্যের ও অনুকরণের দাসে পরিণত হয়।"

খ. অমুসলিমদের অধিকার ব্যাহত হওয়ার অভিযোগ

ইসলামী আইনের বিরুদ্ধে নানা ধরণের অপপ্রচার প্রাচ্য-পশ্চাত্যে চালু রয়েছে। যার মধ্যে ইসলামী আইনে ভিন্ন ধর্মাবলম্বী নাগরিকদের অধিকার ব্যাহত হওয়ার অভিযোগ অন্যতম। এটি একেবারেই অমূলক ও অবাস্তব অভিযোগ।

---

[১] মুহাম্মদ ছালাহ উদ্দিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৩

ইসলামী রাষ্ট্রের মুসলিম এবং ভিন্ন ধর্মাবলম্বী সকলের জান, মাল ও ইজ্জতের নিরাপত্তা সমভাবে নিশ্চিত করার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। নিম্নে ইসলামী আইনে অমুসলিমদের অধিকারের কিছু দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হলো।

ইসলাম মানুষের প্রত্যেকটি সমস্যাকে মানবীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে। মানুষের সাধ্যের অতিরিক্ত কোন বোঝা ইসলাম তাদের উপর চপিয়ে দেয় না। ইসলামের শ্বাশত ও সার্বজনীন বাণী নিয়ে যাঁকে প্রেরণ করা হয়েছে, সেই সর্বশ্রেষ্ট ও সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ বলেন,

قُلْ يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّیْ رَسُوْلُ اللهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا الَّذِیْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ۚ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ يُحْیٖ وَ يُمِيْتُ فَاٰمِنُوْا بِاللهِ وَ رَسُوْلِهِ النَّبِیِّ الْاُمِّیِّ الَّذِیْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَ كَلِمٰتِهٖ وَ اتَّبِعُوْهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ۝

বল, হে মানুষ! আমি তোমাদের সকলের জন্য আল্লাহর রসূল, (সেই আল্লাহর) যিনি আকাশসমূহ আর পৃথিবীর রাজত্বের মালিক, তিনি ছাড়া সত্যিকারের কোন ইলাহ নেই, তিনিই জীবিত করেন আর মৃত্যু আনেন। কাজেই তোমরা ঈমান আন আল্লাহর প্রতি ও তাঁর প্রেরিত সেই উম্মী বার্তাবাহকের প্রতি যে নিজে আল্লাহর প্রতি ও তাঁর যাবতীয় বাণীর প্রতি বিশ্বাস করে, তোমরা তাঁর অনুসরণ কর যাতে তোমরা সঠিক পথ পেতে পার।[১]

উপরোক্ত আয়াতটি গোটা মানবজাতিকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে, শুধুমাত্র মুসলমাদের উদ্দেশ্যে নয়। খিলাফত রাষ্ট্রের বিধান প্রদানকারী সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর দৃষ্টিতে বর্ণ, গোত্র, জাতি ও সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন ভেদাভেদ নেই। তিনি ইরশাদ করেন,

يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّ اُنْثٰى وَ جَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّ قَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوْا ؕ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ اَتْقٰكُمْ اِنَّ اللهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ

হে মানুষ! তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোষ্ঠীতে বিভক্ত করেছি যাতে তোমরা পরস্পরকে চিনতে পার। তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নিকট সেই লোকই অধিক সম্মানীয় যে লোক অধিক মুত্তাক্বী। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সব খবর রাখেন।[২]

ইসলামী রাষ্ট্র কখনও কোন অমুসলিমকে নিজের ধর্মপালনে বাধা দেয়না। কিংবা জোর করে ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য করেনা। পবিত্র কুরআন এ ব্যাপারে পরিষ্কার ঘোষণা দিয়েছে,

لَاۤ اِكْرَاهَ فِی الدِّيْنِ ۟ۙ قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَیِّ ۚ فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَ يُؤْمِنْۢ بِاللهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى * لَا انْفِصَامَ لَهَا ؕ وَ اللهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

দ্বীনের মধ্যে জবরদস্তির অবকাশ নেই, নিশ্চয় হিদায়াত গোমরাহী হতে সুস্পষ্ট হয়ে গেছে। কাজেই যে ব্যক্তি মিথ্যে মা'বুদদেরকে (তাগুতকে) অমান্য করল এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনল, নিশ্চয়ই সে দৃঢ়তর রজ্জু ধারণ করল যা ছিন্ন হওয়ার নয়। আল্লাহ সর্বশ্রোতা এবং সর্বজ্ঞাতা।[৩]

---

[১] আল কুরআন, ৭ : ১৫৮
[২] আল কুরআন, ৪৯ : ১৩
[৩] আল কুরআন, ২ : ২৫৬

খিলাফত রাষ্ট্রে একজন মুসলমানের মতই একজন অমুসলিম মুআ'হিদের জীবন পবিত্র ও সুরক্ষিত থাকে। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে,

عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ أَلاَ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهِدَةً لَهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ فَقَدْ أَخْفَرَ بِذِمَّةِ اللَّهِ فَلاَ يَرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ سَبْعِينَ خَرِيفًا

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সাবধান! যে লোক সন্ধি-চুক্তি করে আল্লাহ ও তার রাসূলের যিম্মা (নিরাপত্তা) নিয়েছে তাকে যে লোক খুন করল সে আল্লাহ্ তা'আলার যিম্মাদারীকে ছিন্ন করল। সে জান্নাতের সুগন্ধটুকুও লাভ করবে না। অথচ জান্নাতের সুগন্ধ সত্তর বছরের দূরত্ব (পথ) হতেও পাওয়া যায়।[১]

বিচারক বাদী বিবাদীর মাঝে কে মুসলিম কে অমুসলিম কিংবা কে খলীফা কে সাধারণ নাগরিক এই বিবেচনায় বিচার কার্য পরিচালনা করেন না। বরং তার উপর ইসলামের নির্দেশ হচ্ছে ন্যায়-ইনসাফের ভিত্তিতে বিচার করার। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

اِنَّ اللّٰهَ يَاۡمُرُكُمۡ اَنۡ تُؤَدُّوا الۡاَمٰنٰتِ اِلٰۤى اَهۡلِهَا ۙ وَ اِذَا حَكَمۡتُمۡ بَيۡنَ النَّاسِ اَنۡ تَحۡكُمُوۡا بِالۡعَدۡلِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمۡ بِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيۡعًۢا بَصِيۡرًا

নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন, হকদারদের হক তাদের কাছে পৌঁছে দিতে। তোমরা যখন মানুষের মাঝে বিচার করবে তখন ন্যায়পরায়ণতার সঙ্গে বিচার করবে। আল্লাহ তোমাদেরকে কত উত্তম উপদেশই না দিচ্ছেন; নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছু শোনেন, সবকিছু দেখেন।[২]

অন্য আয়াতে ইয়াহুদীদের প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তাঁর রাসুলকে নির্দেশ দিয়েছেন এই বলে যে,

سَمّٰعُوۡنَ لِلۡكَذِبِ اَكّٰلُوۡنَ لِلسُّحۡتِ ؕ فَاِنۡ جَآءُوۡكَ فَاحۡكُمۡ بَيۡنَهُمۡ اَوۡ اَعۡرِضۡ عَنۡهُمۡ ۚ وَ اِنۡ تُعۡرِضۡ عَنۡهُمۡ فَلَنۡ يَّضُرُّوۡكَ شَيۡـًٔا ؕ وَ اِنۡ حَكَمۡتَ فَاحۡكُمۡ بَيۡنَهُمۡ بِالۡقِسۡطِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الۡمُقۡسِطِيۡنَ

তারা বেশিবেশি মিথ্যে শুনতে আগ্রহী, হারাম ভক্ষণকারী, তারা যদি তোমার কাছে আসে তাহলে (ইচ্ছে হলে) তাদের বিবাদ নিস্পত্তি কর নতুবা অস্বীকার কর। অস্বীকার করলে তারা তোমার কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। যদি বিচার ফায়সালা কর তাহলে ইনসাফের সাথে তাদের বিচার ফায়সালা কর, আল্লাহ্ ন্যায়পরায়ণদেরকে ভালবাসেন।[৩]

এমনিভাবে সকল ক্ষেত্রেই ইসলামী রাষ্ট্র ও আইনে সকল ধর্মের অনুসারীদের যথাযথ অধিকার ও মর্যাদা প্রদান করা হয়েছে। কোনো ক্ষেত্রেই ইসলামী আইনে তাদের প্রতি কোনো অন্যায় আচরণ করা হয়নি।

গ. স্বেচ্ছাচিন্তার যুগ

অধিকাংশ মুসলিম রাজ্যই অষ্টাদশ শতাব্দিতে বিভিন্ন পশ্চিমা উপনিবেশবাদের আওতায় চলে আসে। পশ্চিমাদের মুসলিম রাষ্ট্র দখলের প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিলো অর্থনৈতিক। শিল্প উন্নয়নের ক্ষেত্রে কাঁচামাল অপরিহার্য। তারা মূলত

---

[১] ইমাম তিরমিযী রহ., *আস সুনান*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, হাদীস নং ১৪০৩
[২] আল কুরআন, ৪ : ৫৮
[৩] আল কুরআন, ৫ : ৪২

কাঁচামাল সংগ্রহ করতেই তুলনামূলক দরিদ্র দেশগুলোতে শাসন কায়েম করে। তবে উপনিবেশিক শক্তিগুলোর কর্মক্ষেত্র শুধুমাত্র অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল না। রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থাপনার সকল ক্ষেত্রেই তারা তাদের চিন্তা চেতনা চাপিয়ে দেয়। মুসলিম শাসিত দেশগুলোতে ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক শক্তি ক্রমান্বয়ে শরী'আ আইনের পরিবর্তে ইউরোপীয় আইন ও বিচার ব্যবস্থা চালু করে। এসব মুসলিম দেশে এক পর্যায় ইউরোপীয় আইন ও বিচার ব্যবস্থার ভিত্তি সুদৃঢ় হয়। দুঃখজনক বস্তবতা হচ্ছে বর্তমানে অধিকাংশ মুসলিম দেশই শরী'আ আইনের তুলনায় ইউরোপীয় আইনকেই যৌক্তিক মনে করছে, যদিওবা তারা এখন স্বাধীন।

অটোম্যান কর্তৃক ১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দের গুলহেন সনদ (Gulhane charter of 1839) প্রবর্তন এবং ভারতীয় উপমহাদেশের ক্ষেত্রে ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে ব্যর্থ মুসলিম অভ্যুত্থানের সময় হতে স্বেচ্ছাচারিতার যুগ শুরু হয়েছে বলে গণ্য করা যায়। বিগত দুটি বিশ্বযুদ্ধ এবং এর অব্যবহিত পরে মানবিক সম্পর্কের বিভিন্ন ক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদ এবং আঞ্চলিকতাবাদের ইউরোপীয় ধারণাসমূহ পশ্চিমা আইনকে সম্মুখে ঠেলে দেয় এবং মুক্ত আইনের গতি আবদ্ধ হয়ে পড়ে। পুঁজিবাদ এবং সমাজতন্ত্রের মিশ্র ধারণা এর অস্তিত্বের প্রতি হুমকি হয়ে দাঁড়ায় এবং মুসলিম জাতির জন্য ইসরাঈলী আগ্রাসন একটি অন্যতম চ্যালেঞ্জরূপে পরিগণিত হয়। শরী'আ আইনের ইতিহাসের এ পর্যায়ে শরী'আ আইন এক চরম পরীক্ষার মধ্যদিয়ে ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে।[১]

বিশেষজ্ঞগণ এ যুগের নানা বৈশিষ্ট্যের কথা আলোচনা করেছেন। যার মধ্যে অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল, ভোগবাদী পশ্চিমা চিন্তার স্রোত ইসলামী দেশগুলোকে ভীষণভাবে হতবুদ্ধি করেছে। এ সময়ে উপনিবেশবাদ, রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র এবং আধিপত্যবাদের সূত্রে পশ্চিমা সভ্যতার সাথে যে প্রত্যক্ষ সংশ্রব ঘটে, বিশেষ করে তখন শিক্ষায় উদারনৈতিকতাবাদ, লিঙ্গ সমতা, একক বিবাহবাদ, বিজ্ঞান বা প্রযুক্তি শিল্প নির্ভর গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা, জাতীয় সার্বভৌমত্ব এবং বস্তুবাদ, ইত্যাদি বিষয়ে ইউরোপীয় ধারণাসমূহ প্রাচ্যে ব্যাপকভাবে চর্চা হতে শুরু করে। এর একটি সুগভীর এবং কার্যকরী ফল দেখা দেয়। অনুসন্ধানী প্রশ্নসমূহ জিজ্ঞাসিত হতে থাকে। ধর্ম কী? সংস্কৃতি কী? ইসলামী আইন কী? আমরা এগুলো নির্মূল করে দিব, না প্রয়োজনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে এগুলোর উন্নয়ন করব? একজন মুসলিম কে? এবং তার জন্য কী কী প্রয়োজন? এ সকল প্রশ্ন রাজনৈতিক জাতীয়তাবাদের ধারণার মধ্য দিয়ে গভীর থেকে গভীরভাবে মৌলিক এবং জাতীয় আত্মনির্ভরতার প্রশ্নে একত্রে জট পাকিয়ে প্রধানরূপে দেখা দেয়।[২]

ঘ. প্রগতিবাদের প্রোপাগান্ডা

তথ্যপ্রযুক্তির এই যুগে মানুষের বোধ পরিবর্তন ও সমাজ নিয়ন্ত্রণের বড় একটি অস্ত্র মিডিয়া। যার উপর পশ্চিমাদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। শরী'আ আইনকে বর্তমানে নানা ধরনের প্রশ্নের মুখোমুখি করা হচ্ছে। একে বিতর্কিত করাই যার উদ্দেশ্য। আর শরী'আ আইনকে বিতর্কিত করার ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা পালন করে চলেছে পশিচমা বিশ্ব নিয়ন্ত্রিত মিডিয়া। ইসলাম ও ইসলামী বিধানসমূহকে বর্তমান বিশ্বে প্রগতির নামে নানাভাবে হেয় প্রতিপন্ন ও এর বিরুদ্ধে বিষোদ্গার ছড়ানো হচ্ছে। জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক মিডিয়াগুলো বর্তমান যুগে ইসলামী শরী'আত কার্যকর করার

[১] মুহাম্মদ ছালাহ উদ্দিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৩

[২] মোহাম্মদ মজিবর রহমান, *মুসলিম পারিবারিক আইন পরিচিতি*, ঢাকা : হলি প্রকাশনী, ১৯৯৬, পৃ. ৪৮-৪৯

যৌক্তিকতা নেই, এ শরী'আত মানব কল্যাণে অকার্যকর ইত্যাদি তাদের প্রচারের নৈমিত্তিক অংশ হিসেবে গ্রহণ করেছে।

ইসলামের দণ্ডবিধিগুলোকে মানবাধিকার বিরোধী বলেও এসব মিডিয়ায় বেশ জোরেশোরে প্রচার করা হচ্ছে। তাদের অপপ্রচারে তালিকায় বিশেষভাবে রয়েছে হত্যার জন্য শিরশ্ছেদ, ব্যভিচারের জন্য বিবাহিতের শাস্তি পাথর ছুঁড়ে হত্যা ও অবিবাহিতের শাস্তি একশ বেত্রাঘাত ইত্যাদি। মুসলিম দেশগুলোতে ইসলামী শরী'আ আইনের বিরূদ্ধে তাদেরকে বিভিন্ন সময় আন্দোলন করতেও দেখা যায়। তাদের আন্দোলন ও প্রচার প্রচারণার চাপের ফলে রাষ্ট্রের আইন প্রণয়নকারী সংস্থাগুলো শরী'আ আইন প্রণয়ন করতে বাধার মুখে পরতে হয়। বাস্তবতা হচ্ছে অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রগতিবাদীরা অজ্ঞতাবশতই ইসলামী আইনের বিরোধিতা করে থাকেন। ইসলামী আইনের উদ্দেশ্য, প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি বিচার বিশ্লেষণ না করেই এর বিরুদ্ধাচারণ করে থাকেন।

ঙ. রাজনৈতিক অসাধুতা

শরী'আ আইন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যতোগুলো বড় প্রতিবন্ধকতা তার মধ্যে রাজনৈতিক অসাধুতা অন্যতম। রাজতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় বংশ পরম্পরায় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভ জনগণ ও শারী'আর প্রতি দায়বদ্ধতাকে নিঃসন্দেহে কমিয়ে দেয়। যার ফলে ইসলামের প্রথম চার খলীফার পরবর্তী যুগের শাসন শরী'আ আইনকে প্রভাবিত করছে। খলিফা ও খিলাফতের আবরণে আচ্ছাদিত তথাকথিত খিলাফতের খলিফাগণ আমির-ওমারা, সুলতানদের জবাবদিহিতাহীন শাসন ব্যবস্থা শরী'আ আইনের ধারাগুলোকে ধীরে ধীরে পর্যুদস্ত করেছে।[১]

চ. নিত্য নতুন ধর্মীয় ব্যখ্যা প্রদান

তাকলীদ শব্দটি আরবি। তাকলীদ' (التقليد) শব্দটি 'ক্বালাদাতুন' (قلادة) হ'তে গৃহীত। যার অর্থ কণ্ঠহার বা রশি। যেমন বলা হয়, قَلَّدَ الْبَعِيْرَ 'সে উটের গলায় রশি বেঁধেছে'। সেখান থেকে 'মুক্বাল্লিদ' (مقلد) , যিনি কারো আনুগত্যের রশি নিজের গলায় বেঁধে নিয়েছেন।

ইসলামী আইনতত্ত্বে তাকলীদ বলতে মুসলিম আইনবিদদের মতের অনুসরণ বুঝায়। যে সম্পর্কে কুর'আন, হাদীস বা ইজমায় কোন সমাধান নেই, সে সম্পর্কে মুসলিম আইনবিদগণ যে অভিমত প্রকাশ করেন তা গ্রহণ করার নাম তাকলীদ। তাকলীদের অন্যতম উদ্দেশ্য হল, শৃঙ্খলার অনুশীলন। যিনি ইসলামী শরী'আ আইনে বিজ্ঞ নন তিনিই তাকলীদ করবেন। যিনি নিজে আইনবিদ তিনি স্বাধীন অভিমত পোষণ করতে পারেন। তাঁর পক্ষে অন্যের অভিমত গ্রহণ করা উচিত নয়। তাকলীদ ইসলামের ইতিহাসে এক গৌরবোজ্জ্বল দিক। যে সকল সমস্যার সমাধান ইসলামের চার প্রধান ইমামসহ ইসলামী ফিকহের শীর্ষস্থানীয় আলেমগণ দিয়েছেন সেক্ষেত্রে তাকলীদ কোন বাধা নয়।[২] মুজতাহিদ নন, ইসলামী জ্ঞানে যিনি পণ্ডিত নন তাকে বিজ্ঞ ইমাম-আলেমদের মতামত গ্রহণ করার ব্যাপারে কুরআন কারীমে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন,

---

[১] মুহাম্মদ ছালাহ উদ্দিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৪-১২৫

[২] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৬

يَاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡۤا اَطِيۡعُوا اللّٰهَ وَ اَطِيۡعُوا الرَّسُوۡلَ وَ اُولِی الۡاَمۡرِ مِنۡكُمۡ ۚ فَاِنۡ تَنَازَعۡتُمۡ فِیۡ شَیۡءٍ فَرُدُّوۡهُ اِلَی اللّٰهِ وَ الرَّسُوۡلِ اِنۡ كُنۡتُمۡ تُؤۡمِنُوۡنَ بِاللّٰهِ وَ الۡیَوۡمِ الۡاٰخِرِ ؕ ذٰلِکَ خَیۡرٌ وَّ اَحۡسَنُ تَاۡوِیۡلًا

ওহে যারা ঈমান এনেছ, তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর, আর আনুগত্য কর (এই) রাসূলের এবং তোমাদের মধ্যকার 'উলুল আমর' এর। এবং যদি কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে কোন মতভেদ দেখা দেয় তবে তা উপস্থাপন কর আল্লাহ ও রাসূলের নিকট যদি তোমরা আল্লাহ ও আখিরাতের বিশ্বাস কর। এটাই উত্তম ও পরিণামে প্রকৃষ্টতর।[১]

অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন,

وَ مَاۤ اَرۡسَلۡنَا مِنۡ قَبۡلِکَ اِلَّا رِجَالًا نُّوۡحِیۡۤ اِلَیۡهِمۡ فَسۡـَٔلُوۡۤا اَهۡلَ الذِّکۡرِ اِنۡ کُنۡتُمۡ لَا تَعۡلَمُوۡنَ

আর আমি তোমার পূর্বে কেবল পুরুষদেরকেই রাসূল হিসেবে প্রেরণ করেছি, যাদের প্রতি আমি ওহী পাঠিয়েছি। সুতরাং জ্ঞানীদের জিজ্ঞাসা কর, যদি তোমরা না জানো। [২]

বর্তমন যুগকে বলা হয় বিজ্ঞানের যুগ, শিল্পের যুগ। বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, অর্থনীতি ও সামাজিক বিজ্ঞান, চিকিৎসা বিজ্ঞানের ব্যাপক উন্নয়নের ফলে নিত্য নতুন প্রশ্নের সৃষ্টি হচ্ছে। নিত্যনতুন আবিষ্কারের ফলে এসব আবিষ্কার ব্যবহারের ক্ষেত্রে ইসলামের অবস্থান কী হবে, কোন বিষয়গুলো গ্রহণ করা বৈধ হবে, কোনগুলো নয় এসব বিষয় প্রতিনিয়তই জটিলতার সৃষ্টি হচ্ছে। যুগের চাহিদা ও পরিপ্রেক্ষিত বিবেচনায় দাওয়াতের সবচেয়ে গুরুত্ব ইজতিহাদ কৌশলটি এখন স্থায়ীভাবে আলেমদের হাতে রয়েছে। যুগের নবতর অনেক প্রশ্নের স্থায়ী সমাধান তাকলীদী মাসআলাগুলোতে বর্তমান নেই। দীর্ঘকাল তাকলীদভিত্তিক মাসআলার উপর নির্ভর করায় নবতর অনেক সমস্যার সমাধান আসতে অনেক সময় লেগে গেছে, যা কখনো কাম্য ছিল না।

ইসলামের বিখ্যাত চার ইমাম, ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.), ইমাম মালিক বিন আনাস (রহ.), ইমাম মুহাম্মদ বিন ইদরিস আশ শাফি'ঈ (রহ.), ও ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহ.), তারা প্রত্যেকেই ছিলেন এক একজন যুগশ্রেষ্ঠ মুজতাহিদ। সমসাময়িক উদ্ভূত নতুন সমস্যার সমাধান তারা দিয়েছেন। সুতরাং শরী'আ আইনে তাকলীদ কোনো বাধা নয়। কিন্তু যে সকল বিষয়ে তাকলীদী মাসআলা নেই সেসকল ক্ষেত্রে ইজতিহাদের মাধ্যমে মাসআলা নির্ধারণ করা যায়।[৩] ইসলাম চির প্রগতির ধর্ম, মানব জীবনের সকল সমস্যার সমাধানই কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন,

وَ یَوۡمَ نَبۡعَثُ فِیۡ کُلِّ اُمَّۃٍ شَهِیۡدًا عَلَیۡهِمۡ مِّنۡ اَنۡفُسِهِمۡ وَ جِئۡنَا بِکَ شَهِیۡدًا عَلٰی هٰۤؤُلَآءِ ؕ وَ نَزَّلۡنَا عَلَیۡکَ الۡکِتٰبَ تِبۡیَانًا لِّکُلِّ شَیۡءٍ وَّ هُدًی وَّ رَحۡمَۃً وَّ بُشۡرٰی لِلۡمُسۡلِمِیۡنَ

সেদিন আমি প্রত্যেক উম্মাত থেকে তাদের নিজেদেরই মধ্য হতে একজন সাক্ষী দাঁড় করাব, আর (তোমার) এই লোকদের ব্যাপারে সাক্ষ্যদাতা হিসেবে (হে মুহাম্মাদ!) আমি তোমাকে আনব। আমি তোমার প্রতি এ কিতাব নাযিল

---

[১] আল কুরআন, ৪ : ৫৯
[২] আল কুরআন, ১৬ : ৪৩
[৩] মুহাম্মদ ছালাহ উদ্দিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৭

করেছি যা প্রত্যেকটি বিষয়ের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা, সত্য পথের নির্দেশ, রহমাত আর আত্মসমর্পণকারীদের জন্য সুসংবাদ স্বরূপ।[১]

বর্তমান আলেমদের কর্তব্য নবসৃষ্ট সমস্যা সমাধানে পূর্ববর্তী ইমামদের নীতিমালা অনুসরণ করে কুরআন-হাদীস থেকে নবসৃষ্ট সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান বের কর।

ছ. ইউরোপীয় আইনের প্রভাব

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ওসমানীয় সাম্রাজ্য অক্ষ শক্তির পক্ষাবলম্বন করে। যুদ্ধে অক্ষ শক্তির পরাজয় মুসলিম খিলাফত ব্যবস্থায় শেষ পেরেক ঠুকে দেয়। ১৯২৩ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে খিলাফত ব্যবস্থার বিলুপ্তি ঘটে। তুরস্কের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয় সেকুলার রাজনীতিতে বিশ্বাসী কামাল আতাতুর্ক। কামাল আতাতুর্ক রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে ক্রমেই ইসলামী আইন থেকে সরে আসতে শুরু করে। ইউরোপীয় প্রাকৃতিক আইনের উন্নয়নে অনুপ্রাণিত হয়ে পুরাতন আইন-কানুনকে নতুন ও পুনর্গঠিত ডিক্রি দ্বারা স্থলাভিষিক্ত করা হয়। প্রথম পর্যায়ের সংস্কার সেনাবাহিনী, অর্থব্যবস্থা এবং অনুরূপ বিষয়াদিতে সীমাবদ্ধ ছিল। দ্বিতীয় পর্যায়ে দেওয়ানি ও ফৌজদারি আইনে এবং সাধারণ প্রশাসনের সংস্কার সাধন করা হয়। এ সময় দেশকে ইসলামী রূপ পরিবর্তন করে ইউরোপীয় রাষ্ট্রের ছাঁচে গড়ার জন্য আইন সংকলন বা আইন সংহিতা প্রকাশ করা হয়।[২]

মিশরে মোহাম্মদ আলীর রাজত্বকালে যতদূর সম্ভব ওয়াকফ এবং ব্যক্তিগত বিষয়াদির ক্ষেত্রে শরী'আ আইনের প্রয়োগ সীমাবদ্ধ করে অন্যান্য ক্ষেত্রে যেমন, দেওয়ানি ও বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে হানাফি মাযহাবের আইনকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।[৩] ইউরোপীয় উপনিবেশগুলোতে বিবাহ, তালাক, উত্তরাধিকার, অভিভাবকত্ব, ইচ্ছা-পত্র (উইল, অসিয়ত), দান এবং ওয়াকফ ইত্যাদি বিষয়কে ব্যক্তিগত আইনের ক্ষেত্র বলে সাব্যস্ত করা হয় এবং যতদূর সম্ভব ইউরোপীয়করণ হতে বিমুক্ত রাখা হয়।[৪]

জ. শরী'আ আইনকে ধর্মীয় আইন মনে করার প্রবণতা

পশ্চিমা বিশ্বের আরেকটি প্রবণতা হচ্ছে শরী'আ আইনর পূণাঙ্গতা অস্বীকার করা। এক্ষেত্রে তারা শরী'আ আইনকে শুধুমাত্র ইসলাম ধর্মের অনুসারীদের জন্য প্রযোজ্য বলে প্রমাণ করতে চায়। আধুনিক বিশ্বে পৃথিবীর প্রতিটি দেশেই সব ধর্ম ও মতবাদের মানুষ বসবাস করে। পশ্চিমাদের দাবি হচ্ছে, রাষ্ট্র একটি সার্বজনীন বিষয়। এক্ষেত্রে এমন আইন প্রণয়ন করতে হবে যা সকল নাগরিকের জন্য প্রযোজ্য হতে পারে। শরী'আ আইন যেহেতু শুধুমাত্র মুসলিমদের জন্য প্রযোজ্য, তাই অন্য ধর্মাবলম্বী নাগরিকদের উপর এ আইন চাপিয়ে দেওয়া অযৌক্তিক। সুতরাং রাষ্ট্রীয় সংহতি রক্ষার্থে মানব রচিত আইন বলবৎ করাকেই তারা যৌক্তিক বলে দাবি করে থাকে।

---

[১] আল কুরআন, ১৬ : ৮৯

[২] মুহাম্মদ ছালাহ উদ্দিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৬

[৩] আলামা ইউসুফ আল কারযাভী, *ইসলামী শরীয়াতের বাস্তবায়ন*, অনু. ড মাহফুজুর রহমান, ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, ২০০২, পৃ. ৪৯

[৪] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫০

ঞ. ইসলামী আইনকে স্থির মনে করা

ইসলামী আইনের বিরুদ্ধে পশ্চিমাদের আরেকটি আপত্তির জায়গা হলো, ইসলামী আইন স্থির, বিবর্তনমূলক নয়। এ আইন যেহেতু প্রায় দেড় হাজার বছর আগে প্রণীত হয়েছে তাই আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় এর আর উপযোগিতা নেই। সমাজ ও রাষ্ট্র পরিবর্তনশীল, তাই এর আইনও সময়ের পরিক্রমায় পরিবর্তিত হবে। এ কথা অস্বীকার করার সুযোগ নাই যে ইসলামী আইনের প্রধান দুটি উৎস হচ্ছে, কুরআন এবং সুন্নাহ। কুরআন-সুন্নাহর মূলনীতির আলোকেই ইমামগণ আরও বেশ কিছু বিষয়কে ইসলামী আইনের উৎস হিসেবে চিহ্নিত করেছেন, যেমন-ইজমা, কিয়াস, ইসতিহসান ইত্যাদি। ইজমার ব্যপারে কুরআন কারীমে ইরশাদ করা হয়েছে,

وَ مَنۡ یُّشَاقِقِ الرَّسُوۡلَ مِنۡۢ بَعۡدِ مَا تَبَیَّنَ لَہُ الۡہُدٰی وَ یَتَّبِعۡ غَیۡرَ سَبِیۡلِ الۡمُؤۡمِنِیۡنَ نُوَلِّہٖ مَا تَوَلّٰی وَ نُصۡلِہٖ جَہَنَّمَ وَ سَآءَتۡ مَصِیۡرًا

যে ব্যক্তি সত্য পথ প্রকাশিত হওয়ার পরও রসূলের বিরোধিতা করে এবং মু'মিনদের পথ বাদ দিয়ে ভিন্ন পথ অনুসরণ করে, আমি তাকে সে পথেই ফিরাব যে পথে সে ফিরে যায়, আর তাকে জাহান্নামে দগ্ধ করব, কত মন্দই না সে আবাস![১]

মহানবী (সা.) এর হাদীসেও ইজমা এর স্বপক্ষে একাধিক বর্ণনা রয়েছে। হযরত ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা আমার উম্মাতকে (বর্ণনান্তরে উম্মতে মুহাম্মদীকে) কখনো গুমরাহীর উপর অবশ্যই একত্রিত করবেন না। আল্লাহর হাত হল জামাআতের উপর। যে ব্যক্তি বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে সে একাকী জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।[২]

ইসলামী আইনের উৎস হিসেব ইমামগণ অন্য যেসব উৎসের উদ্ভাবন ঘটিয়েছেন সেগুলোর স্বপক্ষেও কুরআন-সুন্নাহর দলিল রয়েছে। কুরআন-সুন্নাহ সমর্থিত এসব উৎস নিঃসন্দেহ ইসলামী আইনকে গতিশীল করেছে। পশ্চিমাদের এসব বিষয় বিবেচনায় নেওয়া আবশ্যক।

ইসলামী আইন বা শরী'আ আইনের সাফল্য ও কার্যকারিত মহানবী (সা.) এবং খোলাফায় রাশেদার শাসনামলে প্রমাণিত হয়েছে। তা সত্ত্বেও আজকের বিশ্ব শরী'আ আইনেকে রাষ্ট্রের আইন হিসেবে গ্রহণ করছে না। এক্ষেত্রে ইসলামের অনুসারী এবং অনুসারী নয়, উভয় পক্ষ থেকেই প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। মুসলমানগণ শরী'আ আইনের কার্যকরিতা ও উপযুক্ততা যখাযথ বাবে উপস্থাপন করতে সক্ষম হচ্ছেন না। অপরদিকে অন্য ইসলামের ধর্মের অনুসারী নয় তারা অনেক ক্ষেত্রেই বিদ্বেষ প্রসূত শরী'আ আইনের বিরোধিতা করছেন, শরী'আ আইন প্রতিষ্ঠায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছেন।

---

[১] আল কুরআন, ৪ : ১১৫

[২] ইমাম তিরমিযী রহ., *আস সুনান*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, হাদীস নং ২১৭০

বাংলাদেশে ইসলামী আইন বাস্তবায়নের পথে মৌলিক সমস্যা

বাংলাদেশে শরী'আ আইন বাস্তবায়নের পথে মৌলিক সমস্যাসমূহ নিম্নরূপ:

ক. শরী'আ আইন সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণার অভাব

বাংলাদেশ মুসলিম প্রধান দেশ হওয়া সত্ত্বেও এ দেশে ইসলামী শিক্ষা ব্যাপকতা লাভ করেনি। বিশেষত মাদরাসা ব্যতীত অন্যান্য শিক্ষা ব্যবস্থায় ইসলাম এবং ইসলামী আইন সম্পর্কে জানার সুযোগ খুবই কম। দেশের উচ্চ শিক্ষা স্তরের সিলেবাসে নানা ধরনের রাষ্ট্রব্যবস্থা সম্পর্কে শিক্ষাদান করা হয়। গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, রাজতন্ত্র, স্বৈরতন্ত্রসহ প্রায় সব ধরনের রাষ্ট্র ব্যবস্থা সম্পর্কেই পড়ানো হয় শিক্ষার্থীদের। দুঃখজনক বাস্তবতা হচ্ছে, ইসলামী খিলাফত, আইন ও বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের পড়ানো হয় না বললেই চলে। কোনো কোনো পর্যায়ে ইসলামী আইন ও বিচারব্যবস্থা সম্পর্কে সামান্য শিক্ষাদানের ব্যবস্থা থাকলেও তা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল খণ্ডিত ও বিকৃত। ফলে এ সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের মধ্যে স্বচ্ছ ধারনা জন্মায় না, এর প্রতি আগ্রহও জন্মায় না। শিক্ষা জীবনে ইসলামী আইন সম্পর্কে স্পষ্ট ধারনা লাভ না করায় এ সম্পর্কে পশ্চিমাদের অপপ্রচারকেই ইসলামী আইনের প্রকৃত স্বরূপ বলে তারা মনে করে।

খ. শরী'আ আইনের কার্যকারিতা উপস্থাপনে ব্যর্থতা

এদেশে ইসলামী খিলাফত ও আইন প্রতিষ্ঠার পক্ষে বুদ্ধিবৃত্তিক কর্মসূচী নেই বললেই চলে। যারা এর পক্ষে রাজনীতি করছেন তাদের অধিকাংশই ইসলামী আইন সম্পর্কে খুব স্পষ্ট ধারনা রাখেন বলে মনে হয় না। কারণ তাদের বক্তৃতা বিবৃতির মধ্যে এর যৌক্তিকতা প্রমাণের স্বপক্ষে যুক্তি ও বিজ্ঞানভিত্তিক, বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা খুব কমই থাকে। তারা ইসলামী আইন যে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে একটি আধুনিক ও কল্যাণমুখি সমাজ রাষ্ট্র পরিচালনা করতে সক্ষম তা জনগণের সামনে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরতে পারছেন না। ফলে জনগণের ভেতরে একটি অস্পষ্টতা, ভীতি, সংশয় ও অজ্ঞতা থেকে যাচ্ছে। জনগণের একটা অংশ বুঝে হোক বা না বুঝে, ইসলামী আইন সম্পর্কে এ অস্পষ্টতা থেকে এর বিরোধিতায় লিপ্ত হচ্ছেন।

গ. শিক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটি

বাংলাদেশে প্রধানত দুই ধরনের শিক্ষা পদ্ধতি চালু আছে। একটি সাধারণ শিক্ষা এবং অপরটি মাদরাসা শিক্ষা নামে পরিচিত। সাধারণ শিক্ষায় সাধারণত পার্থিব প্রয়োজনীয় বিষয় শিক্ষাদান করা হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে মাদরাসা শিক্ষায় ইসলাম ধর্মীয় শিক্ষাকে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। বাস্তবতা হচ্ছে মাদরাসার শিক্ষার্থীদের জন্য পাঠ্যসূচীতে সমসাময়িক এবং আধুনিক কর্মমুখী বিষয়ে তুলনামূলক কম গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। ফলে বিজ্ঞানের নব আবিষ্কার, সেগুলোর ধরন, গতি-প্রকৃতি ইত্যাদি সম্পর্কে তাদের বিস্তারিত ধারণা লাভ করার সুযোগ কম। ফলে মানবজীবনে সমস্যার যে সুষ্ঠু ও নির্ভুল সমাধান কুর'আন ও হাদীসে দেয়া হয়েছে তা বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করার কোন সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিভঙ্গিই তারা লাভ করতে পারেন না। এ কারণে সুদীর্ঘকাল কঠোর সাধনা করেও তারা যে শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা লাভ করেন তা বর্তমান বিশ্বের প্রয়োজন পূরণে প্রযুক্তির দৌড়ে কার্যত ব্যর্থতার গ্লানি বয়ে আনে। পক্ষান্তরে যারা জাগতিক শিক্ষা অর্জন করেন তারা প্রচলিত দুনিয়ার জ্ঞান অর্জন করতে পারেন বটে, কিন্তু নির্ভুল আদর্শিক জ্ঞানে তারা সমৃদ্ধ হতে

পারেন না। এ শিক্ষার পাশাপাশি ইসলামের পূর্ণ আনুগত্য করতে তাদেরকে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় ইসলামের মৌলিক বিষয়াদি শিখে নিজেদেরকে খাঁটি মুসলমান রূপে গড়ে তুলতে অতিরিক্ত শ্রম ও সময় ব্যয় করতে হয়।[১]

ঘ. জাতীয়-আন্তর্জাতিক মিডিয়ার অপপ্রচার

তথ্যপ্রযুক্তির এই যুগে ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অন্যতম অন্তরায় আধুনিক মিডিয়া। মূলধারার গণমাধ্যম প্রায় সবগুলোই পশ্চিমা মতাদর্শে পরিচালিত হয়ে থাকে। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক, প্রায় সবগুলোই ইসলাম, বিশেষত শরী'আ আইন ও বিচারব্যবস্থা সম্পর্কে অপপ্রচার চালিয়ে আসছে। শরী'আ আইনের বিরুদ্ধে নানা অপপ্রচার চালিয়ে জনমনে এ সম্পর্কে ভুল ধারনা পৌঁছে দিচ্ছে। ফলে সাধারণ মানুষও ক্রমেই ইসলামী খিলাফত ও ইসলামী আইন বিরোধী হয়ে উঠছে।

ঙ. ধর্মীয় নেতাদের অনৈক্য

মহান আল্লাহ মুসলিমদের ঐক্যবদ্ধ থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। পবিত্র কুরআন কারীমে মহান আল্লাহ বলেন,

وَ اعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّ لَا تَفَرَّقُوْا ۪ وَ اذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَآءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهٖۤ اِخْوَانًا ۚ وَ كُنْتُمْ عَلٰى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَاَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا ؕ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ

আল্লাহর রজ্জুকে সমবেতভাবে দৃঢ়ভাবে ধারণ কর, পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না এবং তোমাদের প্রতি আল্লাহর নি'মাত স্মরণ কর, যখন তোমরা ছিলে পরস্পর শত্রু, তিনি তোমাদের অন্তরে প্রীতির সঞ্চার করলেন, ফলে তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহে পরস্পর ভাই ভাই হয়ে গেলে। তোমরা অগ্নি-গহ্বরের প্রান্তে ছিলে, অতঃপর আল্লাহ তোমাদেরকে তাথেকে রক্ষা করলেন। এভাবে আল্লাহ নিজের নিদর্শনাবলী তোমাদের কাছে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন যাতে তোমরা সঠিক পথ প্রাপ্ত হও।[২]

বাংলাদেশে বিভিন্ন পর্যায় ইসলামের পক্ষে, ইসলামী আইনের পক্ষে কাজ করা হচ্ছে। কেউ ব্যক্তি পর্যায়, কেউ দলগতভাবে ইসলামের পক্ষে কাজ করার চেষ্টা করছেন। বাংলাদেশে যারা ইসলামকে বিজয়ী আদর্শ হিসেবে দেখতে চান তাদের স্লোগান, লেখনী ও বক্তৃতা-বিবৃতিতে ঐক্যের দাবি করে আসছেন। কার্যত তারা বিভিন্ন দলে-উপদলে বিভক্ত। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইসলামী নেতৃবৃন্দ ক্ষুদ্র ও ব্যক্তি স্বার্থে নিজেদের মাঝে দূরত্ব সৃষ্টি করে রেখেছেন। এক নেতা অন্য নেতার বিরুদ্ধে, এক দল অন্য দলের বিরুদ্ধে বিষোদগার করে চলেছেন। ফলে তারা রাজনৈতিক অঙ্গনে কোন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারছেন না। তাদের এ অনৈক্য বাংলাদেশকে একটি আদর্শ রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলার পথে বড় অন্তরায়।[৩]

চ. রাজনৈতিক মতানৈক্য

বাংলাদেশের রাজনীতিতে প্রদানত দুটি স্রোতধারা বিদ্যমান। বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে অনেক নাম লক্ষ্য করা গেলেও তারা মূলত দুটি প্রধান মেরুতে অবস্থিত।

---

[১] ড. মুহাম্মদ ছাইদুল হক, *ইসলামী বিচারব্যবস্থা : প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ*, (অপ্রকাশিত থিসিস), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, খ্রি. ২০০৭, পৃ. ৩৭৬
[২] আল কুরআন, ৪ : ১০৩
[৩] ড. মুহাম্মদ ছাইদুল হক, *প্রাগুক্ত*

ক. একটি ধারা সমাজ ও রাষ্ট্র জীবনের সকল ধারায় ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠার ঘোর বিরোধী

খ. অপরটি ইসলামী আইন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রচেষ্টারত।

এ দেশে ইসলামী আইন সুপ্রতিষ্ঠা ও বাস্তবায়নের পথে এই বিপরীতমুখী রাজনৈতিক ধারা একটি বড় বাধা। ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠা করতে চাইলে এর পক্ষের রাজনীতিবিদদের ইসলামী আইনের যৌক্তিকতা ভিন্ন মতালম্বীকে বোঝাতে হবে এর পক্ষে নিয়ে আসতে হবে।[১]

ছ. ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা

বাংলাদেশে অসংখ্য ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। প্রাথমিক পর্যায় থেকে শুরু করে উচ্চ শিক্ষাস্তর পর্যন্ত অসংখ্য মাদরাসা ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান করে চলেছে। ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রধানত কুরআন, হাদীস, ফিক্হ, ইসলামের ইতিহাস ইত্যাদি বিষয় পাঠদান করা হয়। আধুনিক রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থা নিয়ে ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাঠ্যসূচীতে খুব বেশি আলোচনা নেই। ফলে শিক্ষার্থীরা যুগের চাহিদা সম্পর্কে গভীর জ্ঞান অর্জন করতে পারছেন না। এ প্রেক্ষাপটে ইসলামী আইনকে কীভাবে সমাজে তুলে ধরলে মানুষ সহজেই তা বুঝতে পারবে এবং গ্রহণ করতে পারবে তা-ও তারা জানার সুযোগ পাচ্ছেন না।

জ. রাজনৈতিক কারণ

আমাদের দেশে রাজনীতিবিদদের কেউ কেউ ক্ষমতাকেন্দ্রিক রাজনীতি করে থাকেন। ক্ষমতা অধিষ্ঠিতা থাকা কিংবা ক্ষমতা লাভ করার প্রতিযোগিতায় তারা সর্বদা ব্যস্ত থাকেন। জনকল্যাণ কীভাবে সাধিত হবে, দেশের ও দেশের মানুষের উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি কোন পথে আসবে এ নিয়ে খুব কম রাজনৈতিকই চিন্তা করে থাকেন। ফলে ইসলামী আইন যে, জনকল্যাণমুখী আইন এ নিয়েও তাদের চিন্তা করার সুযোগ থাকে না। তাছাড়া, আমাদের দেশের রাজনৈতিক দলগুলো রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে বিদেশী দাতাদের মতামতকে অনেক বেশি প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে তাদের পরামর্শ অনেকক্ষেত্রেই ইসলামী আইন বিরোধী হয়ে থাকে।

বাংলাদেশ পৃথিবীর বৃহৎ মুসলিম অধ্যুষিত দেশগুলোর একটি। এ দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৯০ শতাংশ মানুষই ইসলাম ধর্মের অনুসারী। তা সত্ত্বেও এ দেশে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শরী'আ আইন অনুসরণ করা হচ্ছে না। এটা মূলতঃ ইসলামী পন্থীদের অনৈক্য, শরী'আ আইনকে জনগনের সামনে যথাযথ ভাবে উপস্থাপন করতে ব্যর্থ হওয়া ইত্যাদি কারণেই সম্ভব হচ্ছে না।

---

[১] ড. মো. মাসুদ আলম ও মোহাম্মদ মিজানুর রহমান, বাংলাদেশে ইসলামী আইন : সমস্যা ও সম্ভাবনা, *ইসলামী আইন ও বিচার পত্রিকা*, বর্ষ ৬, সংখ্যা, ২৪ অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১০, ঢাকা : পৃ. ১১৭

ইসলামী আইন বাস্তবায়নে করণীয়

বাংলাদেশে ইসলামী আইন বাস্তাবনের সম্ভাবনা অপার। এক্ষেত্রে প্রয়োজন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ। ইসলামী নেতৃবৃন্দকেই এগিয়ে আসতে হবে। বাংলাদেশে ইসলামী আইন বাস্তবায়নে করণীয় দিক নিয়ে নিম্নে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

ক. ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার পুনঃপ্রচলন

মহান আল্লাহ মানব জাতির কল্যাণ ও মুক্তির জন্য ইসলামকে জীবন বিধান হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা। ইসলামের সকল বিধানই মানুষের কল্যাণে আরোপিত হয়েছে। ইসলামী বিধিবিধান যতটুকু অনুসরণ করা হবে ঠিক ততটুক সাফল্যই লাভ করা যাবে। ইসলামের খণ্ডিত অনুসরণ কখনোই সামগ্রিক কল্যাণ আনতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়- যিনা, ব্যভিচারের হদ (শাস্তি) বাস্তবায়ন করার জন্য অবশ্যই এমন ইসলামী সমাজব্যবস্থা প্রয়োজন যেখানে লোকেরা হালালভাবে বিয়ে করার জন্য সহজ ব্যবস্থা বিদ্যমান থাকে এবং অবৈধ যৌনচারের পথ অবরুদ্ধ থাকে। একদিকে প্রাপ্তবয়স্ক হলে বিয়ের ব্যবস্থা করা, মহরের পরিমাণ কমানো, বাসস্থান ও আসবাবপত্র সহজলভ্য করা, বিয়ের অনুষ্ঠানের খরচ কমানো ও অন্যদিকে সমাজকে যৌন উত্তেজক কর্মকাণ্ডে তথা অশ্লীলতা, বেহায়াপনা, নগ্নতা, পর্দাহীনতা, অশ্লীল গল্প-নাটক, উপন্যাস, নাচ-গান, কুরুচীপূর্ণ শিল্প সাহিত্য হতে পূত-পবিত্র রাখা সম্ভব হলে তখনই ব্যভিচারী নারী- পুরুষকে শাস্তিদান যথার্থ ও যুক্তিসঙ্গত হয় এবং বিধানদাতার এ শাস্তি ব্যবস্থাও পুরাপুরিভাবে সার্থক হয়।[১]

খ. ইসলামী মূল্যবোধ জাগ্রত করা

সমাজের সর্বস্তরে ইসলামী আইনের বাস্তব্য়নের জন্য সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে ইসলামী মূল্যবোধ জাগ্রত করা জরুরি। ছাত্র-শিক্ষক, আমলা-শ্রমিক, রাজনৈতিক-বুদ্ধিজীবী সর্বমহলেই ইসলামী চেতনা ছড়িয়ে দিতে হবে। বর্তমান সময়ে ইসলামী আইন দ্বারা কল্যাণ লাভ করতে হলে আমাদের এমন এক মুসলিম সমাজ তৈরি করতে হবে যারা শরী'আতের সুবিচারে বিশ্বাসী এবং পূর্ণবিশ্বাস ও সন্তুষ্টির সাথে শরী'আতের শাসন কামনা করে। আমাদেরকে এমন মুমিন বিচারক তৈরি করতে হবে যারা ইসলামী শরী'আতের পবিত্রতা ও মর্যাদায় বিশ্বাসী। এমন ঈমানদার আইন প্রয়োগকারী সংস্থা- তৈরি করতে হবে যারা বিপদে পরে বা উপয়ান্তর না দেখে বরং নিজ উৎসাহেই ইসলামী শরী'আতের হিফাজত ও বাস্তবায়ন করবে এবং সমাজে ইসলামী মূল্যবোধ সৃষ্টি হবে। এমন একটি ইসলামী সম্প্রদায় সৃষ্টি করতে হবে, যারা ইসলামী শরী'আত বাস্তবায়নের দায়িত্ব নিজের স্কন্ধে তুলে নেবে। বর্তমান সমাজের যে মূল্যবোধ, চিন্তা-চেতনা, আচার-আচরণ, আদব-কায়দা ও সংগঠন বিরাজমান–এ সবই ঔপনিবেশিকবাদের সৃষ্টি। উপনিবেশিক আমলে নানান কলা-কৌশলের মাধ্যমে আমাদের মৌলিক ইসলামী মূল্যবোধ, জীবনযাপন সবকিছু সমাজ থেকে সুকৌশলে উচ্ছেদ করে দিয়েছে। সুতরাং চিন্তাগত ও মানসিক বিপ্লব সাধন ছাড়া আমাদের এ সমাজ কিছুতেই মুক্তি লাভ করতে পারবে না।[২]

[১] আলামা ইউসুফ আল কারযাভী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭৪-১৭৫
[২] মুহাম্মদ ছালাহ উদ্দিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩১

গ. জনমত তৈরি

শারী'আ আইন বাস্তবায়নের জন্য জনমত তৈরি অন্যতম প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য। উম্মাহর আলেম-ওলামা, তাবলীগে দ্বীনের দায়িত্বে নিয়োজিত মুবাল্লিগ, মসজিদের ইমাম, শিক্ষাবিদ, গবেষক, সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে দ্বীনের কার্যক্রমে নিয়োজিত ব্যক্তিদের শরী'আ আইনের বিষয়ে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা আবশ্যক। শরী'আ আইনের বৈশিষ্ট্য ও বিশেষত্ব, ইতিহাস, বাস্তবতা, প্রয়োজনীয়তা এবং এ আইনের সফলতার বিষয়ে জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। এ প্রসঙ্গে আল কুরআনের নিম্নের আয়াতটি অধিক যুক্তিযুক্ত- "অতঃপর তাদের প্রতিটি দল থেকে কিছু লোক কেন বের হয় না, যাতে তারা দ্বীনের গভীর জ্ঞান আহরণ করতে পারে এবং আপন সম্প্রদায় যখন তাদের নিকট প্রত্যাবর্তন করবে, তখন তাদেরকে সতর্ক করতে পারে, যাতে তারা (গুনাহ থেকে) বেঁচে থাকে।"[১]

ঘ. শিক্ষাব্যবস্থায় সমন্বয় সাধন

শিক্ষা জাতির দেরুদণ্ড। শিক্ষাই মানুষকে ন্যায়-অন্যায় ভালো-মন্দের পথে পরিচালিত করে। ইসলামী আইনকে সম্ভাবনাময় পর্যায়ে নিয়ে আসতে সাধারণ আইন শিক্ষার সাথেসাথে ইসলামী আইন শিক্ষার ব্যবস্থা করা অপরিহার্য। এজন্য যেমন প্রয়োজন ইসলামী আইন বিশেষজ্ঞ শিক্ষকের, তদ্রূপ প্রয়োজন একটি আইন একাডেমি প্রতিষ্ঠা করা। এ একাডেমিই আমাদের পূর্ব পুরুষদের কর্মপদ্ধতি পর্যালোচনা করবে এবং ইসলামী আইনের যেসব গ্রন্থ রয়েছে তা শুধু মাতৃভাষায় অনুবাদই করবে না, ইসলামী আইন ও বিচার ব্যবস্থা জানার জন্য বর্তমান যুগ চাহিদার দাবি অনুসারে তা নতুনভাবে ঢেলে সাজাবে। শরী'আ আইনের মৌলিক গ্রন্থগুলোর বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ বিশেষ করে ইংরেজি ভাষায় অনুদিত হওয়া আবশ্যক। এ পদ্ধতিতেই পূর্ণ সফলতা অর্জন করা সম্ভব।[২]

উল্লেখ্য, ইসলামী আইনের গ্রন্থসমূহ প্রধানত আরবী ভাষায় রচিত। আমাদের দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় সাধারণত আরবী ভাষায় অনভিজ্ঞ। এই অনভিজ্ঞতার কারণে কিছু শোনা কথার উপর ভিত্তি করে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত অনেকেই প্রায়ই ইসলামী আইন ও বিধান সম্পর্কে নানা ধরনের ভুল ধারণা পোষণ করেন এবং তা প্রচার করেন। প্রকৃত বিষয় হচ্ছে, যারা এরকম অর্থহীন চিন্তাধারা পোষণ করেন, তারা নিজেদের অসার চিন্তা ও বিবেকের দৈন্য-দশারই প্রকাশ ঘটান। যদি তারা তাদের পূর্ব পুরুষদের ইসলামী আইন শাস্ত্রের (ফিকহ শাস্ত্র) গুরুত্বপূর্ণ অবদান সম্পর্কে গবেষণা করতেন তাহলে দেখতে পেতেন গত দেড় হাজার বছরে আমাদের পূর্ব-পুরুষগণ অর্থহীন বিতর্কে জড়িয়ে সময় নষ্ট করেননি; বরং তারা পরবর্তী বংশধরদের জন্য রেখে গেছেন এক মহান উত্তরাধিকার।[৩]

ঙ. অতীত ঐতিহ্য অনুসরণ

পৃথিবীত সর্বাধিক স্থায়ীত্ব প্রাপ্ত আইন হচ্ছে ইসলামী আইন। প্রায় তের শতাব্দী পৃথিবীর এক বিশাল অংশ মরোক্কো থেকে ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত মুসলমানগণ যে কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তার সবকটি আইনই ছিল ইসলামী আইন কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। তারাই এ রাষ্ট্রের জজ-ম্যাজিস্ট্রেট ও চিফ জাস্টিস নিযুক্ত হতেন। তাদের রায় দ্বারা বিচার বিবরণীর

---

[১] আল কুরআন, ৯ : ১২২

[২] মুহাম্মদ ছালাহ উদ্দিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৩

[৩] ড. মো. মাসুদ আলম ও মোহাম্মদ মিজানুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৮- ১১৯

বিপুল সম্পদ তৈরি হতো এবং তারা আইনের প্রায় সব বিভাগ নিয়েই আলোচনা করেছেন। এজন্য প্রয়োজন আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের একটি দলকে বাছাইপূর্বক এ কাজে নিয়োজিত করা, যারা বর্তমান যুগের আইনের গ্রন্থরাজির পাশাপাশি সেসব মূল্যবান বিষয়কেও সাজিয়ে দেবেন। বিশেষত এমন কতিপয় আইন ও বিচার সম্পর্কীয় গ্রন্থ আছে যার বঙ্গানুবাদ হওয়া একান্ত জরুরি।[১]

চ. জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা ও গবেষণায় গুরুত্বারোপ করা

ইসলামে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা ও গবেষণার ব্যাপারে যথেষ্ট গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। শিক্ষা ও জ্ঞানার্জনের জন্য পঠন-পাঠন অন্যতম মাধ্যম। আমাদের প্রিয় নবী (সা.) এর প্রতি ওহির প্রথম নির্দেশ ছিল, 'পড়ো, তোমার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন, সৃষ্টি করেছেন "আলাক" থেকে। পড়ো, তোমার রব মহা সম্মানিত, যিনি শিক্ষাদান করেছেন লেখনীর মাধ্যমে। শিখিয়েছেন মানুষকে, যা তারা জানত না।'[২]

নবী-রাসুলদের দাওয়াতি কাজের মূল ভিত্তি ছিল জ্ঞানের আলো দিয়ে মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে আসা। হজরত ইব্রাহিম (আ.) দোয়া করেছিলেনঃ 'হে আমাদের প্রভু! আপনি তাদের মাঝে এমন রাসুল পাঠান, যিনি তাদের সমীপে আপনার আয়াত উপস্থাপন করবে, কিতাব ও হেকমত শিক্ষা দেবে এবং তাদের পবিত্র করবে। নিশ্চয়ই আপনি পরাক্রমশালী স্নেহশীল ও কৌশলী।'[৩]

ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠা করতে হলে এর সুফল জনসমাজে তুলে ধরতে হবে। বর্তমান বিশ্বে প্রচলিত অন্যান্য মতবাদসমূহের সাথে এর পার্থক্য এর শ্রেষ্ঠত্ব মানুষকে জানাতে হবে। প্রচলিত মতবাদসমূহের অসারতা সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করে গড়ে তুলতে হবে। আর এজন্যই প্রয়োজন জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা ও গবেষণায় মনোনিবেশ করা।

ছ. ইসলামী শিক্ষার বিকাশ সাধন

ইসলামী শিক্ষা সম্পর্কে দার্শনিক ও ইসলামী চিন্তাবিদগণ বিভিন্ন সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। মুসলিম দার্শনিক আইনবিদ ও শিক্ষাবিদ শাহ ওয়ালীউল্লাহ (রহ.) (১৭০৩-১৭৬৩) এর মতে, "ইসলামীশিক্ষার সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল এ শিক্ষা মানুষকে আত্মপ্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে সত্যিকারের উন্নতির পথে নিয়ে যায়, যা তার সামঞ্জস্যপূর্ণ উন্নতির দ্বারা এবং তার সামাজিক বৈশিষ্ট্য 'আদালত' এর পূর্ণতার মাধ্যমে প্রমাণিত হয়। আর ইসলামী শরীয়তের ভাষায় আদালত হল সর্ববিষয়ে ন্যায্যতা, মহানুভবতা, ন্যায়-নিষ্ঠা, মহত্ব, নৈতিক পবিত্রতা এবং আল্লাহ সম্পর্কে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের সমন্বিত বিকাশ।[৪]

মিশরীয় দার্শনিক Professor Muhammad Qutb তার "The Concept of Islamic Education" প্রবন্ধে বলেছেন, "শিক্ষার ক্ষেত্রে ইসলামের কাজ হলো পরিপূর্ণ মানবসত্তাকে লালন করা, গড়ে তোলা এমন একটি

---

[১] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৯

[২] আল কুরআন, ৯৬ : ১-৫

[৩] আল কুরআন, ২: ১২৯

[৪] ড. আবদুল ওয়াহিদ, *বাংলাদেশ ইসলামী শিক্ষা প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি*, ঢাকা : ইসলামী সাংস্কৃতিক পরিষদ, প্রথম প্রকাশ, ২০০১, পৃ. ১৪-১৫

লালন কর্মসূচী যা মানুষের দেহ, তার বুদ্ধিবৃত্তি এবং আত্মা, তার বস্তুগত ও আত্মিক জীবন এবং পার্থিব জীবনের প্রতিটি কার্যকলাপের একটিকেও পরিত্যাগ করে না আর কোন একটির প্রতি অবহেলাও প্রদর্শন করে না।"[১]

কুরআন ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে প্রত্যেক মুসলমানকেই জ্ঞান অর্জন করতে হবে। এ মর্মে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন- অর্থাৎ "জ্ঞানান্বেষণ করা প্রতিটি মুসলিমের উপর বাধ্যতামূলক এখানে শিক্ষা দ্বারা ইসলামী শিক্ষাকে বুঝানো হয়েছে"।[২]

ইসলামী শিক্ষার সংজ্ঞায় আরো বলা হয়েছে, ইসলাম সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞান লাভ করার শিক্ষাই হল ইসলামী শিক্ষা অর্থাৎ- যে জ্ঞান দ্বারা সত্য-মিথ্যা, হালাল-হারাম, ন্যায়-অন্যায়, ভাল-মন্দ ইত্যাদি সম্পর্কে জানা যায় এবং যে শিক্ষালব্ধ জ্ঞানের মাধ্যমে মানুষ তার স্বীয় আত্মাকে ও মহান স্রষ্টা আল্লাহকে জানতে ও চিনতে পারে তাই হলো ইসলামী শিক্ষা।"[৩]

আ.ই.ম নেছার উদ্দিন তাঁর "*ইসলামী শিক্ষার প্রসার ও উন্নয়ন: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ*" বইয়ে লিখেছেন, "ইসলাম শিক্ষা বলতে মূলত তাওহীদভিত্তিক শিক্ষাকে বুঝায়। এ শিক্ষার মূল উৎস দুটি আল কুর'আন ও হাদীস। এ দুটি নীতি অনুসরণের মাধ্যমে যে শিক্ষাব্যবস্থা প্রণীত হয়েছে এরই নাম ইসলামী শিক্ষা।[৪]

ড. সিকান্দার আলী ইবরাহিমী ইসলামী শিক্ষার পরিচয় ও স্বরূপ সম্পর্কে বলেছেন, Islamic education, in the true sense of term, is a system of education which enables a man to know the respects of Islam and perform all activities of his life in conformity with the Quran and Sunnah; as such he can mould his life in accordance with doctrines and injunctions of Islam. And thus peace and prosperity may prevail in his own life as well as in the whole world. অর্থ, বাস্তবিক অর্থে ইসলামী শিক্ষা এমন এক শিক্ষাব্যবস্থা; যা মানুষকে ইসলামের আদর্শকে জানতে এবং সুনিশ্চিতভাবে কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে জীবনের সকল কর্মকাণ্ড সম্পাদনে যোগ্য করে তোলে। ফলে সে নিজের জীবনকে জানতে এবং ইসলামের মতাদর্শ ও নির্দেশনা অনুযায়ী সাজাতে পারে। এর ফলে তার জীবনে ও গোটা পৃথিবীতে শান্তি ও সমৃদ্ধি বিরাজ করে।[৫]

ইসলামী আইন মূলত ইসলামী শিক্ষার অন্তর্ভূক্ত একটি বিষয়। এ বিষয়ে গভীর জ্ঞান অর্জনের জন্য শিক্ষার সর্বস্তরে ইসলামী শিক্ষার প্রচলন অত্যন্ত জরুরি। এর পাশাপাশি শরী'আ আইনের যৌক্তিকতা, প্রয়োজনীয়তা, জনগনের কাছে তুলে ধরে জনসচেতনতা সৃষ্টি করার মাধ্যেম শরী'আ আইন প্রচলনের ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে। এ জন্য প্রয়োজন অধিক গবেষণা ও শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কর।

---

[১] Professor Muhaminad Qutb, *The Concept of Islamic Education*

[২] আবূ 'আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন য়াযীদ ইবন মাজা আল-কাযবীনী, *আসসুনাল লিবন,* বাব নং- ১৭ মাজা দেওবন্দ ও আল-মাকতাবাতুর রহীমিয়া, ১৩৮৫ হি.

[৩] নূরুল ইসলাম, *ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা,* মাসিক পৃথিবী, সংখ্যা : ৩, ডিসেম্বর, ২০০০, পৃ. ৪১

[৪] ড. আ.ই.ম. নেছার উদ্দিন, *ইসলামী শিক্ষার প্রসার ও উন্নয়ন: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ*, (ঢাকা : ই.ফা.বা, প্রথম প্রকাশ, ২০০৫) পৃ. ১৩

[৫] Dr. Sekander Ali Ibrahimi, *Reports on Islamic Education and Madrasah Education in Bengal,* Dhaka: Islamic Foundation Bangladesh, 1984, Page-xxx

নবম অধ্যায়

ইসলামের হুদুদ আইনের সাথে ইয়াহুদী, খ্রিস্ট, হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মীয় শাস্তি আইনের তুলনামূলক পর্যালোচনা

ইসলামের হুদুদ আইনের সাথে ইয়াহুদী, খ্রিস্ট, হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মীয় শাস্তি আইনের তুলনামূলক পর্যালোচনা

পৃথিবীতে মানুষ স্রষ্টার প্রতিনিধিত্ব করছে। পৃথিবীর স্রষ্টা স্বয়ং আল্লাহ মানুষের উপর তাঁর প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাপনের লক্ষ্যে গোটা সৃষ্টি জগৎকে মানুষের অনুগত করে দেওয়া হয়েছে। এর পাশাপাশি মানুষকে দেওয়া হয়েছে প্রজ্ঞা, বিবেক, বুদ্ধিমত্তা। মানুষের কর্তব্য এসবের সৎ ব্যবহার করে গোটা সৃষ্টি জগতে শান্তি স্থাপন করা। বাস্তবতা হচ্ছে মানুষের স্বেচ্ছাচারিতা, স্বার্থপরতা ইত্যাদি কারণে পৃথিবী আজ অশান্ত। অসহায়-দুর্বল তার অধিকার বুঝে পাওয়ার পরিবর্তে বিশ্বব্যপীই নির্যাতিত নিপীড়িত হচ্ছে। মানুষের এই অনাকাঙ্ক্ষিত অন্যায় আচরণ নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষ্যে প্রতিটি ধর্মেই মানুষের জন্য কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে, যা আইন হিসেবে আমাদের নিকট পরিচিত। ইতোপূর্বে আমরা প্রচলিত প্রধান পাঁচটি ধর্মের পরিচয় এবং নির্দিষ্ট কিছু অপরাধ সম্পর্কে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি আলোচনা করেছি। এ অধ্যায় সেসব আইন সম্পর্কে তুলনামূলক আলোচনা করা হবে।

মদ্যপান

ইয়াহুদী ধর্ম

ইয়াহুদী ধর্ম মতে মাদক হচ্ছে অশুচি অর্থাৎ অপবিত্র খাবারসমূহের একটি। এই অপবিত্র বস্তু গ্রহণ করা কোনো মানুষের পক্ষে কখনোই উচিত নয়। ইয়াহুদী ধর্মে আরও বলা হয়েছে, কেউ যদি ধর্মীয় পবিত্র স্থানে এসব অপবিত্র বস্তু গ্রহণ করা তাহলে সে অবশ্যই মারা পড়বে। এ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে,

Who has woe? Who has sorrow? Who has strife? Who has complaining? Who has wounds without cause? Who has redness of eyes? Those who tarry long over wine; those who go to try mixed wine. Do not look at wine when it is red, when it sparkles in the cup and goes down smoothly. In the end it bites like a serpent and stings like an adder. Your eyes will see strange things, and your heart utter perverse things. ...[১]

অর্থাৎ, যারা অতিরিক্ত দ্রাক্ষারস পান করে এবং জোরালো পানীয় গ্রহণ করে তাদের পক্ষে খুব খারাপ হবে। তারা যখন তখন মারদাঙ্গা এবং বিবাদে জড়িয়ে পড়ে; তাদের চোখ লাল হয়ে ওঠে, যেখানে সেখানে হোঁচট খায় এবং নিজেদের আঘাত করে। তারা এই সমস্যাগুলোকে এড়াতে পারে না! তারাই যারা সুরাপানে আসক্ত, যারা মিশ্রিত সুরা ভর্তি বাটির দিকে যায়। সুতরাং দ্রাক্ষারসের ব্যাপারে সতর্ক থেকো। লাল দ্রাক্ষারস হয়ত দেখতে প্রলুব্ধকর; সেটা পেয়ালার মধ্যে ঝকমক করে। তুমি যখন সেটা পান কর তখন তা সুন্দর ভাবে গলা দিয়ে নীচে নামে। কিন্তু শেষে তা সাপের মতো ছোবল দেয়। দ্রাক্ষারস পান করলে তুমি চোখে অদ্ভুত সব জিনিস দেখবে। তোমার মস্তিষ্ক বিভ্রান্ত হয়ে পড়বে। যখন তুমি শুয়ে পড়বে তখন তোমার মনে হবে যেন তুমি উত্তাল সমুদ্রের ওপর শুয়ে আছো। মনে হবে

[১] Proverbs 23 : 29-35

জাহাজের ওপর শুয়ে রয়েছো। তুমি বলবে, তারা আমাকে আঘাত করেছে কিন্তু আমি অনুভব করিনি। তারা আমাকে মেরেছে কিন্তু আমি তা মনে রাখিনি। এখন আর আমি জেগে উঠতে পারব না। আমি আরো একটি পানীয় চাই।

ইয়াহুদী ধর্মে মাদকসেবীর ব্যপারে অত্যন্ত কঠোরতা অবলম্বন করা হয়েছে। মাদক গ্রহণকারী যে ব্যক্তিই হোক না কেন তাকে অবশ্যই শাস্তি ভোগ করতে হবে। এমনকি যাজকগণ অর্থাৎ ধর্মীয় গুরুগণ মদ পান করলে সে-ও শাস্তি থেকে রেহাই পাবে না।

ইয়াহুদী ধর্মে ক্ষেত্রবিশেষ মাদক গ্রহণের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। সমাজের উচ্চবিত্ত ও ধনী শ্রেণির মানুষকে মাদক গ্রহণে নিষেধ করা হলেও দরিদ্র শ্রেণিকে ইয়াহুদী ধর্মে অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। এর পিছনে যুক্তি হিসেবে বলা হয়েছে, মাদক মানুষকে অতীত ভুলিয়ে দেয়। মাদক সেবনের ফলে দরিদ্ররা তাদের দুঃখ-কষ্ট ভুলে থাকতে পারে।

খ্রিস্টধর্ম

খ্রিস্টধর্মে মাদক গ্রহণের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। ঈশ্বরের রাজ্যে অধার্মিক লোকদের কোন স্থান নেই। ব্যভিচার, প্রতিমা পূজা, লোভ-লালসা, সমকাম, পরনিন্দা ইত্যাদি অধার্মিক লোকদের কাজ। মদপানও অধর্ম বা ধর্ম বিরোধী কাজ, যা অধার্মিক লোকেরাই করে থাকে। মাদক সেবন করে অধর্ম চর্চা করার কারণে ঈশ্বরের রাজ্যে মাদক সেবনকারীর কোনো স্থান নেই।

বাইবেলে বেশ কিছু বিষয়কে জঘন্য পাপ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। যেমন- ব্যভিচার, অশুচিতা, স্বেচ্ছাচারিতা, প্রতিমা পূজা, ডাইনি বিদ্যা, ঘৃণা, স্বার্থপরতা, হিংসা, ক্রোধ, নিজেদের মধ্যে বিতর্ক, মতভেদ, দলাদলি, ঈর্ষা ইত্যাদি। খ্রিস্টধর্ম ঘোষিত জঘন্য পাপসমূহের মধ্যে মাদক গ্রহণ এবং মাতলামি করাও অন্যতম বড় একটি পাপ।

হিন্দু ধর্ম

মদপান সম্পর্কে হিন্দু ধর্মীয় গ্রন্থে দুই ধরনের বক্তব্য পওয়া যায়। যেমন- মনুস্মৃতি গ্রন্থে সব ধরনের গোশত ভক্ষণের অনুমতি দেওয়া হয়েছে, মদপানের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। বিষ্ণু স্মৃতি গ্রন্থে ব্রাহ্মণদেরকে মদপানের অনুমতি দেওয়া হয়নি। তবে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের অন্য তিনটি জাতকে মদপানের করার অনুমতি প্রদান করা হয়েছে।

হিন্দু ধর্মের অধিকাংশ গ্রন্থেই মাদক সেবন নিষিদ্ধ না করা হলেও এর নানান ক্ষতিকর দিক তুলে ধরা হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে- মদপানকারীরা বুদ্ধি হারিয়ে ফেলে, অসংলগ্ন কথা বলে, উলঙ্গ হয়ে একে অপরের সাথে লড়াই করে ইত্যাদি।

বৌদ্ধ ধর্ম

বৌদ্ধ ধর্মে মাদক গ্রহণ বৈধ নয়। দশশীলের মধ্যে সে প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হয়েছে। দশশীলে বলা হয়েছে, 'সুরামেরয-মজ্জ-পমাদট্‌ঠানা বেরমণী সিক্‌খাপদং সমাদিযামি'। অর্থাৎ, সুরা-মাদক জাতীয় দ্রব্য সেবন হতে বিরত থাকার শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।

ইসলাম ধর্ম

আল্লাহ্ তায়ালা কুরআন মাজীদের মধ্যে মদ্যপান তথা যে কোন নেশাকর দ্রব্য গ্রহণ অথবা সেবনকে শয়তানের কাজ বলে আখ্যায়িত করেছেন। শয়তান চায় এরই মাধ্যমে মানুষে মানুষে শত্রুতা, হিংসা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করতে এবং আল্লাহ্'র স্মরণ ও নামায থেকে মানুষকে গাফিল করতে।

আল্লাহ্ তায়ালা বলেন:

يَآ أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِنَّمَا الْـخَمْرُ وَالْـمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ، فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ إِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ فِيْ الْـخَمْرِ وَالْـمَيْسِرِ، وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، فَهَلْ أَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ

"হে ঈমানদারগণ! নিশ্চয়ই মদ (নেশাকর দ্রব্য), জুয়া, মূর্তি ও লটারীর তীর এ সব নাপাক ও গর্হিত বিষয়। শয়তানের কাজও বটে। সুতরাং এগুলো থেকে তোমরা সম্পূর্ণরূপে দূরে থাকো। তা হলেই তো তোমরা সফলকাম হতে পারবে। শয়তান তো এটিই চায় যে, মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের পরস্পরের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি হোক এবং আল্লাহ্ তায়ালার স্মরণ ও নামায থেকে তোমরা বিরত থাকো। সুতরাং এখনো কি তোমরা এগুলো থেকে বিরত থাকবে না?"[২]

মদপানের শাস্তির ওয়াজিব হওয়ার বিষয়ে প্রসিদ্ধ ইমামগণ একমত। তবে শাস্তির পরিমাণ নিয়ে তাদের মধ্যে মত পার্থক্য রয়েছে। ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালেকের মতে ৮০টি বেত্রাঘাত। ইমাম শাফেয়ীর মতে ৪০টি বেত্রাঘাত। রাসূল (সা.) মদপানকারীকে ৪০টি, আবু বকর (রা.) ৪০টি উমর (রা.) ৮০টি বেত্রাঘাত করেছেন।

মাদকের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে পৃথিবীর প্রায় সকল ধর্মই একমত। আমাদের আলোচিত প্রতিটি ধর্মেই মাদককে অপবিত্র বলে ঘোষণা করা হয়েছে। আধুনিক চিকাৎসা শাস্ত্রও মাদককে স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হিসেবে ঘোষণা দিয়েছে। বর্তমান পৃথিবীর অনেক দেশেই মাদক নিষিদ্ধ এবং মাদক সেবন, মাদক ব্যবসা ইত্যাদি শাস্তিযোগ্য অপরাধ। বাংলাদেশেও মাদক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের জন্য বিভিন্ন মেয়াদে শাস্তির কথা বলা হয়েছে।

ইসলাম ধর্মে মদপানকারীরর জন্য সুনির্দিষ্ট শাস্তির কথা বলা হলেও অন্যান্য ধর্মে মদপানকারীর জন্য শাস্তির বিষয়ে উল্লখযোগ্য কোনো বর্ণনা পাওয়া যায় না। এমনকি ইয়াহুদী ধর্মে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য মাদক গ্রহণের অনুমতিও প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া হিন্দু ধর্মেও মাদকসেবনকে স্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ করা হয়নি। মাদকের ক্ষতি বিবেচনায় সকলের জন্যই সমভাবে মাদক নিষিদ্ধ হওয়া এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে স্বীকৃত হওয়াই যৌক্তিক।

ব্যভিচার

ইয়াহুদী ধর্ম

বাইবেলে ব্যভিচারকে অত্যন্ত লজ্জাজনক অপরাধ হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রত্যেক মানুষকে এ অপরাধ থেকে বিরত থাকতে বাইবেলে কঠোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ইয়াহুদী ধর্মে ব্যভিচার একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ। ইয়াহুদী ধর্মে মারাত্মক অপরাধের জন্য সর্বোচ্চ শাস্তি নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে মৃত্যুদণ্ড। বাইবেলের বিধান হচ্ছে, বিবাহিত ব্যভিচারকারীকে রজম অর্থাৎ পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করা হবে। অবিবাহিত ব্যক্তি যৌনাচারে লিপ্ত হলে তাদেরকেও মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে। এ অপরাধে লিপ্ত অপরাধীর শাস্তি কার্যকর করা হবে নগরের দ্বারে সকলের সামনে নিয়ে

[২] আল কুরআন, ৫ : ৯০-৯১

এসে। তাদের হত্যা করা হবে পাথর নিক্ষেপ করে। বাইবেলে ব্যভিচারের সর্বোচ্চ শাস্তি প্রাণদণ্ড ঘোষণা করা হয়েছে। বর্ণিত হয়েছে,

The LORD spake unto Moses, saying, Again, thou shalt say to the children of Israel, Whosoever he be of the children of Israel, or of the strangers that sojourn in Israel, that giveth any of his seed unto Molech; he shall surely be put to death: the people of the land shall stone him with stones. And I will set my face against that man, and will cut him off from among his people; because he hath given of his seed unto Molech, to defile my sanctuary, and to profane my holy name. And if the people of the land do any ways hide their eyes from the man, when he giveth of his seed unto Molech, and kill him not: Then I will set my face against that man, and against his family, and will cut him off, and all that go a whoring after him, to commit whoredom with Molech, from among their people. And the soul that turneth after such as have familiar spirits, and after wizards, to go a whoring after them, I will even set my face against that soul, and will cut him off from among his people. Sanctify yourselves therefore, and be ye holy: for I am the LORD your God. And ye shall keep my statutes, and do them: I am the LORD which sanctify you. For every one that curseth his father or his mother shall be surely put to death: he hath cursed his father or his mother; his blood shall be upon him. And the man that committeth adultery with another man's wife, even he that committeth adultery with his neighbour's wife, the adulterer and the adulteress shall surely be put to death.[৩]

অর্থাৎ, প্রভূ মোশিকে বললেন, তুমি অবশ্যই ইস্রায়েলের লোকদের আরও এই বিষয়গুলি বলো: তোমাদের দেশের কোন মানুষ যদি মোলকের মূর্ত্তির সামনে তার শিশুদের মধ্যে একটিকে উত্সর্গ করে, তবে সেই মানুষটির অবশ্যই প্রাণদণ্ড হবে। যদি সেই ব্যক্তি ইস্রায়েলের নাগরিক হয় বা ইস্রায়েলে বাস করা একজন বিদেশী হয় তাতে কিছু ইস্রায়েলে আসে না। তোমরা অবশ্যই সেই ব্যক্তিকে পাথর ছুঁড়ে হত্যা করবে। আমি সেই ব্যক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াব এবং তাকে তার লোকদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করব, কারণ সে তার শিশুকে মোলকের উদ্দেশ্যে দিয়েছে। সে আমার পবিত্র নামকে শ্রদ্ধা করেনি এবং আমার পবিত্র স্থানকে অশুচি করেছে। কিন্তু সাধারণ মানুষ সেই ব্যক্তিকে উপেক্ষা করে এবং যে তার শিশুদের মোলককে দিয়েছে তাকে হত্যা না করে, তাহলে আমি সেই ব্যক্তি এবং তার পরিবারের বিরোধিতা এবং তাকে তার লোকদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করব। ইস্রায়েলেরা সেই ব্যক্তিকে অনুসরণ করে মোলকের পিছনে ইস্রায়েলে আমি তাদেরও বিচ্ছিন্ন করব। যদি কোন ব্যক্তি ভুতুড়িয়া এবং মায়াবীদের কাছে উপদেশের জন্য

[৩] Leviticus 20:1-10

ইস্রায়েলে আমি তার বিরোধী হবো। সেই ব্যক্তি আমার প্রতি অবিশ্বাসী, তাই আমি তাকে তার লোকদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করব। তোমরা পৃথক হও! নিজেদের পবিত্র করো। কারন আমি পবিত্র! আমিই প্রভু তোমাদের ঈশ্বর! আমার বিধিগুলি স্মরণে রাখো এবং মেনে চলো। আমি প্রভু এবং আমিই সেই, যিনি তোমাদের পবিত্র করেন। যদি কোনো মানুষ তার পিতা কিম্বা মাতাকে অভিশাপ দেয়, তার প্রাণদণ্ড হবে। পিতামাতাকে অভিশাপ দিয়েছে বলে সে তার নিজের মৃত্যুর জন্য দায়ী! যদি কোন পুরুষের তার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সঙ্গে যৌন সম্পর্ক থাকে, তাহলে সেই পুরুষ এবং মহিলা দুজনেই ব্যভিচারের দোষে দোষী হবে। সেই পুরুষ এবং মহিলা দুজনের অবশ্যই যেন প্রাণদণ্ড হয়।

মুহরিম অর্থাৎ যাদেরকে বিয়ে করা নিষিদ্ধ তাদের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত না হতে বিশেষ গুরুত্বের সাথে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কেউ এ অপরাধে লিপ্ত হলে তার শাস্তিও মৃত্যুদণ্ড। মুহরিম নয় কিন্তু আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ এরূপ ব্যক্তির সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়াও মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হওয়ার কারণ। ইয়াহুদী ধর্মে সমকামিতার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। কোনো মানুষ চাই সে নারী বা নর হোক পশুর সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত হলে তাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করাই ইয়াহুদী আইনের বিধান।

কোনো রমনী ধর্ষণের শিকার হলে তার কোনো শাস্তি হবে না। ধর্ষিতা রমনী কারো বাগদত্তা হলে ধর্ষণকারীকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে। আর ধর্ষিতা রমনী কারো বাগদত্তা না হলো ধর্ষনকারী ধর্ষিতাকে বিয়ে করবে এবং ধর্ষিতার বাবাকে ২০ আউন্স স্বর্ণ জরিমানা দিবে। ইয়াহুদী ধর্মে মাসিক চলাকালীন সময় স্বামী-স্ত্রীর যৌন মিলন নিষিদ্ধ। এ নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে কোনো দম্পতি মিলনে লিপ্ত হলে তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যাবে।

খ্রিস্টধর্ম

খ্রিস্টধর্মে ব্যভিচার হচ্ছে অপবিত্রতা। ব্যভিচার থেকে বিরত থাকার নির্দেশ স্বয়ং ঈশ্বর প্রদান করেছেন। এ ধরণের অপবিত্রতা থেকে বেঁচে থেকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পবিত্র জীবন যাপনের নির্দেশ খ্রিস্টধর্মে দেওয়া হয়েছে। খ্রিস্টধর্ম ঘোষিত বড় পাপসমূহের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে ব্যভিচার। খ্রিস্টধর্মে মন্দ বিষয় হিসেবে স্বীকৃত বিষয় সমূহের একটি ব্যভিচার। ব্যভিচারকারীর জন্য মৃত্যু পরবর্তীকালীন জীবনে অপেক্ষা করছে ভয়াবহ শাস্তি। ব্যভিচার নরকে যাওয়ার কারণসমূহের মধ্যে অন্যতম প্রধান একটি কারণ।

হিন্দু ধর্ম

ধর্ষণ-ব্যভিচার হিন্দু ধর্ম ঘোষিত বড় পাপসমূহের মধ্যে অন্যতম। যেসব অপরাধের কারণে মানুষকে নরকে যেতে হবে তার মধ্যে ব্যভিচার অন্যতম। Srimad Bhagavata-এর বর্ণনানুযায়ী যে ব্যক্তি অগম্যা স্ত্রীতে এবং যে স্ত্রী অগম্য পুরুষে অভিগমন করে অর্থাৎ যেসব নারী বা পুরুষ ব্যভিচারে লিপ্ত হয় তাদেরকে 'Taptasurmi' নামক নরকে শাস্তি প্রদান করা হবে।

হিন্দু ধর্মে ধর্ষণ এক ধরণের ব্যভিচার। হিন্দু শাস্ত্রের পণ্ডিতগণের মতে, হিন্দু ধর্মগ্রন্থে ব্যভিচারের জন্য যে শাস্তি নির্ধারিত হয়েছে তা ধর্ষণের ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য হবে। তবে ব্যভিচারের ক্ষেত্রে অপরাধে লিপ্ত নর-নারী উভয়কেই শাস্তি ভোগ করতে হবে। আর ধর্ষণের ক্ষেত্রে যৌক্তিক কারণেই যে ব্যক্তি অপরকে ব্যভিচারে বাধ্য করবে শুধু সেই ব্যক্তিই শাস্তি ভোগ করবে। ব্রাহ্মণ নিজ বর্ণের কোনো সংরক্ষিত (Guarded) ব্রাহ্মণীর সাথে ব্রাহ্মণীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে

জোরপূর্বক ব্যভিচারে লিপ্ত হলে বিচারক তাকে ১০০০ পণ জরিমানা করবেন। কিন্তু ব্রাহ্মণীর সম্মতিতে ব্যভিচার সংঘটিত হলে তাকে ৫০০ পণ জরিমানা প্রদান করতে হবে।

ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য সমাজের কেউ সংরক্ষিত ব্রাহ্মণীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হলে বিচারক তাকে ব্রাহ্মণের সমপরিমাণ ১০০০ পণ জরিমানা করবেন। অতিরিক্ত শাস্তি হিসেবে বৈশ্যকে কারাদণ্ড প্রদান করা হবে এবং ক্ষত্রিয়কে চুল কামিয়ে নগ্ন মাথায় মূত্র ঢেলে অপমান করা হবে। সংরক্ষিত (Guarded) ব্রাহ্মণী সম্ভ্রান্ত কারো স্ত্রী হলে অপরাধীকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হবে এবং তার সমস্ত সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হবে।

ধর্ষণ-ব্যভিচারের ক্ষেত্রে সবচেয়ে কঠোর শাস্তি ভোগ করতে হয় শূদ্র গোত্রভূক্ত কেউ এ অপরাধে লিপ্ত হলে। উচ্চ বর্ণের কোনো রমণীর সাথে অপরাধে লিপ্ত হলে তার সব সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার পাশাপাশি যৌনাঙ্গ কর্তন করার আইন রয়েছে, ক্ষেত্রবিশেষ মৃত্যুদণ্ড প্রদানের বিধানও রাখা হয়েছে।

বৌদ্ধ ধর্ম

বৌদ্ধ ধর্ম তার অনুসারীদের ব্যভিচারে লিপ্ত না হওয়ার অঙ্গীকারে অঙ্গীকারাবদ্ধ করে। বৌদ্ধ ধর্ম মনে করে, বিয়ের বাইরে যৌন সম্পর্কে লিপ্ত হওয়া, অন্য পুরুষের স্ত্রীর সাথে, যে মেয়ে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ, বা তার আত্মীয় (পিতা বা ভাই) দ্বারা সুরক্ষিত কোনও মেয়ে, বা পতিতাদের সাথে বিবাহ বহির্ভূত যৌনতা, পরিণামে অন্য মানুষের জন্য কষ্ট দেয় এবং নিজেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বৌদ্ধ ধর্মের 'সম্যক কর্মে' ব্যভিচার থেকে আত্মরক্ষার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পঞ্চশীলেও ব্যভিচারে জড়িত না হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

ইসলাম ধর্ম

আল্লাহ্ তায়ালা কুরআন মাজীদে ব্যভিচারের কঠিন নিন্দা করেন। তিনি বলেন:

«وَلَا تَقْرَبُوْا الزِّنَا، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَّسَآءَ سَبِيْلًا»

"তোমরা যেনা তথা ব্যভিচারের নিকটবর্তীও হয়ো না। কারণ, তা অশ্লীল ও নিকৃষ্ট আচরণ"।[৪]

১. ফকীহদের ঐক্যমতে অবিবাহিত পুরুষ অথবা নারী ব্যভিচার করলে একশত বেত্রাঘাত করা। বেত্রাঘাত করার পাশাপাশি নির্বাসন দেওয়া হবে কিনা এ ব্যাপারে ইমামাদের মতপার্থক্য রয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) এর মতে নির্বাসন দেওয়া হবে না, ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এর মতে নির্বাসন দিতে হবে।

২. বিবাহিত পুরুষ ও নারীকে পাথর মেরে হত্যা করা।

ব্যভিচার একটি অত্যন্ত ঘৃণ্য যৌন অপারাধ। এটি সম্পূর্ণ নৈতিকতা পরিপন্থি একটি কাজ। যৌনতা একটি অত্যন্ত প্রাকৃতিক একটি বিষয়। ধর্মসমূহে তাই অবৈধ যৌনাচার থেকে রক্ষা করতে বিয়ে ও পারিবারিক জীবনের প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। বিশেষত ইসলাম ও খ্রিস্টধর্মের ধর্মীয়গ্রন্থসমূহে আদম সন্তানকে বিয়ে করতে বারংবার

[৪] আল কুরআন, ১৭ : ৩২

উৎসাহ প্রদান করেছে। ইসলাম ধর্মে বিয়ে ও পারিবারিক জীবন বর্জন করে সন্যাসবাদ গ্রহণ করতে কাঠোর ভাষায় নিষেধ করা হয়েছে।

ব্যভিচার একটি অত্যন্ত ঘৃণ্য অপরাধ, এ সম্পর্কে আলোচিত ধর্মসমূহের মাঝে কোনো বৈপরীত্য দেখা যায় না। ইয়াহুদী, খ্রিস্ট, হিন্দু ও ইসলাম এ চারটি ধর্মেই ব্যভিচারকারীর জন্য মৃত্যু পরবর্তী শাস্তির ব্যপারে সতর্ক করা হয়েছে। ইয়াহুদী, খ্রিস্ট ও ইসলাম ধর্মে পার্থিব জীবনেও ব্যভিচারকারীর জন্য শাস্তি বিধান রাখা হয়েছে। ইয়াহুদী-খ্রিস্টধর্মে ব্যভিচারে লিপ্ত ব্যক্তির শাস্তি স্বরূপ মৃত্যুদণ্ড নির্ধারিত হয়েছে। ইসলাম ধর্মে বিবাহিত ব্যভিচারকারীর জন্য মৃত্যুদণ্ডের কথা বলা হলেও অবিবাহিত ব্যভিচারকারী শাস্তি নির্ধারিত হয়েছে একশ বেত্রাঘাত। যেহেতু বিবাহিত ব্যক্তির বৈধ উপায় যৌন চাহিদা পূরণের সুযোগ রয়েছে, এবং অবিবাহিত ব্যক্তির সে সুযোগ নেই। যেকারণে ইসলাম অবিবাহিত ব্যক্তির জন্য তুলনামূলক সহজ শাস্তি ঘোষণা করেছে। বৌদ্ধ ধর্মে এ ব্যপারেও কোনো শাস্তির বিধান নেই। না পার্থিব জীবনে, না মৃত্যু পরবর্তী জীবনে। তবে বৌদ্ধ ধর্মও ব্যভিচারকে অবৈধ এবং অন্যায় কাজ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। এ কাজ না করার ব্যপারে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের শপথ বাক্যও পাঠ করানো হয়।

ব্যভিচারের অপবাদ

ইয়াহুদী ধর্ম

ইয়াহুদী ধর্মে মিথ্যা মহাপাপ হিসেবেই স্বীকৃত। স্বাভাবিক মিথ্যা কথার তুলনায় মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া আরও ভয়াবহ পাপের কাজ। ইয়াহুদী ধর্মে মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করা নিষিদ্ধ। ইয়াহুদী ধর্ম গ্রন্থসমূহে মিথ্য রটানো ব্যক্তি নির্বোধ ও বোকা হিসেবে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে।

কেউ যদি কারো বিরুদ্ধে ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদ রটায় তাহলে তাকে অবশ্যই শাস্তি ভোগ করতে হবে। তার শাস্তির ব্যাপারে বিচারকগণ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। অপরাধের মাত্রা বিবেচনা করে বিচারকগণ অপরাধীকে শাস্তি প্রদান করবেন। স্বামী তার স্ত্রীর প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ উত্থাপন করলে এবং স্ত্রীর ব্যভিচারের অপরাধ প্রমাণে ব্যর্থ হলে স্বামী ৪০ আউন্স রৌপ্য জরিমানা দিতে হবে। এবং আমৃত্যু ঐ স্ত্রীর সঙ্গেই সংসার করতে হবে।

খ্রিস্টধর্ম

খ্রিস্ট ধর্মে মিথ্যা কথা বলা, কারো বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া, কারো নামে বদনাম ছড়ানো ইত্যাদি রটানো ইত্যদি স্পষ্টতই পরিত্যাজ্য, নিষিদ্ধ এবং গুনাহের কাজ। কোনো পবিত্র চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তির বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অপবাদ দেওয়া, কেউ ব্যভিচারে লিপ্ত হয়নি, তা সত্ত্বেও তার বিরুদ্ধে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার সাক্ষ্য দেওয়া অত্যন্ত জঘন্য অপরাধ। নরহত্যা, ব্যভিচার, চুরি ইত্যদি যেমন খ্রিস্টধর্মে নিষিদ্ধ, অনুরূপভাবে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া, কারো বিরুদ্ধে অপবাদ দেওয়াও এ ধর্মে নিষিদ্ধ।

হিন্দু ধর্ম

হিন্দু ধর্মে ব্যভিচারের অপবাদের ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট কোনো বর্ণনা পাওয়া যায় না। তবে মিথ্যা সাক্ষ্যাকে অপরাধ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। আর অপবাদ এবং মিথ্যা সাক্ষ্য পুরোপুরি একই বিষয় না হলেও উভয়ের মাঝে বেশ সামঞ্জস্যও রয়েছে।

মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদানকারী মারা যাওয়ার পর নরকে কঠিন শাস্তি ভোগ করবে। যে ব্যক্তি ইহলোকে সাক্ষ্য প্রদান করার সময়, ক্রয়-বিক্রয় করার সময় এবং দান করার সময় কোন প্রকার মিথ্যা কথা বলে, পরলোকে যমদূতেরা তাকে শত যোজন উন্নত পর্বত শিখর থেকে মাথা নিচের দিকে করে 'অবীচিমৎ' নামক নরকে নিক্ষেপ করে।

বৌদ্ধ ধর্ম

বৌদ্ধ ধর্মের দৃষ্টিতে মিথ্যা ভাষণ করা, কর্কশ বাক্য বলা, কটুবাক্য বলা, তুচ্ছ বা নিরর্থক বাক্য আলাপ করা ইত্যাদি অকুশল কর্মের অন্তর্ভূক্ত। গৌতম বুদ্ধ অকুশলকর্ম সর্বতোভাবে পরিবর্জনের নির্দেশ প্রদান করেছেন।

ইসলাম ধর্ম

সতী-সাধ্বী মহিলাদেরকে ব্যভিচারের অপবাদ দেয়া আরেকটি কঠিন অপরাধ তথা কবীরা গুনাহ্। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন:

«إِنَّ الَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْـمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْـمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوْا فِيْ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَلَـهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ»

"নিশ্চয়ই যারা সতী-সাধ্বী সরলমনা মু'মিন মহিলাদেরকে ব্যভিচারের অপবাদ দেয় তারা দুনিয়া ও আখিরাতে অভিশপ্ত এবং তাদের জন্য (আখিরাতে) রয়েছে মহা শাস্তি"।[৫]

শাস্তি:-

১। ৮০ বেত্রাঘাত ।

২। তার স্বাক্ষ্য অন্য কোন স্থানে কখনও গ্রহণযোগ্য হবে কিনা এ ব্যপারে ইমামদের ভিন্নমত রয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) এর মতে তাওবা করলে তার সাক্ষ্য পরবর্তীতে গ্রহণযোগ্য হবে, ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এর মতে তার সাক্ষ্য কখনোই গ্রহণযোগ্য হবে না।

কারো বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অপবাদ দেওয়ার মাধ্যমে তিনটি অপরাধ সংঘটিত হয়। প্রথমত এটি একটি মিথ্যা ভাষণ। সব ধর্মই মিথ্যাচারকে অনৈতিক এবং অন্যায় কর্ম হিসেবে বিবেচনা করে থাকে। মিথ্যা পার্থিব জীবনে চরম অবিশ্বাস ও ভয়াবহ অশান্তির সৃষ্টি করে। যেকারণে অত্যন্ত কঠোর ভাষায় সব গুলোই ধর্মই মিথ্যা বর্জনের নির্দেশ দিয়েছে।

দ্বিতীয়ত কারো বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অপবাদ আরোপের মাধ্যেমে মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করা হয়। ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অন্যতম বড় প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে এই মিথ্যা সাক্ষ্য। পৃথিবীর সকল ধর্মই ন্যায় বিচারের পক্ষে। এবং সকল ধর্মেই মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদানকে জঘণ্য অপরাধ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

---

[৫] আল কুরআন, ২৪ : ২৩

তৃতীয়ত কোনো নারীর বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অপবাদ দেওয়া ঐ নারীর প্রতি ভয়াবহ যুলুমের শামিল। এর মাধ্যমে নারীর চরিত্র হনন করা হয়। এ ধরনের অপবাদ নারীর জীবনকে বিষিয়ে তোলে। ব্যক্তি জীবনে, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে নারীকে সীমাহীন লাঞ্চনার শিকার হতে হয়। অনেক সময় এ অপবাদ সহ্য না করতে পেরে কেউ কেউ আত্মহত্যা পর্যন্ত করে।

মিথ্যা ভাষণ যে নিষিদ্ধ এ ব্যপারে আমাদের আলোচিত কোনো ধর্মেরই ভিন্নমত নেই। বরং সবগুলো ধর্মের ধর্মীয়গ্রন্থেই মিথ্যা ভাষণ থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বৌদ্ধ ধর্ম ব্যতীত অন্য চারটি ধর্মের ধর্মীয়গ্রন্থে মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান না করতেও স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ইয়াহুদী-খ্রিস্টধর্মে কোনো নারীর বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অপবাদ দেওয়াকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয়েছে, তবে শাস্তি নির্ধারণ করে দেওয়া নেই। শুধুমাত্র ইসলাম ধর্মেই নারী মর্যাদা রক্ষার্থে, নারীকে অযাচিত অপমান ও লাঞ্চনা থেকে রক্ষার্থে অপবাদ দাতার জন্য শাস্তি নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে।

রাষ্ট্রদ্রোহিতা

খ্রিস্টধর্ম

খ্রিস্টধর্মে রাষ্ট্র ও সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার অনুমতি দেয়নি। বরং পূর্ণ আনুগত্য করার নির্দেশ দিয়েছে। খ্রিস্টধর্ম মতে রাজ ক্ষমতা নির্ধারণ করে দেন স্বয়ং ঈশ্বর। তাই তাদের আনুগত্য করা, প্রশংসা করা প্রজাদের একান্ত কর্তব্য।

ইসলাম ধর্ম

ইসলাম ধর্মে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধের শাস্তি স্বরূপ অপরাধীর মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত হতে পারে। পৃথিবীর প্রায় সকল রাষ্ট্রের আইনে রাষ্ট্রদ্রোহিতার শাস্তি ইসলাম নির্দেশিত শাস্তির মতোই। ইসলামী রাষ্ট্র একটি কল্যাণকর রাষ্ট্র। এই রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা বা বিদ্যমান সরকারকে উচ্ছেদ একটি বড় অপরাধ। সুতরাং তার জন্য নির্ধারিত এ শাস্তি সঠিক ও যথাযথ।

ইমামদের কেউ কেউ বিদ্রোহীদের শাস্তি হিসেবে ডাকাতির শাস্তিকে নির্ধারণ করেছেন। ইবনে হাযম, সাইয়্যেদ সাবেকসহ ইমামদের একদল এ মত পোষণ করেছেন।[৬] তাদের যুক্তি হচ্ছে, ডাকাত এবং বিদ্রোহী উভয়ের উদ্দেশ্য প্রায় এক এবং অভিন্ন। উভয় দলই চায় সমাজে ত্রাসের রাজত্ব ও নৈরাজ্য সৃষ্টি করতে, সমাজের স্বাভাবিক শান্তি-শৃঙ্খলা নষ্ট করতে।

আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় রাষ্ট্রদ্রোহিতা একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ। পৃথিবীর অধিকাংশ রাষ্ট্রই রাষ্ট্রদ্রোহিতাকে সর্বোচ্চ শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে বিবেচনা করে থাকে। কোনো কোনো দেশে রাষ্ট্রদ্রোহিতার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত দেওয়া হয়। আমাদের দেশেও রাষ্ট্রদ্রোহিতা একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

---

[৬] সাইয়্যেদ সাবেক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৭৪

ইসলাম কল্যাণ রাষ্ট্রে বিশ্বাসী। যে রাষ্ট্রে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত থাকবে, মানবাধিকার থাকবে। নাগরিকরা তাদের সকল সুযোগ সুবিধা বৈষম্যহীন ভাবে ভোগ করবে। যে রাষ্ট্রের শাসকরা জনসাধারণের সাথে কোনো অন্যায় আচরণ করবে না। সারকথা হচ্ছে রাষ্ট্র হবে একটা সুখী ও সমৃদ্ধ রাষ্ট্র। এরকম একটি রাষ্ট্রে নৈরাজ্য সৃষ্টি করা, শান্তি ও স্থিতি নষ্ট করা ইসলাম সমর্থন করে না। যেকারণে ইসলাম রাষ্ট্রদ্রোহীর জন্যও শাস্তি বিধান নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে।

ইসলাম ব্যতীত অন্যান্য ধর্মসমূহে রাষ্ট্রদ্রোহিতার ব্যপারে স্পষ্ট কোনো বিধিবিধান পাওয়া যায় না। গবেষকগণ এর প্রধানত দুটি কারণ উল্লেখ করেছেন। প্রথমত ইসলাম ব্যতীত অন্য কোনো ধর্মই পূর্ণাঙ্গ নয়। অন্য কোনো ধর্মেই জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র ও ধাপ সম্পর্কে স্পষ্ট বিধিবিধান বর্ণনা করা হয়নি। যেকারণে অন্য অনেক বিষয়ের মতো রাষ্ট্রদ্রোহিতার বিষয়ও এসব ধর্মে কোনো নির্দেশনা দেওয়া নেই। দ্বিতীয়ত এসব ধর্মসমূহের যখন উদ্ভব ঘটেছে, কিংবা এসব ধর্মগ্রন্থ যখন অবতীর্ণ হয়েছে বা রচিত হয়েছে তখন বর্তমান সময়ের মতো রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রচলিত ছিল না। যেকারণে ঐসব ধর্মে এ সংক্রান্ত বিধিবিধান বর্ণিত হয়নি।

ধর্মদ্রোহিতা

ইয়াহুদী ধর্ম

ইয়াহুদী ধর্মে ধর্ম ত্যাগ করা, ধর্মের কোনো বিধান অস্বীকার করা কিংবা প্রভুর অবমাননা হয় এমন কোনো কথা বলা বা কাজ করার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। ধর্ম ত্যাগকারীকে পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা এবং স্বাভাবিকভাবে হত্যা উভয় প্রকার হত্যার কথাই বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্টে বলা হয়েছে। কেউ যদি কারো প্ররোচনায় প্ররোচিত হয়ে ধর্ম ত্যাগ করে তাহলে প্ররোচনা দানকারী ব্যক্তিকেও মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে। ধর্ম ত্যাগকারীর শাস্তি সম্পর্কে বলা হয়েছে,

Thou shalt not sacrifice unto the LORD thy God any bullock, or sheep, wherein is blemish, or any evil favouredness: for that is an abomination unto the LORD thy God. If there be found among you, within any of thy gates which the LORD thy God giveth thee, man or woman, that hath wrought wickedness in the sight of the LORD thy God, in transgressing his covenant, And hath gone and served other gods, and worshipped them, either the sun, or moon, or any of the host of heaven, which I have not commanded; And it be told thee, and thou hast heard of it, and enquired diligently, and, behold, it be true, and the thing certain, that such abomination is wrought in Israel: Then shalt thou bring forth that man or that woman, which have committed that wicked thing, unto thy gates, even that man or that woman, and shalt stone them with stones, till they die.[৭]

---

[৭] Deuteronomy 17:1-5

অর্থাৎ, তোমরা তোমাদের প্রভু, ঈশ্বরের কাছে খুঁত আছে এমন কোনও গরু বা মেষ বলি দেবে না। কেন? কারণ তোমাদের প্রভু ঈশ্বর এটিকে ঘৃণা করেন! প্রভু, তোমাদের ঈশ্বর, তোমাদের যে দেশ দিচ্ছেন সেখানে তোমরা তোমাদের গোষ্ঠীর এমন কোন পুরুষ অথবা স্ত্রীলোককে পেতে পার যে প্রভুর বিরুদ্ধে পাপ করেছে বা প্রভুর নিয়ম ভঙ্গ করেছে, এবং অন্যান্য দেবতার পূজা করেছে, এ-ও হতে পারে যে তারা সূর্য, চন্দ্র অথবা নক্ষত্রের পূজা করেছে। এগুলো প্রভুর আজ্ঞার বিরুদ্ধে যা আমি তোমাদের দিয়েছিলাম। যদি তোমরা এই ধরণের কোনো খবর শোনো, তাহলে তোমরা অবশ্যই যত্ন সহকারে খোঁজ খবর নেবে। এই রকম সাংঘাতিক ঘটনা ইস্রায়েলে যদি সত্যিই ঘটে এবং যদি তার সত্যতা সম্পর্কে তোমরা নিশ্চিত হও, তাহলে যে ব্যক্তি সেই খারাপ কাজ করেছিল তাকে তোমরা অবশ্যই শাস্তি দেবে। শহরের দরজার কাছে কোনো প্রকাশ্য রাস্তার সেই পুরুষ অথবা স্ত্রীলোককে তোমরা অবশ্যই নিয়ে যাবে এবং তাদের পাথর দিয়ে হত্যা করবে।

খ্রিস্টধর্ম

খ্রিস্টধর্মে মানুষকে সাবধানতার সাথে ধর্ম গ্রহণের পরামর্শ দেয়। যাতে করে ভবিষ্যতে ধর্ম ত্যাগের কোনো প্রশ্ন না আসে। কেউ খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করার পর ছেড়ে দেওয়ার তুলনায় ধর্ম গ্রহণ না করাকেই খ্রিস্টধর্মের ধর্মীয় পুস্তকে উত্তম বলা হয়েছে। ইয়াহুদী ধর্মে ধর্ম ত্যাগের শাস্তি ছিলো মৃত্যুদন্ড। খ্রিস্টধর্মে সে কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে মানুষকে ধর্ম ত্যগের ব্যাপারে সাবধান করা হয়েছে। যাতে করে মানুষ ধর্ম ত্যাগের অপরাধের ভয়াবহতা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় এবং ধর্ম ত্যাগ করার অপরাধ থেকে নিজেদের ফিরিয়ে রাখে। ধর্ম ত্যাগ করতে নিষেধাজ্ঞা জারির পাশাপাশি ঈশ্বরের জন্য অবমাননাকর কথা বা কাজ থেকেও বিরত থাকার নির্দেশ খ্রিস্টধর্মে জারি করা হয়েছে।

হিন্দু ধর্ম

হিন্দু ধর্মে হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করে অন্য ধর্ম গ্রহণ করা নিষিদ্ধ। কেউ হিন্দু ধর্মের দীক্ষা গ্রহণ করার পরে ছেড়ে দিলে, অন্য ধর্ম গ্রহণ করলে, পাপাচারে লিপ্ত হলে তাকে অবশ্যই নরকে যেতে হবে। যে ব্যক্তি স্বীয় বেদমার্গ থেকে ভ্রষ্ট হয়ে পাষণ্ড ধর্ম অবলম্বন করে, যমদূতেরা তাকে ‘অসিপত্রবন’ নামক নরকে নিক্ষেপ করে বেত্রাঘাত করবে। এছাড়াও যে সমস্ত রাজন্য বা রাজপুরুষ ক্ষত্রিয় আদি দায়িত্বশীল পরিবারে জন্মগ্রহণ করা সত্বেও ধর্মনীতির অবহেলা করে এবং তার ফলে অধঃপতিত হয়, তারা মৃত্যুর পর বৈতরণী নামক নরকের নদীতে পতিত হয়।

ইসলাম ধর্ম

ইসলাম ধর্মে ধর্মদ্রোহী বা ধর্মাবমাননাকারীর জন্য দুই ধরনের শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে।

১। আখিরাতের শাস্তি : কঠিন আযাব ও চিরস্থায়ী জাহান্নাম।

২। দুনিয়ার শাস্তি তাকে হত্যা করা মুরতাদ পুরুষ হলে তাকে হত্যা করার ব্যাপারে সকলে একমত তবে মুরতাদ নারীর ব্যাপারে আলেমগণের মধ্যে মত পার্থক্য রয়েছে।

দুনিয়াতে শাস্তি কখন, কী রূপে আরোপ করা হবে এ বিষয় ইমামদের একাধিক মত পাওয়া যায়।

১। কোন কোন আলেমগণের মতে পুরুষের মত তাকেও হত্যা করতে হবে। কারণ হাদীসে পুরুষ নারীকে পৃথক করা হয়নি। উম্মে মারওয়ান নামে এক মহিলা মুরতাদ হলে রাসূলের (সা.) নিকট এ সংবাদ পৌঁছানো হয়। তখন তিনি বললেন তাকে তাওবা করতে বলো। তাওবা না করলে তাকে হত্যা কর।

২। কেউ কেউ বলেন, তাকে বন্দী করে রাখ, হত্যা করো না।

৩। হানাফী ইমামদের নিকট তাকে হত্যা করা যাবে না তবে তাকে বন্দী করে ইসলামে ফিরে আসার আহবান করতে হবে। যদি অস্বীকার করে তাহলে বন্দী করে রাখতে হবে। ইসলাম থেকে বের হয়ে যাওয়ার অর্থ বিদ্রোহ করা। কোন ব্যক্তি রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলে রাষ্ট্র তাকে কখনও ক্ষমা করে না। সুতারাং মুসলমান নাম ব্যবহার করে কেউ বিদ্রোহ করলে সেও ক্ষমা পেতে পারে না।

আমাদের আলোচিত ধর্মসমূহের মধ্যে বৌদ্ধ ধর্ম ব্যতীত অন্য চারটি ধর্মেই ধর্ম ত্যাগ গর্হিত অপরাধ। শুধু ধর্ম ত্যাগ করাই অপরাধ নয়, বরং ধর্ম অবমাননা হয় এমন কথা বা কাজও অপরাধ। হিন্দু ধর্মে এ ধরনের অপরাধে লিপ্ত ব্যক্তির জন্য পরকালীন অর্থাৎ মৃত্যু পরবর্তী শাস্তির কথা বলা হয়েছে। ইয়াহুদী-খ্রিস্ট এবং ইসলাম ধর্মে এ অপরাধের জন্য পরকালীন শাস্তির পাশাপশি পার্থিব জীবনেও শাস্তির কথা বলা হয়েছে। এ তিন ধর্মেই ধর্ম ত্যাগ কিংবা ধর্ম অবমাননার শাস্তি মৃত্যুদন্ড।

ইসলাম ধর্ম এ শাস্তি প্রয়োগের ব্যপারে যথেষ্ট উদারতার পরিচয় দিয়েছে। ধর্ম ত্যাগকারী কিংবা অবমাননাকারীকে সরাসরি শাস্তি না দিয়ে তার বক্তব্যের পক্ষে যুক্তি তর্ক উপস্থাপনের সুযোগ দেওয়া হয়েছে। প্রয়োজনে বিচারক তাকে বন্দী করবেন, তাকে তার বক্তব্য প্রত্যাহারের সুযোগ দিবেন। এরপরও সে তার বক্তব্যে অটল থাকলেই কেবল তাকে শাস্তি প্রদানের কথা ইসলামী শরীয়াতে বলা হয়েছে।

চুরি

ইয়াহুদী ধর্ম

চৌর্যবৃত্তি ইয়াহুদী ধর্ম মতে ভয়াবহ এবং বড় পাপগুলোর একটি। ইয়াহুদী ধর্মের ধর্মীয় গ্রন্থের বিবরণ অনুযায়ী চোর অভিশপ্তদের অন্তর্ভুক্ত। স্বয়ং প্রভু চোর এবং মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দানকারীকে তাদের কৃত অপরাধের জন্য অভিশাপ দিয়ে থাকেন। চোর তার অপরাধে জন্য অবশ্যই ধ্বংস প্রাপ্ত হবে। সে পার্থিব জীবনে এবং পরকালীন জীবনে উভয় জীবনেই শাস্তির মুখোমুখি হবে।

কোনো প্রাণী চুরির পর হত্যা করলে তাকে একটা চুরি করার বদলে পাঁচটা কিনে দিতে হবে। আর চুরিকৃত প্রাণীটি চোরের নিকটেই পাওয়া গেলে চোরকে অবশ্যই চুরি করা জন্তুটির মূল্যের দ্বিগুণ মূল্য দিতে হবে। ইয়াহুদী ধর্মে মানব

সন্তান চুরিকে বড় ধরনের অপরাধ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এ ধর্মে যতগুলো অপরাধের কারণে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার বিধান রয়েছে তার মধ্যে মানব সন্তান চুরি একটি। বর্ণিত হয়েছে,

"If a man steals an ox or a sheep, and kills it or sells it, he shall repay five oxen for an ox, and four sheep for a sheep. If a thief is found breaking in and is struck so that he dies, there shall be no bloodguilt for him, But if the sun has risen on him, there shall be bloodguilt for him. He shall surely pay. If he has nothing, then he shall be sold for his theft. If the stolen beast is found alive in his possession, whether it is an ox or a donkey or a sheep, he shall pay double.[৮]

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি ষাঁড় বা মেষ চুরি করেছে তাকে কিভাবে শাস্তি দেবে? যদি সে প্রাণীটিকে হত্যা করে বা বিক্রি করে দেয় তবে সে সেটা ফেরৎ দিতে পারবে না, তাই তাকে একটা চুরি করা ষাঁড়ের বদলে পাঁচটা ষাঁড় কিনে দিতে হবে বা একটা মেষের বদলে চারটি মেষ দিতে হবে। তাকে চুরির জন্য জরিমানা দিতে হবে। যদি রাতের বেলায় সিঁধ কেটে চুরি করার সময় কোনও চোর মারা যায় তবে কেউই দোষী হবে না। কিন্তু যদি এটা দিনের বেলায় হয় তাহলে যে হত্যা করবে সে দায়ী হবে। যদি তার কাছে কিছু না থাকে তাহলে তাকে দাস হিসেবে বিক্রি করে দেওয়া হবে। যদি তুমি লোকটির কাছে জন্তুটিকে দেখতে পাও, তবে চোরকে অবশ্যই চুরি করা জন্তুটির মূল্যের দ্বিগুণ মূল্য দিতে হবে। প্রাণীটি ষাঁড় বা গাধা বা মেষ যাই হোক না কেন নিয়ম একই থাকবে।

ইয়াহুদী ধর্মের ধর্মীয় বিধান মতে ক্ষুধার্ত ব্যক্তি চুরি করলে তাকেও শাস্তির আওতায় আনা হবে। এক্ষেত্রে তার চুরিকৃত মালের সাত গুন ক্ষতিপূরণ তাকে দিতে হবে। চুরির মতো অপরাধে লিপ্ত ব্যক্তিদের সাধারণত ইয়াহুদী সমাজ থেকে সমাজচ্যুত করা হয় কিংব একঘরে করে ফেলা হয়। এবং চোরকে প্রচণ্ড ঘৃণার চোখে দেখা হয়। তবে ক্ষুধার্ত ব্যক্তি চুরি করলে তাকে সমাজচ্যুত করা যাবে না, একঘরে করা যাবে না কিংবা ঘৃণার চোখেও দেখা যাবে না। যেহেতু সে পরিস্থিতির স্বীকার হয়ে চুরি করেছে।

খ্রিস্টধর্ম

খ্রিস্টধর্ম মতে, ঈশ্বর কর্তৃক নিষেধাজ্ঞা জারিকৃত বিষয়ের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে চুরি। খ্রিস্টধর্মে চুরির পরিবর্তে শারীরিক পরিশ্রম করে জীবন যাপন করতে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। যারা চুরি করতে অভ্যস্ত তাদেরকে চুরি ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

হিন্দু ধর্ম

---

[৮] Exodus 22:1-4

হিন্দু ধর্মে যেসকল বিষয়কে পাপ বা অপরাধ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম প্রধান হচ্ছে চৌর্যবৃত্তি। এসব অপরাধ থেকে বেঁচে থাকা সকল মানুষের আবশ্যক কর্তব্য।

বৌদ্ধ ধর্ম: সমাজে প্রচলিত অর্থনৈতিক অপরাধসমূহের মধ্যে অন্যতম হলো চুরি-ডাকাতি। অষ্টশীলের মাধ্যমে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের চুরি-ডাকাতি থেকে বিরত থাকার শপথ বাক্য পাঠ করানো হয়।

ইসলাম ধর্ম

আল্লাহ্ তায়ালা বলেন:

«وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللهِ، وَاللهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ»

"তোমরা চোর ও চুন্নির (ডান) হাত কেটে দিবে তাদের কৃতকর্মের (চৌর্যবৃত্তি) দরুন আল্লাহ্ তায়ালার পক্ষ থেকে শাস্তি সরূপ। বস্তুত আল্লাহ্ তায়ালা অতিশয় ক্ষমতাবান মহান প্রজ্ঞাময়"।[৯]

আল্লাহর বাণী দ্বারা বোঝা যায় চুরির কারণে হাত কাটা ওয়াজিব। ফকীহগণ এ ব্যাপারে ঐক্যমত্য পোষণ করেছেনস যে, নিসাব পরিমাণ ডান হাত কর্তন করতে হবে, তবে কোথা থেকে হাত কাটা হবে এ ব্যাপারে তাদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

চৌর্যবৃত্তি একটি সামাজিক শান্তি শৃঙ্খলা বিরোধী অপরাধ। এর কারণে মানুষ সর্বাবস্থায় নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে, অর্থ-সম্পদের নিরাপত্তা নিয়ে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়। এটি সর্বসম্মতভাবে অপরাধ হিসেবে বিবেচিত। ধর্ম, রাষ্ট্র, সমাজ সবার নিকটই এটি অপরাধ হিসেবে পরিচিত। বর্তমান পৃথিবীতে সব দেশেই চৌর্যবৃত্তি শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

আমাদের আলোচিত ধর্মসমূহেও চৌর্যবৃত্তি অপরাধ ও অন্যায় কর্ম হিসেবেই আখ্যায়িত। বৌদ্ধ ধর্মে চৌর্যবৃত্তি থেকে বিরত থাকতে শপথ বাক্য পাঠ করানো হয়, এ ধর্মে বিশেষ কোনো শাস্তির কথা বলা হয়নি। হিন্দু ধর্মে মৃত্যু পরবর্তী জীবনে শাস্তির কথা বলা হলেও পার্থিব জীবনে শাস্তির কথা বলা নেই। ইয়াহুদী-খ্রিস্ট এবং ইসলাম ধর্মে মৃত্যু পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী উভয় জীবনেই শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে।

ইয়াহুদী-খ্রিস্টধর্মে চোরের শারীরিক শাস্তির ব্যবস্থা রাখা হয়নি। বরং শুধু অর্থ দন্ডের কথা বলা হয়েছে। সেই সাথে কোনো ব্যক্তি ক্ষুধার্থ অবস্থায় নিরুপায় হয়ে চুরি করলে তার জন্য শাস্তি বিধান রাখা হয়েছে। পক্ষান্তরে ইসলাম ধর্মে ক্ষুধার্থ অবস্থায় নিরুপায় হয়ে কিংবা দুর্ভিক্ষ চলাকালীন অবস্থায় কেউ চুরি করলে ঐ চোরকে শাস্তি থেকে রেহাই দেওয়ার বিধান দেওয়া হয়েছে। এছাড়া কেউ এ অন্যায় কাজে যুক্ত হলে এবং শাস্তি পাপ্তির সকল শর্ত পূরণ করলে অবশ্যই তাকে শাস্তি ভোগ করতে হবে।

চৌর্যবৃত্তির অপরাধে ইসলামে তুলনামূলক কঠোর শাস্তি আরোপ করা হয়েছে। গবেষকগণ এর একাধিক কারণ চিহ্নিত করেছেন। যেমন, সমাজে চৌর্যবৃত্তি বৃদ্ধি পেলে সকলকেই এক ধরনের অস্বস্তি, অশান্তি ও দুশ্চিন্তার মধ্যে কাটাতে হয়।

---

[৯] আল কুরআন, ৫ : ৩৮

ইবাদাত, স্বাভাবিক কাজকর্ম কোনো কিছুই নিশ্চিন্ত মনে করা যায় না। সমাজকে এই অস্থিরতা থেকে রক্ষা করতেই চোরের উপর কঠোর শাস্তি আরোপ করা হয়েছে।

ইসলামে বৈধ উপায় উপার্জন করাকে আবশ্যক করে দেওয়া হয়েছে। আমাদের প্রিয় নবীসহ অতীতের সকল নবী-রাসূলগণই বৈধ পন্থায় শ্রম ও মেধা বিনিয়োগ করে উপার্জন করতেন। চৌর্যবৃত্তি মানুষকে বৈধ উপার্জনের পথ থেকে ফিরিয়ে রাখে। তাছাড়া যাতে মানুষ শাস্তির ভয়ে এ অপরাধ থেকে দূরে থাকে সেজন্যও ইসলামে এ অপরাধের জন্য কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

ডাকাতি

ইয়াহুদী ধর্ম

ইয়াহুদী ধর্মে চুরি এবং ডাকাতি উভয়ই ভয়াবহ অপরাধ। বর্ণিত হয়েছে,

Come, and let us return unto the LORD: for he hath torn, and he will heal us; he hath smitten, and he will bind us up. After two days will he revive us: in the third day he will raise us up, and we shall live in his sight. Then shall we know, if we follow on to know the LORD: his going forth is prepared as the morning; and he shall come unto us as the rain, as the latter and former rain unto the earth. O Ephraim, what shall I do unto thee? O Judah, what shall I do unto thee? for your goodness is as a morning cloud, and as the early dew it goeth away. Therefore have I hewed them by the prophets; I have slain them by the words of my mouth: and thy judgments are as the light that goeth forth. For I desired mercy, and not sacrifice; and the knowledge of God more than burnt offerings. But they like men have transgressed the covenant: there have they dealt treacherously against me. Gilead is a city of them that work iniquity, and is polluted with blood. And as troops of robbers wait for a man, so the company of priests murder in the way by consent: for they commit lewdness. I have seen an horrible thing in the house of Israel: there is the whoredom of Ephraim, Israel is defiled. Also, O Judah, he hath set an harvest for thee, when I returned the captivity of my people.[১০]

অর্থাৎ, এসো , চল আমরা প্রভুর কাছে ফিরে যাই। তিনি আমাদের আঘাত করেছেন, কিন্তু তিনিই আমাদের আরোগ্য করবেন। তিনি আমাদের আহত করেছিলেন, কিন্তু তিনি আমাদের (ক্ষতস্থানগুলিকে) পটি দিয়ে বেঁধে দেবেন। দুদিন বাদে তিনি আমাদের জীবন ফিরিয়ে দেবেন। তৃতীয় দিনে, তিনি আমাদের ওঠাবেন। তাহলে আমরা তাঁর সামনে

[১০] Hosea 6 : 1-11

বেঁচে থাকতে পারব। এসো, প্রভুর সম্বন্ধে আমরা জ্ঞান সঞ্চয় করি। প্রভুকে জানবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করি। যে রকম নিশ্চিত ভাবে আমরা জানি যে ভোর হতে চলেছে সে রকম ভাবেই আমরা নিশ্চিত যে তিনি আসছেন। প্রভু আমাদের কাছে বৃষ্টির মতো আসবেন, বসন্তের বৃষ্টির জল যেভাবে মাটিকে সিক্ত করে।" "ইফ্রয়িম, তোমার সঙ্গে আমি কি করব? যিহূদা, তোমার সঙ্গে আমি কি করব? তোমার বিশ্বস্ততা তো ভোরের কুয়াশার মতো, তোমার বিশ্বস্ততা তো শিশিরের মতো, যা সকালে মিলিয়ে যায়। তাই আমি তাদের ভাববাদীদের কেটে ফেলেছি। আমার আদেশেই তাদের হত্যা করা হয়েছে; যাতে ন্যায় তোমার কাছ থেকে আলোর মতো বেরিয়ে যেতে পারে। কারণ, আমি বিশ্বাসপূর্ণ ভালোবাসা চাই, উৎসর্গ নয়। আমি চাই লোকে ঈশ্বরকে জানুক, হোমবলি উৎসর্গ নয়। কিন্তু লোকে চুক্তি ভেঙে ছিল, ঠিক আদম যে ভাবে ভেঙে ছিল। তাদের রাজ্যে তারা আমার প্রতি অবিশ্বস্ত। গিলিয়দ অধর্মচারীদের শহর। সেখানকার লোকরা চালাকি করে অন্যদের হত্যা করেছে। ডাকাতরা লুকিয়ে থাকে, পথে কাউকে আক্রমণ করার জন্য অপেক্ষা করে। একই ভাবে, যাজকরা শিখিমের রাস্তার ওপর অপেক্ষা করে এবং পথচারীদের আক্রমণ করে তারা অনেক অন্যায় করেছে। ইস্রায়েল জাতির মধ্যে একটি ভয়ঙ্কর জিনিস দেখেছি। ইফ্রয়িম ঈশ্বরের প্রতি অবিশ্বস্ত ছিল। পাপে ইস্রায়েল নোংরা হয়ে গেছে। যিহূদা, তোমার জন্য ফসল কাটারও একটা সময় আছে। যখন আমি আমার লোকদের বন্দী দশা থেকে ফিরিয়ে আনব, তখনই এটা ঘটবে।"

ইয়াহুদী ধর্মে সর্বাবস্থায় ডাকাতি প্রতিহত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এবং যিনি ডাকত দ্বারা আক্রান্ত হবেন তাকে সাহায্য করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও কেউ ডাকাতির অপরাধ করলে তাকে সম্পদ অপহরণের দায় চুরির অনুরূপ শাস্তি ভোগ করতে হবে। ডাকাতি করার সময়ে কেউ নিহত হলে ডাকাতকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে। কারো হত্যার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড এ সম্পর্কে পরবর্তীতে আলোচনা করা হবে। ডাকাতি করার সময়ে কারো অঙ্গহানি ঘটলে যে অঙ্গ হানি হয়েছে ডাকাতেরও সে অঙ্গচ্ছেদ করা হবে।

হিন্দু ধর্ম

ডাকাতি পেশায় যুক্ত ব্যক্তিকে নরকের শাস্তি ভোগ করতে হবে। যে ব্যক্তি সঙ্কট উপস্থিত না হলেও ব্রাহ্মণ অথবা অন্য কোন ব্যক্তির স্বর্ণ-রত্ন ইত্যাদি ধন চৌর্যবৃত্তির দ্বারা অথবা বল প্রয়োগের দ্বারা অপহরণ করে, তাকে 'সন্দংশ' নামক নরকে নিক্ষেপ করা হয়। সেখানে লৌহময় অগ্নিপিণ্ড এবং সাঁড়াশির দ্বারা তার ত্বক ছিন্নভিন্ন করা হয়। এইভাবে তার সারা শরীর কেটে টুকরো টুকরো করা হয়।

এছাড়াও দস্যুবৃত্তি করে পরগৃহে অগ্নি দেয় অথবা বিষ প্রদান করা, অথবা যে সমস্ত রাজা বা রাজপুরুষ আয়কর আদায়ের নামে অথবা অন্যান্য উপায়ে বণিক সম্প্রদায়কে লুণ্ঠন করা ইত্যাদি অপরাধের শাস্তি স্বরূপ মৃত্যুর পর সেই সমস্ত ডাকাত বা দস্যুদের সারমেয়াদন নামক নরকে নিক্ষেপ করা হয়। সেখানে ৭২০টি বজ্রের মতো দন্ত সমন্বিত কুকুর রয়েছে। যমদূতের নির্দেশে সেই কুকুরগুলি অত্যন্ত তৃপ্তির সঙ্গে সেই সমস্ত পাপীদের ভক্ষণ করে।

বৌদ্ধ ধর্ম

সমাজে প্রচলিত অর্থনৈতিক অপরাধসমূহের মধ্যে অন্যতম হলো চুরি-ডাকাতি। অষ্টশীলের মাধ্যমে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের চুরি-ডাকাতি থেকে বিরত থাকার শপথ বাক্য পাঠ করানো হয়।

ইসলাম ধর্ম

আল্লাহ বলেন, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতা করে এবং দুনিয়ায় ফাসাদ সৃষ্টির পায়তারা করে তাদের শাস্তি হলো তাদেরকে হত্যা করতে হবে অথবা শূলেবিদ্ধ করতে হবে, অথবা বিপরীত দিক থেকে হাত ও পা কেটে ফেলতে হবে (ডান ও বাম পা অথবা বাম হাত ও ডান পা) অথবা তাদের দেশান্তর করতে হবে। দুনিয়াতে এটাই তাদের জন্য লাঞ্ছনাকর শাস্তি আর পরকালে তাদের জন্য রয়েছে মহা শাস্তি।

কোন কোন আলেম বলেন, হত্যাকারী ও লুণ্ঠনকারীর উপর শাস্তি প্রয়োগ করা ইমামের ইচ্ছেধীন। তিনি আল্লাহ প্রদত্ত শাস্তি হত্যা, শূলেবিদ্ধ করা, হাত পা কর্তন করা ও দেশ থেকে নির্বাসন করার মধ্যে থেকে যে কোন একটি প্রয়োগ করবেন। কেননা আয়াতে (او) উল্লেখ করা হয়েছে। ইহা মুজাহিদ, দাহাক, নাখয়ী ও মালেকের মত। ইবনে আব্বাস বলেন, কুরআনে (او) অথবা শব্দ দ্বারা যা কিছু বর্ণনা করা হয়েছে তা সবই স্বেচ্ছামূলক।

একদল আলেম বলেন, আয়াতে অপরাধের মাত্রা অনুযায়ী শাস্তির বিধান ধারাবাহিকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। যে ব্যক্তি হত্যা করবে ও সম্পদ লুণ্ঠন করবে তাকে শূলেবিদ্ধ করে হত্যা করা হবে। আর যে শুধু সম্পদ লুণ্ঠন করেছে তার হাত, পা বিপরীত দিক থেকে কর্তন করতে হবে। যে ব্যক্তি শুধু রাস্তায় ত্রাস সৃষ্টি করেছে হত্যা করে নাই সম্পদ লুণ্ঠন করে নাই তাকে দেশ থেকে নির্বাসন দিতে হবে। ইহা ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদের মত। ইমাম আবু হানিফা বলেন আয়াতে বর্ণিত বিধান ইমামের ইচ্ছেধীন মনে করেন। তবে সকল মুহারিবের জন্য নয়।

চুরির ন্যায় ডাকাতিও মানুষের অর্থনৈতিক নিরাপত্তার জন্য চরম হুমকিস্বরূপ। যা সকল ধর্ম, সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থায় নিষিদ্ধ। ইসলাম ধর্ম ব্যতীত অন্যান্য ধর্মসমূহে চুরি এবং ডাকাতির বিধান মোটামুটি একই। ইসলাম ধর্মে ডাকাতির শাস্তি চুরির তুলনায় বেশি। ইসলামী আইনে মূলত ডাকাতির শাস্তি নির্ধারিত হয় অপরাধীর অপরাধের মাত্রা বিবেচনায়। এ ক্ষেত্রে বিচারককেও যথেষ্ট স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। তিনি অপরাধীর অপরাধ ও ক্ষয়ক্ষতির মাত্রা বিবেচনা করে রায় প্রদান করবেন।

হত্যা

ইয়াহুদী ধর্ম

হত্যাকারী ব্যক্তি নিহত ব্যক্তির ওপর ঘৃণাবশত, ইচ্ছাকৃত ভাবে হত্যা করেছে বলে প্রমাণিত হলে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার বিধান দেওয়া হয়েছে। ঘৃণাবশত ইচ্ছাকৃত নয় বরং ভুলবশত অনিচ্ছাকৃত হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে বলে প্রমাণিত হলে হত্যাকারীকে হত্যা করা কিংবা বিচার করা যাবে না। তবে হত্যাকারী ব্যক্তি শহরের সীমা ত্যাগ করে বাইরেও যেতে পারবে না। বাইরে গেলে নিহত ব্যক্তির স্বজনরা তাকে হত্যা করে ফেললে এর কোনো বিচার হবে না।

ইয়াহুদী ধর্মে রক্তপণের কোনো বিধান রাখা হয়নি। বরং অপরাধীর অপরাধ প্রমাণিত হলে তাকে অবশ্যই মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

খ্রিস্টধর্ম

খ্রিস্টধর্ম অত্যন্ত কঠোর ভাষায় হত্যাকে নিষিদ্ধ হিসেবে ঘোষণা করেছে। এবং ইয়াহুদী ধর্মর শাস্তি বিধানের আলোকে হত্যাকারীর শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে বলে খিষ্টধর্মের পণ্ডিত ব্যক্তিগণ মতামত প্রদান করেছেন।

হিন্দু ধর্ম

অন্যান্য ধর্মের ন্যায় হিন্দু ধর্মও মানব হত্যা করা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। হিন্দু ধর্মে ঘোষিত জঘণ্যতম ও বড় পাপসমূহের একটি মানব হত্যা। এক্ষেত্রে অবশ্যই অপরাধীকে শাস্তি ভোগ করতে হবে।

বৌদ্ধ ধর্ম

বৌদ্ধ ধর্মে সকল ধরনের প্রাণি হত্যাই নিষিদ্ধ। আহারের জন্য মাছ, পশু-পাখি ইত্যাদি শিকার করা, হত্যা করাও নিষিদ্ধ। এ ধর্মে মানব হত্যা যে নিষিদ্ধ তা প্রাণি হত্যার নিষেধাজ্ঞার মাধ্যমে সহজেই অনুধাবন করা যায়। পঞ্চশীলে রয়েছে প্রাণি হত্যা না করার শপথ।

ইসলাম ধর্ম

ইসলাম ধর্মের আইনে অন্যায়ভাবে অপরের প্রাণ হরণকে বড় গুনাহগুলোর তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করলে আল্লাহ দুনিয়ায় বড় শাস্তি এবং আখেরাতে তীব্র আযাবের ঘোষণা দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

قُلۡ تَعَالَوۡا اَتۡلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمۡ عَلَيۡكُمۡ اَلَّا تُشۡرِكُوۡا بِهٖ شَيۡـًٔا وَّ بِالۡوَالِدَيۡنِ اِحۡسَانًا ۚ وَ لَا تَقۡتُلُوۡۤا اَوۡلَادَكُمۡ مِّنۡ اِمۡلَاقٍ ؕ نَحۡنُ نَرۡزُقُكُمۡ وَ اِيَّاهُمۡ ۚ وَ لَا تَقۡرَبُوا الۡفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنۡهَا وَ مَا بَطَنَ ۚ وَ لَا تَقۡتُلُوا النَّفۡسَ الَّتِیۡ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالۡحَقِّ ؕ ذٰلِكُمۡ وَصّٰكُمۡ بِهٖ لَعَلَّكُمۡ تَعۡقِلُوۡنَ

‘বলো, এসো, তোমাদের ওপর তোমাদের রব যা হারাম করেছেন, তা তিলাওয়াত করি যে, তোমরা তার সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না এবং মা-বাবার প্রতি ইহসান করবে আর দারিদ্র্যের কারণে তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না। আমিই তোমাদেরকে রিয্ক দেই এবং তাদেরকেও। আর অশ্লীল কাজের নিকটবর্তী হবে না- তা থেকে যা প্রকাশ পায় এবং যা গোপন থাকে। আর বৈধ কারণ ছাড়া তোমরা সেই প্রাণকে হত্যা করো না, আল্লাহ যা হারাম করেছেন। এগুলো আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে তোমরা বুঝতে পার।’[১১]

আরেক আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন-

[১১] আল কুরআন, ৬ : ১৫১

قُلْ تَعَالَوْا اَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ اَلَّا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا وَّ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ۚ وَ لَا تَقْتُلُوْۤا اَوْلَادَكُمْ مِّنْ اِمْلَاقٍ ؕ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَ اِيَّاهُمْ ۚ وَ لَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ مَا بَطَنَ ۚ وَ لَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ ؕ ذٰلِكُمْ وَصّٰكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ

'আর যারা আল্লাহর সাথে অন্য ইলাহকে ডাকে না এবং যারা আল্লাহ যে নাফ্‌সকে হত্যা করা নিষেধ করেছেন যথার্থ কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করে না। আর যারা ব্যভিচার করে না। আর যে তা করবে সে আযাবপ্রাপ্ত হবে। কিয়ামতের দিন তার আযাব বর্ধিত করা হবে এবং সেখানে সে অপমানিত অবস্থায় স্থায়ী হবে।'[১২]

কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হলে ইসলাম তার প্রতিকারের কার্যকর ব্যবস্থা নির্দেশ করেছে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَ لَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ ؕ وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوْمًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهٖ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفْ فِّي الْقَتْلِ ؕ اِنَّهٗ كَانَ مَنْصُوْرًا

'আর তোমরা সেই নাফসকে হত্যা করো না, যা আল্লাহ হারাম করেছেন, সঙ্গত কারণ ছাড়া। যে অন্যায়ভাবে নিহত হয় আমি অবশ্যই তার অভিভাবককে ক্ষমতা দিয়েছি। সুতরাং হত্যার ব্যাপারে সে সীমালঙ্ঘন করবে না; নিশ্চয় সে হবে সাহায্যপ্রাপ্ত।'[১৩]

কাউকে অবৈধভাবে হত্যা করাও কবীরা গুনাহ্। তবে উক্ত হত্যা আরো ভয়ঙ্কর বলে বিবেচিত হয় যখন তা এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে হয় যাকে বাঁচানো সবার নৈতিক দায়িত্ব এবং যাকে হত্যা করা একেবারেই অমানবিক। যেমন: নিষ্পাপ শিশু, নিজ মাতা-পিতা, নবী-রাসূল, ইনসাফ প্রতিষ্ঠাকারী রাষ্ট্রপতি অথবা উপদেশদাতা আলিমকে হত্যা করা। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন:

إِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِآيَاتِ اللهِ، وَيَقْتُلُوْنَ النَّبِيِّيْنَ بِغَيْرِ حَقٍّ، وَيَقْتُلُوْنَ الَّذِيْنَ يَأْمُرُوْنَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيْمٍ، أُوْلَائِكَ الَّذِيْنَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِيْ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَا لَهُمْ مِّنْ نَّاصِرِيْنَ

"নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ্ তায়ালার আয়াত ও নিদর্শনসমূহ অস্বীকার করে, অন্যায়ভাবে নবীদেরকে হত্যা করে এবং মানুষদের মধ্য থেকে যারা ন্যায় ও ইনসাফের আদেশ করে তাদেরকেও। (হে নবী) তুমি তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দাও। এদেরই আমলসমূহ ইহকাল ও পরকালে নষ্ট হয়ে যাবে এবং এদেরই জন্য তখন আর কেউ সাহায্যকারী হবে না"।[১৪]

আল্লাহ্ তায়ালা উক্ত হত্যাকারীকে চির জাহান্নামী বলে আখ্যায়িত করেছেন এবং তিনি তার উপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট। তেমনিভাবে তার উপর তাঁর অভিশাপ ও আখিরাতে তার জন্য দ্বিগুণ শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন,

وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيْهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيْمًا

---

[১২] আল কুরআন, ২৫ : ৬৮-৬৯
[১৩] আল কুরআন, ১৭ : ৩৩
[১৪] আল কুরআন, ৩ : ২১-২২

“আর যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় কোন মু'মিনকে হত্যা করে তার শাস্তি হবে জাহান্নাম। তার মধ্যে সে সদা সর্বদা থাকবে এবং আল্লাহ্ তায়ালা তার প্রতি ক্রুদ্ধ হবেন ও তাকে অভিশাপ দিবেন। তেমনিভাবে তিনি তার জন্য প্রস্তত রেখেছেন ভীষণ শাস্তি”।[১৫]

মানব হত্যাকে হাদীসেও অত্যন্ত কঠোর ভাষায় নিষেধ করা হয়েছে। যেমন বর্ণিত হয়েছে,

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَىُّ الذَّنْبِ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ قَالَ " أَنْ تَدْعُوَ لِلَّهِ نِدًّا، وَهْوَ خَلَقَكَ ". قَالَ ثُمَّ أَىٌّ قَالَ " ثُمَّ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ، أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ ". قَالَ ثُمَّ أَىٌّ قَالَ " ثُمَّ أَنْ تُزَانِيَ بِحَلِيلَةِ جَارِكَ ". فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ تَصْدِيقَهَا وَالَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلاَ يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا

হযরত আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসুল! আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বড় গুনাহ কোনটি? তিনি বললেন, তুমি আল্লাহ সাথে কাউকে সমকক্ষ সাব্যস্ত কর অথচ তিনই তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। লোকটি বলল, এরপর কোনটি? তিনি বললেন, তারপর হল, তুমি তোমার সন্তানকে এ ভয়ে হত্যা কর যে, সে তোমার সাথে আহার করবে। লোকটি বলল, এরপর কোনটি? তিনি বললেন, তারপর হল, তুমি তোমার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে যিনা কর। অতঃপর আল্লাহ এ কথার সত্যায়নে অবতীর্ণ করলেন, এবং তারা আল্লাহর সঙ্গে কোন ইলাহকে ডাকে না, আল্লাহ যার হত্যা নিষেধ করেছেন। যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে তাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না। যে এগুলো করে সে শাস্তি ভোগ করবে (২৫ : ৬৮)।[১৬]

ইচ্ছে করে হত্যার শাস্তিঃ

১। কেসাস অথবা দিয়াত বা ক্ষমা করে দেয়া।

আল্লাহ তাআলা যেমন বলেন,

وَ كَتَبۡنَا عَلَیۡهِمۡ فِیۡهَاۤ اَنَّ النَّفۡسَ بِالنَّفۡسِ ۙ وَ الۡعَیۡنَ بِالۡعَیۡنِ وَ الۡاَنۡفَ بِالۡاَنۡفِ وَ الۡاُذُنَ بِالۡاُذُنِ وَ السِّنَّ بِالسِّنِّ ۙ وَ الۡجُرُوۡحَ قِصَاصٌ ؕ فَمَنۡ تَصَدَّقَ بِهٖ فَهُوَ کَفَّارَۃٌ لَّهٗ ؕ وَ مَنۡ لَّمۡ یَحۡکُمۡ بِمَاۤ اَنۡزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِکَ هُمُ الظّٰلِمُوۡنَ

‘আর আমি এতে তাদের উপর অবধারিত করেছি যে, প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ, চোখের বিনিময়ে চোখ, নাকের বিনিময়ে নাক, কানের বিনিময়ে কান ও দাঁতের বিনিময়ে দাঁত এবং জখমের বিনিময়ে সমপরিমাণ জখম। অতঃপর যে তা ক্ষমা করে দেবে, তার জন্য তা কাফ্ফারা হবে। আর আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তার মাধ্যমে যারা ফয়সালা করবে না, তারাই যালিম।’[১৭]

---

[১৫] আল কুরআন, ৪ : ৯৩

[১৬] আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাইল ইবনে ইবরাহীম আল বুখারী, *সহীহ বুখারী শরীফ*, (كتاب الديات) ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, হাদীস নং ৬৩৯৬

[১৭] আল কুরআন, ৫ : ৪৫

এ ব্যাপারে হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

عَامَ فَتْحِ مَكَّةَ قَتَلَتْ خُزَاعَةُ رَجُلاً مِنْ بَنِي لَيْثٍ بِقَتِيلٍ لَهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " إِنَّ اللَّهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ وَسَلَّطَ عَلَيْهِمْ رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ، أَلاَ وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ قَبْلِي، وَلاَ تَحِلُّ لأَحَدٍ بَعْدِي، أَلاَ وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، أَلاَ وَإِنَّهَا سَاعَتِي هَذِهِ حَرَامٌ لاَ يُخْتَلَى شَوْكُهَا، وَلاَ يُعْضَدُ شَجَرُهَا، وَلاَ يَلْتَقِطُ سَاقِطَتَهَا إِلاَّ مُنْشِدٌ، وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا يُودَى وَإِمَّا يُقَادُ ". فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ يُقَالُ لَهُ أَبُو شَاهٍ فَقَالَ اكْتُبْ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " اكْتُبُوا لأَبِي شَاهٍ ". ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلاَّ الإِذْخِرَ، فَإِنَّمَا نَجْعَلُهُ فِي بُيُوتِنَا وَقُبُورِنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِلاَّ الإِذْخِرَ ".

মক্কা বিজয়ের বছর খুযা'আ গোত্রের লোকেরা জাহেলী যুগের স্বগোত্রীয় নিহত ব্যক্তির প্রতিশোধ হিসেবে বনী লায়স গোত্রের এক ব্যক্তিকে হত্যা করল। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়ালেন এবং বললেন, আল্লাহ মক্কা থেকে হস্তিদলকে রুখেছেন এবং তাদের বিরুদ্ধে আপন রাসুল ও মুমিনদেরকে কর্তৃত্ব দান করেছেন। জেনে রেখো! মক্কা আমার পূর্বে কারো জন্য হালাল হয়নি, আর আমার পরও কারো জন্য হালাল হবে না। জেনে রেখো! আমার ক্ষেত্রে তা দিনের কিছু সময়ের জন্য হালাল করা হয়েছে। সাবধান! তা আমার এ সময়ে এমন সম্মানিত, তার কাটা উপড়ানো যাবে না, তার বৃক্ষ কাটা যাবে না, তাতে পড়ে থাকা বস্তু মালিকের কাছে ফিরিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্য ব্যতীত ভুলে নেওয়া যাবে না।

আর যার কাউকে হত্যা করা হয় সে দু'প্রকার দণ্ডের যে কোন একটি প্রয়োগের ইখতিয়ার লাভ করবে। হয়ত রক্তপণ গ্রহণ করা হবে, নতুবা কিসাস নেওয়া হবে। এ সময় ইয়ামনবাসী এক ব্যক্তি দাঁড়াল, যাকে আবূ শাহ বলা হয়। সে বলল, হে আল্লাহর রাসুল! আমাকে লিখে দিন। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা আবূ শাহকে লিখে দাও। তারপর কুরাইশ গোত্রের এক ব্যক্তি দাঁড়াল। আর বলল, হে আল্লাহর রাসূল! ইযখির ব্যতীত। কেননা, আমরা তা আমাদের ঘরে, আমাদের কবরে ব্যবহার করি। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ইযখির ব্যতীত।[১৮]

২। উত্তরাধিকার সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হওয়া।

৩। কোন কোন ফকীহদের মতে তার কাফফারা আদায় করতে হবে।

৪। সে গুনাহগার বলে বিবেচিত হবে।

[১৮] আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাইল ইবনে ইবরাহীম আল বুখারী, *প্রাগুক্ত*, হাদীস নং ৬৪১৪

ইচ্ছার সাদৃশ্য শাস্তিঃ

১। দিয়াত : একশত উট, ৪০টি গর্ভবতী উঠনী, ৩০টি তিন বছরের, আর ৩০টি ৪ বছরের উট।

২। কাফফারা : কাফফারা একজন মুমিন দাস মুক্ত করা যদি তা সম্ভব নয় হয় তাহলে একাধারে দুমাস রোযা রাখা। কেউ কেউ বলে তা সম্ভব না হলে ৬০ জন মিসকিন খাওয়াতে হবে।

৩। উত্তরাধিকারী থেকে বঞ্চিত।

ভুলবশত হত্যার শাস্তি :

ভুলবশত হত্যার শাস্তি নিম্নরূপ-

১। একজন মুমিন দাস মুক্ত করা।

অথবা

২। মৃত ব্যক্তির পরিবারকে দিয়াত (রক্ত পণ) প্রদান করা।

ফকীহগণের, ঐক্যমতে হত্যাকারীর পরিবারের উপর দিয়াত আদায় করা ওয়াজিব, পরিবার তিন বৎসরের মধ্যে উহা পরিশোধ করার সুযোগ পাবে। প্রতি বৎসর ৩ ভাগের ১ ভাগ আদায় করবে।

দিয়াত হলো একশত উট। উহা তিন বৎসর কিস্তি পাঁচ প্রকারের উট দিয়ে আদায় করতে হবে। রাসূল (সা.) হত্যার দিয়াত সম্পর্কে যে ফয়সালা দিয়েছেন, তাহলো ২০টি আসন্ন প্রসবা উষ্ট্রী, ২০টি পুরুষ উট, ২০টি দুধওয়ালা, ২০টি প্রাপ্ত বয়স্ক, ২০টি ছোট।

মানবের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় ও মর্মান্তিক অপরাধ হচ্ছে কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা। মহান আল্লাহ সকল মানুষকেই সৃষ্টি করেছেন। কারো অধিকার নেই বৈধ কারণ ব্যতীত কাউকে হত্যা করা। এই ঘৃণ্য অপকর্ম পৃথিবীর সূচনা থেকেই অন্যায় এবং নিষিদ্ধ কর্ম হিসেবেই স্বীকৃত। হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মে অত্যন্ত কঠোর ভাষায় এ অপরাধ থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ইয়াহুদী-খ্রিস্ট এবং ইসলাম ধর্মে এটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ। যার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। এবং তিন ধর্মেই ইচ্ছাকৃতভাবে কাউকে হত্যা করা হলে কেবল সেক্ষেত্রেই মৃত্যুদণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে। ইসলাম ধর্মে এ শাস্তির পরিবর্তে দিয়াত অর্থৎ রক্তপণের ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে।

গবেষণার প্রাপ্তি ও সার্বিক পর্যালোচনা

বক্ষ্যমাণ অভিসন্দর্ভটিতে ইসলামী হুদুদ আইনের সাথে ইয়াহুদী, খ্রিস্ট, হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের আইনের সাথে তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে ইসলাম, ইয়াহুদী, খ্রিস্ট, হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের পরিচয়, প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য ও ধর্মীয় বিশ্বাস সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়েছে। আইনের সংজ্ঞা, প্রকারভেদ, উৎস, ইসলামী আইনের পরিচয়, বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি বিষয়েও নাতিদীর্ঘ আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে। ইসলামী আইনের দৃষ্টিতে হুদুদভুক্ত অপরাধসমূহ প্রমাণ পদ্ধতি কী, বিচারিক প্রক্রিয়া কী এ সম্পর্কেও আলোকপাত করা হয়েছে। বাংলাদেশ পৃথিবীর বৃহৎ মুসলিম দেশগুলোর একটি। এ দেশের মানুষ সবসময়ই ধর্মপ্রাণ হিসেবে পরিচিত। একাধিক গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে, এ দেশের মানুষ শরী'আহ আইনের বাস্তবায়ন চায়। বাংলাদেশে ইসলামী আইন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা কী এবং উত্তরণের পন্থা কী হতে পারে এ বিষয়েও সংক্ষিপ্ত আলোচনা স্থান পেয়েছে। নিম্নে গবেষণায় প্রাপ্ত উল্লেখযোগ্য দিকসমূহ সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো।

১. হুদুদভুক্ত অপরাধ নিন্দনীয়

হুদুদভুক্ত অপরাধের সংখ্যা ৮টি। মোটামুটি এবং সাধারণ ভাবে সব ধর্মেই হুদুদভুক্ত অপরাধ অত্যন্ত নিন্দনীয় এবং শাস্তিযোগ্য। হুদুদভুক্ত অপরাধের প্রতিটিই মানব সভ্যতার জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর ও মানব সভ্যতার উন্নতি ও সমৃদ্ধির পথে অন্তরায়। যেমন ব্যভিচারের কথা ধরা যাক। এর মাধ্যমে মানব জাতির বংশগত পবিত্রতা নষ্ট হয়। আবার মাদক সেবনের কারণে মানুষের বিবেক-বুদ্ধি লোপ পায়, কর্মক্ষমতা হ্রাস পায়। হুদুদভুক্ত অন্যান্য অপরাধও একইভাবে মানব জাতির জন্য ক্ষতিকর। যেকারণে প্রাচীনকাল থেকেই এসব বিষয় অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত। এমনকি আইয়্যামে জাহেলিয়াতের যুগে, যে যুগ অজ্ঞতার ও বর্ববরতার যুগ হিসেবে পরিচিত, সে যুগেও হুদুদভুক্ত অপরাধের ব্যাপক চর্চা হলেও এগুলো অন্যায় ও অপরাধ হিসেবেই বিবেচিত হতো। হত্যাসহ আরও বেশ কিছু অপরাধের শাস্তির ব্যবস্থা সে যুগেও বিদ্যমান ছিলো এবং তা অত্যন্ত কঠোর ভাবে আরোপ করা হতো। বক্ষ্যমান অভিসন্দর্ভের তৃতীয় অধ্যায়ে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

২. হুদুদভুক্ত অপরাধ মহাপাপ

ধর্মের দৃষ্টিতে মানুষের সকল কাজকেই প্রধানতঃ দু'ভাগে ভাগ বিভক্ত করা যায়, যথা-পাপ ও পূণ্য। যেসব কাজ মানুসসহ সকল সৃষ্টির জন্য কল্যাণ বয়ে নিয়ে আসে, সেসব পূণ্য হিসেবে বিবেচিত হয় এবং পূণ্য কর্মের জন্য রয়েছে পুরস্কার। বিপরীতে পাপের জন্য রয়েছে শাস্তির ঘোষণা। হুদুদভুক্ত অপরাধ ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার পথে অন্যতম অন্তরায়। সকল ধর্মেই হুদুদভুক্ত অপরাধকে অত্যন্ত কঠোর ভাষায় নিন্দা করা হয়েছে, মারাত্মক পাপের কাজ হিসেবে ধর্মীয় গন্থসমূহে উল্লেখ করা হয়েছে।

৩. ইহকালীন ও পরকালীন শাস্তি ভোগের কারণ

বক্ষ্যমাণ অভিসন্দর্ভে হুদুদভুক্ত অপরাধ সম্পর্কে ইসলাম, ইয়াহুদী, খ্রিস্ট, হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের অবস্থান তুলে ধরা হয়েছে। সব ধর্মেই এ অপরাধগুলো করা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ প্রদান করা হলেও দৃষ্টিভঙ্গিগত ও বিধাগত পার্থক্য রয়েছে। ইসলাম, ইয়াহুদী, খ্রিস্ট, হিন্দুধর্মে হুদুদভুক্ত অপরাধের ক্ষেত্রে ইহকালীন শাস্তির পাশাপাশি পরকালীন শাস্তির কথাও বলা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে বৌদ্ধ ধর্ম ব্যতিক্রম। বৌদ্ধ ধর্মে শুধু এসব অপরাধ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

৪. অপরাধীর জন্য রয়েছে শারীরিক শাস্তি

কেউ হুদুদভুক্ত অপরাধে লিপ্ত হলে তাকে শারীরিক কোনো শাস্তি ভোগ করতে হবে কিনা এ ব্যপারে আলোচিত ধর্মগুলোর দু'ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি পাওয়া যায়। ইসলাম, ইয়াহুদী, খ্রিস্ট, হিন্দু ধর্মে শারীরিক শাস্তির কথা বলা হলেও বৌদ্ধ ধর্মে এ অপরাধীর জন্য কোনো শাস্তি বিধানের কথা বলা হয়নি।

৫. শাস্তি বিধানের ক্ষেত্রে রয়েছে সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য

হুদুদভুক্ত অপরাধের শাস্তি বিধানের ক্ষেত্রে আলোচিত ধর্মগুলোর ক্ষেত্র বিশেষে এক ধর্মের সাথে অন্য ধর্মের সামঞ্জস্য রয়েছে। সেমিটিক ধর্ম হিসেবে হুদুদভুক্ত অপরাধসমূহের ক্ষেত্রে ইসলাম-ইয়াহুদী-খ্রিস্টধর্মের মাঝে কিছুটা সমাঞ্জস্য দেখা যায়। যেমন বিবাহিতের ব্যভিচারের ক্ষেত্রে রজম অর্থাৎ পাথর নিক্ষেপ করে হত্যার বিধান। মানব হত্যার ক্ষেত্রেও ইচ্ছাকৃত হত্যা, অনিচ্ছাকৃত হত্য ইত্যাদি প্রকারে ইসলাম-ইয়াহুদী-খ্রিস্টধর্মে ভাগ করে শাস্তি বিধান দেওয়া হয়েছে। আবার বৈসাদৃশ্যও রয়েছে অনেক। যেমন বাইবেলে ধর্ষিতার জন্য আবশ্যক হচ্ছে ধর্ষককে বিয়ে করা, অথচ কুরআনে তা বলা হয়নি। আবার সব ধর্মের আইন পূর্ণাঙ্গও নয়। সুতরাং সকল ধর্মের ধর্মীয় আইনকে একই দৃষ্টিতে পরিমাপ করা নির্ঘাত অজ্ঞতা।

৬. ওল্ড টেস্টামেন্টও খ্রিস্টধর্মের অনুসারীদের জন্য অনুসরণ অপরিহার্য

পবিত্র ইঞ্জিল বা বাইবেল নিউ টেস্টামেন্ট ঈসা (আ.) (যীশু খ্রিস্ট) এর উপর অবতীর্ণ ঐশী গ্রন্থ। বাইবেল নিউ টেস্টামেন্টে অনেক বিষয়ই সুনির্দিষ্ট কোনো বিধান বর্ণিত হয়নি। বিশেষত অপরাধ এবং এর শাস্তি বিধান, রাষ্ট্রব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয়ে। তবে এ ক্ষেত্রে সংশয় সৃষ্টির কোনো সুযোগ নেই। কারণ বাইবেল নিউ টেস্টামেন্টে খ্রিস্টধর্মে যেসব বিষয়ে সুনির্দিষ্টি বিধান নেই সেসব ক্ষেত্রে ইয়াহুদী ধর্মের বিধান অনুসরণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ ওল্ড টেস্টামেন্টের বিধানও খ্রিস্টধর্মের অনুসারীদের জন্য অনুসরণীয়।

৭. আইনের শাসন প্রসঙ্গ

আধুনিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আইনের শাসন একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক। যেসকল রাষ্ট্রে আইনের শাসন যত সুসংহত, ধারনা করা হয় সেসব রাষ্ট্রে নাগরিক অধিকার তত বেশি নিরাপদ। এ কারণে আইনের শাসন রাষ্ট্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ মানদণ্ড হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। আইনের শাসনের পূর্বশর্ত সাম্য, বিশেষত আইনের দৃষ্টিতে সমতার অধিকার। বাংলাদেশের সংবিধান, জাতিসংঘ কর্তৃক ১৯৪৮ সালে ঘোষিত মানবাধিকার সনদ, ওআইসি কর্তৃক ঘোষিত কায়রো

ঘোষণাতে অত্যন্ত গুরুত্বেও সাথে আইনের শাসন ও আইনের দৃষ্টিতে সমতার অধিকার ঘোষিত হয়েছে।হিন্দু ধর্মে বর্ণপ্রথাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। ধর্মীয়, সামাজিক, আইনগত সকল ক্ষেত্রেই বর্ণভেদে ভিন্ন ভিন্ন বিধান প্রদান করা হয়েছে। হুদুদভুক্ত অপরাধে লিপ্ত ব্যক্তির শাস্তি বিধানের ক্ষেত্রেও হিন্দু ধর্মে বর্ণ ভেদে ভিন্ন মাত্রার শাস্তি বিধানের কথা বলা হয়েছে। ইসলাম ধর্মে শাস্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রে কোনোরূপ বৈষম্য করা থেকে কঠোর ভাষায় বিরত থাকার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। ইসলাম ধর্মের শাস্তি আইনে অন্যান্য ধর্মের অধিকারও পূর্ণ সংরক্ষণ করা হয়েছে। ক্ষেত্র বিশেষে পার্থক্য থাকলেও তাযীরী শাস্তির মাধ্যমে সামঞ্জস্য রক্ষার সুযোগ রাখা হয়েছে ইসলামে। তাযীরী শাস্তি হচ্ছে, মহান আল্লাহ অথবা মানুষের অধিকার সংশ্লিষ্ট যে সকল অন্যায়র আচরণের জন্য কুরআন-হাদীসে সুনির্দিষ্ট কোন শাস্তি কিংবা কাফ্ফারা নির্ধারণ করে দেয়া হয়নি বরং অপরাধ ও এর পারিপার্শ্বিক বিষয়াদি বিবেচনায় নিয়ে বিচারক অপরাধীকে শাস্তি প্রদান করে থাকেন সে সব অপরাধের শাস্তিকে তাযীর বলে।

৮. অপরাধ প্রমাণ পদ্ধতি

কোনো ব্যাক্তির অপরাধ প্রমাণের জন্য প্রয়োজন অপরাধ প্রমাণের আইনসম্মত ও যৌক্তিক পদ্ধতি। ইসলাম ধর্মে হুদুদভুক্ত অপরাধ প্রমাণের সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। ইয়াহুদী এবং খ্রিস্টধর্মেও কিছু অপরাধের ক্ষেত্রে অপরাধ প্রমাণ পদ্ধতির কথা আলোকপাত করা হয়েছে। তবে অপরাধ প্রমাণ পদ্ধতি বিবেচনায় ইসলাম ধর্মের বিধান যথাযথ ও যৌক্তিক।

৯. ভূক্তভোগীর অবস্থান

যে কোনো অপরাধ সংঘটিতে হলে কাউকে না কাউকে এর ভূক্তভোগী হতে হয়। ইসলাম ধর্মে ভূক্তভোগীকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ ব্যভিচার এবং ধর্ষণের শাস্তির কথা বলা যেতে পারে। ব্যভিচার এবং ধর্ষণের ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তির অধিকার একমাত্র ভূক্তভোগীকেই প্রদান করা হয়েছে।হিন্দু, ইয়াহুদী এবং খ্রিস্টধর্মে অনেক ক্ষেত্রে ভূক্তভোগীর পরিবর্তে ভূক্তভোগীর বাবা, স্বামীকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এ ক্ষেত্রেও ব্যভিচার এবং ধর্ষণের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এ ধরনের বিধান স্পষ্টতই নারী বিদ্বেষী এবং অন্যায্যতার প্রমাণ বহন করছে।

১০. মানবাধিকার প্রসঙ্গ

বর্তমান বিশ্বেও বহুল আলোচিত বিষয়গুলোর একটি মানবাধিকার। ইসলাম ধর্মের শাস্তি আইনে মানবাধিকার সংরক্ষিত হয়েছে। যে কারণে দেখা যায়, শাস্তি প্রদানের পূর্বে অপরাধীর শারীরিক অবস্থা বিবেচনায় নিতে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে, মুখমণ্ডলে আঘাত করতে নিষেধ করা হয়েছে, ক্ষেত্র বিশেষে অপরাধীকে সংশোধনের সুযোগ প্রদানের নির্দেশ প্রদান করেছে, অহেতুক আটক রাখতে নিষেধ করা হয়েছে।

হুদুদ অপরাধ সংগঠনের মাধ্যমে অন্যের অধিকার লংঘিত হয়। অন্যকে সমজে ঘৃণার পাত্রে পরিণত করার সুযোগ সৃষ্টি হয়। উদাহরণস্বরূপ ব্যভিচারের অপবাদের কথা বলা যেতে পারে। কারো প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ আরোপের মাধ্যমে ব্যক্তির চরিত্র হনন করা হয়, তাকে সমাজের কাছে ছোট করা হয়। যে কারণে ইসলাম ধর্মে ব্যভিচারের অপবাদ আরোপকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

১১. নারী ও শিশু অধিকার

ইসলাম ধর্মের শাস্তি আইনে নারী ও শিশু অধিকার সংরক্ষিত হয়েছে। কোনো কোনো ধর্মে ধর্ষণের শিকার নারীকে ধর্ষকের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার নির্দেশ প্রদান করা হলেও ইসলাম ধর্মে এ ধরনের বিধান নেই। কোনো নারী ভূক্তভোগী আপস-মীমাংসা করতে চাইলে ইসলাম ধর্মে এ অধিকার শুধু ঐ নারীকেই প্রদান করা হয়েছে। হিন্দু ধর্মে কিছু ক্ষেত্রে এ অধিকার ভূক্তভোগী নারীর পিতাকে দেওয়া হয়েছে। এর পাশাপাশি অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশুদের সংশোধনের সুযোগও ইসলাম ধর্মে রাখা হয়েছে। হিন্দু ধর্মেও এ সুযোগ রাখা হয়েছে।

১২. বিবাদীর মর্যাদা ও অধিকার

মানুষ হিসেবে সকল মানুষই মহান আল্লাহর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির মর্যাদা ভোগ করার অধিকার রাখে। এমনকি একজন অপরাধীকে ইসলাম এ মর্যাদা প্রদান করেছে। যে কারণে ইসলাম ধর্মে বিবাদীর পূর্ণ মর্যাদা ও অধিকার সংরক্ষিত হয়েছে। শাস্তি ভোগকারীর ব্যাপারে কটু কথা বলতেও নিষেধ করা হয়েছে। বিবাদীকে তার আত্মপক্ষ সমর্থনের পূর্ণ সুযোগ প্রদান করা হয়েছে। যাতে করে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়।

১৩. ধর্ম ও নৈতিকতা

নৈতিকতা ব্যতীত কোনো সমাজ ও রাষ্ট্র কাঙ্খিত সুখ-সমৃদ্ধি লাভ করতে পারে না। প্রতিটি মানুষকে নৈতিক মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা সকল ধর্মেরই অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যসমূহের একটি। নৈতিকতা হচ্ছে সত্য ও সুন্দরের প্রতি অনুরাগ এবং অসত্য ও অসুন্দরের প্রতি বিরাগ। নৈতিকতার দাবি হচ্ছে মানুষ বিবাহ বহির্ভূত যৌনতায় লিপ্ত হবে না। যদিওবা পশ্চিমা অনেক দেশেই অবাধ যৌনাচারকে এখন আর অনৈতিক, অশোভন, অশ্লীল ও অপরাধ মনে করা হয় না। বরং এগুলোকে মনে করা হচ্ছে মানুষের অধিকার হিসেবে। অনেক রাষ্ট্র এগুলোকে আইনী বৈধতাও প্রদান করেছে। কিন্তু প্রতিটি ধর্মেই অবাধ যৌনতার মতো অনৈতিকতার বিপক্ষে, নিয়ন্ত্রিত ও বৈধ যৌন সম্পর্ক অর্থাৎ বিবাহের পক্ষে জোরালো অবস্থান ঘোষণা করা হয়েছে।

১৪. ধর্মীয় আইনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য

ধর্মীয় বিধানাবলী সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য বাস্তবায়নে প্রণয়ন করা হয়েছে। ধর্মীয় আইনের অন্যতম উদ্দেশ্য, মানুষের মাঝে নৈতিকতার চর্চা বৃদ্ধি করা এবং মানুষকে অপরাধ প্রবণতা থেকে বিরত রাখা। যে কারণে ইসলাম ধর্মে অত্যন্ত কঠোর শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে। অন্যান্য ধর্মেও শাস্তি বিধানের ক্ষেত্রে কঠোরতা লক্ষ্য করা যায়। যাতে মানুষ শাস্তির ভয়ে হলেও অপরাধ থেকে বিরত থাকে। মানুষের জীবন-সম্পদ-সম্ভ্রমের নিরাপত্তা নিশ্চিত করাও ধর্মীয় আইনের অন্যতম উদ্দেশ্য।

সুপারিশ

১. ধর্মচর্চা বৃদ্ধি

অপরাধ প্রবণতা সমাজের শান্তি-শৃঙ্খলা নষ্ট করে, সমাজে অস্থিরতা সৃষ্টি করে। অপরাধ প্রবণতার কারণেই মানুষের জীবন-সম্পদ-সম্ভ্রম অনিরাপদ হয়ে পড়ে। অপরাধ প্রবণতা দূরীকরণে ধর্মের ভূমিকা অনস্বীকার্য। কারণ মানুষ স্বপ্রণোদিত হয়ে ধর্মচর্চা করে, অপরাধ থেকে বিরত থাকা ধর্মীয় দায়িত্ব বলে মনে করে। মাদক, অবাধ যৌনাচার অনেক সমাজে অনুমোদিত হলেও ধর্মীয় কারণে ঐ সমাজের অনেকেই এ ধরনের অনৈতিক অপরাধ থেকে নিজেদের রক্ষা করে চলেন। সুতরাং রাষ্ট্রের সকল ক্ষেত্রে ধর্ম চর্চা বৃদ্ধি করা আবশ্যক।

২. ধর্ম ও ধর্মীয় আইন শিক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ

প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় ধর্ম ও ধর্মীয় আইন সম্পর্কে জানার সুযোগ সীমিত। যে কারণে সমাজে ধর্ম ও ধর্মীয় আইন নিয়ে রয়েছে নানা ধরনের অস্পষ্টতা। যা থেকে সৃষ্টি হচ্ছে নানা অনাচার ও কুসংস্কার। উদাহরণস্বরূপ জিহাদের কথা বলা যেতে পারে। এমন কোনো প্রকৃত আলেম নেই যারা আত্মঘাতী হামলার সমর্থন করেন, হলি আর্টিজানের হামলার সমর্থন করে, আইএসের কার্যক্রম সমর্থন করে। কিন্তু শিক্ষিত তরুণরা এসব কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়েছে জিহাদের নামে। তারা জিহাদের অর্থ জানে না, ইমাম সুয়ূতী (রহ.) জিহাদের ৮০ টি অর্থ করেছেন। কোন প্রেক্ষাপটে জিহাদ করতে হয়, জিহাদের শর্ত কী, রাসূলুল্লাহ (সা.) কী মূলনীতি ঠিক করে দিয়েছেন এসব সম্পর্কে তাদের নামমাত্র ধারনা আছে এমনটি বলার সুযোগ নেই তাদের কর্মকাণ্ড দেখে। সুতরাং এসব অনাচার ও কুসংস্কার থেকে জাতিকে রক্ষা করতে ধর্ম ও ধর্মীয় আইন শিক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ অত্যন্ত জরুরী।

৩. ধর্মীয় আইন বিষয়ক ব্যাপক আলোচনা ও গবেষণার উদ্যোগ গ্রহণ

রাষ্ট্রীয় আইন হিসেবে ধর্মীয় আইন প্রণয়নের পূর্বে ধর্মীয় আইনের যৌক্তিকতা, পূর্ণাঙ্গতা ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তর আলোচনা ও গবেষণা জরুরী। এর মাধ্যমে ধর্মীয় আইন নিয়ে জনসাধারণের অস্পষ্টতা দূর হবে, ধর্মীয় আইনের

প্রাসঙ্গিকতাও জনসাধারণ জানার সুযোগ পাবে। কোনো ধর্মের ধর্মীয় আইনে কোনো অসংলগ্নতা থাকলে তাও দূর করা সম্ভব হবে এর মাধ্যমে।

৪. ধর্মীয় আইন পরিষদ গঠন

সরকারের উদ্যোগে ধর্মীয় আইন পরিষদ গঠন করা যেতে পারে। এ পরিষদের কাজ হবে ধর্মীয় আইন বিশ্লেষণ, পর্যালোচনা, কার্যকারিতা, উপযোগিতা ইত্যাদি বিষয় গবেষণা করা। সরকার রাষ্ট্রে নতুন কোনো আইন প্রনয়ন করতে চাইলে এ পরিষদের কাছ থেকে পরামর্শ গ্রহণ করবে, ধর্মীয় ব্যাখ্যা গ্রহণ করবে।

৫. ধর্মীয় আইনের একক ব্যাখ্যা গ্রহণে উদ্যোগ গ্রহণ

ধর্মীয় আইনের ক্ষেত্রে একই বিষয় একাধিক বিধান দেখা যায়। যেমন চোর কী পরিমাণ সম্পদ চুরি করলে তার হাত কাটা হবে এ বিষয় ইসলামে একাধিক মতামত রয়েছে। এখন ইসলামী আইনকে রাষ্ট্রীয় আইনে পরিণত করতে চাইলে সব বিষয়ই একক ব্যাখ্যা গ্রহণ করতে হবে। অন্যথায় বৈষম্য সৃষ্টি হওয়ার সমূহ সম্ভবনা রয়েছে।

৬. ধর্মীয় আইনের অস্পষ্টতা দূরীকরণ

ধর্মীয় আইনে কিছু কিছু ক্ষেত্রে অস্পষ্টতা দেখা যায়, কোনো কোনো ধর্মের ধর্মীয় আইনে কিছু কিছু বৈপরীত্যও লক্ষণীয়। ধর্মীয় আইনকে রাষ্ট্রীয় আইনে পরিণত করতে চাইলে যেসব অস্পষ্টতা রয়েছে তা দূর করতে কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ জরুরী। ধর্মীয় আইনে বিদ্যমান অস্পষ্টতা দূরীকরণে প্রধানতঃ ধর্মীয় আইন শাস্ত্রে পণ্ডিত ব্যক্তিগণকেই এগিয়ে আসতে হবে।

৭. রাষ্ট্রীয় আইন প্রণয়নের পূর্বে ধর্মীয় আইন বিশ্লেষণ

ইসলাম ধর্মে মানব জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় সার্বিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে, দেয়া হয়েছে রাষ্ট্র গঠন, রাষ্ট্র পরিচালনা, অপরাধের শাস্তি বিধানসহ প্রাসঙ্গিক সকল বিধিবিধান। ধর্মীয় আইন রাষ্ট্রে প্রণয়নের পূর্ব পর্যন্ত রাষ্ট্রের যে কোনো আইন প্রণয়নের পূর্বে ধর্মীয় আইনবিদগণের পরামর্শ গ্রহণ করা যেতে পারে।

৮. ধর্মীয় আইন প্রণয়নে জনমত যাচাই

আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কাঠামোতে জনমতকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় নেয়া হয়। ধর্মীয় আইনকে রাষ্ট্রীয় আইন হিসেবে পরিণত করতে জনমত যাচাই করা যেতে পারে। জনমত ধর্মীয় আইনের পক্ষে থাকলে রাষ্ট্র নাগরিদেরকে এ থেকে বঞ্চিত করার অধিকার রাখে না।

৯. ধর্মের নামে কুসংস্কার চর্চা রোধ

ধর্ম ও ধর্মীয় আইনের নামে সমাজে নানা ধরনের কুসংস্কার বিদ্যমান রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ হিল্লা বিয়ের কথা বলা যেতে পারে। ইসলাম ধর্মে হিল্লে বিয়েকে অভিশপ্ত বলা হলেও বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে এখনও হিল্লা বিয়ে চালু রয়েছে ধর্মের নামে। শুধু হিল্লা বিয়ের ক্ষেত্রেই নয় বরং আরও কিছু কিছু ক্ষেত্রে ধর্মের নামে সামাজিক রীতি-রেওয়াজ ও কুসংস্কার চাপিয়ে দিতে দেখা যায়।

১০. হুদুদভূক্ত অপরাধগুলো ব্যক্তি, রাষ্ট্র, সমাজ জীবনের জন্য ক্ষতিকর বলেই এ অপরাধগুলো প্রতিরোধ এবং নির্মূলের জন্য হুদুদ শাস্তিবিধান প্রণয়ন করা হয়েছে। অতএব সব ধর্মাবলম্বীদের মতামত গ্রহণ করে মানব জাতির কল্যাণের জন্য হুদুদ আইন কার্যকর করার উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন।

১১. কোনো ধর্মই পাপকাজ বা অন্যায় কাজ সমর্থন করে না। একই সাথে বলা যায়, সব ধর্মের অনুশাসনগুলো মানব জাতির কল্যাণের জন্যই প্রণীত হয়েছে। অতএব সব ধর্মের অনুসারীদের মানবতার কল্যাণের জন্য হুদুদ আইন কার্যকর করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত।

১২. ইসলাম কেবল কতিপয় অনুষ্ঠান সর্বস্ব ধর্মই নয় বরং এটি একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধানের নাম। আর ইসলামী জীবন ব্যবস্থা কিয়ামত পর্যন্ত সব সমাজ ও পরিবেশে যথাযথ ভাবে কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম। অতএব মানব জাতির শান্তি, সমৃদ্ধি ও মুক্তির জন্য একটি অপরাধমুক্ত সুন্দর বিশ্ব বিনির্মাণ করতে চাইলে সর্ব ধর্মাবলম্বীদের মতামতের ভিত্তিতে ইসলামী হুদুদ আইন কার্যকর করার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিত।

উপসংহার

একটি রাষ্ট্র ও সমাজে সব সময়ই দুই শ্রেণির মানুষের বসবাস। একটি শ্রেণি সত্যের পক্ষে, ন্যায়ের পক্ষে। অপর একটি শ্রেণি অসত্য ও অন্যায়ের পক্ষে। প্রথম শ্রেণিভূক্ত মানুষ কখনো অন্যায় কর্মে লিপ্ত হয় না। তাদের দ্বারা কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হয় না, এমনকি পশু-পাখিও না। এরা নিজেরা ভালো থাকে, অন্যদের ভালো রাখতে সর্বাত্মক চেষ্টা করে। অপরদিকে, দ্বিতীয় শ্রেণিভূক্ত মানুষেরা নিজেদের নানা অপকর্মে জড়িয়ে ফেলে। যা তাদের নিজেদের এবং অন্যদেরও ক্ষতিগ্রস্ত করে। তাদের কারণে মানুষের অধিকার হরণ, সমাজে অশান্তির সৃষ্টি হয়। এ অবস্থায় দ্বিতীয় শ্রেণিকে নিয়ন্ত্রণ করা অত্যন্ত জরুরী। তা না হলে মানব সভ্যতাই হুমকির মুখে পড়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। পৃথিবীকে শান্ত, সুশৃঙ্খল ও মানব সভ্যতার স্বাভাবিক বিকাশ ধরে রাখতেই প্রয়োজন পরে আইন ও শাস্তি বিধানের।

প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকেই রীতি-নীতি, বিধি-বিধান, আইন-কানুন ও শাস্তি বিধানের প্রচলন। যদিওবা একদিনেই আইন ও বিচারব্যবস্থা আজকের এ অবস্থানে আসেনি। বরং বহু গ্রহণ-বর্জনের মধ্যে দিয়ে আজকের এ অস্থায় এসেছে। এবং এখনও প্রতিনিয়তই প্রচলিত আইন ও শাস্তি পরিবর্তীত হচ্ছে। এক দেশের আইনের সাথে অন্য দেশের আইনে রয়েছে বিস্তর ফারাক। একই অপরাধে ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন মাত্রার শাস্তি প্রদান করা হচ্ছে।

ধর্ম মানবজীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। ইতিহাসে এমন কোনো সমাজ বা সভ্যতা নেই যে সমাজ বা সভ্যতায় ধর্মের অস্তিত্ব পাওয়া যায় না। ধর্মের প্রধান কাজ মানুষকে অপরাধ থেকে দূরে রাখা। প্রতিটি ধর্মই অন্যায় সম্পর্কে মানুষকে সাবধান করেছে। এর ক্ষতিকর দিকগুলো তুলে ধরেছে। অপরাধের শাস্তি বিধানও কোনো কোনো ধর্মে বর্ণিত হয়েছে।

বক্ষ্যমাণ গবেষণা অভিসন্দর্ভে আমরা আটটি অপরাধ নিয়ে আলোচনা করেছি, যেগুলো ইসলামী আইনে হুদুদ হিসেবে পরিচিত। এর মধ্যে মদ্যপান শুধুমাত্র অপরাধী ব্যক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট এবং অপরাধীর একক ক্ষতির আশঙ্কা বেশি। যদিওবা পরোক্ষভাবে অন্যরাও ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। অন্য সাতটি অপরাধই অন্যের অধিকারের

সাথে সংশ্লিষ্ট এবং অত্যন্ত জঘণ্য অপরাধ। আলোচিত ধর্মসমূহ তথা ইসলাম, ইয়াহুদী, খ্রিস্ট, হিন্দু ও বৌদ্ধ এ সকল অপরাধের কোনোটি সমর্থন করে না। বরং প্রতিটি ধর্মই তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও চেতনা অনুযায়ী এসব অপরাধের নিন্দা করেছে, শাস্তি বিধানের কথা বলেছে। আমাদের রাষ্ট্রীয় আইনেও এগুলো অপরাধ হিসেবেই বিবেচিত।

শাস্তির ক্ষেত্রে বাহ্যত ইসলামী আইন তুলনামূলক কঠোর। এর কারণও আমরা আলোচনা করেছি। আবারও উল্লেখ করছি। মূলতঃ ইসলামী আইনের উদ্দেশ্য একটি অপরাধ মুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা। সমাজের সকল মানুষকে অপরাধ থেকে নিবৃত করে একটি নৈতিক, মানবিক ও শান্তিপূর্ণ সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা। সেই সাথে প্রত্যকটি ব্যক্তির অধিকার রক্ষায়ও ইসলাম সচেষ্ট। শাস্তির কঠোরতা বিবেচনা করে সাধারণত মানুষ অপরাধ থেকে বিরত থাকবে, এটাই ইসলামের প্রত্যাশা। সেই সাথে অপরাধীর শাস্তি দেখে অন্যরাও শিক্ষা গ্রহণ করবে, নিজেরা অপরাধ থেকে দূরে থাকবে। যেকারণে ইসলাম এ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

মহানবী (সা.), খুলাফায় রাশেদা এবং পরবর্তী মুসলিম শাসকগণ ইসলামী আইন ও ইসলাম নির্ধারিত শাস্তি বিধান প্রয়োগ করেই প্রায় অপরাধহীন সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। সারকথা হচ্ছে, অন্যায় অপরাধ মুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যেই ইসলাম শাস্তি আইন আরোপ করেছে, কাউকে অন্যায়ভাবে শাস্তি প্রদান করার জন্য নয়। এবং ইসলামের এ দৃষ্টিভঙ্গিই অত্যন্ত যৌক্তিক। একটি সুখী, সমৃদ্ধশীল বিশ্ব নির্মাণে ইসলামী আইনের প্রতিষ্ঠা সময়ের দাবি। তবে আইনের বৈষম্যহীন প্রয়োগ ব্যতীত কোনোভাবেই অপরাধ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়।

পরিশিষ্ট

বাংলাদেশের আইনে হুদুদ সংশ্লিষ্ট অপরাধসমূহের শাস্তি

হুদুদভুক্ত অপরাধসমূহ পৃথিবীর অধিকাংশ দেশেই শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত। বাংলাদেশের প্রচলিত আইনেও এগুলোকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসিবে গ্রহণ করা হয়েছে। ইসলামী আইনে বর্ণিত শাস্তি বিধানের সাথে বাংলাদেরশের আইনের সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য উভয়ই রয়েছে। যেমন ধর্ষণের ব্যাপারে ইসলামী আইন ও প্রচলিত আইনে মৃত্যুদণ্ডের কথা বলা হয়েছে। এটা সামঞ্জস্যতার দৃষ্টান্ত। আবার মাদক সেবনের ব্যাপারে ইসলামী আইনে বেত্রাঘাতের কথা বলা হলেও প্রচলিত আইনে জেল-জরিমানার কথা বলা হয়েছে। এটা বৈসাদৃশ্যের দৃষ্টান্ত। নিম্নে বাংলাদেশের প্রচলিত আইনে হুদুদভুক্ত অপরাধের শাস্তিবিধান তুলে ধরা হলো।

মাদক গ্রহণ

মাদক নিয়ন্ত্রন আইন ২০১৮ অর্থাৎ মাদকদ্রব্যের নিয়ন্ত্রণ, সরবরাহ ও চাহিদা হ্রাস, অপব্যবহার ও চোরাচালান প্রতিরোধ এবং মাদকাসক্তদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসনকল্পে বিধান প্রণয়নের জন্য প্রণীত পূর্ণঙ্গ আইন নিম্নে তুলে ধরা হলো-

প্রথম অধ্যায়

প্রারম্ভিক

সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন

১। (১) এই আইন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ নামে অভিহিত হইবে।

(২) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে তারিখ নির্ধারণ করিবে সেই তারিখ হইতে এই আইন কার্যকর হইবে।

এস, আর, ও নং ৩৬২-আইন/২০১৮, তারিখঃ ১০ ডিসেম্বর, ২০১৮ ইং দ্বারা ১৩ পৌষ, ১৪২৫ বঙ্গাব্দ মোতাবেক ২৭ ডিসেম্বর, ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ উক্ত আইন কার্যকর হইয়াছে।

সংজ্ঞা

২। বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই আইনে,-

(১) 'অধিদপ্তর' অর্থ ধারা ৪ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বা স্থাপিত মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর;

(২) 'অ্যাগনিস্ট (Agonist)' অর্থ এইরূপ কোনো বস্তু যাহা তপশিলে উল্লিখিত কোনো মাদকদ্রব্যের রাসায়নিক গঠনের অনুরূপ গঠনবিশিষ্ট বস্তু না হওয়া সত্ত্বেও আসক্তি সৃষ্টিকারী মনোদৈহিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টিতে উক্ত বস্তুর মতো একইভাবে কার্যকর;

(৩) ‘অ্যানালগ (Analogue)’ অর্থ তপশিলের অন্তর্ভুক্ত হয় নাই এইরূপ বস্তু, যাহার রাসায়নিক সংগঠন তপশিলের অন্তর্গত কোনো মাদকের রাসায়নিক সংগঠনের অনুরূপ এবং যাহার আসক্তি সৃষ্টিকারী মনোদৈহিক কার্যক্রম একই রকম;

(৪) ‘অ্যালকালয়েড (Alkaloid)’ অর্থ তপশিলের উল্লিখিত কোনো বস্তু বা মাদকদ্রব্য হইতে রাসায়নিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রাপ্ত কোনো বস্তু যাহার আসক্তি সৃষ্টিকারী মনোদৈহিক প্রতিক্রিয়া মূল মাদকদ্রব্য বা মাদকজাতীয় বস্তুটির অনুরূপ;

(৫) ‘অ্যালকোহল (Alcohol)’ অর্থ 1[হাইড্রোকার্বনজাত হাইড্রোক্সিল (OH-] মূলকসম্বলিত কোনো জৈব যৌগ অথবা তপশিলের ‘খ’ শ্রেণির মাদকদ্রব্যের ক্রমিক নং ৩ এবং ‘গ’ শ্রেণির মাদকদ্রব্যের ক্রমিক নং ১ ও ২ এ উল্লিখিত কোনো তরল পদার্থ;

(৬) ‘আইসোমার (Isomer)’ অর্থ দুই বা ততোধিক সমগোত্রীয় পদার্থের যেকোনো একটি, যাহা একই উপাদান দ্বারা একই আনুপাতিক হারে গঠিত, কিন্তু উহাতে পারমাণবিক বিন্যাসের তারতম্যের কারণে কতিপয় গুণগত বৈশিষ্ট্যের ভিন্নতা রহিয়াছে;

(৭) ‘উৎপাদন বা প্রক্রিয়াজাতকরণ’ অর্থ কোনো মাদকদ্রব্যকে কোনো বস্তু হইতে সংগ্রহ, পরিশোধন, রাসায়নিক বিন্যাস ও বিশ্লেষণ, তৈরি, উহার সহিত কোনো কিছু দ্রবীভূত অথবা মিশ্রিত করা, উহাকে অন্য কোনো মাদকদ্রব্য, কিংবা উহার উপজাত দ্রব্য অথবা যৌগ কিংবা উহা হইতে উদ্ভূত অথবা প্রস্তুতকৃত কোনো পদার্থ (যাহাতে উক্ত পদার্থ উহার রাসায়নিক গুণাগুণ ও মনোদৈহিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির ক্ষমতাসহ বিদ্যমান) কিংবা উহার কোনো অ্যালকালয়েড, সল্ট, আইসোমার, অ্যানালগ কিংবা অ্যাগনিস্ট যে বাণিজ্যিক নামে অথবা আকারেই থাকুক নামে অথবা আকারেই থাকুক না কেন ইত্যাদিতে রূপান্তরিত করা কিংবা উহা নির্দিষ্ট পরিমাণ ও মাত্রায় বিভাজন ও বিন্যস্ত করা;

2[(৭ক) ‘এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত’ অর্থ ফৌজদারী কার্যবিধি অনুযায়ী, ক্ষেত্রমত, অপরাধ আমলে গ্রহণের অথবা বিচারের এখতিয়ারসম্পন্ন কোনো আদালত;]

(৮) ‘ওয়াশ (Wash)’ অর্থ শর্করা কিংবা শ্বেতসার অথবা সেলুলোজসংবলিত যেকোনো বস্তুকে পানি ও অন্যান্য উপকরণ সহযোগে গাঁজানোর মাধ্যমে উৎপন্ন অ্যালকোহল মিশ্রিত কোনো দ্রবণ;

(৯) ‘ক’শ্রেণির মাদকদ্রব্য, ‘খ’ শ্রেণির মাদকদ্রব্য ও ‘গ’শ্রেণির মাদকদ্রব্য অর্থ তপশিলে উল্লিখিত যথাক্রমে ‘ক’, ‘খ’ ও ‘গ’ শ্রেণির মাদকদ্রব্য;

(১০) ‘ক্ষমতাপ্রাপ্ত অফিসার’ অর্থ ধারা ২৩ এ উল্লিখিত কোনো অফিসার;

(১১) ‘চাষাবাদ’ অর্থ কোনো মাদকদ্রব্যের উৎস হইতে পারে এইরূপ কোনো উদ্ভিদের বীজ বপন, চারা রোপণ, কলমকরণ, চারা উৎপাদন এবং তাহা হইতে মাদকদ্রব্যের কাঁচামাল, উপাদান, উপকরণ সংগ্রহ করা;

(১২) ‘চিকিৎসক’ অর্থ বাংলাদেশ মেডিক্যাল ও ডেন্টাল কাউন্সিল আইন, 2010 (2010 সনের 61 নং আইন) এর ধারা 2 এর দফা (16) এবং (18) এ সংজ্ঞায়িত যথাক্রমে স্বীকৃত ডেন্টাল চিকিৎসক ও স্বীকৃত মেডিক্যাল চিকিৎসক; এবং Bangladesh Homeopathe Practitioners Ordinance, 1983 (Ordinance XLI of 1983) অনুসারে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত অথবা স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে হোমিওপ্যাথিক ডিগ্রিধারী ব্যক্তি এবং Bangladesh Veterinary

Practitioner Ordinance, 1982 (XXX of 1982) এর section 2(g) তে সংজ্ঞায়িত Registered Veterinary Practitioner;

(১৩) 'তপশিল' অর্থ এই আইনের সহিত সংযুক্ত কোনো তপশিল;

(১৪) 'দখল অথবা ধারণ' অর্থ কোনো পদার্থ অথবা উপকরণ অথবা বস্তু সজ্ঞানে কোনো ব্যক্তির অঙ্গপ্রতঙ্গে, পোশাকে অথবা মালিকানায় অথবা স্বত্বাধিকারে, নিয়ন্ত্রণে অথবা কর্তৃত্বে থাকা অথবা কোনো ব্যক্তি কর্তৃক কোনোকিছু সংরক্ষণ, গুদামজাতকরণ, প্রদর্শন, দখল অথবা ধারণ করা;

(১৫) 'নিয়ন্ত্রিত বিলি (Control Delivery)' অর্থ কোনো মাদকদ্রব্য অপরাধ সংঘটনে জড়িত ব্যক্তিদের সনাক্ত করিবার উদ্দেশ্যে পরিচালিত বিশেষ তদন্ত কৌশল, যাহাতে কোনো মাদকদ্রব্য, উহার উৎসবস্তু, উপাদান অথবা মিশ্রণের বেআইনি অথবা সন্দেহজনক চালানকে তদন্তের ক্ষমতাসম্পন্ন কোনো আইন প্রায়োগকারী সংস্থার (সরকারের) জ্ঞাতসারে ও তত্ত্বাবধানে শেষ গন্তব্য পর্যন্ত পরিবহন ও বিতরণ অথবা হস্তান্তর করিতে দেওয়া যাহার মাধ্যমে শেষ পর্যন্ত উক্ত মাদকদ্রব্যের উৎস হইতে গন্তব্য পর্যন্ত যাবতীয় কার্যক্রমের সহিত জড়িত সকল অপরাধীকে গ্রেফতার করা যায়;

(১৬) 'পারমিট' অর্থ এই আইনের ধারা ১৩ এর অধীন প্রদত্ত কোনো পারমিট;

(১৭) 'পাস' অর্থ এই আইনের ধারা ১৩ এর অধীন প্রদত্ত কোনো পাস;

(১৮) 'পুনর্বাসন' অর্থ এমন কোনো কার্যক্রম অথবা কর্মসূচি যাহার মাধ্যমে কোনো মাদকাসক্ত ব্যক্তিকে স্বাভাবিক পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে প্রতিষ্ঠিত করা;

(১৯) 'প্রিকারসর কেমিক্যালস (Precursor Chemicals)' অর্থ তপশিলের 'ক' শ্রেণির মাদকদ্রব্য অংশের ৮ নং ক্রমিকে উল্লিখিত এবং সময়ে সময়ে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা সরকার কর্তৃক ঘোষিত কোনো প্রিকারসর কেমিক্যালস যাহা মাদকদ্রব্য উৎপাদনের উপাদান অথবা উপকরণ হিসাবে অপব্যবহৃত হইতে পারে;

(২০) 'ফৌজদারী কার্যবিধি' অর্থ Code of Criminal Procedure, 1898 (Act V of 1898);

(২১) 'বাহন' অর্থ বিমান, মোটরযান, জলযান এবং রেলগাড়িসহ যেকোনো প্রকারের বাহন;

(২২) 'বাজেয়াপ্তযোগ্য বস্তু' অর্থ ধারা ২৬ এ উল্লিখিত কোনো দ্রব্য বা বস্তু বা মাদকদ্রব্য;

(২৩) 'বিধি' অর্থ ধারা ৬৮ এর অধীন প্রণীত কোনো বিধি;

(২৪) 'বিয়ার' অর্থ মল্ট ও হপস্ সহযোগে ব্রিউইং (Brewing) পদ্ধতিতে ব্রিউয়ারিতে প্রস্তুতকৃত অন্যূন ০.৫% (দশমিক পাঁচ শতাংশ) অ্যালকোহলযুক্ত কোনো পানীয়;

(২৫) 'ব্রিউয়ারি' অর্থ বিয়ার অথবা বিয়ারের গুণাগুণসম্পন্ন যে-কোনো তরল পদার্থ প্রস্তুতের স্থাপনা, যন্ত্রপাতি, কারখানা অথবা কেন্দ্র;

3[(২৬) 'ব্যক্তি' অর্থে যে কোনো কোম্পানী, প্রতিষ্ঠান, সংবিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষ অথবা অনুরূপ সংঘ বা সমিতিও অন্তর্ভুক্ত হইবে;]

(২৭) 'ব্যবস্থাপত্র' অর্থ রোগ নিরাময়ের উদ্দেশ্যে বিএমডিসি কর্তৃক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত কোনো চিকিৎসকের প্রদেয় লিখিত ঔষধের ফর্দ, কিংবা ব্যবহার বিধি, অথবা নির্দেশনাপত্র;

(২৮) 'মহাপরিচালক' অর্থ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক;

(২৯) 'মাদকদ্রব্য' অর্থ-

(ক) প্রথম তপশিলে উল্লিখিত কোনো দ্রব্য; বা

(খ) মাদকদ্রব্যের সহিত অন্য যে-কোনো দ্রব্য একীভূত, মিশ্রিত, কিংবা দ্রবীভূত থাকিলে উহাদের সমুদয় কোনো দ্রব্য;

(৩০) 'মাদকদ্রব্য অপরাধ' অর্থ এই আইনের অধীন দণ্ডনীয় কোনো অপরাধ;

(৩১) 'মাদকাসক্ত' অর্থ শারীরিক অথবা মানসিকভাবে মাদকদ্রব্যের উপর নির্ভরশীল কোনো ব্যক্তি অথবা অভ্যাসবশে মাদকদ্রব্য ব্যবহারকারী অথবা সেবনকারী কোনো ব্যক্তি;

(৩২) 'মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র' অর্থ এই আইনের অধীন সরকারি খাতে স্থাপিত বা ঘোষিত অথবা বেসরকারি খাতে অনুমোদিত কোনো মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র;

4[***]

(৩৪) 'লাইসেন্স' অর্থ ধারা ১৩ এর অধীন প্রদত্ত লাইসেন্স; 5[এবং]

(৩৫) 'সম্পদ' অর্থ বিনিময় মূল্য রহিয়াছে এমন যে-কোনো স্থাবর-অস্থাবর বস্তু, গ্রন্থস্বত্ব (Copyright), সুনাম (Goodwill), কর্তৃত্ব, ক্ষমতা, স্বত্ব, অংশীদারিত্ব বা অনুরূপ কোনো বিষয় 6[।]

7[***]

আইনের প্রাধান্য

৩। আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের বিধানাবলি প্রাধান্য পাইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা, ইত্যাদি

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর

৪। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯০ এর ধারা ৮ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর এমনভাবে বহাল ও কার্যকর থাকিবে যেন উহা এই আইনের অধীনে স্থাপিত হইয়াছে।

অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়

৫। (১) অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় থাকিবে ।

(২) সরকার, প্রয়োজনবোধে, দেশের যে কোনো স্থানে অধিদপ্তরের অধঃস্তন বা শাখা কার্যালয় স্থাপন করিতে পারিবে।

অধিদপ্তরের কার্যাবলি

৬। অধিদপ্তরের কার্যাবলি হইবে নিম্নরূপ, যথা:-

(ক) মাদকদ্রব্য-সৃষ্ট সম্ভাব্য ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া রোধকল্পে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

(খ) মাদকদ্রব্য সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য সংগ্রহের জন্য যে কোনো ধরনের গবেষণা বা জরিপ পরিচালনা;

(গ) মাদকদ্রব্য উৎপাদন, সরবরাহ, ব্যবহার ও নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ঘ) মাদকাসক্তদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসন সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ঙ) মাদকদ্রব্যের কুফল সম্পর্কে জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও প্রচারমূলক কার্যক্রম গ্রহণ;

(চ) মাদকদ্রব্য সংক্রান্ত বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয় ও সংস্থার সহিত যোগাযোগ স্থাপন এবং এতৎসংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন;

(ছ) উপরি-উক্ত দায়িত্ব পালন ও কর্তব্য সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় যে-কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ; এবং

(জ) সরকার কর্তৃক সময় সময় উহার উপর অর্পিত অন্য যেকোনো দায়িত্ব পালন।

মহাপরিচালক

৭। (১) অধিদপ্তরের একজন মহাপরিচালক থাকিবে এবং তিনি অধিদপ্তরের প্রধান নির্বাহী হইবেন।

(২) মহাপরিচালক সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবে এবং তাহার চাকরির শর্তাদি সরকার কর্তৃক স্থিরীকৃত হইবে।

কর্মচারী নিয়োগ

৮। সরকার অধিদপ্তরের কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে তৎকর্তৃক অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মচারী নিয়োগ, পদায়ন ও পদোন্নতিসহ চাকরির অন্যান্য শর্তাবলি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

তৃতীয় অধ্যায়

মাদকদ্রব্য নিষিদ্ধকরণ ও নিয়ন্ত্রণ (লাইসেন্স, পারমিট বা পাস)

অ্যালকোহল ব্যতীত অন্যান্য মাদকদ্রব্যের উৎপাদন, ইত্যাদি নিষিদ্ধ

৯। (১) অ্যালকোহল ব্যতীত অন্যান্য মাদকদ্রব্য অথবা মাদকদ্রব্যের উৎপাদন অথবা প্রক্রিয়াজাতকরণে ব্যবহৃত হয় এইরূপ কোনো দ্রব্য অথবা উদ্ভিদের,-

(ক) চাষাবাদ, উৎপাদন বা প্রক্রিয়াজাতকরণ, বহন, পরিবহন বা স্থানান্তর; এবং আমদানি বা রপ্তানি করা যাইবে না;

(খ) সরবরাহ, বিপণন, ক্রয়, বিক্রয়, হস্তান্তর, অর্পণ, গ্রহণ, প্রেরণ, লেনদেন, নিলামকরণ, ধারণ, অধিকার অথবা দখল, সংরক্ষণ, গুদামজাতকরণ ও প্রদর্শন করা যাইবে না;

(গ) সেবন, প্রয়োগ অথবা ব্যবহার করা যাইবে না; এবং

(ঘ) দফা (ক) হইতে (গ) পর্যন্ত উল্লিখিত কোনো উদ্দেশ্যে কোনো প্রচেষ্টা অথবা উদ্যোগ গ্রহণ, অর্থ বিনিয়োগ, কোনো প্রতিষ্ঠান স্থাপন অথবা পরিচালনা কিংবা উহার পৃষ্ঠপোষকতা, কিংবা মিথ্যা ঘোষণা প্রদান করা যাইবে না।

(২) কোনো মাদকদ্রব্যের উপাদান অথবা উপকরণ হিসাবে ব্যবহৃত হয় অথবা হইতে পারে এইরূপ কোনো প্রিকারসর কেমিক্যালসের-

(ক) উৎপাদন বা প্রক্রিয়াজাতকরণ; বহন, পরিবহন বা স্থানান্তর; এবং আমদানি বা রপ্তানি করা যাইবে না;

(খ) সরবরাহ, বিপণন, ক্রয়, বিক্রয়, হস্তান্তর, অর্পণ, গ্রহণ, প্রেরণ, লেনদেন, নিলাম করা, ধারণ, অধিকার অথবা দখল, সংরক্ষণ, গুদামজাতকরণ ও প্রদর্শন করা যাইবে না;

(গ) সেবন, প্রয়োগ অথবা ব্যবহার করা যাইবে না; এবং

(ঘ) দফা (ক) হইতে (গ) পর্যন্ত উল্লিখিত কোনো উদ্দেশ্যে কোনো প্রচেষ্টা অথবা উদ্যোগ গ্রহণ, অর্থ বিনিয়োগ, কোনো প্রতিষ্ঠান স্থাপন অথবা পরিচালনা, কিংবা উহার পৃষ্ঠপোষকতা, কিংবা মিথ্যা ঘোষণা প্রদান করা যাইবে না।

(৩) উপ-ধারা (১) ও (২) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোনো মাদকদ্রব্য, দ্রব্য অথবা উদ্ভিদ অথবা প্রিকারসর কেমিক্যালস কোনো আইনের অধীন অনুমোদিত কোনো ঔষধ প্রস্তুতে, শিল্পে ব্যবহার, চিকিৎসা, বৈজ্ঞানিক গবেষণা, কিংবা মহাপরিচালক কর্তৃক অনুমোদিত কোনো বৈধ কার্যক্রমের জন্য প্রয়োজন হইলে উহা এই আইনের অধীন প্রদত্ত-

(ক) লাইসেন্সবলে চাষাবাদ, উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, বহন, পরিবহন, স্থানান্তর, আমদানি, রপ্তানি, সরবরাহ, বিপণন, ক্রয়, বিক্রয়, ধারণ, অধিকার অথবা দখল, সংরক্ষণ, গুদামজাতকরণ, প্রদর্শন অথবা ব্যবহার করা যাইবে;

(খ) পারমিটবলে সেবন, প্রয়োগ অথবা ব্যবহার করা যাইবে; এবং

(গ) পাসবলে বহন অথবা পরিবহন করা যাইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, এই আইনের কোনো বিধান প্রতিপালনের নিমিত্ত, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো আইন প্রায়োগকারী সংস্থার কোনো সদস্য দায়িত্ব পালনকালে যুক্তিসংগতভাবে যথাযথ এবং বৈধ কাগজপত্র অথবা দালিলিক প্রমাণের ভিত্তিতে তপশিলে উল্লিখিত কোনো বস্তু বহন, পরিবহন, ধারণ, অধিকার অথবা দখল, সংরক্ষণ, গুদামজাতকরণ, প্রদর্শন, হস্তান্তর, অর্পণ, গ্রহণ, প্রেরণ, নিলামকরণ, নিয়ন্ত্রিত বিলিবন্দেজ, ইত্যাদি কার্যক্রমের ক্ষেত্রে এই ধারার কোনো কিছুই প্রযোজ্য হইবে না।

(৪) উপ-ধারা ৩ এর অধীন উৎপাদিত, প্রক্রিয়াজাত এবং আমদানিকৃত মাদকদ্রব্যের মোড়ক ও লেবেলের উপর উহার অপব্যবহারের বিপদ সম্পর্কে সর্তকবাণী স্পষ্ট অক্ষরে মুদ্রণ অথবা ছাপাংঙ্কন করিতে হইবে।

(৫) যাত্রী পরিবহনে নিয়োজিত কোনো জলযান, আকাশযান অথবা স্থলযানে জরুরি চিকিৎসার প্রয়োজনে চিকিৎসকের নিয়ন্ত্রণে রক্ষিত প্রাথমিক চিকিৎসাবাক্সে, যদি থাকে, সরকার কর্তৃক, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, নির্ধারিত পরিমাণ ঔষধ হিসাবে ব্যবহারযোগ্য মাদকদ্রব্য সংরক্ষণ, বহন, পরিবহন, প্রয়োগ ও ব্যবহার করিবার ক্ষেত্রে এই ধারার কোনো কিছুই প্রযোজ্য হইবে না।

অ্যালকোহল উৎপাদন, ইত্যাদি সম্পর্কে বিধি-নিষেধ

১০। (১) কোনো ব্যক্তি লাইসেন্স, পারমিট বা পাস ব্যতিরেকে নিম্নবর্ণিত কোনো কার্য করিতে পারিবে না, যথা:-

(ক) কোনো ডিস্টিলারি অথবা ব্রিউয়ারি স্থাপন;

(খ) কোনো অ্যালকোহল উৎপাদন অথবা প্রক্রিয়াজাতকরণ;

(গ) কোনো অ্যালকোহল বহন, পরিবহন, আমদানি অথবা রপ্তানি;

(ঘ) কোনো অ্যালকোহল সরবরাহ, বিপণণ, ক্রয় অথবা বিক্রয়;

(ঙ) কোনো অ্যালকোহল ধারণ, অধিকার অথবা দখল, সংরক্ষণ, গুদামজাতকরণ অথবা প্রদর্শন;

(চ) কোনো অ্যালকোহল সেবন, প্রয়োগ ও ব্যবহার;

(ছ) কোনো অ্যালকোহল জাতীয় ঔষধ প্রস্তুতের উপাদান হিসাবে ব্যবহার; এবং

(জ) দফা (ক) হইতে (ছ) পর্যন্ত উল্লিখিত কোনো উদ্দেশ্যে কোনো প্রচেষ্টা অথবা উদ্যোগ গ্রহণ, অর্থ বিনিয়োগ, কোনো প্রতিষ্ঠান স্থাপন, পরিচালনা, উহার পৃষ্ঠপোষকতা, কিংবা মিথ্যা ঘোষণা (Misdeclaration) প্রদান।

ব্যাখ্যা: এই উপ-ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, ‘ডিস্টিলারি (Distillery)’ বলিতে অ্যালকোহল উৎপাদনের যে কোনো স্থাপনা অথবা কারখানাকে বুঝাইবে।

(২) উপ-ধারা (১)-এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের কোনো বিধান প্রতিপালনের জন্য, ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো আইন প্রায়োগকারী সংস্থার কোনো সদস্যের নিকট সরকারি দায়িত্ব পালনকালে যুক্তিসংগতভাবে যথাযথ এবং বৈধ কাগজপত্র অথবা দালিলিক প্রমাণের ভিত্তিতে অ্যালকোহল বহন, পরিবহন, ধারণ, অধিকার অথবা দখল, সংরক্ষণ, গুদামজাতকরণ, প্রদর্শন, হস্তান্তর, অর্পণ, গ্রহণ, প্রেরণ, নিলামকরণ, ইত্যাদি কার্যক্রমের ক্ষেত্রে, এই ধারার কোনো কিছুই প্রযোজ্য হইবে না।

অ্যালকোহল পান, ইত্যাদি সম্পর্কে বিধি-নিষেধ

১১। (১) পারমিট ব্যতীত কোনো ব্যক্তি অ্যালকোহল পান করিতে পারিবেন না এবং চিকিৎসার প্রয়োজনে সিভিল সার্জন অথবা সরকারি মেডিক্যাল কলেজের অন্যূন কোনো সহযোগী অধ্যাপকের লিখিত ব্যবস্থাপত্র ব্যতীত কোনো মুসলমানকে অ্যালকোহল পান করিবার জন্য পারমিট প্রদান করা যাইবে না।

(২) মুচি, মেথর, ডোম, চা শ্রমিক ও ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী কর্তৃক তাড়ি ও পচুঁই পান করিবার ক্ষেত্রে এবং রাঙ্গামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলাসমূহ এবং অন্যান্য অঞ্চলের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী কর্তৃক ঐতিহ্যগতভাবে প্রচলিত অথবা প্রস্তুতকৃত মদ পান করিবার ক্ষেত্রে উপ-ধারা (১) এর কোনো কিছুই প্রযোজ্য হইবে না।

(৩) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন-

(ক) লাইসেন্সপ্রাপ্ত বার-এ বসিয়া বিদেশি ও পারমিটধারী দেশিয় নাগরিকগণ অ্যালকোহল পান করিতে পারিবেন; এবং

(খ) কূটনৈতিক পাসপোর্টধারী বিদেশি নাগরিকরা শুল্ক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত পাস বইধারী অথবা প্রচলিত ব্যাগেজ রুলসের দ্বারা স্বীকৃত ব্যক্তির ক্ষেত্রে, অ্যালকোহল আমদানি, রপ্তানি, ক্রয়, বহন, সংরক্ষণ অথবা পানের ব্যাপারে কোনো কিছুই প্রযোজ্য হইবে না।

(৪) অ্যালকোহল সংক্রান্ত সকল শুল্কমুক্ত কার্যক্রম (Duty Free Operations) এই আইনের অধীন প্রদত্ত লাইসেন্সবলে সম্পাদিত হইবে।

মাদকদ্রব্যের ব্যবস্থাপত্র প্রদান সম্পর্কে বিধি-নিষেধ

১২। (১) চিকিৎসক ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তি কোনো মাদকদ্রব্য ঔষধ হিসাবে ব্যবস্থাপত্র প্রদান করিতে পারিবেন না।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রদত্ত ব্যবস্থাপত্রের ভিত্তিতে একবারের অধিক মাদকদ্রব্য ক্রয় করা যাইবে না।

লাইসেন্স, ইত্যাদি

১৩। (১) লাইসেন্স, পারমিট ও পাস বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, ফরমে, শর্তে এবং ফিস প্রদান সাপেক্ষে মহাপরিচালক অথবা তাহার নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো অফিসার কর্তৃক প্রদান করা যাইবে।

(২) লাইসেন্স, পারমিট অথবা পাসের মেয়াদ উহাতে উল্লিখিত শর্তে নির্ধারিত সময় পর্যন্ত অথবা উহার প্রদানের তারিখ হইতে সংশ্লিষ্ট অর্থ বৎসর সমাপ্ত হওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে:

তবে শর্ত থাকে, কোনো লাইসেন্স অথবা পারমিট একাদিক্রমে ৩ (তিন) বৎসর নবায়ন না করা হইলে উহা পুনরায় নবায়নের যোগ্য হইবে না।

লাইসেন্স, ইত্যাদি প্রদানের ক্ষেত্রে বিধি-নিষেধ

১৪। এই আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোনো ব্যক্তি লাইসেন্স অথবা পারমিট প্রাপ্তির যোগ্য হইবেন না, যদি-

(ক) তিনি নৈতিক স্খলনজনিত কোনো অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইয়া অন্যূন ৩ (তিন) মাসের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন এবং তাহার মুক্তি লাভের পর ৫ (পাঁচ) বৎসর কাল অতিবাহিত না হইয়া থাকে, অথবা ৫০০ (পাঁচশত) টাকার অধিক অর্থ দণ্ডে দণ্ডিত হন এবং দণ্ডের টাকা আদায় করিবার পর ৫ (পাঁচ) বৎসরকাল অতিবাহিত না হইয়া থাকে;

(খ) তিনি কোনো অপরাধের জন্য দণ্ডিত হন; এবং

(গ) তিনি লাইসেন্স অথবা পারমিটের কোনো শর্ত ভঙ্গ করেন এবং সেইজন্য তাহার উক্ত লাইসেন্স অথবা পারমিট বাতিল হইয়া যায়।

লাইসেন্স, ইত্যাদির শর্ত ভঙ্গের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা

১৫। (১) কোনো ব্যক্তি কোনো লাইসেন্স, পারমিট অথবা পাসের শর্ত ভঙ্গ করিলে লাইসেন্স, পারমিট অথবা পাস প্রদানকারী অফিসার-

(ক) প্রথমবার শর্ত ভঙ্গের ক্ষেত্রে, অভিযুক্ত ব্যক্তির নিকট হইতে ভবিষ্যতে এইরূপ শর্ত লঙ্ঘন না করিবার জন্য হলফনামার মাধ্যমে অঙ্গীকার অথবা মুচলেকা গ্রহণ করিয়া অনূর্ধ্ব ১ (এক) লক্ষ টাকা জরিমানা আদায়পূর্বক উক্ত অভিযোগের আপোষ নিষ্পত্তি করিতে পারিবে;

(খ) দ্বিতীয়বার শর্তভঙ্গের ক্ষেত্রে, লাইসেন্স, পারমিট অথবা পাস বাতিল করিতে পারিবে।

(২) লাইসেন্স, পারমিট অথবা পাসের শর্ত ভঙ্গজনিত অভিযোগের জন্য যদি কোনো ব্যক্তির দখল হইতে কোনো বাজেয়াপ্তযোগ্য বস্তু জব্দ করা হয় এবং উক্ত ব্যক্তির উক্ত অভিযোগটি যদি উপ-ধারা (১)(ক) এর বিধান অনুসারে নিষ্পত্তি করা হয় এবং উক্ত ব্যক্তি যদি উক্ত মাদকদ্রব্য অথবা বস্তু সংরক্ষণের জন্য আইনগতভাবে বৈধ অধিকারপ্রাপ্ত হন, তাহা হইলে আটককারী অফিসার তাহার নিয়ন্ত্রণকারী অফিসারের অনুমোদনক্রমে উক্ত মাদকদ্রব্য অথবা বস্তু বাজেয়াপ্ত না করিয়া বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে উহার প্রচলিত বাজারমূল্য নির্ধারণ করিয়া সমপরিমাণ অর্থ আদায়পূর্বক উহা উক্ত ব্যক্তির অনুকূলে হস্তান্তর করিতে পারিবে এবং আদায়কৃত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা করিতে হইবে।

লাইসেন্স, ইত্যাদি বাতিল

১৬। (১) এই আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যদি কোনো ব্যক্তি লাইসেন্স, পারমিট অথবা পাসের কোনো শর্ত ভঙ্গ করেন অথবা যদি কোনো লাইসেন্স, পারমিট অথবা পাসধারী ব্যক্তি কোনো মাদকদ্রব্য অপরাধের জন্য দণ্ডিত হন, তাহা হইলে লাইসেন্স, পারমিট অথবা পাস প্রদানকারী অফিসার তাহাকে কারণ দর্শানোর সুযোগ প্রদান করিয়া তাহার লাইসেন্স, পারমিট অথবা পাস বাতিল করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রদত্ত কোনো আদেশের দ্বারা কোনো ব্যক্তি সংক্ষুব্ধ হইলে তিনি আদেশ প্রাপ্তির তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিবসের মধ্যে-

(ক) আদেশটি যদি মহাপরিচালকের অধস্তন কোনো অফিসার কর্তৃক প্রদত্ত হইয়া থাকে, তাহা হইলে মহাপরিচালকের নিকট আপিল করিতে পারিবে; এবং

(খ) আদেশটি যদি মহাপরিচালক কর্তৃক প্রদত্ত হইয়া থাকে, তাহা হইলে সরকারের নিকট আপিল করিতে পারিবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত আপিল কর্তৃপক্ষের রায় চূড়ান্ত হইবে এবং উহার বিরুদ্ধে কোনো আদালতে মামলা দায়ের করা যাইবে না।

লাইসেন্স, ইত্যাদি সাময়িকভাবে স্থগিতকরণ

১৭। (১) লাইসেন্স, পারমিট অথবা পাস প্রদানকারী কোনো অফিসারের নিকট যদি ইহা প্রতীয়মান হয় যে তৎকর্তৃক প্রদত্ত কোনো লাইসেন্স, পারমিট অথবা পাসের শর্তাবলি যথাযথভাবে পালন করা হইতেছে না, তাহা হইলে উক্ত অফিসার লিখিত আদেশ দ্বারা এই আইনের অধীন অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ সাপেক্ষে লাইসেন্স, পারমিট অথবা পাস অনূর্ধ্ব ৬০ (ষাট) দিনের জন্য সাময়িকভাবে স্থগিত করিতে পারিবে।

(২) কোনো ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রদত্ত কোনো আদেশের দ্বারা সংক্ষুব্ধ হইলে তিনি আদেশ প্রাপ্তির তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিবসের মধ্যে-

(ক) আদেশটি যদি মহাপরিচালকের অধস্তন কোনো অফিসার কর্তৃক প্রদত্ত হইয়া থাকে, তাহা হইলে মহাপরিচালকের নিকট আপিল করিতে পারিবে; এবং

(খ) আদেশটি যদি মহাপরিচালক কর্তৃক প্রদত্ত হইয়া থাকে, তাহা হইলে সরকারের নিকট আপিল করিতে পারিবে।

(৩) উপ-ধারা (২)-এ উল্লিখিত আপিল কর্তৃপক্ষের রায় চূড়ান্ত হইবে এবং উহার বিরুদ্ধে কোনো আদালতে মামলা দায়ের করা যাইবে না।

কতিপয় লাইসেন্স প্রদানের ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ

১৮। (১) কোনো ব্যক্তি ধারা ৩৯ ব্যতীত অন্য কোনো ধারায় দণ্ডপ্রাপ্ত হইলে কোনো আগ্নেয়াস্ত্র অথবা যানবাহন চালকের লাইসেন্স প্রদান করা যাইবে না এবং তাহার উক্তরূপ কোনো লাইসেন্স থাকিলে উহা বাতিল হইয়া যাইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন ব্যক্তির লাইসেন্স বাতিল হইলে তিনি অথবা ক্ষেত্রমতে, তত্ত্বাবধায়ক অথবা অভিভাবক লাইসেন্স বাতিল হইবার দিন হইতে ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে লাইসেন্স প্রদানকারী অফিসার অথবা নিকটস্থ থানায় জমা প্রদান করিবেন এবং যদি লাইসেন্সটি আগ্নেয়াস্ত্র-এর জন্য হয়, তাহা হইলে আগ্নেয়াস্ত্রটি তৎসহ জমা প্রদান করিতে হইবে।

মাদকদ্রব্যের দোকান অথবা পানশালা (Bar) সাময়িকভাবে বন্ধ ঘোষণা করিবার ক্ষমতা

১৯। (১) মহাপরিচালকের অনুমোদন ব্যতীত লাইসেন্স প্রাপ্ত কোনো মদের দোকান অথবা পানশালা বন্ধ করা যাইবে না:

তবে শর্ত থাকে, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট অথবা পুলিশ কমিশনার যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে তাঁহার অধীন কোনো এলাকায় আইন শৃঙ্খলা রক্ষার্থে কোনো মাদকদ্রব্যের দোকান বা পানশালা সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা প্রয়োজন, তাহা হইলে তিনি লিখিত আদেশ দ্বারা অনধিক ৩০ (ত্রিশ) দিনের জন্য উক্ত দোকান বা পানশালা বন্ধ করিতে পারিবেন।

(২) বিশেষ জরুরি অবস্থায় মহাপরিচালকের পূর্বানুমোদনক্রমে এই মেয়াদ আরও ৩০ (ত্রিশ) দিন পর্যন্ত বর্ধিত করিতে পারিবেন।

(৩) উপ-ধারা (১) ও (২) এর অধীন জারিকৃত কোনো আদেশের অনুলিপি অবিলম্বে মহাপরিচালকের নিকট তাঁহার অবগতির জন্য প্রেরণ করিতে হইবে।

চতুর্থ অধ্যায়

মাদকদ্রব্য প্রতিরোধের ক্ষমতাসমূহ

প্রবেশ, ইত্যাদির ক্ষমতা

২০। মহাপরিচালক অথবা তাহার নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে সাধারণ অথবা বিশেষভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো অফিসার বিধির বিধান সাপেক্ষে-

(ক) কোনো মাদকদ্রব্য লাইসেন্সবলে প্রস্তুত অথবা গুদামজাত করা হইয়াছে অথবা হইতেছে এইরূপ যে-কোনো স্থানে যে-কোনো সময় প্রবেশ করিতে এবং উহা পরিদর্শন করিতে পারিবে;

(খ) লাইসেন্সবলে প্রস্তুত অথবা সংগৃহীত মাদকদ্রব্য বিক্রয়ের জন্য যে দোকানে মজুত রাখা হইয়াছে সেই দোকানে, দোকান খোলা রাখিবার সাধারণ সময়ে প্রবেশ করিতে পারিবে এবং উহা পরিদর্শন করিতে পারিবে;

(গ) দফা (ক) ও (খ) এ উল্লিখিত স্থান অথবা দোকানে,-

(অ) রক্ষিত হিসাববহি অথবা নিবন্ধনবহি পরীক্ষা করিতে পারিবে;

(আ) প্রাপ্ত মাদকদ্রব্য, মাদকদ্রব্য প্রস্তুতের সাজ-সরঞ্জাম, যন্ত্রপাতি ও তৈজসপত্র পরীক্ষা, ওজন ও পরিমাপ করিতে পারিবে;

(ই) উপ-দফা (অ) ও (আ) এ উল্লিখিত কোনো কিছু বেআইনি অথবা ত্রুটিপূর্ণ প্রাপ্ত হইলে অথবা বিবেচিত হইলে উহা জব্দ করিতে পারিবে।

প্রকাশ্য স্থান, ইত্যাদিতে আটক অথবা গ্রেফতারের ক্ষমতা

২১। যদি কোনো ক্ষমতাপ্রাপ্ত অফিসারের এইরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে যেকোনো প্রকাশ্য স্থানে অথবা কোনো চলাচলকারী যানবাহনে,-

(ক) এই আইনের পরিপন্থি কোনো মাদকদ্রব্য অথবা বাজেয়াপ্তযোগ্য বস্তু অথবা কোনো মাদকদ্রব্য অপরাধ প্রমাণের সহায়ক কোনো দলিলদস্তাবেজ রক্ষিত রহিয়াছে, তাহা হইলে, তাহার অনুরূপ বিশ্বাসের কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া তিনি উক্ত মাদকদ্রব্য, বস্তু অথবা দলিলদস্তাবেজ তল্লাশি করিয়া জব্দ করিতে পারিবেন; এবং

(খ) মাদকদ্রব্য অপরাধ সংঘটনকারী অথবা সংঘটনে উদ্যত কোনো ব্যক্তি রহিয়াছে, তাহা হইলে তাহার অনুরূপ বিশ্বাসের কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া, তিনি তাহাকে আটকপূর্বক তল্লাশি করিয়া দলিল দস্তাবেজ প্রাপ্ত হইলে তাহাকে গ্রেফতার করিতে পারিবেন।

তল্লাশি, ইত্যাদির পদ্ধতি

২২। এই আইনে ভিন্নরূপ কিছু না থাকিলে, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে জারিকৃত সকল পরোয়ানা, তল্লাশি, গ্রেফতার, ক্রোক, বাজেয়াপ্তি ও আটকের বিষয়ে ফৌজদারি কার্যবিধির বিধান অনুসরণ করিতে হইবে।

পরোয়ানা ব্যতিরেকে তল্লাশি, ইত্যাদির ক্ষমতা

২৩। (১) মহাপরিচালক অথবা তাহার নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে সাধারণ অথবা বিশেষভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো অফিসার, অথবা পুলিশের উপ-পরিদর্শক অথবা তদূর্ধ্ব কোনো অফিসার অথবা ৪[কাস্টমসের সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা] অথবা সমমানসম্পন্ন অথবা তদূর্ধ্ব কোনো অফিসার অথবা বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের ল্যান্স নায়ক অথবা তদূর্ধ্ব কোনো অফিসার অথবা কোস্ট গার্ড বাহিনীর পেটি অফিসার অথবা তদূর্ধ্ব কোনো অফিসারের এইরূপ বিশ্বাস করিবার কোনো কারণ থাকে যে, কোনো মাদকদ্রব্য অপরাধ কোনো স্থানে সংঘটিত হইয়াছে, হইতেছে অথবা হইবার আশংকা রহিয়াছে, তাহা হইলে তিনি অনুরূপ বিশ্বাসের কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া লাইসেন্স প্রিমিজেস ব্যতীত, যে কোনো সময়-

(ক) উক্ত স্থানে প্রবেশ করিয়া তল্লাশি করিতে পারিবেন এবং প্রবেশে বাধাপ্রাপ্ত হইলে, বাধা অপসারণের জন্য দরজা-জানালা ভাঙ্গাসহ যে-কোনো প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন;

(খ) উক্ত স্থানে তল্লাশিকালে প্রাপ্ত মাদকদ্রব্য অপরাধ সংঘটনে ব্যবহার্য মাদকদ্রব্য অথবা বস্তু এই আইনের অধীন আটক অথবা বাজেয়াপ্তযোগ্য বস্তু এবং কোনো মাদকদ্রব্য অপরাধ প্রমাণে সহায়ক কোনো দলিল, দস্তাবেজ অথবা জিনিসপত্র আটক করিতে পারিবেন;

(গ) উক্ত স্থানে উপস্থিত যে-কোনো ব্যক্তির দেহ তল্লাশি করিতে পারিবে; এবং

(ঘ) উক্ত স্থানে উপস্থিত কোনো ব্যক্তিকে কোনো মাদকদ্রব্য অপরাধ করিয়াছেন অথবা করিতেছেন বলিয়া সন্দেহে গ্রেফতার করিতে পারিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সূর্যাস্ত হইতে সূর্যোদয় পর্যন্ত সময়ের মধ্যে কোনো স্থানে প্রবেশ করিয়া তল্লাশি পরিচালনা না করিলে মাদকদ্রব্য অপরাধ সম্পর্কীয় কোনো বস্তু নষ্ট অথবা লুপ্ত হইবার অথবা অপরাধী পালাইয়া যাইবার আশংকা রহিয়াছে বলিয়া উক্ত উপ-ধারায় উল্লিখিত কোনো অফিসারের বিশ্বাস করিবার সংগত কারণ থাকিলে অনুরূপ বিশ্বাসের কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া তিনি উক্ত সময়ের মধ্যে উক্ত স্থানে প্রবেশ ও তল্লাশি করিতে পারিবে।

দেহ তল্লাশির জন্য বিশেষ পরীক্ষা

২৪। (১) এই আইনের অধীন কোনো তদন্ত অথবা তল্লাশি পরিচালনাকালে কোনো অফিসারের যদি ইহা বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট কারণ থাকে যে কোনো ব্যক্তি তাহার শরীরের কোনো অঙ্গপ্রত্যঙ্গে মাদকদ্রব্য লুকাইয়া রাখিয়াছেন, তাহা হইলে, অনুরূপ বিশ্বাসের কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া, তিনি তাহাকে তাহার শরীরের এক্স-রে, আলট্রাসনোগ্রাম, এন্ডোসকপি, কোলনস্কপি কিংবা রক্ত ও মলমূত্রসহ অন্য যে-কোনো প্রকার প্রয়োজনীয় পরীক্ষা করিবার নিমিত্তে নিজেকে সমর্পণ করিবার জন্য নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন এবং উক্ত নির্দেশ অমান্য করিলে নির্দেশ প্রদানকারী অফিসার তাহাকে নির্দেশ পালনে বাধ্য করিবার জন্য সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর বিধান অনুসারে পরীক্ষার পর কোনো ব্যক্তির অঙ্গপ্রত্যঙ্গে যদি কোনো মাদকদ্রব্যের উপস্থিতি সনাক্ত হয়, তাহা হইলে তাহাকে প্রযোজ্যক্ষেত্রে ধারা ৩৬ এর সারণির ক্রমিক নম্বর ৬ হইতে ১১ কিংবা ১৩ হইতে ২০ এর বিধান অনুযায়ী দণ্ডিত মাদকদ্রব্য অপরাধের জন্য গ্রেফতার করা যাইবে।

(৩) উপ-ধারা (১) এর বিধান অনুসারে পরীক্ষার পর যদি কোনো ব্যক্তি কর্তৃক কোনো মাদকদ্রব্য গ্রহণের, সেবনের, ব্যবহারের অথবা প্রয়োগের কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় এবং উহা যদি ধারা ৯ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (গ) কিংবা উপ-ধারা (২) এর দফা (গ) কিংবা ধারা ১০ এর (চ) এর বিধান লঙ্ঘনকারী হয় তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তিকে ধারা ৩৬ এর সারণি ক্রমিক নম্বর ১৬, ২১, ২৫, ২৯ অথবা ৩১ অনুসারে শাস্তিযোগ্য মাদকদ্রব্য অপরাধের জন্য গ্রেপ্তার করা যাইবে।

(৪) মাদকাসক্ত ব্যক্তি শনাক্ত করিবার প্রয়োজনে, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ডোপ টেস্ট (Dope Test) করা যাইবে। ডোপ টেস্ট (Dope Test) পজেটিভ হইলে ধারা ৩৬(৪) অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে।

আটক, ইত্যাদি সম্পর্কে উর্ধ্বতন অফিসারকে অবহিতকরণ

২৫। এই আইনের অধীন কোনো ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হইলে অথবা কোনো বস্তু জব্দ করা হইলে, গ্রেফতারকারী অথবা আটককারী অফিসার তৎসম্পর্কে লিখিত প্রতিবেদনের মাধ্যমে তাহার ঊর্ধ্বতন অফিসারকে অবহিত করিবেন এবং প্রতিবেদনের একটি অনুলিপি মহাপরিচালকের নিকট প্রেরণ করিবে।

বাজেয়াপ্তযোগ্য মাদকদ্রব্য, বস্তু, ইত্যাদি

২৬। (১) কোনো মাদকদ্রব্য অপরাধ সংঘটিত হইলে মাদকদ্রব্য, মাদকদ্রব্যের সহিত জব্দকৃত অর্থ, সাজ-সরঞ্জাম, যন্ত্রপাতি, উপকরণ, আধার, পাত্র, মোড়ক, যানবাহন অথবা অন্য কোনো বস্তু সম্পর্কে অথবা সহযোগে উক্ত অপরাধ সংঘটিত হইয়াছে সেইগুলি বাজেয়াপ্তযোগ্য হইবে।

(২) মাদকদ্রব্য অপরাধ সংঘটনের সময় বাজেয়াপ্তযোগ্য মাদকদ্রব্যের সহিত যদি কোনো বৈধ মাদকদ্রব্য পাওয়া যায়, তাহা হইলে উক্ত মাদকদ্রব্যও বাজেয়াপ্তযোগ্য হইবে।

(৩) কোনো মাদকদ্রব্য অপরাধ সংঘটনের জন্য যদি কোনো সরকারি অথবা সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষের কোনো যানবাহন ব্যবহার করা হয়, তাহা হইলে উহা জব্দযোগ্য হইবে এবং মামলা রুজুকারী অফিসার সরকারি কার্যের স্বার্থে উক্ত যানবাহন সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রণকারী অফিসারের জিম্মায় প্রদান করিতে পারিবেন, তবে বিষয়টি এজাহারে উল্লেখ করিতে হইবে।

(৪) জব্দকৃত মাদকদ্রব্য 9[এখতিয়ারসম্পন্ন আদালতের] আদেশক্রমে উহা ধ্বংস করিতে হইবে।

বাজেয়াপ্তকরণ পদ্ধতি

২৭। (১) কোনো মাদকদ্রব্য অপরাধের মামলা চলাকালে কোনো 10[এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত] যদি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন, আটককৃত কোনো বস্তু বাজেয়াপ্তযোগ্য, তাহা হইলে, 11[উক্ত আদালত] , উক্ত অপরাধ প্রমাণিত হউক অথবা না হউক-

(ক) বস্তুটি মাদকদ্রব্য হইলে বাজেয়াপ্ত করিবার আদেশ প্রদান করিবে;

(খ) বস্তুটি মাদকদ্রব্য না হইলে বাজেয়াপ্ত করিবার বিষয়ে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত প্রদান করিতে পারিবে; এবং

(গ) মাদকদ্রব্যের বিক্রয়লব্ধ অর্থ বাজেয়াপ্ত করা এবং উক্ত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা দানের আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(২) যদি কোনো ক্ষেত্রে বাজেয়াপ্তযোগ্য কোনো বস্তু আটক করা হয় কিন্তু উহার সহিত সংশ্লিষ্ট অপরাধীকে পাওয়া না যায়, তাহা হইলে মহাপরিচালক অথবা তাহার নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো অফিসার, যিনি বস্তুটি আটককারী অফিসারের ঊর্ধ্বতন অফিসার হইবেন, লিখিত আদেশ দ্বারা, উহা বাজেয়াপ্ত করিতে পারিবেন :

তবে শর্ত থাকে যে উক্তরূপ বাজেয়াপ্তির আদেশ প্রদানের পূর্বে বাজেয়াপ্তির বিরুদ্ধে আপত্তি প্রদানের সুযোগ প্রদান করিবার জন্য বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে নোটিশ জারি করিতে হইবে এবং নোটিশে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে, যাহা নোটিশ জারির তারিখ হইতে অন্যূন ১৫ (পনেরো) দিন হইতে হইবে, আপত্তি উত্থাপনকারীকে শুনানির যুক্তিসংগত সুযোগ প্রদান করিতে হইবে।

বাজেয়াপ্ত এবং আটককৃত মাদকদ্রব্য ও দ্রব্যাদির নিষ্পত্তি অথবা বিলিবন্দেজ

২৮। (১) বাজেয়াপ্তযোগ্য কোনো মাদকদ্রব্য অথবা দ্রব্যের বাজেয়াপ্তির আদেশ প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে উক্ত মাদকদ্রব্য অথবা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কোনো অফিসার কর্তৃক আটককৃত হইলে উহা মহাপরিচালক কিংবা তাহার নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অফিসারের নিকট হস্তান্তর করিতে হইবে এবং মহাপরিচালক কিংবা তাহার নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অফিসার বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে উহা ব্যবহার, হস্তান্তর, ধ্বংস কিংবা অন্য কোনো প্রকারে নিষ্পত্তি অথবা বিলিবন্দেজের ব্যবস্থা করিবে।

(২) আটককৃত মাদকদ্রব্য অথবা দ্রব্য এই আইনের অধীন ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোনো সংস্থা কর্তৃক আটককৃত হইলে বাজেয়াপ্তির আদেশ প্রদানের পর উহা উক্ত আটককারী সংস্থার নিকট হস্তান্তর করিতে হইবে এবং আটককারী সংস্থা 12[এখতিয়ারসম্পন্ন আদালতের] আদেশ অনুসারে মহাপরিচালক কিংবা তাহার প্রতিনিধির উপস্থিতিতে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে উহা হস্তান্তর কিংবা অন্য কোনো প্রকারে উহার বিলিবন্দেজ করিতে পারিবে।

(৩) এই আইনের অধীন কোনো মাদকদ্রব্য অথবা বস্তু আটক, বাজেয়াপ্ত ও নিষ্পত্তির ক্ষমতাপ্রাপ্ত 13[অন্যান্য সংস্থা] ও অফিসার এই আইনের অধীন নিষ্পত্তিকৃত সকল মাদকদ্রব্য ও বস্তুসমূহের নিষ্পত্তিসংক্রান্ত একটি বাৎসরিক প্রতিবেদন সরকারের নিকট পেশ করিবে।

গ্রেফতারকৃত ব্যক্তি ও আটককৃত মালামাল সম্পর্কে বিধান

২৯। (১) মহাপরিচালক অথবা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো অফিসার অথবা কোনো পুলিশ অফিসার ব্যতীত অন্য কোনো অফিসার কোনো ব্যক্তিকে গ্রেফতার করিলে অথবা কোনো বস্তু আটক করিলে তিনি অনতিবিলম্বে গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে অথবা আটককৃত বস্তুটিকে সংশ্লিষ্ট থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার অথবা থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার হিসাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত নিকটস্থ কোনো অফিসারের নিকট প্রেরণ করিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোনো ব্যক্তি অথবা বস্তুকে যে অফিসারের নিকট প্রেরণ করা হইবে তিনি যথাশীঘ্র সম্ভব উক্ত ব্যক্তি অথবা বস্তু সম্পর্কে আইনানুগ যথাযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন এবং আটককৃত মাদকদ্রব্য অথবা মালামাল যদি পরিমাণে অত্যধিক হয় অথবা অতি মূল্যবান হয় কিংবা সংরক্ষণের জন্য অসুবিধাজনক কিংবা ঝুঁকিবহুল হয়, তাহা হইলে তদন্তকারী অফিসার 14[এখতিয়ারসম্পন্ন আদালতের] অনুমতিক্রমে উক্ত মাদকদ্রব্য অথবা মালামালের যথোপযুক্ত নমুনা ও প্রমাণ সংরক্ষণপূর্বক অবশিষ্ট মাদকদ্রব্য অথবা মালামাল বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে হস্তান্তর, ধ্বংস অথবা অন্য কোনো প্রকারে বিলিবন্দেজ করিতে পারিবেন এবং বিষয়টি উক্ত 15[আদালতকে] অবিলম্বে অবহিত করিবেন।

(৩) এই ধারায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের অধীন আটককৃত কোনো মাদকদ্রব্য অথবা বস্তুর যদি কোনো কারণে তাৎক্ষণিক বিলিবন্দেজ অপরিহার্য হয় অথবা উহা বহন অথবা স্থানান্তরের অযোগ্য হয়, তাহা হইলে আটককারী অফিসার কর্তৃক উক্ত মাদকদ্রব্য অথবা বস্তুর উপযুক্ত নমুনা এবং পরিমাণ নির্দেশক যথাযথ প্রমাণ সংরক্ষণপূর্বক অবশিষ্ট মাদকদ্রব্য অথবা বস্তুর হস্তান্তর, ধ্বংস অথবা অন্য কোনো প্রকারে উহার বিলিবন্দেজ করা যাইবে।

মহাপরিচালক ইত্যাদির তদন্তের ক্ষমতা

৩০। (১) এই আইনের অধীন অপরাধ তদন্তের ব্যাপারে মহাপরিচালকের থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসারের ক্ষমতা থাকিবে।

(২) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, মহাপরিচালকের অধস্তন কোনো অফিসারকে এই আইনের অধীন অপরাধ তদন্তের জন্য থানার ভারপ্রাপ্ত একজন অফিসারের ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবে।

মাদকদ্রব্য অপরাধ তদন্তের সময়সীমা

৩১। (১) ফৌজদারি কার্যবিধিতে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোনো মাদকদ্রব্য অপরাধ তদন্ত-

(ক) অভিযুক্ত ব্যক্তি মাদকদ্রব্য অপরাধ সংঘটনের সময়ে হাতেনাতে পুলিশ কর্তৃক ধৃত হইলে অথবা এই আইনের অধীন ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোনো ব্যক্তি কর্তৃক ধৃত হইয়া কোনো 16[এখতিয়ারসম্পন্ন আদালতের] নিকট সোপর্দ হইলে, তাহার ধৃত হইবার তারিখ হইতে পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) কার্য দিবসের মধ্যে সম্পন্ন করিতে হইবে;

(খ) অভিযুক্ত ব্যক্তি মাদকদ্রব্য অপরাধ সংঘটনের সময় হাতেনাতে ধৃত না হইলে মাদকদ্রব্য অপরাধ সংঘটন সংক্রান্ত প্রাথমিক তথ্যপ্রাপ্তি বা, ক্ষেত্রমত, মহাপরিচালক অথবা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অফিসার বা 17[এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত] বা সংশ্লিষ্ট অন্য কোনো কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত তদন্তের আদেশ প্রাপ্তির তারিখ হইতে পরবর্তী ৬০ (ষাট) কার্য দিবসের মধ্যে সম্পন্ন করিতে হইবে; এবং

(গ) একই মামলায় গ্রেফতার ও পলাতক ব্যক্তি থাকিলে উক্ত মামলার তদন্ত উপ-ধারা (১) (খ) অনুযায়ী সম্পন্ন হইবে।

(২) কোনো যুক্তিসংগত কারণে উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত সময়ের মধ্যে তদন্তকার্য সম্পন্ন করা সম্ভব না হইলে, তদন্তকারী অফিসার কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া অতিরিক্ত ১৫ (পনেরো) কার্যদিবসের মধ্যে মাদকদ্রব্য অপরাধের তদন্তকার্য সম্পন্ন করিবেন এবং তৎসম্পর্কে কারণ উল্লেখপূর্বক তাহার নিয়ন্ত্রণকারী অফিসার অথবা, ক্ষেত্রমতে, তদন্তের আদেশ প্রদানকারী মহাপরিচালক অথবা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অফিসার অথবা 18[এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত] অথবা সংশ্লিষ্ট অন্য কোনো কর্তৃপক্ষকে লিখিতভাবে অবহিত করিবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত সময় সীমার মধ্যেও তদন্তকার্য সম্পন্ন করা সম্ভব না হইলে, সংশ্লিষ্ট তদন্তকারী অফিসার উক্ত সময়সীমা অতিক্রান্ত হইবার ২৪ (চব্বিশ) ঘণ্টার মধ্যে উক্তরূপ তদন্তকার্য সম্পন্ন না হওয়া সম্পর্কে তাহার নিয়ন্ত্রণকারী অফিসার কিংবা, ক্ষেত্রমতে, তদন্তের আদেশ প্রদানকারী মহাপরিচালক অথবা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অফিসার অথবা 19[এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত] অথবা সংশ্লিষ্ট অন্য কোনো কর্তৃপক্ষকে লিখিতভাবে অবহিত করিবে।

(৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন তদন্তকার্য সম্পন্ন না হওয়া সম্পর্কে অবহিত হইবার পর নিয়ন্ত্রণকারী অফিসার কিংবা ক্ষেত্রমতে, তদন্তের আদেশ প্রদানকারী মহাপরিচালক অথবা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অফিসার অথবা 20[এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত] অথবা সংশ্লিষ্ট অন্য কোনো কর্তৃপক্ষ উক্ত অপরাধের তদন্তভার অন্য কোনো অফিসারের নিকট হস্তান্তর করিতে পারিবেন এবং উক্তরূপে কোনো মাদকদ্রব্য অপরাধের তদন্তভার হস্তান্তর করা হইলে তদন্তের ভারপ্রাপ্ত অফিসার-

(ক) অভিযুক্ত ব্যক্তি মাদকদ্রব্য অপরাধ সংঘটনের সময়ে হাতেনাতে পুলিশ কর্তৃক ধৃত হইলে অথবা অন্য কোনো ব্যক্তি কর্তৃক ধৃত হইয়া পুলিশের নিকট সোপর্দ হইলে, তদন্তের আদেশ প্রাপ্তির তারিখ হইতে পরবর্তী ১৫ (পনেরো) কার্যদিবসের মধ্যে তদন্ত সম্পন্ন করিবে; এবং

(খ) অন্যান্য ক্ষেত্রে তদন্তের আদেশ প্রাপ্তির তারিখ হইতে পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে তদন্ত সম্পন্ন করিবে।

(৫) উপ-ধারা (৪) এ উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যেও তদন্তকার্য সম্পন্ন করা না হইলে, সংশ্লিষ্ট তদন্তকারী অফিসার উক্ত সময়সীমার মধ্যেও তদন্তকার্য সম্পন্ন করা না হইলে, সংশ্লিষ্ট তদন্তকারী অফিসার উক্ত সময়সীমা অতিক্রান্ত হইবার ২৪ (চব্বিশ) ঘণ্টার মধ্যে উক্তরূপ তদন্তকার্য সম্পন্ন না হওয়া সম্পর্কে তাহার নিয়ন্ত্রণকারী অফিসার কিংবা, ক্ষেত্রমতে, তদন্তের আদেশ প্রদানকারী মহাপরিচালক অথবা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অফিসার অথবা 21[এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত] অথবা সংশ্লিষ্ট অন্য কোনো কর্তৃপক্ষকে লিখিতভাবে অবহিত করিবে।

(৬) উপ-ধারা (২) অথবা (৪) এ উল্লিখিত সময়ের মধ্যে কোনো তদন্তকার্য সম্পন্ন না করিবার ক্ষেত্রে, তৎসম্পর্কে ব্যাখ্যা সংবলিত প্রতিবেদন পর্যালোচনার পর নিয়ন্ত্রণকারী অফিসার কিংবা ক্ষেত্রমতে, তদন্তের আদেশ প্রদানকারী মহাপরিচালক অথবা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অফিসার অথবা 22[এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত] অথবা সংশ্লিষ্ট অন্য কোনো কর্তৃপক্ষ যদি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তদন্ত সম্পন্ন না হইবার জন্য সংশ্লিষ্ট তদন্তকারী অফিসারই দায়ী, তাহা হইলে উহা দায়ী, ব্যক্তির অদক্ষতা বলিয়া বিবেচিত হইবে এবং এই অদক্ষতা তাহার বাৎসরিক গোপনীয় প্রতিবেদনে লিপিবদ্ধ করা হইবে এবং উপযুক্ত ক্ষেত্রে চাকরি বিধি অনুযায়ী তাহার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে।

মামলার তদন্ত হস্তান্তর

৩২। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক এই আইনের অধীন রুজুকৃত এবং অধিদপ্তরের কোনো অফিসার কর্তৃক তদন্তকৃত কোনো মামলার তদন্তকালীন যদি মহাপরিচালক লিখিতভাবে অনুরোধ করেন, তাহা হইলে তদন্তকারী কর্তৃপক্ষ মহাপরিচালক কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত কোনো অফিসারের নিকট তদন্তকার্য হস্তান্তর করিবেন এবং যে অফিসারের নিকট উক্ত তদন্তকার্য হস্তান্তর করা হইবে তিনি প্রয়োজনবোধে শুরু হইতে অথবা যে পর্যায়ে তদন্তকার্য হস্তান্তর হইয়াছে সেই পর্যায় হইতে তদন্তকার্য পরিচালনা করিতে পারিবেন এবং তদন্ত শেষে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

ব্যাংক হিসাব, ইত্যাদি নিরীক্ষা ও নিষ্ক্রিয়করণ

৩৩। (১) যদি মহাপরিচালক অথবা তদন্তকারী অফিসারের এইরূপ বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট কারণ থাকে যে, কোনো ব্যক্তি কোনো মাদকদ্রব্য অপরাধের সহিত জড়িত থাকিয়া অবৈধ অর্থ ও সম্পদ সংগ্রহে লিপ্ত রহিয়াছেন এবং উক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে এই আইনের বিধান অনুসারে কার্যক্রম গ্রহণের নিমিত্ত তাহার ব্যাংক হিসাব অথবা আয়কর অথবা সম্পদের কর সম্পর্কীয় রেকর্ডপত্র পরীক্ষা করা প্রয়োজন, তাহা হইলে তদন্তকারী অফিসার মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(২) তদন্তকারী অফিসার মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এর ধারা ২ এর উপ-ধারা (শ) এ উল্লিখিত সম্পৃক্ত মাদকদ্রব্য অপরাধ (অবৈধ মাদক ও নেশাজাতীয় দ্রব্যের ব্যবসা) নিয়ন্ত্রণের জন্য তদন্তকারী অফিসার হিসাবে গণ্য হইবেন এবং তিনি অবৈধ মাদক ব্যবসার মাধ্যমে অর্জিত অর্থ অথবা সম্পদ সম্পর্কে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ অনুযায়ী তদন্তসহ পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(৩) প্রয়োজনে তদন্তকারী অফিসার উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত অনুরূপ বিশ্বাসের কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া উক্ত হিসাব অথবা রেকর্ডপত্র পরীক্ষা নিরীক্ষা করা কিংবা সংশ্লিষ্ট ব্যাংক হিসাব নিষ্ক্রিয়করণ (Freezing) করা কিংবা সম্পদ যাচাই-বাছাইয়ের (Scrutinizing) অনুমতি প্রদানের জন্য 23[এখতিয়ারসম্পন্ন আদালতে] আবেদন করিতে পারিবে।

(৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন পেশকৃত আবেদন পর্যালোচনা করিয়া এবং আবেদনকারীকে শুনানির সুযোগ প্রদান করিয়া 24[এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত] আবেদনটি নিষ্পত্তি করিবে এবং যদি তিনি প্রার্থিত অনুমতি যুক্তিসংগত বলিয়া মনে করেন, তাহা হইলে অনুমতি প্রদান করিবেন এবং উহার একটি অনুলিপি সংশ্লিষ্ট ব্যাংক, কর অফিসার অথবা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করিবে।

(৫) উপ-ধারা (৪) এর অধীন অনুমতিপ্রাপ্ত অফিসার তাহার পরীক্ষা-নিরীক্ষার অগ্রগতি ও ফলাফল সম্পর্কে 25[এখতিয়ারসম্পন্ন আদালতকে] নির্ধারিত সময়ে অবহিত করিবে।

সম্পত্তি হস্তান্তর, ইত্যাদি নিষিদ্ধ

৩৪। (১) কোনো মাদকদ্রব্য অপরাধের তদন্তকালে যদি তদন্তকারী অফিসারের এইরূপ বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট কারণ থাকে যে, কোনো ব্যক্তির নিকট উক্ত অপরাধের মাধ্যমে উপার্জিত সম্পত্তি রহিয়াছে, তাহা হইলে, অনুরূপ বিশ্বাসের কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া উক্ত সম্পত্তির বিক্রয়, বন্ধক, হস্তান্তর অথবা অন্য কোনো প্রকার হস্তান্তর তদন্ত কার্য সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত নিষিদ্ধ করিবার আদেশ প্রদানের জন্য, তিনি 26[এখতিয়ারসম্পন্ন আদালতের] নিকট আবেদন করিতে পারিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন পেশকৃত আবেদন পর্যালোচনা করিয়া এবং আবেদনকারী ও যাহার বিরুদ্ধে আবেদন করা হইয়াছে তাহাকে শুনানির যুক্তিসংগত সুযোগ প্রদান করিয়া 27[এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত] আবেদনটি নিষ্পত্তি করিবেন এবং যদি তিনি প্রার্থিত আদেশ প্রদান যুক্তিসংগত বলিয়া মনে করেন, তাহা হইলে তিনি প্রার্থিত আদেশ প্রদান করিবেন:

তবে শর্ত থাকে, ৩ (তিন) মাসের মধ্যে তদন্তকার্য সম্পন্ন না হইলে 28[এখতিয়ারসম্পন্ন আদালতের] আবেদনকারী অফিসারের আবেদনের ভিত্তিতে উক্ত সময় অনূর্ধ্ব ৩ (তিন) মাস হইলে তিনি প্রার্থিত আদেশ প্রদান করিবেন:

আরও শর্ত থাকে যে, উভয় পক্ষের শুনানির পর আবেদনটির নিষ্পত্তিসাপেক্ষে বিশেষ কারণে কেবল আবেদনকারীকে শুনানি প্রদান করিয়া 29[এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত] আবেদনটির ব্যাপারে সাময়িক আদেশ জারি করিতে পারিবে।

(৩) কোনো মাদকদ্রব্য অপরাধের জন্য দায়েরকৃত কোনো মামলা চলাকালীন অভিযোগকারী যদি এই মর্মে আবেদন করেন, অভিযুক্ত ব্যক্তির মাদকদ্রব্য অপরাধ প্রমাণিত হইলে তাহার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিবার প্রয়োজন হইবে এবং সেই কারণে তাহার সম্পত্তির বিক্রয়, বন্ধক, হস্তান্তর অথবা অন্য কোনো প্রকার লেনদেন মামলা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত নিষিদ্ধ করিবার আদেশ প্রদান প্রয়োজন, তাহা হইলে 30[এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত] উভয়পক্ষকে যুক্তিসংগত শুনানির সুযোগ দান করিয়া, প্রয়োজনবোধে, উক্তরূপ আদেশ প্রদান করিবে।

গোপন অভিযোগ ও নিয়ন্ত্রিত বিলি

৩৫। (১) উপ-ধারা (২) এবং কোনো বিদেশি রাষ্ট্রের সহিত বাংলাদেশের স্বাক্ষরিত চুক্তি অথবা সমঝোতা সাপেক্ষে, সরকার, এই আইন অথবা কোনো বিদেশি রাষ্ট্রের অনুরূপ কোনো আইনের অধীন সংঘটিত কোনো মাদকদ্রব্য

অপরাধ সম্পর্কে বাংলাদেশে অথবা অন্য কোথাও প্রমাণ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে, নিয়ন্ত্রিত বিলির লিখিত অনুমোদন প্রদান করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন অনুমোদন প্রদান করা হইবে না, যদি না সরকার-

(ক) কোনো ব্যক্তিকে, যাহার পরিচিতি জ্ঞাত অথবা অজ্ঞাত যাহাই হউক না কেন, এই বলিয়া সন্দেহ করে যে, তিনি এইরূপ কোনো কার্যে লিপ্ত ছিলেন অথবা রহিয়াছেন অথবা হইবার উদ্যোগ গ্রহণ করিয়াছেন যাহা এই আইন অথবা কোনো বিদেশি রাষ্ট্রের অনুরূপ কোনো আইনের অধীন মাদকদ্রব্য অপরাধ বলিয়া পরিগণিত; এবং

(খ) এই মর্মে সন্তুষ্ট হয়, নিয়ন্ত্রিত বিলির ব্যবস্থা এইরূপ নির্ধারিত করা হইয়াছে যে, উহাতে উক্ত ব্যক্তির কার্য প্রকাশিত হইবার অথবা উক্ত কার্যসংক্রান্ত অন্য কোনো প্রমাণ লাভের সুযোগ রহিয়াছে।

(৩) সরকার অনধিক ৩ (তিন) মাসের জন্য, সময়ে সময়ে, উক্ত অনুমোদন প্রদান করিতে পারিবে।

(৪) উপ-ধারা (১) এর সামগ্রিকতা ক্ষুণ্ন না করিয়া, উক্ত উপ-ধারার অধীন অনুমোদনপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি, নিয়ন্ত্রিত বিলি ও গোপন অভিযান চলাকালে এবং তদুদ্দেশ্যে, নিম্নরূপ কার্যাবলি সম্পাদন করিতে পারিবে, যথা:-

(ক) কোনো বাহনকে বাংলাদেশে প্রবেশ অথবা বাংলাদেশ ত্যাগ করিতে দেওয়া;

(খ) কোনো বাহনকে মাদকদ্রব্য সরবরাহ অথবা সংগ্রহ করিতে দেওয়া;

(গ) কোনো বাহনে প্রবেশ ও তল্লাশির জন্য পরিস্থিতি অনুযায়ী যুক্তিসংগত শক্তি প্রয়োগ করা;

(ঘ) কোনো বাহনে গোপন সংকেত প্রদানকারী যন্ত্র (Tracking Device) স্থাপন করা; এবং

(ঙ) যে ব্যক্তির অধিকারে অথবা হেফাজতে মাদকদ্রব্য রহিয়াছে তাহাকে বাংলাদেশে প্রবেশ অথবা বাংলাদেশ ত্যাগ করিতে দেওয়া।

(৫) আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোনো গোপন অভিযান অথবা নিয়ন্ত্রিত বিলিতে অংশগ্রহণকারী কোনো অনুমোদনপ্রাপ্ত ব্যক্তি, অনুমোদনের শর্ত অনুযায়ী, উক্ত অভিযান অথবা নিয়ন্ত্রিত বিলিতে অংশগ্রহণের জন্য কোনো মাদকদ্রব্য অপরাধের দায়ে দায়ী হইবে না।

পঞ্চম অধ্যায়

অপরাধ ও দণ্ড

ধারা ৯ এবং ১০ এর বিধান লঙ্ঘনের দণ্ড

৩৬। (১) কোনো ব্যক্তি যদি নিম্নের সারণির ২য় কলামে উল্লিখিত কোনো মাদকদ্রব্য সম্পর্কে ধারা ৯ এবং ১০ এর কোনো বিধান লঙ্ঘন করে তাহা হইলে তিনি উক্ত সারণির কলাম ৩ এ উল্লিখিত দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন, যথা:-

সারণি

ক্রমিক	মাদকদ্রব্যের নাম এবং অপরাধের বিবরণ	দণ্ডের প্রকার
(১)	(২)	(৩)
১।	প্রথম তপশিলের ক শ্রেণির ১ নং ক্রমিকভুক্ত অপিয়াম পপি গাছ সম্পর্কে ধারা ৯ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (ক) এর লঙ্ঘন।	(ক) গাছের সংখ্যা অনূর্ধ্ব ১০টি হইলে অন্যূন ১(এক) বৎসর, অনূর্ধ্ব ৫ (পাঁচ) বৎসরের কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ড; (খ) গাছের সংখ্যা ১০ এর ঊর্ধ্বে এবং অনূর্ধ্ব ১০০টি হইলে অন্যূন ৫ (পাঁচ) বৎসর, অনূর্ধ্ব ১০(দশ) বৎসর কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ড; (গ) গাছের সংখ্যা ১০০টির ঊর্ধ্বে হইলে অন্যূন ১০ (দশ) বৎসর, এবং অনূর্ধ্ব ১৫ (পনেরো) বৎসরের কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ড।
২।	প্রথম তপশিলের 'ক' শ্রেণির ১ নং ক্রমিকভুক্ত অপিয়ম পপি ফল সম্পর্কে ধারা ৯ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (খ) এর লঙ্ঘন।	(ক) ফলের সংখ্যা অনূর্ধ্ব ১০০টি হইলে অন্যূন ১(এক) বৎসর, অনূর্ধ্ব ৫ (পাঁচ) বৎসর কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ড; (খ) ফলের সংখ্যা ১০০টির ঊর্ধ্বে এবং অনূর্ধ্ব ৫০০ (পাচশত) টি হইলে অন্যূন ৫ (পাঁচ) বৎসর, অনূর্ধ্ব ১০ বৎসর কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ড; (গ) ফলের সংখ্যা ৫০০ (পাঁচশত) টির ঊর্ধ্বে হইলে অন্যূন ১০ (দশ) বৎসর, অনূর্ধ্ব ১৫ (পনেরো) বৎসর কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ড।
৩।	প্রথম তপশিলের 'ক' শ্রেণির ১ নং ক্রমিকভুক্ত অপিয়ম পপি বীজ সম্পর্কে ধারা ৯ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (খ) এর লঙ্ঘন।	(ক) অঙ্কুরোদগম উপযোগী বীজের পরিমাণ অনূর্ধ্ব ১০ গ্রাম হইলে অন্যূন ১ বৎসর, অনূর্ধ্ব ৫(পাঁচ) বৎসর কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড; (খ) অঙ্কুরোদগম উপযোগী বীজের পরিমাণ ১০ গ্রামের ঊর্ধ্বে এবং অনূর্ধ্ব ৫০ (পঞ্চাশ) গ্রাম হইলে অন্যূন ৫ (পাঁচ) বৎসর, অনূর্ধ্ব ১০ বৎসর কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ড; (গ) অঙ্কুরোদগম উপযোগী বীজের পরিমাণ ৫০(পঞ্চাশ) গ্রামের ঊর্ধ্বে হইলে অন্যূন ১০ বৎসর, অনূর্ধ্ব ১৫ (পনেরো) বৎসর কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ড।
৪।	প্রথম তপশিলের 'ক' শ্রেণির ২ নং ক্রমিকভুক্ত কোকা গাছ অথবা কোকা গুল্ম	(ক) গাছের সংখ্যা অনূর্ধ্ব ১০টি হইলে অন্যূন ১ বৎসর, অনূর্ধ্ব ৫ (পাঁচ) বৎসর কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ড;

ক্রমিক	মাদকদ্রব্যের নাম এবং অপরাধের বিবরণ	দণ্ডের প্রকার
(১)	(২)	(৩)
	সম্পর্কে ধারা ৯ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (ক) এর লঙ্ঘন।	(খ) গাছের সংখ্যা ১০টির ঊর্ধ্বে এবং অনূর্ধ্ব ১০০টি হইলে অন্যূন ৫ (পাঁচ) বৎসর, অনূর্ধ্ব ১০ বৎসর কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ড; (গ) গাছের সংখ্যা ১০০টির ঊর্ধ্বে হইলে অন্যূন ১০ বৎসর, অনূর্ধ্ব ১৫ (পনেরো) বৎসর কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ড।
৫।	প্রথম তপশিলের 'ক' শ্রেণির ২ নং ক্রমিকভুক্ত কোকা পাতা সম্পর্কে ধারা ৯ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (খ) এর লঙ্ঘন।	(ক) পাতার পরিমাণ অনূর্ধ্ব ১০০ গ্রাম হইলে অন্যূন ১ বৎসর, অনূর্ধ্ব ৫ (পাঁচ) বৎসর, কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ড; (খ) পাতার পরিমাণ ১০০ গ্রামের ঊর্ধ্বে এবং অনূর্ধ্ব ১০০০ গ্রাম হইলে অন্যূন ৫ (পাঁচ) বৎসর, অনূর্ধ্ব ১০ বৎসর কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ড; (গ) পাতার পরিমাণ ১০০০ গ্রামের ঊর্ধ্বে হইলে অন্যূন ১০ বৎসর, অনূর্ধ্ব ১৫ (পনেরো) বৎসর কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ড।
৬।	প্রথম তপশিলের 'ক' শ্রেণির ৩ নং ক্রমিকভুক্ত অপিয়াম ফল নিঃসৃত আঠাল পদার্থ কিংবা পরিশোধিত, অপরিশোধিত কিংবা তৈরিকৃত যে-কোনো ধরনের আফিম কিংবা আসক্তি সৃষ্টিতে সক্ষম আফিম সহযোগে তৈরি যে-কোনো পদার্থ সম্পর্কে ধারা ৯ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (খ) এর লঙ্ঘন।	(ক) আফিম অথবা পদার্থের পরিমাণ অনূর্ধ্ব ১০০ গ্রাম অথবা মিলিলিটার হইলে অন্যূন ১ বৎসর, অনূর্ধ্ব ৫ (পাঁচ) বৎসর কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ড; (খ) আফিম অথবা পদার্থের পরিমাণ ১০০ গ্রাম অথবা মিলিলিটার-এর ঊর্ধ্বে এবং অনূর্ধ্ব ১০০০ গ্রাম অথবা মিলি লিটার হইলে অন্যূন ৫ (পাঁচ) বৎসর, অনূর্ধ্ব ১০ বৎসর কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ড; (গ) আফিম অথবা পদার্থের পরিমাণ ১০০০ গ্রাম অথবা মিলিলিটারের ঊর্ধ্বে হইলে অন্যূন ১০ বৎসর, অনূর্ধ্ব ১৫ (পনের) বৎসর কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ড।
৭।	প্রথম তপশিলের 'ক' শ্রেণির ৪ নং ক্রমিকভুক্ত যে-কোনো মাদকদ্রব্য সম্পর্কে ধারা ৯ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (ক) এর লঙ্ঘন।	(ক) মাদকদ্রব্যের পরিমাণ অনূর্ধ্ব ৫ (পাঁচ) গ্রাম অথবা মিলিলিটার হইলে অন্যূন ১ বৎসর, অনূর্ধ্ব ৫ (পাঁচ) বৎসর কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ড; (খ) মাদকদ্রব্যের পরিমাণ ৫ (পাঁচ) গ্রাম অথবা মিলিলিটার-এর ঊর্ধ্বে এবং অনূর্ধ্ব ২৫ (পঁচিশ) গ্রাম অথবা মিলিলিটার হইলে

ক্রমিক	মাদকদ্রব্যের নাম এবং অপরাধের বিবরণ	দণ্ডের প্রকার
(১)	(২)	(৩)
		অন্যূন ৫ (পাঁচ) বৎসর অনূর্ধ্ব ১০ বৎসর কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ড; (গ) মাদকদ্রব্যের পরিমাণ ২৫ (পঁচিশ) গ্রাম অথবা মিলিলিটারের ঊর্ধ্বে হইলে মৃত্যুদণ্ড অথবা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ড।
৮।	প্রথম তপশিলের ‘ক’ শ্রেণির ৪ নং ক্রমিকভুক্ত যে-কোনো মাদকদ্রব্য সম্পর্কে ধারা ৯ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (খ) এর লঙ্ঘন।	(ক) মাদকদ্রব্যের পরিমাণ অনূর্ধ্ব ৫ (পাঁচ) গ্রাম অথবা মিলিলিটার হইলে অন্যূন ১ বৎসর, অনূর্ধ্ব ৫ (পাঁচ)বৎসর কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ড; (খ) মাদকদ্রব্যের পরিমাণ ৫ (পাঁচ) গ্রাম অথবা মিলিলিটার এর ঊর্ধ্বে এবং অনূর্ধ্ব ২৫ (পচিশ) গ্রাম অথবা মিলি লিটার হইলে অন্যূন ৫ (পাঁচ) বৎসর অনূর্ধ্ব ১০ বৎসর কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ড; (গ) মাদকদ্রব্যের পরিমাণ ২৫ (পঁচিশ) গ্রাম অথবা মিলিলিটারের ঊর্ধ্বে হইলে মৃত্যুদণ্ড অথবা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।
৯।	প্রথম তপশিলের ‘ক’ শ্রেণির ৫ নং ক্রমিকভুক্ত যে-কোনো মাদকদ্রব্য সম্পর্কে ধারা ৯ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (ক) এর লঙ্ঘন।	(ক) মাদকদ্রব্যের পরিমাণ অনূর্ধ্ব ১০০ গ্রাম অথবা মিলিলিটার হইলে অন্যূন ১ বৎসর, অনূর্ধ্ব ৫ বৎসর কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ড; (খ) মাদকদ্রব্যের পরিমাণ ১০০ গ্রাম অথবা মিলিলিটার-এর ঊর্ধ্বে এবং অনূর্ধ্ব ২০০ গ্রাম অথবা মিলিলিটার হইলে অন্যূন ৫ বৎসর, অনূর্ধ্ব ১০ বৎসর কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ড; (গ) মাদকদ্রব্যের পরিমাণ ২০০ গ্রাম অথবা মিলিলিটারের ঊর্ধ্বে হইলে মৃত্যুদণ্ড অথবা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ড।
১০।	প্রথম তপশিলের ‘ক’ শ্রেণির ৫ নং ক্রমিকভুক্ত যে-কোনো মাদকদ্রব্য সম্পর্কে ধারা ৯ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (খ) এর লঙ্ঘন।	(ক) মাদকদ্রব্যের পরিমাণ অনূর্ধ্ব ২০০ গ্রাম অথবা মিলিলিটার হইলে অন্যূন ১ বৎসর, অনূর্ধ্ব ৫ বৎসর কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ড;

ক্রমিক	মাদকদ্রব্যের নাম এবং অপরাধের বিবরণ	দণ্ডের প্রকার
(১)	(২)	(৩)
		(খ) মাদকদ্রব্যের পরিমাণ ২০০ গ্রাম অথবা মিলিলিটার এর ঊর্ধ্বে এবং অনূর্ধ্ব ৪০০ গ্রাম অথবা মিলিলিটার হইলে অন্যূন ৫ বৎসর, অনূর্ধ্ব ১০ বৎসর কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ড; (গ) মাদকদ্রব্যের পরিমাণ ৪০০ গ্রাম অথবা মিলিলিটারের ঊর্ধ্বে হইলে মৃত্যুদণ্ড অথবা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।
১১।	প্রথম তপশিলের ‘ক’ শ্রেণির ৬ নং ক্রমিকভুক্ত যে-কোনো মাদকদ্রব্য সম্পর্কে ধারা ৯ এর উপ-ধারা (১ এর দফা (ক) এর লঙ্ঘন।	(ক) মাদকদ্রব্যের পরিমাণ অনূর্ধ্ব ৫ (পাঁচ) গ্রাম অথবা মিলিলিটার হইলে অন্যূন ১ বৎসর, অনূর্ধ্ব ৫ বৎসর কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ড; (খ) মাদকদ্রব্যের পরিমাণ ৫ গ্রাম অথবা মিলিলিটারের ঊর্ধ্বে এবং অনূর্ধ্ব ২৫ গ্রাম অথবা মিলিলিটার হইলে অন্যূন ৫ বৎসর, অনূর্ধ্ব ১০ বৎসর কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ড; (গ) মাদকদ্রব্যের পরিমাণ ২৫ গ্রাম অথবা মিলিলিটারের ঊর্ধ্বে হইলে মৃত্যুদণ্ড অথবা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।
১২।	প্রথম তপশিলের ‘ক’ শ্রেণির ৬নং ক্রমিকভুক্ত যে-কোনো মাদকদ্রব্য সম্পর্কে ধারা ৯ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (খ) এর লঙ্ঘন।	(ক) মাদকদ্রব্যের পরিমাণ অনূর্ধ্ব ১০ গ্রাম অথবা মিলিলিটার হইলে অন্যূন ১ বৎসর, অনূর্ধ্ব ৫ বৎসর কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ড; (খ) মাদকদ্রব্যের পরিমাণ ১০ গ্রাম অথবা মিলিলিটারের ঊর্ধ্বে এবং অনূর্ধ্ব ৫০ গ্রাম অথবা মিলিলিটার হইলে অন্যূন ৫ বৎসর, অনূর্ধ্ব ১০ বৎসর কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ড; (গ) মাদকদ্রব্যের পরিমাণ ৫০ গ্রাম অথবা মিলিলিটারের এর ঊর্ধ্বে হইলে মৃত্যুদন্ড অথবা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ড।
১৩।	প্রথম তপশিলের ‘ক’ শ্রেণির ৭ নং ক্রমিকভুক্ত যে-কোনো মাদকদ্রব্য সম্পর্কে ধারা ৯ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (ক) এর লঙ্ঘন।	(ক) মাদকদ্রব্যের পরিমাণ অনূর্ধ্ব ৫০০ গ্রাম অথবা মি.লিটার হইলে অন্যূন ১ বৎসর, অনূর্ধ্ব ৫ বৎসর কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ড; (খ) মাদকদ্রব্যের পরিমাণ ৫০০ গ্রামের ঊর্ধ্বে এবং অনূর্ধ্ব ৫ কেজি অথবা লিটার হইলে অন্যূন ৫ বৎসর, অনূর্ধ্ব ১০ বৎসর কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ড;

ক্রমিক	মাদকদ্রব্যের নাম এবং অপরাধের বিবরণ	দণ্ডের প্রকার
(১)	(২)	(৩)
		(গ) মাদকদ্রব্যের পরিমাণ ৫ কেজি অথবা লিটারের ঊর্ধ্বে হইলে অন্যূন ১০ বৎসর অনূর্ধ্ব যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ড।
১৪।	প্রথম তপশিলের 'ক' শ্রেণির ৭ নং ক্রমিকভুক্ত যে-কোনো মাদকদ্রব্য সম্পর্কে ধারা ৯ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (খ) এর লঙ্ঘন।	(ক) মাদকদ্রব্যের পরিমাণ অনূর্ধ্ব ৫০০ গ্রাম অথবা মিলিলিটার হইলে অন্যূন ১ বৎসর, অনূর্ধ্ব ৫ বৎসর কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ড; (খ) মাদকদ্রব্যের পরিমাণ ৫০০ গ্রামের ঊর্ধ্বে এবং অনূর্ধ্ব ৫ কেজি অথবা লিটার হইলে অন্যূন ৫ বৎসর, অনূর্ধ্ব ১০ বৎসর কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ড; (গ) মাদকদ্রব্যের পরিমাণ ৫ কেজি অথবা লিটার-এর ঊর্ধ্বে হইলে অন্যূন ১০ বৎসর, অনূর্ধ্ব যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ড।
১৫।	প্রথম তপশিলের 'ক' শ্রেণির ৮ নং ক্রমিকভুক্ত যে-কোনো মাদকদ্রব্য সম্পর্কে ধারা ৯ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (ক) অথবা (খ) এর লঙ্ঘন।	(ক) প্রিকারসর কেমিক্যালস-এর পরিমাণ অনূর্ধ্ব ১০ কেজি অথবা লিটার হইলে অন্যূন ১ বৎসর অনূর্ধ্ব ৫ বৎসর কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ড; (খ) প্রিকারসর কেমিক্যালস-এর পরিমাণ ১০ কেজি অথবা লিটারের ঊর্ধ্বে এবং অনূর্ধ্ব ৫০ কেজি অথবা লিটার হইলে অন্যূন ৫ বৎসর, অনূর্ধ্ব ১০ বৎসর কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ড; (গ) প্রিকারসর কেমিক্যালস-এর পরিমাণ ৫০ কেজি অথবা লিটারের ঊর্ধ্বে হইলে অন্যূন ১০ বৎসর, অনূর্ধ্ব যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ড।
১৬।	প্রথম তপশিলের 'ক' শ্রেণির কোনো মাদকদ্রব্য সম্পর্কে ধারা ৯ এর উপ-ধারা (১)-এর দফা (গ) 31[অথবা উপ-ধারা (২) এর দফা (গ)] এর লঙ্ঘন।	অন্যূন ৩ (তিন) মাস, অনূর্ধ্ব ২ বৎসর কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ড।
১৭।	প্রথম তপশিলের 'ক' শ্রেণির কোনো মাদকদ্রব্য সম্পর্কে ধারা ৯ এর উপ-ধারা (১)-এর দফা (ঘ) কিংবা উপ-ধারা (২)-	অন্যূন ৩ (তিন) মাস, অনূর্ধ্ব ২ বৎসর কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ড।

ক্রমিক	মাদকদ্রব্যের নাম এবং অপরাধের বিবরণ	দণ্ডের প্রকার
(১)	(২)	(৩)
	এর দফা (ঘ) এবং উপ-ধারা (৪) এর লঙ্ঘন।	
১৮।	প্রথম তপশিলের ‘খ’ শ্রেণির ১ নং ক্রমিকভুক্ত গাঁজা অথবা ভাং গাছ সম্পর্কে ধারা ৯ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (ক) এর লঙ্ঘন।	(ক) গাছের সংখ্যা অনূর্ধ্ব ৫০টি হইলে অন্যূন ১ বৎসর অনূর্ধ্ব ৫ বৎসর কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড; (খ) গাছের সংখ্যা ৫০টির ঊর্ধ্বে এবং অনূর্ধ্ব ৫০০টি হইলে অন্যূন ৫ বৎসর, অনূর্ধ্ব ৭ বৎসর কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড; (গ) গাছের সংখ্যা ৫০০টির ঊর্ধ্বে হইলে অন্যূন ৭ বৎসর অনূর্ধ্ব ১০ বৎসর কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।
১৯।	প্রথম তপশিলের ‘খ’ শ্রেণির ১ নং ক্রমিকভুক্ত গাঁজা অথবা ভাং গাছের শাখা-প্রশাখা, পাতা, ফুল অথবা ইত্যাদি সহযোগে প্রস্তুত যে-কোনো মাদকদ্রব্য সম্পর্কে ধারা ৯ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (খ) এর লঙ্ঘন।	(ক) মাদকদ্রব্যের পরিমাণ অনূর্ধ্ব ৫ কেজি অথবা লিটার হইলে অন্যূন ৬ মাস, অনূর্ধ্ব ৫ বৎসর কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ড; (খ) মাদকদ্রব্যের পরিমাণ ৫ কেজি অথবা লিটারের ঊর্ধ্বে এবং অনূর্ধ্ব ১৫ কেজি হইলে অন্যূন ৫ বৎসর, অনূর্ধ্ব ৭ বৎসর কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ড; (গ) মাদকদ্রব্যের পরিমাণ ১৫ কেজি অথবা লিটারের ঊর্ধ্বে হইলে অন্যূন ৭ বৎসর, অনূর্ধ্ব ১০ বৎসর কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।
২০।	প্রথম তপশিলের ‘খ’ শ্রেণির ২ নং ক্রমিকভুক্ত যে-কোনো মাদকদ্রব্য সম্পর্কে ধারা ৯ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (ক) অথবা (খ) এর লঙ্ঘন।	(ক) মাদকদ্রব্যের পরিমাণ অনূর্ধ্ব ১ কেজি অথবা লিটার হইলে অন্যূন ১ বৎসর, অনূর্ধ্ব ৩ বৎসর কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ড; (খ) মাদকদ্রব্যের পরিমাণ ১ কেজি অথবা লিটারের ঊর্ধ্বে এবং অনূর্ধ্ব ৫ কেজি হইলে অন্যূন ৩ বৎসর অনূর্ধ্ব ৭ বৎসর কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ড; (গ) মাদকদ্রব্যের পরিমাণ ৫ কেজি অথবা লিটারের ঊর্ধ্বে হইলে অন্যূন ৭ বৎসর অনূর্ধ্ব ১০ বৎসর, কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ড।
২১।	প্রথম তপশিলের ‘খ’ শ্রেণির (৩ নং ক্রমিকে উল্লিখিত মাদকদ্রব্য ব্যতীত) কোনো মাদকদ্রব্যের সম্পর্কে ধারা ৯ এর	অন্যূন ৩ (তিন) মাস অনূর্ধ্ব ২ বৎসর কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।

ক্রমিক	মাদকদ্রব্যের নাম এবং অপরাধের বিবরণ	দণ্ডের প্রকার
(১)	(২)	(৩)
	উপ-ধারা (১)-এর দফা (গ) কিংবা উপ-ধারা (২) এর দফা (গ) এর লঙ্ঘন।	
২২।	প্রথম তপশিলের 'খ' শ্রেণির (৩ নং ক্রমিকে উল্লিখিত মাদকদ্রব্য ব্যতীত) কোনো মাদকদ্রব্যের সম্পর্কে ধারা ৯ এর উপ-ধারা (১)-এর দফা (ঘ) কিংবা উপ-ধারা (২) এর দফা (ঘ) এর লঙ্ঘন।	অন্যূন ১ বৎসর অনূর্ধ্ব ৭ বৎসর কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।
২৩।	প্রথম তপশিলের 'খ' শ্রেণির ৩ নং ক্রমিকভুক্ত যে-কোনো মাদকদ্রব্য সম্পর্কে ধারা ১০ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (ক) অথবা (খ) এর লঙ্ঘন।	অন্যূন ১ বৎসর অনূর্ধ্ব ১০ বৎসর কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।
২৪।	প্রথম তপশিলের 'খ' শ্রেণির ৩ নং ক্রমিকভুক্ত যে-কোনো মাদকদ্রব্য সম্পর্কে ধারা ১০ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (গ) (ঘ) অথবা (ঙ) এর লঙ্ঘন।	(ক) মাদকদ্রব্যের পরিমাণ অনূর্ধ্ব ১০ কেজি অথবা লিটার হইলে অন্যূন ৬ মাস অনূর্ধ্ব ৩(তিন) বৎসর কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ড; (খ) মাদকদ্রব্যের পরিমাণ ১০ কেজি অথবা লিটার-এর ঊর্ধ্বে এবং অনূর্ধ্ব ১০০ কেজি অথবা লিটার হইলে অন্যূন ৩ (তিন) বৎসর অনূর্ধ্ব ৫ বৎসর কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ড; এবং (গ) মাদকদ্রব্যের পরিমাণ ১০০ কেজি অথবা লিটার-এর ঊর্ধ্বে হইলে অন্যূন ৫ বৎসর অনূর্ধ্ব ১০ বৎসর কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।
২৫।	প্রথম তপশিলের 'খ' শ্রেণির ৩ নং ক্রমিকভুক্ত যে-কোনো মাদকদ্রব্য সম্পর্কে ধারা ১০ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (চ) এর লঙ্ঘন	অন্যূন ৬ মাস অনূর্ধ্ব ২ বৎসর কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ড।
২৬।	প্রথম তপশিলের 'খ' শ্রেণির ৩ নং ক্রমিকভুক্ত যে-কোনো মাদকদ্রব্য সম্পর্কে ধারা ১০ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (ছ) এর লঙ্ঘন।	অন্যূন ১ বৎসর অনূর্ধ্ব ১০ বৎসর কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।

ক্রমিক	মাদকদ্রব্যের নাম এবং অপরাধের বিবরণ	দণ্ডের প্রকার
(১)	(২)	(৩)
২৭।	প্রথম তপশিলের ‘খ’ শ্রেণির ৩ নং ক্রমিকভুক্ত যে-কোনো মাদকদ্রব্য সম্পর্কে ধারা ১০ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (জ) এর লঙ্ঘন।	অন্যূন ১ বৎসর অনূর্ধ্ব ১০ বৎসর কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।
২৮।	প্রথম তপশিলের ‘খ’ শ্রেণির ৪ নং ক্রমিকভুক্ত যে-কোনো মাদকদ্রব্য সম্পর্কে 32[ধারা ৯] এর উপ-ধারা (১) এর দফা (ক) এর লঙ্ঘন।	অন্যূন ১ বৎসর অনূর্ধ্ব ৭ বৎসর কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।
২৯।	প্রথম তপশিলের ‘খ’ শ্রেণির ৪ নং ক্রমিকভুক্ত যে-কোনো মাদকদ্রব্য সম্পর্কে ধারা ৯ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (খ) (গ) অথবা (ঘ) এর লঙ্ঘন।	(ক) মাদকদ্রব্যের পরিমাণ অনূর্ধ্ব ১ কেজি অথবা লিটার হইলে অন্যূন ১ বৎসর অনূর্ধ্ব ৫ বৎসর কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ড; (খ) মাদকদ্রব্যের পরিমাণ ১ কেজি অথবা লিটারের ঊর্ধ্বে এবং অনূর্ধ্ব ৫ কেজি অথবা লিটার হইলে অন্যূন ৫ বৎসর অনূর্ধ্ব ৭ বৎসর কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ড; এবং (গ) মাদকদ্রব্যের পরিমাণ ৫ কেজি অথবা লিটারের ঊর্ধ্বে হইলে অন্যূন ৭ বৎসর অনূর্ধ্ব ১০ বৎসর কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ড।
৩০।	প্রথম তপশিলের ‘খ’ শ্রেণির ৫ নং ক্রমিকভুক্ত যে-কোনো মাদকদ্রব্য সম্পর্কে ধারা ৯ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (ক) এর লঙ্ঘন।	অন্যূন ১ বৎসর অনূর্ধ্ব ৭ বৎসর কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।
৩১।	প্রথম তপশিলের ‘খ’ শ্রেণির ৫ নং ক্রমিকভুক্ত যে-কোনো মাদকদ্রব্য সম্পর্কে ধারা ৯ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (খ) (গ) অথবা (ঘ) এর লঙ্ঘন।	(ক) মাদকদ্রব্যের পরিমাণ অনূর্ধ্ব ৩ কেজি অথবা লিটার হইলে অন্যূন ১ বৎসর অনূর্ধ্ব ৩ বৎসর কারাদন্ড এবং অর্থদন্ড; (খ) মাদকদ্রব্যের পরিমাণ ৩ কেজি অথবা লিটারের ঊর্ধ্বে হইতে ১০ কেজি অথবা লিটার হইলে অন্যূন ৩ বৎসর অনূর্ধ্ব ৭ বৎসর কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ড; এবং (গ) মাদকদ্রব্যের পরিমাণ ১০ কেজি অথবা লিটারের ঊর্ধ্বে হইলে অন্যূন ৭ বৎসর অনূর্ধ্ব ১০ বৎসর কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ড।

ক্রমিক	মাদকদ্রব্যের নাম এবং অপরাধের বিবরণ	দণ্ডের প্রকার
(১)	(২)	(৩)
৩২।	প্রথম তপশিলের ‘গ’ শ্রেণির ১ ও ২ নং ক্রমিকভুক্ত যে-কোনো মাদকদ্রব্য সম্পর্কে ধারা ১০ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (খ) (গ), (ঘ) অথবা (ঙ) এর লঙ্ঘন।	(ক) মাদকদ্রব্যের পরিমাণ অনূর্ধ্ব ৫০ কেজি অথবা লিটার হইলে অনূর্ধ্ব ১ বৎসর কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ড; (খ) মাদকদ্রব্যের পরিমাণ ৫০ কেজি অথবা লিটারের ঊর্ধ্বে এবং অনূর্ধ্ব ৫০০ কেজি অথবা লিটার হইলে অন্যূন ৬ মাস অনূর্ধ্ব ২ বৎসর কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ড; এবং (গ) মাদকদ্রব্যের পরিমাণ ৫০০ কেজি অথবা লিটারের ঊর্ধ্বে হইলে অন্যূন ২ বৎসর অনূর্ধ্ব ৫ বৎসর কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ড।
৩৩।	প্রথম তপশিলের ‘গ’ শ্রেণির ৩ নং ক্রমিকভুক্ত যে-কোনো মাদকদ্রব্য সম্পর্কে ধারা ৯ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (ক) অথবা (খ) এর লঙ্ঘন।	(ক) মাদকদ্রব্যের পরিমাণ অনূর্ধ্ব ১ কেজি অথবা লিটার হইলে অন্যূন ১ বৎসর অনূর্ধ্ব ৩ বৎসর কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ড; (খ) মাদকদ্রব্যের পরিমাণ ১ কেজি অথবা লিটারের ঊর্ধ্বে হইতে ৫ কেজি অথবা লিটার হইলে অন্যূন ৩ বৎসর অনূর্ধ্ব ৫ বৎসর কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ড; এবং (গ) মাদকদ্রব্যের পরিমাণ ৫ কেজি অথবা লিটারের ঊর্ধ্বে হইলে অন্যূন ৫ বৎসর অনূর্ধ্ব ৭ বৎসর কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ড।
৩৪।	প্রথম তপশিলের ‘গ’ শ্রেণির ৪ নং ক্রমিকভুক্ত যে-কোনো মাদকদ্রব্য সম্পর্কে ধারা ৯ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (ক) অথবা (খ) এর লঙ্ঘন।	(ক) মাদকদ্রব্যের পরিমাণ অনূর্ধ্ব ১ কেজি অথবা লিটার হইলে অন্যূন ১ বৎসর অনূর্ধ্ব ৩(তিন) বৎসর কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ড; (খ) মাদকদ্রব্যের পরিমাণ ১ কেজি অথবা লিটারের ঊর্ধ্বে এবং অনূর্ধ্ব ৫ কেজি অথবা লিটার হইলে অন্যূন ৩ (তিন) বৎসর অন্যূন ৫ বৎসর কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ড; এবং (গ) মাদকদ্রব্যের পরিমাণ ৫ কেজি অথবা লিটারের ঊর্ধ্বে হইলে অন্যূন ৫ বৎসর অনূর্ধ্ব ৭ বৎসর কারাদন্ড এবং অর্থদন্ড।

(২) কোনো মাদকদ্রব্য অপরাধের জন্য দণ্ডিত হইয়া দণ্ড ভোগ করিবার পর যদি কোনো ব্যক্তি পুনরায় কোনো মাদকদ্রব্য অপরাধ করেন, তাহা হইলে উক্ত অপরাধের দণ্ড মৃত্যুদণ্ড অথবা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড না হইলে তিনি উক্ত অপরাধের জন্য এই আইনে সর্বোচ্চ যে দণ্ড রহিয়াছে উহার দ্বিগুণ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

(৩) কোনো মাদকদ্রব্য অপরাধের জন্য দ্বিতীয়বার দণ্ডিত হইয়া দণ্ড ভোগ করিবার পর যদি কোনো ব্যক্তি পুনরায় কোনো মাদকদ্রব্য অপরাধ করেন তাহা হইলে উক্ত অপরাধের দন্ড মৃত্যুদণ্ড অথবা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড না হইলে তিনি উক্ত অপরাধের জন্য অন্যূন ২০ (বিশ) বৎসর কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

(৪) এই আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোনো 33[এখতিয়ারসম্পন্ন আদালতে] যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি মাদকসেবন ব্যতীত অন্য কোনোরূপ মাদক অপরাধী হিসাবে প্রতীয়মান না হন, তাহা হইলে উক্ত আদালত উক্ত ব্যক্তিকে মাদকাসক্ত ব্যক্তি বিবেচনাপূর্বক যে-কোনো মাদকাসক্তি চিকিৎসা কেন্দ্রে স্বীয় অথবা পরিবারের ব্যয়ের মাদকাসক্তি চিকিৎসার জন্য প্রেরণ করিতে পারিবেন এবং যদি উক্ত মাদকাসক্ত ব্যক্তি এইরূপ মাদকাসক্তির চিকিৎসা গ্রহণে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন, তাহা হইলে তিনি অন্যূন ৬ (ছয়) মাস অনূর্ধ্ব ৫ (পাঁচ) বৎসর কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

(৫) কোনো ব্যক্তি অ্যালকোহল পান কিংবা যে-কোনো ধরনের নেশাগ্রস্ত অবস্থায় জনসাধারণের শান্তি বিনষ্ট অথবা বিরক্তিকর কোনো আচরণ করিলে কিংবা নেশাগ্রস্ত অবস্থায় গাড়ি চালনা করিলে তিনি অনূর্ধ্ব ১ (এক) বৎসর কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

(৬) কোনো সরকারি যানবাহনের চালক যানবাহন ব্যবহারকারী অফিসারের অনুপস্থিতিতে গাড়িতে মাদকদ্রব্য পরিবহণের সময় যদি ক্ষমতাপ্রাপ্ত অফিসার কর্তৃক হাতেনাতে আটক হন, তাহা হইলে তাহার বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট অপরাধ অনুযায়ী আইনানুগ এবং বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে।

মাদকদ্রব্য উৎপাদনে ব্যবহারযোগ্য যন্ত্রপাতি, ইত্যাদি রাখিবার দণ্ড

৩৭। লাইসেন্সপ্রাপ্ত নহেন এইরূপ কোনো ব্যক্তির নিকট অথবা তাহার দখলকৃত কোনো স্থানে যদি মাদকদ্রব্য উৎপাদনে ব্যবহারযোগ্য কোনো যন্ত্রপাতি, ওয়াশ অথবা অন্যান্য উপকরণ পাওয়া যায়, তাহা হইলে তিনি অন্যূন ২ (দুই) বৎসর অনূর্ধ্ব ১০ (দশ) বৎসর কারাদণ্ডে এবং অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে।

গৃহ অথবা যানবাহন, ইত্যাদি ব্যবহার করিতে দেওয়ার দণ্ড

৩৮। কোনো ব্যক্তি যদি সজ্ঞানে কোনো মাদকদ্রব্য অপরাধ সংঘটনের জন্য তাহার মালিকানাধীন অথবা দখলি কোনো বাড়িঘর, জায়গাজমি, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, যানবাহন, যন্ত্রপাতি অথবা সাজসরঞ্জাম কিংবা কোনো অর্থ অথবা সম্পদ ব্যবহার করিতে অনুমতি প্রদান করেন, তাহা হইলে তিনি অনূর্ধ্ব ৫ (পাঁচ) বৎসর কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

বেআইনি অথবা হয়রানিমূলক তল্লাশি, ইত্যাদির দণ্ড

৩৯। যদি তল্লাশি, আটক অথবা গ্রেফতার করিবার ক্ষমতাসম্পন্ন কোনো অফিসার-

(ক) সন্দেহ করিবার যুক্তিসংগত কোনো কারণ ব্যতিরেকে তল্লাশির নামে কোনো স্থানে প্রবেশ করেন ও তল্লাশি চালান,

(খ) হয়রানিমূলকভাবে বাজেয়াপ্তযোগ্য কোনো বস্তু তল্লাশি করিবার নামে কোনো ব্যক্তির কোনো সম্পদ আটক করেন, এবং

(গ) কোনো ব্যক্তিকে হয়রানিমূলক তল্লাশি করেন অথবা গ্রেফতার করেন, তাহা হইলে তিনি অনূর্ধ্ব ১ (এক) বৎসর কারাদণ্ডে অথবা অর্থদণ্ডে অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

অর্থ যোগানদাতা, পৃষ্ঠপোষকতা, মদদদাতা, ইত্যাদি সম্পর্কে বিধান

৪০। কোনো ব্যক্তি কোনো মাদকদ্রব্য অপরাধ সংঘটনে অর্থ বিনিয়োগ করিলে অথবা অর্থ সরবরাহ করিলে অথবা সহযোগিতা প্রদান করিলে অথবা পৃষ্ঠপোষকতা করিলে তিনি সংশ্লিষ্ট ধারায় নির্ধারিত দণ্ডের অনুরূপ দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

মাদকদ্রব্য অপরাধ সংঘটনে প্ররোচনা, ইত্যাদির দণ্ড

৪১। কোনো ব্যক্তি কোনো মাদকদ্রব্য অপরাধ সংঘটনে কাহাকেও প্ররোচিত করিলে অথবা সাহায্য করিলে অথবা কাহারও সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইলে অথবা এতদুদ্দেশ্যে কোনো উদ্যোগ অথবা প্রচেষ্টা গ্রহণ করিলে, মাদকদ্রব্য অপরাধ সংঘটিত হউক অথবা না হউক, তিনি সংশ্লিষ্ট অপরাধের জন্য নির্ধারিত দণ্ডের অনুরূপ দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

শাস্তির ব্যবস্থা করা হয় নাই, এইরূপ মাদকদ্রব্য অপরাধের দণ্ড

৪২। (১) কোনো ব্যক্তি যদি এই আইন অথবা বিধির কোনো বিধান লঙ্ঘন করিলে যাহার জন্য উহাতে স্বতন্ত্র কোনো দণ্ডের ব্যবস্থা নাই, তাহা হইলে তিনি উক্ত অপরাধের জন্য অনূর্ধ্ব ১ (এক) বৎসর কারাদণ্ডে এবং অর্থ দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

(২) মাদকদ্রব্য অপরাধ দমন কার্যে নিয়োজিত কোনো আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যকে তাহার দায়িত্ব পালনকালে কোনো ব্যক্তি কোনোভাবে অসহযোগিতা করিলে অথবা বাধা প্রদান করিলে কিংবা কোনোভাবে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিলে তাহা মাদকদ্রব্য অপরাধ সংঘটনে সহযোগিতা হিসাবে গণ্য হইবে এবং তজ্জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি অন্যূন ২ (দুই) বৎসর, অনূর্ধ্ব ১০ (দশ) বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

কোম্পানি কর্তৃক মাদকদ্রব্য অপরাধ সংঘটন

৪৩। এই আইনের কোনো বিধান লঙ্ঘনকারী ব্যক্তি যদি কোম্পানি হয়, তাহা হইলে উক্ত কোম্পানির মালিক, পরিচালক, ম্যানেজার, সচিব অথবা অন্য কোনো অফিসার অথবা এজেন্ট বিধানটি লঙ্ঘন করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে, যদি না তিনি প্রমাণ করিতে সামর্থ হন যে, উক্ত লঙ্ঘন তাহার অজ্ঞাতসারে হইয়াছে অথবা উক্ত লঙ্ঘন রোধ করিবার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছে।

ব্যাখ্যা: এই ধারায়-

(ক) 'কোম্পানি' বলিতে কোনো সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষ, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ও সমিতি অথবা সংগঠনকে বুঝাইবে; এবং

(খ) বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে 'পরিচালক' বলিতে উহার কোনো অংশীদার অথবা পরিচালনা পর্ষদের সদস্যকেও বুঝাইবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

34[মাদকদ্রব্য অপরাধের বিচার]

অপরাধের বিচার, ইত্যাদি

35[৪৪। (১) এই আইনের অধীন মাদকদ্রব্য অপরাধসমূহ অপরাধের গুরুত্ব অনুযায়ী এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত কর্তৃক বিচার্য হইবে।

(২) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সংশ্লিষ্ট দায়রা জজ, মহানগর দায়রা জজ, চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বা চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট, উহার এখতিয়ারাধীন এলাকার জন্য, কেবল মাদকদ্রব্য অপরাধ বিচারের নিমিত্ত, প্রয়োজনে, এক বা একাধিক এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত নির্দিষ্ট করিবেন।]

36[***]

মাদকদ্রব্য অপরাধ আমলযোগ্যতা

৪৬। মাদকদ্রব্য অপরাধসমূহ আমলযোগ্য অপরাধ হইবে।

জামিন সংক্রান্ত বিধান

৪৭। (১) এই আইনের অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে, অভিযুক্ত কোনো ব্যক্তিকে জামিনে মুক্তি প্রদান করা হইবে না, যদি-

(ক) তাহাকে মুক্তি প্রদানের আবেদনের উপর রাষ্ট্র বা, ক্ষেত্রমত, অভিযোগকারী পক্ষকে শুনানির সুযোগ প্রদান করা না হয়; এবং

(খ) তাহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগে তিনি দোষী সাব্যস্ত হওয়ার যুক্তিসংগত কারণ রহিয়াছে মর্মে 37[এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত] সন্তুষ্ট হন; অথবা

(গ) তিনি নারী বা শিশু অথবা শারীরিকভাবে বিকলাঙ্গ না হন এবং তাহাকে জামিনে মুক্তি প্রদানের কারণে ন্যায়বিচার বিঘ্নিত হইবে না মর্মে 38[এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত] সন্তুষ্ট না হয়।

(২) কোনো মাদকদ্রব্য অপরাধের তদন্ত সমাপ্তির পর, তদন্ত প্রতিবেদন বা সেই সূত্রে প্রাপ্ত অন্যান্য তথ্যের ভিত্তিতে যদি 39[এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত] বা, ক্ষেত্রমত, আপিল আদালত এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, কোনো ব্যক্তি উক্ত অপরাধের সহিত জড়িত নহেন বলিয়া বিশ্বাস করিবার যুক্তিসংগত কারণ রহিয়াছে, তাহা হইলে 40[এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত] বা আপিল আদালত সংশ্লিষ্ট তথ্য ও কারণ উল্লেখপূর্বক উক্ত ব্যক্তিকে জামিনে মুক্তির আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

বিচারের বিশেষ পদ্ধতি

41[৪৮। এই আইনের অধীন মাদকদ্রব্য অপরাধের সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা ৫ (পাঁচ) বৎসরের অধিক কারাদণ্ড না হইলে, সংশ্লিষ্ট মামলার বিচার সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে নিষ্পন্ন হইবে এবং এইরূপ ক্ষেত্রে ফৌজদারি কার্যবিধির অধ্যায় ২২ এর বিধানাবলি, যতদূর সম্ভব, অনুসরণ করিতে হইবে।]

বিচারকার্য মুলতবি

৪৯। 42[এখতিয়ারসম্পন্ন আদালতে] মামলার বিচারকার্য আরম্ভ হইলে উহা শেষ না হওয়া পর্যন্ত অবিরাম চলিবে, তবে 43[উক্ত আদালত] যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, ন্যায় বিচারের স্বার্থে বিচারকার্য মুলতবি করা একান্ত প্রয়োজন, তাহা হইলে স্বল্পকালীন সময়ের জন্য, যাহা তিন কার্য দিবসের অধিক হইবে না, বিচারকার্য মুলতবি করা যাইবে।

বিচারাধীন মাদকদ্রব্য অপরাধের সহিত জড়িত অন্য অপরাধের বিচার

44[৫০। এই আইনের অন্য কোনো বিধান অথবা অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এখতিয়ারসম্পন্ন আদালতে বিচারাধীন কোনো মামলার মাদকদ্রব্য অপরাধের সহিত অন্য কোনো অপরাধ যদি এমনভাবে জড়িত থাকে যে, ন্যায়বিচারের স্বার্থে উক্ত অন্য অপরাধের বিচার বিচারাধীন মাদকদ্রব্য অপরাধের সহিত একই সঙ্গে হওয়া উচিত, তাহা হইলে উক্ত অন্য অপরাধটি বিচারাধীন মাদকদ্রব্য অপরাধের সহিত, যতদূর সম্ভব, এখতিয়ারসম্পন্ন আদালতে একই সঙ্গে বিচার্য হইবে।]

বিচার সমাপ্তির মেয়াদ

৫১। 45[(১) বিচারের জন্য মামলা প্রাপ্তির তারিখ হইতে ৯০ (নববই) কার্যদিবসের মধ্যে এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত কর্তৃক মাদকদ্রব্য অপরাধের বিচার সমাপ্ত করিতে হইবে।]

(২) কোনো অনিবার্য কারণে উক্ত মেয়াদের মধ্যে কোনো বিচার সমাপ্ত করা সম্ভব না হইলে, 46[এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত] কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া অতিরিক্ত ৩০ (ত্রিশ) কার্য দিবসের মধ্যে বিচার সমাপ্ত করিতে পারিবে এবং তৎসম্পর্কে সুপ্রীম কোর্টকে লিখিতভাবে অবহিত করিবে, যাহার একটি অনুলিপি সরকারের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে ।

(৩) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত বর্ধিত সময়ের মধ্যেও যদি যুক্তিসঙ্গত কোনো কারণে কোনো বিচার কার্য সমাপ্ত করা সম্ভব না হয়, তাহা হইলে 47[এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত] উহার কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া বিচার কার্য সমাপ্তির জন্য সর্বশেষ আরও ১৫ (পনেরো) কার্যদিবস সময় বর্ধিত করিতে পারিবে এবং এইরূপ সময় বর্ধিতকরণ সম্পর্কে সুপ্রিম কোর্টকে লিখিতভাবে অবহিত করিবে, যাহার একটি অনুলিপি সরকারের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

(৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন বর্ধিত সময়ের মধ্যে আবশ্যিকভাবে বিচার কার্য সমাপ্ত করিতে হইবে।

অভিযুক্ত শিশুর বিচার পদ্ধতি৫২। কোনো শিশু মাদকদ্রব্য অপরাধ সংঘটনের অভিযোগে অভিযুক্ত হইলে তাহার ক্ষেত্রে শিশু আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ২৪ নং আইন) এর বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে ।

আপিল

48[৫৩। এখতিয়ারসম্পন্ন আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে, রায় প্রদানের তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে, আপিল করা যাইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, রায়ের জাবেদা নকল পাওয়ার জন্য যে সময় অতিবাহিত হইবে উহা উক্ত সময় হইতে কর্তন করিতে হইবে।]

ফৌজদারি কার্যবিধির প্রয়োগ

৫৪। এই আইনে ভিন্নরূপ কিছু না থাকিলে, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে মাদকদ্রব্য অপরাধের অভিযোগ (এফ আই আর) দায়ের, তদন্ত, অনুসন্ধান, বিচার ও 49[আপিল] নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে ফৌজদারি কার্যবিধির বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে।

মাদকদ্রব্য অপরাধ সংঘটনে আইনানুগ অনুমান (presumption)

50[৫৫। যদি কোনো ব্যক্তির নিকট অথবা তাহার দখলকৃত বা নিয়ন্ত্রণাধীন কোনো স্থানে কোনো মাদকদ্রব্য সেবন, অন্য কোনোভাবে মাদকদ্রব্য ব্যবহার বা প্রয়োগ অথবা মাদকদ্রব্য প্রস্তুতে ব্যবহারযোগ্য সরঞ্জাম, যন্ত্রপাতি অথবা মাদকদ্রব্য প্রস্তুতের জন্য প্রয়োজনীয় বস্তু বা উপাদান পাওয়া যায়, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি, ভিন্নতর প্রমাণ করিতে ব্যর্থ হইলে, এই আইন লঙ্ঘন করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে।]

ক্যামেরায় গৃহীত ছবি, রেকর্ডকৃত কথাবার্তা, ইত্যাদির সাক্ষ্য মূল্য

৫৬। Evidence Act, 1872 (Act No.I of 1872) তে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোনো ব্যক্তি বা তদন্তকারী সংস্থার কোনো সদস্য বা অন্য কোনো ব্যক্তি কোনো মাদকদ্রব্য অপরাধ বা ক্ষতি সংঘটন বা সংঘটনের প্রস্তুতি গ্রহণ বা উহা সংঘটনে সহায়তা সংক্রান্ত কোনো ঘটনার ভিডিও বা স্থিরচিত্র ধারণ বা গ্রহণ করিলে বা কোনো কথাবার্তা বা আলাপ-আলোচনা টেপ রেকর্ড বা ডিস্কে ধারণ করিলে উক্ত ভিডিও, স্থিরচিত্র, টেপ বা ডিস্ক উক্ত অপরাধ বা ক্ষতি সংশ্লিষ্ট মামলা বিচারের সময় সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণযোগ্য হইবে।

মোবাইল কোর্ট আইনের প্রয়োগ

৫৭। এই আইনে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, মাদকদ্রব্য অপরাধসমূহ মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৫৯ নং আইন) এর অধীন মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করিয়া বিচারকার্য সম্পাদন করা যাইবে।

সপ্তম অধ্যায়

বিবিধ

মাদকশুল্ক

৫৮। (১) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, তপশিলে উল্লিখিত মাদকদ্রব্যের উপর মাদকশুল্ক নামে এক প্রকার শুল্ক আরোপ করিতে পারিবে এবং সময় সময় উক্ত শুল্ক পরিবর্তন করিতে পারিবে :

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো উৎপাদিত অ্যালকোহল বা প্রিকারসর কেমিক্যালস রপ্তানি করা হইলে উহার উপর উক্ত মাদকশুল্ক আরোপ করা হইবে না।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন আরোপিত শুল্ক, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে মহাপরিচালক বা তদধীন কোনো কর্মচারী কর্তৃক আদায় করা হইবে।

মাদকপ্রবণ অঞ্চল ঘোষণা

৫৯। (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার জনস্বার্থে মাদকের ভয়াবহতার বিষয় বিবেচনা করিয়া দেশের যে-কোনো অঞ্চলকে প্রয়োজনীয় সময়ের জন্য বিশেষ মাদকপ্রবণ অঞ্চল হিসাবে ঘোষণা করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন ঘোষিত অঞ্চলে মাদকদ্রব্য অপরাধ প্রতিরোধের জন্য অধিদপ্তর প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ বা ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

ক্ষতিপূরণ, ইত্যাদির দাবি অগ্রহণযোগ্য

৬০। এই আইনের অধীন প্রদত্ত আদেশের কারণে কোনো লাইসেন্স, পারমিট অথবা পাসধারী ব্যক্তির কিংবা যেখানে কোনো মাদকদ্রব্য অপরাধ দমন অভিযান পরিচালনা করা হইয়াছে এইরূপ স্থানের কোনো মালিক অথবা তৎসংশ্লিষ্ট কোনো ব্যক্তি অথবা প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হইলে তিনি তজ্জন্য অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোনো ক্ষতিপূরণ দাবি করিতে পারিবে না অথবা তৎকর্তৃক প্রদত্ত কোনো ফিস ফেরত চাহিতে পারিবে না।

মাদকাসক্ত ব্যক্তির তালিকা প্রণয়ন, মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র স্থাপন এবং মাদকাসক্ত পুনর্বাসন কেন্দ্র, ইত্যাদি

৬১। (১) অধিদপ্তর মাদকাসক্ত ব্যক্তির তালিকা প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(২) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা,-

(ক) অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন এক বা একাধিক মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র ও মাদকাসক্ত পুনর্বাসন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে এবং উহা পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক জনবল নিয়োগ করিতে পারিবে এবং তাহাদের চাকরির শর্তাবলি অধিদপ্তরের চাকরি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে; এবং

(খ) সরকারি খাতের কোনো প্রতিষ্ঠানকে মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র ও মাদকাসক্ত পুনর্বাসন কেন্দ্র হিসাবে নির্ধারণ বা ঘোষণা করিতে পারিবে।

(৩) বেসরকারি পর্যায়ে মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র ও মাদকাসক্তি পুনর্বাসন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার অনুমতি সরকার প্রদান করিতে পারিবে এবং বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতি ও মানদণ্ডে উহা পরিচালিত হইবে।

রাসায়নিক পরীক্ষাগার স্থাপন ও উহার প্রতিবেদন

৬২। (১) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা,-

(ক) মাদকদ্রব্য অথবা মাদকদ্রব্যের কোনো উপাদানের রাসায়নিক পরীক্ষার জন্য অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন এক বা একাধিক পরীক্ষাগার স্থাপন করিতে পারিবে এবং উহার জন্য রাসায়নিক পরীক্ষকসহ প্রয়োজনীয় সংখ্যক জনবল নিয়োগ করিতে পারিবে এবং তাহাদের চাকরির শর্তাবলি অধিদপ্তরের চাকরি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে; এবং

(খ) সরকারি খাতের কোনো প্রতিষ্ঠানকে রাসায়নিক পরীক্ষাগার হিসাবে নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(২) এই আইনের অধীন পরিচালিত কার্যক্রমের কোনো পর্যায়ে কোনো বস্তুর রাসায়নিক পরীক্ষার প্রয়োজন অনুভূত হইলে উহা উপ-ধারা (১) এর অধীন স্থাপিত বা নির্ধারিত রাসায়নিক পরীক্ষাগারে প্রেরণ করিতে হইবে।

(৩) রাসায়নিক পরীক্ষকের স্বাক্ষরযুক্ত রাসায়নিক পরীক্ষার প্রতিবেদন মামলা দায়ের, মাদকদ্রব্য অপরাধের তদন্ত, অনুসন্ধান, বিচার অথবা অন্য কোনো প্রকার কার্যধারায় সাক্ষ্য হিসাবে ব্যবহার করা যাইবে।

ব্যাখ্যা: এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে 'রাসায়নিক পরীক্ষক' অর্থ এই আইনের অধীন সরকার কর্তৃক স্থাপিত বা নির্ধারিত সরকারি রাসায়নিক পরীক্ষাগারে নিয়োগকৃত অথবা স্বীকৃত যে-কোনো পদমর্যাদার রাসায়নিক পরীক্ষক।

কমিটি গঠন ও উহার দায়িত্ব

৬৩। (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা নিম্ন-বর্ণিত এক বা একাধিক কমিটি গঠন করিতে পারিবে, যথা:-

(ক) জাতীয় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ উপদেষ্টা কমিটি; (খ) জাতীয় মাদকবিরোধী কমিটি; (গ) জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ ও প্রচার কমিটি; এবং (ঘ) উপজেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ ও প্রচার কমিটি।

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত প্রজ্ঞাপনে বা বিধি দ্বারা সরকার কমিটিসমূহের দায়-দায়িত্ব, সভা অনুষ্ঠান, কার্য পদ্ধতিসহ অন্যান্য বিষয়াদি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

ক্ষমতা অর্পণ

৬৪। মহাপরিচালক এই আইনের অধীন তাহার কোনো ক্ষমতা অথবা দায়িত্ব প্রয়োজনবোধে, লিখিত আদেশ দ্বারা, তাহার অধস্তন যে-কোনো অফিসারকে অর্পণ করিতে পারিবেন।

তপশিল সংশোধন

৬৫। সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে-কোনো তপশিল সংশোধন করিয়া কোনো মাদকদ্রব্যের নাম অর্ন্তভূক্তি বা কর্তন করিতে পারিবে।

পারস্পরিক সহযোগিতায় বাধ্যবাধকতা

৬৬। এই আইনের কোনো বিধান কার্যকর করিবার ব্যাপারে এবং তথ্য বিনিময় করিবার ব্যাপারে কোনো ব্যক্তি অনুরুদ্ধ হইলে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অফিসারগণকে সর্বপ্রকার সাহায্য ও সহযোগিতা করিতে বাধ্য থাকিবেন।

জটিলতা নিরসনে সরকারের ক্ষমতা

৬৭। এই আইনের কোনো অস্পষ্টতার কারণে উহা কার্যকর করিবার ক্ষেত্রে কোনো জটিলতা বা অসুবিধা দেখা দিলে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের বিধানাবলির সহিত সংগতিপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, উক্ত বিধানের স্পষ্টীকরণ বা ব্যাখ্যা প্রদানপূর্বক উক্ত বিষয়ে করণীয় সম্পর্কে দিকনির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে।

বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা

৬৮। (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রদত্ত ক্ষমতার সামগ্রিকতাকে ক্ষুণ্ণ না করিয়া, উক্ত বিধিতে নিম্নবর্ণিত সকল বা যে কোনো বিষয়ে বিধান প্রণয়ন করা যাইবে, যথা:-

(ক) অ্যালকোহল; (খ) মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র স্থাপন, মাদকাসক্তি পুনর্বাসন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা; (গ) লাইসেন্স, পারমিট ও ফিস; (ঘ) বাজেয়াপ্তকরণ; (ঙ) ডোপ টেস্ট; (চ) মাদকাসক্তদের তালিকা; এবং (ছ) অফিসার-কর্মচারী নিয়োগ:

(৩) এই ধারার অধীন বিধি প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত সরকার, প্রয়োজনে, সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা, এই আইনের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, যে কোনো কার্যক্রম গ্রহণ ও সম্পাদনের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

রহিতকরণ ও হেফাজত

৬৯। (১) এই আইন প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, (১৯৯০ সনের ২০ নং আইন), অতঃপর 'উক্ত আইন' বলিয়া উল্লিখিত, এতদ্দ্বারা রহিত হইবে।

(২) উক্ত আইন রহিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে, উহার অধীন গঠিত-

(ক) 'জাতীয় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ বোর্ড' বিলুপ্ত হইবে; এবং

(খ) 'জাতীয় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ বোর্ড তহবিল ও এতৎসংক্রান্ত 'জাতীয় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ বোর্ড (তহবিল রক্ষণাবেক্ষণ ও অর্থ ব্যয়) বিধি, ২০০১' বিলুপ্ত হইবে, এবং বিলুপ্ত তহবিলে গচ্ছিত সকল অর্থ সরকারি কোষাগারে স্থানান্তরিত হইবে।

(৩) উক্ত আইন রহিত হওয়া সত্ত্বেও, উহার অধীন-

(ক) কৃত কোনো কার্য বা গৃহীত ব্যবস্থা এই আইনের অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে;

(খ) প্রণীত কোনো বিধি, জারিকৃত কোনো প্রজ্ঞাপন, প্রদত্ত কোনো আদেশ, নির্দেশ, অনুমোদন, সুপারিশ বা কার্যক্রম উক্তরূপ রহিত হইবার অব্যবহিত পূর্বে বলবৎ থাকিলে, এই আইনের অধীন প্রণীত, জারিকৃত বা প্রদত্ত না হওয়া পর্যন্ত, এই আইনের বিধানাবলির সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে বলবৎ থাকিবে;

(গ) দায়েরকৃত অনিষ্পন্ন ফৌজদারি কার্যধারা এমনভাবে নিষ্পন্ন করিতে হইবে যেন উক্ত আইন রহিত হয় নাই;

(ঘ) প্রতিষ্ঠিত বা অনুমোদিত মাদকাসক্তি পরামর্শ কেন্দ্র, মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র এ মাদকাসক্ত পুনর্বাসন কেন্দ্র এই আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত বা অনুমোদিত বলিয়া গণ্য হইবে; এবং

(ঙ) স্থাপিত বা অনুমোদিত রাসায়নিক পরীক্ষাগার এই আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত বা অনুমোদিত বলিয়া গণ্য হইবে।

(৪) উক্ত আইন রহিত হওয়া সত্ত্বেও, উহাতে সংযুক্ত দ্বিতীয় তপশিলে উল্লিখিত মাদক শুল্কের হার এই আইনের অধীন নির্ধারিত না হওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে।

আইনের ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ

৭০। (১) এই আইন প্রবর্তনের পর সরকার, যথাশীঘ্র সম্ভব, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের মূল বাংলা পাঠের ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিবে।

(২) বাংলা পাঠ এবং ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

1 "হাইড্রোকার্বনজাত হাইড্রোক্সিল (OH-)" শব্দগুলি, বন্ধনী, বর্ণগুলি ও চিহ্ন "হাইড্রোকার্বনজাত (OH-) হাইড্রোক্সিল" শব্দগুলি, বন্ধনী, বর্ণগুলি ও চিহ্নের পরিবর্তে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (সংশোধন) আইন, ২০২০ (২০২০ সনের ২৬ নং আইন) এর ২ (ক) ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

2 দফা (৭ক) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (সংশোধন) আইন, ২০২০ (২০২০ সনের ২৬ নং আইন) এর ২ (খ) ধারাবলে সন্নিবেশিত।

3 দফা (২৬) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (সংশোধন) আইন, ২০২০ (২০২০ সনের ২৬ নং আইন) এর ২ (গ) ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

4 দফা (৩৩) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (সংশোধন) আইন, ২০২০ (২০২০ সনের ২৬ নং আইন) এর ২ (ঘ) ধারাবলে বিলুপ্ত।

5 "এবং" শব্দ প্রান্তস্থিত সেমিকোলন চিহ্নের পর মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (সংশোধন) আইন, ২০২০ (২০২০ সনের ২৬ নং আইন) এর ২ (ঙ) ধারাবলে সংযোজিত।

6 "।" দাড়ি চিহ্ন ";" সেমিকোলন চিহ্নের পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত এবং "এবং" শব্দ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (সংশোধন) আইন, ২০২০ (২০২০ সনের ২৬ নং আইন) এর ২ (চ) ধারাবলে বিলুপ্ত ।

7 দফা (৩৬) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (সংশোধন) আইন, ২০২০ (২০২০ সনের ২৬ নং আইন) এর ২ (ছ) ধারাবলে বিলুপ্ত।

8 "কাস্টমসের সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা" শব্দগুলি "কাস্টমসের পরিদর্শক" শব্দগুলির পরিবর্তে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (সংশোধন) আইন, ২০২০ (২০২০ সনের ২৬ নং আইন) এর ৩ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

9 "এখতিয়ারসম্পন্ন আদালতের" শব্দগুলি "ম্যাজিস্ট্রেট আদালত বা, ক্ষেত্রমত, ট্রাইব্যুনালের" শব্দগুলি ও কমাগুলির পরিবর্তে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (সংশোধন) আইন, ২০২০ (২০২০ সনের ২৬ নং আইন) এর ৪ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

10 "এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত" শব্দগুলি "ম্যাজিস্ট্রেট আদালত বা ট্রাইব্যুনালে" শব্দগুলির পরিবর্তে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (সংশোধন) আইন, ২০২০ (২০২০ সনের ২৬ নং আইন) এর ৫(ক) ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

11 "উক্ত আদালত" শব্দগুলি "ম্যাজিস্ট্রেট আদালত বা ট্রাইব্যুনাল" শব্দগুলির পরিবর্তে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (সংশোধন) আইন, ২০২০ (২০২০ সনের ২৬ নং আইন) এর ৫(খ) ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

12 "এখতিয়ারসম্পন্ন আদালতের" শব্দগুলি "উক্ত ম্যাজিস্ট্রেট আদালত বা ট্রাইব্যুনালের" শব্দগুলির পরিবর্তে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (সংশোধন) আইন, ২০২০ (২০২০ সনের ২৬ নং আইন) এর ৬(ক) ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

13 "অন্যান্য সংস্থা" শব্দগুলি "সকল কর্তৃপক্ষ" শব্দগুলির পরিবর্তে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (সংশোধন) আইন, ২০২০ (২০২০ সনের ২৬ নং আইন) এর ৬(খ) ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

14 "এখতিয়ারসম্পন্ন আদালতের" শব্দগুলি "ম্যাজিস্ট্রেট আদালত বা ট্রাইব্যুনালের" শব্দগুলির পরিবর্তে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (সংশোধন) আইন, ২০২০ (২০২০ সনের ২৬ নং আইন) এর ৭(ক) ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

15 "আদালতকে" শব্দটি "ম্যাজিস্ট্রেট আদালত বা ট্রাইব্যুনালকে" শব্দগুলির পরিবর্তে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (সংশোধন) আইন, ২০২০ (২০২০ সনের ২৬ নং আইন) এর ৭(খ) ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

16 "এখতিয়ারসম্পন্ন আদালতের" শব্দগুলি "ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের" শব্দগুলির পরিবর্তে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (সংশোধন) আইন, ২০২০ (২০২০ সনের ২৬ নং আইন) এর ৮(ক) (অ) ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

17 "এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত" শব্দগুলি "ম্যাজিস্ট্রেট আদালত" শব্দগুলির পরিবর্তে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (সংশোধন) আইন, ২০২০ (২০২০ সনের ২৬ নং আইন) এর ৮(ক) (আ) ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

18 "এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত" শব্দগুলি "ম্যাজিস্ট্রেট আদালত" শব্দগুলির পরিবর্তে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (সংশোধন) আইন, ২০২০ (২০২০ সনের ২৬ নং আইন) এর ৮(খ) ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

19 "এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত" শব্দগুলি "ম্যাজিস্ট্রেট আদালত" শব্দগুলির পরিবর্তে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (সংশোধন) আইন, ২০২০ (২০২০ সনের ২৬ নং আইন) এর ৮(গ) ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

20 "এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত" শব্দগুলি "ম্যাজিস্ট্রেট" শব্দের পরিবর্তে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (সংশোধন) আইন, ২০২০ (২০২০ সনের ২৬ নং আইন) এর ৮(ঘ) ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

21 "এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত" শব্দগুলি "ম্যাজিস্ট্রেট আদালত" শব্দগুলির পরিবর্তে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (সংশোধন) আইন, ২০২০ (২০২০ সনের ২৬ নং আইন) এর ৮(ঙ) ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

22 "এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত" শব্দগুলি "ম্যাজিস্ট্রেট আদালত" শব্দগুলির পরিবর্তে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (সংশোধন) আইন, ২০২০ (২০২০ সনের ২৬ নং আইন) এর ৮(চ) ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

23 "এখতিয়ারসম্পন্ন আদালতে" শব্দগুলি "ম্যাজিস্ট্রেট আদালত বা ট্রাইব্যুনালে" শব্দগুলির পরিবর্তে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (সংশোধন) আইন, ২০২০ (২০২০ সনের ২৬ নং আইন) এর ৯(ক) ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

24 "এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত" শব্দগুলি "ম্যাজিস্ট্রেট আদালত বা ট্রাইব্যুনাল" শব্দগুলির পরিবর্তে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (সংশোধন) আইন, ২০২০ (২০২০ সনের ২৬ নং আইন) এর ৯(খ) ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

25 "এখতিয়ারসম্পন্ন আদালতকে" শব্দগুলি "ম্যাজিস্ট্রেট আদালত বা ট্রাইব্যুনালকে" শব্দগুলির পরিবর্তে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (সংশোধন) আইন, ২০২০ (২০২০ সনের ২৬ নং আইন) এর ৯(গ) ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

26 "এখতিয়ারসম্পন্ন আদালতের" শব্দগুলি "ম্যাজিস্ট্রেট আদালত বা ট্রাইব্যুনালের" শব্দগুলির পরিবর্তে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (সংশোধন) আইন, ২০২০ (২০২০ সনের ২৬ নং আইন) এর ১০(ক) ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

27 "এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত" শব্দগুলি "ম্যাজিস্ট্রেট আদালত বা ট্রাইব্যুনাল" শব্দগুলির পরিবর্তে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (সংশোধন) আইন, ২০২০ (২০২০ সনের ২৬ নং আইন) এর ১০(খ)(অ) ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

28 "এখতিয়ারসম্পন্ন আদালতের" শব্দগুলি "ম্যাজিস্ট্রেট আদালত বা ট্রাইব্যুনালের" শব্দগুলির পরিবর্তে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (সংশোধন) আইন, ২০২০ (২০২০ সনের ২৬ নং আইন) এর ১০(খ)(আ) ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

29 "এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত" শব্দগুলি "ম্যাজিস্ট্রেট আদালত বা ট্রাইব্যুনাল" শব্দগুলির পরিবর্তে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (সংশোধন) আইন, ২০২০ (২০২০ সনের ২৬ নং আইন) এর ১০(খ)(ই) ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

30 “এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত” শব্দগুলি “ম্যাজিস্ট্রেট আদালত বা ট্রাইব্যুনাল” শব্দগুলির পরিবর্তে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (সংশোধন) আইন, ২০২০ (২০২০ সনের ২৬ নং আইন) এর ১০(গ) ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

31 “অথবা উপ-ধারা (২) এর দফা (গ)” শব্দগুলি, বন্ধনীগুলি, সংখ্যা ও বর্ণ “উপ-ধারা (২) এর দফা (ঘ)” শব্দগুলি, বন্ধনীগুলি, সংখ্যা ও বর্ণের পরিবর্তে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (সংশোধন) আইন, ২০২০ (২০২০ সনের ২৬ নং আইন) এর ১১(ক)(অ) ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

32 “ধারা ৯” শব্দ ও সংখ্যা “ধারা ১০” শব্দ ও সংখ্যার পরিবর্তে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (সংশোধন) আইন, ২০২০ (২০২০ সনের ২৬ নং আইন) এর ১১(ক)(আ) ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

33 “এখতিয়ারসম্পন্ন আদালতে” শব্দগুলি “ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে” শব্দগুলির পরিবর্তে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (সংশোধন) আইন, ২০২০ (২০২০ সনের ২৬ নং আইন) এর ১১(খ) ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

34 “মাদকদ্রব্য অপরাধের বিচার” শব্দগুলি “ট্রাইব্যুনাল স্থাপন ও অপরাধের বিচার” শব্দগুলির পরিবর্তে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (সংশোধন) আইন, ২০২০ (২০২০ সনের ২৬ নং আইন) এর ১২ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

35 ধারা ৪৪ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (সংশোধন) আইন, ২০২০ (২০২০ সনের ২৬ নং আইন) এর ১৩ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

36 ধারা ৪৫ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (সংশোধন) আইন, ২০২০ (২০২০ সনের ২৬ নং আইন) এর ১৪ ধারাবলে বিলুপ্ত।

37 “এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত” শব্দগুলি “ম্যাজিস্ট্রেট আদালত বা ট্রাইব্যুনাল” শব্দগুলির পরিবর্তে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (সংশোধন) আইন, ২০২০ (২০২০ সনের ২৬ নং আইন) এর ১৫(ক)(অ) ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

38 “এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত” শব্দগুলি “ম্যাজিস্ট্রেট আদালত বা ট্রাইব্যুনাল” শব্দগুলির পরিবর্তে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (সংশোধন) আইন, ২০২০ (২০২০ সনের ২৬ নং আইন) এর ১৫(ক)(আ) ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

39 “এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত” শব্দগুলি “ম্যাজিস্ট্রেট আদালত বা ট্রাইব্যুনাল” শব্দগুলির পরিবর্তে, উভয় স্থানে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (সংশোধন) আইন, ২০২০ (২০২০ সনের ২৬ নং আইন) এর ১৫(খ) ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

40 “এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত” শব্দগুলি “ম্যাজিস্ট্রেট আদালত বা ট্রাইব্যুনাল” শব্দগুলির পরিবর্তে, উভয় স্থানে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (সংশোধন) আইন, ২০২০ (২০২০ সনের ২৬ নং আইন) এর ১৫(খ) ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

41 ধারা ৪৮ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (সংশোধন) আইন, ২০২০ (২০২০ সনের ২৬ নং আইন) এর ১৬ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

42 “এখতিয়ারসম্পন্ন আদালতে” শব্দগুলি “ট্রাইব্যুনালে” শব্দের পরিবর্তে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (সংশোধন) আইন, ২০২০ (২০২০ সনের ২৬ নং আইন) এর ১৭ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

43 “উক্ত আদালত” শব্দগুলি “ট্রাইব্যুনাল” শব্দের পরিবর্তে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (সংশোধন) আইন, ২০২০ (২০২০ সনের ২৬ নং আইন) এর ১৭ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

44 ধারা ৫০ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (সংশোধন) আইন, ২০২০ (২০২০ সনের ২৬ নং আইন) এর ১৮ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

45 উপ-ধারা (১) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (সংশোধন) আইন, ২০২০ (২০২০ সনের ২৬ নং আইন) এর ১৯(ক) ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

46 ‘‘এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত’’ শব্দগুলি ‘‘ট্রাইব্যুনাল’’ শব্দের পরিবর্তে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (সংশোধন) আইন, ২০২০ (২০২০ সনের ২৬ নং আইন) এর ১৯(খ) ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

47 ‘‘এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত’’ শব্দগুলি ‘‘ট্রাইব্যুনাল’’ শব্দের পরিবর্তে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (সংশোধন) আইন, ২০২০ (২০২০ সনের ২৬ নং আইন) এর ১৯(গ) ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

48 ধারা ৫৩ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (সংশোধন) আইন, ২০২০ (২০২০ সনের ২৬ নং আইন) এর ২০ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

49 ‘‘আপিল’’ শব্দ ‘‘বিচার ও’’ শব্দগুলির পর মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (সংশোধন) আইন, ২০২০ (২০২০ সনের ২৬ নং আইন) এর ২১ ধারাবলে সন্নিবেশিত।

50 ধারা ৫৫ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (সংশোধন) আইন, ২০২০ (২০২০ সনের ২৬ নং আইন) এর ২২ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

(সূত্র: লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার. http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-details-1276.html)

ব্যভিচার

বাংলাদেশে প্রচলিত দণ্ডবিধির ৪৯৩ ধারা থেকে ৪৯৮ ধারা পর্যন্ত বিয়ে- সংক্রান্ত বিভিন্ন অপরাধের জন্য শাস্তির বিধান করা হয়েছে

৪৯৩ ধারা: কোনো ব্যক্তি যদি কোনো নারীকে প্রতারণামূলক আইনসম্মত বিবাহিত বলে বিশ্বাস সৃষ্টি করায়, কিন্তু আদৌ ওই বিয়ে যদি আইনসম্মতভাবে না হয়ে থাকে এবং ওই নারীর সঙ্গে যৌন- সম্পর্ক স্থাপন করে, তাহলে অপরাধী ১০ বছর পর্যন্ত যেকোনো মেয়াদের সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবে।

৪৯৪ ধারা: যদি কোনো ব্যক্তি এক স্বামী বা এক স্ত্রী জীবিত থাকা সত্ত্বেও পুনরায় বিয়ে করে, তাহলে দায়ী ব্যক্তি সাত বছর পর্যন্ত যেকোনো মেয়াদের সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবে এবং অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবে। তবে যে সাবেক স্বামী বা স্ত্রীর জীবদ্দশায় বিয়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছে, বিয়ের সময় পর্যন্ত সে স্বামী বা স্ত্রী যদি সাত বছর পর্যন্ত নিখোঁজ থাকেন এবং সেই ব্যক্তি বেঁচে আছেন বলে কোনো সংবাদ না পান, তাহলে এ ধারার আওতায় তিনি শাস্তিযোগ্য অপরাধী বলে গণ্য হবেন না।

৪৯৫ ধারা: যদি কোনো ব্যক্তি দ্বিতীয় বা পরবর্তী বিয়ে করার সময় প্রথম বা পূর্ববর্তী বিয়ের তথ্য গোপন রাখে, তা যদি দ্বিতীয় বিবাহিত ব্যক্তি জানতে পারে, তাহলে অপরাধী ১০ বছর পর্যন্ত যেকোনো মেয়াদের সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবে এবং অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত হবে।

৪৯৬ ধারা: যদি কোনো ব্যক্তি আইনসম্মত বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা ব্যতীত প্রতারণামূলকভাবে বিয়ে সম্পন্ন করে, তাহলে অপরাধী সাত বছর পর্যন্ত সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবে।

৪৯৭ ধারা: যদি কোনো ব্যক্তি এমন কোনো নারীর সঙ্গে তার স্বামীর সম্মতি ব্যতীত যৌনসঙ্গম করে এবং অনুরূপ যৌনসঙ্গম যদি ধর্ষণের অপরাধ না হয়, তাহলে সে ব্যক্তি ব্যভিচারের দায়ে দায়ী হবে, যার শাস্তি সাত বছর পর্যন্ত যেকোনো মেয়াদের সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ডসহ উভয় দণ্ড। এ ক্ষেত্রে নির্যাতিতাকে অন্য লোকের স্ত্রী হতে হবে। তবে ব্যভিচারের ক্ষেত্রে নারীর কোনো শাস্তির বিধান আইনে নেই।

৪৯৮ ধারা: কোনো বিবাহিত নারীকে ফুসলিয়ে বা প্ররোচনার মাধ্যমে কোথাও নিয়ে যাওয়া এবং তাকে অপরাধজনক উদ্দেশ্যে আটক রাখা অপরাধ। এ ধারা অনুযায়ী অপরাধী ব্যক্তি দুই বছর পর্যন্ত যেকোনো মেয়াদের সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ডসহ উভয় ধরনের শাস্তি পাবে।

(সূত্র: লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার. http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-11/chapter-23.html)

ধর্ষণ ৩৭৫-৩৭৬

দণ্ডবিধি ৩৭৫ ধারায় ধর্ষণের সংজ্ঞা:- ধারা ৩৭৫। ধর্ষণ (Rape): কোন পুরুষ অতঃপর উল্লেখিত ব্যতিক্রম ভিন্ন অপর সকল ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত পাঁচটি যেকোন অবস্থায় কোন স্ত্রীলোকের সাথে যৌনসঙ্গম করলে সে ধর্ষণ করেছে বলে পরিগণিত হবে।

- প্রথমত:- স্ত্রীলোকটির ইচ্ছার বিরুদ্ধে ।
- দ্বিতীয়ত:- স্ত্রীলোকটির সম্মতি ব্যতিরেকে।
- তৃতীয়ত:- স্ত্রীলোকটির সম্মতিক্রমেই, যেক্ষেত্রে মৃত্যু বা জখমের ভয় প্রদর্শন করে স্ত্রীলোকটির সম্মতি আদায় করা হলে।
- চতুর্থত:- স্ত্রীলোকটির সম্মতিক্রমেই, যেক্ষেত্রে পুরুষটি জানে যে, সে স্ত্রীলোকটি স্বামী নয়, এবং পুরুষটি ইহাও জানে যে, স্ত্রীলোকটি তাকে এমন অপর একজন পুরুষ বলে ভুল করেছে, যে পুরুষটির সাথে সে আইন সম্মতভাবে বিবাহিত হয়েছে বা বিবাহিত বলে বিশ্বাস করে ।
- পঞ্চমত:- স্ত্রীলোকটির সম্মতিক্রমে অথবা সম্মতি ব্যতিরেকে, যতি স্ত্রীলোকটির বয়স চৌদ্দ বৎসরের কম হয়।

ব্যতিক্রম: কোন পুরুষের কর্তৃক নিজ স্ত্রীর সাথে যৌনসঙ্গম ধর্ষণ বলে পরিগণিত হবে না, যদি স্ত্রী তের[১] বৎসরে নিম্ন বয়স্কা না হয়।

ব্যতিক্রম: কোন পুরুষ নিজ স্ত্রীর সঙ্গে যৌনসঙ্গম করলে সেটাকে ধর্ষণ বলে ধরা হবে, যদি তার স্ত্রীর বয়স ১৩ বছরের[২] কম হয়।

(সূত্র: লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার. http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-11/section-3231.html)

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০

(২০০০ সনের ৮ নং আইন)[১৪ ফেব্রুয়ারী, ২০০০]

নারী ও শিশু নির্যাতনমূলক অপরাধসমূহ কঠোরভাবে দমনের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় বিধান প্রণয়নকল্পে প্রণীত আইন।

ধর্ষণ, ধর্ষণজনিত কারণে মৃত্যু, ইত্যাদির শাস্তি

৯। (১) যদি কোন পুরুষ কোন নারী বা শিশুকে ধর্ষণ করেন, তাহা হইলে তিনি [মৃত্যুদণ্ডে বা যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডে] দণ্ডনীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবেন।[৩]

ব্যাখ্যা।- যদি কোন পুরুষ বিবাহ বন্ধন ব্যতীত [ষোল বৎসরের] অধিক বয়সের কোন নারীর সহিত তাহার সম্মতি ব্যতিরেকে বা ভীতি প্রদর্শন বা প্রতারণামূলকভাবে তাহার সম্মতি আদায় করিয়া, অথবা [ষোল বৎসরের] কম বয়সের কোন নারীর সহিত তাহার সম্মতিসহ বা সম্মতি ব্যতিরেকে যৌন সঙ্গম করেন, তাহা হইলে তিনি উক্ত নারীকে ধর্ষণ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন।[৪]

(২) যদি কোন ব্যক্তি কর্তৃক ধর্ষণ বা উক্ত ধর্ষণ পরবর্তী তাহার অন্যবিধ কার্যকলাপের ফলে ধর্ষিতা নারী বা শিশুর মৃত্যু ঘটে, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি মৃত্যুদণ্ডে বা যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অন্যূন এক লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবেন।

---

[১] "ষোল বৎসরের" শব্দগুলি "বারো বা তেরো বা চৌদ্দ বৎসরের" শব্দগুলির পরিবর্তে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ৩০ নং আইন) এর ৩ ধারা বলে প্রতিস্থাপিত

[২] "ষোল বৎসরের" শব্দগুলি "বারো বা তেরো বা চৌদ্দ বৎসরের" শব্দগুলির পরিবর্তে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ৩০ নং আইন) এর ৩ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত

[৩] "মৃত্যুদণ্ডে বা যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডে" শব্দগুলি "যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডে" শব্দগুলির পরিবর্তে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২০ (২০২০ সনের ০৪ নং অধ্যাদেশ) এর ৩(ক) ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

[৪] "ষোল বৎসরের" শব্দগুলি "চৌদ্দ বৎসরের" শব্দগুলির পরিবর্তে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ৩০ নং আইন) এর ৩ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত

(৩) যদি একাধিক ব্যক্তি দলবদ্ধভাবে কোন নারী বা শিশুকে ধর্ষণ করেন এবং ধর্ষণের ফলে উক্ত নারী বা শিশুর মৃত্যু ঘটে বা তিনি আহত হন, তাহা হইলে ঐ দলের প্রত্যেক ব্যক্তি মৃত্যুদণ্ডে বা যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অন্যূন এক লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবেন।

(৪) যদি কোন ব্যক্তি কোন নারী বা শিশুকে-

(ক) ধর্ষণ করিয়া মৃত্যু ঘটানোর বা আহত করার চেষ্টা করেন, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি [মৃত্যুদণ্ডে বা যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডে] দণ্ডনীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবেন;[৫]

(খ) ধর্ষণের চেষ্টা করেন, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি অনধিক দশ বৎসর কিন্তু অন্যূন পাঁচ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবেন।

(৫) যদি পুলিশ হেফাজতে থাকাকালীন সময়ে কোন নারী ধর্ষিতা হন, তাহা হইলে যাহাদের হেফাজতে থাকাকালীন উক্তরূপ ধর্ষণ সংঘটিত হইয়াছে, সেই ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ ধর্ষিতা নারীর হেফাজতের জন্য সরাসরিভাবে [দায়িত্বপ্রাপ্ত] ছিলেন, তিনি বা তাহারা প্রত্যেকে, ভিন্নরূপ প্রমাণিত না হইলে, হেফাজতের ব্যর্থতার জন্য, অনধিক দশ বৎসর কিন্তু অন্যূন পাঁচ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অন্যূন দশ হাজার টাকা অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবেন।[৬]

নারীর আত্মহত্যায় প্ররোচনা, ইত্যাদির শাস্তি

[৯ক। কোন নারীর সম্মতি ছাড়া বা ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন ব্যক্তির ইচ্ছাকৃত (Wilful) কোন কার্য দ্বারা সম্ভ্রমহানি হইবার প্রত্যক্ষ কারণে কোন নারী আত্মহত্যা করিলে উক্ত ব্যক্তি উক্ত নারীকে অনুরূপ কার্য দ্বারা আত্মহত্যা করিতে প্ররোচিত করিবার অপরাধে অপরাধী হইবেন এবং উক্ত অপরাধের জন্য তিনি অনধিক দশ বৎসর কিন্তু অন্যূন পাঁচ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবেন।][৭]

যৌন পীড়ন, ইত্যাদির দণ্ড

[১০। যদি কোন ব্যক্তি অবৈধভাবে তাহার যৌন কামনা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে তাহার শরীরের যে কোন অঙ্গ বা কোন বস্তু দ্বারা কোন নারী বা শিশুর যৌন অঙ্গ বা অন্য কোন অঙ্গ স্পর্শ করেন বা কোন নারীর শ্লীলতাহানি করেন তাহা হইলে তাহার এই কাজ হইবে যৌন পীড়ন এবং তজ্জন্য উক্ত ব্যক্তি অনধিক দশ বৎসর কিন্তু অন্যূন তিন বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবেন।][৮]

---

[৫] "মৃত্যুদণ্ডে বা যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডে" শব্দগুলি "যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডে" শব্দগুলির পরিবর্তে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২০ (২০২০ সনের ০৪ নং অধ্যাদেশ) এর ৩(খ) ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

[৬] "দায়িত্বপ্রাপ্ত" শব্দ "দায়ী" শব্দের পরিবর্তে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২০ (২০২০ সনের ০৪ নং অধ্যাদেশ) এর ৩(গ) ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

[৭] ধারা ৯ক নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ৩০ নং আইন) এর ৪ ধারাবলে সন্নিবেশিত

[৮] ধারা ১০ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ৩০ নং আইন) এর ৫ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত

ধর্ষণের ফলশ্রুতিতে জন্মলাভকারী শিশু সংক্রান্ত বিধান

[১৩। (১) অন্য কোন আইনে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ধর্ষণের কারণে কোন সন্তান জন্মলাভ করিলে-

(ক) উক্ত সন্তানকে তাহার মাতা কিংবা তাহার মাতৃকুলীয় আত্মীয় স্বজনের তত্ত্বাবধানে রাখা যাইবে;

(খ) উক্ত সন্তান তাহার পিতা বা মাতা, কিংবা উভয়ের পরিচয়ে পরিচিত হইবার অধিকারী হইবে;

(গ) উক্ত সন্তানের ভরণপোষণের ব্যয় রাষ্ট্র বহণ করিবে;

(ঘ) উক্ত সন্তানের ভরণপোষণের ব্যয় তাহার বয়স একুশ বৎসর পূর্তি না হওয়া পর্যন্ত প্রদেয় হইবে, তবে একুশ বৎসরের অধিক বয়স্ক কন্যা সন্তানের ক্ষেত্রে তাহার বিবাহ না হওয়া পর্যন্ত এবং পঙ্গু সন্তানের ক্ষেত্রে তিনি স্বীয় ভরণপোষণের যোগ্যতা অর্জন না করা পর্যন্ত প্রদেয় হইবে।

(২) সরকার বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত সন্তানের ভরণপোষণ বাবদ প্রদেয় অর্থের পরিমাণ নির্ধারণ করিবে।

(৩) এই ধারার অধীন কোন সন্তানকে ভরণপোষণের জন্য প্রদেয় অর্থ সরকার ধর্ষকের নিকট হইতে আদায় করিতে পারিবে এবং ধর্ষকের বিদ্যমান সম্পদ হইতে উক্ত অর্থ আদায় করা সম্ভব না হইলে, ভবিষ্যতে তিনি যে সম্পদের মালিক বা অধিকারী হইবেন সেই সম্পদ হইতে উহা আদায়যোগ্য হইবে।][৯]

সূত্র: লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার. http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-details-835.html

ধর্ষন সম্পর্কিত আইন ও আইনের বিশ্লেষন

বাংলাদেশ দন্ডবিধির ৩৭৬ নং ধারা অনুযায়ী, যদি কোন ব্যক্তি নারীকে ধর্ষন করে তবে তিনি যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডিত হবেন কিংবা যেকোন বর্ণনার কারাদন্ডে-(যার মেয়াদ দশ বছর পর্যুন্ত হবে) দণ্ডিত হবেন একই সাথে অর্থদন্ডেও দন্ডিত হবেন। তবে ধর্ষিতা নারীটি যদি ঐ ব্যক্তির স্ত্রী হন এবং তার বয়স বার(১২) বছরের কম না হয় তবে সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদন্ডে –(যার মেয়াদ দুই বছর পর্যুন্ত হবে) দন্ডিত হবেন বা অর্থদন্ডে বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হবেন।

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ এর অধিকতর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ৮ নং আইন) এর অধিকতর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল :-

[৯] ধারা ১৩ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ৩০ নং আইন) এর ৭ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত

সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন

১। (১) এই আইন নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) আইন, ২০২০ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২০০০ সনের ৮ নং আইনের ধারা ৭ এর সংশোধন

২। নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ৮ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ৭ এর "ধারা ৫-এ উল্লিখিত" শব্দগুলি, সংখ্যা এবং চিহ্নের পরিবর্তে "মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৩ নং আইন) এর ধারা ৩ ও ৬ এ উল্লিখিত" শব্দগুলি, কমা, সংখ্যাগুলি এবং বন্ধনী প্রতিস্থাপিত হইবে।

২০০০ সনের ৮ নং আইনের ধারা ৯ এর সংশোধন

৩। উক্ত আইনের ধারা ৯ এর-

(ক) উপ-ধারা (১) এর "যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডে" শব্দগুলির পরিবর্তে "মৃত্যুদণ্ডে বা যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডে শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) উপ-ধারা (২) এর দ্বিতীয় লাইনে উল্লিখিত "ধর্ষিতা" শব্দের পরিবর্তে "ধর্ষণের শিকার" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(গ) উপ-ধারা (৪) এর দফা (ক) এর "যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডে" শব্দগুলির পরিবর্তে "মৃত্যুদণ্ডে বা যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডে" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং

(ঘ) উপ-ধারা-৫ এর "প্রথম ও তৃতীয় লাইনে দুইবার, উল্লিখিত "ধর্ষিতা" শব্দটির পরিবর্তে উভয় স্থানে "ধর্ষণের শিকার" শব্দগুলি এবং অতঃপর উল্লিখিত "দায়ী" শব্দের পরিবর্তে "দায়িত্বপ্রাপ্ত" শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে।

২০০০ সনের ৮ নং আইনের ধারা ১৯ এর সংশোধন

৪। উক্ত আইনের ধারা ১৯ এর উপ-ধারা (১) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (১) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:-

"(১) এই আইনের অধীন সকল অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণীয় হইবে, এবং ধারা ১১ এর দফা (গ) এ উল্লিখিত অপরাধ আপসযোগ্য হইবে।" ।

২০০০ সনের ৮ নং আইনের ধারা ২০ এর সংশোধন।-

৫। উক্ত আইনের ধারা ২০ এর-

(ক) উপ-ধারা (১) এর "ধারা ২৫ এর" শব্দগুলি এবং সংখ্যার পরিবর্তে "ধারা ২৬ এর" শব্দগুলি এবং সংখ্যা প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং

(খ) উপ-ধারা (৭) এর "Children Act, 1974 (XXXIX of 1974)" শব্দগুলি, কমা, সংখ্যাগুলি এবং বন্ধনীর পরিবর্তে "শিশু আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ২৪ নং আইন)" শব্দগুলি, কমা, সংখ্যাগুলি এবং বন্ধনী প্রতিস্থাপিত হইবে।

২০০০ সনের ৮ নং আইনের ধারা ৩২ এর সংশোধন

৬। উক্ত আইনের ধারা ৩২ এর-

(ক) উপান্তটীকার "অপরাধের শিকার ব্যক্তির মেডিক্যাল পরীক্ষা" শব্দগুলির পরিবর্তে "অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তি এবং অপরাধের শিকার ব্যক্তির মেডিক্যাল পরীক্ষা" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং

(খ) উপ-ধারা (১) এর "অপরাধের শিকার ব্যক্তির" শব্দগুলির পরিবর্তে "অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তি এবং অপরাধের শিকার ব্যক্তির সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করিয়া" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

২০০০ সনের ৮ নং আইনে নূতন ধারা ৩২ ক এর সন্নিবেশ

৭। উক্ত আইনের ধারা ৩২ এর পর নিম্নরূপ ধারা ৩২ক সন্নিবেশিত হইবে, যথা :-

"৩২ক। অভিযুক্ত ব্যক্তি এবং অপরাধের শিকার ব্যক্তির ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিক এসিড (ডিএনএ) পরীক্ষা।- এই আইনের অধীন সংঘটিত অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তি এবং অপরাধের শিকার ব্যক্তির ধারা ৩২ এর অধীন মেডিক্যাল পরীক্ষা ছাড়াও, উক্ত ব্যক্তির সম্মতি থাকুক বা না থাকুক, ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিক এসিড (ডিএনএ) আইন, ২০১৪ (২০১৪ সনের ১০ নং আইন) এর বিধান অনুযায়ী ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিক এসিড (ডিএনএ) পরীক্ষা করিতে হইবে।"।

রহিতকরণ ও হেফাজত

৮। (১) নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২০ (২০২০ সনের ৪ নং অধ্যাদেশ) এতদ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উক্তরূপ রহিতকরণ সত্ত্বেও উক্ত অধ্যাদেশের অধীন-

(ক) কৃত কোনো কাজ বা গৃহীত কোনো ব্যবস্থা এই আইনের অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে, এবং

(খ) দায়েরকৃত কোনো মামলা বা গৃহীত কোনো কার্যধারা অনিষ্পন্ন থাকিলে উহা এইরূপে নিষ্পন্ন হইবে যেন উহা এই আইনের অধীন দায়েরকৃত বা গৃহীত হইয়াছে।

(সূত্র: লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার. http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-details-1351.html)

ব্যভিচারের অপবাদ

নারী নির্যাতনের মিথ্যা মামলা দায়ের

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ৮ নং আইন) [১৪ ফেব্রুয়ারী, ২০০০]

মিথ্যা মামলা, অভিযোগ দায়ের ইত্যাদির শাস্তি

১৭। (১) যদি কোন ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তির ক্ষতিসাধনের অভিপ্রায়ে উক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে এই আইনের অন্য কোন ধারার অধীন মামলা বা অভিযোগ করার জন্য ন্যায্য বা আইনানুগ কারণ নাই জানিয়াও মামলা বা অভিযোগ দায়ের করেন বা করান তাহা হইলে মামলা বা অভিযোগ দায়েরকারী ব্যক্তি এবং যিনি অভিযোগ দায়ের করাইয়াছেন উক্ত ব্যক্তি অনধিক সাত বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবেন।

(২) কোন ব্যক্তির লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে ট্রাইব্যুনাল উপ-ধারা (১) এর অধীন সংঘটিত অপরাধের অভিযোগ গ্রহণ ও মামলার বিচার করিতে পারিবে।

সূত্র: লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার. http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-details-835.html

এছাড়া দণ্ডবিধির ধারা ৪৯৯-৫০২ অনুযায়ী মানহানি মামলা করার সুযোগ রয়েছে-

ধারা ৪৯৯: কোন ব্যক্তি যদি অন্য কোন ব্যক্তির খ্যাতি বা সুনাম নষ্ট করার উদ্দেশ্যে বা তার খ্যাতি বা সুনাম নষ্ট হবে বলে জানা সত্ত্বেও বা তার বিশ্বাস করার কারণ থাকা সত্ত্বেও কথিত বা পঠিত হওয়ার জন্য অভিপ্রেত কথা বা চিহ্ন কর্তৃক বা দৃশ্যমান কল্পমূর্তির সাহায্যে সে ব্যক্তি সম্পর্কিত কোন নিন্দাবাদ প্রণয়ন বা প্রকাশ করে, তবে নিম্নে নির্দেশিত ব্যতিক্রমসমূহ ছাড়াই অন্যান্য ক্ষেত্রে, সে ব্যক্তি উক্ত অন্য ব্যক্তির মানহানি করে বলে পরিগণিত হয়।

ধারা ৫০০: কোন ব্যক্তি যদি অন্য কোন ব্যক্তির মানহানি করে, তবে উক্ত ব্যক্তি দুই বৎসর পর্যন্ত যেকোন মেয়াদের বিনাশ্রম কারাদণ্ডে অথবা অর্থ দণ্ডে অথবা উভয়বিধ দণ্ডেই দণ্ডিত হবে।

ধারা ৫০১: কোন ব্যক্তি যদি এমন কোন বস্তু মুদ্রণ করে বা খোদাই করে যে বস্তু অন্য কোন ব্যক্তির মানহানিকর বলে সে জানে বা তার বিশ্বাস করার সঙ্গত কারণ রয়েছে, তবে উক্ত ব্যক্তি দুই বৎসর পর্যন্ত যেকোন মেয়াদের বিনাশ্রম কারাদণ্ডে, অথবা অর্থ দণ্ডে, অথবা উভয়বিধ দণ্ডেই দণ্ডিত হবে।

ধারা ৫০২: যদি কোন ব্যক্তি মুদ্রিত বা খোদাই করা এমন মানহানিকর বিষয় সম্বলিত কোন দ্রব্য বিক্রয় করে বা বিক্রয়ার্থে উপস্থাপন করে যে মালিকের বস্তুটি সে দ্রব্যে রয়েছে বলে সে জানে, তবে সে ব্যক্তি দুই বৎসর পর্যন্ত যেকোন মেয়াদের বিনাশ্রম কারাদণ্ডে, অথবা অর্থ দণ্ডে, অথবা উভয়বিধ দণ্ডেই দণ্ডিত হবে।

(সূত্র: লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার. http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-details-11.html)

রাষ্ট্রদ্রোহিতা

দণ্ডবিধির **১২১-১৩০** ধারায় রাষ্ট্রদ্রোহিতা সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে।

১২১ ধারা: কোন ব্যক্তি যদি বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে অথবা অনুরূপ যুদ্ধের উদ্যোগ গ্রহণ করে অথবা অনুরূপ যুদ্ধে সহায়তা করে, তবে সে ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ডে অথবা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে এবং তদুপরি অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত করা হবে।

ক। কোন ব্যক্তি যদি বাংলাদেশের মধ্যে বা বাইরে থেকে-১২১ ধারামতে দণ্ডনীয় অপরাধসমূহের মধ্যে যে কোন একটি অপরাধ সংঘটনের জন্য অথবা বাংলাদেশের কিংবা উহার কোন অংশ বিশেষের সার্বভৌমত্ব হতে সরকারকে বঞ্চিত করার জন্য অথবা অপরাধমূলক বল প্রয়োগ কর্তৃক কিংবা অপরাধমূলক বল প্রয়োগের হুমকি কর্তৃক সরকারকে সন্ত্রস্ত করার জন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়, তবে সে ব্যক্তি যাবজ্জীবন অথবা কোন হোসতর মেয়াদের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবে অথবা দশ বৎসর পর্যন্ত যে কোন মেয়াদের সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবে এবং অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত হবে।

১২২ ধারা: বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করার জন্য অথবা যুদ্ধারম্ভ করার উদ্দেশ্যে প্রস্তুত হওয়ার জন্য কোন ব্যক্তি যদি ব্যক্তিবল, অস্ত্রশস্ত্র অথবা গোলাবারুদ সংগ্রহ করে অথবা অপর কোনভাবে যুদ্ধারম্ভের প্রস্তুতি গ্রহণ করে, তবে সে ব্যক্তি অনধিক দশ বৎসর পর্যন্ত যে কোন মেয়াদের সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবে এবং অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত হবে।

১২৩ ধারা: কোন ব্যক্তি যদি কোন কাজ কর্তৃক কোন কাজ করা হতে বেআইনীভাবে বিরত থাকার মাধ্যমে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধারম্ভের ষড়যন্ত্রের অস্তিত্ব গোপন করে এবং যুদ্ধারম্ভের সুবিধা বিধানের উদ্দেশ্যেই অথবা অনুরূপ গোপন করার ফলে যুদ্ধারম্ভের সুবিধা হবে জেনেই তা করে, তবে সে ব্যক্তি দশ বৎসর পর্যন্ত যে কোন মেয়াদের সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবে, এবং তাকে অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত করা হবে।

ক। (১) কোন ব্যক্তি যদি বাংলাদেশের মধ্যে বা বাইরে থেকে বাংলাদেশের নিরাপত্তার পক্ষে ক্ষতিকর হতে পারে অথবা বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমার অভ্যন্তরীণ সকল এলাকার অথবা কোন এলাকা বিশেষের দিক হতে বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের বিপজ্জনক হতে পারে এমন পদ্ধতিতে কোন ব্যক্তিকে অথবা জনসাধারণের সমগ্র অংশ বা কোন অংশবিশেষকে প্রভাবিত করার উদ্দেশ্যে অথবা তার কাজ কর্তৃক অনুরূপ কোন ব্যক্তি অথবা জনসাধারণের সমগ্র অংশ বা কোন অংশবিশেষ প্রভাবিত হবে জেনে, উচ্চারিত বা লিখিত কথা কর্তৃক কিংবা চিহ্ন বা দৃশ্য প্রতীক কর্তৃক ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ রাষ্ট্রসমূহের এলাকার সাথে একত্রীকরণের মাধ্যমে কিংবা অপর কোনভাবে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমার অভ্যন্তরবর্তী সকল এলাকার বা কোন এলাকাবিশেষের দিক হতে বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব খর্ব করার বা কোন বিলোপের সমর্থন বা সে মর্মে প্রচারণা করে, তবে সে ব্যক্তিকে দশ বৎসর পর্যন্ত যে কোন মেয়াদের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, এবং তাকে অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত করা হবে।

(২) প্রাসঙ্গিক সময়ে বলবৎ অপর কোন আইনে যা কিছুই বিধান করা হয়ে থাকুক না কেন এই ধারামতে কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে তার তদন্ত বা বিচারকালে যে আদালতে তাকে সোপর্দ করা হবে সে আদালত আইনসম্মত ভাবেই যে পর্যন্ত না বিষয়টি চূড়ান্তরূপে নিস্পত্তি হয় সে পর্যন্ত উক্ত ব্যক্তির গতিবিধি, অন্যান্য ব্যক্তির সাথে তার মেলামেশা বা সহচার্য বা যোগাযোগ এবং খবর সরবরাহ ও মতামত প্রচারণা বিষয়ক উক্ত ব্যক্তির কার্যকলাপ সম্পর্কে যে কোন আদেশ, যা আবশ্যকীয় বলে পরিগণিত হয়-প্রদান করতে পারবেন।

(৩) উপধারায় (২)-এ উল্লেখিত আদালতের সাথে সম্পর্কের দিক হতে যে আদালত একটি আপীল অথবা রিভিশনের আদালত সে আদালতও উক্ত উপধারা বলে কোন আদেশ প্রদান করতে পারেন।

১২৪ ধারা: কোন ব্যক্তি যদি বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি গভর্নর প্রমুখ ব্যক্তিকে আইনানুগ ক্ষমতা সমূহের যে কোন একটি যে কোন পদ্ধতিতে প্রয়োগ করতে অথবা প্রয়োগ করা হতে বিরত থাকতে প্ররোচিত বা বাধ্য করার উদ্দেশ্যে অনুরূপ রাষ্ট্রপতি বা সরকারকে আক্রমণ করে,

অথবা বেআইনীভাবে নিয়ন্ত্রণ করে, অথবা বেআইনীভাবে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে অথবা অপরাধমূলক বলপ্রয়োগ করে অথবা অপরাধমূলক বলপ্রয়োগের ভীতি প্রদর্শন করে ভীতবিহ্বল করে, অথবা ভীতবিহ্বল করার চেষ্টা করে, তবে সে ব্যক্তি সাত বৎসর পর্যন্ত যে কোন মেয়াদের সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবে, এবং তাকে অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত করা হবে।

ক। কোন ব্যক্তি যদি উচ্চারিত বা লিখিত কথা বা উক্তি দ্বারা, অথবা চিহ্নাদি দ্বারা, অথবা দৃশ্যমান প্রতীকের সহায়তায় অথবা অপর কোনভাবে বাংলাদেশে আইনানুসারে প্রতিষ্ঠিত সরকারের প্রতি ঘৃণা বা বিদ্বেষ সৃষ্টি করে বা করার চেষ্টা করে অথবা বৈরিতা উদ্রেক করে বা করার চেষ্টা করে, তবে সে ব্যক্তি যাবজ্জীবন অথবা যে কোন কম মেয়াদের কারাদণ্ডে যার সাথে অর্থদণ্ড যোগ করা যাবে অথবা তিন বৎসর পর্যন্ত যে কোন মেয়াদের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবে যার সাথে অর্থদণ্ড যোগ করা যাবে, অথবা তাকে অর্থ দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

ব্যাখ্যা (Explanation) ১:- 'বৈরিতা' বলতে রাজানুগত্যহীনতা এবং সর্বপ্রকার শত্রুতার ভাব বুঝায়।

ব্যাখ্যা (Explanation) ২:- ঘৃণা, বিদ্বেষ বা বৈরিতা সৃষ্টি করা বা সৃষ্টি করার চেষ্টা করা ছাড়াই আইনসম্মত উপায়ে পরিবর্তন বা সংশোধনের উদ্দেশ্যে সরকারের গৃহীত ব্যবস্থাসমূহের প্রতি অসমর্থন প্রকাশ এই ধারামতে অপরাধ বলে পরিগণিত হবে না।

ব্যাখ্যা (Explanation) ৩:- ঘৃণা, বিদ্বেষ বা বৈরিতা সৃষ্টি করার বা সৃষ্টি করার চেষ্টা করা ছাড়াই সরকারের কোন শাসন পরিচালন বিষয়ক বা অন্যরূপ কার্য সম্পর্কে অসমর্থনমূলক অভিমত বা মন্তব্য প্রকাশ এই ধারামতে অপরাধ বলে পরিগণিত হবে না।

১২৫ ধারা: কোন ব্যক্তি যদি বাংলাদেশের সাথে মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ অথবা শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক বিদ্যমান কোন এশীয় শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরম্ভ করে অথবা অনুরূপ যুদ্ধ আরম্ভ । করার চেষ্টা করে অথবা অনুরূপ যুদ্ধারম্ভের সহায়তা করে, তবে সে ব্যক্তিকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা যাবে এবং এই দণ্ডের সাথে অর্থদণ্ডও যোগ করা যাবে, অথবা সে ব্যক্তিকে সাত বৎসর পর্যন্ত যে কোন মেয়াদের সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা যাবে এবং এই দণ্ডের সাথে অর্থদণ্ডও যোগ করা যাবে, অথবা সে ব্যক্তিকে অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত করা যাবে।

১২৬ ধারা: কোন ব্যক্তি যদি বাংলাদেশের সাথে মৈত্রবন্ধনে আবদ্ধ বা শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক বিদ্যমান কোন শক্তির রাষ্ট্রীয় এলাকার উপর হামলা বা লুটতরাজ সংঘটন করে অথবা হামলা বা লুটতরাজ সংঘটনের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে, তবে সে ব্যক্তিকে সাত বৎসর পর্যন্ত যে কোন মেয়াদের সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবে এবং তৎসহ তাকে অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত করা যাবে ও অনুরূপ হামলা বা লুটতরাজে ব্যবহৃত বা ব্যবহার করার জন্য উদ্দিষ্ট যে কোন সম্পত্তি অথবা অনুরূপ হামলা বা লুটতরাজ হতে লব্ধ যে কোন সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা যাবে।

১২৭ ধারা: ১২৫ ও ১২৬ ধারা দুইটিতে উল্লেখিত অপরাধসমূহের যে কোনটি সংঘটনক্রমে লব্ধ সম্পত্তি বলে জানা সত্ত্বেও কোন ব্যক্তি যদি অনুরূপ কোন সম্পত্তি গ্রহণ করে, তবে সে ব্যক্তি সাত বৎসর পর্যন্ত যে কোন মেয়াদের

সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবে এবং তাকে অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত করা যাবে ও অনুরূপ গৃহীত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হবে।

১২৮ ধারা: কোন ব্যক্তি যদি একজন সরকারী কর্মচারী হওয়া সত্ত্বেও এবং রাজবন্দি বা যুদ্ধবন্দির হাজতের দায়িত্ব সম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও যে স্থানে অনুরূপ বন্দি আটক আছে ইচ্ছাকৃতভাবে সে স্থান হতে তাকে পলায়ন করতে দেয়, তবে অনুরূপ ব্যক্তি যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবে অথবা দশ বৎসর পর্যন্ত যে কোন মেয়াদের সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবে এবং তাকে অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত করা যাবে।

১২৯ ধারা: কোন ব্যক্তি যদি একজন সরকারী কর্মচারী হওয়া সত্ত্বেও এবং রাজবন্দি বা যুদ্ধবন্দির হাজতের দায়িত্বসম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও যে স্থানে অনুরূপ বন্দি আটক আছে, ইচ্ছাকৃতভাবে সে স্থান হতে তাকে পলায়ন করতে দেয় তবে অনুরূপ ব্যক্তি তিন বৎসর পর্যন্ত যে কোন মেয়াদের বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবে এবং তাকে অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত করা হবে।

১৩০ ধারা: কোন ব্যক্তি যদি জ্ঞাতসারে কোন রাজবন্দিকে বা যুদ্ধবন্দিকে আইনসম্মত হাজত হতে পলায়ন করতে সহায়তা করে বা আনুকূল্য দান করে অথবা অনুরূপ কোন বন্দিকে উদ্ধার করে বা উদ্ধার করার চেষ্টা করে অথবা অনুরূপ যে বন্দি আইনসম্মত হাজত হতে পলায়ন করেছে তাকে আশ্রয়দান করে বা লুকিয়ে রাখে অথবা অনুরূপ বন্দিকে পুনরায় গ্রেফতার করার কাজে প্রতিরোধ সৃষ্টি করে বা প্রতিরোধ সৃষ্টি করার চেষ্টা করে, তবে সে ব্যক্তিকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা যাবে অথবা দশ বৎসর পর্যন্ত যে কোন মেয়াদের সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা যাবে এবং তাকে অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত করা যাবে।

(সূত্র: লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার. http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-details-11.html)

ধর্ম অবমাননা

দণ্ডবিধির ২৯৫-২৯৮ ধারায় ধর্ম অবমাননার শাস্তি উল্লেখ করা হয়েছে।

২৯৫ ধারা: কোন ব্যক্তি যদি কোন উপাসনা স্থান বিনষ্ট করে, ক্ষতিগ্রস্ত করে বা অপবিত্র করে অথবা জনসাধারণের কোন শ্রেণী দ্বারা পবিত্র বলে গণ্য কোন বস্তু বিনষ্ট করে, ক্ষতিগ্রস্ত করে বা অপবিত্র করে, এবং জনসাধারণের কোন শ্রেণীর ধর্মকে অপদস্থ করার মানসেই তা করে অথবা অনুরূপ বিনষ্টকরণ, ক্ষতিসাধন বা অবপবিত্রকরণকে একশ্রেণীর জনসাধারণ তাদের ধর্মের প্রতি অবমাননা বলে বিবেচনা করবে জানা সত্ত্বেও তা করে, তবে সে ব্যক্তি দুই বৎসর পর্যন্ত যেকোন মেয়াদের সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ডে, অথবা অর্থ দণ্ডে, অথবা উভয়বিধ দণ্ডেই দণ্ডিত হবে।

ক। কোন ব্যক্তি যদি বাংলাদেশের নাগরিকবৃন্দের কোন শ্রেণীর ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করার উদ্দেশ্যে ইচ্ছাকৃত ও হিংসাত্মকভাবে লিখিত বা উচ্চারিত কথা কর্তৃক বা দৃশ্যমান কোন বস্তু কর্তৃক সে শ্রেণীর ধর্মকে বা ধর্মীয় বিশ্বাসকে অপমানিত করে বা অপমানিত করার চেষ্টা করে, তবে সে ব্যক্তি দুই বৎসর পর্যন্ত যেকোন মেয়াদের সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ডে অথবা অর্থ দণ্ডে অথবা উভয়বিধ দণ্ডেই দণ্ডিত হবে।

২৯৬ ধারা: কোন ব্যক্তি যদি আইনসম্মতভাবে ধর্মীয় কাজ অনুষ্ঠানরত বা ধর্মীয় উৎসব পালনরত কোন সমাবেশে ইচ্ছাকৃতভাবে গোলযোগ সৃষ্টি করে, তবে সে ব্যক্তি এক বৎসর পর্যন্ত যেকোন মেয়াদের সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ডে, অথবা অর্থ দণ্ডে, অথবা উভয়বিধ দণ্ডেই দণ্ডিত হবে।

২৯৭ ধারা: কোন ব্যক্তি যদি অন্য কোন ব্যক্তির অনুভূতিকে আহত করার উদ্দেশ্যে, কিংবা অন্য কোন ব্যক্তির ধর্মের অবমাননা করার উদ্দেশ্যে, অথবা অন্য কোন ব্যক্তির অনুভূতি আহত হতে পারে বা অন্য কোন ব্যক্তির ধর্মের অবমাননা হতে পারে জানা সত্ত্বেও,কোন উপাসনাস্থলে বা সমাধিস্থলে বা অন্তেষ্টিক্রিয়া সম্পাদনের জন্য আলাদাভাবে রক্ষিত স্থান বা মৃত ব্যক্তির দেহাবশেষ রাখার জন্য আলাদাভাবে রক্ষিত স্থানে অনধিকার প্রবেশ করে, তবে সে ব্যক্তি এক বৎসর পর্যন্ত যেকোন মেয়াদের সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ডে, অথবা অর্থ দণ্ডে অথবা উভয়বিধ দণ্ডেই দণ্ডিত হবে।

২৯৮ ধারা: কোন ব্যক্তি যদি ইচ্ছাকৃতভাবে কোন ব্যক্তির ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানার উদ্দেশ্যমূলক অভিসন্ধিক্রমে সে ব্যক্তির শ্রুতিগোচর হয় এমনভাবে কোন কথা বলে বা শব্দ করে অথবা সে ব্যক্তির দৃষ্টিগোচর হয় এমনভাবে কোন অঙ্গভঙ্গি করে অথবা সে ব্যক্তির দৃষ্টিগোচর হয় এমনভাবে কোন বস্তু স্থাপন করে, তবে সে ব্যক্তি এক বৎসর পর্যন্ত যেকোন মেয়াদের সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ডে অথবা অর্থ দণ্ডে, অথবা উভয়বিধ দণ্ডেই দণ্ডিত হবে।

(সূত্র: লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার. http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-details-11.html)

চুরি

দণ্ডবিধির ৩৭৮-৩৮২ ধারায় চুরির শাস্তি উল্লেখ করা হয়েছে।

৩৭৮ ধারা: কোন ব্যক্তি যদি কারো দখল হতে তার সম্মতি ব্যতীত কোন অস্থাবর সম্পত্তি অসাধুভাবে গ্রহণ করার উদ্দেশ্য নিয়ে উক্ত সম্পত্তি অনুরূপভাবে গ্রহণের জন্য স্থানান্তর করে, তবে উক্ত ব্যক্তি চুরি করেছে বলে গণ্য হবে।

৩৭৯ ধারা: কোন ব্যক্তি যদি চুরি করে, তবে সে ব্যক্তি তিন বৎসর পর্যন্ত যেকোন মেয়াদের সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ডে, অথবা অর্থ দণ্ডে অথবা উভয়বিধ দণ্ডেই দণ্ডিত হবে।

৩৮০ ধারা: কোন ব্যক্তি যদি এমন কোন গৃহ, তাবু জলযানে চুরি করে যে গৃহ তাবু বা জলযান মানুষের বাসস্থান হিসেবে ব্যবহৃত হয় অথবা সম্পত্তি হেফাজতের জন্য ব্যবহৃত হয়, তবে সে ব্যক্তি সাত বৎসর পর্যন্ত যে কোন মেয়াদের সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবে এবং তদুপরি অর্থ দণ্ডেও দণ্ডিত হবে।

৩৮১ ধারা: কোন ব্যক্তি যদি কর্মচারী বা ভৃত্য হওয়া সত্ত্বেও অথবা কর্মচারী বা ভৃত্যের কাজে নিয়োজিত হওয়া সত্ত্বেও তার প্রভুর বা মালিকের অধিকারভুক্ত সম্পত্তি চুরি করে, তবে সে ব্যক্তি সাত বৎসর পর্যন্ত যে কোন মেয়াদের সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবে এবং তদুপরি অর্থ দণ্ডেও দণ্ডিত হবে।

৩৮২ ধারা: কোন ব্যক্তি যদি চুরি করার পূর্বে চুরি করার জন্য, অথবা চুরি করে পলায়নের জন্য অথবা অনুরূপ চুরি কর্তৃক লব্ধ সম্পত্তি রক্ষণের জন্য মৃত্যু ঘটানোর, অথবা আঘাত করার, অথবা আটকানোর অথবা মৃত্যুর ভয় সৃষ্টি

করার, অথবা আঘাত করার, ভয় সৃষ্টি করার অথবা আটকানোর প্রস্তুতি গ্রহণান্তে চুরি করে, তবে উক্ত ব্যক্তি দশ বৎসর পর্যন্ত যে কোন মেয়াদের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবে এবং তদুপরি অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত হবে।

(সূত্র: লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার. http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-details-11.html)

ডাকাতি

দণ্ডবিধির ৩৯০-৪০২ ধারায় ডাকাতির শাস্তি উল্লেখ করা হয়েছে।

৩৯০ ধারা: প্রত্যেক দস্যুতায় হয় চুরি, না হয় বলপূর্বক সম্পত্তি আদায়ের অপরাধ সংঘটিত হয় ।

যেক্ষেত্রে চুরি দস্যুতা বলে পরিগণিত হবে (When theft is robbery):-

চুরি করার উদ্দেশ্যে, অথবা চুরি করতে, কিংবা চুরিতে লব্ধ সম্পত্তি বহন বা বহনের উদ্যোগ কালে, অপরাধকারী তদুদ্দেশ্যে ইচ্ছাপূর্বক কোন ব্যক্তির মৃত্যু ঘটায় বা তাকে আঘাতদান করে তাকে অন্যায় ভাবে আটক করে বা করার উদ্যোগ করে, বা তাকে তাৎক্ষণিক মৃত্যু বা তাৎক্ষণিক আঘাত বা তাৎক্ষণিক অবৈধ আটকের ভীতি প্রদর্শন করে বা করার উদ্যোগ করে, তা হলে উক্ত চুরি হচ্ছে 'দস্যুতা' ।

বলপূর্বক সম্পত্তি আদায় যেক্ষেত্রে দস্যুতা বলে পরিগণিত হবে (When extortion is robbery):-

বলপূর্বক সম্পত্তি আদায়ের সময় অপরাধী- যে ব্যক্তিকে ভয়ে বিহবল করা হয়েছে, সে ব্যক্তির বা অন্য কোন ব্যক্তিকে আশু মৃত্যুর, আশু আঘাতের বা আশু অন্যায় নিয়ন্ত্রণের ভয়ে অভিভূত করে বলপূর্বক সম্পত্তি আদায় করলে, এবং এইভাবে যে ব্যক্তিকে ভয়ে অভিভূত করা হয়েছে, সে ব্যক্তিকে তখন বলপূর্বক আদায়কৃত বস্তুটি অর্পণে বাধ্য করলে, বলপূর্বক সম্পত্তি আদায় 'দস্যুতা' বলে পরিগণিত হবে।

৩৯১ ধারা: যদি পাচ বা ততোধিক ব্যক্তি মিলিতভাবে দস্যুতা সংঘটন করে বা দস্যুতা সংঘটনের চেষ্টা করে, অথবা যদি কোন ক্ষেত্রে মিলিতভাবে দস্যুতা সংঘটনের চেষ্টা করে, অথবা যদি কোন ক্ষেত্রে মিলিতভাবে দস্যুতা সংঘটন প্রচেষ্টারত ব্যক্তির ও অনুরূপ কার্যে বা প্রচেষ্টায় সহায়তাকারী ব্যক্তির মোট সংখ্যা পাচ বা ততোধিক হয়, তবে অনুরূপ কাজ সংঘটনকারী বা প্রচেষ্টাকারী বা সহায়তাকারী প্রত্যেক ব্যক্তি ডাকাতি করছে বলে পরিগণিত হবে।

৩৯২ ধারা: কোন ব্যক্তি যদি দস্যুতা সংঘটন করে তবে সে ব্যক্তি দশ বৎসর পর্যন্ত যেকোন মেয়াদের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবে, এবং তদুপরি অর্থ দণ্ডেও দণ্ডিত হবে। এবং যদি সূর্যাস্ত ও সূর্যোদয়ের মধ্যবর্তী সময় রাজপথে দস্যুতা অনুষ্ঠিত হয়, তবে কারাদণ্ডের মেয়াদ চৌদ্দ বৎসর পর্যন্ত হতে পারে।

৩৯৩ ধারা: কোন ব্যক্তি যদি দস্যুতা সংঘটনের উদ্যোগ করে, তবে উক্ত ব্যক্তি সাত বৎসর পর্যন্ত যেকোন মেয়াদের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবে, এবং তদুপরি অর্থ দণ্ডেও দণ্ডিত হবে।

৩৯৪ ধারা: কোন ব্যক্তি যদি দস্যুতা সংঘটনকালে বা সংঘটনের উদ্যোগকালে স্বেচ্ছাকৃতভাবে আঘাত দান করে, তবে উক্ত ব্যক্তি এবং অনুরূপ দস্যুতা সংঘটনের সাথে বা অনুরূপ দস্যুতা সংঘটনের উদ্যোগের সাথে মিলিতভাবে সংশ্লিষ্ট অপর যে কোন ব্যক্তি যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে অথবা দশ বৎসর পর্যন্ত যেকোন মেয়াদের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবে এবং তাকে বা তাদিগকে অর্থ দণ্ডেও দণ্ডিত করা হবে।

৩৯৫ ধারা: কোন ব্যক্তি যদি ডাকাতি করে, তবে উক্ত ব্যক্তি যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে অথবা দশ বৎসর পর্যন্ত যেকোন মেয়াদের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবে, এবং তদুপরি অর্থ দণ্ডেও দণ্ডনীয় হবে।

৩৯৬ ধারা: যদি মিলিতভাবে ডাকাতি অনুষ্ঠানকালে পাঁচ বা ততোধিক ব্যক্তি, যে কোন একজন অনুরূপ ডাকাতি অনুষ্ঠানকালে খুন করে, তবে তাদের প্রত্যেকে মৃত্যুদণ্ডে, অথবা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে, অথবা দশ বৎসর পর্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবে এবং তদুপরি অর্থ দণ্ডেও দণ্ডনীয় হবে।

৩৯৭ ধারা: যদি দস্যুতা বা ডাকাতি সংঘটনকালে অপরাধকারী কোন মারাত্মক অস্ত্র ব্যবহার করে, অথবা কাউকে গুরুতর আঘাত করার উদ্যোগ করে, তবে যে কারাদণ্ডে অনুরূপ অপরাধকারীকে দণ্ডিত করা হবে তার মেয়াদ সাত বৎসরের কম হবে না।

৩৯৮ ধারা: যদি দস্যুতা বা ডাকাতি অনুষ্ঠানের উদ্যোগকালে অপরাধকারী কোন মারাত্মক অস্ত্রে সজ্জিত থাকে, তবে অনুরূপ অপরাধকারী যে দণ্ডে দণ্ডিত হবে, তার মেয়াদ সাত বৎসরের কম হবে না।

৩৯৯ ধারা: কোন ব্যক্তি যদি ডাকাতি অনুষ্ঠানের জন্য কোনরূপ প্রস্তুতি গ্রহণ করে, তবে উক্ত ব্যক্তি দশ বৎসর পর্যন্ত যে কোন মেয়াদের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবে এবং তদুপরি অর্থ দণ্ডেও দণ্ডিত হবে।

৪০০ ধারা: কোন ব্যক্তি যদি এই আইন পাসের পরবর্তী যে কোন সময়ে কোন ডাকাতি সংঘটনের উদ্দেশ্যে যারা পরস্পর সংঘবদ্ধ আছে, এইরূপ কোন দলে থাকে, তবে উক্ত ব্যক্তি যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে, অথবা দশ বৎসর পর্যন্ত যেকোন মেয়াদের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবে এবং তদুপরি অর্থ দণ্ডেও দণ্ডিত হবে।

৪০১ ধারা: কোন ব্যক্তি যদি এই আইন পাস হওয়ার পরবর্তী কোন সময়ে এমন কোন ভ্রাম্যমান বা অপর কোনরূপ দলে থাকে, যে দলের ব্যক্তিরা বরাবর চুরি বা দস্যুতা অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে পরস্পর সংঘবদ্ধ এবং যদি উহা ঠগদের বা ডাকাতদের দল না হয়, তবে উক্ত ব্যক্তি সাত বৎসর পর্যন্ত যেকোন মেয়াদের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবে এবং তদুপরি অর্থ দণ্ডেও দণ্ডিত হবে।

৪০২ ধারা: কোন ব্যক্তি যদি এই আইন পাস হওয়ার পরবর্তী কোনসময়ে ডাকাতি সংঘটনের উদ্দেশ্যে সমবেত পাঁচ বা ততোধিক ব্যক্তির অন্যতম হয়, তবে উক্ত ব্যক্তি সাত বৎসর পর্যন্ত যে কোন মেয়াদের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবে এবং তদুপরি অর্থ দণ্ডেও দণ্ডিত হবে।

(সূত্র: লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার. http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-details-11.html)

হত্যা

দণ্ডবিধির ২৯৯-৩১১ ধারায় হত্যার শাস্তি উল্লেখ করা হয়েছে।

২৯৯ ধারা: কোন ব্যক্তি যদি মৃত্যু ঘটাবার উদ্দেশ্য নিয়ে কৃত কোন কাজ কর্তৃক মৃত্যু ঘটায়, অথবা যে দৈহিক জখম মৃত্যু ঘটাতে পারে, তেমন দৈহিক জখম ঘটাবার উদ্দেশ্য নিয়ে কৃত কোন কাজের সংঘটন কর্তৃক মৃত্যু ঘটায়, অথবা যে কাজ মৃত্যু ঘটাতে পারে বলে সে জানে, সে কাজ সম্পাদন কর্তৃক মৃত্যু ঘটায়, তবে সেই ব্যক্তি শাস্তিযোগ্য নরহত্যার দোষে দোষী হবে।

৩০০ ধারা: খুনের সবক্ষেত্রে ব্যতিক্রম নির্দেশ করা হয়েছে। সে সকল ক্ষেত্র ব্যতীত অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে শাস্তিযোগ্য নরহত্যা খুন হবে, যদি যে কার্যটি কর্তৃক মৃত্যু অনুষ্ঠিত হয়, সে কার্যটি মৃত্যু সংঘটনের জন্যই করা হয়ে থাকে, অথবা

দ্বিতীয়ত, যদি কার্যটি কোন ব্যক্তিকে এমনভাবে দৈহিক আঘাত দেওয়ার উদ্দেশ্যে করা হয়ে থাকে, যে আঘাতের ফলে যে ব্যক্তিকে আঘাত দেওয়া হল, সে ব্যক্তির মৃত্যু হতে পারে বলে অপরাধী জানে, অথবা

তৃতীয়ত, যদি কোন ব্যক্তিকে দৈহিক আঘাত দানের উদ্দেশ্যে কার্যটি করা হয় এবং যদি যে দৈহিক আঘাত দেওয়ার অভিসন্ধি করা হয়েছে, সে আঘাতটি প্রকৃতির স্বাভাবিক গতিতে মৃত্যু ঘটাবার পক্ষে যথেষ্ট হয়, অথবা

চতুর্থত, যদি যে ব্যক্তি কার্যটি অনুষ্ঠান করে সে ব্যক্তি জানে যে, কার্যটি এমন আশু বিপজ্জনক যে, ইহার দরুণ খুব সম্ভব মৃত্যু ঘটবে, অথবা ইহার দরুণ অবশ্যই এমন দৈহিক আঘাত ঘটবে, যার ফলে মৃত্যু ঘটতে পারে এবং মৃত্যু ঘটাবার বা অনুরূপ দৈহিক আঘাত ঘটাবার ঝুঁকি গ্রহণের অপর কোন অজুহাত ব্যতিরেকে অনুরূপ কার্য করে।

৩০১ ধারা: কোন ব্যক্তি যদি এমন কোন কার্য করে যা কর্তৃক মৃত্যু সংঘটনের ইচ্ছা বা উদ্দেশ্য তার ছিল অথবা যার দরুণ মৃত্যু সংঘটন হতে পারে বলে তার জানা ছিল এবং এই কার্য কর্তৃক সে এমন কোন ব্যক্তির মৃত্যু সংঘটন করে শাস্তিযোগ্য নরহত্যা করে, যার মৃত্যু সে কামনা করে নাই বা যার মৃত্যু হতে পারে বলে তার জানা ছিল না, তবে অপরাধী যে ব্যক্তির মৃত্যু সংঘটনের ইচ্ছা করেছিল, কিংবা যে ব্যক্তির মৃত্যু ঘটতে পারে বলে জানত সে ব্যক্তির মৃত্যু সংঘটন করলে তার অপরাধটি যেরূপ হত, এই ক্ষেত্রেও সেরূপ হবে।

৩০২ ধারা: কোন ব্যক্তি যদি খুনের অপরাধ করে তবে উক্ত ব্যক্তি মৃত্যুদণ্ডে, যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবে এবং তদুপরি অথ দণ্ডেও দণ্ডিত হবে।

৩০৩ ধারা: কোন ব্যক্তি যদি যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত অবস্থায় খুন করে, তবে সে ব্যক্তি মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হবে।

৩০৪ ধারা: কোন ব্যক্তি যদি খুন নয় এমন শাস্তি যোগ্য নরহত্যা করে, তবে সে ব্যক্তি যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে, অথবা দশ বৎসর পর্যন্ত যেকোন মেয়াদের সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবে এবং তদুপরি অর্থ দণ্ডেও দণ্ডিত হবে, যদি যে কার্যটি কর্তৃক মৃত্যু অনুষ্ঠিত হয়, সে কার্যটি মৃত্যু সংঘটনের উদ্দেশ্য নিয়ে করা হয়, অথবা এমন দৈহিক জখম করার উদ্দেশ্য নিয়ে করা হয়, যে দৈহিক জখমের দরুণ মৃত্যু ঘটতে পারে; অথবা দশ বৎসর পর্যন্ত যেকোন মেয়াদের সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ডে, অথবা অর্থ দণ্ডে, অথবা উভয়বিধ দণ্ডেই দণ্ডিত হবে, যদি যে কার্যটি কর্তৃক মৃত্যু অনুষ্ঠিত হয়, সে কার্যটি সম্পাদনের দরুণ মৃত্যু অনুষ্ঠিত হতে পারে বলে জানা থাকে, অথচ কার্যটি মৃত্যু সংঘটনের উদ্দেশ্যে করা হয় নাই যে দৈহিক জখম করার কারণে মৃত্যু ঘটতে পারে।

ক। কোন ব্যক্তি যদি বেপরোয়াভাবে বা অবহেলাজনকভাবে কার্য করে কারো মৃত্যু ঘটায় এবং তা শাস্তিযোগ্য নরহত্যা না হয়, তবে সে ব্যক্তি পাঁচ বৎসর পর্যন্ত মেয়াদের সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ডে, অথবা অর্থ দণ্ডে, অথবা উভয়বিধ দণ্ডেই দণ্ডিত হবে।

খ। কোন ব্যক্তি বেপরোয়াভাবে বা অবহেলামূলকভাবে জনপথে যান চালিয়ে বা অশ্বারোহণের কর্তৃক নিন্দনীয় নরহত্যা নয় এমন মৃত্যু ঘটাইলে, সে ব্যক্তি তিন বৎসর পর্যন্ত যেকোন মেয়াদের কারাদণ্ডে বা অর্থ দণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডেই দণ্ডিত হবে।

৩০৫ ধারা: যদি আঠারো বৎসরের কম বয়স্ক কোন ব্যক্তি, কোন উন্মাদ ব্যক্তি, প্রলাপগ্রস্ত ব্যক্তি, নির্বোধ ব্যক্তি, বা কোন ব্যক্তি নেশাগ্রস্ত অবস্থায় আত্মহত্যা করে, তবে যে ব্যক্তি এই আত্মহত্যায় সহায়তা বা প্ররোচনা দান করে, সে

ব্যক্তি মৃত্যুদণ্ডে বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে অথবা অনধিক দশ বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবে, এবং তদুপরি অর্থ দণ্ডেও দণ্ডিত হবে।

৩০৬ ধারা: কোন ব্যক্তি যদি আত্মহত্যা করে, তবে যে ব্যক্তি আত্মহত্যায় সহায়তা বা প্ররোচনা দান করবে, উক্ত ব্যক্তি দশ বৎসর পর্যন্ত যেকোন মেয়াদের সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবে, এবং তদুপরি অর্থ দণ্ডেও দণ্ডিত হবে।

৩০৭ ধারা: কোন ব্যক্তি যদি এমন উদ্দেশ্য নিয়ে বা এমন আশঙ্কা জানা সত্ত্বেও এমন অবস্থায় এমন কোন কার্য করে, যার ফলে মৃত্যু ঘটলে সে খুনের দায়ে অপরাধী সাব্যস্ত হবে, তবে উক্ত ব্যক্তি দশ বৎসর পর্যন্ত যেকোন মেয়াদের সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবে, এবং তদুপরি অর্থ দণ্ডেও দণ্ডিত হবে, এবং যদি অনুরূপ কাজের কর্তৃক কোন ব্যক্তিকে আঘাত করা হয়, তবে অপরাধী যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে অথবা ইতোপূর্বে যে সাজার উলেখ করা হয়েছে, সে দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তির উদ্যোগ (Attempts by life convicts): যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত কোন ব্যক্তি যদি এই ধারায় উল্লেখিত অপরাধ করে এবং তার ফলে কেউ আহত হয়, তবে উক্ত ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা যেতে পারে।

৩০৮ ধারা: কোন ব্যক্তি যদি এমন উদ্দেশ্য নিয়ে বা এমন আশঙ্কা জানা সত্ত্বেও এমন অবস্থায় এমন কোন কার্য করে, যে অবস্থায় সে কার্যটি করার ফলে মৃত্যু অনুষ্ঠিত হলে সে খুন নয় এমন শাস্তিযোগ্য নরহত্যা করার দায়ে অপরাধী সাব্যস্ত হবে, তবে সে ব্যক্তি তিন বৎসর পর্যন্ত যেকোন মেয়াদের সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবে, অথবা অর্থ দণ্ডেও দণ্ডিত হবে, অথবা উভয়বিধ দণ্ডেই দণ্ডিত হবে; এবং যদি অনুরূপ কাজের দরুণ কোন ব্যক্তি আহত হয়, তবে সে ব্য (অপরাধকারী) সাত বৎসর পর্যন্ত যেকোন মেয়াদের সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ডে অথ অর্থ দণ্ডে অথবা উভয়বিধ দণ্ডেই দণ্ডিত হবে।

৩০৯ ধারা: কোন ব্যক্তি যদি আত্মহত্যা করার চেষ্টা করে এবং অনুরূপ অপরাধ সংঘটনের উদ্দেশ্যে কোন কার্য করে, তবে উক্ত ব্যক্তি এক বৎসর পর্যন্ত যেকোন মেয়াদের বিনাশ্রম কারাদণ্ডে অথবা অর্থ দণ্ডে অথবা উভয়বিধ দণ্ডেই দণ্ডিত হবে।

৩১০ ধারা: কোন ব্যক্তি যদি এই আইন পাস হওয়ার পরে কোন সময় খুনের মাধ্যমে বা খুন সহ দস্যুতা সাধন বা শিশু অপহরণের জন্য অপর এক বা একাধিক ব্যক্তির সাথে অভ্যাসগতভাবে সংশ্লিষ্ট হয়ে থাকে, তবে সে ব্যক্তি একজন ঠগ ।

৩১১ ধারা: কোন ব্যক্তি যদি ঠগ হয়, তবে সে ব্যক্তি যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবে এবং তদুপরি অর্থ দণ্ডেও দণ্ডিত হবে।

(সূত্র: লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার. http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-details-11.html)

গ্রন্থপঞ্জি

ধর্মগ্রন্থ

১. আল কুরআন

২. বাইবেল (ওল্ড টেস্টামেন্ট)

৩. বাইবেল (নিউ টেস্টামেন্ট)

৪. মনুস্মৃতি

৫. বেদ

৬. ভগবত

৭. ত্রিপিটক

৮. অনুবাদক মণ্ডলী, ইঞ্জিল শরিফ (বাংলা ও রেজী অনুবাদ) ঢাকা : দি বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি, ১৯৯২

৯. অনুবাদক মণ্ডলী, পবিত্র বাইবেল (পুরাতন ও নতুন নিয়ম) ঢাকা : বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি ২০০০

১০. মানুবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, মনুসংহিতা, কলকাতা, ভারত : সদেশ, ১৪১২ বাং

১১. শ্রী শিবশঙ্কর চক্রবর্তী, শ্রীমদ্ভগবত গীতা, ঢাকা: আনন্দ প্রকাশনী, ১৯৯৯

১২. অনুবাদক মণ্ডলী, পবিত্র ত্রিপিটক, বাংলাদেশ : ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, ২০১৭

১৩. শ্রীহরিদাস সিদ্ধান্ত বাগীশ ভট্রাচার্যের স্মৃতিচিন্তামণিঃ, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলকাতা, ভারতঃ ২০০৯

১৪. সতেন্দ্র নাথ ঠাকুর, বৌদ্ধধর্ম, অর্পিতা প্রকাশনী, ঢাকা: ২০১২

১৫. সুদর্শন বড়ুয়া, ত্রিপিটক পরিচিতি, প্রকাশিকা–শ্রীমতী প্রভাবতী বড়ুয়া, চট্রগ্রাম, বাংলাদেশঃ ২০০৭

১৬. সুদর্শন বড়ুয়া, প্রশ্নোত্তরে ত্রিপিটক, (দ্বিতীয় খন্ড) প্রকাশিকা– শ্রীমতী প্রভাবতী বড়ুয়া, চট্রগ্রাম, বাংলাদেশঃ ২০০৩

১৭. স্বামী বেদানন্দ, ভারত সেবাশ্রম সজ্ঞঃ ১৪০৫ বাং স্বামী নির্বেদানন্দ হিন্দু ধর্ম, রামকৃষ্ণমিশন, কলকাতা, ভারত, ২০১১

তাফসীরুল কুরআন ও উলুমুল কুরআন বিষয়ক গ্রন্থ

১. আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস, *তাফসীরে ইবন আব্বাস*, অনুবাদকমণ্ডলী কর্তৃক অনূদিত, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৫

২. আবুল ফিদা ইসমাইল ইবন কাসীর, *তাফসীরুল কুরআরিল আযীম*, বৈরুত : দারু তাইয়্যেবাহ লিল নশর, ১৪২০ হি
৩. আবুল কাসিম হুসাইন ইবন মুহাম্মদ আল মা'রুফ বির রাগিব আল-ইস্পাহানী, *আল-মুফরাদাতু ফী গারীবিল কুর'আন*, দামেশক : দারুল ক্বলম, ১৪১২ হি
৪. আবূ আব্দিল্লাহ্ মাহমূদ ইবন উমার আল-জামাখশারী, *আল-কাশ্‌শাফু আন হাকায়িকিল গাওয়ামিজিত তানযীল ওয়া উয়ূনুল আকাবীল ফী উজুহিত তা'বীল*, মিশরঃ মুস্তফা আল-বাবী আল-হালবী, ১৯৩৮
৫. আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন আহমাদ আল-কুরতুবী, *আল-জামি' লি আহকামিল কুর'আন*, বৈরূত : দারু ইহয়িয়ায়িত্ তুরাছ আল-আরবী, তাবি
৬. আবু বকর আহমদ ইবন আলী আল জাসসাস, *আল ফুসুল ফিল উসূল*, লাহোর : মাকতাবায়ে ইলমিয়া, তাবি
৭. কাযী ছানাউল্লাহ পানিপথী, *তাফসীরে মাযহারী*, অনুবাদকমণ্ডলী কর্তৃক অনূদিত ও সম্পাদনা পর্ষদ কর্তৃক সম্পাদিত, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৭
৮. ড. সুবহি সালিহ, *মাবাহিছ ফী 'উলূমিল কুর'আন*, মিশর : দারুল ইলম, ২০০০
৯. ড. আহমাদ সান্‌বাতী, *তরজুমাতুল মা'আনিল কুর'আনিয়্যাহ*, কাতার : মাতাবি'আদ দা'ওয়াতুল হাদীছাহ, তাবি
১০. মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শাফী (রহ.), *তাফসীরে মা'রেফুল কুর'আন*, অনু. মাওলানা মুহিউদ্দিন খান, সৌদি আরব : তাবি
১১. মুহাম্মদ ফখরুদ্দীন রাযী, *আত-তাফসীর আল কাবীর*, তেহরান : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, তাবি

আল হাদীস বিষয়ক গ্রন্থ

১. আবু আব্দিল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইয়াযিদ ইবন মাজাহ, *আস সুনান*, মিশর : দার ইহয়্যি কুতুবুললি আরাবী, তাবি
২. আবু বকর আব্দুর রাজ্জাক, *আল মুসান্নিফ*, বৈরুত : মাকতাবাতুল ইসলামী, ১৪০৩ হি
৩. আবু বকর আহমদ ইবন হুসাইন ইবন আলী ইবন মূসা বায়হাকী, *সুনানুল কুবরা*, বৈরুত : দারু কুতুবুল ইলমিয়্যাহ, ১৪২৪ হি
৪. আবদুল্লাহ ইবন আবী শায়বা, *আল-মুসান্নাফ*, রিয়াদঃ মাকতাবাতুর রুশদ, ১৪০৯ হি
৫. আবু মুহাম্মদ আব্দুল হামিদ ইবন আবদ ইবন হুমায়দ, *আল-মুসনাদ*, কায়রোঃ মাকতাবাতুস সুন্নাহ, ১৯৮৮
৬. আবু হাতিম মুহাম্মদ ইবন হিব্বান, *আস-সহীহ*, বৈরুতঃ মুআস্‌সাতুর রিসালাহ, ১৯৯৩
৭. আবু বকর ইবন আবদিল বার্‌র, *আত-তামহীদ*, আল-মাগরিবঃ ওয়াযারাতুল আওকাফ, ১৩২৭
৮. আহমদ ইবন আবি ইয়ালা, আহমদ : *আল-মুসনাদ*, দামেশকঃ দারুল মামুন লিত-তুরাছ, ১৯৮৪
৯. আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল বুখারী, *আস সহীহ*, দামেশক : দারু তাওকুন নাজাত, ১৪২২ হি

১০. আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল বুখারী, *আদাবুল মুফরাদ*, বৈরুত : দারু বাশায়িরিল ইসলামী, ১৪০৯ হি
১১. মুসলিম ইবনল হাজ্জাজ আন নিশাপুরী, *আস সহিহ*, বৈরুত : দারু এহইয়া আত তুরাস আল আরাবী, তাবি
১২. মালিক ইবন মালিক ইবন আনাস ইবন আমের আল মাদানী, *আল মুয়াত্তা*, বৈরুত : মুআস্‌সাতুর রিসালাহ, তাবি
১৩. আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা আত তিরমিযী, *আস-সুনান*, মিশর : শিরকাতু মাকতাবাতি মাতবা'আতি মুসতফা আল বালী আল হালী, ১৩৯৫ হি
১৪. আবু দাউদ সূলায়মান ইবন আশআস ইবন ইসহাক আসসিজিস্তানী, *আস সুনান*, বৈরুত : মাকতাবা আসরীয়াহ, তাবি
১৫. আহমদ ইবন হুসাইন আল বায়হাকী, *শুআবুল ঈমান*, হিন্দ : দারে সালাফিয়্যাহ, ১৪২৩ হি
১৬. আহমদ ইবন হুসাইন আল বায়হাকী, *সুনানুল সুগরা*, বৈরুত : মাকতাবাতুল ইসলামী, ১৪০৫ হি
১৭. আহমদ ইবন হাম্বল, *আল মুসনাদ*, বৈরুত : মুআসসাসাতুর রিসালা, ১৪২১ হি
১৮. মুহাম্মদ ইবন ইসহাক খুযায়মাহ আবু বকর, *আল মুসনাদ*, বৈরুতঃ আল-মাকতাতুল ইসলামী, ১৯৮৫

আল ফিকহ, উসূলে ফিকহ, আইন ও ইসলামী আইন বিষয়ক গ্রন্থ

১. আলী ইবন আহমদ আল-জুরজানী, *আত-তা'আরিফাত*, ইস্তাম্বুল : মাতবা'আহ আহমাদ কামিল, ১৩২৭ হি
২. আবু ইসহাক ইবরাহীম ইবন মূসা আল-লাখমী আশ-শাতিবী, *আল-মুআফাকাত ফী উসূলিশ শরীআহ*, মিসর : আল মাকতাবাতুত তিজারিয়্যাতিল কুবরা, তাবি
৩. আহমদ মোল্লাজিউন, *নুরুল আনওয়ার*, দিল্লী : রশিদীয়া কুতুবখানা, তাবি
৪. আবুল আব্বাস আহমদ ইবন ইদরীস আল-কারাফী, *আল-ফুরূক*, বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৮
৫. আবু ইসহাক ইবরাহীম ইবন মূসা আল-লাখমী আশ-শাতিবী, *মাজমুআতুর রাসাইল ওয়াল মাসাইল*, আল কাহিরা, তা.বি
৬. আলী ইবন আহমদ ইবন হাযম, *আল-ইহকামু ফী উসূলিল আহকাম*, কায়রো : দারুল হাদীস, ১৪০৪হি
৭. আবূ বকর আহমদ আল খাতীব আল বাগদাদী, *আল ফাকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ*, রিয়াদ : মাতাবিউল কাসীম, তাবি
৮. আবু মুহাম্মদ মুওয়াফিক উদ্দিন আব্দুল্লাহ ইবন আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন কুদামা, *আল মুগণী*, বৈরুত : দারুল কিতাবিল আরাবি, ১৯৭২
৯. আবদুস শহীদ নাসিম, *ইসলামী শারীয়া কি? কেন? কিভাবে?* ঢাকা : শতাব্দী প্রকাশনী, ২০১০
১০. আলতাফ হোসেন (অধ্যক্ষ), *ইকুইটি ট্রাস্ট ও হিন্দু আইন*, প্রভাতী প্রকাশনী, ঢাকা: ২০০৬
১১. আলতাফ হোসেন (অধ্যক্ষ), হিন্দু আইন, সিটি ল'বুকস, ঢাকা: ২০১০

১২. আলতাফ হোসেন (অধ্যক্ষ), *জুরিস্প্রুডেন্স*, জলি ল'বুক সেন্টার, ঢাকা: ২০০৭
১৩. আল্লামা ইউসুফ আল কারযাভী, *ইসলামী শরীয়াতের বাস্তবায়ন*, অনু. ড মাহফুজুর রহমান, ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, ২০০২
১৪. আলিমুজ্জামান চৌধুরী, *ইসলামিক জুরিস্প্রুডেন্স ও মুসলিম আইন*, ঢাকা : কুমিল্লা ল' বুক হাউজ, ২০০৫
১৫. আলাউদ্দিন আবূ বকর ইবন মাসউদ আল কাসানী, *বাদাইউস সানাই ফী তারতিবিশ শারাঈ* (কাহিরা : দারুন নাহদা, ১৩৭৮ হি
১৬. ইবন খাল্লিকান, *ওয়াফাতুল 'আইয়ান*, আল-কাহিরা : ১৮৮১
১৭. ইবন বাদরান হাম্বলী, *আল-মাদখাল ইলা মাযহাবি আহমদ*, মিসর : আল- মাতবাআতুল মুনিরিয়্যাহ, ১৯২৭
১৮. ইবনল কায়্যিম আল জাওযিয়া, *ইলামুল মুওয়াক্কিঈন*, আল কাহিরা : দারুল হাদীস, ২০০১
১৯. আবুল হাসান ইবন উসফুর আল-ইশবিলী, *আল-মুমতিউল কাবীর ফিত তাসরীফ*, বৈরূত : দারুল আফাকিল জাদীদ, ১৯৭৮
২০. ইউসুফ আল কারযাভী, শরী'আতুল ইসলাম খুলুদুহা ওয়া ছালাহুহা লিততাতবিক ফি কুল্লি যামাননিল ওয়া মাকানিল, বৈরূত : আল মাকাতাবুল ইসলাম, তাবি
২১. আবু হামিদ মুহাম্মদ ইবন মুহাম্মদ আল গাযালী, *আল মুসতাসফা ফী উসূলিল ফিক্হ*, বৈরুত : দারু কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৪১৩ হি
২২. এম মনিরুজ্জামান, *ইসলামিক জুরিসপ্রুডেন্স ও মুসলিম আইন*, ঢাকা : ধানসিঁড়ি পাবলিকেশন্স, ২০১২
২৩. এম পি জৈন, *আউটলাইন্স অব ইন্ডিয়ান লিগ্যাল হিস্টরী*, নিউ দিল্লী : মানোহার পাবলিশার্স, ১৯৯৩
২৪. গাজী শামছুর রহমান, *আইনবিদ্যা*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩
২৫. গাজী শামছুর রহমান, *মুসলিম আইনের ভাষ্য*, ঢাকা : খোশরোজ কিতাব মহল, ২০১০
২৬. ড. জামাল উদ্দীন আতীয়া, *ইসলামী শরীয়ত ও বিচার ব্যবস্থায় বৈশিষ্ট্য*, ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিচার্স এণ্ড লিগাল এইড সেন্টার, ২০১২
২৭. ড. ইউসুফ হামিদ আল আলিম, *আল মাকাসিদুল আম্মা লিশ্ শারী'আতিল ইসলামিয়্যাহ*, রিয়াদ : আল মাহমুদ আলাম আল ইসলামী, ১৪১৫ হি
২৮. ড. আবদুল করীম যায়দান, *আল-মাদখাল লি দিরাসাতিশ শরীআতিল ইসলামিয়্যাহ*, আল-ইসকান্দারিয়্যাহ : দারু উমর ইবন আল-খাত্তাব, ১৯৬৯
২৯. ড. গালিব আলী আদ-দাওয়াদী, *আল-মাদখাল ইলা ইলমিল কানূন*, আম্মান : দারু ওয়াঈল লিত্ তবাআতি ওয়ান্ নাশরি, ২০০৪
৩০. ড. মুহাম্মদ মুস্তফা আয-যুহাইলী, *আল-ওয়াজীয ফী উসূলিল ফিকহিল ইসলামী*, দামেশক : দারুল খাইর, ২০০৩
৩১. ড. আব্দুল করীম যায়দান, *আল-ওয়াজীয ফী উসূলিল ফিকহ*, বৈরুত : মুআস্সাসাতুর রিসালাহ, তাবি
৩২. ড. ওয়াহাবাতু আয-যুহাইলী, *উসূলুল ফিকহিল ইসলামী*, দামেশক : দারুল ফিকর, তাবি

৩৩. ড. আনওয়ার শুআইব আল-আবদুস সালাম, *শার'উ মান কাবলানা মাহিয়্যাতুহু ওয়া হুজ্জিয়্যাতুহু ওয়া নাশআতুহু ওয়া দাওয়াবিতুহু ওয়া তাতবীকাতুহু*, কুয়েত : প্রকাশনা কমিটি, কুয়েত বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৫

৩৪. ড. আবদুল করীম যায়দান, *উসূলুদ দাওয়াহ*, মিসর : দার উমর ইবনল খাত্তাব, ১৯৭৫

৩৫. ড. মুহাম্মদ আত-তাহের আর-রিযকী, *মানবাধিকার ও দণ্ডবিধি*, ঢাকা : ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ, ২০০৮

৩৬. ড. মুহাম্মদ ইয়াসীন মাযহার সিদ্দিকী, *রাসূলুল্লাহ মুহাম্মদ (সা.)-এর সরকার কাঠামো*, অনু. মুহাম্মদ ইবরাহীম ভুঁইয়া, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪

৩৭. ড. মুসতাফা হাসানী আস্-সিবাঈ, *ইসলামী শরীয়াহ ও সুন্নাহ*, অনু. এ,এম,এম সিরাজুল ইসলাম, ঢাকা : ইসলামীক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৯

৩৮. ড. আবু আমীনাহ বিলাল ফিলিপস, *মাযহাব অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ*, সেলাংগর, মালেশিয়া : সিয়ান পাবলিকেশন, ২০১৪

৩৯. ড. আবদুল আযীয আমের, *ইসলামী দণ্ডবিধি*, শহীদুল ইসলাম অনূদিত, ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার, ২০১২

৪০. ড. আহমদ আলী, *ইসলামের শাস্তি আইন*, ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০০৯

৪১. তকী উদ্দীন ইবন তাইমিয়াহ, *বায়ানুদ দালীল আলা বুতলানিত তাহলীল*, রিয়াদ : মাকতাবাতু লিন নাশরি ওয়াত তাওযী', তাবি

৪২. প্রফেসর ড. মুহা. আব্দুর রহমান আনওয়ারী, *ইসলামী শারী'আতে ইজতিহাদের স্বরূপ*, কুষ্টিয়া : সেন্টার ফর ইসলামিক কল এণ্ড রিসার্চ, ২০০৭

৪৩. ফখরুদ্দীন মুহাম্মদ ইবন আলী আর-রাযী, *আল-মাহসূলু ফী ইলমি উসূলিল ফিকহ*, বৈরূত : মুআসসাসাতুল রিসালাহ, ১৯৯২

৪৪. মান্না ইবন খলীল আল কাত্তান, *তারীখুত তাশরীইল ইসলামী*, দামেশক : মাকতাবাতু ওহবিয়্যাহ, ১৪২২ হি

৪৫. মাওলানা ওবায়দুল হক ও অন্যান্য (সম্পাদিত), *ফাতওয়া ও মাসাইল*, ঢাকা : ইসলামিক ফাইন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৬

৪৬. মুহাম্মদ ইবন আলী আশ শাওকানী, *ইরশাদুল ফুহুল ইলা তাহকীকিল হক্কি মিন ইলমিল উসূল*, রিয়াদ : দারুল ফাদীলাহ, তাবি

৪৭. বিচারপতি আবদুল কাদির আওদাহ, *আত তাশরীউল জিনাইল ইসলামী*, বৈরুত : মুয়াসসাতুর রিসালাহ, ১৯৮৬

৪৮. মওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *ইসলামী শরীয়াতের উৎস*, ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, ২০০৬

৪৯. মাওলানা মুহাম্মদ মূসা ও মাওলানা মোঃ মোজাম্মেল হক সংকলিত, *বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা : ২০১৮

৫০. লেখকমণ্ডলী ও সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামী আইন ও আইন বিজ্ঞান*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০১১

৫১. লেখকমণ্ডলী, *মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ ১৯৬১-এর কুরআন সুন্নাহর আলোকে পর্যালোচনা ও কতিপয় সংশোধনীর প্রস্তাব*, ঢাকা : ইসলামিক ল’ রিসার্চ সেন্টার এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ, ২০০৭
৫২. বুরহান উদ্দীন আবুল হাসান আলী ইবন আবূ বকর আল-ফারগানী আল-মারগীনানী (রহ.), *আল-হিদায়া*, আবু তাহের মিসবাহ অনূদিত, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৭
৫৩. সাইয়্যেদ সাবেক, *ফিকহুস সুন্নাহ*, আবদুস শহীদ নাসিম সম্পাদিত, শতাব্দী প্রকাশনী, ঢাকা : ২০১৫

অভিধান

১. আবু মানসুর মুহাম্মদ ইবন আহমদ আল-হারাবী, *তাহযিবুল লুগাহ*, বৈরুতঃ দারু ইহয়াউত তুরাছিল আরাবী, ২০০১
২. আবুল হাসান আহমদ ইবন ফারিস আররাযী, *মু’জামু মাক্বাইসিল লুগাত*, দামেশকঃ দারুল ফিকর, ১৯৭৯
৩. জামালউদ্দীন ইবন মুহাম্মদ ইবন মানযূর আল-আফ্রিকী, *লিসানুল আরব*, বৈরূত : দারু ইহইয়াউত তুরাসিল আরাবী, ১৯৯৯
৪. ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান, *আল মুনীর আরবী-বাংলা অভিধান*, ঢাকা : দারুল হিকমা বাংলাদেশ, ২০১০
৫. ডক্টর মুহাম্মদ এনামুল হক ও শিব প্রসন্ন লাহিড়ী, *ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, পথম সংস্করণ ডিসেম্বর ১৯৭৪ ও জুন ১৯৮৪
৬. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান*, ঢাকা : রিয়াদ প্রকাশনী, ২০০৯
৭. মাজদুদ্দীন মুহাম্মদ ইবন ইয়াকুব ফিরোযাবাদী, *আল-কামূসুল মুহীত*, বৈরুত : দারু ইয়াহইউত তুরাসিল আরাবী, ২০০৩
৮. মুহাম্মদ রাওয়াছু কাল’আযী এবং হামিদ সাদিক কুনাইবী, *মু’অজামু লুগাতিল ফুকাহা*, দারুন নাফাইস লিত তাবা’আতি ওয়ান নাশরী ওয়াত-তাওযী, ১৯৮৮
৯. নরেন বিশ্বাস, *বাঙলা উচ্চারণ অভিধান*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা : ১৯৯৯
১০. শৈলেন্দ্র বিশ্বাস, *সংসদ বাংলা অভিধান*, সাহিত্য সংসদ, কোলকাতাঃ ২০০৪

অভিসন্দর্ভ

১. উম্মে হাবিবা, *আইনগত ও নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে মানবাধিকার চর্চা*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ.ডি ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি (অপ্রকাশিত), ২০১৫
২. মো : মনোয়ার পারভেজ মুন্না, *ইসলামে শিশুর মৌলিক অধিকার ঃ বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ.ডি ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি(অপ্রকাশিত), ২০১৪

৩. মোঃ মাহবুবুল আলম, *ইসলামে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির বিধান : অপরাধ ও দুর্নীতি দমনের অনন্য উপায়*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ. ডি ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত (অপ্রকাশিত) অভিসন্দর্ভ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি, ২০১৫

৪. ড. মুহাম্মদ ছাইদুল হক, *ইসলামী বিচার ব্যবস্থা : প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ*, (অপ্রকাশিত থিসিস), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, খ্রি. ২০০৭

৫. মো: বশির উদ্দিন, *আবূ হানীফা(র.) ও হাদীসশাস্ত্র*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ.ডি ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি(অপ্রকাশিত), ২০১৫

৬. মোঃ গোলাম কিবরিয়া, "ইসলাম, হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান ধর্মে উত্তরাধিকার আইন ঃ একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা", ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ.ডি ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি(অপ্রকাশিত), ২০১৩

অন্যান্য গ্রন্থাবলী

১. আব্বাস আলী খান, *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস*, ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১৯৯৪

২. মুহাম্মদ শহিদুল ইসলাম, *ইসলাম পরিচিতি*, বুকস্ ফেয়ার, ঢাকা : ২০১৮

৩. মোঃ ইব্রাহীম খলিল, ইসলাম পরিচিতি, ঢাকা : মেরিট ফেয়ার প্রকাশনা, ২০১১

৪. সাইয়েদ জালালুদ্দিন আনসার উমরী, *ইসলামি সমাজে নারী*, *ইসলামি সমাজে নারী*, মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক অনূদিত, ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, নভেম্বর ২০০৮

৫. আল্লামা ছফিউর রহমান মোবারকপুরী, *আর রহীকুল মাখতুম*, আল কোরআন একাডেমী লন্ডন, লন্ডন : ২০০৪

৬. হাসান আলী চৌধুরী, *ইসলামের ইতিহাস ও বাংলাদেশ ও পাক ভারতের মুসলমানদের ইতিহাস*, ঢাকা : আইডিয়াল লাইব্রেরী, বাংলাবাজার, ১৯৯৫

৭. স্যার টমাস আর্নল্ড ও আলফেড গিল্ম, *পাশ্চাত্য সভ্যতায় ইসলাম*, অনু. নুরুল ইসলাম পাটোআরী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা : ২০০৭

৮. আবূ জা'ফার মুহাম্মদ ইবন জারীর আত-ত্ববারী, *তারীখুল উমামি ওয়াল মুলূক*, বৈরুত : দারুল কুতুবিল 'ইল্মিয়া, ১৪০৭ হি

৯. ফিলিপ কে হিট্টি, *আরব জাতির ইতিহাস*, কলিকাতা : মল্লিক ব্রাদার্স, ১৯৯৯

১০. ড. মো: শফিকুর রহমান, *বাংলাদেশের আইন বিচার ব্যবস্থা এবং সাংবিধানিক ক্রমবিকাশ*, কামরুল বুক হাউস, ঢাকা-চট্টগ্রাম : ২০১৯

১১. ড. হারুন-অর-রশীদ, *বাংলাদেশ : রাজনীতি সরকার ও শাসনতান্ত্রিক উন্নয়ন ১৭৫৭-২০০০*, নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা : ২০১৪

১২. অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, নাজমুল ইসলাম, *বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান*, রোদেলা প্রকাশনী, ঢাকা : ২০২০

১৩. ড. মোঃ শাজাহান কবির, *বিশ্বের ধর্ম পরিচিতি*, ঢাকা: দিক দিগন্ত, ২০১৪

১৪. ড. মোঃ ইব্রাহীম খলিল, *বিশ্বের প্রধান প্রধান ধর্ম*, ঢাকা : মেরিট ফেয়ার প্রকাশনা, ২০১৯

১৫. ডঃ মাযহার উদ্দীন সিদ্দীকী, *ইসলাম ও অন্যান্য ধর্ম*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯১

১৬. ড. এ এইচ এম মুজতবা হোসাইন সম্পাদিত, *হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (স) সমকালীন পরিবেশ ও জীবন*, ইসলামিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ, ঢাকা : ২০০১

১৭. ড. মুহাম্মদ ইয়াসীন মাযহার সিদ্দিকী, *রাসূলুল্লাহ মুহাম্মদ (সা.)-এর সরকার কাঠামো*, অনু. মুহাম্মদ ইবরাহীম ভুঁইয়া, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা : ২০০৪

১৮. ড. মোঃ ইব্রাহীম খলিল, *আস-সীরাতুন নববীয়া*, মেরিট ফেয়ার প্রকাশন, ঢাকা : ২০১২

১৯. মুহাম্মদ আলী আস সাবুনী, *আন নুবুওয়্যাহ আল-আম্বিয়্যাহ*, মক্কা : ১৯৮০

২০. মোহাম্মদ আলী মনসুর, *বিচার বিভাগের স্বাধীনতার ইতিহাস*, ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক ল’ রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার, ২০১০

২১. শাহ ওয়ালী উল্লাহ দিহলবী, মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ে সঠিক পন্থা অবলম্বনের উপায়, (অনুবাদ : আব্দুস শহীদ নাসিম, ঢাকা : ইসলামিক সেন্টার, ১৯৯১)

২২. সাইফুদ্দিন আলী ইবন মুহাম্মদ আল-আমিদী, আল-ইহকামু ফী উসূলিল আহকাম, (রিয়াদ : দারুল মামীয়ী লিন নাশর ওয়াত তাওযী, ২০০৩)

23. N.E Simmonds, *Philosophy of Law,* (Harcourt Brace College Publishers, New York 1996)
24. Johari, J. C., *Contemporary Political Theory, Basic Concepts and Major Trends,* (Sterling Publisher Pvt. Ltd.1980)
25. Dunning, *A History of Political Theories. From Rousseau to Spencer,* (Central Book Depot, Allahbad, 1967)
26. A.Y. Vyshinsky: *The law of the Soviet State,* (New York: Macmillan,1948)
27. Samuel Koeting, ph.D, *Sociology an Introduction to the science of Society,* New York: Barnes and Nobel inc, 1965
28. Morris Ginsberg, *Sociology,* London: Oxford University Press, 1987
29. M.A. Mannan, *Islamic Economics : Theory and practice*, Cambridge: The Islamic Academy, 1936
30. M. Nejahullah Siddiqui, *History of Islamic Thought* (Lectures on Islamic Economics, IRT/IDB, Jeddha, 1992
31. Mouluvi Nur Ahmed, captain k. M. A. Rab. *Islam and is holy pronhet as fudged by the non Muslim world,* (Dhaka : Islami foundation Bangladesh, 1994).
32. Sir George Rankin, *Background of Indian Law* (Cambridge: University Press, 1946)
33. Imran Ahsan Khan Nyazee, *Theories of Islamic law: the Methodology of Ijtihad,* Kuala Lampur: The other Press, 2002
34. Imran Ahsan Khan Nyazee, *Islamic Jurisprudence: usul al-Fiqh*. Islamabad: International Institute of Islamic Thought, 2006

Dhaka University Institutional Repository

পত্রিকা, জার্নাল

১. আলহাজ বদিউল আলম, ইসলামী আইন ও বিচার ব্যবস্থা : 'প্রেক্ষিত বাংলাদেশ', ঢাকা : *ইসলামী আইন ও বিচার পত্রিকা*, প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, জানুয়ারী-মার্চ ২০০৫।

২. ড. মো. মাসুদ আলম ও মোহাম্মদ মিজানুর রহমান, বাংলাদেশে ইসলামী আইন : সমস্যা ও সম্ভাবনা, ঢাকা : *ইসলামী আইন ও বিচার পত্রিকা*, বর্ষ ৬, সংখ্যা, ২৪ অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১০।

৩. ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, ইসলামে ইজতিহাদ : একটি পর্যালোচনা, ঢাকা : *ইসলামী আইন ও বিচার পত্রিকা*, জুলাই- সেপ্টেম্বর : ২০১০, বর্ষ ৬, সংখ্যা ২৩

৪. ড. ইউসুফ হামেদ আল আলেম, ইসলামী শরীয়তের তাৎপর্য ও উৎস, *ইসলামী আইন ও বিচার পত্রিকা*, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, জানুয়ারী- মার্চ ২০০৫

5. Habibeh Rahim, "Understanding Islam", *Journal of The Furrow,* Vol. 52, No. 12 (Dec., 2001)

৬. জুলকার নাইন ও আরাফাত মুন্না, 'দেশে দেশে কঠোর শাস্তি : আইন সংস্কার করে মৃত্যুদণ্ডের দাবি বাংলাদেশেও', *দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন*, ঢাকা : ৭ অক্টোবর ২০২০

৭. আবু নাঈম মোঃ মফিদুল ইসলাম, মানব রচিত আইন বনাম ইসলামী শরীয়াত, *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, ৪২ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, অক্টোবর-ডিসেম্বর-২০০২